তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৮তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি-এস্-সি

দ্বাবিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

১৮৫২ শক

কলিকাতা

৫৫ নং আপার চিৎপুর রোড্

আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গ ১৩৩৭। খৃঃ ১৯৩১। সম্বৎ ১৯৮৭। কলিগতাব্দ ৫০৩১

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী।

দ্বাবিংশ কল্প, চতুর্থ ভাগ।

১৮৫২ শক, ব্রাহ্মসম্বৎ ১০১।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৮তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০১। সাল ১৩৩৭। শক ১৮৫২। খৃঃ ১৯৩০। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩১।

নববর্ষে অভিবাদন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

অভিবাদন।

ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন অবধি এক শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে। আজ নব শতাব্দীর নূতন বৎসরের প্রথম দিন। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিনে আমরা দেশের ও বিদেশের, বর্ত্তমানের ও অতীতের সাধুভক্ত এবং পাপতাপক্লিষ্ট সকলকে নির্ব্বিশেষে যথাযথ অভিবাদন করিতেছি এবং সাদর-সম্ভাষণাদি জানাইতেছি। আজ আমরা ভ্রাতৃভাবে ডুবিয়া গিয়া সকলকেই প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গন দিতেছি এবং অন্তরের শুভ ইচ্ছা জানাইতেছি।

নববর্ষে মহর্ষির উপস্থিতি।

সে আজ অনেক দিনের কথা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন জীবিত; আমরা বালক—বিদ্যালয়ের ছাত্র। আমাদের জোড়াসাঁকোস্থ বাড়ীতে (দ্বারকানাথ-ভবনের) সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে প্রতি বৎসরেই নববর্ষ উপলক্ষে বিশেষভাবে ব্রহ্মোপাসনা হইত। পূজ্যপাদ পিতামহদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বিদেশভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বৎসরের প্রথম দিনের এই উৎসবে প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন দেখিতাম।

পূর্ব্বরাত্রে উঠান সাজানো।

এই উৎসব উপলক্ষে পূর্ব্ব দিন অবধি উঠানের চারিদিকে কলাগাছ পুঁতিয়া উঠানটিকে সুসজ্জিত করিবার ব্যবস্থা করা হইত। মাথার উপর সুন্দর একটী চন্দ্রাতপ খাটানো হইত। রৌদ্রতেজে পাছে শুকাইয়া যায়, সেই কারণে রাত্রি একটু গভীর হইলে মোমবাতি জ্বালাইয়া তাহারই আলোকে কলাগাছগুলির গায়ে গায়ে পাতায় পাতায় সুগন্ধি বেলফুল ও লেবুফুলের মালা লাগাইয়া দেওয়া হইত। উঠানের উত্তর পার্শ্বে আচার্য্যদিগের বসিবার জন্য দক্ষিণমুখ করিয়া দালানের সিঁড়ির উপরে বেদী সংরচিত হইত—সেই বেদীরও চারিপার্শ্ব সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করা হইত। নিম্নে ভূমিতলে দরমা বিছাইয়া তাহার উপর সতরঞ্চি বিছাইয়া তদুপরি নবধৌত বিশুভ্র জাজিম বা চাদর বিছাইয়া দেওয়া হইত।

১লা বৈশাখ প্রত্যুষে।

পরদিন ১লা বৈশাখ—নববর্ষ। অতি প্রত্যুষ হইতে ভৈরবী রাগিণীর সুমধুর আলাপ নিঃসৃত হইয়া বাড়ীর বহিঃপুরের সঙ্গে অন্তঃপুরও মুখরিত

করিয়া তুলিত। ব্রহ্মমুহূর্ত্তে বাড়ীর পুরুষ ও মহিলা এবং বালকবালিকা জাগিয়া উঠিয়া উৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেন। আমরাও বাঁশীর সুরে জাগিয়া উঠিয়া হাতমুখ ধুইয়া পবিত্র বেশে বাহিরে আসিতাম। দেখিতাম তখনও কর্ম্মচারীরা মোমবাতির আলোকে সাজাইবার কাজে লাগিয়া আছেন—তাঁহাদের ভয়, পাছে মহর্ষি কোন অংশে তাঁহাদের কাজের ত্রুটী পাইয়া বিরক্ত হন। ক্রমে প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই, ভোর পাঁচটার পূর্ব্বেই সমস্ত সাজানো শেষ হইয়া যাইত —সুগন্ধে সমস্ত উঠানটী ভরিয়া উঠিত।

সুসজ্জার সুফল।

বেদীর দুই পার্শ্বে এবং উঠানের চারিপার্শ্বে মধ্যে মধ্যে ধুনচিতে ধূপধুনা জ্বালাইয়া দেওয়া হইত। তাহার ধূম সমস্ত উঠানটীকে নবতর সুগন্ধে পরিপূর্ণ করিয়া ঊর্দ্ধমুখে উঠিত। এইপ্রকার সুন্দর শোভা ও বিশুদ্ধ ফুলগন্ধের মধ্যে আমরাও বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িতাম; আমাদের মনপ্রাণ আমাদের অজানতই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরম-পুরুষের সান্নিধ্যে ধাবিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইত। আমাদের সমস্ত হৃদয় ভক্তিশ্রদ্ধায় আপ্লুত হইয়া ভগবচ্চরণের অভিমুখে ঊর্দ্ধমুখে ছুটিবার জন্য লালায়িত হইত। এই প্রকার উৎসব অনুষ্ঠানের বাহ্যিক আকারপ্রকারের ভিতর দিয়া বালকবালিকাদের হৃদয়মন যে কি সুন্দর বিশুদ্ধভাবে গঠিত হইয়া উঠে, তাহা বুঝিবার অবসর যাহাঁরা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ভাগ্যবান।

উপাসনা আরম্ভের পূর্ব্বে।

নববর্ষে কি কি গান গীত হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া মুদ্রিত হইত। কিন্তু যথারীতি উপাসনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মমুহূর্ত্ত অবধি গায়কেরা উৎসবের উদ্বোধনস্বরূপে টোড়ী ভৈরবী প্রভৃতি প্রভাতসূচক রাগরাগিণীতে, মুদ্রিত গানের অতিরিক্ত অনেকগুলি গান করিতেন। আজ এই শুভ অবসরে রাজা রামমোহন রায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত ও ব্রাহ্মসমাজের একান্ত অনুরাগী পূতচরিত সুগায়ক বৃদ্ধ ৺বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে স্মরণ হইতেছে —তিনিই গায়কদিগের নেতৃত্ব করিতেন। তাঁহার সুকণ্ঠনিঃসৃত ব্রহ্মসঙ্গীত যিনি শুনিয়াছেন, জীবনে তিনি তাহা ভুলিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। গানের পর গান চলিত; উপাসকগণও একএক জন করিয়া আসিয়া প্রাঙ্গণটী পূর্ণ করিতেন। নববর্ষের প্রভাত-উৎসবে ১১ই মাঘের সান্ধ্য উৎসবের ন্যায় তত জনতা হইত না। মহর্ষিসন্দর্শনে যাঁহাদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইত এবং যাঁহারা বৎসরের প্রথম দিবসে ব্রহ্মোপাসনা করিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইতেন, তাঁহারাই প্রত্যূষে গাত্রোত্থানের কষ্ট বা বাধা না মানিয়া এই উৎসবে আসিতেন। ভক্তগণ নিজ নিজ পাদুকা একধারে রাখিয়া বিছানায় আসিয়া আসন অধিকার করিতেন। সকলেরই মুখ ভক্তিশ্রদ্ধায় সমুজ্জ্বল।

উপাসনাপ্রণালী।

ক্রমে প্রভাতের কনকতপন অরুণাচল ভেদ করিয়া স্বীয় উদীয়মান মহিমায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। ৬টার ঘণ্টা পড়িল। মহর্ষিও মুহূর্ত্তমধ্যে সভাস্থলে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। সুমঙ্গল শঙ্খধ্বনিতে প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিন জন আচার্য্য বেদীতে যথানির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিলেন। মধ্যে পূজ্যপাদ আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার দুই পার্শ্বে দুই উপাচার্য্য। উপাসনার আদিতে বা অন্তে আবশ্যক বোধ করিলে মহর্ষি নিজের আসনে বসিয়াই যাহা কিছু বলিবার বলিতেন। পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺হেমেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে তাহা লিখিয়া লইতেন। আজ আমরা মহর্ষির উপদেশ যাহা কিছু পাইতেছি, তাহা পিতৃদেবেরই চেষ্টার ফলে। সভাক্ষেত্রে কোলাহল-কলরবের কোনপ্রকার সংস্পর্শ থাকিত না।

সকলেরই নীরব দৃষ্টি অন্তরে সন্নিবদ্ধ। যথারীতি উপাসনাকার্য্য আরম্ভ হইল। একজন উপাচার্য্য ভক্তজনদিগকে ভগবানের নামে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎস্বরে বেদমন্ত্রে স্বাধ্যায়াদি পঠিত হইল। পরে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার উদাত্তকণ্ঠে সুগভীর ভাবপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিলেন। সর্ব্বশেষে অপর উপাচার্য্য একটী সুমিষ্ট প্রার্থনা করিলেন। মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত হইতে লাগিল। সর্ব্বশেষে সঙ্গীত হইয়া

উপাসনাকার্য্য সমাপ্ত হইল। নববর্ষের উৎসবের পবিত্র ছবি আমাদের অন্তরে কি প্রকার গভীররূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে; ঐ উৎসবে আমাদের হৃদয়মন যে কিরূপ ভক্তিশ্রদ্ধায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, আজ এই পরিণত বয়সে আমি তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতেছি।

উপাসনা অন্তে আলিঙ্গন।

উপাসনা সমাপনান্তে যখন সমাগত উপাসকবৃন্দ ভক্তিসিক্ত হৃদয়ে মহর্ষিকে একে-একে প্রণাম করিতেন, তখন তিনি ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে, উচ্চনীচনির্ব্বিশেষে, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেরই সঙ্গে যেভাবে আলিঙ্গন আদানপ্রদান করিতেন, সে ছবি আমার অন্তরে চিরমুদ্রিত থাকিবে। সে সময়ে আমি বয়সে নিতান্ত অল্প হইলেও আমারও হৃদয় ঐভাবে পরস্পরের সহিত আলিঙ্গনের বিনিময় করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিত। সেই সমস্ত স্মরণ করিয়া আজ আমার হৃদয় অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, সকল কালের এবং নির্ব্বিচারে দেশবিদেশ সকল স্থানেরই ভক্ত সাধু ও অসাধু সকলকেই আমার মুক্তপ্রাণের আলিঙ্গনপ্রদানের জন্য সমুৎসুক হইতেছে। আজ বিরোধ-বিবাদ ও দ্বন্দ্বকলহ সমস্ত ভুলিয়া গিয়া আমার প্রেম ও আনন্দের উৎস সকলেরই জন্য উন্মুক্ত রাখিতেছি।

বৎসরের প্রথম দিনে ভগবৎস্মরণ।

বর্ত্তমান বৎসরের সকল কার্য্য আরম্ভ করিবার *পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম জগতের একমাত্র পিতামাতা* পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে স্মরণ করিও। তিনিই সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত প্রেম, সমস্ত মঙ্গলভাব ও সমস্ত আনন্দের একমাত্র অক্ষয় উৎস। ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠায় নব শতাব্দীর এই প্রথম দিবসের মত তাঁহাকে স্মরণ করিবার শুভ অবসর আর পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। তাঁহার প্রেমে তিনি সমগ্র বিশ্ব ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। আজ উপলব্ধি করিবার বড়ই সুন্দর সুযোগ আসিয়াছে যে, তিনি আমাদের পিতা, আমরা তাঁহার সন্তান। আমাদের মঙ্গলের জন্যই আজ তিনি ব্রাহ্মসমাজকে নব শতাব্দীতে আনিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের উপর দিয়া কতই বিপদ কতই ঝড়ঝটিকা চলিয়া গিয়াছে—ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা ব্যতীত মানুষের সাধ্য কি যে, তাহাকে আজ পর্য্যন্ত জীবিত রাখিতে পারিত?

ঈশ্বর অনন্তস্বরূপ সুতরাং আমাদের বিভিন্নতাও অনন্ত।

তিনি অনন্তস্বরূপ। তাঁহার রাজ্যে অনন্তজ্ঞানের, অনন্তভাবের লীলা চলিতেছে দেখা যায়। সুতরাং মানবগণেরও পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য ও বিভিন্নতারও যে অন্ত থাকিবে না, তাহা স্বাভাবিক। আচারে ব্যবহারে, অনুষ্ঠানে পূজাপদ্ধতিতে, এবং ক্ষুদ্রবৃহৎ নানাবিষয়ে আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে বিভিন্নতা থাকিবে, তাহা বলিয়া দিবারই প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু সকল মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব-বিষয়ে যেমন একটা সাধারণ একতা আছে, সেইরূপ ঈশ্বর আমাদের পিতামাতা, এই বিষয়ে সকল মানবের অন্তরে মূলগত জ্ঞানের ঐক্য দৃষ্ট হয়, এবং সেই ঐক্য আমাদের বজায় রাখিতে হইবে। এই মূলভাবের ঐক্য বজায় রাখিয়া তাহা প্রকাশ করিবার আকারে প্রকারে শতবিধ বিভিন্নতা থাকিলেও সেদিকে আমাদের অতিমাত্র লক্ষ্য দিবার প্রয়োজন নাই; সে সকল বিষয় লইয়া আমাদের পরস্পরের মধ্যে মরণান্তিক বিবাদকলহ আনিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না।

ভগবানের সঙ্গে মানবের প্রত্যক্ষ যোগ।

আমাদের অন্তরে এই মূল সত্যটী খুদিয়া বসাইতে হইবে যে, একই সূর্য্য যেমন নির্ব্বিশেষে জগতের সর্ব্বত্র তেজ ও জ্যোতি সমানভাবে বিকীর্ণ করে, সেইপ্রকার মানবমাত্রেরই উপর বিশ্বপিতা অখিলমাতার স্নেহপ্রেম অবিরলধারে ঝরিতেছে; এবং তিনিই আমাদের জীবনকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের পথে, মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের নাড়ীতে নাড়ীতে যোগ। তিনি আমাদিগকে তাঁহার সঙ্গে সমধর্ম্মী করিয়া দিয়াছেন। ঈশ্বর আমাদের পিতামাতা বলিয়াই নরনারী মাত্রই একই অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ। আজ সাম্প্রদায়িকতা, অজ্ঞানজনিত পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, নিছক স্বার্থপরতা, বৃথা গর্ব্ব ও আত্মম্ভরিতা, এই সকলই আমাদের মধ্যে কলহ-বিবাদ আনয়ন করে এবং পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে।

ভগবান একমাত্র বরণীয়।

আজ আমাদের বুঝিতে হইবে যে, আমাদের অন্তর যে জ্ঞানজ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত হইতেছে; আমাদের জীবনের প্রতি বিভাগে প্রতি কর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রতি পদক্ষেপে যে শক্তি প্রকাশ পাইতেছে, সে জ্ঞান ও সে শক্তি সেই মহাজ্ঞান ও মহাশক্তি পরমপুরুষ পরমেশ্বর হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে। জগতের বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন সম্প্রদায় একমাত্র তাঁহাকেই বিভিন্ন নামে পূজার্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং বিভিন্ন আকারে প্রকারে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করে। বিশ্বমানবের পূজার মধ্য হইতে সকল পূজার অন্তর্নিহিত অখণ্ড সত্য ভগবানই একমাত্র সমুজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রকাশ পান। আজিকার এই নববর্ষের উৎসব সেই অখণ্ড সত্যকে বিশেষভাবে আমাদের উপলব্ধিতে আনিয়া দিতেছে। সেই উপলব্ধির সুমঙ্গল অগ্নিতে আমাদের সকল গর্ব্ব, আমাদের সকল দম্ভ-অভিমান ভস্মীভূত হউক।

ভগবানকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা।

প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে এমন এক-একটা সময় আসে, যখন তাহার প্রাণে সত্যস্বরূপ ভগবানকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা উদ্দাম আকারে জাগিয়া উঠে, নিজের আত্মাকে বিশ্বের আত্মার সঙ্গে অবিচ্ছেদে মিলাইয়া দিবার জন্য আকুল হইয়া উঠে। তখন দ্বন্দ্ব-কলহ, বিরোধ-বিবাদ সংস্কারের ছোটখাটো খুঁটিনাটি তাহার নিকট নিতান্তই অসহ্য হয়। মানুষ তখন প্রকৃতির বিরাট বিশাল ভাব উপলব্ধি করিয়া এবং তাহার মধ্যে নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া নিরাশায় হাহুতাশ ফেলিতে থাকে। সেই নিরাশা ও দৈন্যের মধ্যে মানুষ ভগবানের করুণার আভাস পায় এবং সেই করুণা আরও—আরও—আরও পাইবার জন্য মানুষ পাগল হইয়া উঠে। মানুষ তখন সেই দয়া ভিক্ষা করিয়া ভগবানেরই চরণে আছড়াইয়া পড়ে। অধ্যাত্মরাজ্যের ইহা একটী আশ্চর্য্য সত্য যে, যতই কেহ ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করে ও আপনাকে ভুলিয়া যায়, ততই তাহার অন্তর অধিক হইতে অধিকতর দিব্যজ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত ও দিব্যশক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠে। ভগবানের কাছে মানুষ যতই পরাজয় স্বীকার করে, ততই সে সকল বিপদআপদের মধ্যে দুঃখকষ্টের মধ্যে তাঁহার স্নেহপ্রেমের সুদৃঢ় আবেষ্টনে সুরক্ষিত হয়।

অমৃতধারা লাভের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

নববর্ষের আজ এই উৎসবের দিনে ভগবানের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া সম্বৎসরের জন্য তাঁহার স্নেহহস্তে বিতরিত মৃতসঞ্জীবনী অমৃতধারা লাভ করিবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে প্রস্তুত হইতে হইবে। সাগর যেমন মেঘনিঃসৃত বারিধারার সঙ্গে মিলিত হইয়া আশ্চর্য্য শক্তিশালী জলস্তম্ভ রচনা করিবার জন্য আকুলপ্রাণে ঊর্দ্ধমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ আজিকার দিনে আমাদের প্রত্যেকের প্রেমভক্তিকে ঊর্দ্ধমুখী করিয়া ভগবানের প্রেমধারা আকর্ষণ করিয়া সংসারে নামাইয়া আনিয়া তাহার বন্যায় সংসারকে ভাসাইয়া দিতে হইবে, যাহাতে সেই প্রেমধারা শুধু সম্বৎসরকাল কেন, চিরজীবন—অনন্তকাল আমাদের আত্মাকে সরস ও সজীব রাখিতে পারে, তাঁহাকে লাভ করিবার উপযুক্ত সবলতা প্রদান করিতে পারে। তাঁহাকে লাভ করাই মানবের গৌরবপূর্ণ অধিকার। উহাতে মানবের মনুষ্যত্ব—মানবের জ্ঞান, সকল শক্তি ও সকল প্রেমের পরিসমাপ্তি। এই মনুষ্যত্বের উপলব্ধিতেই আমাদের সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত হইবে এবং মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইয়া যাইবে।

হিন্দুদের ধর্ম্মপ্রাণতা ও উদারতা।

যিনি যতই বলুন না কেন, এবং বিদেশের অনুকরণে বর্ত্তমানে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ঢাকঢক্কা যতই নিনাদিত করুন না কেন, কেহই বোধ হয় ইহা অস্বীকার করিতে সাহস করিবেন না যে, ভারতবাসী মূলত ধর্ম্মপ্রাণ। ভারতবাসীর অন্তরে অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম অন্তঃসলিল আকারে কিন্তু প্রবল বেগে প্রবাহিত। ধর্ম্মপ্রাণ বলিয়াই ভারতবাসী খুবই সহজে উপলব্ধি করে যে, সকল ধর্ম্মেরই মূলপ্রাণ হইল সীমার মাঝে অসীমকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা—সীমাহীন পরমাত্মার অনন্ত সাগরে সীমাবদ্ধ মানবাত্মায় আত্মহারা হইবার প্রয়াস। ইহারই কারণে ভারতের গভীরতম অন্তর্দেশে ধর্ম্মবিষয়ে একান্ত উদারতা চির-বিদ্যমান। এ

প্রকার উদারতা থাকিবার ফলেই আজ পর্য্যন্ত অধ্যাত্মবিষয়ে ভারতবাসীকে তাহার উন্নততম আসন হইতে কেহই বিচ্যুত করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। এই উদারতার ফলেই হিন্দুধর্ম্ম শতবিধ উপধর্ম্মকেও স্বীয় বিশাল ক্রোড়ে স্থান দিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। যে কোন জাতি নিজের ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য ভারতের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছে, সে জাতি উপযুক্ত আশ্রয়লাভে বঞ্চিত হয় নাই। এই ভারতে যবনাদি জাতিগণও ভারতে আশ্রয় লাভ করিয়াছে এবং উদার হিন্দুধর্ম্মের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কারসমূহের আমূল পরিবর্ত্তনসাধনে বাধ্য হইয়াছে। হিন্দুদের মূলমন্ত্র আব্রহ্মস্তম্বের মধ্যেই ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা। সুতরাং হিন্দু কোনও মানুষকেই অবহেলা করিতে পারে না; কারণ সে জানে যে, কোনও মনুষ্যই ভগবানের ত্যাজ্য নহে। মানুষকে যে অবহেলা করে, ঘৃণা করে, সে প্রকৃত হিন্দু নহে, অথবা সে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই, ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। এই বিরাট বিশাল ও উদার হিন্দুসমাজ হইতেই ব্রাহ্মসমাজ বিকশিত হইয়াছে এবং লালিতপালিত হইতেছে; এই বিরাট বিশাল ও উদার হিন্দুধর্ম্মের বিরাটতম বিশালতম ও উদারতম ভাবের ভিতর হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম সমুদ্ভূত ও পরিপুষ্ট। আজ ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়ের শতাব্দী পরে আমাদের সে কথা ভুলিলে চলিবে না—এই সত্যটুকু আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

নব শতাব্দীতে চলিবার প্রণালী।

নবশতাব্দীর নববর্ষের শুভ প্রথম দিবসে নবতর আশা-ভরসা লইয়া আমাদিগের মঙ্গলের পথে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। মানুষ হইয়া মানুষের উপর অত্যাচার করিলে চলিবে না; মানুষকে ঘৃণা করিলে চলিবে না। নবতররূপে ভ্রাতৃভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিবাদবিসম্বাদ পদদলিত করিতে হইবে। আমাদের হৃদয়ে উদারতা উদ্বেলিত হইয়া উঠুক। সকল মতবাদ ও সকল সাধনার ভিতর মূলগত ঐক্য উপলব্ধি করিয়া সকলেরই অন্তর্নিহিত সত্যকে গ্রহণ করিতে হইবে। দুর্নীতিকে দূর হইতে পরিহার করিতে হইবে। পরের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কথায় ও কাজে ঠিক থাকিতে হইবে।

মাতা তাঁহার সকল সন্তানকে সমান স্নেহে স্তন্যদান করেন। সকল সন্তানই তাঁহার প্রেমের সমান অধিকারী। সেখানে দ্বন্দ্ববিবাদের স্থান নাই। ইহা স্মরণ করিয়া আজ অবধি মানুষমাত্রকেই একই পিতামাতার সন্তান জানিয়া ভ্রাতৃভাবের মঙ্গল আলিঙ্গনে আবদ্ধ কর। আজ অবধি সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে আত্মসম্প্রসারণের পথে চলিতে অভ্যাস কর।

আজ বৎসরের এই প্রথম দিবসে আমরাও সকলকে আমাদের সাদর আলিঙ্গন দিতেছি; সকলেরই উদ্দেশে ভগবানের নিকট মঙ্গল কামনা জানাইতেছি এবং শুভবুদ্ধি প্রার্থনা করিতেছি।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১৭। পাগল।

জননী! এই অন্ধকার কুটীরে তুমি আমায় কোথায় রাখিয়া গিয়াছ? দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছে; দেহ পলে পলে ক্ষীণ হইতেছে। সকল সময়েই ইচ্ছা হয় তোমার চরণতলে বসিয়া তোমার মুখের কথা শুনি। তুমি যখন আমাকে এখানে রাখিয়া গিয়াছ, তখন আমার ভয়ের কোনই কারণ নাই তাহা জানি। তবু এইটুকু চাই যে, জীবনের সকল কাজ যখন শেষ হইবে, তখন তুমি আমা হইতে দূরে থাকিও না; হৃদয়ের বীণায় যেন তোমারই নাম সর্ব্বদা ঝঙ্কৃত হইতে থাকে। তোমার জন্য এখন যেমন পাগল হইয়াছি, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেন তেমনই পাগল থাকি। তোমার নামে সকলই ছাড়িয়াছি; কিন্তু জীবনের সেই শেষ দিনে যেন ফাঁকিতে না পড়ি—তোমার প্রসন্ন মুখ যেন দেখিতে পাই। তোমার নামে পাগল হইয়াছি বলিয়া মৃত্যুশোকও আমাকে স্পর্শ করিতে সাহস করিতেছে না। ভয়, লজ্জা,

সমস্তই তোমার নামে পরিত্যাগ করিয়াছি। তোমার পথে যেন ঠিক দাঁড়াইয়া থাকি, বিপথে গিয়া কাঁটার আঘাতে যেন না মরি, এই আশীর্ব্বাদ দাও।

১৮। দাঁড়াও—দাঁড়াও।

আজ এই সুমধুর প্রভাতে আমার সম্মুখে তুমি কি অপরূপ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছ! আমার জীবন আজ ধন্য হইল। তোমার ঐ প্রসন্ন মুখে কি শান্তি—কি কমনীয় কান্তি! মা—মা! দাঁড়াও—দাঁড়াও একবার—এই পুণ্য মুহূর্ত্তে তোমার চরণে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে একবার প্রণাম করি। জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তোমার এই অসহায় শক্তিহীন গতিহীন সন্তানকে কোলে লইয়া বসিয়াছিলে—সে দিন কি আনন্দেরই দিন গিয়াছে! তুমি আমার মুখের দিকে চাহিয়া অনবরত আনন্দসিক্ত প্রসন্ন মুখের সুন্দর হাসি হাসিয়াছিলে; আমিও তোমার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কেবলই হাসিতাম। তোমার স্নেহ ও বল মাতৃস্তন্যে নামিয়া আমাকে দিগ্বিজয়ের উপযুক্ত বলবীর্য্য দিয়াছিল, তাহা আমি জানি। জননী! জীবনের সেই নবোন্মেষে কি আনন্দে তোমার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। আর আজ এই জীবনের সন্ধ্যায় তোমার সন্ধানে শ্মশানে শ্মশানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি! শ্মশানের সর্ব্বগ্রাসী চিতাধূমের ঐ ঊর্দ্ধমুখী শিখার ভিতর হইতেও কি জানি কেন, তোমারই শান্ত সৌন্দর্য্য আসিয়া হৃদয় স্পর্শ করিতেছে—তোমারই বিশ্বপালনীভাব অনুভব করিতেছি। অগণ্য রবি-শশী, অগণিত গ্রহতারকখচিত নীলাম্বর-পরিহিত গগনমণ্ডলে তোমার মুখের যে অনুপম জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছ, তাহা দেখিতে দেখিতে আমার চক্ষু ঝলসিয়া যায়। কিন্তু সেই জ্যোতির কি যে-মোহিনী শক্তি, তাহা হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারি না—দেখিতে দেখিতে কোথায় যে গিয়া পড়ি, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। বড়ই আশ্চর্য্য হই যে, সংসারের শতবিধ চাঞ্চল্যের মধ্যে এবং শ্মশানে সকল চাঞ্চল্যের অন্তর্নিহিত শান্তির মধ্যেই আমি তোমাকে বড় নিকটে পাই।

১৯। শান্তি।

সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে ভীষণ কোলাহল-কলরবের মধ্যে অনেক ঘুরিয়াছি। ফল তো কিছুই দেখিলাম না। অগ্নি নিজের তেজে যাহা দগ্ধ করে, তাহার ফলে ছাইটুকুই অবশিষ্ট থাকে। আমার প্রাণও নিজের তেজে দগ্ধ হইয়া ভস্মাবশেষ হইয়াছে। এখন পার যদি, তবে তুমি সেই ভস্মের উপর তোমার শান্তিজল বর্ষণ করিয়া নূতন প্রাণের সঞ্চার কর। শান্তির আশায় দিকে দিকে পাগলের মত ছুটিয়া বেড়াইয়াছি। কিন্তু হায়! শান্তি—কোথায়—শান্তি কোথায়? মা! তোমার এই সন্তানকে যদি বাঁচাইবার ইচ্ছা হয়, তবে এসো, কাছে এসো—ঐ চরণে দুঃখভারে অবনত এই মাথাখানি রাখিতে দাও। আকাশে তারাগুলি কি সুন্দর ফুটিয়া আছে—ঐ তারার ভিতর দিয়া তোমারই স্নেহে ভরা প্রসন্ন আনন্দের নয়নতারা কি সুন্দর মঙ্গল দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছে! তোমার ঐ নয়নের দিকে তাকাইতে তাকাইতে কোন্ অসীমে যে আপনাকে হারাইয়া ফেলি, তাহা যদি তুমি জানিতে, তবে নিশ্চয়ই তুমি আমার কাছে আসিয়া ধরা দিতে। জগতে আমার ত আর কেহই নাই—তুমি আর আমি। তখন তুমি আমাকে কেমন করিয়া ছাড়িয়া আছ, তাহাই ভাবি। আমার হৃদয়ে চিরকাল তোমারই সঙ্গীত বাজিতেছে—কি সুন্দর তাহার সুর! আমার নিজের গান যেটুকু বাজাইতে গিয়াছিলাম, সে সমস্তই বেসুরা হইয়া গেল—বাজাইতে বাজাইতে বীণার তারও ছিঁড়িয়া গেল। আবার তোমার সঙ্গীত বাজাইতে ধরিয়া আমার হারানিধি হৃদয়ের শান্তি ফিরিয়া পাইয়াছি। এসময় আর আমাকে পরিত্যাগ করিও না। তুমি কাছে থাকিলে সঙ্গীতের সকল উৎস খুলিয়া যায়। জননী! আর পারি না—আর পারি না—আমাকে তোমার কোলে একটুখানি স্থান দাও। তোমার কোলে মাথা থুইয়া এই অনুতপ্ত হৃদয়ের তপ্ত অশ্রু ফেলিয়া একটুখানি শান্তি পাইতে দাও।

২০। নাড়ীতে নাড়ীতে যোগ।

জননী! তোমার চরণে আমি অনেক অপরাধ করিয়াছি। যাহা করিয়াছি, তাহা তো করিয়াছি—

তাহা তো আর ফিরাইতে পারিব না। এখন আমার সেই সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে। ক্ষমা কর, আর তোমার কোলে মুখ রাখিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া একটুখানি শান্তি পাইতে দাও। তাহা দিবে, অথবা আমাকে তোমার ত্যাজ্য পুত্র করিয়া তোমার বিদ্রোহী করিয়া তুলিবে? তোমার চরণ ধরিয়া মিনতি করি, প্রাণে আর ব্যথা দিও না। ভাবিয়া দেখ—আমি যদি মা হইতাম, আর তুমি যদি সন্তান হইতে—তাহা হইলে এই অবস্থায় তুমি কি প্রকার কষ্ট পাইতে? তোমার ব্যথা দেখিয়া আমি একমুহূর্ত্ত স্থির থাকিতে পারিতাম? কখনই নয়। আমি বেশ বুঝিতেছি—আমাকে ছাড়িয়া তোমার খুবই ব্যথা লাগিতেছে; তবু কেন যে ছাড়িয়া আছ, সেইটুকু বুঝিতে পারিতেছি না। আমার ইচ্ছা হয়—সময়ে সময়ে তুমি আমার সন্তান হও, আর আমি তোমার মা হই; আমি লুকাইয়া বেড়াই আর তুমি মা—মা—করিয়া আমাকে খুঁজিয়া বেড়াও—তবেই তুমি মায়ের অভাবে ছেলের প্রাণের জ্বালা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিবে। তোমায়-আমায় যে নাড়ীতে নাড়ীতে চিরন্তন যোগ। আর বিলম্ব করিও না—কোলে তুলিয়া লও; চরণতলে বসিয়া প্রাণটা একটুখানি শীতল হইতে দাও।

২১। [illegible]।

তোমার প্রসন্ন মুখ আমার উপর পড়ে নাই বলিয়া একবার চাহিয়া দেখ—বিষাদরাশি ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘজালের মত কি প্রকার আমাকে ঘিরিয়া আছে। আমি তোমার বড়ই দীনদুঃখী সন্তান। আমার কি সাধ্য যে আমি এই সমস্ত বিপদআপদ কাটিয়া নিরাপদ কূলে উঠিতে পারি। রোগে শোকে বিপদে তোমাকে ছাড়িয়া আর কাহার দুয়ারে দুয়ারে ফিরিব? তুমি আমার শিয়রে যে নিত্য দাঁড়াইয়া আছ সেইটুকু বুঝিতে দাও, তাহা হইলেই তো আমার সমস্ত বিপদ-আপদই কাটিয়া যাইবে। ঐটুকু বুঝিতে পারি না বলিয়াই তো আমি এত অস্থির হই, আমার প্রাণে এত জ্বালা এত যন্ত্রণা আসে। এখন তো এখানে নিত্য কতই নূতন নূতন বন্ধু জুটিতেছে; কিন্তু এখানকার কাজ সারা হইলে, যখন ইহলোক ছাড়িয়া পরলোকে যাইবার জন্য পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিতে থাকিব, তখন তো একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেহই কাছে থাকিবে না। তবে কেন তুমি আমা হইতে দূরে থাক? পাপতাপে জরজর হইয়া গিয়াছি; এখন তোমার স্নেহহস্ত বুলাইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গের কঠিন ব্যথা দূর করিয়া দাও।

২২। অন্তিমে।

তুমি আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া আছ দেখিয়া আমার জন্ম সার্থক হইল, আমার জীবন সার্থক হইল, আমার রোগ শোক সকলই সার্থক হইল। পাপেতাপে, রোগে শোকে আমার দেহ অপটু হইয়াছে? হোক তাহা। তাহারই তো ফলে আজ জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তোমার কোলে মাথা রাখিবার অধিকার পাইয়াছি। তোমার গর্ভে যখন লুকায়িত ছিলাম, তখন অবধি মা-নামের কি যে চিত্তবিমোহন মন্ত্র অন্তরে খুদিয়া বসাইয়া দিয়াছ—সেই নামে একবার তোমাকে ডাকিলে সমস্ত দুঃখ-বিপদ, সকল নিরাশা-নিরানন্দ মুহূর্ত্ত-মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। তোমার নামের সেই মন্ত্রে আমি পাগল হইয়া গিয়াছি। লও—লও—লও আমারে—দুঃখভয় বিপদআপদ সমস্তই ভুলাইয়া দাও। তোমার কোলে মাথা রাখিয়া একটিবার শান্তিতে ঘুমাইতে দাও। তোমার এই দুষ্ট ছেলে তোমার আদেশ না মানিয়া বিপথে চলিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে, প্রাণের সুখশান্তি সমস্তই হারাইয়াছে। এখন অন্তিমকালে তোমার ঐ চরণে শরণ লইতেছি—আমাকে দূরে সরাইয়া দিও না—আমি তোমারই দীন—অতি দীন সন্তান। সকলেই তো আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে; এখন তুমি আমাকে ছাড়িলে—সম্মুখে শূন্য—মহাশূন্য। আমি ধন চাহি না, সুখ চাহি না; চাহি—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; আর তোমার ঐ প্রসন্ন মুখের হাসি দেখিয়া এই জ্বালাদগ্ধ প্রাণে একরত্তি শান্তিলাভ করি।

২৩। আমি-হারা।

জননী! যখন তুমি আমার বড়ই কাছে ছিলে, তখন তোমায় দূরে দেখিতে পাইতাম না। যখন তোমায় দূরে দেখিলাম, তখন তোমায় কাছে

দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু আজ তোমায় যেমন কাছেও দেখিতেছি, তেমনি দূরেও সমস্ত আকাশ জুড়িয়া আছ, তাহাও দেখিতেছি। আজ তোমার নামের মধুর সুর যেমন প্রাণের অন্তরে দিবানিশি ধ্বনিত হইতেছে, তেমনি ঐ রবিশশী, ঐ গ্রহ-তারার প্রত্যেকটী হইতে তোমারই নাম ধ্বনিত হইয়া আমার প্রাণে আসিয়া পৌঁছিতেছে—আমি তাহারই মাঝে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছি। মা! তুমি তো দেখিতেছ—আমি কি দুঃখকষ্টের ভিতর, কি অশান্তি লইয়া কালযাপন করিতেছি—একএকটী মুহূর্ত্ত যেন যাইতেই চাহে না। তোমার শান্তি-যজ্ঞের একটুখানি ভস্ম আমার কপালে স্পর্শ করিয়া দাও—তাহাই আমার বিজয়টীকা হোক; সেই শান্তি-যজ্ঞের জলের একটুখানি ছিটা আমার মাথায় দাও—আমার প্রাণের জ্বালাযন্ত্রণা সমস্তই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হোক। এতদিন আমি আপনাকে ছাড়িয়া আর কাহাকেও চিনিতাম না। আমি দুর্ব্বল ছিলাম বলিয়া সর্ব্বদাই তুমি আমার বড় নিকটে থাকিতে; তখন তোমার বলেই যে আমি সবল ছিলাম, তাহা না বুঝিয়া নিজেকেই বড় বেশী বড় করিয়া দেখিতাম। আমি কত দুঃখী কত দুর্ব্বল তাহা এখন বুঝিয়াছি। আমার "আমি" আজ মরিয়া গিয়া তোমাতেই মিলিয়া গিয়াছে। আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। এখন অবধি আমার যাহা কিছু ভাবনা, সে সমস্তই তোমাকে ভাবিতে হইবে। আমি কেবল আমার প্রাণের একতারাতে তোমার নামের তারখানি বাঁধিয়া রাখিব। দিবসের শেষে কর্ম্মকোলাহল হইতে যখন একটুখানি অবসর পাইব; যখন নীরব নিশীথে গগনভুবন একই ভাবের ভাবুক হইয়া পরস্পরের দিকে মুখোমুখি চাহিয়া থাকিবে, তখন তোমার মুখ হইতে কত না নীরব কথা আসিয়া আমার প্রাণকে অধিকার করিবে। আমি সেগুলি একমনে শুনিব, আর ঐ তারাগুলির ভিতর দিয়া তোমার যে কোমল করুণ দৃষ্টি আমার উপর পড়িতেছে, তাহাই অনিমেষ নয়নে দেখিতে থাকিব। তখনই আমার ঐ একতারাতে তোমার মধুর নাম অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে ঝঙ্কার দিয়া উঠিবে। আমিও আত্মহারা হইব, আর আমার আশেপাশে যাহারা থাকিবে, সকলেই আত্মহারা হইবে—সকলের ভিতর দিয়া আনন্দাশ্রুর এক ধারা বহিতে থাকিবে। আমার সকল কথায়, সকল গানে তোমারই নাম ধ্বনিয়া উঠুক—শান্তিধারা প্রবাহিত হইয়া অশান্তি বিধৌত করিয়া দিক।

ঋগ্বেদে জাতিভেদ।

(স্বামী ভূমানন্দ)

স্বজাতির প্রতি মমত্ববোধ যাহার নাই, এমন মানুষ জাতির উপদ্রবস্বরূপ। এই 'উপদ্রবস্বরূপ' মানুষের সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াই হিন্দুজাতির এত দুর্দ্দশা।

কি কারণে স্বজাতির প্রতি হিন্দুর মমত্ববোধ দিন দিন হ্রাস পাইতেছে, তাহার হেতু নির্ণয় করিতে না পারিলে তাহার দুঃখেরও অবসান হইবে না।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের মধ্যে আমরা প্রায় ষাটটি জাতি দেখিতে পাইতেছি। এই সকল জাতি দুই ভাগে বিভক্ত:—(১) জলচল জাতি। (২) জল-অচল জাতি। কিন্তু অধিকাংশ জাতিই স্বজাতি ছাড়া অপরের অন্ন খাইবে না। অনেক স্থলে একের অন্ন অপরে গ্রহণ করিলে জাতিচ্যুত হইতে হইবে।

এই জন্য হিন্দু জাতির মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বা জাতিভেদপ্রথা হইতেই জাতির প্রতি হিন্দুর মমত্ববোধ লোপ পাইয়াছে।

সুতরাং জাতিবিভাগই যদি মমত্ববোধের অন্তরায় হইয়া থাকে, তবে সকলেরই দেখা কর্ত্তব্য এই জাতি-বিভাগ যুক্তি ও বিচারের উপরে স্থাপিত সৎশাস্ত্রসম্মত কি না। সৎশাস্ত্রসম্মত হইলে প্রাণপাত করিয়াও হিন্দু-জাতির এই ব্যবস্থা রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আর অশাস্ত্রীয় বলিয়া ধার্য্য হইলে প্রাণপাত করিয়া এই ব্যবস্থার পরিহার করা একান্তই বাঞ্ছনীয়।

বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া সমগ্র হিন্দুস্থানে এবং বিশেষভাবে বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যা দ্রুত কমিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যখনই কোন জাতি সংখ্যায় দ্রুত হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে, তখনই সকলের কারণ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

এই কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে,—হাজার বৎসর যাবৎ সমাজ তাহার আমদানীর পথ দৃঢ় রুদ্ধ রাখিয়া রপ্তানীর পথ সুগম রাখিয়াছে। অর্থাৎ হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত যে সকল (সংখ্যায় প্রায় ষাটটি) জাতি আছে,

তাহার মধ্যে কোন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্থানলাভ করিতে চাহিলে হিন্দুসমাজ তাহাকে স্থান দিতে পারে না। পক্ষান্তরে নিজ জাতির মধ্যে নানা হেতু উপলক্ষ্য করিয়া সমাজ যাহাকে যখন-ইচ্ছা জাতিচ্যুত করিয়াছে।

আমদানীর পথ কেন রুদ্ধ হইল তাহা জানিতে যাইয়া দেখা গেল, বংশগত জাতিবিভাগই ইহার একমাত্র কারণ। অর্থাৎ তথাকথিত ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত কেহই 'পরগাছা'কে নিজ সমাজ-অঙ্গে স্থান দিতে প্রস্তুত নহে। হেতু—জাতি যাইবে।

রপ্তানীর পথ কেন উন্মুক্ত রহিল তাহাও জানিতে যাইয়া দেখা গেল,—স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নিষিদ্ধ মাংস ও ভিন্ন জাতির অন্নগ্রহণ, অস্পৃশ্য জাতির সংস্পর্শ, অসবর্ণবিবাহ, প্রচলিত সামাজিক আদর্শ পরিত্যাগ ও বলপূর্ব্বক একবর্ণ অপর বর্ণের কন্যাগ্রহণ এবং বাধ্যতামূলক ব্রহ্মচর্য্যপালনে অক্ষম বিধবা—এই সকল অপরাধে অপরাধীকে সমাজ জাতিচ্যুত করিত। ইহার হেতু ছিল,—যাহাতে হিন্দুসমাজ 'জাতিধর্ম্ম' ত্যাগ না করিতে পারে। কিন্তু এই সকল জাতিচ্যুত ব্যক্তি দেশেই থাকিত এবং বাধ্য হইয়া মুসলমান বা খ্রীষ্টান সমাজে স্থান গ্রহণ করিত।

এই ভাবে হিন্দুর সংখ্যা কমিয়াছে এবং মুসলমান ও খ্রীষ্টানের সংখ্যা বাড়িয়াছে। কিন্তু মোটের উপর ভারতবাসীর সংখ্যা ধীরে ধীরে যে বাড়িতেছে, তাহা আদমসুমারির লোকগণনাতেই প্রকাশ পাইয়াছে।

পূর্ব্বে যেখানে সকলেই হিন্দু ছিল সেখানে আজ সমগ্র লোকসংখ্যার মধ্যে মুসলমান ¼ অংশ, খ্রীষ্টান ১/৪০ অংশ, জৈন বৌদ্ধ শিখ পার্শী প্রভৃতি মিলিত হইয়া ১/২০ অংশ দখল করিয়াছে। বাকী যে লোক আছে তাহারাই হিন্দু নামে পরিচিত রহিয়াছে। এই হিন্দুর মধ্যে আবার সংখ্যাতীত জাতি।

যাহারা সমাজের তাড়নায় ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহারা ছাড়াও এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা স্বেচ্ছায় হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিয়াছে এবং এখনও কেহ কেহ করিতেছে। এই সকল লোকদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে:—(১) শিক্ষিত, (২) অশিক্ষিত। শিক্ষিতের মধ্যে যাঁহারা কোন অবস্থার গণ্ডীতে আবদ্ধ হইতে চাহেন না (অথচ বর্ত্তমান হিন্দুসমাজও গণ্ডী ভাঙ্গিতে রাজী নহেন) তাঁহারাই হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিয়া—হয় মুসলমান, নয় খ্রীষ্টান হইয়াছেন ও হইতেছেন। অশিক্ষিতের মধ্যে অধিকাংশই নীচ ও অন্ত্যজ-আখ্যা লাভ করিয়া সমাজের সকল সুখ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। এই হেতু তাহাদের মধ্যে অনেকেই বাধ্য হইয়া হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে বংশগত জাতিবিভাগ যে ভাবে প্রচলিত রহিয়াছে, অনেকেরই ধারণা ইহারই জন্য হিন্দুসংগঠন সার্থক হইতেছে না; এই জাতিবিভাগের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে শাস্ত্রে কি আছে তাহা জানিবার জন্য হিন্দু মাত্রেরই আমাদের সহিত যোগদান করা বিধেয়।

শাস্ত্র বলিতে কোন একখানা গ্রন্থকে বুঝায় না। বেদ আছে, সূত্র আছে, স্মৃতি আছে, পুরাণ আছে, তন্ত্র আছে, এবং ইতিহাসও আছে। এই সকল শাস্ত্রের মধ্যে বেদই প্রাচীন গ্রন্থ। তন্মধ্যে ঋগ্বেদ প্রাচীনতম সংহিতা। সুতরাং ঋগ্বেদসহায়ে বৈদিক যুগের সভ্যতা কোন্ পথে প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাই সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে,—বৈদিক যুগে কি ছিল, না ছিল—তাহা জানিয়া কি হইবে? সমাজকে যে ভাবে পাইয়াছ তাহার কিসে ভাল হয়, কি করিলে তাহার দোষ দূর হয়, তাহাই করনা কেন?

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে,—বংশগত জাতিবিভাগরূপ 'কার্য্য', যে 'কারণ' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা না জানিতে পারিলে—শুধু 'কার্য্য' দেখিয়া কিসে তাহার ভাল হইবে, কি করিলে তাহার দোষ দূর হইবে, ইহার মীমাংসা করা সম্ভবপর নহে। কার্য্য-কারণসম্বন্ধ না জানিয়া যেখানে মীমাংসার চেষ্টা হইয়াছে, সে ক্ষেত্রেই 'নানা মুনির নানা মত' প্রকাশ পাইয়াছে এবং তদ্দ্বারা সমস্যাকে আরও জটিল করিয়াই তোলা হইয়াছে।

প্রমাণ—মনু, অত্রি, বিষ্ণু প্রভৃতি কুড়িখানি স্মৃতিশাস্ত্র এবং পুরাণ ও উপপুরাণসকল। এই সকল শাস্ত্রপ্রণেতাদিগের মধ্যে মনুর অভিমতে 'বেদই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ'; যেহেতু বেদ হইতে ধর্ম্মের (বিহিত কর্ম্ম) প্রকাশ হইয়াছে। বৃহস্পতির অভিমতে,—"যেখানে শাস্ত্রমধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইবে সেখানে প্রথমে বেদ, পরে বেদানুগামী মনুসংহিতার মান্য দিতে হইবে। অনন্তর যে সকল মত বেদানুগামী মনুসংহিতাকে অনুসরণ করে দৃষ্ট হইবে, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে; এবং যাহা বেদানুগামী মনুসংহিতার বিরোধী তাহা ত্যাগ করিতে হইবে"।

শুধু যে মনু ও বৃহস্পতিই বেদের মান্য দিয়াছেন তাহা নহে; অত্রি, পরাশর, ব্যাস, বশিষ্ঠ প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ সকলে একবাক্যে বেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আবার বিরুদ্ধাচরণও করিয়াছেন।

সুতরাং জাতির সম্বন্ধে কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে বেদের আলোচনা হওয়াই একান্ত

কর্ত্তব্য জানিতে হইবে। যেহেতু হিন্দুর জাতীয় ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় মাত্র ঋগ্বেদে দৃষ্ট হইবে। কিন্তু এই আলোচনাতে বিপদও যে না আছে এমত নহে।

কারণ, প্রচলিত প্রথাতে লাঞ্ছিত হইয়াও অবস্থান করিতে এবং যত রকম অসম্ভব গল্পকে সত্য বলিয়া গ্রহণ ও ধারণ করিতে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ যেরূপ তৎপর আছেন, তাহাতে বেদের আলোচনায় যে তাঁহাদের এতদিনের সযত্নপোষিত সংস্কারের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে, এরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। বরং প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে বেদ হইতে কোন অনুশাসন বাহির হইয়া পড়িলে, হিন্দুগণ যে তখন কি করিবেন তাহা বলা বড়ই কঠিন।

এই জন্য সমগ্র হিন্দুজাতিকে আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া রাখিতেছি যে, যাহাতে বেদাদি ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনায় সময় তাঁহারা বর্ত্তমান প্রথা বা সংস্কারের কথা ভুলিয়া গিয়া যোগদান করিতে পারেন তাহাই করিবেন। অর্থাৎ যখন বেদের আলোচনা হইবে তখন পাঠকগণকে মনে করিতে হইবে যে, এই বেদ ছাড়া জগতে অন্য কোন গ্রন্থ নাই, যাহার কথা তৎকালে কেহ ভাবিতে পারেন। বেদের পরে যখন গৃহ্যসূত্রের আলোচনা হইবে, তখন বেদের আদর্শ গৃহ্যসূত্রে লিখিত হইয়াছে কিনা দেখিতে হইবে। তারপরে স্মৃতি, পুরাণ, উপপুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনায় সময় স্থির লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, এই সকল গ্রন্থ বৈদিক আদর্শের অনুকূলে কিংবা উহার প্রতিকূলে লিখিত হইয়াছে। তাহা হইলেই সকলে দেখিতে ও ধারণা করিতে পারিবেন, হিন্দুগণ যে তাঁহাদের ধর্ম্মকে 'সনাতন ধর্ম্ম' বলিয়া থাকেন, তাহা সত্যই সনাতন অথবা চিরপরিবর্ত্তনশীল।

অতঃপর ঋগ্বেদের সহায়ে জাতিবিভাগ সত্য কি মিথ্যা তাহার আলোচনা হইবে। এই সত্যমিথ্যা নিরূপণে দ্বিবিধ পন্থা গ্রহণ করাই বিধেয়ঃ—

(১) ঋগ্বেদে যত রকম সৃষ্টি-তত্ত্ব আছে, তৎসহায়ে জাতির আলোচনা।

(২) সমগ্র ঋগ্বেদসহায়ে বৈদিক সভ্যতার আলোচনা।

এই আলোচনা হইতে জাতিভেদ গুণগত কিংবা বংশগত ছিল, অথবা কিছুই ছিল না তাহা প্রকাশ পাইবে।

এই আলোচনা হইতে জাতিবিভাগ সম্ভবপর হইয়াছিল কি না এবং সম্ভব হইয়া থাকিলে কি আকারে প্রচলিত ছিল তাহাও প্রকাশ পাইবে।

ঋগ্বেদের আলোচনায় আদর্শের পার্থক্যে জাতির পরিচয় দৃষ্ট হইবে। এই রকম চারি জাতির কথা ঋগ্বেদে আছেঃ—

(১) আর্য্য। (২) দস্যু বা তস্কর। (৩) দাস। (৪) অসুর।

যে জাতি বেদে বিশ্বাসবান ছিল, যাহারা বেদপাঠ যাগযজ্ঞ এবং কৃষি-বাণিজ্য দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিত, তাহারা একজাতি বা "আর্য্যবর্ণং" বলিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিত। এই আর্য্যবর্ণের মধ্যেই কর্ম্মপার্থক্যে বিভিন্ন শ্রেণী আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। যথাঃ—

(ক) হে সোম! সকল ব্যক্তির কাজ এক প্রকার নহে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার,—আমাদের কার্য্যও নানাবিধ। দেখ তক্ষ (ছুঁতার) কাঠ তক্ষণ করে, বৈদ্য রোগের প্রার্থনা করে, স্তোতা যজ্ঞকর্ত্তাকে চাহে। অতএব তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। (১)

(খ) দেখ আমি স্তোত্রকার, পুত্র চিকিৎসাব্যবসায়ী, কন্যা যব-ভর্জ্জনকারিণী, আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি। যেরূপ গাভীসকল গোষ্ঠ মধ্যে বিচরণ করে, তদ্রূপ আমরাও ধনকামনায় তোমার পরিচর্য্যা করিতেছি। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। (২)

এই দুই মন্ত্র হইতে গুণগত কর্ম্মই প্রকাশ পাইতেছে,—'যেমন গাভীসকল গোষ্ঠমধ্যে বিচরণ করে,' তদ্রূপ আমরাও ধনকামনায় নানাবিধ কার্য্য করিতেছি। সেই সকল কর্ম্ম যে বংশগত না হইয়া গুণগত, তাহাও মন্ত্রেই স্বয়ং 'স্তোত্রকার', পুত্র 'চিকিৎসক' ও কন্যা 'ভূজাওয়ালী'র কার্য্য হইতে প্রকাশ আছে।

উপরোক্ত ঋক্‌দ্বয় মধ্যে (ক)এ প্রকাশ আছে,—'সকল ব্যক্তির কাজ একপ্রকার নহে * * * আমাদের (আর্য্যবর্ণ) কার্য্যও নানাবিধ'। তার পর উদাহরণ সহায়ে বলা হইয়াছে,—'দেখ তক্ষ (ছুঁতার) কাঠ তক্ষণ করে, চিকিৎসক রোগের প্রার্থনা করে, স্তোতা (মূলে আছে 'ব্রহ্মা', অর্থাৎ যজ্ঞে যে বা যাহারা মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক স্তোত্র পাঠ করে) যজ্ঞকর্ত্তাকে চাহে'। কেন চাহে তাহা পরবর্ত্তী (খ) ঋকে প্রকাশ আছে। যথাঃ—'যেরূপ গাভীসকল গোষ্ঠমধ্যে বিচরণ করে, তদ্রূপ আমরাও ধনকামনায় তোমার পরিচর্য্যা করিতেছি।' এই ঋকে ইহাও প্রকাশ আছে যে,—স্তোতার (ব্রহ্মা) পুত্র যে স্তোতা হইতেই বাধ্য ছিল তাহা নহে। সেখানে "ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার" ছিল বলিয়াই "দেখ আমি স্তোত্রকার, পুত্র চিকিৎসাব্যবসায়ী ও কন্যা যবভর্জ্জনকারিণী; আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি" ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

কল্পনাসহায়ে অনেকের ধারণা আছে যে স্তোতা

(১) ঋগ্বেদ, নবম মণ্ডল, ১১২ সূক্ত—১ ঋক্।

(২) [illegible]

(ব্রহ্মা) ও ব্রাহ্মণ একই ছিল এবং সকল জাতির উপরে স্তোতার আসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঋগ্বেদে কিন্তু যজ্ঞকর্ত্তাকেই বড় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, যাহার জন্য "স্তোতা যজ্ঞকর্ত্তাকে চাহে" উক্ত আছে।

(গ) দেখ শুষ্ক বৃক্ষশাখা, পক্ষীর পালক, শান দিবার নিমিত্ত উজ্জ্বল প্রস্তর—এই কয় বস্তুর সহযোগে কর্ম্মকার বাণ প্রস্তুত করিয়া সেই বাণ বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত ধনাঢ্য ব্যক্তির অন্বেষণ করে। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। (১)

(ঘ) যে সকল ব্যক্তি ইহকাল-পরকাল পর্য্যালোচনা করে না, যাহারা স্তুতিপ্রয়োগ বা সোমযাগ কিছুই করে না, তাহারা দোষাশ্রিত ভাষা শিক্ষা করিয়া নির্ব্বোধ ব্যক্তির ন্যায় কেবল লাঙ্গলচালনা অথবা তন্তুবায়ের কাজে উপযুক্ত হয়। (২)

আর্য্যজাতির মধ্যে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীই মাত্র ছিল, তাহা নহে। ইহা ছাড়াও নাপিত (বপ্তা), বাসলপলপুলী (রজকিনী), কামার (কর্ম্মার), কাষ্ঠব্যবসায়ী (দার্ব্বাহার), চামার (চর্ম্মণ), চর্ম্মকার (আজিনেসন্ধ), মদ্যবিক্রেতা (সুরাবত), ব্যাধ (মৃগয়ু), কুম্ভকার (কুলাল), স্তুতিকারক (মাগধ), নর্ত্তক (নৃতু), চিকিৎসক (ভিষক) প্রভৃতি অনেক শ্রেণীর উল্লেখ রহিয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা আর উল্লেখ করিলাম না।

কেহ কেহ বলিতে চান ঋগ্বেদের মধ্যে 'ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণাসঃ, উশিজঃ, বিপ্রং ও ব্রাহ্মণাং' শব্দ দ্বারা ব্রাহ্মণকে বুঝাইয়াছে। কিন্তু মূলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কোথায় কোন্ শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতে যত্ন করিলে সকলেই ঋগ্বেদের ভাষ্যকার আচার্য্য সায়ণের সহিত একমত হইয়া স্বীকার করিবেন যে,—যেখানে 'ন ব্রাহ্মণাসঃ' (১০।৭১।৯) রহিয়াছে, তাহার অর্থ 'যে স্তোত্রকার নহে'। 'উশিজঃ' (১৬০।২) অর্থ—মেধাবী। 'ব্রহ্ম কৃণ্বন্ত ব্রাহ্মণাম্' (৬।৭৫।১৯) মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পাঠকারী বা স্তোতা। 'বিপ্রং দেবম্ অগ্নিং' (৮।১১।৬) অর্থ মেধাবী দেব অগ্নি। ইহা ছাড়া 'ক্ষত্রিয়া' (৭।৬৪।২) শব্দও দৃষ্ট হইবে, যাহার অর্থ বলশালী ছাড়া অন্য কিছু হইতেই পারে না।

কিন্তু ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল, ৯০ সূক্ত—যাহাকে প্রচলিত ভাষায় পুরুষসূক্ত কহে—তাহার মধ্যে আছে:—

'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥'

অর্থাৎ মুখই ব্রাহ্মণ হইল, বাহু রাজন্য হইল, যাহা ঊরু তাহা বৈশ্য হইল, পদ হইতে শূদ্রের উদ্ভব হইল।

প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখা ভাল যে একশ্রেণীর স্বাধ্যায়ী আছেন, যাঁহারা বলিয়া থাকেন বেদে যে সকল শব্দের ইতিকর্ত্তব্যতাংশের কোন উল্লেখ নাই সে সকল মন্ত্র অর্থহীন বা প্রক্ষিপ্ত। (১) এই শ্রেণীর বিদ্বানগণের মতে পুরুষসূক্ত প্রক্ষিপ্ত,—যেহেতু ঋগ্বেদের মধ্যে এই ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য বা শূদ্রের কোন অর্থ বলা হয় নাই; অথবা ঐ ব্রাহ্মণাদি শব্দের ইতিকর্ত্তব্যতা অংশ যে কি, তাহারও কোন উল্লেখ কোথাও নাই।

কিন্তু পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এই মন্ত্রের ভাষ্যরচনায় আচার্য্য সায়ণ ব্রাহ্মণাদি চারি-শব্দ 'মানুষ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, স্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি এই মন্ত্রের অর্থ করিয়াছেন,—

মুখই ব্রহ্মণ্যদেব, বাহুই রাজন্য-দেবতা, ঊরুই বৈশ্য দেবতা হইলেন এবং পাদ হইতে শূদ্র দেবতার উদ্ভব হইল। [সায়ণ-ভাষ্য]

সুতরাং সমগ্র ঋগ্বেদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া কোন মানবজাতির পরিচয় দৃষ্ট হইল না; অথবা স্তোত্রকারপুত্রকে যে বাধ্য হইয়া পিতার বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইবে, তাহারও অর্থাৎ জাতিধর্ম্মেরও কোন উল্লেখ দেখা গেল না।

পুরুষসূক্তে যেরূপ ব্রাহ্মণাদি শব্দের কোন অর্থ বা ইতিকর্ত্তব্যতাংশের উল্লেখ নাই, তেমনই নিষাদ প্রভৃতি শব্দেরও কোন অর্থ বা ইতিকর্ত্তব্যতাংশ দৃষ্ট হইবে না।

প্রশ্ন হইতে পারে, অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় বেদমধ্যে প্রক্ষিপ্ত-মন্ত্র যুক্ত করা কি সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর যথাসময়ে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন।

এপর্য্যন্ত জাতিসম্বন্ধে ঋগ্বেদ সহায়ে যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে বর্ত্তমান সংস্কার ত্যাগ করিয়া যাঁহারা বৈদিক সভ্যতার আলোচনায় যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারা কি সাহস করিয়া বলিতে পারেন,—বিশ্বামিত্র ঋষি প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন; অথবা কক্ষীবান ও কবষ ঋষি দাসীপুত্র ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে শূদ্র জানিতে হইবে!

বেদের পর যদি ধর্ম্মশাস্ত্র (স্মৃতিশাস্ত্র), পুরাণ, ইতিহাস লিখিত না হইত, তবে কাহারও বলিবার সাধ্য ছিল না যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া ঋগ্বেদে কোন জাতির উল্লেখ আছে।

এইবার সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ হইবে।

(১) ঋগ্বেদ, নবম মণ্ডল, ১১২ সূক্ত ৩ ঋক্।
(২) " দশম " ৭১ " ৯ " ।

(১) বৈদিকধিক্কৃত পূর্ব্ব মীমাংসা দ্রষ্টব্য।

পাঠক লক্ষ্য করিয়া দেখিতে থাকুন, ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কোন সন্ধান পান কিনা।

ঋগ্বেদে এক দশম মণ্ডলেই রকমারি সৃষ্টিতত্ব রহিয়াছে। উক্ত মণ্ডলের ৮১ ও ৮২ সূক্তে যে সৃষ্টিতত্ব কথিত হইয়াছে, তাহা অসম্পূর্ণ ও দর্শনশাস্ত্রবিরোধী। কিন্তু ১২১ সূক্তের সৃষ্টিতত্ব দার্শনিক ভিত্তির উপরে রচিত; যদিও উহার ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ ঋক স্তুতিবাচক, তবুও ১ম, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম ঋক্ হইতে দার্শনিক সৃষ্টি তত্বের আভাস দৃষ্ট হইবে। যথা:—

ঋগ্বেদ দশম মণ্ডল, ১২১ সূক্ত। (ক) 'ক' নামধারী প্রজাপতি দেবতা। হিরণ্যগর্ভ ঋষি।

১। সর্ব্বপ্রথমে কেবলমাত্র হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাতমাত্রই সর্ব্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। তিনি এই পৃথিবী ও আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করিলেন। কোন্ দেবতাকে হব্য দ্বারা পূজা করিব?

৭। ভূরি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল; তাহারা গর্ভধারণ পূর্ব্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল; তাহা হইতে দেবতাদিগের একমাত্র প্রাণস্বরূপ যিনি, তিনি আবির্ভূত হইলেন। কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা পূজা করিব?

৮। যখন জলগণ বলধারণপূর্ব্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল, তখন যিনি নিজ মহিমা দ্বারা জলের উপরে সর্ব্বভাগে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, যিনি দেবতাদিগের উপর অদ্বিতীয় দেবতা হইলেন। কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা পূজা করিব?

৯। যিনি পৃথিবীর জন্মদাতা, যাঁহার ধারণক্ষমতা যথার্থ, যিনি আকাশকে জন্ম দিলেন, যিনি আনন্দবর্দ্ধনকারী ভূরিপরিমাণ জল সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যেন আমাদিগকে হিংসা না করেন। কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা পূজা করিব?

১০। হে প্রজাপতি, তুমি ব্যতীত অন্য আর কেহ এই সমস্ত উৎপন্ন বস্তুকে আয়ত্ত করিয়া রাখিতে পারে নাই। যে কামনাতে আমরা তোমার হোম করিতেছি তাহা যেন আমাদিগের সিদ্ধ হয়। আমরা যেন ধনের অধিপতি হই।

(খ) পুরুষ দেবতা, নারায়ণ ঋষি।

১। পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ; তিনি পৃথিবীকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দশ আঙ্গুল পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়া অবস্থিত থাকেন।

২। যাহা হইয়াছে অথবা যাহা হইবে, সকলই সেই পুরুষ। তিনি অমরত্বলাভে অধিকারী হন, কেন না, তিনি অন্ন দ্বারা অতিরোহণ করেন।

৩। তাঁহার এতাদৃশ মহিমা, তিনি কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর। বিশ্বজীবসমূহ তাঁহার একপাদ মাত্র, আকাশে অমর অংশে তাঁহার তিন পাদ।

৪। পুরুষ আপনার তিন পাদ (বা অংশ) লইয়া উপরে উঠিলেন। তাঁহার চতুর্থ অংশ এই স্থানে রহিল। তিনি তদনন্তর ভোজনকারী ও ভোজনরহিত হইয়া চেতন ও তাবৎ বস্তুতে ব্যাপ্ত হইলেন।

৫। তাঁহা হইতে বিরাট জন্মিলেন এবং বিরাট হইতে সেই পুরুষ জন্মিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পশ্চাদ্ভাগে এবং পুরোভাগে পৃথিবীকে অতিক্রম করিলেন।

৬। যখন পুরুষকে হব্যরূপে গ্রহণ করিয়া দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; তখন বসন্ত ঘৃত হইল, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হইল, শরৎ হব্য হইল।

৭। যিনি সকলের অগ্রে জন্মিয়াছিলেন, সেই পুরুষকে যজ্ঞীয় পশুস্বরূপ সেই বর্হিতে পূজা দেওয়া হইল। দেবতারা ও সাধ্যবর্গ এবং ঋষিগণ উহা দ্বারা যজ্ঞ করিলেন।

৮। সেই সর্ব্ব হোমযুক্ত যজ্ঞ হইতে দধি ও ঘৃত উৎপন্ন হইল। তিনি সেই বায়ব্য পশু নির্ম্মাণ করিলেন, তাহারা বন্য এবং গ্রাম্য।

৯। সেই সর্ব্বহোম সম্বলিত যজ্ঞ হইতে ঋক ও সামসমূহ উৎপন্ন হইল, ছন্দঃ সকল তথা হইতে আবির্ভূত হইল, যজুও তাহা হইতে জন্মগ্রহণ করিল।

১০। ঘোটকগণ ও অন্যান্য দন্তপঙ্ক্তিদ্বয়ধারী পশুগণ জন্মিল। তাহা হইতে গাভীগণ ছাগ ও মেষগণ জন্মিল।

১১। পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছিল। ইহার মুখ কি হইল, দুই হস্ত দুই উরু দুই চরণ কি হইল?

১২। ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য হইল; যাহা উরু ছিল তাহা বৈশ্য হইল, দুই চরণ হইতে শূদ্র হইল।

১৩। মন হইতে চন্দ্র হইলেন, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু।

১৪। নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, দুই চরণ হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক ও ভুবনসকল নির্ম্মাণ করা হইল।

১৫। দেবতারা যজ্ঞসম্পাদন কালে পুরুষস্বরূপ পশুকে যখন বন্ধন করিলেন, তখন সাতটি পরিধি অর্থাৎ বেদী নির্ম্মাণ করা হইল, এবং তিন-সপ্তসংখ্যক যজ্ঞকাষ্ঠ হইল।

১৬। দেবতারা যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, উহাই সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠান। যে স্বর্গলোকে প্রধান

প্রধান দেবতা ও সাধ্যেরা আছেন, মহিমান্বিত দেবতাবর্গ —সেই স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠা করিলেন। (১০ম মণ্ডল, ৯০ সূক্ত)

উপরোক্ত সূক্তটীকে প্রচলিত কথায় পুরুষসূক্ত কহে। পুরুষসূক্তের উল্লেখ অনেক পুরাণশাস্ত্রে দৃষ্ট হইবে।

হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন,—বেদ অভ্রান্ত, বেদ অপৌরুষেয়; সেই অভ্রান্ত বেদে দুইরকম সৃষ্টিতত্ত্ব (যাহার মধ্যে বিলক্ষণ অনৈক্য রহিয়াছে)! ইহার কোন্ মত সত্য ও কোন্ মত মিথ্যা এই প্রশ্ন যাহাদের মনে উঠিবে তাহাদিগকে প্রবোধ দিবার মত কোন যুক্তি আমাদের নাই। তবে সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে, ইহার মধ্যে একমত সত্য ও অপর মত মিথ্যা বা প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু দর্শনের কষ্টিপাথরে ইহার কোন মতই দাঁড়াইবে কিনা, সে কথা পরে আলোচিত হইবে। তবে পুরুষসূক্ত সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল। পুরুষ-সূক্তের ১১।১২ ঋক্‌দ্বয় না থাকিলে এই রূপক সৃষ্টি-বর্ণনায় তবুও এই সূক্তের কতকটা মর্য্যাদা থাকিতে পারিত। যদিও কবিত্বে পুরুষসূক্ত অতুলনীয়, তবুও অসামঞ্জস্য ইহাতে এত বেশী যে অভ্রান্ত বেদ ত অতি দূরের কথা, যে কোন গ্রন্থে এই রূপক সৃষ্টিতত্ত্ব থাকিলে ইহাকে কঠিন সমালোচনা সহ্য করিতে হইত।

পুরুষসূক্তের ৭ম ঋকে বলা হইয়াছে,—'সেই পুরুষকে যজ্ঞীয় পশুরূপে অগ্নিতে অর্পণ করা হইল। সেই যজ্ঞ হইতে দধি, ঘৃত, বন্য ও গ্রাম্য পক্ষী, ঋক্, সাম, ছন্দঃ প্রথমে আবির্ভূত হইল। পরে যজুও জন্মগ্রহণ করিল। তারপর ঘোটক, গাভী, ছাগ ও মেষ জন্মিল।'

পূর্ব্বে যে পুরুষ-পশুকে যজ্ঞীয় পশুরূপে অগ্নিতে অর্পণ করিবার ফলে এত বস্তু ও প্রাণী উদ্ভূত হইল, পরে আবার সেই পশুকে যে কেমন করিয়া খণ্ড খণ্ড করা হইল, যাহার ফলে পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ, বাহু রাজন্য, উরু বৈশ্য হইল এবং অবশিষ্ট পদ শূদ্র না হইয়া —পদ হইতে শূদ্রের উদ্ভব হইল, তাহা বোঝা গেল না। পুরুষ সূক্তের উপরিউক্ত বর্ণনা কবিত্ব হইতে পারে, কিন্তু কোন অবস্থায় যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। বিশে-ষতঃ ১২শ ঋকে যে পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ হইল বলা হইয়াছে, ঠিক পরের ঋকে আবার সেই মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি হইলেন বলা হইয়াছে। সুতরাং যে মুখ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ হইয়াছে সেই 'ব্রাহ্মণ' অর্থে মানুষ হইলে মানুষের মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি হইলেন, এ কথার অর্থ যে কি হইতে পারে তাহা যাঁহারা নিত্য শ্রদ্ধার সঙ্গে পুরুষসূক্ত পাঠ করেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। এই অভিনব তথ্য কিন্তু আমাদের বুদ্ধির অগম্য বলিতে হইবে।

অন্যত্র সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য উল্লেখ করিতে গিয়া ঋগ্বেদের ঋষি নিম্নলিখিত মন্ত্রসকল পাঠ করিয়াছেন:—

দশম মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত।

পরমাত্মা দেবতা, প্রজাপতি ঋষি।

১। তৎকালে যাহা নাই তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূর বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল?

২। তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস-প্রশ্বাস যুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

৩। সর্ব্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল; সমস্তই চিহ্নবর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।

৪। সর্ব্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তি-কারণ নির্গত হইল। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধি দ্বারা আপন হৃদয়ে পর্য্যালোচনা-পূর্ব্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি-স্থান নিরূপণ করিলেন।

৫। রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হইলেন, মহিমাসকল উদ্ভব হইলেন। উঁহাদিগের রশ্মি দুই পার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং ঊর্দ্ধদিকে বিস্তারিত হইল, নিম্নদিকে স্বধা রহিল, প্রযতি ঊর্দ্ধদিকে রহিলেন।

৬। কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করিবে কোথা হইতে জন্মিল—কোথা হইতে এই নানা সৃষ্টি হইল? দেবতারা এই নানা সৃষ্টির পর হইয়াছেন। কোথা হইতে হইল তাহা কেই বা জানে?

৭। এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন—যিনি ইহার প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনিও নাও জানিতে পারেন।

উপরোক্ত মন্ত্র দ্বারা ঋষি প্রজাপতি সৃষ্টি ও অনাদি এই প্রকার ইঙ্গিত করিতেছেন। ঋষি বোধ হয় উপলব্ধি করিয়াছিলেন, পরমেশ্বর ও সৃষ্টি সমান্তরাল (Run parallel) চলিয়াছে। তাই তিনি বলিতেছেন—"এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন কি করেন নাই, তাহা পরমেশ্বরই (তিনিই) জানেন, যিনি ইহার প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনি নাও জানিতে পারেন।"

অন্য স্থলে আর এক ঋষি বলিতেছেন—(পৃশ্নি দেবতা বৃহস্পতির পুত্র শংযু ঋষি) "একবার মাত্র স্বর্গ উৎপন্ন হইয়াছে; একবার মাত্র পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। একবার মাত্র পৃশ্নির দুগ্ধ দোহন করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তৎসদৃশ আর উৎপাদিত হয় নাই।"

—ষষ্ঠ মণ্ডল ৪৮ সূক্ত ২২ ঋক্‌।

উপরোক্ত বাক্য হইতে সৃষ্টি যে অনন্ত তাহা সূচিত হইতেছে। সুতরাং মহাপ্রলয়ে সকল ধ্বংস হইবার পরে নূতন সৃষ্টির কল্পনা, এই বেদমন্ত্রের পরিপন্থী বুঝিতে হইবে।

অনেকে হয় তো আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিবেন, অভ্রান্ত বেদে এত বিরুদ্ধ মতবাদের সমাবেশ কেন হইল?

কেহ কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন,—এত বিরুদ্ধ মতবাদের মধ্যে কেমন করিয়া নির্ণয় করিব কোন্ মত সত্য এবং কোন্ মত প্রক্ষিপ্ত?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে;—যে সকল মতবাদ বৈদিক যুগের পরে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, সেই সকল মতবাদ যে বেদসম্মত তাহা প্রমাণ করিবার জন্যই এই সকল ভ্রান্ত মতবাদ পরে বেদ মধ্যে যুক্ত করা হইয়াছে। যাহা বেদে নাই বা বেদ সমর্থন করেন না, এমন কথা বেদপন্থী সমাজ কখন গ্রহণ করিত না। ইহারই জন্য এমন প্রমাদপূর্ণ রচনাসকল করিতে হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে প্রক্ষিপ্তনির্ণয়ের উপায়-সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে,—

(ক) সৃষ্টিতত্ত্ব বা যে কোন বিচারসাপেক্ষ বিষয় দর্শনের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া গ্রহণ করা।

(খ) সমাজতত্ত্ব বা বৈদিক সভ্যতা সম্বন্ধে কোন বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে, তাহার মীমাংসার জন্য বৈদিক সভ্যতার আদর্শরূপ কষ্টিপাথরে যাচাই করাই বিধেয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—(ক) বেদের মধ্যে যখন অনেক রকম সৃষ্টিতত্ত্ব রহিয়াছে, তখন কোন্ মত সত্য একথা জানিতে হইলে দেখিতে হইবে—পূর্ব্বজ আচার্য্যগণ কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (খ) সামাজিক ব্যাপার যথা:—'বালিকাবিবাহ বনাম তরুণীবিবাহ' ইহার মধ্যে কোন্ ব্যবস্থা বৈদিক সভ্যতার অঙ্গ ছিল মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে যে, ইতিহাস এ সম্বন্ধে কি সাক্ষ্য দিতেছেন; ইতিহাস যদি বলেন বালিকাবিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহা হইলে তরুণীবিবাহের পক্ষের মন্ত্রগুলি প্রক্ষিপ্ত জানিতে হইবে। অথবা তরুণীবিবাহই যদি ইতিহাসে দেখা যায়, তাহা হইলে বালিকাকন্যার বিবাহ পক্ষে যত মন্ত্র আছে সকল মন্ত্রই প্রক্ষিপ্ত জানিতে হইবে। প্রক্ষিপ্তনির্ণয়ের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়।

বসন্ত-গীত।

ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

এল বসন্ত আজিকে ধরাতলে।
শোভিছে মেদিনী ফুলদলে
(আহা) হাসিছে মেদিনী ফুলগন্ধে।
কত কাল পরে
পুলকের ভরে
শোভিছে মেদিনী ফুলদলে
(আহা) হাসিছে মেদিনী ফুলগন্ধে।
এল বসন্ত আজিকে ধরাতলে॥ *

গান—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী।

সা সরা I { গা গা -া গা II গা গা -া গা I রা রা -া গমা I (গা রা সা রা)} I
এ ল • । ব স • ন্ত আ জি • কে ধ রা • ত• লে • এ ল

* শিশুদের এই গানটী Y. W. C. A.র এক অধিবেশনে শিশুদের কর্ত্তৃক গীত হইয়াছিল।

০ ॥ ১´ ০ ১´ ০

| গা -া -া -া I গা পা -া পা | স্মা পা -া ম্মা I গা গা -া মা | পা -া পা পা I

লে ০ ০ ০ শো ভি ০ ছে মে দি ০ নী ফু ল ০ দ লে ০ আ হা

১´ ০ ১´ ০ ১´

I ধা ধা -া গা | ধা পা -া পা I গা গা -া মা | পা -া পা পা I পা পা -া মা II

হা সি ০ ছে মে দি ০ নী ফু ল ০ গ লে ০ এ ল ব স ০ ন্ত

১´ ০ ১´ ০ ১´

I গগা গা -া মা | পা -া ধা -া I পস্মা পা -া ধা | পা মা গা -া I গাঃ গঃ গাঃ মঃ |

কত কা ০ ল প ০ রে ০ পু ল কে ০ র ভ ০ রে ০ ক ত কা ল

০ ১´ ০ ১´ ০

| পা -া ধা -া I পাঃ স্মাঃ পাঃ ধঃ | পাঃ মঃ গা -া I গা পা -া পা | স্মা পা -া মা I

প ০ রে ০ পু ল কে র ভ ০ রে ০ শো ভি ০ ছে মে দি ০ নী

১´ ০ ১´ ০ ১´

I গা গা -া মা | পা -া পা পা I ধা ধা -া গা | ধা পা -া পা I গা গা -া মা |

ফু ল ০ দ লে ০ আ হা হা সি ০ ছে মে দি ০ নী ফু ল ০ গ

০ ১´ ০ ১´ ০

| পা -া পা পা I পা পা -া মা | গা গা -া গা I রা রা -া গমা | গা রা সা রা I

লে ০ এ ল ব স ০ ন্ত আ জি ০ কে ধ রা ০ ত০ লে ০ এ ল

১´ ০ ১´ ০ ১´

I গা গা -া গা | গা গা -া গা I রা রা -া গমা | গা রা গ-া মা I পা স্মা পা ম্মা II II

ব স ০ ন্ত আ জি ০ কে ধ রা ০ ত০ লে ০ এ ল ব স ০ ন্ত

সঙ্ঘের পরিণতি।

(শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ)

প্রথম বিংশবর্ষকাল বুদ্ধের সেবা-পরিচর্য্যার নিমিত্ত কোন নির্দ্দিষ্ট সেবক নিযুক্ত হন নাই। সঙ্ঘের যে যখন সুযোগ পাইতেন, তাহা সম্পাদন করিতেন। ইহাতে অনেক সময়ে বিশৃঙ্খলা ঘটিলেও বুদ্ধ প্রয়োজনমত নিজ হস্তেই আবশ্যকীয় কাজ সমাধা করিয়া লইতেন। কিন্তু এভাবে আর অধিক দিন চলা সম্ভব হইল না। বার্দ্ধক্যাপহত বুদ্ধের নিরন্তর সেবাকার্য্যের জন্য একজন নির্দ্দিষ্ট সেবকের প্রয়োজন হইল। তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া সকল প্রধান শিষ্যগণই সেবার সৌভাগ্যলাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। স্থির রহিলেন কেবল আনন্দ, কারণ তিনি জানিতেন যিনি সেবাভার-গ্রহণের উপযুক্ত তথাগত নিজেই তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করিয়া লইবেন।

একে একে সকল বিশিষ্ট অন্তরঙ্গগণের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিয়া বুদ্ধ কহিলেন,—"ভিক্ষুগণ, অর্হত্ব লাভ করিয়াছেন, এমন কাহারো সেবাগ্রহণ আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না। আনন্দ যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমার সেবাভার লইতে পারেন।" আনন্দ সসম্মানে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলেন, বুদ্ধ তাঁহার আটটি প্রার্থনা-পূরণে প্রতিশ্রুত হইলে তিনি তদীয় সেবাভার গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহার আটটি সর্ত্ত এই :—

(১) বস্ত্রাদি দানে তৎপ্রতি বুদ্ধ কোন বৈশিষ্ট্যাচরণ দেখাইবেন না ;

(২) আহার্য্য সম্পর্কে অথবা

(৩) বাসস্থান-নির্দ্দেশেও নয় ;

(৪) কোন গৃহস্থ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিলে আনন্দকেও তাঁহার সহিত আহার করিতে অনুরোধ করা হইবে না ;

কিন্তু

(৫) আনন্দ যদি কাহারো নিমন্ত্রণ বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত করেন, বুদ্ধকে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে ;

(৬) তিনি বুদ্ধদর্শনে যাহাদিগকে লইয়া আসিবেন, বুদ্ধ তাহাদের সহিত আলাপ করিবেন ;

(৭) ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ জাগিলে বুদ্ধ তৎক্ষণাৎ তাহা মীমাংসা করিয়া দিবেন ;

এবং

(৮) কার্য্যগতিকে তাঁহার অনুপস্থিতিতে বুদ্ধ যে সকল উপদেশ দিবেন, তিনি ফিরিয়া আসিলে বুদ্ধকে পুনরায় তাঁহার নিকট সেই সকল আবৃত্তি করিতে হইবে।

আনন্দের প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। তিনি সেই দিন হইতে বুদ্ধের 'উপস্থায়ক' নিযুক্ত হইলেন। আনন্দ ভুক্তি-মুক্তি তুচ্ছজ্ঞান করিয়া একান্তমনে তাঁহার নবজীবনদাতার সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।* আর সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধের প্রতি বাণী, প্রত্যেক উপদেশ বিশেষরূপে অধিগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এদিকে উপালী সঙ্ঘের যে সকল শুভকরী নিয়মাবলী প্রণীত হইতে লাগিল, তৎসমুদয় সম্যকরূপে আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। প্রতি নিয়ম যাহাতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালিত হয়, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

বুদ্ধের অভিপ্রায় ছিল জগৎকে মুক্তিপন্থা দেখাইয়াই তিনি নিরস্ত হইবেন। তাঁহাকে বেড়িয়া কোন সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিবে, তাহা তিনি পূর্ব্বে কল্পনাও করেন নাই। সঙ্ঘ যখন গড়িয়া উঠিল, তখন প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। নির্ব্বাণলাভই বুদ্ধের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বলিয়া তিনি ব্যবহারিক নীতিসমূহের প্রতি প্রথমে লক্ষ্য করেন নাই,—প্রত্যেককেই এ সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপভাবে আর অধিক দিন চলিল না। কোন অল্পবুদ্ধি ভ্রাতা হয় তো কোন অপকর্ম্ম করিয়া বসিলেন; অপকর্ম্মের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিরোধোপযোগী নিয়ম প্রণয়ন করিতে হইল। কোন রাজদণ্ডে দণ্ডিত পলাতক ব্যক্তি আসিয়া বিপদ কাটাইবার অভিপ্রায়ে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিল; রাজার অনুরোধে এক্ষেত্রেও উপযুক্ত নিয়ম প্রণয়ন করিতে হইল। কোন ভিক্ষু আহার শয্যা ইত্যাদি ব্যাপারে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করিলেন, বিনয়সাহায্যে তাহাও নিরোধ করিতে হইল। গ্রামবাসী অনুযোগ করিল, ভিক্ষুগণের বাড়ী গিয়া মাংসাদি যাচ্ঞা শোভন হয় না—মাংসাহার সম্বন্ধে বিধি প্রণীত হইল।* আবার কেহ বা নির্দ্দেশ করিলেন, তখনকার অন্যান্য ধর্ম্মসংঘের প্রথানুযায়ী প্রতি অমাবস্যা-পূর্ণিমাতে একএকটি বিশেষ অধিবেশনে বিশেষভাবে ধর্ম্মালোচনা হওয়া উচিত,—এই শুভকর প্রস্তাবও গৃহীত হইল। বর্ষার তিন মাস কাল কোন এক স্থানে অবস্থান করিয়া আত্মোন্নতির জন্য সাধন এবং বর্ষাবাসকালে আহার্য্যদাতাগণকে ধর্ম্মদানের নিয়মও অন্যান্য সংঘে প্রচলিত প্রথার অনুকরণে পরিগৃহীত হইল। পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধনও আবশ্যকানুযায়ী চলিতে থাকিল। যেমন গ্রীষ্মপ্রধান অবন্তিদেশের ধুতপন্থী শ্রমণগণকে বুদ্ধ প্রত্যহ শীতল জলে স্নানাদির অনুমতি দান করিলেন, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাস্তাঘাট কঙ্করময় বলিয়া সেখানকার ভিক্ষুগণের পাদুকাব্যবহার অনুমোদন করিলেন। এই-ভাবে 'বিনয়' দিন দিন পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। উপালী বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত গোপ্তৃ-কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। †

বুদ্ধের অন্তরঙ্গ পার্শ্বদগণের প্রত্যেকেই এক-একদিকে বিশিষ্টতা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আনন্দ শ্রুতিতে এবং উপালী বিনয়ে ধীরে ধীরে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন, অন্যান্য সকলেও অধ্যবসায় সহকারে এক এক দিকে উৎকর্ষ লাভ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ প্রত্যেকের রুচি অনুযায়ী শিক্ষা বিধান করিতেন। সকলকেই এক মূল ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান করিয়া মানসিক বৃত্তি অনুযায়ী তিনি প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সাধনপ্রণালী নির্দ্দেশ করিতেন। সহজ ও স্বাভাবিক পথে উন্নতিলাভ করায় বুদ্ধ-শিষ্যগণের ব্যক্তিত্ব দ্রুত প্রস্ফুটিত হইল।

শারীপুত্র ইতিপূর্ব্বে বেদত্রয়ে বিশেষ অধিকার অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি দেশের সকল

---

* বুদ্ধের দেহত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আনন্দ অর্হত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। জীবন্মুক্তাবস্থা লাভ করিতে হইলে, সমস্ত মায়া-মমতা অতিক্রম করিতে হয়। বুদ্ধের শরীরের উপর প্রবল আকর্ষণ ছিল বলিয়া আনন্দ বুদ্ধের জীবনকালে ঐ অবস্থা লাভ করিতে পারেন নাই। জৈনধর্ম্মব্যাখ্যাতা মহাবীর স্বামীর অনুচর সেবক গোতম ইন্দ্রভূতিও ঠিক একই কারণে মহাবীরের দেহত্যাগের পূর্ব্বে কৈবল্য লাভ করিতে পারেন নাই।

* অনেকের ধারণা আছে বুদ্ধদেব মাংসাহার নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। বুদ্ধ কুত্রাপি মাংসাহার নিষেধ করেন নাই। উপরোক্ত ঘটনার ফলে বুদ্ধ মাংসাহার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করেন। তাহার সারকথা—ভিক্ষুগণের উদ্দেশে বলিপ্রদত্ত কোন প্রাণীর মাংস কোন বৌদ্ধ-শ্রমণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। বৌদ্ধ "অহিংসা" ঠিক জৈন "অহিংসা" নহে। বুদ্ধদেব শুধু মনকে হিংসাবৃত্তি-পরিশূন্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

† মহাবগ্‌গ দ্রষ্টব্য। See also—Spread of Buddhism—D. N. Dutta.

রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধমহাসভায় বৌদ্ধসাহিত্যের সূত্রাংশ সম্পাদনের ভার লইয়াছিলেন "বহুশ্রুত আনন্দ", এবং বিনয়াংশের ভার লইয়াছিলেন "বিনয়ধর উপালী"। আনন্দ বৌদ্ধশাস্ত্রে "ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক" নামেও পরিচিত।

ধর্ম্মমতের যাবতীয় শাস্ত্র আয়ত্ত করিলেন। প্রজ্ঞায় তিনি সকলকে অতিক্রম করিলেন। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্ম-ব্যাখ্যার জন্য তিনি বুদ্ধের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। শ্রাবস্তিতে বিরুদ্ধাচারী ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের সহিত বিচার বিতর্কের জন্য বুদ্ধ শারীপুত্রকেই প্রথমে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। শারীপুত্রের প্রচারের ফলে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে পর তিনি স্বয়ং তথায় গমন করেন।

আদর্শ বিদ্যার্থীরূপে রাহুল সকলকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। বিদ্যাচর্চ্চায় প্রবল অনুরাগদর্শনে বুদ্ধ শারীপুত্রকে তাঁহার আচার্য্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দেন। উপযুক্ত শিক্ষাগুরুর অনুপ্রেরণালাভে বালভিক্ষু চিরকালের জন্য বিদ্যার্থীর আদর্শস্থানীয় হইয়া থাকিবার আয়োজন করিলেন।

মৌদ্‌গল্যায়ন শারীপুত্রের উপযুক্ত ভ্রাতাই ছিলেন। জ্ঞান-গরিমায় তিনিও খুব উচ্চাসন অধিকার করিয়াছিলেন। অত্যদ্ভুত সংযমশীলতায়ই তিনি বিশেষরূপে বুদ্ধের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সাধনবলে তিনি বহু অলৌকিক শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। *

বুদ্ধের বাণী বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় মহাকাত্যায়ন বিশিষ্টতা অর্জ্জন করেন। ঋষি অসিত দেবলের উপদেশে অবন্তির রাজপুরোহিতপুত্র নালক কঠোর তপশ্চর্য্যা অবলম্বন করিয়া অরণ্যাশ্রয়ী হইয়াছিলেন। পরে বুদ্ধের সন্ধান পাইয়া বারাণসীনগরে তাঁহার সহিত মিলিত হন। সঙ্ঘভুক্ত হইয়া তিনি মহাকাত্যায়ন (মহাকাচ্চায়ন) নাম লাভ করেন। কাহারো কাহারো নিকট কঠোরাচারের নিন্দা করিলেও বুদ্ধ মহাকাত্যায়নকে ঐ মার্গেই চরমোৎকর্ষ লাভের উপদেশ দেন। শাস্তা তাঁহাকে অবন্তিরাজ্যে ধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রেরণ করিলেন।

মহাকাত্যায়নের ন্যায় মহাকশ্যপও বুদ্ধ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়াও জ্ঞান-শ্রেষ্ঠের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। মহাকশ্যপও তপাচারী ছিলেন। দিগম্বর হইয়া নির্জ্জনবাসই মহাকশ্যপের সমধিক প্রিয় ছিল। প্রচারকালীন তদীয় উদাত্ত গর্জ্জন তাঁহার জন্য 'সিংহনাদী' আখ্যা অর্জ্জন করিয়াছিল। †

'কান্তি-সৌরভে' মন্তানিপুত্র পূর্ণ বুদ্ধের স্নেহ আকর্ষণ করিলেন। বর্ব্বরতমের নিকটেও ধর্ম্মপ্রচারে পূর্ণের অসম্ভব ধৈর্য্য পরিলক্ষিত হইল। অসভ্য শ্রোণপরন্তকগণের (অপরান্তবাসী?) নিকট ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করিতে আদেশ করিয়া বুদ্ধ বলিলেন,—"যাও পূর্ণ, যাহারা বন্ধন ছেদন করিতে চায়, তাহাদিগকে সাহায্য কর; যাহারা উদ্ধার পাইতে চায়, তাহাদিগকে উদ্ধার কর; যাহারা শান্তি চায়, তাহাদিগকে শান্তি দান কর; আর যাহারা নির্ব্বাণ-মুক্তি চায়, তাহাদের নির্ব্বাণলাভে সহায় হও"। শাস্তার উপদেশ সানন্দে মস্তকে ধারণ করিয়া পূর্ণ পশ্চিমপ্রান্তে ধর্ম্মপ্রচারে যাত্রা করিলেন।

পিণ্ডোল ভরদ্বাজও ধর্ম্মপ্রচারে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁহার প্রচারকালীন বজ্রনির্ঘোষ সিংহনাদের মতোই প্রতিধ্বনিত হইত।

গৌতমের পিতৃব্যপুত্র * অনিরুদ্ধ "দিব্যচক্ষুষ্মান"রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। দিব্যদৃষ্টিসহায়ে তিনি দেশ-দেশান্তরের সংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে অবগত হইতে পারিতেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিবার আয়োজন করিলেন দেবদত্ত, বুদ্ধের প্রতি আপনার বৈরতাচরণের দ্বারা। সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইয়া দেবদত্ত কঠোর তপশ্চর্য্যা দ্বারা ঋদ্ধিবল লাভ করেন। ঋদ্ধিসম্পন্ন হইয়া তিনি আকাশমার্গে বিচরণ ইত্যাদি দ্বারা লোকচক্ষু আকৃষ্ট করিবার প্রয়াস পাইতেন। যাহাতে তিনি বিভূতি-শক্তির অপব্যবহার না করেন, বুদ্ধ তজ্জন্য বহু চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল।

দেবদত্ত মগধ-রাজকুমার অজাতশত্রুর সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিলেন। অজাতশত্রু এক বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। দেবদত্ত বহুসংখ্যক অনুচর সংগ্রহ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

বুদ্ধের বয়ঃক্রম তখন ৭২ বৎসর। একদিন যখন ভিক্ষুমণ্ডলীর প্রতি বুদ্ধ উপদেশ দিতেছিলেন, দেবদত্ত তথায় উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব করিলেন—"তথাগত এখন বার্দ্ধক্য-প্রপীড়িত। অতএব সঙ্ঘনিয়মনের জন্য তাঁহার একজন সহায়ক নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। বুদ্ধ দেবদত্তের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া উত্তরে জানাইলেন যে, শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নই সহায়ক হইবার পক্ষে যোগ্যতম। দেবদত্ত ইহাতে বড় ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহার হিংসাবৃত্তি জ্বলিয়া উঠিল। অজাতশত্রুর সহিত মিলিত হইয়া তিনি প্রতিশোধের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে স্থির হইল, বৃদ্ধ মহারাজ বিম্বিসারকে নিহত করিয়া অজাতশত্রু সিংহাসন অধিকার করিবেন এবং তদনন্তর কোন কৌশলে বৃদ্ধ শ্রমণ গৌতমের প্রাণনাশ করিয়া দেবদত্ত বৌদ্ধসঙ্ঘের অধিনায়ক হইবেন।

* শারীপুত্র এবং মৌদ্‌গল্যায়নকে বুদ্ধ "অগ্রশাবক" বলিতেন। অগ্র—শ্রেষ্ঠ; শাবক—সন্তান।

† মহাকশ্যপ সঙ্ঘে অত্যন্ত সম্মান লাভ করেন। তাঁহার উপস্থিতির পূর্ব্বে বুদ্ধের চিতায় অগ্নিসংযোগ সম্ভব হয় নাই। ইনিই রাজগৃহের প্রথম বৌদ্ধ মহাসম্মেলনের অধিনায়ক ছিলেন।

* শুদ্ধোদনের সহোদর অমৃতোদনের পুত্র।

বিম্বিসারের নিধন সংসাধিত হইল।* অজাতশত্রু সিংহাসনারূঢ় হইলেন। বুদ্ধের প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে দূর হইতে তাঁহাকে বিষাক্ত তীরবিদ্ধ করিবার জন্য একজন তীরন্দাজ নিযুক্ত হইল; কিন্তু প্রেরিত তীর বিপরিতগামী হইল। বিস্ময়বিমূঢ় তীরন্দাজ বুদ্ধের শরণগ্রহণ করিল। গৃধ্রকূট পর্ব্বতপার্শ্ব দিয়া গমনকালে অন্য একদিন তৎপ্রতি বিশাল শিলাখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইল। কিন্তু বুদ্ধকে উহা আঘাত করিল না। অপর একদিন রাজগৃহের পথে তিনি ভিক্ষার্থে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময় এক মদোন্মত্ত হস্তীকে তাঁহার সম্মুখে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু দেবদত্তের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করিয়া মত্তহস্তী শান্তভাবে মস্তক অবনত করিয়া মহাশ্রমণকে প্রণাম জানাইল।

মগধের লোক অবাক হইয়া গেল। দেবদত্ত ও তাঁহার অনুচরবর্গের আর তথায় ভিক্ষান্ন সংগ্রহ কষ্টকর হইয়া উঠিল। তদুপরি পিতৃহত্যার তীব্র অনুশোচনায় মর্ম্মাহত অজাতশত্রু রাজবৈদ্য জীবকের পরামর্শে শান্তির আশায় বুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেবদত্তের কল্পনা-প্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। অপব্যবহারের ফলে তিনি ইতিমধ্যে সমস্ত ঋদ্ধিবল হারাইয়াছিলেন। দুঃখিতান্তঃকরণে তিনি পুনরায় সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইবার চেষ্টা করিলেন।

কিন্তু দেবদত্ত তাঁহার দুর্জ্জয় অভিমান ত্যাগ করিতে পারিলেন না। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই পুনরায় তাঁহার অন্তরে প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। তিনি নিজে কঠোর জীবন যাপন করিতেন বলিয়া তাঁহার মনে হইল সঙ্ঘের সকলেরই কঠোরাচারী হওয়া উচিত। তিনি একদিন প্রস্তাব করিলেন, সঙ্ঘের সকলের জন্য পাঁচটি নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হউক:—

১। নগর হইতে দূরে অরণ্যে বাস;

২। ভিক্ষান্নমাত্রে জীবনধারণ;

৩। লোকের পরিত্যক্ত জীর্ণবসন মাত্র পরিধান;

৪। বৃক্ষতলে বাস; এবং

৫। মৎস্য ও মাংসাহার একান্তভাবে বর্জ্জন।

বুদ্ধ এই সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি জানাইলেন যে যাঁহারা ইচ্ছা করেন, কেবল তাঁহারাই এই সকল নিয়মাবলী মানিয়া চলিবেন। সকলের জন্য এইগুলি বিধিবদ্ধ করা সম্ভব নহে এবং তাহার কোন আবশ্যকও নাই।

দেবদত্ত বুদ্ধের উত্তর অযৌক্তিক বিবেচনা করিলেন। তিনি বুদ্ধকে আয়াসপ্রার্থী বলিয়া তীব্র সমালোচনা করিলেন। তাঁহার উত্তেজনায় কোকালিক প্রভৃতি বহু ভিক্ষু বুদ্ধের প্রতি বীতরাগ হইল। দেবদত্ত পৃথক্ সঙ্ঘস্থাপনে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, অনূ্যন পঞ্চশত ভিক্ষু তাঁহার অনুগমন করিয়াছে। পরম পুলকে দেবদত্ত গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে নবীন ধর্ম্মান্দোলনের কেন্দ্র সংস্থাপন করিলেন।

একদিন যখন দেবদত্ত সমবেত অনুচরমণ্ডলীকে উপদেশ দানে রত, শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন অপ্রত্যাশিতভাবে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ শিষ্যদ্বয় বুদ্ধকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই শরণ লইতে আগমন করিয়াছেন ভাবিয়া দেবদত্ত পরম হৃষ্ট হইলেন। বহুক্ষণ বক্তৃতার পর পরিশ্রান্ত দেবদত্ত শারীপুত্রকে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিয়া বিশ্রামার্থে গমন করিলেন এবং অনতিবিলম্বে বিশ্রামাগারে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। শারীপুত্র উপদেশচ্ছলে দেবদত্তের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া বুদ্ধের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহার অতুলনীয় কথনভঙ্গী, তাঁহার মধুর বচনবিন্যাস, তাঁহার অপ্রমাদী যুক্তিজাল উপস্থিত সকলের চিত্তহরণ করিল। নিদ্রোত্থিত দেবদত্ত সবিস্ময়ে দেখিলেন, প্রায় সমস্ত ভিক্ষুই তাঁহার সঙ্ঘ ত্যাগ করিয়া শারীপুত্রের সহিত প্রস্থান করিয়াছে।

মনস্তাপের বৃশ্চিকদংশন দেবদত্তকে ব্যাধির হস্তে সঁপিয়া দিল। তিনি আর সারিয়া উঠিলেন না। অন্তিমসময় সমুপস্থিত হইলে তিনি বুদ্ধদর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বুদ্ধ-সন্নিধানে নীত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।*

বুদ্ধ প্রথমে নবীন ভিক্ষু ও শ্রমণগণের শিক্ষার বা বিদ্যাচর্চ্চার বিশেষ কিছুই ব্যবস্থা করেন নাই। একদিন একদল ভিক্ষু ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া এক গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। গৃহস্থ তাঁহাদিগকে সেদিন কি বার, কি তিথি ইত্যাদি প্রশ্ন করিলেন। ভিক্ষুদলের কেহই

---

* সিংহলী মতে অজাতশত্রু পিতা বিম্বিসারকে অস্ত্রাঘাত করিতে গিয়া দৌর্ব্বল্যবশতঃ পারেন নাই। অবশেষে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। কারাগারে অনাহারে তাঁহার প্রাণত্যাগ হয়। See Manual of Buddhism—Spence Hardy—pp. 328-29.

* বৌদ্ধ বলেন, দেহত্যাগের পর দেবদত্ত নিরয়গামী (অবীচি) হইয়াছিলেন। তবে দেহত্যাগকালে বুদ্ধকে স্মরণ করায় তিনি কল্পক্ষয়ে 'প্রত্যেক বুদ্ধত্ব' লাভ করিবেন।

দেবদত্তের বিবরণ সম্ভবতঃ বৌদ্ধ আখ্যানকার অতিরঞ্জিত করিয়াছেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে চৈন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ এবং সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে য়ুয়ান্-চোয়াঙ (হিউয়েন্-সাঙ্) দেবদত্তের সম্প্রদায়কে যথাক্রমে শ্রাবস্তি ও কর্ণসুবর্ণে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। দ্বাদশ শতাধিক বৎসরের আয়ুকাল নিশ্চয়ই বৌদ্ধবৃত্তান্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়।

দেবদত্ত কঠোর জীবন-যাপন পছন্দ করিতেন। সম্ভবতঃ ইহাই বুদ্ধের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদের একমাত্র কারণ। তিনি তাঁহার মতানুযায়ী এক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্প্রদায়ই অন্ততঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী কাল টিকিয়াছিল।

কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় গৃহস্থ মন্তব্য করিলেন যে, ঐ সকল অজ্ঞ ভিক্ষুগণের নিকট মুক্তিপথ প্রদর্শনের আশা করা মূর্খতামাত্র। বুদ্ধ এই সংবাদ-শ্রবণে চিন্তাযুক্ত হইলেন। বহু চিন্তার পর তিনি শিক্ষার একটি সহজ পন্থা আবিষ্কার করিলেন। সমস্ত অশিক্ষিত ও নবীন ভিক্ষু এবং শ্রমণগণের রুচি অনুযায়ী পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করিয়া প্রবীণ বিজ্ঞ শিষ্যগণের এক-একজনের অধীনে তাহাদের শিক্ষার ভার দিলেন। জ্ঞানস্পৃহা যাহাদের প্রবল তাহাদিগকে শারীপুত্র অথবা মৌদ্‌গল্যায়নের অধীনে; তপশ্চর্য্যা যাহাদের প্রিয় তাহাদিগকে মহাকাত্যায়ন অথবা মহাকশ্যপের অধীনে,—এইভাবে তিনি প্রকৃতি ও রুচি বিচার করিয়া, এক এক দলকে উপযুক্ত এক-একজন শিক্ষাগুরুর অধীনে শিক্ষালাভের বিধান করিলেন। প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়ায় এই প্রণালী আশু কার্য্যকরী হইল।*

এইরূপে সঙ্ঘনিয়মনের ব্যবস্থা ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইল। তথাগতের অন্তিমকালও সন্নিকটবর্ত্তী হইল। সঙ্ঘকে সুসংবদ্ধ দেখিয়া তিনি পরমহৃষ্ট মনে লোকাতীত রাজ্যের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। শাস্তার অন্তিমক্ষণে ভিক্ষুত্ব লাভ করিয়া নবাগত সুভদ্র বিহ্বল-চিত্তে সুখ ও দুঃখের মাঝখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মানবজীবনের হিসাবনিকাশ।†

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ)

আজ মানবীয় কার্য্যাবলীর পরিমাপক একটি বর্ষ দিগন্ত বিস্তৃত মহাম্বুধির বক্ষে ক্ষুদ্র লহরীর মত অনন্ত কালবক্ষে বিলীন হইতে চলিল—আজ বর্ষশেষ।

এই বর্ষশেষের সঙ্গে মানবজীবন ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। বর্ষশেষের মধ্যে একটা অজ্ঞাতপ্রভাব বিদ্যমান—যাহা ধারণাতীত কাল হইতে মানবকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে, স্বীয় মহিমার অলোক ঔজ্জ্বল্যে ধরাবক্ষ উদ্ভাসিত করিয়াছে; তাই আমরা দেখিতে পাই পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক সমাজ, প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায় বর্ষশেষের অজ্ঞাত আকর্ষণে যুগ-যুগান্তর হইতে আকৃষ্ট।

আর্য্যঋষি পরম পবিত্র জ্ঞানে এই বর্ষশেষ দিবসে বিবিধ ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান দিয়াছেন, আবার অন্যান্য মানবসমাজও এই দিনে যে কোন প্রকার উৎসবানুষ্ঠানে নিরত থাকে।

কিন্তু কেন এই বর্ষশেষের দিনে মানব, প্রাণের গোপন সহানুভূতি অনুভব করে? কি সে রহস্য, যাহার অমিত আভা মানবহৃদয়কে অজ্ঞাতে তাহার দিকে টানিয়া লইয়া যায়?

সে রহস্য, সে আকর্ষণ আর কিছুই নহে—উহা সান্ত ও অনন্তের মিলন-বিন্দু। যে-ক্ষুদ্র সসীম বর্ষকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মানব অনন্ত কাল-সাগরে পাড়ি জমাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, সেই সান্ত বর্ষের শেষ দিন অনন্তের বুকে ঢলিয়া পড়িতে চলিল—একদিকে অন্তহীন অতীত, অন্য দিকে অনাগত অনন্ত ভবিষ্যৎ—এই দুই অনন্তের মাঝখানে সংযোগরেখা টানিয়া দেয় বর্ষশেষ, যেমন দিন ও রাত্রির মধ্যভাগে ধূসরকুন্তলা সন্ধ্যা মিলন-বাণী উচ্চারণ করিয়া দণ্ডায়মানা। মানব দেখে, হৃদয়ের পরতে পরতে অনুভব করে, যে সসীম বর্ষ তাহার জীবনের সঙ্গে পরিচিত, যাহাকে সাথী করিয়া সে সংসার-সমরাঙ্গণে কত যুদ্ধই না করিয়াছে, সুখ-দুঃখের কত আঘাতই না সহ্য করিয়াছে, সে বর্ষ তাহার নিকট হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিতেছে, আর সম্মুখে অন্তহীন কাল-সমুদ্র অপরিচিতের বেশে লক্ষকণার গর্জ্জন করিতেছে, তখন কাঁদিয়া উঠে স্বভাব-কোমল মানবের মন, ব্যথিত হয় তাহার হৃদয়; তাই সে উৎসবের ব্যপদেশে, ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সে বিদায়-বেদনা ভুলিতে চেষ্টা করে।

আরও একটা বিষয় এই যে, বর্ষশেষের এই দিনে মানবের মনে পড়ে—এই বর্ষশেষের শেষ সন্ধ্যাটির মত মানবও ত সান্ত এবং অনন্তের মিলনক্ষেত্র; জাগিয়া উঠে মানবের অন্তর প্রদেশে শরতের কমলবনে সূর্য্যকিরণ-স্পর্শে শতদলের দলরাজির মত মানবের হৃদয়-নিহিত অনন্তের শান্ত-নির্ম্মল-শ্রী-বিমণ্ডিত আদর্শ লোকের ছবি—মানব ত শুধু ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ সসীম জীব নহে—মানব যে অনন্তের সন্তান—'অমৃতস্য পুত্রাঃ'—মানবের মধ্যেও যে অনন্ত পরব্রহ্মের করুণাধারা প্রকাশিত, যাহা মানবকে অমৃতলোকে, অমরলোকে, অন্তহীন পরব্রহ্মের চরণতলে লইয়া যাইবে; যাহা ভুলাইয়া দিবে এই বিশ্বে সসীমতার অভাবের অপূর্ণতার দুঃখরাশি, একনিমিষে ধৌত করিবে যাহা কিছু মালিন্য-কালিমা, যাহা কিছু পাপ-কলঙ্ক। মানব অন্তরের গূঢ়তম অন্তস্তলে বর্ষশেষের পুণ্যস্পর্শে যখন স্বীয় স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহার প্রাণের বীণায় অনন্তের মধুর রাগিণী বাজিয়া উঠে, ধ্বনিত হইয়া উঠে জীবচরাচরে অপরূপ ছন্দ ও মেঘলোকের উপর হইতে নামিয়া আসে এক অভয় অশরীরী বাণী; আর তাহা মিলন রাত্রির মধ্য দিয়া কর্মকোলাহল মথিত করিয়া, সাংসারিক সুখ-দুঃখ বন্ধন [illegible] প্রত্যেক রক্তবিন্দুর স্পন্দন-তালে বাজিয়া উঠে—"ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্"।

---

* এই প্রণালীর একটা দোষও ছিল। বুদ্ধের দেহত্যাগের পর ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ভিক্ষুদল আপনাপন শিক্ষাগুরুকে লইয়া ভিন্ন ভিন্ন [illegible] সৃষ্টি করিয়াছিল। সঙ্ঘের বিভক্তির মূলে এই কারণটিও বর্তমান।

† বর্ষশেষে [illegible] 'বর্ষশেষ' উপলক্ষে [illegible] সভার মন্দিরে বিবৃত।

বর্ষশেষের পুণ্যমুহূর্ত্তে অন্য একটি ভাবও হৃদয়মাঝে আত্মপ্রকাশ করে, সে ভাব সুন্দর ও বিরাটের বৈষম্য—মানবজীবনে সুন্দর ও বিরাটের প্রভাব। বর্ষশেষের মধ্যেও দেখিতে পাই এই বিভিন্নতা পূর্ণভাবে প্রকটিত।

দিবাবিভাবরী-ঋতুকুসুমসমূহ মাল্যমধ্যস্থ সূত্রের মত অদৃশ্যভাবে বক্ষে ধারণ করিয়া যখন স্বীয় গরীয়সী মূর্ত্তির অমিত ছটায় বিশ্ব উদ্ভাসিত করিয়া শেষ বিদায়ের জন্য বর্ষ পুরোভাগে আসিয়া উপনীত হয়, তখন তাহার মধ্যে লক্ষিত হয় সুন্দরের অরূপ-রূপমাধুরী; স্নেহে ভালবাসায় হৃদয় ভরিয়া উঠে; কিন্তু যখন অনন্ত কালস্রোতের বিষয় বর্ষের সঙ্গে তুলনায় মানস-যবনিকায় প্রতিফলিত হয়, তখন মানববুদ্ধি কোন অতলে হারাইয়া যায়—সীমাহীন বিরাটের মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া প্রাণ ক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে—ভয় ও বিস্ময়ে মানসপ্রদেশ আকুল হইয়া উঠে।

যাহা বিরাট্, তাহার দিকে চাহিয়া মানব দেখে, বিরাটের তুলনায় সে নিজে কত ক্ষুদ্র; তখন নিজের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিয়া ধারণাতীত বিরাটের চিন্তায় তাহার মন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে; তখন নিজের অজ্ঞাতসারে কণ্ঠ হইতে নির্গত হয় "ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং", কিন্তু ভয় লইয়া মানব জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না; সংসারের গৃহস্থালীর প্রত্যেক কার্য্যে যদি ভীতি আত্মপ্রকাশ করে, তবে সেখানে মানব-প্রাণ অস্বস্তি অনুভব করিয়া ব্যাকুল হয়; সুতরাং 'অনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্' বিরাট পুরুষের সাহচর্য্যে মানবের মানবত্ব বিকশিত না হইয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল; ভয় আসিল, কিন্তু ভালবাসা আসিল না, প্রেম দেখা দিল না, শুষ্ক মরুতে পরিবর্ত্তিত হইল মানবহৃদয়।

তখন ব্যাকুল হইল মানব সুন্দরের জন্য। যাহাকে পাইলে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারি, তিনি শুধু ভীতির পাত্র নহেন, ভালবাসা ও প্রেমেরও আধার; তাই সুন্দরের আরতি করিতে যাইয়া আর্য্যঋষি অমরছন্দে শান্ত তপোবনের হোমধূম-সুরভিত সন্ধ্যাকাশ কম্পিত করিয়া, বনস্পতির শাখা-বাহুপল্লবে নবীন স্পন্দন জাগাইয়া, দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের শুষ্কবক্ষে করুণ রাগিণীর সৃষ্টি করিয়া উদাত্তঝঙ্কারে গাহিলেন—"পিতা নোঽসি"।

বর্ষশেষের বিদায়দিনে সেই সুন্দরের চরণে আত্মনিবেদন করিতে মানব ব্যাকুল হইয়া উঠে। মানব মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারে ভগবান যদিও অখিল বিশ্বচরাচরের অধিপতি, অণুপরমাণু হইতে অগণিত সৌরমণ্ডল পর্য্যন্ত তাঁহার আজ্ঞায় পরিচালিত, তিনি রুদ্র—কিন্তু তাহা হইলেও তিনি যে আমাদের পিতা, তখনই রুদ্র বিরাটের হৃদয়ে যেমন পিতার সুন্দর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, ভয়ের স্থান ভালবাসা অধিকার করে। আর অমনি "পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য" বলিয়া ভগবানের চরণকমলে লুটাইয়া পড়িবার জন্য ছুটিয়া যায়।

সংসারে সংসারী লোক বর্ষশেষে সমগ্র বর্ষের হিসাবনিকাশ করে, লাভ-লোকসান খতাইয়া দেখে। আজ বর্ষশেষে আমাদের জীবনের কর্ম্মসমষ্টির হিসাব নিকাশের প্রয়োজন হইয়াছে। বাস্তবিক, আমরা পরম পিতার নিকট হইতে বর্ষের প্রথমে যে মূলধন পাইয়াছিলাম, তাহার কতখানি সদ্ব্যয় করিতে পারিয়াছি, কতখানি বা বাজে খরচ করিয়া অধঃপাতের পথে নামিয়া চলিয়াছি, তাহা ঠিক করা দরকার। মহাজন যেমন দেখে সে তাহার পুঁজি বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে কি না, কাহার নিকট কত দেনা বা পাওনা রহিয়াছে, আজ আমরাও সেইরূপ দেখিতে চাই, দয়াময় পরম পিতার অনুশাসনবাণী মস্তকে ধারণ করিয়া আমরা যে তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে চলিব বলিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, তাহার কতখানি করিতে সমর্থ হইয়াছি,—কবে কোন্ দিবসের মাহেন্দ্র ক্ষণে পরব্রহ্মের করুণাধারা হৃদয়কন্দরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে শাশ্বত অমৃতলোকের আস্বাদ অনুভব করাইয়াছে; আবার কবে কোন্ তিমিরাবৃতা দুর্য্যোগময়ী শ্রাবণরাত্রির মধ্যভাগে আমরা দুর্ব্বলমুহূর্ত্তে পরব্রহ্মের অনুশাসনবাণী বিস্মৃত হইয়া সংসারের মায়ামোহে গা ঢালিয়া দিয়াছিলাম—আজ একটি-একটি করিয়া সাংসারিক ব্যবসায়ীর মত আমাদের এই বৎসরের কর্ম্মসমষ্টির আলোচনা করিতে হইবে, দেখিতে হইবে আমরা কোন্ দিকে অতিরিক্ত পরিমাণ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছি; সত্যই কি আমরা পরব্রহ্মকে জীবনের সার বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন পূর্ব্বক সংসারে যাহা কিছু কর্ত্তব্য সকলই তাঁহার আশীর্ব্বাদ বলিয়া মস্তকে ধারণ করিয়াছি, না সংসারের পাপকলুষিত প্রলোভনে মুগ্ধচিত্তে বিষয়তৃষ্ণার লালসায় আত্মহারা হইয়াছি; আঘাতের পর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি, তবু আমাদের চেতনা হয় নাই; উষ্ট্র যেমন কণ্টকতরু ভক্ষণ করিয়া মুখ ক্ষতবিক্ষত হইলেও কণ্টকতরুর মোহে মুগ্ধ হইয়াই থাকে,—নিজেকে সামলাইতে পারে না, আমরাও যে তেমনি ইন্দ্রিয়ের আপাতমনোরম বস্তুনিচয়ের মধ্যে সুখের সন্ধান করিয়া মরীচিকাভ্রান্ত পথিকের মত কষ্ট পাইয়াও উহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি নাই! আজ বর্ষশেষে, সত্যসত্যই আমাদের সেই হিসাবনিকাশের দিন—আজ আমাদিগকে দেখিতে হইবে, উপলব্ধি করিতে হইবে প্রাণে প্রাণে পরব্রহ্মের করুণা এই বৎসরের মধ্যে আমাদিগকে তাঁহার চরণতলে কতদূর টানিয়া না নিয়াছে; কতদূর আমরা প্রতি কার্য্যে, প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি নিঃশ্বাসে, ধমনীর স্পন্দন-

তাদে পরব্রহ্মের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া সংসারের অন্ধ কুসংস্কারের, লোভ-মোহের, অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছি। যদি প্রতি কার্য্যের বিচারে দেখি, সত্য সত্যই প্রাণের মধ্যে ব্রহ্মভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সত্যের পূজায় উৎসর্গীকৃত-জীবন আমরা—সংসারের প্রলোভনে ভুলি নাই, মোহের বাঁধনে আত্মহারা হই নাই, নবযৌবনের তেজে অসত্যের বিরুদ্ধে, প্রচলিত কুসংস্কার ও মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া পরব্রহ্মের সত্যমূর্ত্তির পূজা করিতে সমর্থ হইয়াছি; তবেই বুঝিব—এই বৎসরে আমরা প্রকৃতই লাভবান হইয়াছি, আমাদের মূলধন কমে নাই, বৃদ্ধিই পাইয়াছে; সার্থক হইয়াছে এই বৎসর। আর যদি দেখি, ক্ষণিক দুর্ব্বলতায় আচ্ছন্ন-চিত্ত আমরা মিথ্যাচারের আপাত-মনোরম কোমল আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করিয়া সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মের পূজা করিতে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছি, সাময়িক যশ-মান-সুখ্যাতির প্রলোভনে সত্যপথচ্যুত হইয়া কুসংস্কারের পঙ্কিলপল্বলে অবগাহন করিয়াছি, তবেই বুঝিব আমাদের মূলধন খোয়াইয়া ফেলিয়াছি, জমার ঘরে শূন্য দিয়া খরচের ঘরে ষোল আনা ঢালিয়া দিয়াছি; বৃথা হইয়াছে আমাদের এবৎসর।

বর্ষশেষের শান্তমঙ্গল মুহূর্ত্তে আরও একটি কথা মনে পড়ে—জীবনের সমস্ত বর্ষগুলিই যদি এমনিভাবে ব্যর্থতার সিন্ধুজলে ঢলিয়া পড়ে, বাস্তবিক যে মহান্ উদ্দেশ্যের বশ-বর্ত্তী হইয়া আমরা পরম পিতার নিকট হইতে এই সংসার-পথে পদার্পণ করিয়াছিলাম, যদি তাহা সাধন না করিয়া ক্ষণিক সুখভোগে ডুবিয়া থাকি, আপাতসুন্দরের জন্য লালায়িত হইয়া শাশ্বতসুন্দরকে বিস্মৃতির অনন্ত অতলে নিক্ষেপ করি, তবে ব্যর্থ মানবজীবনের উৎপত্তি, ব্যর্থ মানবজীবনের পরিণতি। যেদিন এই সৌর-করোজ্জ্বল ধরণীর সমস্ত সুষমা নয়নের পুরোভাগে অন্ধকারে আবৃত হইয়া যাইবে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিকল হইতে বিকলতর হইয়া অভীষ্ট কার্য্যসাধনে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিবে, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যেদিন পড়িয়া থাকিবে এই ধূলিমলিন মর্ত্তলোকে, আর আমি যাত্রা করিব—কোন্ অজানা রাজ্যে,—সেদিন মনে হইবে—কি করি-লাম এই জ্ঞানবৈরাগ্য-শ্রী-বিমণ্ডিত মানবজীবনে, কি করিলাম এই অনন্ত শক্তির আধার মানবদেহ ধারণ করিয়া? তখন মনে হইবে আমার মত হতভাগ্য জগতী-তলে কেহই নাই, কাচের বিনিময়ে কাঞ্চন দিয়া আমি রিক্তহস্তে ঘরে ফিরিতেছি!

জীবনের শেষদিনে ব্যর্থতার অশ্রুজল সম্বল করিয়া অনন্ত-পথের যাত্রী হইতে না হয়, সেদিন যেন সম্বল-সম্পদ্ সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি। সার্থকতার সফলতায় অপরিসীম আনন্দ বক্ষে ধারণ করিয়া জীর্ণ বস্ত্রের মত এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া পরম পিতার চরণতলে উপনীত হইতে পারি এবং মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, হে প্রভো, জীবনে মরণে আমি তোমারি কার্য্য সাধন করিয়াছি, তোমার মঙ্গলবাণী অনুসরণ করিয়া সংসার-গহন-বনে দুর্ভেদ্য তিমিররাশি অতিক্রম করিয়াছি, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে কখনো অসত্যের পূজা করি নাই"। আজ এই বর্ষশেষে সময় থাকিতে থাকিতে আমরা যেন জীবনের সেই শেষ দিনটীর জন্য প্রস্তুত হই; সে দিন যেন জীবনের হিসাবনিকাশ শেষ করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি—

"সাঙ্গ আমার ধূলিখেলা, সাঙ্গ আমার বেচাকেনা;
এসেছি করে হিসেব নিকেশ—যাহার যত পাওনা দেনা;
আজকে আমি শ্রান্ত বড়, কোলে তুলে ওমা নেনা!
যেথানে ঐ অসীম শাদায় মিশেছে ঐ অসীম কালো।"

যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই, যে বর্ষ চলিয়া যাইতেছে—আজ যাহার শেষ দিন—এই বর্ষে বাস্তবিক যদি আমরা সত্যের পূজা না করিয়া মায়া-মোহের পূজা করিয়া থাকি, ভগবানকে ভুলিয়া যশমানপ্রতিষ্ঠায় নিমগ্ন হইয়া থাকি, তবে, এখন আমরা শত দুঃখ-ক্রন্দনে আকাশ বিদীর্ণ করিলেও গত কর্ম্মকে ফিরাইয়া আনিতে পারিব না। ব্যর্থ অনুশোচনায় কোন ফল ফলিবে না। সুতরাং যে গেল, সে চলিয়া যাউক; কিন্তু সম্মুখে অনাগত ভবিষ্যের মধ্য হইতে যে বর্ষ বর্ত্তমানের আকার ধারণ করিয়া আমাদিগের পুরোভাগে উপস্থিত হইতে উদ্যত, সে বর্ষ যাহাতে ব্যর্থ না হয়, সেই বর্ষের মধ্যে যাহাতে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ব্রহ্ম-সাধনা আমাদের প্রত্যেক কার্য্যে সুপ্রতি-ষ্ঠিত হয়, তাহার জন্য আমাদিগের প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন।

হয়ত, সেই বর্ষেও বহু মায়ামোহের প্রলোভন মোহিনী মূর্ত্তিতে আমাদিগকে কুহক-জালে মুগ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইবে, অনেক মিথ্যাচার সত্যপথ ভ্রষ্ট করিবার জন্য, ব্রহ্মের পবিত্র নাম ভুলাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিবে, কিন্তু আমরা যেন তাহাতে না ভুলি, আমরা যেন তাহাতে মুগ্ধ না হই।

আর্য্যঋষি বলিয়াছেন সত্যের পথ কুসুমাবৃত নহে;—উহা "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"। কিন্তু সেই ক্ষুরধার পথে আমাদিগকে বিচরণ করিতে হইবে, প্রথমে তাহাতে যতই কষ্ট হউক না কেন, যতই দুঃখ মনোমন্দিরের রুদ্ধ কবাটে করাঘাত করুক না কেন, যতই দুর্য্যোগময়ী হিমযামিনীর আবির্ভাব হউক না কেন, সত্যের দীপ্ত মূর্ত্তির নিকট সমস্ত দুঃখ সমস্ত কষ্ট একদিন না একদিন মস্তক নত করিবে, মিথ্যার

দুর্যোগ কাটিয়া যাইবে, হাসিয়া উঠিবে প্রাচীর উদয়াচলে গৈরিকবসনা উষার সুন্দর সহাস্য মূর্ত্তি।

সুতরাং সত্য পথে চলিতে গেলে পদে পদে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে বলিয়া ভয় পাইলে চলিবে না, সাহসে বুক বাঁধিয়া পরম করুণাময় পরব্রহ্মের নাম স্মরণ করিয়া কর্ম্ম-সাগরে ঝাঁপ দিতে হইবে, অটল বিশ্বাসের বলে অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতে হইবে। যদি সত্য সত্যই আমরা পরব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁরই নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে আরম্ভ করি, তখন দেখিব, মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট যেমন বিন্ধ্য পর্ব্বত মস্তক নত করিয়াছিল, তেমনি সত্যের দীপ্ত প্রতিভার নিকট মিথ্যার সমস্ত সুষমা ম্লান হইয়া যাইবে, অজ্ঞানতা-কুসংস্কার সূর্য্যোদয়ে তিমির-রাশির মত দূরে পলায়ন করিবে।

বর্ষশেষে আমাদের জীবনে যেন এই শিক্ষা লাভ করিতে পারি, যিনি অনলে অনিলে অসীম নভোমণ্ডলে, নির্ঝরের উচ্ছ্বাসব্যাকুল কলস্বরে, বিহগের কলকূজনে, তারায় তারায় যাঁহার আবাহনগীতি, মানবজীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, সুখ-সৌন্দর্য্য—সবই যেন তাঁহারই দান বলিয়া গ্রহণ করি; প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক বাক্যে, প্রত্যেক পদক্ষেপে যেন হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে তাঁহারই নাম ধ্বনিত হইয়া উঠে নির্জ্জিত করিয়া সমস্ত কোলাহল, দুর্নিবার ইন্দ্রিয়ের ব্যর্থ হাহাকার, কামকামনার তীব্র আর্ত্তনাদ! যেন মনে প্রাণে আকাশবাতাস প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিতে পারি—

"তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুখ,
তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি অনুভব,
তোমারি দুনয়নে তোমারি শোকবারি,
তোমারি সান্ত্বনা শীতল সৌরভ।"

যাঁহারা যুগ-যুগান্তকাল হইতে ব্রহ্মোপাসক, তাঁহাদের শুভাশীর্ব্বাণী আজ এই বর্ষশেষের মঙ্গলমুহূর্ত্তে—আনন্দময় অমৃতময় ব্রহ্মলোক হইতে আমাদের অন্তরে অন্তরে সঞ্চারিত হউক। যাঁহারা সত্যের প্রপূজক, তাঁহাদের চিন্তাধারা আমাদের প্রাণের পরতে পরতে অভয়বাণী বহন করিয়া আনুক।

যে মহাপুরুষ সত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, শত অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাই যিনি জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই মহাত্মা রাজা রামমোহনের অমর আত্মা লোকান্তর হইতে এই বর্ষশেষে আমাদের প্রাণে সাহসের সঞ্চার করুন।

সত্যের দীপ্ত প্রতিভাদর্শনে মুগ্ধহৃদয়ে যিনি সংসারের অগাধ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও ত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন, সত্যের প্রচার যাঁহার মূলমন্ত্র ছিল, সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আজ বর্ষশেষে সত্যের প্রতি আমাদের অনুরাগ বৃদ্ধি করুন।

বর্ষশেষের শান্ত সন্ধ্যায় পরব্রহ্মের উপাসনায় যাঁহারা সমবেত হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বমঙ্গলের আকর, যিনি সমস্ত প্রাণীর একমাত্র আশ্রয়, যিনি "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্" ব্রহ্ম, তিনি প্রত্যেকেরই হৃদয়ে আনন্দের অফুরন্ত ধারা প্রবাহিত করুন; সে আনন্দের অনাবিল প্রবাহে ডুবিয়া যাউক আমাদের যাহা কিছু দুঃখ-শোক, যাহা কিছু অপূর্ণতা সঙ্কীর্ণতা। যেন আগামী বর্ষে আমরা তাঁহারই অভয়বাণী বক্ষে ধারণ করিয়া সংসার-পথে চলিতে সমর্থ হই, তাঁহারই অভীষ্ট কার্য্যসাধন জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। সার্থক হউক মানবজীবন, সার্থক হউক বর্ষশেষের শান্ত সন্ধ্যা, পরব্রহ্মের পুতচরণে এই আমাদের প্রার্থনা।

THE

BRAHMA SAMAJ

OR

HINDU THEISTIC CHURCH: ITS RISE AND PROGRESS.*

[*G. S. Leonard—Late Assistant Secretary to the Asiatic Society of Bengal*]

CHAPTER I.

The foundation of the Brahma Samaj

BY

Raja Rammohan Roy.

1. Brahma Samaj causing change in Hindu community.

A Thoughtful inquiry into the present state of Hindu society cannot fail to attract the attention of the observer to the Brahma Samaj movement, which is causing a rapid and visible change in the manners and customs, the thoughts and actions, of the higher and educated classes of the Hindu Community.

* Mr. G. S. Leonard, once the Assistant Secretary to the Asiatic Society of Bengal, wrote a history of the Brahma Samaj so far back as 1879. The work seems to have been one of love of a generous heart towards the Brahma Samaj. So far as we have seen of the book, it has been on the whole impartially written, the author being a European observer of great learning. We therefore do not hesitate to re-publish it and thus give it a permanent habitation in the Tatwobodhini Patrika.
—Editor, T. Patrika.

2. Rational Monotheism, the source of changes in the Hindu mind leading to a higher standard.

We find a pure spiritual adoration of one only God supplanting the deep-rooted idolatry of the land; a rational monotheism substituted in lieu of a horrible polytheism of millions of fanciful and sensual divinities; prejudices of caste and custom giving place to a more social and liberal feeling; the phantoms of fear and superstition rapidly vanishing at the approach of the substantial realities of truth and reason;—these are all palpable signs of the emancipation of the Hindu mind from the thraldom of superstition which has perverted its intellectual faculties for ages; and proofs of its liberation from the bondage of the most despotic hierarchy ever known in history. They are some of the results of the reformation we are about to relate, and foreshadow the future advancement of the nation to a still higher social, moral, and intellectual standard.

3. The Institution of the Brahma Samaj brings the dawn of Hindu reformation, social and moral.

The Institution of the *Brahma Samaj*, or "Church of the worshippers of the one God," like that of the imperial city of Rome, than which, to use the words of a Roman historian, "no other institution could be more humble and limited at its foundation, and more grand and extensive in its full devolopment," deserves the attention of all men; but more especially of those interested in tracing the advancement of true religion and knowledge among, and the general progress of, a people hitherto sunk in the profoundest and grossest superstition; for, from its establishment dates the dawn of Hindu refo.mation,—both social and moral.

4. The first effect of English Education—indifference to religion—checked by the intervention of Brahmoism.

At the time of its foundation European education has just begun to make some progress among the Natives, and although its influence was speedily felt in helping to remove the deep-rooted prejudices and superstitious notions of the people, yet still numerous proofs can be adduced that its first introduction greatly tended to create among members of the intelligent and educated classes of the people a lamentable atheism and indifference to religion in general. This was the natural result to be expected from the English education afforded in Government Schools, which, whilst sapping the foundation of the Hindu religion, substitued nothing in its place; hence a race of unbelievers sprang up, and these would have increased a hundred fold but for the intervention of *Brahmaism*.

5. Condition of the Hindus before the Brahmic Reformation.

At the period immediately preceding the era of *Brahmic* Reformation, we find that the unsettled state of the country, the degraded condition of the Hindus, as regards their social, religious, and civil concerns, required the energies and talents of highly gifted minds for the introduction of order and reform. The reform so necessary and so important had, no doubt, been hindered in its execution by the then existing state of things in almost every department. A change, however, was at hand, and the beginning of the 19th century ushered in the golden age of the progress of India and her people.

6. Advent of Raja Rammohun Roy.

It was then that Râjâ Ram Mohun Roy, a man eminently fitted to guide and instruct, established the *Samaj*, and verified the observation of Cousin that, "God sends special Agents when circumstances are ripe for their advent." This man, endowed with much learning and rare wisdom, and strongly imbued with anti-idolatrous opinions by the study of the works of Arabian Scholars and Vedantic philosophers, came forward as a champion to battle against erroneous belief and religious corruption, and, single-handed, maintained successfully his position against all comers.

7. The first stages of the Brahmo Samaj.

The *Brahma Samaj* was originally established in the house of its founder, and held its hebdomedal meetings among a few friends assembled for the purpose of deliberating on the best plans to be devised for the emancipation of their countrymen from the thraldom of idolatry and pernicious

customs by which they were held in degradation in the eyes of the civilised world. Confident of the truth of the maxim *Magna est veritas et prevalebit,* corresponding to the saying in the *Mundak Upanishad, Satyameva Jayate,* the benevolent members removed the *Samàj* to a small house in a more conspicuous locality, where it was consecrated to that end. The weekly lectures which were delivered in this little chapel soon began to attract public attention. The press also proved instrumental in disseminating their doctrines among the learned, and among people situated beyond the reach of the *Samâj* and gradually the *Samáj* began to gain ground among the people, and to extend the arena of its labours.

8. History of the Brahma Samaj is the History of allround reformation of the Hindu Society.

The history of the *Brâhma Samáj* is not so much the narrative of any particular sect or religious order as it is that of a general reformation of the condition of the Hindus in all that relates to their spiritual social, and moral concerns.

The tract entitled "*Bràhmaism is no Sectarianism,* written by a leading member of the *Samàj,* fully corroborates this statement ; and the omission of Dr. Wilson who was an eye witness of the establishment of the *Samâj*, to include it among the religious orders mentioned in his "*Sketches of Hindu Sects,*" is sufficient proof of its being no sectarian schism or innovation. We are further justified, upon the testimony of two well-known authors, both reliable authorities on India matters, Drs. Duff and Wilson, to style the 'History of the *Brâhma Samàj* the "*History of* a Reformation," rather than the history of a sect. The former calls the founder of the *Sàmaj* the Luther of his country, and the latter styles him "the reviver of Sankara's doctrines."

9. Rammohan Roy believed in the religious reformation as the groundwork of all other reforms.

A religious reformation was believed by the founder of *Samaj* to be the groundwork of reform in all other matters. In his opinion, it is the religion of a people which forms the *primum mobile* of their conduct in every concern of life, and where there exists an error in the first principles of faith and creed, the whole fabric must sooner or later totter and fall to the ground. This applies more especially to the Hindus, as their religion forms the basis of all their laws, manners, and customs, and hence the tenacity with which this branch of the Aryan race cling to those laws and customs.

10. The religion as preached by members of the Somaj was claimed to be that contained in the Upanishads.

Deeply impressed with a conviction of this truth, the members of the *Samaj* remodelled and restored the religion of the country to its pristine state of purity ; inculcated the lofty doctrine of divine Government, and taught men their moral obligations to themselves and their fellow creatures. This religion the *Brahma* claims to be purely orthodox and catholic, and of indigenous growth, without any foreign element, being contained in the *Vedas* and *Upanishads* It is a resuscitation of the monotheistic doctrines inculcated in the real *Vedanta* that is the *Upanishads* which form the sum and conclusion of the *Vedas* and a purification of the Hinduism from *Puranic* corruption.

11. Brahmoism is the restoration of the Primary spiritual worship of God.

It is well known to the student of the *Vedas* that the early religion of the Aryans was purely monotheistic which degenerated afterwards through the influence of the *Puranas* to the form of Pantheism or warship of visible nature, and ultimately became degraded to gross idolatry. *Brahmaism*, then, is the restoration of the primary spiritual worship of God, which was almost for ages obliterated by idolatry, and which was only known to, and professed by ascetics and *jogis* in their caves and forest retreats, till revived by Sankara, and preached among the masses in a reformed shape, by the *Brahmo Somaj.*

12. It is a movement from within that worked the wonderful reform needed for ages.

For many centuries had the Hindu

people laboured under the dominion of a powerful and crafty priesthood and of an idolatrous and debased religion. Since the growth of the different systems of philosophy caused by the important apostacy of Buddhism, we read of the continual efforts of patriotic reformers to liberate their countrymen from the superstitious idolatry imposed upon them by the priesthood. The struggles of a Dadu, Kabir, Nanak, Chaitanya, and many other reformers in different parts of India, then and in modern times, proved altogether abortive, although they gave out that they were possessed of superhuman powers. It is true that for a time they made many converts, and had their devoted followers, but their disciples were from among the vulgar and ignorant, the higher and educated classes remaining steadfast in their Brahminical faith. In vain did the haughty Moslem endeavour to strike at the root of Hindu idolatry, by destroying temples dedicated to various divinities, and slaying many of their priets ; its structure was too strong to yield to even the powerful arguments of fire and steel. The persuasive eloquence of the preachers of the Gospel has up to the present time secured but few proselytes from among the higher and educated classes of the people, and Brahmanism would have still perhaps laughed its assailants to scorn had not this movement from within worked the wonderful reform which was so much needed, and had been so successfully resisted for ages.

13. Difficulties in its propagation.

To those acquainted with the narrow-minded tenacity of the Hindu in his polytheism, the difficulties of establishing an institution for social and moral reform will be fully appreciated. The priesthood were not slow to perceive that its success boded their downfall. The people were loth to renounce a religion, and habits, customs, and ceremonies, which had been handed down to them by their ancestors from remote ages. The obstacles to be overcome appeared at first insurmountable. The active hostility of the priests and the passive resistance of the people hindered, at the outset, its rapid develepment and circumscribed its circle of operations.

14. R. M. Ray's perseverance overcame all obstacles.

But Raja Ram Mohun Ray was not a man to be easily daunted by obstacles. He was a high caste Brahman. He was rich, and he was firmly convinced of the fact that nothing but a religious reformation, nothing but a return to the ancient, pure, and simple religion of his country, would help to reclaim his countrymen from the gross idolatry into which they had fallen. Deeply impressed with this idea he persevered, and the results of that perseverance we are now about to narrate.)

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

আকুল পরাণ।

হাম্বীর—পটতাল।

আমার পরাণ ধায়্—ধায়্ তোমারি পানে
গোপনে মরম ব্যথা লয়ে আছি একা হেথা
আকুল পরাণে।
তুমি আছ কোন্ দূরে জ্যোতির্ম্ময় কোন্ পুরে
আমার কাতর ডাক পশে নাকি কানে ?
নীরবে প্রভু তোমায় আঁখি ঝরে শতধার—
বাধা নাহি মানে।
কবে আসি দিবে দেখা মধু রূপে প্রাণসখা
চৌদিকে উঠিবে ভরি' তব জয়গানে।

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী।

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
I র্সা র্সা। না ধা I পক্ষা পক্ষা। গা মা I ধা -া। ধা না I নধা র্সা। র্সা র্সা I
আ মা র প রা০ ০০ ০ ণ ধা র্ ধা র্ তো০ মা রি পা

১´ ০
I নর্সর্রা র্সা। নধা পক্ষাপা II
০০০ নে ০০ ০০০

০ ১´ [গপা] ০ [ক্ষধা] ১´ ০ ১´ ০
। গা গা I রা গমপা। পা ক্ষপধা I পক্ষা ধপপা। -া রা I গা মা। গমধা পা I
গো প নে য০০ র য০০ ব্য০ থা০০ ০ ল রে আ ০০০ ছি

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
I মা গরা। নরা সা I র্সা র্সর্রর্গা। র্রা র্সা I না ধনধা। ধপা ক্ষপধা II
এ কা০ হে০ থা আ ০০০ কূ ল প রা০০ পে ০০

০ ১´ ০ ১´ ০ ১´ ০ ১´
। {পা ধা I পা র্সা। র্সা -া I র্সা র্সা। র্সনা ধা I র্সা র্রা। র্সা নধা I না ধপপা} ।
তু মি আ ছ কো ন্ দূ রে জ্যো০ তি র্ম য় কো০ ন্ পু রে০০

০ ১´ ০ ১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
। র্গা র্গা I র্গা র্গর্মা। র্রা র্রা I র্সা -া। গা মা I পা ধা। পধা পর্সা I র্সা নধা। পক্ষা পা II
আ মা র কা০ ত র ডা ক্ প শে না কি কা০ ০০ নে ০০ ০০ ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
। {গা গা। রা গপা I পা ক্ষপধা। পা -া I মা গা। রা রা I ম্‌রা রা। সা -া} I
নী র বে প্র০ ভু তো০০ মা র্ আঁ খি ঝ রে শ ত ধা র্

১´ ০ ১´ ০
I র্সা র্সর্রর্গা। র্রা র্সা I না ধনধা। ধপা -া I
বা ধা০০ না হি মা ০০০ নে ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০ ১´
I {পা ধা। পা র্সা I র্সা র্সা। র্সা র্সা I র্সনা ধা। র্সনা র্রা I র্সা নধা।
ক বে আ সি দি বে দে খা ম০ ধু রূ০ পে প্রা ণ০

০ ১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
। না ধপপা } I পা র্গা। র্গা র্গা I র্গর্মা র্রা। র্রা র্সা I র্সা -া। গা মা I
স খা০০ চো০ খি কে উ০ ঠি বে ভ রি ০ ত ব

১´ ০ ১´ ০
I পা ধা। পধা পর্সা I র্সা নধা। পক্ষা পা IIII
জ য় গা০ ০০ নে ০০ ০০০

তিনখানি চিঠি।*

(১)

কৃষ্ণনগর;
৩০শে আষাঢ়, ১৭৮৫ শক।

অসংখ্য নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদনমিদং,

মহাশয়ের ২৩শে আষাঢ়-দিবসীয় লিপি প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। 'ঘুর্ণি' ব্রাহ্মসমাজের গৃহ-নির্ম্মাণ বিষয়ে যে কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অতি যথার্থ বোধ হইল। কিন্তু উক্ত কার্য্যসাধনে ঘূর্ণিস্থ ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহ-অনল নির্ব্বাপিত না করিয়া যাহাতে সামান্যাকারে একটী গৃহ প্রস্তুত হয়, তজ্জন্য যত্নশীল হওয়া বিধেয় মনে করিতেছি। পুঁটুরিয়াবাসী শ্রীমতিলাল বসু ও শ্রীচুণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা কৃষ্ণনগরে আসিয়াছেন। তাঁহাদের সংসর্গে সম্প্রতি পরম প্রীতি-লাভ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত রামতনু লাহিড়ী মহাশয় আপনাকে নমস্কার জানাইয়াছেন। প্রেমাস্পদ নিমাই বাবু এখন কেমন অবস্থায় আছেন? সারদাবাবুর পত্রে তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাদৃশ আর অনুরাগ নাই অবগত হইয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইয়াছি। রসা হইতে (টালিগঞ্জের নিকট) 'বেহালা' সমাজে কেহ কি উপস্থিত হইয়া থাকেন? মান্যবর শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মিত্র মহাশয় এখানে আসিয়াছিলেন। 'ঘুর্ণি' সমাজের গৃহনির্ম্মাণে সাহায্যপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় তাঁহার নিকট আমরা কয়েকজন গমন করিয়াছিলাম। তিনি শারীরিক অসুস্থতা হেতু গবর্ণমেণ্টে দুই মাস ছুটীর আবেদন করিয়াছেন। ছুটী প্রাপ্ত হইলে কৃষ্ণনগরে আসিয়া অবস্থিতি করিবেন। সেই সময় ঘুর্ণিসমাজে গমন ও সাহায্যদান করিবেন স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার নিকট ব্রজবাবু সংক্রান্ত সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছি। ধার্ম্মিকবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের এখানে আসিবার প্রস্তাবনা আছে জ্ঞাত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। তিনি কিছুদিন অবস্থিতি করিলে যে এখানকার প্রভূত মঙ্গল হইবে তাহাতে সংশয় নাই। কেশববাবুর তাঁহার পিতৃব্যের সহিত কিরূপ চলিতেছে? বিষয়বিভাগের কি হইবে? সারদা বাবুকে একখানি পত্র লিখিয়াছি, তিনি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না জানিতে পারিলাম না। তাঁহার কোন বিষয় কর্ম্ম হইয়াছে কি না? শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীরাম বাবুকে (বেহালা-ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব সম্পাদক) আমার কোটী কোটী নমস্কার জ্ঞাত করিতে আজ্ঞা হইবে। শ্রীযুক্ত চুণিলাল বাবুর মুখে পুঁটুরিয়ার নির্ম্মল বাবুর ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে অনুরাগের কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। অম্বিকা বাবু কেমন আছেন? নিবেদনমিতি।

আপনার অনুগত শিষ্য—শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(২)

ইং ১৮৬৩, ১৩ই জুলাই।

অসংখ্য নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদনমিদং,

মহাশয়ের পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়া যারপর নাই আনন্দ লাভ করিয়াছি। 'কৃষ্ণনগর'-ব্রাহ্মসমাজ উত্তমরূপ চলিতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা লোকসংখ্যা অধিক দৃষ্ট হয়। কলেজের ছাত্রের মধ্যে কেহ কেহ আমাদের ধর্ম্মে অনুরাগী হইয়া উঠিতেছেন। সে দিবস Second yearএর একটি ছাত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। সমাজের উন্নতিকল্পে এই দুটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে:—প্রথমতঃ প্রতি সমাজে বক্তৃতা, দ্বিতীয়তঃ সঙ্গীত। এক্ষণে আমরা কয়েকজন ব্রাহ্মভ্রাতায় মিলিত স্বরে গান করিতেছি (নগেন বাবু গান করিতে জানিতেন)। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস সকলে ভাল জানেন না। সেই জন্য ঈশ্বরের প্রতি আত্মা কিসে উন্নত হয় অথচ ব্রাহ্মদের মত ও বিশ্বাস সকলে সুন্দররূপে জানিতে পারেন, এইরূপ উপদেশ দিতে হইবে। 'ঘুর্ণি' সমাজ এক প্রকার চলিতেছে। বেহালার ভ্রাতৃসকলকে আমার নমস্কার জানাইতে আজ্ঞা হইবে। প্রিয়তম অম্বিকা ভায়া এখন কি করেন? মহাশয়! আপনি আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, আর আমি এত অধিক দিন পত্র না লিখিয়া যেরূপ অভদ্রতা প্রকাশ করিয়াছি, তাহা এক্ষণে মনে করিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে হইতেছে। আমি আপনার অনুগ্রহের উপযুক্ত পাত্র নহি।

পুঁটুরিয়ার ভ্রাতৃগণ কেমন আছেন, নির্ম্মল বাবু এখন কি করেন, তাঁহাদের সেই সমাজটি কেমন চলিতেছে জ্ঞাপন করিবার আজ্ঞা হইবে। ('বেহালা' হইতে দুই মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে আদি গঙ্গার পার্শ্বে নির্ম্মল বাবু প্রমুখ কয়েকজন অনুরাগী উপাসক শ্রদ্ধেয় আচার্য্য বেচারাম বাবুর নিকট হইতে আলোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করেন, পরে তাহা উঠিয়া যায়।) ইছাপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আপনাকে প্রণাম জানাইতেছেন, আপনি ইঁহার শিক্ষা মহাশয়।

আমি বোধ হয় আপনার প্রতি এপ্রকার হীনস্বভাব-সুলভ অসৎ আচরণ করিব না। আমার ঘৃণিত ব্যবহার দেখিয়া আপনার শেষ পত্রে যে কয়েকটি হৃদয়ভেদী কথা বলিয়াছেন, তাহা অনলের ন্যায় আমার মনকে দগ্ধ করিতেছে। মহাশয়, আপনার তুল্য আমার

---

* মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনীলেখক ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার যৌবনের প্রারম্ভে বেহালাব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য ৺বেচারাম চট্টোপাধ্যায়কে যে কয়খানি পত্র লিখেন, তাহার মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত তিনখানি পত্র চিন্তামণি বাবুর [illegible] সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হইল। [illegible]

হিতকাঙ্গী আর কেহ নাই। কিন্তু আমার তুল্য অকৃতজ্ঞ আর কেহ নাই। আমার অতীব ক্ষুদ্র ও নিতান্ত হীন মন। আমি আপনার অনুপযুক্ত শিষ্য। আমিও নিতান্ত হতভাগা। আমাতে আর কোন পদার্থ নাই। আপনি মধ্যে মধ্যে পত্র দ্বারা উপদেশ দিয়া সাধুর কার্য্য করিবেন। নিবেদনমিতি।

অনুগত শিষ্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(৩)

২৩এ ভাদ্র, ১৭৮৫ শক।
(ডাকের ছাপ—১৮৬৩, ৬ই সেপ্টেম্বর)

অসংখ্য নমস্কারপূর্ব্বকনিবেদনমিদং,

মহাশয়ের প্রেরিত 'স্তোত্রমালা' (বেচারাম বাবুর রচিত) প্রাপ্ত হইয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। কি বাক্যে যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব জানি না! 'কৃষ্ণনগর' সমাজ উত্তমরূপ চলিতেছে। 'ঘূর্ণি' সমাজের বড় দুর্দশা! আমি তথায় নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইতে পারি না। উক্ত সমাজের একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম স্থানান্তরিত হইয়াছেন। যাহা হউক, ভবিষ্যতে যদি পারি তবে ইহার স্থায়ীত্বের ও উন্নতির চেষ্টা দেখিতে হইবে।

সমাজ এক্ষণে কেমন চলিতেছে? আপনি শারীরিক কেমন আছেন লিখিতে আজ্ঞা হইবে। ভ্রাতৃগণকে অনুগ্রহ করিয়া আমার নমস্কার জানাইবেন। কোন বন্ধুর পত্রে সারদাপ্রসাদ বাবুর সমাচার অবগত হইয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি। (সারদা বাবু বেহালা ব্রাহ্মসমাজের একজন সভ্য ছিলেন ; তিনি শ্রদ্ধেয় আচার্য্য ৺বেচারাম চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক দীক্ষিত হন।) নিমাই বাবু কেমন আছেন জানিতে ইচ্ছা করি। নিবেদনমিতি।

অনুগত শিষ্য—শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থপরিচয়।

(শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি. এস্-সি)

আমরা গুরুকুলসমিতি এবং পুপুনকী-গুরুকুল ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পরমহংস শ্রীমৎস্বামী স্বরূপানন্দ প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম।

(১) পথের প্রদীপ, (২) সাধকের বাণী, (৩) পথের সন্ধান, (৪) পথের সম্বল, (৫) পথের সাথী, (৬) কর্মের পথে—প্রত্যেকটির মূল্য ছয় পয়সা। (৭) আপনার জন—মূল্য লেখা নাই, (৮) স্বামীজীর পত্র—মূল্য দশ আনা, (৯) সংযমসাধনা বা বীর্য্যক্ষয়ের প্রতীকার—মূল্য আট আনা, (১০) বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য—মূল্য এক টাকা, (১১) সরল ব্রহ্মচর্য্য,—মূল্য তিন আনা। স্বামী সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে আমাদের দেশের অবনতির মূল কারণ যে ব্রহ্মচর্য্যহীনতা তাহা উপলব্ধি করিয়া সেই পাপ হইতে দেশকে মুক্ত করিবার ইচ্ছাতেই এই সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে সরল সবল ব্রহ্মচর্য্যের বাণী—অনন্ত উন্নতির বাণী উদ্ভাসিত হইতেছে। দেশবাসীকে—বাঙ্গলার প্রত্যেক পিতামাতাকে আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা স্বামীজীর এই সকল গ্রন্থ ক্রয় করিয়া স্বীয় স্বীয় পুত্রকন্যার হস্তে প্রদান করুন। এই-জন্য অর্থব্যয় বৃথা হইবে না—ইহার প্রত্যেক পাইপয়সাটী পর্য্যন্ত সন্তানগণের মানসিক ও শারীরিক উন্নতির আকারে সার্থক হইয়া উঠিবে। বর্ত্তমান চরিত্রহীনতার দিনে—যখন সাহিত্যে রাষ্ট্রে সমাজে, সর্ব্বত্রই নীতিহীনতা রাজত্ব করিয়া আমাদের দেশের সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণকে ধ্বংসের অতলগহ্বরে লইয়াযাইতে চেষ্টা করিতেছে, তখন এই দুর্দ্দিনে এরূপ গ্রন্থের উপযোগিতা যে কত অধিক তাহা না বলিলেও চলে। এই গ্রন্থগুলির বিশেষ গুণ এই যে, স্বামীজী ব্রহ্মচর্য্য লইয়া আলোচনা করিলেও যে অশ্লীলতার ভয়ে বর্ত্তমান বাঙ্গালী পিতামাতা "ব্রহ্মচর্য্য" শব্দ উচ্চারণে লজ্জিত হন, সে অশ্লীলতার বিন্দুমাত্রও এই সকল গ্রন্থে নাই। ইহা দ্বারা শুধু যে সন্তান-সন্ততির উপকার হইবে তাহা নহে, আমরা মনে করি অনেক পিতামাতাও এই সকল গ্রন্থপাঠে উপকৃত হইবেন।

এই সকল গ্রন্থ পাঠে স্বামীজীকে আমরা বলিতে চাই যে, মাত্র এই কয়েকটি গ্রন্থ দ্বারা আমরা তৃপ্ত হইতে পারি নাই—আরও চাই,—আরও চাই। ভগবান স্বামীজীকে জয়যুক্ত করুন।

এই সকল গ্রন্থের সমুদয় আয় পুপুনকী গুরুকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের উন্নতিকল্পে ব্যয় করা হইবে। গ্রন্থসমূহের প্রাপ্তিস্থান—গুরুকুলসমিতি; ১৩ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা এবং পুপুনকী গুরুকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। গ্রাম পুপুনকী, পোঃ—চাস। মানভূম।

Profitable Industris—By An Industrial Expert. Published by Industry Book Depot Keshub Bhaban, 22 Shambazar Bridge Road, Calcutta. মূল্য ১৷৹।

এই ইংরাজী পুস্তকখানিতে আমাদের দেশের উপযোগী অনেকগুলি সহজসাধ্য দ্রব্য প্রস্তুতের কথা বলা হইয়াছে। যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত দ্বারা

বিদেশীগণ আমাদের ধনশোষণ করিয়া লইতেছে, গ্রন্থকার সেইরূপ কতকগুলি সহজসাধ্য দ্রব্য প্রস্তুতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সূচীপত্র হইতেই পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন। ব্রস্, দড়ি, কাতা, টুপী, সিগার, বিড়ি, লজেন্‌জেস্, সোডালেমনেড প্রভৃতি পানীয়, চুষ্‌শর্করা, চশমার কাঁচ বা লেন্‌স, পিরীষ কাগজাদি ও মানচিত্র এবং গোলক বা গ্লোব প্রস্তুতের বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে। পাঠকগণ দেখিবেন, ইহার অধিকাংশই বিলাতী সভ্যতার সহিত আমাদের দেশে আসিয়াছে এবং ঐ সকল সামান্য দ্রব্যের মধ্য দিয়া বিদেশীগণ আমাদের কত অর্থই না লুটিতেছে। গ্রন্থকার বাঙ্গলার ছেলেদের এইসকল অর্থকর ব্যবসায়ে চক্ষু ফুটাইবার জন্যই ইহা লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থের বাঙ্গলা সংস্করণ দেখিতে পাইলে আমরা আনন্দিত হইব। আমরা প্রত্যেক ইংরাজী শিক্ষিতের হস্তে এই পুস্তক দেখিতে ইচ্ছা করি। গ্রন্থের ছাপা সুন্দর, ভাষা সহজ। গ্রন্থকারের এই সকল ব্যবসায়বর্ণনার ক্ষমতা আছে। আমরা গ্রন্থকারের নিকট হইতে এই ধরণের আরও গ্রন্থের আশা রাখি। এই গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা গ্রন্থকার বাঙ্গলার ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

জাতিভেদ—মূল্য চারি আনা। **ব্রাত্যসংস্কার-ব্যবস্থা**—মূল্য তিন আনা। শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার প্রণীত এবং শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড সন্স, কটন লাইব্রেরী, ঢাকা হইতে প্রকাশিত।

গ্রন্থকার এই দুই গ্রন্থে যথাক্রমে জাতিভেদ ও পতিত ব্রাহ্মণগণের গায়ত্রী পুনর্গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার নিপুণতার সহিত দেখাইয়াছেন যে ব্রাহ্মণের পুত্র যত অপকর্ম্মই করুক না, চিরকাল ব্রাহ্মণ থাকিবে এবং শূদ্রের পুত্র সৎকর্ম্ম করা সত্ত্বেও শূদ্রই থাকিবে, তাহা শাস্ত্রের বিধান নহে।

ব্রাত্যসংস্কার-ব্যবস্থায় তিনি পতিত ব্রাহ্মণগণের পক্ষে গায়ত্রীলাভার্থে শাস্ত্রানুযায়ী প্রায়শ্চিত্তের বিধান উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মহারাজা সীতারাম—(ঐতিহাসিক নাটক)—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত ও গোবিন্দধাম, আগদীঘা, রাজসাহী হইতে প্রকাশিত। গ্রন্থের মূল্য লেখা নাই।

নাটকটির বিষয়ে আমরা ভূমিকালেখকের সহিত একমত যে "এই জাতীয় উদ্দীপনার যুগে সুরেশবাবুর সীতারাম সার্থক ও সময়ানুকূলই হইয়াছে।" ইহার অতিরিক্ত আমাদের আর কিছুই বলিবার নাই। আমরা আশা করি, নাটকটি নাট্যামোদীদের সন্তোষবিধান করিবে।

আত্মজীবনস্মৃতি—শ্রীনীলমণি চক্রবর্ত্তী (প্রচারক—সাধারণব্রাহ্মসমাজ) প্রণীত। প্রবাসীকার্য্যালয় ১২০।২ আপার সর্কুলার রোড কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

এই গ্রন্থটী গ্রন্থকারের আত্মজীবনস্মৃতিরূপে লিখিত হইলেও খাসিয়াজাতির উন্নতিকল্পে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাবলীর এক অধ্যায় বলিলেও চলে। ইহা হইতে তৎকালীন ব্রাহ্মপ্রচারকগণের স্বার্থত্যাগ, ব্রতপালনার্থে কষ্ট স্বীকার ও নির্ভরশীলতার সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।

Keshub as Seen by his opponents—Compiled By G. C. Benerji. প্রকাশকের নাম নাই, মূল্যও লেখা নাই।

এই গ্রন্থে গ্রন্থকার ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে কে কিভাবে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের রচনা ও বক্তৃতা উদ্ধৃত করিয়া তাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। গ্রন্থটি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম, তবে দুইটি বিষয়ে আমরা গ্রন্থকার মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি—

(১) তাঁহার "opponents" শব্দব্যবহারে আমরা আপত্তি করি, কারণ অন্যদের বিষয়ে বলিতে না পারিলেও মহর্ষির বিষয়ে বলা যায় যে, তিনি কখনই ব্রহ্মানন্দের "opponent" ছিলেন না। পিতাপুত্রে মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহারা পরস্পরের "opponent" বা প্রতিদ্বন্দ্বী নহেন। আমরা যতদূর জানি, গ্রন্থকার অন্যান্য যাঁহাদের রচনা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহারাও ব্রহ্মানন্দের "opponent" বা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না।

(২) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্বন্ধে পরিশিষ্টে যে সকল পত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা না করিলেই গ্রন্থটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

God and his Visions—By Sj B. M. Das, M.A. Published By Sj B. M. Dass from 10 A, Sreenath Das, Lane, Calcutta. দাম লেখা নাই।

এই ইংরাজী গ্রন্থটীতে গ্রন্থকার নানাদেশীয় মহাজনগণের ভগবানের ধারণার বিষয়ে আলোচনাপূর্ব্বক দেখাইয়াছেন যে, সকলেই একই ভগবানকে বিভিন্ন প্রণালীতে মনন করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি দেখাইয়াছেন যে, বুদ্ধ ভগবানের বিষয়ে নীরব থাকিলেও নাস্তিক ছিলেন না; এবং সকল দেশের সকল সাধুর মতেই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় হৃদয়ের বিশুদ্ধিসাধন।

শ্রীকে না. ঠা.

হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা ও অব্যর্থ ঔষধ নির্ব্বাচন—ডাঃ শ্রীঅরুণোদয় মুখোপাধ্যায়, এল-এম-পি প্রণীত। ২য় সংস্করণ। প্রকাশক—ডাঃ এস, সি, মুখার্জ্জি এম-ডি (হোমিও)—৮৩১ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ১৩৬৪ পৃঃ। মূল্য ৭॥০ টাকা মাত্র।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯২৭এ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের সমালোচনায় আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করিয়াছিলাম। আমাদের সেই কামনা সফল হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। এই নাটক নবেল প্লাবিত দেশে এত অল্প সময়ের মধ্যে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ হওয়াই ইহার উপকারিতা ও জনপ্রিয়তার প্রমাণ। ইহা কেবল চিকিৎসকদিগের নহে, আমার ন্যায় অব্যবসায়ী গৃহস্থেরও অত্যন্ত উপকারে আসিবে। ইংরাজী বর্ণমালা অনুসারে ঔষধের সূচী দেওয়া হইয়াছে। তদনুসারে রোগেরও একটী বর্ণানুক্রমিক সূচী দিলে ভাল হইত। এই গ্রন্থের বহুল বিক্রয়ের দ্বারা আমরা আশান্বিত হইতেছি যে, হোমিওপ্যাথির প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এই দরিদ্র দেশে প্রজাগণ চিকিৎসার অভাবে যেখানে মরিয়া যায়, সেখানে হোমিওপ্যাথি দ্বারা সহজে কি প্রকার উপকার করা যাইতে পারে, আমি অনেকবার তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছি। একবার একটা পল্লীগ্রামে রক্তামাশয়ের মহামারীতে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দিনে দিনে মৃত্যুমুখে পড়িতেছিল। আমি সহসা তথায় গিয়া পড়িয়া চিকিৎসা করিলাম—একমাসের মধ্যে প্রায় ৯০ টী ছেলেকে মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইবার আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলাম। আমরা সমালোচ্য পুস্তকের এই কারণে বহুল প্রচার কামনা করি। মূল্য ৭॥০ টাকা হইলেও এই গ্রন্থ গৃহস্থের কত টাকা যে বাঁচাইয়া দিবে তাহা বলা যায় না।

সুরধুনী—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর—প্রকাশক শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় ৯১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"ইহার অনেকগুলি কবিতা আমার ভালো লাগিল। ভাষা, ছন্দ ও ভাবের সামঞ্জস্যে এগুলি সুন্দর হইয়াছে।" অন্যতর কবি কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় তাঁহার "পরিচারিকা"তে একটু স্বল্পাক্ষর ও সারদিগ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। এই উভয় সমালোচনাই গ্রন্থের প্রথমেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এ অবস্থায় ইহার "সমালোচনা" করিবার দুঃসাহস আমার নাই। তবে, এইটুকু বলিতে পারি যে, কবিতাগুলি আমার ভালই লাগিয়াছে—একটা মধুর শান্তভাব অন্তরকে ঢাকিয়া ফেলে।

বীরু—(অনুন্নত শ্রেণীর একটী যুবকের জীবনচিত্র)। শ্রীগিরিশচন্দ্র নাগ বি-এ প্রণীত। প্রকাশক—চক্রবর্ত্তী ও চ্যাটার্জ্জি কোম্পানি লিঃ ১৫, কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা।

আজকাল উপন্যাস পড়িতে গেলেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, পাছে অশ্লীলতার পঙ্কে হাবুডুবু খাইতে হয়। বহুকাল পরে সরলভাবে লিখিত এই উপন্যাসখানি পড়িয়া প্রাণে শান্তি অনুভব করিলাম—ছেলেমেয়েদের হাতে দিবার মত এই উপন্যাসখানি পাইয়া বেশ একটু আরাম পাইলাম। গ্রন্থকার ইহাতে বর্ত্তমান যুগে উন্নত ও অনুন্নত জাতীয় নরনারীর পরস্পর মিশ্রণে এবং সংঘর্ষে নানাপ্রকার সমস্যার উদ্ভব হইতেছে, তাহারই আভাস দিয়াছেন। মানুষকে মানুষের হিসাবে দেখিলে যে এই সকল সমস্যার সহজে নিরাকরণ হইতে পারে তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছেন। শিক্ষা দ্বারা অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যেও যে উদারহৃদয় মানুষ ফুটিতে পারে, গ্রন্থকার বীরুর চরিত্রে তাহা সুন্দর ফুটাইতে পারিয়াছেন। এই উপন্যাসপাঠে পাঠক একাধারে আমোদ ও শিক্ষা লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। তবে এইটুকু বলিতে চাই যে, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে অনেকগুলি সমাজসমস্যার একসঙ্গে অবতারণা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভাষার প্রাদেশিকত্ব প্রকাশ পাইয়াছে—যথা "পাওনাদার"এর পরিবর্ত্তে "পানাদার" ইত্যাদি। দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার এবিষয়ে বিচার করিবেন আশা করি। আমরা চাই যে, এইরূপ গ্রন্থ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পারিতোষিক হিসাবে ছেলেমেয়েদের হাতে দেওয়া হউক।

শ্রীক্ষি. না. ঠা.

Tattwabodhini Patrika

Reg. No. C 462

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৮তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৷৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে শ্রীরণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Dr. V. Ra ridih)
(ডাক্তার বিপিন চন্দ্র রায়)

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৮তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০১। সাল ১৩৩৭। শক ১৮৫২। খৃঃ ১৯৩০। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩১।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

২৪। জীর্ণ তরী।

আমার এই জীর্ণ তরী তোমার নাম করিয়া তো অজানা মহাসাগরে ভাসাইয়া দিলাম। দেখি কোথায় যায়। আমার উপর তুমি এত নিদয় হইলে কেন? তোমার কত ছেলে মেয়ে হাসিতে হাসিতে কেমন সুন্দর সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া কত সুন্দর তরী বাহিয়া চলিয়াছে। আমাকেই কেন এত দুঃখদারিদ্র্যে ফেলিয়াছ যে, আমার এই তরীখানি একটু মেরামতও করিতে পারি না, তাহার ছিন্ন পালটুকুও মেরামত করিতে পারি না। সকলকেই তুমি ডাকিতেছ, কিন্তু কৈ— আমাকে তো একবার ডাকিলেও না—আমার দিকে একবার চক্ষু তুলিয়া চাহিলেও না? আমি তোমার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি? সকলেই তোমার ঘরে যাইতেছে, আদরও পাইতেছে। কিন্তু মা! আমাকে না ডাকিলে আমি যাইবও না, তোমার আদরও লইব না। অন্য অন্য ছেলে মেয়েদের জন্য আলোকে আলোকে ঝলসিত কত ঘরবাড়ী দিয়াছ; আর আমাকে বুঝি শেষে এই দুঃখকষ্টের অন্ধকারে ভরা একখানি ভগ্ন কুটীর দিলে—মা তোমার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি, যাহার জন্য এই শাস্তি দিতেছ? তাহা হউক। দুঃখদারিদ্র্য তো তুমিই দিয়াছ —তাহাতেই আমি সুখী—আমার এই কুটীরই ভাল। উহারা ঐ ঘরবাড়ীর চোখ-ঝলসানো আলো, ক্ষুদ্র সংসারের শত ক্ষুদ্র আমোদ আহ্লাদ লইয়াই থাক্। আমি সে সমস্ত কিছুই চাহি না। আমি এই ভগ্ন কুটীরেরই পার্শ্বে বসিয়া ঐ সুনীল মুক্ত গগনের দিকে চাহিয়া থাকিব, আর তারার ভিতরে তোমারই হাসি দেখিব। মন যখন বড়ই অস্থির হইয়া উঠিবে, তখন ঐ জীর্ণতরীতে ছিন্ন পাল তুলিয়া দিয়া অনন্তসাগরে ভাসিয়া পড়িব। জানি—জানি মা—ডুবিব না। ডুবিলেই বা কি? অনন্তের সুকোমল শয্যায় তোমারই কোলে মাথা রাখিতে পাইব—ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। তখন তো আর তুমি আমায় ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না। আমি তোমার কোলে মাথা রাখিয়া গোপনে আনন্দের দুই ফোঁটা অশ্রুজল ফেলিয়া শান্তি পাইব। আমার সেই অশ্রুজলের কথা তুমি কি জানিতে পারিবে? হয় ত নাও জানিতে পারিবে।

২৫। নীরব নিশীথে।

নীরব নিশীথিনী—নিথর ধরণী। নরনারী জীবজন্তু সকলেরই চক্ষে নিসুতি চাপিয়া বসিয়াছে। বাদুড় প্রভৃতি দু-একটী নিশাচর পক্ষী চাঁদের আলোর ভিতর দিয়া উড়িতেছে আর প্রাণের ভিতর কি এক উদাস ভাবের মলয়বাতাস বহাইয়া দিতেছে। মাঝে মাঝে চামচিকা দুই একটী কাণের পাশ দিয়া উড়িয়া গিয়া আমাকে চমকাইয়া দিতেছে—আমার সুখের উদাস-উদার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। সুদূরে একটী বটগাছের উচ্চ ডালের উপর বসিয়া একটী পেঁচা কর্কশস্বরে ডাকিতেছে—রাত্রির গভীর নীরবতাকে ভাঙ্গিয়া তাহাকে গভীরতর করিয়া তুলিতেছে। আমি তো মা আর থাকিতে পারিতেছি না। আমার প্রাণের ব্যাকুলতা সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া তোমার চরণে উপস্থিত হইতে চাহিতেছে। মুহূর্ত্তেরও জন্য তোমার সঙ্গে দুটী প্রাণের কথা কহিয়া শান্তিলাভ করিতে চাই। জন্ম অবধি যেমন স্নেহের সুরে আমাকে ডাকিয়া আসিয়াছ—আজ এই নীরব নিশীথে তেমনই স্নেহের সুরে আর একবার আমাকে ডাক; তোমার সেই সুরে আমাকে ডুবিয়া যাইতে দাও, অন্তত মুহূর্ত্তের জন্য আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে দাও। আমার মাথাটী একবার তোমার কোলে রাখিতে দাও; তোমার কোলে মাথা রাখিয়া একটিবার আমাকে ঘুমাইতে দাও—সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা অন্তত একটীবারের জন্য আমাকে ভুলিয়া যাইতে দাও। একবার আমার বুকেতে হাত দিয়া দেখ—তোমাকে মা—মা বলিয়া ফুকারিয়া ডাকিবার জন্য আমার প্রাণ কিরকম হাঁপাইয়া উঠিতেছে। তোমাকে লাভ করিলে আমি আর কিছুই চাহি না। একবার আমায় কোলে লও—মা—একবার আমায় কোলে লও। আমি আর কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না। সংসার আমার কাছে মরুভূমি। প্রেমের নামে বিরোধবিবাদ আর সহ্য হয় না। এই সমস্ত বিরোধের মধ্যে আর আমাকে রুদ্ধশ্বাসে মরিতে দিও না। মা—বড় ব্যথা—বড় ব্যথা!

২৬। মায়ের নাম

মা! তোমার কাছে বসিয়া দুইটী প্রাণের কথা কহিতে দাও। শুধু তোমাকে মা বলিয়া ডাকিয়া যে আনন্দ, সেই আনন্দটুকু পাইতে দাও। আমি তোমার চরণে এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, শতবিধ বিপদ-আপদ দুঃখ-কষ্ট আমাকে ঘিরিয়া আছে? যাহা কিছু অপরাধ করিয়াছি ক্ষমা কর—ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া চরণতলে দাঁড়াইয়াছি, ক্ষমা কর। আমাকে শাস্তি দিবে?—দাও। মায়ের দেওয়া শাস্তি—সে তো ছেলের কাছে মিষ্টই লাগে। যতই কেন শাস্তি দাও না, তোমার ঐ চরণ আমি ছাড়িব না। তুমি সুখ যাহা দিবে তাহাও যেমন আনন্দে গ্রহণ করিব; তুমি দুঃখ যাহা দিবে, তাহাও তেমনি তোমার হাতের দান বলিয়া মাথায় তুলিয়া লইব। যে কোন অবস্থাতেই আমাকে রাখ, আমি তোমার ঐ চরণ দিবানিশি আঁকড়াইয়া থাকিব। এই আশীর্ব্বাদ কর—প্রভাতে যখন গাত্রোত্থান করি, তখনও যেন তোমার চরণধূলি মাথায় লইয়া উত্থান করি; আবার, সারাদিনের কার্য্যশেষে যখন নিদ্রার ক্রোড়ে মাথা রাখিতে যাইব, তখনও যেন তোমার চরণধূলি মাথায় লইতে ভুলিয়া না যাই।

২৭। নাড়ীর যোগ।

জননী! দুষ্ট চিন্তায় আমার মন প্রাণ এমনই অভিভূত হইয়া গিয়াছিল যে, তোমার নাম আমি সহ্য করিতে পারিতাম না। মধুর মা-নামও প্রাণের ভিতর বিষের জ্বালা ঢালিয়া দিত। তোমার সঙ্গে পাছে চোখোচোখি হয়, তাই তোমার পাশ কাটাইয়া কাঁটার বনে কত ঘুরিয়া বেড়াইতাম। মনে পড়ে একদিন, একদিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইয়া বাঘ-ভালুকের মুখেও নিজেকে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। প্রাণের মধ্যে বড়ই দ্বন্দ্ব লাগিয়া গিয়াছিল—তোমাকে প্রাণের ভিতর দেখিতে চাই, ধরিতে চাই; অথচ তুমি তো ধরা দেওয়া তো দূরের কথা, একবার দেখাও দেও না; আবার দেখা দেও না বলিয়াই তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগিয়া উঠে। তুমি যে আমার স্নেহময়ী জননী, আর আমি যে তোমার সন্তান—সে কথা আমার নিকট উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। আমি তখন নিজেকেই বিশ্বজয়ী স্বয়ম্ভু বলিয়া ভাবিতাম! মৃত্যুর অনুচর রোগ শোক ভয়ে আমার নিকটে অগ্রসর হইতে সাহস করিত না। কিন্তু এভাবে আর কতদিন কাটে?—তোমার সঙ্গে যে আমার

নাড়ীর যোগ। সেই তো তুমি আমাকে তোমার চরণে টানিয়া লইয়াছ, তবে এতদিন আমাকে তোমা হইতে দূরে রাখিয়া তোমার কি লাভ হইল? এখন তোমার চরণতলে বসিয়া কি আরাম—কি শান্তি—সকলই মধুময়—রবিশশী প্রাণের ভিতর মধু বর্ষণ করিতেছে; গ্রহ-তারা তোমারই মধুময় সুমঙ্গল বার্ত্তা আনিয়া দিতেছে; বাতাস হৃদয়ে শান্তি ঢালিয়া দিতেছে। যাহারা আমার সঙ্গে বিবাদ কলহ করিতেছে, তাহাদের সেই বিরোধ বিবাদেও তোমার মঙ্গল ভাবের প্রকাশ দেখিতেছি। ভূধরসাগর, বন-উপবন, সকলই এখন আমার নিকট তোমারই নাম কীর্ত্তন করিতেছে। আজ আমার নিকট প্রত্যেক ধূলিকণা তোমারই নামের ধ্বনিতে অনু-রণিত হইতেছে। আজ যে দিকে দেখি তোমারই মধুর ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছি। মা! এখন বুঝিতেছি তুমি আমাকে নিত্যই কোলে লইয়া আছ। তোমার অমৃত স্তন্য আমাকে প্রাণ ভরিয়া পান করিতে দাও—আমি অমর হইয়া তোমারই কোলে নিত্য বাস করি। অনন্তকাল ধরিয়া যেন তোমার চরণ সেবার অধিকার পাই। এই দীন দুঃখীকে দূরে ঠেলিয়া দিও না।

২৮। অরণ্যের পথে।

অরণ্যের বিজন পথ দিয়া চলিয়াছি—আশা, একদিন না একদিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। সহরের কোলাহল-কলরবের মধ্যে আমি নিজেকে হারাইয়া ফেলি—দেখিতে পাই না। এই অর-ণ্যের পথে যে সুগন্ধ আমার প্রাণকে স্পর্শ করি-তেছে, জননী! তোমার চরণতলে যখন বসিতাম, তখন এমনই সুগন্ধ আসিয়া আমাকে পাগল করিয়া দিত। এই পথে চলিতে চলিতে যে অনাহত অনন্দধ্বনি হৃদয়ে আজ বাজিয়া উঠিতেছে, অনেক দিন—অনেক দীর্ঘ দিন—তেমন ধ্বনি কানে আসে নাই। এখানকার ধূলিকণাও যে আনন্দ-খেলা খেলিতেছে, তেমন খেলা যে অনেক দিন দেখি নাই। মা আমার! আর আমাকে পথহারা হইতে দিও না, কাঁটার বনে যাইতে দিও না। এই আনন্দে সুগন্ধে তোমাকে পাইয়া প্রাণ যে কি করিতেছে, তাহা কাহাকে আর জানাইব? এ সমস্তই আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছে। সকল কাজের ভিতরেই মনে হয় যে, কতক্ষণে তোমার কোলে গিয়া উঠি। আমোদ-প্রমোদে নামিয়াই তোমাকে ভুলিয়া ছিলাম। আজ সেই সমস্ত আমোদ-প্রমোদ বিষের মত তিক্ত বোধ হইতেছে। কিছুই ভাল লাগিতেছে না। এখন তোমার চরণপ্রান্তে বসিব, ইহাই লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছি। মা হইয়া তুমি আর আমাকে ঠেলিতে পারিবে না।

নবশতাব্দীর আবাহন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কবি টেনিশন নববর্ষের আগমন উপলক্ষে একটী কবিতায় গাহিয়াছেন—মঙ্গল ঘণ্টাধ্বনি করিয়া পুরাতন বর্ষকে বিদায় দাও এবং মঙ্গলঘণ্টাধ্বনি করিয়া নববর্ষকে আবাহন করিয়া লও। আমরাও তাঁহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছি—ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের পুরাতন শতাব্দীকে মঙ্গল শঙ্খ বাজাইয়া শুভ ঘণ্টাধ্বনি করিয়া বিদায় দাও এবং মঙ্গল-শঙ্খধ্বনি ও শুভ ঘণ্টাধ্বনি সহ-কারে নবশতাব্দীকে আবাহন করিয়া হৃদয়ের শুভকামনার সহিত গ্রহণ কর।

নবশতাব্দীতে গ্রহণের জন্য আমাদের সম্মুখে সর্ব্ব-প্রধান ও সর্ব্বপ্রথম মন্ত্র উপস্থিত হইতেছে—অন্যোন্য-সাহচর্য্য। এই ধ্বনি বিশেষ সংহত আকারে এখনও প্রকাশ না পাইলেও এবং বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন কালে মধ্যে মধ্যে ব্যাহত হইলেও আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া এবং সমগ্র ধরণীর বক্ষ ভেদ করিয়া এই মহাবাণীই ধ্বনিত হইয়া উঠি-তেছে। পরমেশ্বর যে আমাদের সকলেরই একমাত্র পিতামাতা, এই ভাবই তাহার স্বপক্ষে অনন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাঁহার করুণা, তাহার প্রেম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এই অন্যোন্য-সাহচর্য্যের আকারে মানবগণের পরস্পরের প্রতি প্রীতির আকারে সুব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। ভগবান সমগ্র জগতের ঘটনাসমূহকে তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এমনভাবে নিয়মিত করিয়া দিয়াছেন যে, আমরা দেখি যে, এই মহাবাণীকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যেন সমগ্র মানবসমাজ উন্মুখ হইয়া পড়িয়াছে। এই মহাবাণীকে আমরা যদি অন্তরে গ্রহণ করিয়া উহার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে

পারি, তবে জগতের মুখে নবশ্রী ফুটিয়া উঠিতে দেখিব; সমগ্র মানবজাতি নবপ্রাণে অচিরে স্পন্দিত হইয়া উঠিবে, মৃত্যু অচিরে অন্তর্হিত হইবে এবং ইহলোক ও পরলোক এক আশ্চর্য্য প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইবে।

ভগবানকে সকল কার্য্যে শ্রেষ্ঠতম আসন প্রদান কর। সকল কার্য্যের মধ্যে তাঁহার মঙ্গলহস্ত উপলব্ধি কর; প্রতি মানবের অন্তরে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ কর। এই ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ কর—তোমাকে পাপ তাপ স্পর্শ করিতে পারিবে না; তোমার নিকট কোনও মানবই অস্পৃশ্য থাকিবে না; তোমার জীবনে গীতোক্ত এই সত্য সুপ্রকাশ হইয়া উঠিবে যে, ভগবদ্ভক্তের জীবনে পাপ পদ্মপত্র হইতে জলের ন্যায় সহজেই ঝরিয়া যায়—কোনও দাগই রাখিয়া যায় না।

হে জননী! হে করুণাময়ী পরম মাতা! হে দয়াময় বিশ্বপিতা! তুমি আমাদিগকে উপলব্ধি করিবার অধিকার দাও যে, আমরা তোমার সন্তান; তুমি প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের প্রত্যেকের জীবন তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত করিতেছ। তুমিই ভারতের ভাগ্যবিধাতা, সুতরাং ভারতের ভাগ্যকে তোমার মঙ্গল হস্তে সমর্পণ করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। তুমি জগতের ভাগ্যবিধাতা। আমরা নির্ভয় থাকিতে পারি যে, অচিরে জগত হইতে পশুবলের শাসন অন্তর্হিত হইয়া তোমার প্রেমের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। তুমিই ব্রাহ্মসমাজের ভাগ্যবিধাতা। আমরা নিঃসংশয় হইয়া আছি যে, আমাদের মধ্যে সকল দ্বন্দ্ব ও সকল বিবাদ ঘুচিয়া গিয়া নব-শতাব্দীতে আমরা তোমার মঙ্গল আহ্বানে অচিরে মিলনের পথে অগ্রসর হইব এবং তোমার বিজয় পতাকা বহন করিয়া দিকে দিকে প্রোথিত করিব এবং বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে এবং তোমার প্রতিষ্ঠিত সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মকে জয়যুক্ত করিব।

সেই শুভ দিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করিয়া আছি, যে দিন তাঁহার সঙ্গে একযোগে যুক্ত হইয়া সংসারকে পাপতাপ হইতে বিমুক্ত করিতে পারিব।

বিগত শতাব্দীতে আমাদের নবজীবনের নবোন্মেষের সঙ্গে ভারতবাসীর অন্তরে পাপের বিভীষিকা মৃত্যুর বিভীষিকা বড় বেশী জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাই ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভকালে "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" প্রভৃতির ন্যায় গানসকল গীতরচয়িতাদের লেখনীর মুখে প্রকাশ পাইয়াছিল। আশ্চর্য্য এই যে, মঙ্গলময় পরমপুরুষের মঙ্গলবিধানে সেই পাপবিভীষিকা ও মৃত্যুবিভীষিকার অভিব্যক্তিতে আমাদের অন্তরে প্রেমের শাসন মানিয়া লওয়ার দিকে আমাদের অন্তঃকরণ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এযুগে আমরা মরণকে ভয় করিতে চাহিনা, কারণ মরণকেও আমরা দুঃখ কষ্টের কারণের পরিবর্ত্তে ভগবানের মঙ্গলবিধান বলিয়াই গ্রহণ করিতে শিখিয়াছি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মহাত্মাগণই এই প্রেমের শাসন ঘোষণা করিবার পথে অগ্রণী। তাঁহাদের অভিমুখে আজ আমাদের ভক্তিপূর্ণ নমস্কার সানন্দে সমুত্থিত হইতেছে।

বিগত শতাব্দীর শেষভাগে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণে আমরা বিশ্বপিতা অখিলমাতা পরমেশ্বরকে আমাদের প্রত্যেকের পিতা ও প্রত্যেকের মাতা বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। ভগবানকে আমাদের প্রত্যেকের পিতামাতা বলিয়া শুধু জানা নহে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিবার এত বড় গৌরবপূর্ণ অধিকার ব্রাহ্ম-সমাজের পূর্ব্বে আর কাহারও নিকটে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। জননীর চরণে আছড়াইয়া পড়; তাঁহার চরণ প্রেমের অশ্রুতে ধুইয়া দাও। নবীন শতাব্দীতে জীবনে এই প্রতিজ্ঞা লইয়া চল, এই মন্ত্রের সাধন কর যে, তাঁহার চরণ ছাড়িয়া কোনও কারণেই দূরে সরিয়া যাইব না। তিনি যেমন আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই; আমরাও সেইরূপ ভক্তিসিক্ত-হৃদয়ে তাঁহারই চরণতলে সর্ব্বদাই বসিব, তাঁহারই আদেশ লইয়া জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইব। বিশ্বজননীর সন্তানের উপযুক্ত কার্য্য করিয়া তাঁহার সন্তান হইবার মাহাত্ম্য দিকে দিকে বিঘোষিত করিব।

শুধু তাঁহাকে হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিলেই চলিবে না। যে ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া তাঁহাকে জানিয়াছি, সেই ব্রাহ্মসমাজকেও অন্তরে দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকিতে হইবে, নূতন শতাব্দীতে ব্রাহ্মসমাজকে আমাদের প্রাণ দিয়া রক্ষা করিতে হইবে। আমরাই কেবলমাত্র তাঁহাকে পিতামাতা বলিয়া জানিলে চলিবে না। ঐ ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া আমাদের অধস্তন বংশধর-দিগকে ভগবানকে পিতামাতারূপে প্রত্যক্ষ জানিবার এবং জানিয়া সর্ব্বতোভাবে জীবনে উপলব্ধি করিবার শিক্ষা দিতে হইবে। তবেই বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব সার্থক হইবে এবং আমাদেরও ব্রাহ্মসমাজকে অবলম্বন এবং তাহার উদার ভাবের মধ্যে লালিত-পালিত হওয়া সার্থক হইবে।

একথা শুনিতে চাই না যে, সেই করুণাময়ী জননীকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না। অন্তরের সহিত, ডাকিবার মত, তাঁহাকে ডাক—ডাক—ডাক—নিশ্চয়ই তাঁহার সাড়া পাইবে। এবিষয়ে যুগযুগান্তর ধরিয়া দেশদেশান্তরের সাধু ঋষিমুনিগণ যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা কখনও মিথ্যা নহে। নবশতাব্দীর জন্য অন্যোন্যসাহচর্য্যের যে বাণী দিয়াছেন, সেই বাণীর

ভিতর দিয়া তাঁহাকে ডাকিতে হইবে। একা একা প্রাণহীন ভাবে মন্ত্রের মত অসাড় ডাকের উত্তরে সাড়া পাইবে না। ভায়ে ভায়ে মিলিত হইয়া, পরিবারস্থ সকলের সহিত মিলিত হইয়া, সমাজের সকলের সহিত মিলিত হইয়া, সমগ্র মানব জাতির সহিত মিলিত হইয়া ডাকিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জগতের সর্ব্বত্র মিলনের ধ্বনি গর্জ্জিয়া উঠিতেছে, লোক-লোকান্তরের পরস্পরের মধ্যে মিলনের আকাংক্ষা জাগিয়া উঠিতেছে; অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, ত্রিকালের মধ্যে প্রেমসূত্র অবলম্বনে এক আশ্চর্য্য মিলনহার গ্রথিত হইতে চলিয়াছে। এমন শুভ অবসরে আমরা যেন নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া না থাকি; হেলায় অবসর না হারাইয়া ফেলি। কিছুই যদি না পারি, তথাপি ভগবানের নামে ব্রাহ্ম-সমাজের ভিতর ভারতের ত্রিশকোটী নরনারীকে ডাকিয়া লইব। ত্রিশকোটী মানবের সমবেত কণ্ঠে যখন ভগবানে নাম, যখন সেই পরম পিতামাতার নাম, বজ্রনির্ঘোষে গর্জ্জিয়া উঠিবে; যখন সেই ত্রিশকোটী মানবের সমবেত চেষ্টার ফলে জগতের তিনশত কোটী মানবের হৃদয় ভেদ করিয়া তাঁহার নামে জয়ধ্বনি সমুত্থিত হইবে, তখন ভগবান তাঁহার সিংহাসন ছাড়িয়া এই কোটী কোটী ক্ষুদ্র মানবের সম্মুখে উপস্থিত না হইয়া, তাঁহার সন্তান-গণের কাতর প্রার্থনার উত্তরে সাড়া না দিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিবেন না।

জননী! জননী! আমার কাতর ডাকে সাড়া দাও। ব্রাহ্মসমাজকে নবশতাব্দীতে কি প্রকারে সবল করিয়া তুলিতে পারিব, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয়পতাকা কি প্রকারে গৃহে গৃহে প্রোথিত করিতে পারিব, আমাকে তাহার পথ দেখাও; হে অকিঞ্চনগুরু! তুমি আমাকে সেই বিষয়ে আদেশ ও উপদেশ প্রদান কর। আমার জীবনের এই শেষভাগে তোমার নিকট কেবল এইটুকু প্রার্থনা করি।

রামায়ণী কথা।

(শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ বি-এল্)

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিগত চৈত্র-সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয়ের "রামায়ণ সম্বন্ধে দুই একটি কথা" এবং ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের মন্তব্য-পাঠে রামায়ণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনার সূত্রপাত-দৃষ্টে বিশেষ আনন্দিত হইলাম। ঐ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যথাসম্ভব নিম্নে দিলাম।

১। শ্রীরামচন্দ্র ও সীতা একই বংশীয়।

রামবংশ।

(ক) শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ, ৯ম স্কন্ধ, ৬ অধ্যায়—মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর শতপুত্রের মধ্যে বিখ্যাত—বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ডক। বিকুক্ষিই পরে শশাদ নামে নরপতি হ'ন। এই বংশে মান্ধাতা, সগর, ভগীরথ, দশরথ ও শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি জন্মিয়াছিলেন। এই পুরাণ মতে ইক্ষ্বাকু হইতে ৫৮ পুরুষ (অধস্তন) শ্রীরামচন্দ্রাদি ও বায়ু-পুরাণ মতে ৬৬ পুরুষ অধস্তন—শ্রীরামচন্দ্রাদি চারি ভাই। এই বংশাবলী অন্য কয়েকটী পুরাণেও আছে।

সীতার পিতৃবংশ ও 'জনক' নামোৎপত্তি।

(খ) শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ, ৯ম স্কন্ধ, ১৩শ অধ্যায়—মনুপুত্র ঐ ইক্ষ্বাকুর মধ্যম পুত্র নিমির বংশাবলী বর্ণিত আছে। ঐ নিমির দেহান্ত হইলে তাঁহার মৃতদেহ মন্থন করা হয়; তাহাতে ঐ—"মৃতদেহ হইতে একটি কুমার উৎপন্ন হইল। সেই নিমিতনয়ের ঐপ্রকার জন্মহেতু জনক নাম হয়। পিতার বিদেহ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করাতে বৈদেহ, মন্থন দ্বারা জাত এই জন্য মিথিল বলিয়াও খ্যাত হ'ন।" এই পুরাণের বংশাবলী অনুযায়ী সীতার পিতার নাম—সীরধ্বজ। ইনি ইক্ষ্বাকু হইতে অধস্তন—২৩ পুরুষ।

সীতার পিতার নাম।

বায়ুপুরাণ, ৮৮ অধ্যায়ে—নিমি যে ইক্ষ্বাকুর মধ্যম পুত্র তাহা স্বীকৃত। ৮৯ অধ্যায়ে ঐ নিমির বংশাবলী লিখিত আছে। এই পুরাণ অনুযায়ী সীতার পিতা—সীরধ্বজ। ইনি ইক্ষ্বাকু হইতে—অধস্তন ২৩ পুরুষ।

সুতরাং বংশাবলী হইতে সীতার পিতার নাম পাওয়া যায় "সীরধ্বজ" বা "শীরধ্বজ"—মাত্র "জনক" নহে।

"জনক" কুলোপাধি।

উক্ত বায়ুপুরাণের ৮৯ অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকের প্রথম লাইনে আছে—"ইত্যস্মিন্ সন্তিষ্ঠতে বংশো জনকানাং মহাত্মনাম্" অর্থাৎ এই নিমির বংশকে—"মহাত্মা জনকদিগের বংশ" বলা হইয়াছে। এতদ্দৃষ্টে অনুমান হয় যে "নিমি-বংশের রাজগণের কুলোপাধি বা সাধারণ নাম হইয়াছিল—"জনক"। যতদূর স্মরণ আছে—পুরাণান্তরে স্পষ্টই লিখিত আছে যে ঐ নিমিবংশের রাজাদের সাধারণ নাম বা কুলোপাধি ছিল—"জনক"। সকল পুরাণগুলি নিকটে না থাকায় এক্ষণে Reference দেওয়া গেল না, পরে দিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের উপরি উদ্ধৃতাংশ হইতে "জনক" নাম কি কারণে উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা দৃষ্ট হইবে। বিস্তৃততর তথ্যপ্রয়াসীগণ উক্ত পুরাণগুলি পড়িবেন।

উক্ত বংশাবলী হইতে আরও দৃষ্ট হইবে যে মূল বংশ মনুবংশ বা মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকুর বংশ। ইক্ষ্বাকুর উক্ত পুত্রদ্বয় হইতে দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক শাখা বা বংশ উৎপন্ন হইয়া সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক রাজ্যাধিপতি হইয়াছিলেন। সীতা সর্ব্বত্রই জনকবংশীয়—সীরধ্বজ বা শীরধ্বজ নামক রাজার কন্যা বা পালিতা কন্যা বলিয়াই লিখিতা ও খ্যাতা। পালিত ও ঔরসজাত সন্তানে পার্থক্য না করায় তিনি জনকের নিজ সন্তানরূপে উল্লিখিত হন।

সীতা রামচন্দ্রের ভগ্নী নহেন।

পুরাণোদ্ধৃত কুলুজী হইতে দৃষ্ট হইবে যে ইক্ষ্বাকু হইতে এক শাখাবংশে অধস্তন—৫৮ বা ৬৩ পুরুষে—শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার ভাইগণ; এবং অন্য শাখায় মায় ইক্ষ্বাকু হইতে অধস্তন—২৪ পুরুষে সীতা। সুতরাং সীতা শ্রীরামচন্দ্রের যে ভগিনী ছিলেন না, ইহা প্রমাণিত হইল।

সগোত্রবিবাহ।

আরও দ্রষ্টব্য যে মূল মনু বা ইক্ষ্বাকুকুলে জন্ম-গ্রহণ জন্য উভয়েই সগোত্র, সুতরাং এই রামসীতার বিবাহ সগোত্রেই হইয়াছিল। রামচন্দ্রের অন্য তিন ভাইয়ের সহিত সীতার পিতা শীরধ্বজের ভাইদের কন্যাগণের বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং একই কারণে এই সকল বিবাহও সগোত্র-বিবাহ।

২। সীতার—দশরথ বা রাবণের—দুহিতৃত্ব।

সীতার পিতা রাজর্ষি শীরধ্বজ জনকের রাজধানী ছিল বর্ত্তমান 'জনকপুরে'। এই স্থান এক্ষণে দারভাঙ্গা মহারাজার জমিদারীর অন্তর্গত, জেলা দারভাঙ্গা মধুবনী সাবডিভিসানে। তথায় ভগ্ন হরধনু প্রস্তরীভূত (fossilised) আকারে এখনও দৃষ্ট হয় ও প্রতি বৎসর এক বিরাট মেলা হয়—রামকীর্ত্তি স্মরণার্থ।

শ্রীরামচন্দ্রের পিত্রালয় ছিল অযোধ্যা। অযোধ্যা ও জনকপুরের মধ্যে শত শত মাইল ব্যবধান।

যদি সীতা দশরথের সাড়ে সাত শত রাণীর কাহারও গর্ভজাতা হইতেন, তাহা হইলে অযোধ্যা হইতে বহুশত মাইল দূরে শীরধ্বজের রাজ্যে ও তাঁহার চাষের ক্ষেতে তাঁহাকে ফেলিয়া দিতে আসিবে কেন? তাহার সম্ভাবনাই মনে হয় না। দশরথের প্রকাণ্ড অযোধ্যারাজ্যের মধ্যে কি তাঁহাকে ফেলিবার ঠাঁই মিলে নাই?

মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদিতে দশরথের একমাত্র কন্যা শান্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই শান্তাকে দশরথসখা অঙ্গরাজ লোমপাদ সাদরে দত্তক কন্যারূপে গ্রহণ করেন ও শান্তার সহিত পরে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির বিবাহ হইয়াছিল। লোকে সন্তান ফেলিয়া দেয়—(১) অভাবের তাড়নায় বা (২) জারজ সন্তান হইলে লোকলজ্জা হইতে ত্রাণার্থ; কিন্তু দশরথ-পত্নীদের কাহারও ঐ প্রকার কোনও দুর্দ্দশার কথাই কোথাও দৃষ্ট হয় না বা শোনাও যায় নাই। এমতাবস্থায় সীতা দশরথের কন্যা হইলে তাঁহাকে মাঠে ফেলিয়া দিবার কারণ কি? তিনিও তো শান্তারই ন্যায় সাদরে পালিতা বা অন্য কাহাকেও 'দত্তক'কন্যা-রূপে প্রদত্তা হইতে পারিতেন। সুতরাং সীতার দশরথ-দুহিতৃত্ব বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

সেন মহাশয় 'জনক' অর্থাৎ পিতা সুতরাং রামেরই পিতা দশরথের কন্যা এইভাবে অর্থ করিয়া সীতাকে রামের ভগ্নী বলিয়াছেন। কিন্তু "জনক" বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় (তাঁহার উৎপত্তিও উপরে দৃষ্ট হইবে) সেন মহাশয়ের অনুমান ও অর্থ ভুল বলিতে হইবে।

আর সীতা যদি বা মন্দোদরীর সন্তান—রাবণকন্যাই ছিলেন, তবে এইভাবে জনকরাজ্যে সীতাকে ফেলিয়া যাইবার কারণ কি বা দরকারই বা কি হইয়াছিল? সীতার পিত্রালয় জনকপুর নামক স্থান কোনও নদীতীর-বর্ত্তীও নহে, সুতরাং নদীতে ভাসিতে ভাসিতে তথায় কিরূপে আসিবেন? লঙ্কা হইতে সাত সমুদ্র তের নদী বাহিয়া নেপালরাজ্যের সন্নিকটে জনকপুরে সীতার উদয়ও অসম্ভব। আর চাষক্ষেত্রে সীতা হলাগ্রে চাষকালে লাগিয়াছিলেন, তাই জনকের দৃষ্টিপাত হয় ও তিনি সীতাকে তুলিয়া লইয়া আসেন। নদীজলে ভাসিতে ভাসিতে আসিলে চাষক্ষেত্রে কিরূপে জল হইতে উঠিলেন? যদি বলা হয় বন্যাপ্রভাবে তবে বক্তব্য, বন্যায় নদীজল হইতে চাষের ক্ষেত্রে পতিত হইলেও জমিতে জল থাকা বা জমি সুবিশেষ ভিজা থাকা সম্ভব, তাহাতে চাষের সম্ভাবনায় ব্যাঘাত হয়; সুতরাং ইহা কষ্টকল্পনা মনে হয়। তাহা ছাড়া সীতা মন্দোদরীতনয়া হইলে মন্দোদরী নিশ্চয়ই তদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাতা ছিলেন মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু সীতাহরণের পর দীর্ঘকাল সীতার রাবণগৃহবাসকালে—এমন কি, যখন মন্দোদরীই স্বয়ং প্রিয় রাবণকে সীতাবধ হইতে ক্ষান্ত করেন তখনও এবং তার পরও সমগ্র রক্ষকুল ক্ষয় হইলেও তিনি রাবণকে সেকথা বলিলেন না কেন? বলিলেই তো রাবণও ক্ষান্ত হইত ও কুলক্ষয়ও হইত না। এইজন্য ঘোরতর সন্দেহ হয় যে সত্যই কি সীতা মন্দোদরী বা রাবণ-তনয়া?

৩। সহোদর ও সহোদরা—ভ্রাতা ও ভগ্নীর বিবাহ।

(প্রাচীনতম যুগ)

(ক)

প্রচলিত

(অ) বিষ্ণুপুরাণ—প্রথমাংশ, ৭ম অধ্যায়:—১৫—১৭ শ্লোক—"স্বায়ম্ভুব মনু শতরূপাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। এই শতরূপার গর্ভে মনুর আকূতি নাম্নী এক কন্যা জন্মেন। ঐ কন্যা আকূতিকে রুচিকে দান করা হয়।" ১৮—১৯ শ্লোক—"রুচি আকূতিকে গ্রহণ করেন। তাহাতে যজ্ঞ ও দক্ষিণা নামে দাম্পত্য মিথুন জন্মে। দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের দ্বাদশ পুত্রের জন্ম হয়। তাহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাম নামে খ্যাত দেবসকল।"

(বঙ্গবাসী সংস্করণ—২২ পৃঃ)

(আ) শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ—৪র্থ স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়ে—উক্ত ঘটনাই আরও বিশদভাবে বর্ণিত আছে ও উল্লেখ আছে যে—

"কিছুকাল অতীত হইলে দক্ষিণা স্বীয় ভ্রাতা যজ্ঞ পুরুষকেই বিবাহ করিতে অভিলাষ করিলেন। তদনুসারে তাঁহাদের উভয়ের পাণিবন্ধন সম্পন্ন হইল। ভগবান যজ্ঞ স্বয়ং সন্তুষ্ট হইয়া সেই মনোমত ভার্য্যাতে দ্বাদশ পুত্র উৎপাদন করিলেন। প্রজাপতি রুচির এই দ্বাদশটী দৌহিত্রই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিত নামে দেবতা হইয়াছিলেন।"

সুতরাং এই দুই পুরাণে এমন একটা যুগের পরিচয় পাওয়া যায়, যৎকালে সহোদর ও সহোদরা ভ্রাতা ও ভগ্নীর বিবাহ উল্লিখিত, স্বীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছে দৃষ্ট হইবে।

পুরাণান্তরে ঐ যজ্ঞকে সুযজ্ঞদেব বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে ঐ ভ্রাতাভগ্নীর সংসর্গজাত পুত্রগণকে "যাম-দেবতা" এবং শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে উঁহাদিগকেই "তুষিত" দেবতা বলা হইলেও মূল ঘটনা উভয়েরই এক।

তবে উহা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের কথা—সে মন্বন্তর যে কত সহস্র বা লক্ষ বৎসরের পূর্ব্বের তাহার ইয়ত্তা দুরূহ হইলেও প্রবন্ধান্তরে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

(খ)

চিন্তান্তর।

ঋগ্বেদ—১০ম মণ্ডল, ১০ সূক্ত। যম ও যমী সংবাদ।

যম ও যমী—যমজ সহোদর ও সহোদরা ভ্রাতা ও ভগ্নী। বিস্তীর্ণ সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী দ্বীপে নির্জ্জন প্রদেশে, যমী স্বীয় সহোদর ভ্রাতা যমের সহিত সহবাসে, একান্ত সমুৎসুক,—যম তাহাতে আপত্তি করিলেন; শুধু আপত্তি নহে, যমীর নানা প্রলোভন প্ররোচনা ও যুক্তি সত্বেও সহবাস করিলেন না ও যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতে সংক্ষেপে এই জানা যায় যে—"সহোদরা ভগ্নী অগম্যা", "ভগিনীতে যে ব্যক্তি উপগত হয়, তাহাকে পাপী কহে।"

যমীর যুক্তি হইতে জানা যায় যে তৎকালে ভ্রাতা-ভগ্নীর পতি-পত্নীরূপে সংসর্গ দেবতারা ইচ্ছাপূর্ব্বক করিয়া থাকেন, যদিও তাহা মনুষ্যলোকে নিষিদ্ধ হইয়াছে।"

উপরে পুরাণে যে যুগের সংবাদ রহিয়াছে তাহার অনেক পরবর্ত্তী যুগের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে এই ঋগ্বেদীয় সূক্তে, যৎকালে সহোদর সহোদরা ভ্রাতা ও ভগ্নীর সহবাসে পাপবোধ জাগ্রত হইয়াছে—অন্ততঃ যমের মনে; এবং উক্তরূপ সহবাস তৎকালে দেব-লোকের বাঞ্ছিত হইলেও উহা মনুষ্যলোকে নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

(গ)

নিকট আত্মীয়ে বিবাহ।

সেন মহাশয় লিখিয়াছেন "পূর্ব্বে ভ্রাতাভগিনী অর্থাৎ অতি-জ্ঞাতির কন্যাপুত্রে বিবাহ হইত"। এই কথার বিষয়ে পূজনীয় সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—"এখানে মনে হয় লেখক সহোদরার বিবাহ স্বীকার করেন নাই। তাহা যদি না করেন, তবে আমাদের আপত্তির কোনই কারণ দেখি না।"

পুরাণের ও ঋগ্বেদের উক্ত লেখা হইতে ইহাদের উভয়েরই মতবিভূতির সম্ভাবনা। যেকালে লোকসংখ্যা অতীব বিরল বা সমান ঘর-বর না মিলে সেকালে নিকট আত্মীয়গণের কন্যাপুত্রে বিবাহাদি হইলে তাহা সমাজে দূষণীয় গণ্য হয় না এই জন্য যে, নরনারীর দেহসম্বন্ধ সৃষ্টিপ্রবাহ অব্যাহত রাখার নিমিত্ত; তবে পবিত্রতাদিকারণে লোকসংখ্যা অতি বিস্তৃত হইলে ঐরূপ বিবাহও কম হয় বা লোপ পায়। যেমন ঋগ্বেদ বলিয়াছেন যে ভ্রাতাভগ্নীর সহবাসপ্রথা তৎকালে মনুষ্য-লোকে নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

জাতি বা কুলধ্বংসকালে জাতি ও কুলরক্ষার্থ পুরুষ অভাবে আপন পিতার সহযোগে কন্যাগণের দ্বারাই (পিতাকে সুরাপানে মত্ত ও অজ্ঞান করিয়া) বংশ ও কুল পুনঃ প্রবর্ত্তনের কথা ও নিদর্শন Old Testament ১৯ অধ্যায় ৩১ হইতে ৩৮ প্যারায় মধ্যে দ্রষ্টব্য। এব্রাহামের বংশে একমাত্র লট ও তাঁহার দুই কন্যা অবশিষ্ট রহিলে ও দেশের মধ্যে অন্য লোক আদি সব বিনষ্ট হইলে কন্যারা ঐ ভাবে দুই পুত্রের জন্মদান করেন। এই দুই পুত্রের দ্বারা Moabite ও Ben-ami নামক

দুই সম্প্রদায় গঠিত হয়। ঐ দেশীয়গণ বা ঐ জাতিগণ তাহাতে দোষাই কিছু পান নাই। ঐ পুস্তকের অন্যান্য স্থান পাঠে বোধ হয় যে কন্যাদের ঐরূপ কার্য্য বরং সমর্থিত হইয়াছে, যদিও বহুকাল পরে বিভিন্ন দেশকাল-পাত্রে অবস্থিত আমরা কন্যাগণের উক্ত কার্য্য নীতি-বিগর্হিত বলিয়া মনে করিতে পারি।

সুতরাং নরনারীর যৌনসম্পর্ক কখন দোষাই হওন নহে, তাহা দেশ-কাল ও পাত্রের উপর নির্ভর করে মনে হয়। অতএব এককালের নর-নারীর বিবাহ অন্য কালের নর-নারীর Standard দ্বারা বিচার ঠিক মনে হয় না। Test Point ইহাই মনে হয় যে যেখানে ঐরূপ সংসর্গ সমাজ দেশ বা কুলের পক্ষে কল্যাণকর সেখানে উহা দোষাই হয় না— তাহা যত নিকট আত্মীয়ের মধ্যেই হউক, ইহাই চির সত্য।

এমত স্থলে রামসীতার বিবাহ একই বংশের দুই পৃথক শাখাভুক্ত নর-নারীর বিবাহ হইলেও তাহাতে দোষ ই কিছুই তো দৃষ্ট হয় না।

৪। রামসীতার বিবাহ বনাম বিভিন্ন বিশেষতঃ বৌদ্ধমত।

আর্য্য বা হিন্দুগণের কোনও পুস্তকাদিতে রামসীতার বিবাহে দোষারোপ দৃষ্ট হয় না, বরং উভয়কে আদর্শ ও পূজ্য বলিয়া সকল আর্য্যই গণ্য ও মান্য এখনও করেন।

পূর্ব্বে কুলুজী দ্বারা দেখাইয়াছি যে, রাম ও সীতার মধ্যে ভ্রাতা-ভগ্নী সম্বন্ধ ছিলই না; সুতরাং এবিষয়ে বৌদ্ধমত ভ্রান্ত তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

রামসীতার বিবাহ সমস্ত আর্য্যশাস্ত্রাদিতেই স্বীকৃত ও সমর্থিত দৃষ্ট হয়। ঐ বিবাহসমর্থনে সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন— "রামচন্দ্র জনকরাজার পোষ্য কন্যা জানিয়াই সীতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন অনুমান হয়।" এইরূপ অনুমান ঠিক মনে হয় না। কেন—বলিতেছি। জনকবংশীয় সীরধ্বজের ভ্রাতাগণের কন্যাদিগের অর্থাৎ সীতার খুড়তুতো ভগ্নীগণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা তিনজনের বিবাহ হইয়াছিল। এই শেষোক্ত তিন কন্যা নিজ নিজ পিতার ঔরসজাত কন্যা ছিলেন। সুতরাং সীতা রামের ভগ্নী হইলে সীতার এই ভগ্নীগণও রামের ভ্রাতাদিগের ভগ্নী হইতেন এবং তাহা হইলে ইহাদের বিবাহও ভ্রাতা-ভগ্নী বিবাহ মধ্যে গণ্য হইত। পোষ্য কন্যা না হইলে বিবাহে আপত্তি থাকিলে রামের ভাইদের বিবাহও আপত্তিজনক হইত। কিন্তু ভ্রাতা ভগ্নী সম্বন্ধ না থাকায় এরূপ আপত্তি বা অনুমানের কোনই ভিত্তি বা আবশ্যক দেখি না। তবে একটা বিষয় প্রণিধান যোগ্য যে, উদ্ধৃত বৌদ্ধমতে রামের ভাইদের এই বিবাহে কোনই আপত্তি বা ইঙ্গিত নাই। অতএব স্বীকার্য্য এই যে আপত্তি অভাবে এই বিবাহগুলি তাঁহাদের অনুমোদিত ও সমর্থিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় একাকী রামের বিবাহের দরুণ তাঁহাদের এত কটাক্ষ কেন? এই 'কেন'র উত্তরে সম্পাদক মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাঁহার সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া বলিতে বাধ্য যে, ঐ বৌদ্ধমতের মধ্যে বিশদরূপে Propaganda-র স্পষ্ট ছায়া দেখা যাইতেছে, অর্থাৎ হিন্দুগণের অতীব পূজনীয় শ্রীরামচন্দ্রকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।

জাতকের ভূমিকা যাহা সেন মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার শেষভাগে স্বীকৃতি রহিয়াছে যে বৌদ্ধদের মধ্যে "অনেকেই মহামহোপাধ্যায় ছিলেন"। এমতাবস্থায় ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য যে ঐ মহামহোপাধ্যায়গণ পুরাণাদিতে রাম ও সীতার বংশবিবরণ দেখেন নাই! অথবা মনে হয় না কি যে দেখিয়া ও অদৃষ্টে রাম ও সীতা যে ভ্রাতাভগ্নী ছিলেন না ইহা জানিয়াও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ তাঁহারা জ্ঞাতসারেই হীনভাবে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন?

বেয়ে যা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বেয়ে যা—বেয়ে যা—বেয়ে যারে তোরা
পড়ে থাক্ যত কাপুরুষ ওরা।
তালে তালে সব দাঁড়মেরে চল্—
দূরে যেতে হবে—কর্ মনে বল্—
দাসত্বের কেটে শৃঙ্খলের বেড়্—
এক এক ক'রে যত কড়া ঘের।
ওই দেখ্ সবে ছুটিয়া চলেছে
মা'র কাজে—শোন্, আহ্বান এসেছে।
মা'র নামে তোরা চল্ দাঁড় মেরে—
মাভৈ—মাভৈ বল্—তিনি হাল ধ'রে।
মাথার উপরে জ্বলিছে তপন—
ঢেলে দিছে যেন আগুনের কণ।
চারিদিকে দেখ শুষ্ক পড়ে মাঠ—
নাহি লোকজন—খালি পড়ে হাট।
দাঁড় মেরে চল্ জোর ক'রে তোরা—
সাবাস্—সাবাস্—প্রাণে আশা ভরা।
করবে কি আর—ঘূর্ণী যত হোক্?—
দেখছি মায়ের অভয় আলোক।
আগুন জ্বল্‌ছে প্রাণের মাঝার—
নিভাইবে বল্—এত শক্তি কার?
মা'র নাম গেয়ে চল্ দাঁড় মেরে—
মাভৈ—মাভৈ বল্—তিনি হাল ধরে।
উঠেছে বাতাস—পাল দাও তুলে;
উঠে যদি ঝড়, পিছস্ না ঘুরে
সমুখে মোদের সোজা পথ প'ড়ে—
সাধিব গো কাজ, যাহা আছি ধ'রে।
অধীনতা কেটে মুক্তি পেতে চাই—
যশের পিয়াস প্রাণে রাখি নাই।
জেগে ওঠ্ ওরে মায়ের ছেলেরা—
ভয়ী যেয়ে চল্—সকলের সেরা।
বাধা বিঘ্ন শত যদি বা পথের
সমুখে আসিয়া পড়ে আমাদের,
লক্ষ্য তবু স্থির রাখিস্ রে মনে—
মুক্তি চাই—মন্ত্র ধর্ প্রাণপণে॥

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

ব্যথা।

পিলু বাঁরোয়া—দাদরা।

আমার প্রাণের ব্যথা কারে জানাই—
কারে জানাই—কারে জানাই—
তোমায় ছেড়ে কারে জানাই ?
রক্ত-ধারা পড়ছে ঝরে বুকের পাঁজর ভেঙ্গে চুরে—
মরম-ব্যথা কারে জানাই ?
ব্যথায় কাতর একলা আমি বসে আছি দিন-যামি
অপেখিয়া তোমায় আশায়
তবু তোমার দেখা না পাই।
তোমায় ছেড়ে পারি না আর রইতে হেথা ঘরে আঁধার ;
এসো বঁধু এসো হিয়ায়
প্রাণের বেদন তোমায় জানাই—
তোমায় ছেড়ে কারে জানাই ?

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী।

I সা সরা সন্‌া II সা সরজ্ঞা -া I রা মজ্ঞজ্ঞা -া। রজ্ঞমা জ্ঞা -া I
আ মা॰ ॰র প্রা ণে॰ ॰ র ব্য থা॰ ॰ ॰ কা॰ ॰ রে ॰]

I রা সা রা। সরা সন্‌ন্‌া -া I সা সরা জ্ঞা। রা মজ্ঞা -া I
জা না ই আ॰ মা॰ ॰ র প্রা ণে॰ র ব্য থা ॰

I রমা জ্ঞা -া। রা সা -া I গা গা -া। গা গা -া I মা গমা পা।
কা॰ রে ॰ জা না ই কা রে ॰ জা না ই কা রে॰ ॰

। মা পা -া I মা মজ্ঞজ্ঞা -া। রা মজ্ঞা -া I রমা জ্ঞা -া। রা সাঃ রঃ I
জা না ই তো মা॰ ॰ র ছে ড়ে ॰ কা॰ রে ॰ জা না ই

I সরা সন্‌া -া II
"আ॰ মা র"

[মজ্ঞা রসা]
{ I ন্‌া -া সা। গা গা মা I মা গমপা পা। পা পা -া I পা পা ধা।
র ॰ ক্ত ধা রা ॰ প ॰॰ড় ছে ঝ রে ॰ বু কে র

। পধণা পাঃ ধপঃ I পা পধা পমগা। গা মা গমপা I} গমপা মা -া।
পাঁ॰॰ জ ॰র ভে ঙে॰ ॰॰॰ চু রে ॰॰ ম॰॰ র ম

•　　　　　১´　　　　　•　　　　　১´
। জ্ঞরা ঋজ্ঞা -া I　রমা জ্ঞা -া। রা সা -া I　সরা ঋন্‌া -া II
ব্য৹ থা ৹　কা৹ রে ৹　জা না ই　আ৹ মা র

১´　　　•　　　১´　　　•　　　১´
I ন্‌া ন্‌া -া। ন্‌া ন্‌া -া I　সা -া সা। সা সা -া I　ঋজ্ঞা জ্ঞা -া।
ব্য থা র　কা ত র　এ কা কা　আ মি ৹　ব সে ৹

•　　　১´　　　•　　　১´　　　•
। রা জ্ঞা -া I　রমা জ্ঞজ্ঞা -া। রা সা -া I　ন্‌া সা -া। গা গা মা I
আ ছি ৹　দি৹ ন ৹ ৹　যা মি ৹　অ পে ৹　খি য়া ৹

১´　　　•　　　১´　　　•
I মা গমা গমপা। মা পা -া I　মা ঋজ্ঞা -া। রা মজ্ঞজ্ঞা -া I
তো মা৹ ৹৹র্　আ শা য়　ত বু ৹　তো মা৹ ৹ র

১´　　　•
I রজ্ঞমা জ্ঞা -া। রা সা -া I
দে৹ ৹ খা ৹　না পা ই

১´　　　　　　　　　　　　•
[মা ঋজ্ঞঃরঃ সা]　•　　১´　　[পা]
I {সা সা -া। গা গা মা I　মা মা গমপা। মা পা -া I
তো মা র　ছে ড়ে ৹　পা রি ৹৹৹　না আ র

১´　　•
১´　　•　[ধা -া　ধণর্সা ণা -া　ধা পা -া]
I পা -া ধা। পধণা ণাঃ ধপঃ I　পা পধা পমা। গা মা গমঃ পঃ I}
র ই তে　হে৹ ৹ থা ৹৹　ঘ রে৹ ৹৹　আঁ ধা ৹ র্

১´　　　•　　　১´　　　•
I র্গর্সা ণা -া। ধপা পা -া I　পধা পা -া। মা গা -া I
এ সো ৹　বঁ৹ ধু ৹　এ সো ৹　হি য়া র

১´　　　•　　　১´　　　•
I গা গা -া। মা মা -া I　মা গমা গমপা। মা পা -া I
প্রা ণে র　বে দ ন　তো মা৹ ৹৹র　জা না ই

১´　　　•　　　১´　　　•
I মা মজ্ঞজ্ঞা -া। রা ঋজ্ঞা -া I　রমা জ্ঞা -া। রা সা -া I
তো মা৹ ৹ র　ছে ড়ে ৹　কা৹ রে ৹　যা বো ই

১´
I সরা ঋন্‌া -া IIII
"আ৹ মা র"

জড়জগতে ও মানবাত্মায় ভগবানের প্রকাশ।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

বহির্জ্জগতের ন্যায় মানবাত্মা আর একখানি ধর্ম্মশাস্ত্র বস্তুতঃ বহির্জ্জগৎ অপেক্ষা অন্তর্জ্জগৎ আরও অধিক নিগূঢ় ও রহস্যময়। এবং বহির্জ্জগতে আমরা যে অনন্তের পরিচয় পাই, মানবাত্মাতে সেই পরিচয় আরও অধিক সমুজ্জ্বল। অনেক লোক আছেন যাঁহারা মানবপ্রকৃতি যে কত জঘন্য সংসারে কেবল তাহাই দেখিয়া দুঃখ করেন।

মানুষের মধ্যে অনেক জঘন্যতা আছে সত্য। মানুষের প্রতারণা, অত্যাচার ও স্বার্থপরতা যে কত, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। যাঁহারা মানবপ্রকৃতির মহত্ত্বের কথা বলেন তাঁহারা যে এসকল জানেন না তাহা নহে। কিন্তু তাঁহারা ইহাও লক্ষ্য করেন যে মানুষের নীচতা ও হীনতার মধ্য হইতে কতকগুলি দেবভাব ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। এই দেবভাবগুলির মধ্যেই তাঁহারা মানুষের সত্য পরিচয় দর্শন করেন। মানুষের বর্ত্তমান দুর্দ্দশাই তাহার সম্বন্ধে চরম সত্য নহে। বর্ত্তমানে মানুষের যতই নীচতা ও হীনতা থাকুক না কেন, তাহার ভবিষ্যৎ গৌরব আমরা ধারণা করিতে পারি না। স্বর্গের ঈশ্বর যে মানুষকে স্নেহ করেন সে স্নেহের সে অযোগ্য নহে। মানবপ্রকৃতিকে এইভাবে দেখিলে বুঝা যায় যে পৃথিবীর জীবন অনন্ত জীবনের সূচনামাত্র, ইহলোক পরলোকের আয়োজন মাত্র। যে বীজটী সুবিপাল বনস্পতিতে পরিণত হইবে, ইহলোকে আমরা তাহার অঙ্কুরমাত্র দেখিতেছি। পরলোক না মানিলে ইহলোকও বুঝা যায় না, মানবপ্রকৃতির অনেক কথাই অর্থহীন বলিয়া মনে হয়। ইহলোকে মানুষ যতই উন্নত হোক না কেন, পরলোকের অনন্ত পথে চলিতে চলিতে সে যে জ্ঞান প্রেম ও ভদ্রতার অধিকারী হইবে তাহার তুলনায় বর্ত্তমান জীবনের উন্নতি কিছুই নহে।

ন্যায়ই বা কি আর অন্যায়ই বা কি, মানুষ মাত্রেই তাহা জানে। জীবনের সকল বিভাগেই আমরা এই জ্ঞানের পরিচয় পাই। শিক্ষা বল, শাসন বল, সমাজসংস্কার বল, রাজনৈতিক আন্দোলন বল—সর্ব্বত্রই ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞান বা বিবেক মানুষকে পরিচালিত করিতেছে। কস্মিন্ কালেও জগতের কোন জাতি এই জ্ঞানবিবর্জ্জিত ছিল না। কোন্ কাজে আমাদের লাভ আর কোন্ কাজেই বা আমাদের ক্ষতি, কোন্ কাজ আমাদের ভাল লাগে আর কোন কাজই বা আমাদের নিকট বিরক্তিজনক—বিবেক তাহা গ্রাহ্য করে না। যাহা ন্যায় এবং সত্য বিবেক আমাদিগকে তাহারই অনুসরণ করিতে বলে। এই বিবেক মানুষেরই একটী মনোবৃত্তি বটে, মানুষেরই অন্তরে বাস করে বটে, অথচ প্রভুর ন্যায় মানুষকে আদেশ করিবার ইহার একটা আশ্চর্য্য অধিকার আছে।

শক্তি সামর্থ্য, রুচি ও প্রকৃতি ভেদে মানুষ অনেক রকমের। কিন্তু মানুষ যে কখন নির্ম্মল প্রেম অপেক্ষা দ্বেষ-হিংসাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে পারে কিম্বা নিঃস্বার্থ পরোপকার অপেক্ষা প্রবঞ্চনাকে অধিক ভক্তি করিতে পারে, একথা কল্পনা করাও যায় না। যেমন মানুষের বুদ্ধি কোন একটী বস্তুর অংশকে সমগ্র বস্তুটীর অপেক্ষা বড় বলিয়া ভাবিতে পারে না, সেইরূপ মানুষের নীতিজ্ঞান বা বিবেক পরোপকার অপেক্ষা প্রবঞ্চনাকে এবং প্রেম অপেক্ষা দ্বেষ-হিংসাকে ভাল বলিয়া ভাবিতে পারে না। মানবঅন্তরে যত প্রকার মনোবৃত্তি আছে তাহাদের মধ্যে বিবেক সর্ব্বাধিপতি সম্রাট। যে জীবের অন্তরে বিবেকের বসতি, সে জীব কখনও তুচ্ছ নহে। সত্য ও ন্যায়ের অনুসরণই আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ বিধি। বহির্জ্জগতে আমরা ভগবানের শক্তির পরিচয় পাই বটে কিন্তু আমাদের হৃদয়নিহিত বিবেকে আমরা সাক্ষাৎভাবে তাঁহার বাণী শ্রবণ করি। জড়ের শক্তি তাঁহারই শক্তি একথা সত্য, জড়রাজ্য তাঁহারই হস্তে পরিচালিত একথাও সত্য, কিন্তু যখন আমরা অনুভব করি যে আমাদের ধর্ম্মজীবনের মূলে তিনি—তখন তাঁহার পরিচয় আরও কত উজ্জ্বল বলিয়া লাগে!

যখনই আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক বিবেককে লঙ্ঘন করি এবং পাপপ্রলোভনের নিকটে পরাভব স্বীকার করি, তখনই আমরা নিজেদের চক্ষে কত হীন হইয়া যাই এবং আমাদের হৃদয় হইতে কি গভীর ধিক্কার উত্থিত হইতে থাকে; যতই আমরা প্রলোভনকে অতিক্রম করি এবং দৃঢ়তার সহিত ন্যায় ও সত্যের অনুসরণ করি, ততই আমাদের মনের শক্তি সবল হইতে থাকে। মানুষ যে এইরূপে কত উচ্চ জীবন লাভ করিতে পারে এবং মানুষের প্রকৃতিতে যে কি মহত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে, মহাপুরুষগণ তাহার সাক্ষী। পৃথিবীতে সময়ে সময়ে এমন লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা ন্যায় সত্য এবং পবিত্রতাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং জগতের সেবায় আপনাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্পণ করিয়াছেন। সংসারের অপমান ও নির্য্যাতন তাঁহাদিগকে আশ্চর্য্য বলে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। ইহাদেরই জীবনের আলোকে মানবের ইতিহাস সমুজ্জ্বল। সকল মানুষেরই অন্তরে যে শক্তি

বীজরূপে প্রচ্ছন্ন আছে, মহাপুরুষগণের জীবনে আমরা সেই শক্তিরই পূর্ণতর বিকাশ দর্শন করি।

কিন্তু মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব এই যে মানব ভগবানের পূজা করিতে পারে, তাঁহাকে ভক্তি করিতে পারে, তাঁহার ইচ্ছাকে জীবনে কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। তাঁহার করুণা ও প্রেম অনুভব করিতে পারে এবং তাঁহার অনন্ত আনন্দ ও শুদ্ধতার অন্ততঃ কণামাত্রও সম্ভোগ করিতে পারে। ইহা যে মানুষের কত বড় গৌরব ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম, বুদ্ধি তাহা ধারণা করিতে অসমর্থ। এ গৌরব আমরা ধারণা করিতে পারি না বলিয়াই আমরা কথাটা এমন শান্তভাবে শুনি। যদি কথাটার অর্থ আমরা বাস্তবিক বুঝিতাম তবে আনন্দে অধীর হইতাম, মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠিত। যদি মানুষের ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকিত তবে তাহার অন্তরে যে সত্য মঙ্গল ও শুদ্ধতার ভাব আছে তাহা শুষ্ক হইয়া যাইত। ভগবানের সহিত যোগের দ্বারাই আমাদের হৃদয়নিহিত ধর্ম্মভাব সবল ও পরিপুষ্ট হয়। তাঁহাকে ছাড়িয়া আমাদের প্রকৃতির উচ্চতম ভাবগুলির বিকাশ অসম্ভব। আমরা যে তাঁহাকে অন্তরের অন্তরে সত্য বলিয়া অনুভব করি তাহা এইজন্য যে তাঁহার সহিত মানবাত্মার একটা প্রকৃতিগত সম্বন্ধ আছে, মানবাত্মা তাঁহারই প্রকৃতির একরূপ ছায়া। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে কি মানুষ তুচ্ছ?

ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে যে কত প্রকার অধর্ম্ম ও কুসংস্কার প্রচলিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা কঠিন। কিন্তু এই সকল অধর্ম্ম ও কুসংস্কারের মূলে অনেক স্থলে কিছু কিছু সত্য দেখা যায়। সকলেই জানেন যে নানা দেশে ও নানা ধর্ম্মে মহাপুরুষদিগকে ঈশ্বরজ্ঞানে বা ঈশ্বরের অবতারজ্ঞানে পূজা করা হয়। ইহা যে একটা ভয়ানক কুসংস্কার তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার মূলে এই সত্যটুকু বর্ত্তমান যে মানবপ্রকৃতি ভগবৎস্বরূপেরই প্রতিবিম্ব এবং মহাপুরুষগণ সেই প্রকৃতির উজ্জ্বলতম প্রকাশ। সুতরাং লোকে যে তাঁহাদিগকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করিয়াছে তাহা বিচিত্র নহে।

যে ব্যক্তি মানুষকে একপ্রকার পশু বলিয়া মনে করে সে যে অপরের প্রতি পশুর ন্যায়ই ব্যবহার করিবে তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। সে অপরের অধিকার হরণ করিতে এবং অপরের হৃদয় পদদলিত করিতে কুণ্ঠিত হইবে কেন? সে অপরকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্ররূপে জ্ঞান করিবে না কেন? সে অপরের দুঃখমোচনের জন্য নিজের সুখ বিসর্জ্জন করিবে কেন? মানবপ্রকৃতির মধ্যে যে কি দেবত্ব প্রচ্ছন্ন আছে তাহা যে না দেখিবে তাহার পক্ষে মানুষকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা সম্ভব নহে। এই প্রচ্ছন্ন দেবত্ব দর্শন করিলে আমাদের পরস্পরের সহিত সমুদয় সম্বন্ধ, আমাদের সমুদয় সামাজিক কর্ত্তব্য পবিত্র বলিয়া মনে হইবে। লোকের সহিত ব্যবহারে এমন একটা কোমলতা আসিবে, যাহার সহিত বর্ত্তমানের বাহিক ভদ্রতার তুলনাই হয় না। লোকের দুঃখ-কষ্ট দূর করিবার জন্য এমন একটা বল ও উৎসাহ আসিবে, যাহার সহিত তুলনায় বর্ত্তমানের শুষ্ক অনুগ্রহ কিছুই নহে। মানবপ্রকৃতিকে যদি আমরা সম্ভ্রম করিতে শিখি, সমাজ নূতনভাবে গঠিত হইবে, পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইবে।

আকাশ অনন্ত, কালও অনন্ত। আমরা আকাশের আরম্ভ ও সীমা কল্পনা করিতে পারি না, কালেরও আরম্ভ ও সীমা কল্পনা করিতে পারি না। তথাপি আকাশ ও কালের যে কোন জ্ঞানই আমাদের নাই—এ কথা বলা যায় না। ভগবৎস্বরূপ সম্বন্ধেও সেই কথা। অনন্তস্বরূপের পূর্ণ ধারণা মানুষের মত ক্ষুদ্র প্রাণীর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব বটে, কিন্তু আমরা তাঁহার কথা চিন্তা করিতে সমর্থ, এবং আমরা অন্ততঃ এতটুকু উপলব্ধি করিতে পারি যে তিনি আমদের পিতা এবং আমরা তাঁহার সন্তান। এ কি কম সৌভাগ্যের কথা!

এই সত্যের আলোকে ভগবানের সহিত আমাদের সম্বন্ধে নূতন আকার ধারণ করিবে; এই সত্য ধারণা করিতে না পারিয়া মানুষ যে ধর্ম্মের নামে কত কুসংস্কার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বলা যায় না। ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার চাইজ। যিনি ধর্ম্মকে আশ্রয় করেন তিনি দিন দিন ধর্ম্মজীবনে আরও অগ্রসর হন, আরও জ্ঞান প্রেম ও শুদ্ধতাতে সমুন্নত হন। কিন্তু লোকে ধর্ম্ম বলিতে বুঝিয়াছে যে নানা প্রকার স্তবস্তুতি করিয়া, নানা প্রকার নৈবেদ্য উপহার দিয়া, নানা প্রকার কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা দেবতার ক্রোধ শান্তি করিতে হইবে; এবং তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিয়া সংসারযাত্রার কতকটা সুবিধা করিতে হইবে। ইহার মূল কথা দেবতাকে ভয়—দেবতার প্রতি বিশ্বাস নহে কিন্তু অবিশ্বাস। আমরা মুখে যাঁহাকে ভগবান বলিয়া আরাধনা করি, মনে মনে তাঁহাকে একপ্রকার রাক্ষসের আকারে দেখি ও ভয় করি। মানুষ যতদিন আপন প্রকৃতিনিহিত দেবত্ব না দেখিবে, ততদিন তাহার ভগবানের সহিত সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে না এবং সে ভগবানের সত্য পূজা করিতেও সমর্থ হইবে না।

বাস্তবিক মানুষ আপনাকে জানে না। আমরা অন্যান্য সকল তত্ত্বের আলোচনা করি, কেবল আত্মতত্ত্বের আলোচনা করি না। আমরা মুখেই বলি যে মানুষ

ঈশ্বরের সন্তান, কিন্তু কথাটার অর্থ ভাবিয়া দেখি না। এ কথাটা আমাদের অন্তরে স্থানই পায় না। আমরা পরলোকের কথা জানিবার জন্য উৎসুক হই, আমরা স্বর্গ ও নরকের সংবাদ শুনিবার জন্য ব্যাকুল হই, কিন্তু আমাদের নিজ নিজ হৃদয়ের দিকে একবার দৃষ্টি করি না। আমাদের হৃদয়ের সহজ অনুভূতি বা সাক্ষ্য এই যে পাপীসাধু-নির্ব্বিশেষে সকল মানুষ ভগবানের পুত্রকন্যা, তাঁহারই আদর্শে গঠিত; এবং অনন্ত জীবনে দিন দিন ন্যায় ও সত্যে, প্রেম ও পুণ্যে, আশা ও আনন্দে সেই আদর্শের দিকে ফুটিয়া উঠিবে—এই মহা সৌভাগ্য ভগবান স্বহস্তে আমাদের প্রত্যেকের ললাটে লিখিয়া দিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধীর লবণ অভিযান।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মহাত্মা গান্ধী যে লবণ সংক্রান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা বর্ত্তমানে পুরাতন ইতিকথায় দাঁড়াইয়াছে। কেবল ইতিকথা নহে, ইহা এখন একটী বিরাট রাজনৈতিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়া ইহার ফলাফল বা লাভালাভ আমরা বিচার করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী যে ভাবে এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাতে দেশের নৈতিক, এমন কি, রাজনৈতিক হাওয়াও যে অনেক পরিমাণে পরিষ্কার হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেশের রাজনৈতিক নেতাগণ একটী মন্ত্র প্রচার করিতেছিলেন—The end justifies the means, অর্থাৎ উদ্দেশ্য সৎ হইলেই হইল, তাহা সফল করিবার জন্য অসৎ উপায় অবলম্বন করিলেও কোন দোষ আসিতে পারে না। বর্ত্তমানে আমরা যে বিশাল অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বাস করিতেছি, সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঐ মন্ত্রের দিয়াশলাইকাঠি নিক্ষিপ্ত হইলে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ইতিপূর্ব্বেই ভারতে একটা সুবৃহৎ দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত নিঃসন্দেহ। ভাগ্যক্রমে মহাত্মা গান্ধী দেশের রাষ্ট্রনৈতিক তরীর কর্ণধার হইয়াছিলেন, তাই দেশ সেই দাবানল হইতে রক্ষা পাইয়াছে ও পাইতেছে। মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্র যতদূর বুঝিতে পারি, উদ্দেশ্য সাধু হওয়া আবশ্যক এবং তাহাকে সফল করিবার জন্য অবলম্বিত উপায়সকলও সাধু হওয়া আবশ্যক। ঐ যে মহাত্মা গান্ধী প্রকাশ করিলেন যে, 'ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবার ফলে লবণ অভিযানের আদেশ পাইয়া তবে এই কার্য্যে নামিয়াছেন,' ঐ কথা দ্বারাই তো ঐ কার্য্যকে ধর্ম্মভিত্তি করিয়া উহাতে অসংযম প্রবেশ করিবার পথ যথাসাধ্য রুদ্ধ করিয়া দিলেন। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের বল অনেক বেশী। প্রত্যেক কার্য্যে উপাসনা করিয়া ভগবানের আদেশ বুঝিবার চেষ্টায় যে দৃষ্টান্ত মহাত্মা গান্ধী প্রতিনিয়ত প্রদর্শন করিতেছেন, এই দৃষ্টান্তই তো দেশবাসীকে ভগবানের চরণে সজোরে আকর্ষণ করিতেছে। আমরা তো প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, ইহার ফলে দেশের হাওয়া ফিরিয়াছে—মধ্যে কয়েকমাস দুর্নীতির যে ঘূর্ণাবায়ু উঠিয়াছিল, সেই ঘূর্ণাবায়ু যেন নিবৃত্ত হইবার পথে চলিয়াছে। তাঁহার ভগবৎপ্রাণতা দেশবাসীকে সুনীতির পথে সুদৃঢ় থাকিবার জন্য এক আশ্চর্য্য বল প্রদান করিয়াছে ও করিতেছে। জাটগা শিবিরে গত ৩০শে মার্চ তিনি এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে নিজের সহচর অনুচরদিগের লঘুচিত্ততা ও অমিতব্যয়িতার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়া, দেহরক্ষার জন্য যাহা নিতান্ত আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত এতটুকু খরচ করিতে নিষেধ করেন। তিনি ঐ বক্তৃতায় স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে, "ব্যয়বাহুল্য ব্যতীত যদি কংগ্রেসের বাণী প্রচার করিতে না পারি, তাহা হইলে ঐরূপ সভাসমিতি না হইলেও আমি দুঃখিত হইব না।" ইহার পর তিনি তাঁহার প্রাণের আবেগে যে মর্ম্মস্পর্শী বাণী বলিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক দেশহিতৈষীর নিত্য ও প্রতিমুহূর্ত্তে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সে বাণী এই—"স্বাধীনতাযুদ্ধ এই ধরণের গড়িয়া-তোলা সভা ও বাহ্যিক আড়ম্বরের ও সংবাদপত্রের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে না। স্বাধীনতাযুদ্ধ নির্ভর করে ঈশ্বরবিশ্বাসের উপর। আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ও আত্মানুসন্ধান ব্যতীত ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর আসে না"।* মহাত্মা গান্ধী এই যে বাণী দেশবাসীকে দিয়াছেন—ইহার মূল্য যে কত, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? আজ শত বৎসর পূর্ব্বে আর এক মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায় দেশবাসীকে ঐ বাণীই শুনাইয়াছিলেন—"হে মন কর আত্মানুসন্ধান—রবির (শমন) ভয় রবেনা—রবে না"। আজ শত বৎসর পরে ঐ বাণী মহাত্মা গান্ধীর ভিতর দিয়া সফলতা লাভ করিতে চলিয়াছে। আত্মানুসন্ধানের ফলে মৃত্যুর বিভীষিকা যখন চলিয়া যাইবে, স্বাধীনতা তখন তো স্বতই করতলন্যস্ত হইবে। প্রাচ্য ভূখণ্ডে যে সকল ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সে সকলেরই মূল প্রাণ হইল ঐ আত্মানুসন্ধান। ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর এবং আত্মানুসন্ধান অপেক্ষা মৃত্যুভয় অতিক্রম করাইবার দ্বিতীয় কোন মন্ত্র বা অস্ত্র আছে কি না সন্দেহ। মহাত্মা গান্ধী এই অমোঘ মন্ত্রকে

* আনন্দবাজার-পত্রিকা—১৭ চৈত্র, ১৩৩৬।

আত্মগত করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তিনি অনুগ্র (non-violent) অসহযোগে নিজেও সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং দেশবাসীকে উহাতে সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর করিয়া দিতে সক্ষম হইতেছেন। তিনি যদি দেশের মধ্যে উপদেশ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা অনুগ্র অসহযোগের বীজ দু-চোখো বিকীর্ণ না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় কেবল আর্য্যাবর্ত্তে নহে, কিন্তু সমগ্র ভারতে দ্বিতীয় সিপাহীবিদ্রোহ প্রজ্জ্বলিত হওয়া অসম্ভব হইত না। দেশের উগ্রভাবকে দমন রাখিবার ক্ষমতা বর্ত্তমান যুগে একমাত্র মহাত্মা গান্ধীই ধারণ করেন। রাজনীতিকগণ স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যিনি যতই বলুন না কেন, আমাদের সহজ জ্ঞান এই বলিতেছে যে, ঠিক এই সময়ে মহাত্মা গান্ধীকে কারাগারে আবদ্ধ রাখা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হয় নাই। নিরুপদ্রবের সঙ্গে, এমন বিশুদ্ধিসহকারে সংগ্রামে নামা একমাত্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে, বিশেষত ভারতবর্ষেই সম্ভব, যেখানে অহিংসামন্ত্র সকল সময়ে কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলেও, দেশবাসী মর্ম্মে মর্ম্মে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। পাশ্চাত্যগণ যতই চেষ্টা করুন, এই অনুগ্র অসহযোগের প্রাণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ, কারণ তাঁহারা ধর্ম্মকে হিংসা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত করিতে এখনও শিক্ষা করেন নাই। তাঁহাদের মন্ত্র—Pray, but keep the powder dry অর্থাৎ ভগবানের কাছে জয়ের জন্য তোমার প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হয় প্রার্থনা কর, কিন্তু বাপু হে, আসল কথাটা ভুলো না—সেটা হইতেছে বারুদ শুক রাখা; অর্থাৎ হিংসার দিকে চক্ষু রাখিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে হয় কর। কিন্তু এদেশের সকলেরই সাধারণত প্রাণের মূল কথা—অ-হিং-সা। সেই যে সুদূর—সুদূর পুরাকালে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের সংগ্রামে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রের পরাজয়ের কল-কলা ভেদ করিয়া বশিষ্ঠের শান্তভাবের সংস্পর্শে অহিংসার মহাবাণী—'ধিক্ বলং ক্ষাত্রবলং ব্রহ্মতেজো বলং বলং' সমুত্থিত হইয়াছিল, এবং ভারতের মর্ম্মে মর্ম্মে মিশিয়া গিয়াছিল—নানা আকারে প্রকারে তাহাই সময়ে সময়ে ফুটিয়া বাহির হইতে চায়। আজ মহাত্মা গান্ধীর ভিতর দিয়া ঐ অহিংসার মহাবাণীই ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। বিশ্বপিতা অখিলমাতা ভগবান যদি জাগ্রত থাকেন, তিনি যদি জাগ্রত দেবতা হন, তিনি যদি সকলের ভয়ের ভয় এবং ভয়ানকের ভয়ানক হন, তিনি যদি রক্ষকদিগের রক্ষক হন, তবে আমরা নিঃসঙ্কোচে এই ভবিষ্যদ্বাণী বলিতে পারি, অদূর ভবিষ্যতে জগত হইতে হিংসাভাব অন্তর্হিত হইবে এবং অহিংসারই জয়-জয়কার হইবে।

কুড়ানো গান।

(কাঙ্গাল হরিনাথের)

মন-মাঝি সামাল সামাল
ডুবলো তরী ভবের নদী
তুফান ভারি।

তোর হেলে পেলে না জল
কি করবি বল
কেমনে জমাবি পাড়ি।

কলানুশীলন।

(সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী Doc. Mus. (Ind.))

অনন্তজ্ঞান মহান পুরুষ সকল জ্ঞানের একমাত্র উৎস বলিয়া জ্ঞানের সীমা আমরা দেখিতে পাই না—তাহা আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত। যতই জ্ঞান লাভ করা যায়, জ্ঞানলাভের পিপাসা ততই আরও—আরও—আরও বর্দ্ধিত হইতেই থাকে—জ্ঞানপিপাসার আর নিবৃত্তি হয় না।

এই জ্ঞান আমরা বিভিন্ন আকারে প্রকারে অভিব্যক্ত হইতে দেখি। এই জ্ঞানের একটী মূর্ত্তি ভাবময় আকারে ললিতকলার ভিতর দিয়া বিকশিত হইয়া উঠে। ইহা ভগবানের একটীমাত্র জ্ঞানকণার বিকাশ হইলেও ইহারও এক-একটী বিভাগ আয়ত্ত করিতে ঐকান্তিক চেষ্টা সত্বেও মানবের জীবনে কুলাইয়া উঠে না। ললিতকলার ক্ষেত্র এতই গভীর ও অতলস্পর্শী যে, উহার তল খুঁজিয়া পাওয়াই অসম্ভব। ইহার ক্ষেত্র অপর দিকে এতই বিস্তীর্ণ যে, সকলগুলি যুগপৎ আয়ত্ত করা দূরে থাক, ললিতকলার এক-একটী বিভাগও এপর্য্যন্ত কোনও মানবই সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে বলিয়া জানি না। প্রত্যেক বিভাগের এক-একটী উপবিভাগও আয়ত্ত করিতে গেলে বহু বৎসরব্যাপী কঠোর সাধনা আবশ্যক। এই কারণে অতি অল্প লোককেই ললিতকলার পূর্ণকুশলতা লাভ করিতে দৃষ্ট হইয়াছে।

আমাদের শাস্ত্রে চৌষট্টি প্রকার কলাবিদ্যার উল্লেখ আছে, কিন্তু ঐ সকলের মধ্যে সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতি ললিত কলারই শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বজনসম্মত; তাই কলাবিদ্যা বলিতেই সাধারণত ললিতকলাই আমরা বুঝি। বর্ত্তমান প্রবন্ধেও আমরা ললিতকলার অর্থেই "কলা" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছি।

কেবল পার্থিব সুখসাধনের উদ্দেশ্য লইয়া কলার অনুশীলন করিলে তাহা পূর্ণ সাফল্য লাভ করিবে না। আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, আমাদের সকল জ্ঞানের পরিসমাপ্তি ভগবানে। তাঁহারই প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে

এবং লোকহিতার্থে কলার অনুশীলনেই তাহার সার্থকতা।

বিশ্বকার্য্য আলোচনা করিলে সহজেই প্রতীত হইবে যে, মানবের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য প্রকৃতিতে ভগবান নানা উপায় নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। কলাসমূহও সেইসকল উপায়ের অন্যতর। কলাসমূহের যথাযথ অনুশীলনে ও প্রয়োগে মানবসমাজের বহুবিধ হিতসাধন করা সম্ভব হয়। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, মানবের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ভগবৎপ্রদত্ত এমন একটা সুন্দর উপায়ের আমরা বহুলতর অনুশীলন বা যথাযথ প্রয়োগ করি না।

কলাচর্চ্চার ফলে কেবল যে আমরা আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বা মঙ্গলসাধনের সুবিধা প্রাপ্ত হই তাহা নহে। কলাচর্চ্চার আর একটা দিক হইতেছে এই যে, ইহা আমাদের জ্ঞানের গভীরতা ও প্রসারবৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। কলাচর্চ্চার ফলে আমাদের সুখসম্পদ লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন দ্বার আশ্চর্য্যরূপে উন্মুক্ত হইয়া যায়। কলাচর্চ্চার সঙ্গে জ্ঞানলাভের একটী ঘনিষ্ঠযোগ দৃষ্ট হয়। যথাযথভাবে কলাসমূহের উন্নতিসাধনের সঙ্গে জ্ঞানেরও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আবার জ্ঞানের প্রসারবৃদ্ধির সঙ্গে মানবের মানসিক ও নৈতিক উন্নতিসাধনের পক্ষে কলাসমূহের অনুশীলনের ন্যায় অপর কোন কিছু সহায়তা করে কি না সন্দেহ। আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে, কলাসমূহ আমাদের কেবলমাত্র বাহিরের শোভাবর্দ্ধন করিবার বস্তু নহে; মানবের মনোবৃত্তিসকল পরিমার্জ্জিত করিয়া মানবকে সুনীতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতে কলাসমূহ বড়ই সহায়তা করে। এই কারণে কলাসমূহের অনুশীলনের ন্যূনাধিক্য অনেক সময়ে জাতীয় সভ্যতার মাপকাঠিরূপে পরিগণিত হয়।

কলাচর্চ্চা কেবলমাত্র আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের অথবা জ্ঞানের প্রসার ও গভীরতা বৃদ্ধি করিবার সহায়তা করে না, সঙ্গে সঙ্গে ইহা আমাদের আনন্দবিধানে অত্যন্ত সহায়তা করে। বলিতে কি, আনন্দবিধানের সঙ্গে কলাচর্চ্চার এতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, শতবিধ শোকদুঃখের ভিতরেও কলাবিৎ কলা অনুশীলন করিতে করিতে সমস্ত শোকদুঃখ ভুলিয়া যান। ইহার কারণ এই যে, কলাবিৎ তাঁহার কলার ভিতর দিয়া অনন্ত আনন্দের একটা অনাহত সুর ধ্বনিত হইতে শোনেন—বিশাল বিরাট আনন্দের একটী সূক্ষ্ম নাদ শ্রবণ করেন। যখন সুগম্ভীর ধ্রুপদ রাগ-রাগিণীতে, অথবা বহুজনের সমবেতকণ্ঠে কীর্ত্তনের পদাবলীসকল, অথবা সাধারণের মর্ম্মস্পর্শী রাগ-রাগিণীতে খেয়াল প্রভৃতি গীত হয়, তখন কে অস্বীকার করিবে যে, সেই সকলের ভিতরে একটা অসীমের সূক্ষ্ম সুর ধ্বনিত হইয়া মানবের অন্তরে ঝঙ্কার দিয়া উঠে? শুধু সঙ্গীত কেন, চারুকলার প্রত্যেক বিভাগই আমাদিগকে সসীম হইতে অসীমের রাজ্যে লইয়া যায়।

আমরা উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, কলাচর্চ্চার অন্যতর ফল আমাদের মানসিক উন্নতিসাধন। এই উন্নতিসাধন করিতে গেলে কলাচর্চ্চাকে ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। "ধর্ম্ম" শব্দের অর্থ যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। জগতকে যাহা উন্নতির পথে, মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিবে, তাহাই জগৎকে ধারণ করিবে, সুতরাং তাহাই ধর্ম্ম। যাহা কিছু সৎ ও সত্য, তাহাই জগৎসংসারকে উন্নতি ও মঙ্গলের পথে লইয়া যায়, এবং যাহা কিছু অসৎ ও অসত্য তাহাই জগতসংসারকে অবনতি ও অমঙ্গলের দিকে লইয়া যায়। সুতরাং সৎ ও সত্যমূলক বিষয়সমূহই ধর্ম্মের মূল। এককথায় সাধারণত যাহা ভাল বলিয়া উপলব্ধ হয়, তাহাই ধর্ম্ম। কূটতর্কের দ্বারা ধর্ম্মের অর্থ বিকৃত করিলে চলিবে না। এই প্রকৃত ধর্ম্মের উপর কলা-চর্চ্চাকে প্রতিষ্ঠিত করিলে উহার ফলে উন্নতিসাধনও স্বাভাবিক। ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, কলাচর্চ্চা মানবের পক্ষে স্বাভাবিক ও কল্যাণপ্রদ।

কলাচর্চ্চার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র চিত্তবিনোদন বা উহা আমোদ-প্রমোদেরই একটা উপকরণ মাত্র, এই ভাব অন্তরে পোষণ করিয়া অনেকে মস্ত ভুল করেন। অনেকে ইহাকে অর্থলাভের উপায়মাত্ররূপে দৃষ্টি করেন; আবার অনেকে মাত্র খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কলাচর্চ্চায় হস্তক্ষেপ করেন। আমাদের মতে এই সকলের কোনটাই কলাচর্চ্চার প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। আমরা উপরে যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, একমাত্র ভগবানেই কলাচর্চ্চার প্রকৃত পরি-সমাপ্তি। কলাচর্চ্চা যদি ভগবানের অর্চ্চনায় নিয়োজিত হয়, তবেই তাহা সর্ব্বতোভাবে সার্থকতা লাভ করে। দুঃখের বিষয়, কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে কলাসমূহের ভগ-বদর্চ্চনায় প্রয়োগ অতি বিরল। কিন্তু কলাচর্চ্চার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যে সকল কলাবিৎ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বা অধ্যাত্মবিষয়ে কলাপ্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেরাও যেমন কীর্ত্তি লাভ করিয়া-ছেন এবং জগৎকেও যে প্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন; অন্যান্য কলাবিৎদিগের মধ্যে সে প্রকার খুব কমই দেখা যায়। তানসেন সদারঙ্গ প্রভৃতির ধর্ম্ম-সঙ্গীতগুলি ভারতকে যে প্রকার সঙ্গীতরাজ্যে শ্রেষ্ঠত্ব

প্রদান করিয়া জগতের মঙ্গল-সাধন করিয়াছে, নিধুবাবুর টপ্পা ও ভূতি যে তাহা করিতে পারে নাই, সে কথা বোধ হয় সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

কলাসমূহকে ধর্ম্মসাধন বা ভগবদর্চ্চনার উপযোগী করিতে হইলে উহার প্রাণে একটা স্বাতন্ত্র্য আনিতে হইবে—একটা অপার্থিব ভাব ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। কথাটা এত সহজ যে, ইহা অধিক বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক মনে করি না। দৃষ্টান্তস্বরূপে সঙ্গীতের কথাই বলি। ধর্ম্মসঙ্গীত আনন্দব্যঞ্জক হউক বা বিষাদ-ব্যঞ্জক হউক, ভগবানের করুণাপ্রকাশক হউক বা তাঁহার নিকট দয়াভিক্ষাসূচকই হউক, গানের কথা, সুর ও ভাব, সমস্তই এমনটী হওয়া উচিত যে, গানটী গীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে গায়ক ও শ্রোতা সকলেরই হৃদয়ে শ্রদ্ধাভক্তি উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে, সকলেই ভগবানে তন্ময় হইয়া যাইবে, আত্মহারা হইয়া যাইবে; ভগবানের চরণতলে সমাসীন, এই ভাবটাই শ্রোতৃবর্গের অন্তরে স্বতই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। এইরূপ সঙ্গীতাদিই মানবের অন্তরে স্থায়ীত্ব লাভ করে। কলার সকল বিভাগেই এই কথা প্রযোজ্য বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

Ram Mohan Roy's.
CONTROVERSY
with
UTSAVANANDA SARMA.

Copied from printed books now in the possession of the Serampur College and formerly in that of the London Missionary Society's Institution.

ভূমিকা।

ওঁ তৎসৎ। মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যের বেদান্ত-চন্দ্রিকা লিখিবাতে এবং তাঁহার অনুগতদিগের ঐ গ্রন্থ বিখ্যাত করাতে অন্তঃকরণে হর্ষ জন্মিয়াছে যে এইরূপ শাস্ত্রার্থের অনুশীলনের দ্বারা সকল শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ যে পথ, তাহা সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ হইতে পারিবেক; এবং কোন্ পক্ষে ভ্রম আর প্রতারণা ও স্বার্থপরতা আছে তাহাও বিদিত হইতে পারে এবং ইহাতে এক প্রকার নিশ্চয় হইতেছে যে ভট্টাচার্য্য একবার প্রবর্ত্ত হইয়া পুনরায় নিবর্ত্ত হইবেন না। অতএব দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকার উদয়ের প্রতীক্ষায় আমরা রহিলাম। কিন্তু তিন প্রকারে অন্তঃকরণে খেদ জন্মে, প্রথম এই যে সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাতে বেদান্তের মতে এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন; কিন্তু প্রগাঢ় প্রগাঢ় সংস্কৃত শব্দসকল ইচ্ছাপূর্ব্বক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল লোককে তাহার অর্থ হইতে বঞ্চনা এবং তাৎপর্য্যের অন্যথা করা হয়। অতএব প্রার্থনা এই যে দ্বিতীয় বেদান্ত চন্দ্রিকাকে প্রথম বেদান্তচন্দ্রিকা হইতে সুগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য্য লিখেন, যাহাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয়।

দ্বিতীয়। বেদান্তচন্দ্রিকা সাতষট্টি পৃষ্ঠা। তাহাতে অভিপ্রায় করি যে বেদান্তের অষ্ট-নয় সূত্রের অধিক নাই আর বেদের দুই তিন প্রমাণ লিখিয়া থাকিবেন; অধিকন্তু ঐ সকল সূত্র কোন্ অধ্যায়ের কোন্ পাদের হয় আর ঐ শ্রুতি কোন্ উপনিষদের অথবা কোন্ ভাষ্যে ধৃত হয় তাহা লিখেন না; এবং বেদান্তচন্দ্রিকার মঙ্গলচরণীয় প্রভৃতি শ্লোকসকল কোন্ গ্রন্থের হয় তাহা প্রায় লিখেন না। অতএব নিবেদন, দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে সূত্র এবং শ্রুতি আর স্মৃত্যাদির প্রমাণ ভট্টাচার্য্য লিখিবেন তাহার বিশেষরূপে নিদর্শন যেন লিখেন।

তৃতীয়। বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথমে লিখেন যে এই গ্রন্থ কাহার ভাষাবিবরণের উত্তর দিবার জন্যে লেখা যাইতেছে এমত নহে; অথচ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত হে অগ্রাহ্য নামরূপ অমুকেরা ইত্যাদি উক্তি দ্বারা কেবল আমাদিগ্যেই শ্লেষ করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে যাহা আমরা কদাপি কোন গ্রন্থে লিখি নাই এবং স্বীকার করি নাই তাহা আমাদের মত হয় এমৎ জানাইয়াছেন। অতএব তৃতীয় প্রার্থনা এই যে শাস্ত্রার্থের অনুশীলনে সত্যকে অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যদি আমাদের লিখিত মতকে ভট্টাচার্য্য দূষিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহার পৃষ্ঠ এবং পংক্তির নির্দ্দেশপূর্ব্বক লিখিয়া যেন দোষ দেন; তাহা হইলে বিজ্ঞ লোক দোষাদোষ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রালাপে দুর্ব্বাক্য না কহেন এ প্রার্থনা বৃথা করি, যেহেতু অভ্যাসের অন্যথা প্রায় হয় না। যদি ভট্টাচার্য্য কৃপাপূর্ব্বক দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্বাক্যে পরিপূর্ণ না করেন, তবে যথেষ্ট শ্লাঘা করিয়া মানিব। ইতি

প্রশ্ন।

ওঁ তৎসৎ। শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ শরণং।

মুক্তিস্ত্রীকর্ণপূরৌ মুনিহৃদয়বয়ঃপঙ্কজৌ তীরভূমী,
সংসারাপারসিন্ধোঃ কলিকলুষতমস্তোমসোমার্কবিম্বৌ।
উন্মীলন্নম্রপুণ্যোৎপলদলিতদলে লোচনে বৌ-শ্রুতীনাং, কামং

রামেতিবর্ণো শমিহ কলয়তাং সন্তভং সজ্জনানাং ॥ সচ্চিদানন্দানন্ততনুঃ পরং ব্রহ্ম ইতি শব্দিতঃ। শ্রীকৃষ্ণভগবানত্র ভক্তিগম্যো মনীষিণাং ॥ অত্র ভগবতঃ সচ্চিৎসুখানন্তবিগ্রহত্বে সূরীণাং যা বা বিপ্রতিপত্তি রুৎপদ্যতে সা সাংখ্যাতিরিক্তসুকূলযুক্ত্যা সমাধাতব্যেতি ব্যবসিতম্। অথ ভবান্ প্রষ্টব্যঃ। ভবাদৃশাং মতে কা জীবন্মুক্তি স্তৎসত্তাবে কিংবা প্রমাণং কথং বা সম্পাদনীয়া কেন বা সম্পৎস্যতে চ। জীবন্মুক্তো ব্রাহ্মণোঽতিবর্ণাশ্রমী কৃষ্ণভক্তঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যাদিপদবাচ্য এক এব বা নেতি যাদৃশ্য ব্রহ্মবিদ্যে তে শব্দাঃ প্রবর্ত্তন্তে। তথা সতি কৃষ্ণব্রহ্মশব্দয়োরেকার্থত্বং সুতরাং বাচ্যং। তদা ভবৎপ্রণীত-বেদান্তসারভাষায়াং কৃষ্ণ এব পরো দেব স্তং ধ্যায়েৎ ইতি তাপনীশ্রুতিপ্রতিপাদিত-পরদেবেন সাম্যং রুদ্রাকাশোদকধাত্বাদীনামনুচিতমিব ভাতি তেষাং সগুণত্বাৎ নির্গুণত্বাচ্চ তস্য ইতি জিজ্ঞাসয়া ভবদ্দিদৃক্ষা সমজনি।

এই প্রশ্ন ১৪ জ্যৈষ্ঠ রবিবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে আত্মীয় সভাতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সরকারের হস্তে পাওয়া গেল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত উৎসবানন্দ ভট্টাচার্য্য-প্রস্থাপিত।

উত্তর।

ওঁ তৎসৎ। রূপনামাদিনির্দ্দেশবিশেষেণ বিবর্জ্জিতঃ। অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামার্ত্তিজন্মভিঃ। বর্জ্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলং। কেনচিদ্বৈষ্ণবেণ ভগবতি চিদাত্মনি পরমেষ্ঠিনি কৃষ্ণে সমর্পিতচেতসা নির্গুণেন কৃষ্ণেন সহ সগুণানাং শিবাদীনাং সাম্যে কিং কারণমিতি কস্মিংশ্চিৎ প্রেশিতব্রহ্মবিদ্যে মিথ্যাত্বেন পরিগৃহীতনামরূপকে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদিষু বিহিতসাম্যভাবে পৃষ্টে সতি তত্রত্যঃ কশ্চিৎ শৈবঃ পরাৎপরে জগতামধীশ্বরে মহেশ্বরেঽদ্বৈতে পরমানন্দতত্ত্বে শিবে রুদ্রে সর্ব্বেষামেকতন্ত্রে সমবধারিত-মনোবাক্কর্ম্মা চোকুপ্যমানঃ প্রাহ কিমহো অনেন বৈষ্ণবেন কৈবল্যাদ্যুপনিষদো ন দৃষ্টাঃ, মহাভারতং পুরাণাদীনি চ নাবলোকিতানি, কেবলাঃ কাশ্চিদ্ বিষ্ণুপ্রতিপাদিকা এব শ্রুতয়োঽধীতাঃ। অন্যথা তুরীয়েঽদ্বিতীয়ে শান্তে শিবে গুণস্যারোপণং তদ্ভক্তে তদভিন্নত্বে বিষ্ণৌ তু নির্গুণত্বপ্রতিপাদনং কদাচিদপি নাকরিষ্যত। যদি ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদীনাং লীলয়া জনয়িতুঃ পাপাদ্মুক্তিপ্রদাতুঃ শিবস্য বস্তুতঃ সগুণত্বমনীশ্বরত্বঞ্চ স্যাৎ তদ্ভক্তস্য কৃষ্ণস্য তু নির্গুণত্বমীশ্বরত্বঞ্চ ভবেৎ তদা এতাসাং শ্রুতীনাং ভারতাদিবচনানাং চ কা গতিঃ স্যাৎ। তথাচ কৈবল্যোপনিষৎ তথাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতং। উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তং ইত্যাদিঃ। তথা স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনং জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে। ইত্যাদিশ্চ।

তথা শতরুদ্রীয়াং,—ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং। ঊর্দ্ধরেতসং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমোনমঃ। যো রুদ্রোঽগ্নৌ যোঽপ্সু য ওষধিষু, যো রুদ্রো বিশ্বাভুবনং বিবেশ তস্মৈ রুদ্রায় নমোঽস্তু ইত্যাদি। এতাশ্চেৎ শ্রুতয়ো ব্রহ্মপক্ষে ব্যাখ্যায়েরন্ তদা কৃষ্ণ এব পরো দেব ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়োঽপি তৎপক্ষ এব ব্যাখ্যাতব্যাঃ। হা হন্ত বৈষ্ণবোঽয়ং মহাভারতীয়-দানধর্ম্মে ভীষ্মযুধিষ্ঠিরসংবাদে শিবসহস্রনামপ্রকরণমপি ন দৃষ্টবান্। তৎপ্রকরণস্থাঃ কেচন শ্লোকাঃ শিববিমুখানাং মূঢ়ধিয়াং প্রবোধায়াত্র পঠ্যন্তে। ভীষ্ম উবাচ—অশক্তোঽহং গুণান্ বক্তুম্ দেবদেবস্য ধীমতঃ। যো হি সর্ব্বগতো দেবো ন চ সর্ব্বত্র দৃশ্যতে। ব্রহ্ম-বিষ্ণু-সুরেশানাং স্রষ্টা যঃ প্রভুরেব চ। ব্রহ্মাদয়ঃ পিশাচান্তা যং হি দেবা উপাসতে। প্রকৃতীনাং পরত্বেন পুরুষস্য চ যঃ পরঃ। চিন্ত্যতে যো যোগবিদ্ভির্ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম অসচ্চ সদসচ্চ যঃ। প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষোভয়িত্বা স্বতেজসা। ব্রহ্মাণমসৃজত্তস্মাদ্দেবদেবঃ প্রজাপতিঃ। কোহি শক্তো গুণান্ বক্তুং দেবদেবস্য ধীমতঃ। গর্ভজন্মজরাযুক্তমর্ত্ত্যো মৃত্যুসমন্বিতঃ। কোহি শক্তো ভবং জ্ঞাতুং মদ্বিধঃ পরমেশ্বরং। ঋতে নারায়ণাৎ পুত্রশঙ্খচক্রগদাধরাৎ। এষ বিদ্বান্ যদুশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুঃ পরমদুর্জ্জয়ঃ। দিব্যচক্ষুর্মহাতেজা বীক্ষতে যোগচক্ষুষা। রুদ্রভক্ত্যা তু কৃষ্ণেণ জগদ্ব্যাপ্তং মহাত্মনা। তথা। প্রসাদ্য বরদং দেবং চরাচরগুরুং শিবং। যুগে যুগে কৃষ্ণেণ তোষিতো বৈ মহেশ্বরঃ। ইত্যাদয়ঃ। তথা কাশীখণ্ডেঽপি। একং ব্রহ্মৈবাদ্বিতীয়ং সমস্তং সত্যং সত্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চিৎ। একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽবতস্থে তস্মাদেকং ত্বাং প্রপদ্যে মহেশং। ইত্যাদি। এবং বহুষু মহাভারতীয়পর্ব্বসু বহুলেষু পুরাণেষু চেদৃশানি ভূরীণি বচনানি প্রাপ্তব্যানি। তৈস্তৈ স্তৈ সমস্তৈর্ব্বচনৈরিতি স্ফুটমেব প্রতিপন্নমাসীৎ যৎ কৃষ্ণস্যৈশ্বর্য্যং সচ্চিদানন্দত্বং সর্ব্বজ্ঞাদিমাহাত্ম্যঞ্চ বেদে পুরাণেষু চ বর্ণিতমস্তি তৎসর্ব্বং শিবস্য পরমাত্মনঃ প্রসাদাৎ এব কৃষ্ণেণ লব্ধমিতি ॥

অথ তয়োঃ শৈববৈষ্ণবয়োঃ শিববিষ্ণ্বোঃ স্তুতিনিন্দাবিষয়ান্ বিরোধান্ শ্রুত্বা কশ্চিদ্ধরিহরোপাসকো বিষসাদ ব্যাজহার চ। অহো ভবন্তৌ বেদপুরাণাদীনাং বিরুদ্ধমর্থং কল্পয়িত্বা একাত্মনোর্হরিহরয়োর্নবর্কোৎপাদকং ভেদং ব্যাচক্ষাতে। পক্ষপাত-বিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা। এতস্যাঃ শ্রুতেরর্থমিয়পি কিং যুবয়োঃ কর্ণবিবরে প্রবিবেশ। অপিচ ব্যাপ্তস্য ত্র্যক্ষরাত্মক-প্রণবস্য ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানাং একাত্মত্বপ্রতিপাদনং কিং ভবদ্ভ্যাং ন জ্ঞায়তে। হরিবংশোহি নাদৃশ্যত। তত্রত্যাঃ কেচন শ্লোকাঃ শ্রূয়তাং। যোঽহসৌ বিষ্ণুঃ স বৈ রুদ্রো যো রুদ্রঃ স পিতামহঃ।

একা মূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা রুদ্রবিষ্ণুপিতামহাঃ। জগতঃ শুভ-দাতারৌ প্রভূ বিষ্ণুমহেশ্বরৌ। কর্ত্তৃকারণ-কর্ত্তারৌ কর্ত্তৃকারণকারকৌ। ভুতভব্যভবৌ দেবৌ নারায়ণ-মহেশ্বরৌ। রুদ্রশ্চ পরমো বিষ্ণুর্বিষ্ণোশ্চ পরমঃ শিবঃ। এক এব দ্বিধাভূতো লোকে চরতি নিত্যশঃ॥ ইত্যাদ্যাঃ। এবং কৈলাশযাত্রায়াং হরিহরয়োর্ভেদো মহাপাতকোৎপাদকত্বেন নিরূপিতঃ॥ অনয়া শাস্ত্রযুক্ত্যা শিষ্টপরম্পরায় চ ভগবতা শ্রীধরস্বামিনাপি ভাগবত-টীকা-প্রারম্ভে তাবুভাবেকাত্মত্বেন প্রাণম্যেতাং। তথা হি মাধবোমাধবাবীশৌ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনৌ। বন্দে পরস্পরাত্মনৌ পরস্পরনতিপ্রিয়াবিতি। অথেদানী পক্ষপাতব্যাকুলিতচিত্তয়োর্বহুপরিবারয়োঃ শৈববৈষ্ণবয়োঃ শাস্ত্রবিরুদ্ধযুক্ত্যা দুঃখকারুণ্যব্যাপ্তমানসা হরিহরোপাসক-বাক্যশ্রবণসংজাতহর্ষাঃ প্রেপ্সিতাত্মতত্ত্বাঃ তান্ জ্ঞাপয়ামাসুঃ। একত্বমনুপশ্যতামস্মাকং আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তানি যাবন্তি নামরূপাণি মায়াকার্য্যাণি দিক্‌কালাকাশবৃত্তীনি পরিমিতানি সত্যাশ্রিতানি ভবন্তি কেবলং সদধ্যাসেন সত্যমিব প্রতীয়তে। অতোঽধ্যাসবলাৎ সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম ইতি বদতাং বেদমাময়ুগতৈরস্মাভিরাব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সমস্তং জগৎ সমষ্ট্যা ব্যষ্ট্যা বা ব্রহ্মত্বেন বর্ণ্যতে। অতএব দেবাদি-স্থাবরপর্য্যন্ত-সমস্তবস্তুনঃ সুখানন্তবিগ্রহত্বেতাদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং ইত্যাদি পঠতামস্মাকং কদাপি বিপ্রতিপত্তির্নোৎপদ্যতে। এবং যাথার্থ্যতঃ। নামরূপে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম। দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়মুৎপদ্যতে ইত্যাদি শ্রুত্যর্থানুসারেণ যাবন্তি নামরূপাত্মকানি বস্তূনি মিথ্যাত্বেনানুপশ্যাম ইতি। জীবন্মুক্তেঃ স্ফুটলক্ষণং তৎপ্রমাণ-ভূত-গীতাশ্লোকাভ্যাং গ্রহীতব্যং॥ দ্বিতীয়াধ্যায়ে—প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে। দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ জীবন্মুক্তিঃ কথং কেন বা সম্পৎস্যতে ইত্যয়ং প্রশ্নস্তু ভবতঃ সমালোচিতাগ্রিম-গীতাশ্লোকার্থস্যানুচিত ইব প্রতিভাতি। স চায়ং শ্লোকঃ। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ। ইতি-

আত্মীয়সভানির্ব্বাহক-শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ-বন্দ্যোপাধ্যায়স্য

(সংস্কৃত ছাপাখানায় ছাপা হইল)

THE BRAHMA SAMAJ

OR

HINDU THEISTIC CHURCH: ITS RISE AND PROGRESS.

[*G. S. Leonard—Late Assistant Secretary to the Asiatic Society of Bengal.*]

—•—

CHAPTER I.

The foundation of the Brahma Samaj by Raja Rammohan Roy.

(2)

15. Three Epochs of the Brahma Samaj.

The history of the *Brahma Samaj* is generally divided into the following three epochs;—

1st, Its foundation by Ram Mohun Roy;

2ndly, Its continuation and stability under Devendranath Thakur; * and

3rdly, The secession of some of its members under Keshub Chunder Sen.

As the lives of these three reformers are intimately connected with the rise and progress of the *Samaj*, it will be necessary to sketch their careers, while narrating the successive events as they occurred, which led to the promotion of the *Samaj* and the dissemination of the Brahmic religion.

16. Raja Ram Mohun Roy and his ancestors.

"The *Brahma Samaj*, or Theistic Church in India," says Miss Collet in her 'Historical Sketch of the Brahma Samaj,' "owes its origin to Ram Mohun Roy, a man of remarkable mind and noble character, who was the first reformer since the establishment of the British rule in that country." He was born in 1774, corresponding with 1695 of the Saka era, and 1187 of the Bengali Sal. The place of his birth was the village of Radhanagar in the district of Burdwan now Hugli, in the province of Bengal. "He was descended on his father's as well as on his mother's side from a long line of Brahmans of high order, who from time immemorial," says the late Babu Kishory Chand Mittra, in his life of this great man, "were devoted to the duties proper to their race." The

* Thakur, *anglicè*, Tagore.

ancestors of Ram Mohun Roy on the paternal side were descended from Narottama Thakur a follower of Chaitanya, the Vaishnava reformer of Bengal, who had settled at Radhanagar, and was highly venerated for his sanctity. His descendants lineally inherited the sacred title of Thakur, or Thakkura, and were held in high veneration as a family of Vaishnava Brahmans in Bengal down to the fifth progenitor of Ram Mohun Roy, who acquired for himself and his posterity the title of "Roys," in lieu of the title of Thakurs, by entering the service of the Nawab of Bengal. They were, as Ram Mohun Roy himself says, "sometimes rising to honour and sometimes falling; sometimes rich, and sometimes poor." Ram Mohun's grandfather as well as father served under Serajud Dowla at Moorshedabad, and both of them witnessed the downfall of the Viceregal power at the hands of Colonel Clive, at the memorable battle of Plassey. After this event and the downfall of his patron, his father returned to his residence and patrimony at Radhanagar, where he is said to have experienced some ill-treatment from the Raja of Burdwan, in whose Zamindary his taluks were situated. This naturally caused a feeling of ill-will in Ram Mohun and his family against the Burdwan Rajas, which was not in any way diminished till after the demise of his eldest son Radha Prasad Roy, when Rama Prasad, his younger son, who was not of so noble a disposition as his elder brother, wormed himself into the favor of the present Maharaja, forgetful of the ill-treatment his grandsire had received.)

17. His Maternal ancestors.

On his mother's side Ram Mohun Roy was descended from the Bhattacharyas of Chatra on the Hugli, who were acknowledged as Desa-gurus, or high priests of the order of Saktas in Bengal, and who still enjoy the religious privileges and prerogatives of their ancestors. Possessing thus the advantage of descent from two illustrious religious families, Ram Mohun Roy might have passed his life content with the ease and emoluments of his sacerdotal offices, had not he relinquished them all, as well as his title to his patrimonial estates, and devoted himself to that reform which he subsequently so successfully established.

18. His early education.

The early education of Ram Mohun Roy was that usually received by village youths at the hands of the guru mahashày. He is related to have evinced at an early age great intelligence and genius. It is true that his early education may perhaps have suffered from the then prevailing pernicious system of instruction but the natural sagacity and force of his mind not only triumphed over this drawback, but contributed in his maturer years, from his personal experience of it, to the introduction of better plans for early instruction in his Anglo-Vernacular Institution.

19. His study of Persian.

It is related by credible witnesses of Ram Mohun Roy's native village that, his memory was remarkably tenacious, he never forgetting anything he once had heard or read; and striking instances of this faculty are recorded. After the completion of the pàthsàlà course of Bengali education, Ram Mohun, according to the custom of patrician families of that time, devoted his attention to the study of Persian. Tracing the state of native education some 50 years back, we find the study of Persian forming the next step after the study of the vernaculars among the higher orders of the people, and boys were placed under a munshi, at the age of 8 or 9, as they now are sent to an English school. Persian was then the Court language throughout India, and its acquisition was, what the knowledge of English is now, a prospect to wealth and distinction. The study of English commenced with the establishment of the Supreme Court in 1774, which, says the writer of Hare's life, gave an impetus to the study of that language.

20. His knowledge of Sufism.

The study of Persian opened up to Ram Mohun Roy a rich field of literature, of which he previously had no idea, and exhibited to a great extent in their true colors the absurdities of Hindu idolatry of which he was then a follower. He was charmed with the mystic poetry and philo-

sophy of the Persian's Sufis, for which he retained an ardent attachment throughout his life repeating verses from Sufi poets with great enthusiasm. His favourite Sufi poets were Shamis Tabriz, Hafiz and Maulana Rumi.

21. He was sent to Patna to study Persian and Arabic.

All written accounts of the life and education of Ram Mohun Roy agree in stating that Persian and Arabic were the next branches of learning he studied after Bengali, and for the prosecution of which he was sent by his father to Patna, the Oxford of Mahomedan literature in Bengal and Behar, just as Banàras is of Hindu Litarature. Kishory Chand supposes this to have taken place in the ninth year of his age. This statement, however, is contradicted, with good reason no doubt by the members of the Raja's family and fellow-villagers, who declare his initiation in Persian to have taken place under his father's roof, agreeably to the custom of his familly for four successive generations, and the invariable custom of the laity throughout Bengal. Ram Mohun's mastery of the Persian language, as evinced in his later writings, made him not only conversant with the routine of court business, but also familiar with the writings of the greatest sages and bards of Persia. These studies tended to awaken in him a predilection for Sufism, so much akin to the doctrines of Vedanta and Platonism, and led him to form for himself a religion of pure and rational monotheism. He was so struck with the doctrines of this religion that he was often heard to cite passages from Persian poets and philosophers, and to declare his ardent desire to his friends that when his time came for retiring from the world, he might devote himself solely to the reading of the Masnavi of Maulana Rumi and the Vedanta of the Hindus.

22. He learns Sanskrit and becomes a *staunch follower of* Vaishnavism.

It was at this time, in addition to his Persian studies, that he was prevailed upon by his kindred on the maternal side—the *Desa-Gurus*—to learn Sanskrit, the sacred language of the land and hitherto the chief study of his family, partly with the view of training him up in the priestly profession, and partly in the hope of counteracting his evident proclivities to heresy. It was from these, his earliest days, says Miss Collet, that the strong religious tendency of his mind was manifested and while yet a boy, he appeared to have been a staunch follower of Vishnu, his first duty every morning being to recite a chapter of the Bhàgvat.

23. His study of Greek Philosophers through Arabic Translations.

Being thus attached in his early years to both Vaishnavaism and Sufism, between the higher flights of which, as contained in the Bhagvat and the Sufis poets, there is a strong affinity, both treating of ardent divine love and the mystical attachment between the soul and her divine lover God, he intended to explore the origin of these religions, the Vedas and Koran, but was unable to do so from the want of a competent teacher to assist him. It was then at about the age of twelve that he obtained the permission of his father to repair to Patna, and Banàras for the purpose of completing his oriental studies. During a stay of two or three years at Patna, Ram Mohun Roy had, from his previous proficiency in Persian, made amazing progress in Arabic, and had not only read many original works in that language, but had also perused many Greek works which had been preserved by means of Arabic translations. In his inquiry after truth he had occasion frequently to engage in discussion with learned Maulavies, who invited him to a perusal of Aristotle and Euclid, in order to learn the proper method of conducting an argument, before he entered into discussions on such important subjects.

24. He goes to Benares to study the Vedas and the Vedantas.

"It must be perceived," says Kishory Chand, "that the mental discipline thus acquired by the perusal of these works, as well as his acquaintance with the doctrines of the Koran, contributed to cause that vigorous and searching scrutiny into his paternal faith, which soon resulted in his emancipation from its chains, and ultimately

led to the great and successful efforts he made to destroy its empire." From Patna he went to Banaras to prosecute his theological studies in the Vedas and Vedantas, in which he made great progress.

25. On return from Banaras, he publishes a book against idolatry.

On his return from Banaras, about the age of 16, so imbued was he with the spirit of monotheism, that he wrote an article calling in question the validity of Hindu idolatry. This circumstance, together with his known sentiments on the subject, produced a coldness between himself and his immediate kindred, and caused an estrangement from his father. "Thus we see," says Kisory Chand, "that at an age hovering between boyhood and youth, which is seldom devoted to any grave pursuit in this country than playing kapati and attending school, and which we should deem too premature in any country for so important a decision, he renounced Hinduism. His renunciation of it, however, to be duly appreciated, must be viewed in connection with the sacrifices inseparable from it. In casting off his allegiance to it he braved the loss of caste, the loss of ancestral property, and, what must have been more trying to the nerves ofthe young reformer, the enmity and persecutions of his nearest relatives." In thus severing himself from all home ties, by his bold assertion of his religious faith, it must be also borne in mind that it was not as a convert to Christianity, under whose powerful wing he could have found shelter and protection, but as the originator of a new religion that he took his stand.

26. His journey to Thibet.

The result of his quarrel with his famly decided him to travel, and at the age of 16 he set out on his wanderings. Wherever he travelled he learned the dialect of the province, in order to be able to read the sectarian works of a Gorakh, Kabir, Dadu, Nanak, and other reformers of Hinduism, in the districts in which they prevailed, from which he had afterwards occasion to quote extempore passages on different occasions. Being thus conversant with the Hindu and Mahomedan religions and the various sectarian doctrines appertaining to them, together with a thorough knowledge of all the the customs, manners, laws, and governments of all the different native states through which he had passed, he felt a necessity of acquiring a knowledge of the Buddhistic religion and literature, in order to be the better able to refute all arguments, when assailed in his character of a reformer. He had now to master a Turanian language, a task hitherto unattempted by any of his countrymen, He had to explore the difficult mazes of the Kagyar and the Magyar, the large and small collections of the sayings of Buddha teachers, without which it was impossible to derive a thorough knowledge of the religion. The worship of Buddha does not, however, appear to have in any way had his sympathy, but to have rather excited his ridicule.

27. His return home.

From Thibet he passed into further trans-Himalayan regions, where he also spent some time in acquainting himself with the religious tenets of the different people he came across. It is not known how far he intended to pursue his travels when he was recalled by his father at the intercession of his mother. On return to his father's house he is said to have devoted himself to the study of the Vedas, Puranas, and other Sastras, as well as to a recapitulation of his former studies in other departments of literature. It is then, says his biographer, "that he planned that moral revolution with which his name is identified." It is a pity that no account of his travels was ever given by himself or some of his contemporaries to the world, Endowed as he was with such remarkable powers, he would in all probability, have produced a remarkable work. Some articles of his on the subject appeared in the *Kaumudi*, but this journal has long since been out of print and unobtainable.

28. His opinion on British rule.

Hitherto, Ram Mohun had entertained he tells us, "a feeling of great aversion to the establishment of the British power in India." On his return home from his travels

he began to associate with Europeans, and acquired by self-tuition a knowledge of our language together with an acquaintance with our laws and Government, which led him to give up his prejudices against the English, and regard them with favour, "feeling assured that their rule, though a foreign yoke, would lead most speedily and surely to the amelioration of his countrymen."

ছাত্র মদনমোহন।

(শিশুশিক্ষাপ্রণেতা ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার)

(শ্রীরত্নমালা দেবী)

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী বিল্বগ্রামে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে ১২২২ সালে মদনমোহন তর্কালঙ্কার জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়। রামধন চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত সুন্দর সুপুরুষ ন্যায়নিষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন এবং সংস্কৃত কলেজের লিপিকর ছিলেন। বিল্বগ্রামে ইহাঁর আদি নিবাস ছিল। তিনি এই স্থানে যজন-যাজন ও অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহাদের পৈতৃক জমিজমা যাহা ছিল, তাহাতেই একপ্রকার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। রামধন বিদ্যারত্নের দুইটী পুত্র ও তিনটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার প্রথম পুত্র মদনমোহন ও দ্বিতীয় পুত্র গোপীমোহন। মদনমোহনের জন্মসময়ে তাঁহার পল্লীভবন শঙ্খঘণ্টাবাদ্য-ধ্বনিতে মুখরিত হয় নাই; গৃহস্থ ব্রাহ্মণের গৃহে একটী নবজাত শিশু জন্মিয়া সূতিকাগৃহটী আলোকিত করিয়াছিল মাত্র। দ্বিতীয় পুত্র গোপীমোহন বালক-বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার তিনটী কন্যার মধ্যে প্রথমা বামাসুন্দরী, দ্বিতীয়া শ্যামাসুন্দরী ও তৃতীয়া বিন্দুবাসিনী। মদনমোহনের জন্মসময়ে মদনমোহনের পিতা সংস্কৃত কলেজের লিপিকর ছিলেন। মদন-মোহন ভূমিষ্ঠ হইলে শিশুর অসামান্য রূপ দেখিয়া তাঁহার পিতা মদনমোহন নাম রাখিলেন। বিল্বগ্রামের ঠাকুরপাড়ায় গ্রাম্যদেবতা মদনমোহনের নামানুকরণে শিশুর নাম মদনমোহন রাখা হইয়াছিল, এরূপও হইতে পারে। শিশুকাল হইতেই মদনমোহন অত্যন্ত শান্তস্বভাব ছিলেন এবং খুব ঘুমাইতেন; এমন কি শিশুকে তাঁহার জননী দুগ্ধপান করাইতেও পারিতেন না। মদন-মোহনের জননী বিশ্বেশ্বরী দেবী অত্যন্ত ভীরুপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বর্ষিয়সী নারীদের জিজ্ঞাসা করিতেন 'হাঁ মা! আপনারা বলিতে পারেন, আমার ছেলেটী এত ঘুমায় কেন?' বর্ষিয়সীরা তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে বলিতেন, 'বৌমা! তুমি এত ভেবনা, তোমার ছেলেটি বড় শান্ত হবে তাই সারাদিন ঘুমায়।' বর্ষিয়সীদের কথায় মদনমোহনের জননী তখন আশ্বস্তা হইয়া আবার গৃহ-কার্য্যে মন দিতেন। মদনমোহনের জননী বিশ্বেশ্বরী দেবী অত্যন্ত রূপগুণবতী পতিপরায়ণা নারী ছিলেন। শিশু মদনমোহন দেখিতে অতি সুন্দর ছিলেন বলিয়া পাছে কেহ শিশুকে নজর দেয় এজন্য কাহারও সম্মুখে তাহাকে বাহির করা হইত না।

ক্রমে ক্রমে শিশু মদনমোহন শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহ সুস্পষ্ট ও মনোহর হইয়া উঠিল। মদনমোহনের বয়ঃক্রম যখন পঞ্চম বৎসর হইল, তাঁহার পিতা শুভদিনে শুভ লগ্নে তাঁহার বিদ্যারম্ভ করিয়া হাতে খড়ি দিয়া তাঁহাকে গ্রাম্য পাঠশালায় পড়িতে দিলেন। মদনমোহনের অসাধা-রণ স্মৃতিশক্তি ও মেধা দেখিয়া পাঠশালার গুরুমহাশয় আশ্চর্য্য হইতেন। বালক মদনমোহন পাত্‌তাড়ি বগলে লইয়া প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া রূপে গ্রাম্যপথটী আলোকিত করিয়া পাঠশালা যাইতেন। বালকের চমৎকার রূপ ও মধুর কথাগুলি শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে ক্রোড়ে করিতে ভালবাসিত। মদনমোহন যাহা একবার শুনিতেন তাহা আর কখনও ভুলিতেন না। কিছুদিন পাঠ করিয়াই তিনি পাঠশালার সকল বালকের অগ্রণী হইয়া উঠিলেন। এক বৎসরে পাঠশালার পাঠ সমাপন হইলে তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে বিল্বগ্রামের ভরত শিরোমণির নিকট ব্যাকরণ পড়িতে দিলেন। পণ্ডিতপ্রবর ভরত শিরোমণি মদন-মোহনের বুদ্ধির প্রাখর্য্য এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দেখিয়া সযত্নে তাঁহাকে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন, এই বালক জীবিত থাকিলে বিল্বগ্রামের মুখো-জ্জ্বল করিবে। মদনমোহন দুই বৎসরকাল ভরত শিরো-মণির নিকট ব্যাকরণ পাঠ করিলে তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিলেন। মদনমোহন সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ-শ্রেণীতে পাঠ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কিছুদিন কলিকাতায় থাকিবার পরই তিনি প্রবল উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইলেন, এবং অগত্যা স্বদেশে প্রত্যাগমনে বাধ্য হইলেন। কলি-কাতার জল-বায়ু তখন অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল এবং কলেরা ও উদরাময় রোগ-দুইটীই প্রবল ছিল।

মদনমোহন কিছুদিন বিল্বগ্রামে থাকিয়া সুস্থ হইলে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামদাস বিদ্যারত্ন ও বনমালী ন্যায়রত্ন তাঁহাকে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। মদনমোহনের

লেখাপড়ায় প্রগাঢ় অনুরাগ ও যত্ন দেখিয়া তাঁহারা আনন্দসহকারে মদনমোহনকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই মদনমোহন ব্যাকরণে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। অধ্যাপকগণ সকলেই একবাক্যে বলিতেন, এ বালক জীবিত থাকিলে একদিন বিল্বগ্রামের নাম রাখিবে। বাল্যকাল হইতেই মদনমোহন গম্ভীর-প্রকৃতি, অমায়িক, মিষ্টভাষী ও ধীর ছিলেন। তিনি শৈশবকাল হইতেই আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতেন। পণ্ডিতপ্রবর ভরত শিরোমণি মদনমোহনের বুদ্ধি-প্রতিভা দর্শনে তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন।

একাদশ বৎসর বয়সে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতৃব্য পুনরায় তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিলেন। ঐ বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও সংস্কৃত-কলেজে প্রবিষ্ট হয়েন এবং উভয়েই একত্র ব্যাকরণ-শ্রেণীতে পাঠ আরম্ভ করেন। এই কারণে উভয়েই বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হয়েন। মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র উভয়ে সহপাঠী ও সতীর্থ ছিলেন, এই হেতু ক্রমে ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় সৌহৃদ্যও জন্মিয়াছিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মদনমোহনের বিদ্যানুরাগ আরও শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। ঈশ্বরচন্দ্র শুধুই মদনমোহনের সতীর্থ ও সমপাঠী ছিলেন না, উভয়েই যেন সহোদর ভ্রাতার ন্যায় উভয়কে ভালবাসিতেন। উদারচিত্ততায় ও অসাধারণ প্রতিভায় কেহ কাহারও ন্যূন ছিলেন না। কলেজের প্রথম পুরস্কার এই দুইজন ব্যতীত আর কেহই পাইতেন না। দুইজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরস্পরের মনে ঈর্ষ্যার অনল প্রজ্বলিত হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাঁহাদের উদারতার গুণে পরস্পরের উন্নতিতে কেহ কোন দিন কাতর হইতেন না; বরং উভয়ের সাহচর্য্যে উভয়েই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র তিন বৎসরকাল ব্যাকরণ-শ্রেণীতে পাঠ করিয়া উভয়েই সাহিত্য-শ্রেণীতে উঠিলেন। অল্প বয়স হইতেই মদনমোহন ছোট ছোট সংস্কৃত কবিতা লিখিতেন। ষোড়শ বৎসর বয়সেই তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি জন্মিয়াছিল। তিনি এই অল্প বয়সে অল্প সময়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়া অসামান্য কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। সাহিত্যের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মদনমোহনের কবিত্ব-শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। মদনমোহনের ভাবুকতা ও কবিত্ব-শক্তিতে অধ্যাপকগণ সকলেই তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। তৎকালে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মদনমোহনের সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি মদনমোহনকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র দুই বৎসরে সাহিত্যশ্রেণীর পাঠসমাপনান্তে অলঙ্কার-শ্রেণীতে উঠিলেন। ঐ সময় পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ তাঁহাদের অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। মদনমোহন অতি মিষ্টভাষী সদালাপী ও বিনীতপ্রকৃতি ছিলেন, সচরাচর তাঁহার মত রূপবান পুরুষ প্রায় দেখা যাইত না।

সপ্তদশ বৎসর বয়সে মদনমোহন সংস্কৃত রসতরঙ্গিণী-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। রসতরঙ্গিণী কাব্যে তাঁহার অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রচনার লালিত্যে, ভাষার মাধুর্য্যে ও ভাবসম্পদে পুস্তকখানি অতি মধুর। রসতরঙ্গিণীর আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে, মদনমোহনের অপূর্ব্ব কবিত্বরস আস্বাদন করা যায় না। কবি মদনমোহন তরুণ বয়সে যেরূপ প্রাণস্পর্শী কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতে তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ কবি কেহ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রসতরঙ্গিণী পুস্তকখানি যদি আদিরসাশ্রিত না হইত, তবে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মনোহরণ করিত। তাঁহার সুললিত মধুর ভাষার ঝঙ্কারে এখনও সাহিত্য-জগতে অমৃতধারা ঢালিয়া থাকে।

রসতরঙ্গিণীর কবিতা সকলগুলি সুমার্জ্জিত না হইলেও তথাপি যে তাহার ভাষা সরল প্রাঞ্জল সুমধুর ও সরস তাহার আর সন্দেহ নাই, একথা বোধ হয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। অল্প বয়সেই মদনমোহন কবিতা লিখিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মদনমোহনের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অধ্যাপকগণ তাঁহার কবিতার অশেষ প্রশংসা করিতেন। মদনমোহন অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, এজন্য তাঁহার প্রত্যুৎপন্ন মতির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

রসতরঙ্গিনীর অধিকাংশ কবিতা প্রেমোচ্ছ্বাসপূর্ণ হইলেও ইহা একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। যে কবি কিশোর বয়সে এরূপ সুললিত কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, পরিণত বয়সে না জানি তাঁহার প্রেম-বৈচিত্র্যের কি অপূর্ব্ব রস না ফুটিত। যখন তর্কালঙ্কারের লেখনী হইতে রসতরঙ্গিণী প্রসূত হইয়াছিল, তখন অন্য কোন কবির লেখনী হইতেই এরূপ সুললিত মধুর কবিতা রচিত হয় নাই। তৎকালে তর্কালঙ্কারকেই বঙ্গসাহিত্যের নবীন উদীয়মান কবি বলা যাইতে পারে।

মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র অলঙ্কার-শ্রেণী হইতে কাব্য-শ্রেণীতে পাঠ আরম্ভ করিলেন। তৎকালে মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র উভয়েই সংস্কৃত কলেজের প্রধান ছাত্র ছিলেন। বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে মদনমোহন বাসবদত্তা পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার বাসবদত্তা পুস্তকখানি নানা ছন্দে রচিত এবং উহাকে একখানি সুমধুর খণ্ড-কাব্য বলিলে চলে। মদনমোহনের বাসবদত্তা সংস্কৃত ভাষায় সুবন্ধু-কৃত বাসবদত্তার ঠিক অনুরূপ নহে, কতকটা তাঁহার

স্বকপোলকল্পিত। ভাষার আতিশয্যে ও মধুরতর ভাবপ্রবণতায় বাসবদত্তা কবিত্বে উৎকর্ষ দেখাইয়া গিয়াছে। কবি মদনমোহন কাব্য লিখিয়া ভারতচন্দ্রকে পরাজিত করিবেন, এই মনে করিয়া বাসবদত্তা রচনা করেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ও মদনমোহনের বাসবদত্তা একশ্রেণীরই পুস্তক। কিন্তু কবি মদনমোহন বাসবদত্তা লিখিয়া বাসবদত্তা ও বিদ্যাসুন্দর উভয় পুস্তকের সমালোচনা করিয়া ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের উৎকর্ষ বোধ করিয়া ক্ষুণ্ণমনে বলিয়াছিলেন, জীবনে আর কখনও কবিতা লিখিব না। এ কথা যদি সত্য হয় তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। যে কবি বিংশতি বৎসর বয়সে এমন মনোজ্ঞ ও মধুর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, পরিণত বয়সে যে তিনি অসামান্য কবি হইতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া কিন্তু মদনমোহনকে শিশুশিক্ষাত্রয় রচনা করিতে হইয়াছিল। বাসবদত্তা ও রসতরঙ্গিণী তাঁহার মৌলিক রচনা না হইলেও এই অনুবাদমূলক গ্রন্থদুইখানি ভাবপ্রবণ। এই দুই পুস্তক এরূপ সরল সহজ মধুর ও প্রাঞ্জল যে, পাঠ করিতে করিতে তন্ময় হইতে হয়। তাঁহার শিশুশিক্ষার ন্যায় এমন শিশুপাঠ্য গ্রন্থ আর অদ্যাবধি প্রকাশ হইয়াছে কিনা জানি না। তিনি যৎকালে শিশুশিক্ষা রচনা করেন, তখন বঙ্গভাষার অতি দুর্দ্দিন ছিল। তিনি যদি অন্য কোন গ্রন্থ না লিখিয়া শুধু শিশুশিক্ষাত্রয় রচনা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তিনি সুকবি বলিয়াই পরিচিত হইতেন। বাসবদত্তার গ্রন্থসূচনায় তিনি যে সকল দেব-দেবীর স্তোত্র লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে হৃদয়ে ভক্তিধারা প্রবাহিত হয়। বাসবদত্তার একস্থানে বন্ধুপ্রীতির উদাহরণ দিয়া একটি কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা কি অপূর্ব্ব! সেটী পাঠক-পাঠিকাদের জন্য উদ্ধৃত করিলাম—

সজ্জনের প্রীতি প্রতিদিন প্রতিবেলা।
সিতপক্ষ শশী সম বাড়ে প্রতিকলা।
পাষাণের রেখাসম সম চিরদিন।
নিধন হইলে তবু নাহি ভাবে ভিন্ন।
ইহার দৃষ্টান্ত নীর-ক্ষীর পূর্ব্বাপর।
পয়ঃ এই নাম মাত্র প্রীতি পরস্পর।
জাল দিয়া দুগ্ধেরে বিনাশ যবে করে।
ক্ষীরের প্রীতিতে নীর আগে ভাগে মরে॥

বর্ত্তমান সমস্যায় রবীন্দ্রনাথ।*

পাশ্চাত্যের অপরাধ।

যাঁহারা পূর্ব্বদেশ হইতে বহুদূরে ইংলণ্ডে বাস করেন, তাঁহাদিগের এখন বুঝা উচিত এসিয়াবাসীর উপরে ইউরোপীয়দের যে নৈতিক প্রভাব ছিল, ইউরোপ এসিয়ার নিকট হইতে যে মান সম্মান প্রতিপত্তি পাইত, বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ তাহা সম্পূর্ণরূপে হারাইয়াছে। ইউরোপকে আর কেহ পৃথিবীর মধ্যে উচ্চ নীতির আদর্শ এবং ন্যায় বিচারের অগ্রণী বলিয়া মনে করে না। বরঞ্চ সকলে এই কথা মনে করে যে ইউরোপ কেবল পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব গর্ব্বেই পরিপূর্ণ এবং তাহার সীমার বাহিরে যাহারা বাস করে তাহাদিগকে যে কোন সুযোগে শোষণ করিতেই ব্যস্ত।

বাস্তবিক ইউরোপের এক বিরাট নৈতিক পরাজয় ঘটিয়াছে। যদিও এসিয়া এখন দৈহিক শক্তিতে হীন এবং অপরের লোভী গ্রাস হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ, তথাপি পূর্ব্বে যেস্থলে এসিয়া ইউরোপকে সম্মানের চক্ষে দেখিত এক্ষণে সে স্থলে তাহাকে ঘৃণা ও উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে পারে।

এই প্রকার নবোদ্ভূত মানসিক ভাব হইতে উভয়ের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী এক শোচনীয় সংঘর্ষের সম্ভাবনা আছে। এই বিচ্ছেদ দিনের পর দিন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ইহা হইতে যে বিপদ আসিতে পারে ইউরোপীয় জাতি তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা কেবলমাত্র কতকগুলি কৃত্রিম রাজনীতিক কৌশলপ্রয়োগে তাহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় শক্তিপুঞ্জ মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে কত অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন, এই শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় শক্তিপুঞ্জেরাই প্রতিদিন জগতের শান্তি বিনাশ করিতেছেন, কারণ তাঁহারা জাত্যভিমানে স্ফীত হইয়া প্রাচ্য দেশকে একেবারে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। তাঁহারা একথা বুঝিতেছেন না যে তাঁহাদের এই গর্ব্বান্ধতার ফলে এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের প্রবল ইচ্ছার দরুণ অনতিবিলম্বে উভয় মহাদেশই ধ্বংস হইবে।

মন্ত্রণাসভার প্রয়োজন।

বর্ত্তমান সময়ে কি করা কর্ত্তব্য আমাকে অনেকে এই প্রশ্ন করিয়াছেন। আমি সর্ব্বদাই ইহার উত্তরে

---

* ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট রবীন্দ্রনাথ ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

বলিয়াছি যে, যখন আমাদের ভিতরকার সম্বন্ধই নষ্ট হইয়াছে, তখন বাহিরের কোন উপশম-চেষ্টা ফলদায়ক হইবে, এমন কথা বিশ্বাস করি না। এইজন্য আমি আশু প্রতিকারের কোন সরলপথ অথবা মজ্জাগত ব্যাধির কোন সহজ চিকিৎসার উপায় বলিয়া দিতে পারি না। উভয় পক্ষের মন, ইচ্ছা এবং হৃদয়ের আমূল পরিবর্ত্তনের একান্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে, কিছুই হইবে না।

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া সরলভাবে এবং পরস্পরের প্রতি সম্মানের সহিত আলাপ করুন,—একে অন্যের হৃদয়কে ভাল করিয়া বুঝুন। আমার বিশ্বাস তাহা হইলে এই গুরুতর সমস্যার সমাধান সহজ হইয়া আসিবে। যদি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের হৃদয়ের মধ্য দিয়া এমন একটী সরলতার অনাবিল প্রবাহ উন্মুক্ত হইয়া যায়,—যাহাকে কোন প্রকার স্বার্থ অসূয়া অথবা জাত্যভিমান বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে না, তবে উভয় মহাদেশের মধ্যে পুনরায় মিলন-সেতু নির্ম্মিত হইবে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল।

পাশ্চাত্য দেশবাসীরা একথা স্পষ্টরূপে বুঝিয়া রাখুন, আমরা পূর্ব্বদেশে জন্মিয়াছি,—আমরা প্রাচ্যের অধিবাসী; আমরা এখনও অন্তরের সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতার মহত্ব স্বীকার করিয়া থাকি। পরপদদলিত হইয়া নিজেদের হীনতা উপলব্ধি করিলে হৃদয়দৌর্ব্বল্য বশতঃ কখনও কখনও জিঘাংসার উত্তেজনায় আমরা মুখে তাহা অস্বীকার করি বটে, কিন্তু অন্তরে আমরা তখনও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লই। প্রাচ্যদেশের যুবকদের দল স্বভাবতঃ উত্তেজিতপ্রাণ হইলেও পাশ্চাত্যের জ্ঞান, চিন্তা, যাহা কিছু মহৎ ও গ্রহণীয় তাহা আয়ত্ত এবং আত্মস্থ করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল। এমন কি যখন আমরা রাজনীতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য পাশ্চাত্যের সহিত আমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছি, তখনও আমরা পাশ্চাত্যকে উচ্চতর সম্মানই দেখাইতেছি। কারণ আমরা স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম করিতেছি, তাহা পাশ্চাত্য শিক্ষারই ফল; পাশ্চাত্য শিক্ষাই আমাদের দীর্ঘ নিদ্রার অবসাদ হইতে জাগ্রত করিয়াছে। আমরা পরোক্ষে ইহাই স্বীকার করিতেছি যে, পাশ্চাত্যের সাহিত্য আমাদের অন্তরে সাহস ও স্বাধীনতাপ্রিয়তার প্রেরণা আনিয়াছে এবং স্বাধীনতার ঘোষণা করিতে আমাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছে।

সাহস ও স্বাধীনতার স্পৃহা।

আদ্যন্তে ইংরাজ শাসনের প্রথমভাগে আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিরাপদ অবস্থায় ছিলাম এবং তৎসঙ্গে আমাদের চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতাও প্রচুর পরিমাণে ছিল। ইহাতে আমাদের সাহস বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আমাদের অন্তরের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রহিয়াছে। সুতরাং আমাদের সেই সাহস ও স্বাধীনতা যাহাতে বিনষ্ট না হয়, পরন্তু উহা যাহাতে উৎসাহ পাইয়া বৃদ্ধি পায়, বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজদের তাহাই করা কর্ত্তব্য। এরূপ করিলেই তাঁহাদের গৌরব প্রতিষ্ঠা হইবে। আমরা এক্ষণে যে বিপদে পতিত হইয়াছি, তাহাতে আমাদের সহিত ব্যবহারে ইংরাজগণের উদারচিত্ততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং শান্তিস্থাপনে আগ্রহ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

পীড়ননীতি ব্যর্থ হইবে।

ইংলণ্ডের লোকেরা ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিবেন যে ভারতের সঙ্কট এখন এত জটিল হইয়া উঠিয়াছে যে, আর পীড়ননীতি অথবা দৈহিক শক্তির প্রয়োগে তাহার মীমাংসা হইবে না। প্রকৃত মহৎ হৃদয়াবশিষ্ট শাসনকর্ত্তার উদারনীতিতেই তাহার প্রতিকার সম্ভব, কারণ তাহাতেই আমাদের সহযোগিতা আকর্ষণ করিতে পারিবে। আজকাল গবর্ণমেণ্ট যে প্রকার পীড়ননীতি অবলম্বন করিতেছেন, তাহার পরিণামে সামরিক আইন-জারী,—যেমন শোলাপুরে হইয়াছে। এই পীড়ননীতির প্রতিক্রিয়া অবশেষে জনসাধারণের উপর দেখা যায়। ইহা না ঘটিয়া পারে না। কারণ লোকের মনে ভয় ও ত্রাসের সঞ্চার হইলে গবর্ণমেণ্ট নিষ্ঠুর এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। মানবজাতির ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

সামরিক আইনের নামে জনসাধারণের উপরে যে ঘৃণিত অত্যাচার করা হইতেছে তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। শোলাপুরে সৈনিকেরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা কাহারও মাথায় গান্ধী টুপী দেখিলে তাহা কাড়িয়া লয়। ইহাতে শারীরিক যন্ত্রণা কিছুই নাই বটে, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীকে যাহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে এরূপ লক্ষ লক্ষ লোক ইহাতে প্রাণে নিদারুণ ব্যথা পায়। যদি এরূপ উগ্র অবমাননার কার্য্য চলিতে থাকে, তবে অপরাধীদিগকে অবশেষে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। কারণ অসহায় ও দুর্ব্বলের নির্ব্বাক প্রতিবাদ কখনও নিষ্ফল হয় না।

এমন সময় একদিন আসিবে, যখন দুষ্কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সেই জন্য আমি আশা করি, ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ ইংরাজপক্ষীয় সর্ব্ববিধ অত্যাচারে লজ্জিত হইবেন,—আমরা যেমন আমাদের পক্ষের হিংসামূলক কার্য্যে লজ্জিত হইয়াছি। আমরা কোন মতেই

পাপের চক্রে জড়িত হইব না,—আমরা যথাসাধ্য তাহার প্রতিরোধ করিব। এক হিংসার কার্য্য আমাদিগকে অন্য হিংসার কার্য্যে লইয়া যাইবে,—তাহাতে বিচ্ছেদ ও মনোমালিন্য আরও বৃদ্ধি পাইবে। আমরা তাহা ঘটিতে দিব না।*

সাহিত্যে অশ্লীলতা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

গত ১৩৩৬ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার বঙ্গলক্ষ্মীতে 'তরুণ-সাহিত্যে নারী' প্রবন্ধটী আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে। সাহিত্য-নেতাগণ যে মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ বা অন্য যাহাই কেন হউক না, তাহারই দোহাই দিয়া সাহিত্যে অশ্লীলতা প্রবেশ করাইলে যে সমাজের ও দেশের বড়ই অমঙ্গল হয়, তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন; ইহাতেই আমরা সুখী। হইতে পারে যে সাহিত্যরথীগণ অনেক ভাল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, ভাল কথা বলিয়াছেন; কিন্তু লোকে সে কথা বড় একটা ধরে না—সেটা সমাজের মামুলী প্রথার মধ্যে গণ্য হয়; কিন্তু ঐ যে একটা অশ্লীল গ্রন্থ বাহির করিলেন, নূতনত্বের দোহাই দিয়া অশ্লীল ভাব-টাকে সমুজ্জল আকারে প্রকাশ করিলেন, ঐ গ্রন্থ, ঐ ভাবই লোকের মনে খুদিয়া বসিয়া যায়, উহাই চাটনির মত লোকের আপাত-রুচিকর হয়। এই রুচি অধিক-কাল স্থায়ী হয় না সত্য, কিন্তু অন্তরে ঐ উত্তেজক বিষ প্রবেশ করাইবার ফলে যে-রোগ সঞ্চারিত হয়, সে রোগের জন্য বিষভক্ষকের জীর্ণ করিবার শক্তির অভাব বলিয়া ঐ সকল সাহিত্যরথীগণ তাঁহাদের ভক্তগণকে পরিত্যাগ করেন। ভক্তগণ তখন মৃত্যুকে অবলম্বন করা ব্যতীত উদ্ধারের আর কোনই উপায় পান না। লেখক ও পাঠক উভয়ের মধ্যে যতটুকু "পচ" ধরিয়াছে, পচা অশ্লীল সাহিত্য তাহাই লোকসমক্ষে ব্যক্ত করে। এদেশে যে প্রকার অশ্লীল সাহিত্য বিকশিত হইতেছে ও হইয়াছে, সে সমস্তই বিলাতী ছয়-পেনি উপন্যাস-সমূহের চর্ব্বিতচর্ব্বণ অথবা তাহারও চর্ব্বিতচর্ব্বণ—কেহ বা ধরা পড়ে, আর কেহ বা ধরা পড়ে না। এই অশ্লীল সাহিত্য আমাদের দেশের মনোভাবের যথার্থ আকার নিশ্চয়ই প্রকাশ করে না—ইহা দেশের মধ্যে একটা অশ্লীল আবহাওয়া প্রস্তুত করিয়া বলে যে ইহাই দেশের প্রকৃত অবস্থা! এই সকল সাহিত্য দেখিয়া মনে হয় না যে, এই দাসত্বপীড়িত জাতির প্রবল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এমন তীব্র ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এদেশের সাহিত্যকে সত্যই জাতির মনের সর্ব্বাংশে সত্য দর্পণ বলিতে পারি না। আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সম্বাদপত্রে দলাদলির ঝগড়া-ঝাঁটির ভিতর দিয়া ব্যতীত প্রকৃত সাহিত্যে কতটুকুই বা দেখিতে পাই? আমরা জোরের সহিত বলিব যে, অতি-আধুনিক তরুণসাহিত্য সত্য বস্তু নয়, নিতান্ত কৃত্রিম, প্রাণহীন, ব্যাধিগ্রস্ত মনের বিকার মাত্র। তরুণদের সাহিত্য পড়িয়া মনে হয়, মানুষের মধ্যে যেন যৌনবোধ ব্যতীত আর কোন কিছুর অনুভূতিই নাই। ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহাদের বলবীর্য্য এতই অন্তর্হিত হয় যে, তাহারা serious কোন কিছু চিন্তা করিবার ক্ষমতাই হারাইয়া ফেলে। অশ্লীলতার থলথলে পঙ্কের ভিতর কেহ বা গণ্ডারের মত কেহ মহিষের মত নিজেকে সর্ব্বদা ডুবাইয়া রাখিতে ভালবাসে। মানুষের মধ্যে ইহা পশুভাব জাগ্রত হইবারই পরিচয়।

আমরা দেখিতে পাই, মানুষের মধ্যে তিনটী স্তর আছে—স্থূল শারীরিক, সূক্ষ্ম মানসিক এবং উভয়ের পরিচালক সূক্ষ্মতম আধ্যাত্মিক; কিন্তু ভগবানের প্রদত্ত এই তিন স্তরের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য আছে। সেই সামঞ্জস্য ছিন্ন করিলে মানুষ নষ্ট হইয়া যায়। শরীরটাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে প্রত্যক্ষ হয়, সেইজন্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে শরীরেরই প্রতি আমাদের সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি পড়ে, নষ্ট করিতে চাহিলেও সর্ব্বপ্রথম শরীরেরই প্রতি দৃষ্টি পড়ে। শরীর নষ্ট হইলেই মন ও আত্মা নিস্তেজ ও নির্বীর্য্য হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ঐ সকল অশ্লীল সাহিত্য আলোচনা করিলে পশুর ন্যায় মানুষের মধ্যেও যে মিথুনাসক্তি বা কামপ্রবৃত্তি আছে, তাহাই বড় হইয়া মানুষকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। একটুখানি আপাতসুখের লোভে পরিণামে ভীষণ কুফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কামভাবকেই প্রবল হইয়া উঠিবার অবসর দিই। তরুণ সাহিত্যিকদিগের জানা উচিত যে, মানবসমাজ যে বর্ত্তমান উন্নতির প্রশস্ত পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা ছাগতান্ত্রিক সাহিত্যের ফলে নহে; কিন্তু যে সমস্ত সাহিত্যে বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের জলন্ত প্রভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে সকল সাহিত্যের ভিতর দিয়া ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই সকল সাহিত্যের প্রভাবেই মানবসমাজ আজ উন্নতির পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এইখানে লেখ-কের সত্য কথা কতকটা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। "যখন কোন পরাধীন জাতির মধ্যে এইরূপ অবসাদগ্রস্ত উচ্ছৃঙ্খল অসংযত কামসাহিত্যের আবির্ভাব হয়, তখন বুঝিতে হইবে জাতির জীবনী-শক্তির ক্ষয় হইয়াছে, সকল মনুষ্যত্ব তেজবীর্য্য লোপ

---

* সঞ্জীবনী হইতে উদ্ধৃত।

পাইয়াছে। তাহার মধ্যে তরুণসাহিত্যে মানবজীবনের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিতেছে, সে জীবন আদিম গুহানিবাসী মানবেরও নয়, তাহারও নীচের স্তরের শিম্পাঞ্জি, শাখা-মৃগ বা বনমানুষের। এই সাহিত্যের রাজ্যে পুরুষগুলির যেন আর কোন চিন্তা নাই, আছে কেবল কামচিন্তা। নারী দেখিলেই * * * ইহাদের মনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে, ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। আর এদের সৃষ্ট নারীরাও আমাদের সমাজ বা পরিবারের কেহই নয়; তাদের চরিত্র অতি দুর্ব্বল, ক্ষণভঙ্গুর, কাচের মত ঠুনকো—সংযমশক্তির একান্ত অভাব, যে কোন (ব্যক্তির) * * * প্রেমনিবেদনে মোমের পুতুলের মত গলিয়া পড়িবার জন্য যেন ইহারা সর্ব্বদা প্রস্তুত। স্থানে-অস্থানে সময়ে অসময়ে ঐ "দা"-জাতীয় জীবগুলির ভোগ্য হওয়াই যেন এই সব মেয়েদের একমাত্র কাম্য।

"সতীত্বের মর্য্যাদা, গৃহধর্ম্ম ও পারিবারিক ধর্ম্মের আদর্শ, বিবাহবন্ধনের পবিত্রতা—সবই এই তরুণ-সাহিত্যিকদের নিকট তুচ্ছ—সমস্ত লোপ করিয়া দিয়া ইহারা চায় সেই আদিম "যৌথমানবের" যুগে ফিরিয়া যাইতে।" লেখক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার তাঁহার উক্তির সমর্থনে তরুণসাহিত্য হইতে কতকগুলি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরাও তরুণসাহিত্যে ছাগতন্ত্র যে কতদূর গড়াইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত "শনিবারের চিঠি"তে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ বাংলা মাসিকপত্র "উত্তরা" হইতে উদ্ধৃত একটী গল্পাংশে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। উহাতে অন্যতর নায়ক তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে শ্রুতিমধুর ছাগতন্ত্রীর মন্ত্রে বিপথে লইয়া যাইতেছে!! এপ্রকার গল্পের লেখককেও ধিক এবং তাহার প্রকাশকেরও মহিমা বোঝা দায়। এই কথাই ঠিক যে,"তরুণদের সাহিত্যের নায়িকারা তাহাদের মনেরই কামনার চিত্র—বাস্তবের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই।" * * * তরুণদের "রকমসকম দেখিয়া আমাদের ভয় হইতেছে, গৃহ বা পরিবারে তাহাদিগকে অবাধে স্থানদান করা বা মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ দেওয়া সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" আমরা বলি, আপদসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে—তরুণদের এই প্রকার মনোভাব হইলে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কাহারও উপর তিলমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করা অসম্ভব। "ডালিম" নামক অশ্লীল উপন্যাস প্রকাশের জন্য ভক্তিভাজন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যেরূপ "নারায়ণ" মাসিকপত্রকে নিজের গৃহ হইতে নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রত্যেক গৃহস্থের কর্ত্তব্য, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া এই সকল সাহিত্যকে গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত করা। প্রকৃতই এই সকল সাহিত্য ধরিয়া নারীজাতিকে অপমান করা হইতেছে, বক্ষে পদাঘাত করা হইতেছে। অনেক তরুণ সাহিত্যিক "মুখে নারী-স্বাধীনতার জয়গান করে, সময়ে সময়ে নারীদিগকে দেবী-আখ্যা দিয়া সম্মানের ভাণ দেখান; কিন্তু তাহাদের সাহিত্যে অনেক স্থলে নারীকে অতি জঘন্যভাবে চিত্রিত করিয়া নারীর মর্য্যাদা ও মহত্বের মস্তকে পদাঘাত করে। এই ছাগসাহিত্যকে উৎপাটিত করা বিশেষভাবে নারীগণেরই ইচ্ছা ও সৎসাহসের উপর নির্ভর করে। তাঁহারা দৃঢ়তার সঙ্গে বলুন যে, গৃহে এই প্রকার সাহিত্য প্রবেশ করিতে দিব না; দেখিবেন, অচিরেই পুরুষেরা ছাগতন্ত্র সাহিত্যের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে বাধ্য হইবেন। যদি সন্তানগণের চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিতে চান, সমাজকে মঙ্গলের পথে দাঁড় করাইতে চাহেন, দেশকে উন্নতির পথে অগ্রসর দেখিতে চাহেন, তবে দেশের স্ত্রীপুরুষ, বালকযুবক সকলকে মিলিতভাবে রোগনিদান, দুর্ব্বলতার কারণ, সমাজের কলঙ্ক, জাতিকে নরকে নিক্ষেপক এই "মিথুনাসক্তির" ছাগতন্ত্রীর সাহিত্য সুবুদ্ধির সম্মার্জ্জনী দ্বারা আবর্জ্জনার মত গৃহের বাহিরে, দেশের বাহিরে, রাখিতে হইবেই—নহিলে জাতির কল্যাণ নাই।

ব্রহ্মস্তোত্রম্।

(শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

[মাঘস্য একাদশ-দিবসে রচিতং গীতক]

(১)

অনাদ্যমনন্তমখিলমযুতমজাতমমৃতমদেহমস্তৃতম্,
অশেষমক্ষরমসমমসীমমনূর্দ্ধমতলমমধ্যমস্থিতম্।
নমামি নমামি ব্রহ্ম পরাৎপরম্।
যস্য কৃপাবলং কেবলং হি বলম্॥

(২)

অব্যক্তমব্রাতমদৃশ্যমস্পর্শমনক্ষমসঙ্গমব্যয়মধর্ম্ম,
অহস্তমপাদমকর্ণমনেত্রমচলমশব্দমপ্রতিষ্ঠাক্ষেত্রম্।
নমামি ... ... কেবলং হি বলম্॥

(৩)

অবীজমনুপ্তমব্যাপ্তমম্লানমভূতমভাব্যমেবাবর্ত্তমানম্,
অগন্ধমবেশ্যমচ্ছেদ্যমক্লেদ্যমশোষ্যমদাহ্যমলভ্যমভেদ্যম্।
নমামি ... ... কেবলং হি বলম্॥

(৪)

অপূর্ব্বমপরমনিদানীন্তনমভীতসর্ব্বমসুখমবিষণ্ণম্,
অকল্পমগ্রাহ্যমপেতমক্ষেয়মবাঙ্মনসোগোচরমপ্রমেয়ম্,
নমামি ... ... কেবলং হি বলম্॥

(৫)

অনেকবহুলঘনপ্রবেশেষবিষমস্বর্বারনিশাপ্রাণেশম্,
অশূন্যমব্যোমমকূটমকূলমগুণমন্যূনমসংখ্যমতুলম্।
নমামি ... ... কেবলং হি বলম্॥

(৬)

অশীর্ণমদীর্ণমগ্রাহ্যমচ্ছিন্নমচ্ছন্দ্যামবন্দ্যমচ্যুতমভিন্নম্,
অহিংসমক্রোধমদ্বেষমরাগমলৌকিকানন্দঘনমহাত্যাগম্।
নমামি ... ... কেবলং হি বলম্॥

(৭)

অজেয়মযুক্তমবহিরন্তরমধ্যেয়চৈতন্যমজরমমরম্,
অখণ্ডসচ্চিদানন্দমনাহতমখিলজগন্মঙ্গলমনারম্ভম্।
নমামি ... ... কেবলং হি বলম্॥

(৮)

অনৃতনাশনমৃতপ্রভাস্বরমনুপমেয়মক্ষয়ামৃতাকরম্,
অকল্মষবিদ্ধং বিশুদ্ধাত্মময়মভীষ্টগরিষ্ঠমনঘমভয়ম্।
নমামি ... ... কেবলং হি বলম্॥

(৯)

স্বয়মভোক্ত্রপি সর্ব্বভোগেশ্বরমতীতক্রিয়মপ্যলৌকিকেশ্বরম্,
অত্যদ্ভুতচেষ্টমমর্ত্ত্যমস্বর্গ্যমপরিমেয়মপ্রসারমদৈর্ঘ্যম্।
নমামি ... ... কেবলং হি বলম্॥

(১০)

অতুলিতমহিম চাত্মময়ঞ্চানিন্দ্যসুন্দরং ভূমানন্দময়ম্,
অদ্ভুতচরিতং পরং মহাশয়মশিবনাশনং মহাশিবময়ম্।
নমামি ... ... কেবলং হি বলম্॥

(১১)

অক্রমমগুক্রমবর্ণামরূপমজ্ঞানগম্যঞ্চ ভক্তহৃন্মধুপম্,
অগুহ্যং গুহ্যঞ্চৈকমেবাদ্বিতীয়মাত্মানং পরমং প্রিয়াতীব প্রিয়ম্।
নমামি ... ... কেবলং হি বলম্॥

(১২)

অতিনির্ব্বিকল্পং সর্ব্বান্তর্যামীশমনাময়ং নিত্যং মহান্তং স্বাধীনম্,
অজনকং বিভুং স্বয়ম্ভু-সদ্‌গুরুমনাগমমীশং ভক্তকল্পতরুম্।
নমামি ... ... কেবলং হি বলম্॥

(১৩)

অবালমবৃদ্ধমলিঙ্গমকুহমকল্পিতৈশ্বর্য্যং পরাক্রমাতুলম্,
অসূক্ষ্মঞ্চ সূক্ষ্মমস্থূলঞ্চ স্থূলমণোরণীয়ো বিরাট্ বিপুলম্।
নমামি ... ... কেবলং হি বলম্॥

(১৪)

অনাকৃষ্টমেব যৎ সর্ব্বাকর্ষকমসর্ব্বাভিলাষশূন্যং সর্ব্বার্থপূরকম্,
অনির্দ্দিষ্টাসনং পূতচিত্তাধীশমতীন্দ্রিয়গম্যমর্ত্তিপথমীশম্।
নমামি ... ... কেবলং হি বলম্॥

(১৫)

অসম্প্রদায়েশং সর্ব্বত্রৈকাধীশমসামান্যোদারং সার্ব্বভৌমমীশম্,
অকর্ম্মাধীনঞ্চ সদাকর্ম্মময়মধমোত্তমেষু সদা প্রেমময়ম্।
নমামি ... ... কেবলং হি বলম্॥

(১৬)

অপ্রাকৃতমেব প্রকৃতিবিধানমবিশ্বপ্রাণাধীশং করুণানিধানম্,
সর্ব্বত্রপ্রব্যাপ্তমনির্দ্দিষ্টগ্রামং সদাহিতকল্পং পরমাত্মরামম্।
নমামি ... ... কেবলং হি বলম্॥

পরমব্রহ্মস্তোত্রং হি নিত্যং যঃ প্রযতঃ পঠেৎ।
সর্ব্বসঙ্কল্পসিদ্ধশ্চ ব্রহ্মানন্দময়ো ভবেৎ॥

নানাকথা।

ডাঃ ভি. রায়—আমরা বর্ত্তমান সংখ্যার মুখপত্রে গিরিধির খ্যাতনামা ডাক্তার ভি. রায় (ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রায়) মহাশয়ের একখানি প্রতিকৃতি দিয়াছি। ৭৬ বৎসর বয়ঃক্রমেও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের জন্য তাঁহার উৎসাহ দেখিলে অবাক হইতে হয়। যে সকল সাধু ব্যক্তির অবস্থানের কারণে গিরিধি ব্রহ্মোপাসকগণের প্রিয় প্রবাস ও আবাসস্থান হইয়াছে, ডাঃ ভি, রায় তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহারই উদ্যোগে রাজা রামমোহন রায়ের সহিত উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের বিচার, বেদান্তসম্বন্ধীয় অপ্রকাশিত একটী আলোচনা এবং তুহ্‌ফ্‌তুল মোহদ্দীনের মুদ্রিত একখণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ক্রমে ক্রমে আমরা সেগুলি প্রকাশ করিব স্থির করিয়াছি। তত্ত্ববোধিনীর বর্ত্তমান-সংখ্যায় রাজা রামমোহনের সহিত উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের বিচারের প্রথম দফা প্রকাশিত হইল। নিম্নে আমরা রায় মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

শ্রীযুক্ত ডাঃ ভি, রায় (বিপিন চন্দ্র রায়) বাঙ্গালা ১২৬১ সালের ২২শে আষাঢ়, খৃঃ ১৮৫৪ সালের ৫ই জুলাই, তারিখে ঢাকা জিলার অন্তঃপাতী কয়রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারই পিতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান সংস্থাপক। ৫ বৎসর বয়সে ডাঃ ভি, রায়ের মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার পিতা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে কৃষ্ণনগরে, ব্রজ বাবুর স্কুলে এবং হাওড়া গবর্ণমেন্ট স্কুলে পড়িয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে যথাক্রমে পরীক্ষা দিতে দিতে ১৮৭৮ সালে M.L., পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সেই ১৮৭৮ সালে অক্টোবর মাসে মুন্‌সেফী পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হন। ১৮৮৩ সালে তিনি D. L. উপাধি গ্রহণ করেন। ১৮৮৫ সালে তিনি বাঙ্গালাদেশীয় প্রজাস্বত্ব আইনের একটী টীকা প্রকাশ করেন। ইহা পাঠ করিয়া হাইকোর্টের জজ স্যার টি, প্রিন্‌সেপ যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। সন্দ্বীপে থাকার সময় একবার সেখানে বড় অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। তাহা নিবারণ করিতে তিনি খুব খাটিয়াছিলেন এবং উহাতে একরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এখনও সেখানকার লোকেরা সেইজন্য তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করে।

যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের দ্বিতীয়বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, তখন একবার গ্রীষ্মের ছুটীতে তাঁহার পিতার কর্ম্মস্থল কুমারখালিতে গিয়াছিলেন। সেখানে পরম কারুণিক পরমেশ্বর তাঁহার মনে অনুতাপ প্রেরণ করেন ও পরে জ্যোতির্ম্ময়রূপে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে বলেন "আমার কৃপা তোর পাপ হইতে অধিক"। ঈশ্বরদর্শন ও তাঁহার বাণীশ্রবণ বিষয়ে তাঁহার এই অভিজ্ঞতার কারণে পরবর্ত্তী কালের ব্রাহ্মসমাজের এবিষয়ে মতদ্বন্দ্ব

তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কিন্তু এই দর্শন ও শ্রবণ প্রথম প্রথম তাঁহাকে বিপথ হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। তিনি বিষয় ও বিলাসের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিলেন। তথাপি ঈশ্বর তাঁহাকে ছাড়েন নাই। তিনি কাহাকেও ছাড়েন না। ১৮৯১ খৃঃ পিরোজপুর থাকা সময়ে তাঁহার স্ত্রী স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন। ডাঃ রায়ও স্বয়ং ব্রাহ্মধর্ম্মের পুস্তকাদি পাঠ ও খৃষ্টান পাদরী টাইসব্র্যান সাহেবের সহিত পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মালোচনা করিয়া ধর্ম্মবিশ্বাস লাভ করেন। সেই সময় হইতে তিনি ধর্ম্মানুসরণ আর ত্যাগ করেন নাই।

চট্টগ্রামে থাকা সময়ে তিনি অপর কয়েকজন বন্ধুসহ উপাসনা-মন্দির-নির্ম্মাণের চেষ্টা করেন; সে চেষ্টা কয়েক বৎসর পরে সাফল্য লাভ করে। ১৯০৫ সন হইতে ডাঃ রায় গিরিধিতে বাস করিতেছেন ও ১৯০৯ সালের জুলাই মাস অবধি পেনসন্ গ্রহণ করিয়াছেন। এখন বয়স ৭৫ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে। তাঁহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা। প্রথম পুত্র প্লেগরোগে ২৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। দ্বিতীয় পুত্র সরকারী কৃষিবিভাগে কর্ম্ম করেন—এখন চট্টগ্রামে। তাঁহার স্ত্রী, কন্যা, পুত্র ও পুত্রবধূ সকলেই উপাসনানুরাগী ব্রহ্মোপাসক।

সমাজসংস্কার—সংবাদপত্রে দেখি, কাবুলরাজ মহিলাদিগকে পর্দ্দা রাখা বা না রাখা সম্বন্ধে স্বাধীনতা দিয়াছেন। সমাজসংস্কার সম্বন্ধে আমরা এই প্রকার স্বাধীনতার নীতিই সমর্থন করি। অবশ্য যেখানে কোন কারণে জাতীয় জীবনে প্রত্যক্ষ ধ্বংস আসিবার সম্ভাবনা অথবা প্রাণনাশের সম্ভাবনা, সেখানে আইন কর। নতুবা পর্দ্দা রাখা বা না রাখা, অথবা ১৬ বৎসরে বা ১৮ বৎসরে বা ৩০ বৎসরে বিবাহ দেওয়া হইবে, এ সকল বিষয়ে সমাজের মতকে ভিতর হইতে অভিব্যক্ত হইতে দিবার অবসর দেওয়া উচিত। এরূপ বিষয় ছোটখাটো হইলেও এগুলিকে আইনের অধীনে আনিলে জনসাধারণের অন্তরে যে আঘাত পড়ে, তাহার ফলে সমাজবিপ্লব এবং তাহার সঙ্গে রাষ্ট্রবিপ্লব আসিবারও সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। অবশ্য আইন করা উচিত যৌবনের পূর্ব্বে বিবাহে অর্থাৎ সন্তানোৎপাদনে, কারণ তাহার ফলে সন্তান ও প্রসূতি উভয়েরই মৃত্যুমুখে পড়ার সম্ভাবনা বড় বেশী।

আত্মবলিদান—দেশের বর্ত্তমান অবস্থা যাহা হইয়াছে, জন্মভূমি ভারতভূমির যে সঙ্কটকাল আসিয়াছে, বর্ত্তমান অবস্থায় দেশ তাহার প্রত্যেক সন্তানের নিকট আত্মবলি প্রার্থনা করিতেছে। আজ জননী জন্মভূমি শুধু একটী পরিবারের নয়, কিন্তু ভারতের প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট আত্মবলি প্রার্থনা করিতেছেন। ভুল বুঝিও না। বিপ্লবতন্ত্র বুঝি না; রক্তারক্তির কথাও শুনিতে চাই না। আমি দেশবাসীকে আত্মবলিদানের বাণী শুনাইতে চাই। বিনা আত্মবলিদানে তুমি জননী জন্মভূমির সেবা করিবার অধিকার পাইবে না। সুখসোয়াস্তির কথা তোমার স্মৃতিপটে জাগরূক রাখিবে, আর বলিবে—তুমি তোমার রুগ্না জননীর সেবা করিতে প্রস্তুত আছ; আমি বলিব তাহা মিথ্যা কথা। একদিকে, নৃত্যগীতে মাতিয়া, চুরুটসিগারেটের ধোঁয়ায় নিজের জীবনীশক্তির ক্ষয়সাধন করিয়া অশ্লীল আমোদপ্রমোদে গা ঢালিয়া দিয়া প্রাণের সহিত দেশের দুঃখমোচনে অগ্রসর হইবার শক্তি হারাইয়া ফেলিবে, আর দুই চারিবার হৈচৈ করিয়া লম্বা গোলযোগ করিয়া মনকে প্রবোধ দিবে যে দেশের সেবা করিতেছে, তাহা নিতান্ত ভুল। সকল দিকে সংযম সাধন করিবে, ধর্ম্মের ভিত্তির উপর দাঁড়াইবে, ভগবানের মঙ্গল দৃষ্টির উপর নিজের দৃষ্টি স্থির রাখিবে, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার সহিত অপরের মঙ্গল ইচ্ছা একান্ত সংযুক্ত করিয়া সংসারে বিচরণ করিতে থাকিবে, তবেই দেশের প্রকৃত সেবা করিবার উপযুক্ত শক্তি-সামর্থ্য লাভ করিবে, তবেই তোমার আত্মবলিদান সার্থক হইবে।

বিজ্ঞাপনে অশ্লীলতা—গত ১৬ই মাঘের সঞ্জীবনী বিজ্ঞাপনে অশ্লীলতা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। টাকাটাই কি সব চেয়ে বড় হইল? ঐরূপ অশ্লীল ছবি প্রকাশের ফলে যে নিজেদের পিতামাতা, ভাই-বোন এবং পুত্রকন্যাদের অপমান করা হইতেছে, সে বোধ কি হয় না? ক্রীতদাসের যেমন দাসত্বের অপমান-বোধ থাকে না, সেইরূপ আজকাল আমরা যেরূপ অশ্লীলতার আবহাওয়াতে লালিতপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছি, তাহাতে অশ্লীলবিষয়ের অশ্লীলত্ব ও তাহার পরিণাম-ফল সহজে আমাদের উপলব্ধিতে আসে না। ছেলেমেয়েদের এই অশ্লীল আবহাওয়া হইতে রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিয়াছে। সঞ্জীবনী কেবল একটী অশ্লীল বিজ্ঞাপনের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু দৈনিক সম্বাদপত্রে বালক-বৃদ্ধ এবং তরুণ-তরুণীদিগকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য বায়স্কোপ প্রভৃতির বিজ্ঞাপনসূত্রে যে সকল অশ্লীল ছবি প্রকাশিত হয়, সেগুলি কেন যে বন্ধ করা হয় না, তাহাই ভাবিয়া আমরা নির্ব্বাক হই। মুস্কিল এই যে, ইচ্ছা সত্ত্বেও ঐ সকল বিজ্ঞাপন হইতে ছেলেমেয়েদের দৃষ্টি সরাইয়া রাখা অসম্ভব—তাহা হইলে বয়স্ক ছেলেমেয়েদের দৈনিক সম্বাদপত্র পড়িতেই দেওয়া যায় না—সেটা বর্ত্তমান যুগের বর্ত্তমান অবস্থায় নিতান্তই অসম্ভব। গবর্ণমেণ্টের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা, এই বিষয়ে তাঁহাদের যন্ত্রপাতি পরিচালিত করুন, নতুবা তাঁহারা জানিবেন যে, ঐ সকল চিত্রাদির ফলে নরনারীর মন যখন চারিত্র্যহীন হয়, তখনই তাহা বিপ্লববাদের বীজ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হয়।

চিকিৎসাবিভাগে ভারতীয়ের অধিকার—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় মহাশয়ের মন্ত্রীত্বে হাবড়ার সিবিল সার্জ্জন লেফটেনাণ্ট কর্ণেল দ্বারকাপ্রসাদ গয়েল, I.M.S. মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায় ক্যাম্বেল মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা ইহা খুবই দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, ভারতীয় কেহ উপযুক্তক্ষেত্র পাইলে নিজের শক্তি ও যোগ্যতা সহজেই প্রকাশ করিতে পারিবেন। রমেশচন্দ্র দত্ত ও কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত প্রভৃতির ন্যায় ব্যক্তিগণকে শাসনক্ষেত্রের সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদত্ত হইলে তাঁহারা তাহা অলঙ্কৃত করিতে পারিতেন নিঃসন্দেহ।

যাদবপুরে কৃষিশিক্ষা—"যাদবপুর কলেজ অব

ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনলজি (পূর্ব্বের নাম—বেঙ্গল টেকনিকাল ইংষ্টিটিউট) কলিকাতা কর্পোরেসনের নিকট হইতে ১২ বিঘা জমি গ্রহণ করিয়া কৃষি-কলেজ স্থাপন করিতে সংকল্প করিয়াছেন। কর্পোরেসন মাসিক ২০০৲ শত টাকা খাজানায় এই কৃষি কলেজকে প্রদান করিবেন। কর্পোরেসন প্রতি বৎসর ২টী ছাত্রকে ঐ কলেজে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য পাঠাইবেন।" (আর্থিক উন্নতি বৈশাখ ১৩৩৭) এই প্রকার কার্য্যে অগ্রসর হওয়া দেশের পক্ষে সুলক্ষণ নিঃসন্দেহ। আমাদের এইটুকু অনুরোধ যে, এখানেও যেন গ্রন্থাদিনির্ব্বাচনে অনুগ্রহবিতরণের বা favouritism এর জোর হাওয়া না বয়—কর্ত্তৃপক্ষগণ সত্য সত্য কৃষি প্রভৃতির উপযোগী পুস্তকসমূহের সন্ধান করিয়া বিশেষ বিচারপূর্ব্বক যেন নির্ব্বাচন করেন।

পত্রিকাপরিচয়।

আর্থিক উন্নতি— বৈশাখ ১৩৩৭—সম্পাদক স্বনামধন্য শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

এই সংখ্যা আমরা বলিতে পারি আদর্শ সংখ্যা হইয়াছে। আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিলেও magnifying glass এর সাহায্যে ইহার দুই-একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এতই আনন্দ পাইলাম যে, পরে দেখিতে কষ্ট হইলেও এই সংখ্যার প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই সংখ্যার প্রত্যেক প্রবন্ধই চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতেছে এবং প্রত্যেক প্রবন্ধই আর্থিক উন্নতির উপযোগী। এই সংখ্যার এক প্রবন্ধের অংশ অবলম্বনে আমরা "দেশের কথা" নিবন্ধে ভারতের ঋণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আগামী মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। আমাদের ইচ্ছা হয়, আর্থিক উন্নতির এই সংখ্যার প্রত্যেক প্রবন্ধই তত্ত্ববোধিনীতে উদ্ধৃত করি। প্রথম প্রবন্ধ—"বাংলার সম্পদ", ইহাতে প্রধানতঃ কালনা সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের দশম কার্য্যবিবরণ দেওয়া আছে। ইহাতে অনেক শিখিবার বিষয় আছে। দ্বিতীয় নিবন্ধ—আর্থিক ভারতের প্রধান প্রবন্ধ ভারতের ঋণ—সুলিখিত, ইংরাজীতে lucid and clear বলা যায়। তৃতীয় নিবন্ধ—দুনিয়ার ধন-দৌলত। ইহাতে ফ্রান্স, জর্ম্মণি প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশগুলি যে কি প্রকারে সমৃদ্ধির পথে চলিয়াছে, তাহার সুন্দর বর্ণনা আছে। আমাদের দেশের ছেলেরা যদি এই সকল প্রবন্ধ ভাল করিয়া বুঝিয়া ইহাদের মর্ম্ম আত্মস্থ করেন, তবেই দেশ উদ্ধার পাইবে—শুধু ফাঁকা কথায় দেশের লোক আহার পাইবে না। পঞ্চম নিবন্ধ মোলাকাৎ—এবারে তাহার বিষয় হইতেছে ফরাসী ব্যাঙ্ক প্রসঙ্গ। "সমালোচনা"র মধ্যে সেলিগম্যান সম্পাদিত "The Encyclopedia of social sciences"এর যে ক্ষুদ্র বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখিলে আমাদের মাথা লজ্জায় হেঁট হইয়া যায়। মনে হয়, আমরা কি করিতেছি। যাঁহারা ঐ প্রকার কোন গ্রন্থ সম্পাদন করিতে পারেন, তাঁহাদের নিকট আমরা তো পরাধীনতা পূর্ব্ব হইতেই স্বীকার করিয়া বসিয়া আছি বলিলেও চলে। "দারিদ্র্যের নির্ব্বাসন" প্রবন্ধটী সুলিখিত এবং প্রত্যেক দেশহিতৈষীর পাঠ করা উচিত। "বাংলার লবণের ব্যবসা" এবং "গো-রক্ষা ও গো-পালন" সময়োপযোগী প্রবন্ধ।

সুবর্ণবণিক সমাচার—মাঘ, ১৩৩৬—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ কর্ত্তৃক লিখিত এডিসনের জীবনবৃত্তান্ত বড় ভাল লাগিল। হেমেন্দ্রবাবু পাশ্চাত্য দেশের মহৎ লোক ও মহীয়সী নারীদিগের জীবনচরিত লিখিয়া তাঁহাদের বড়ত্বের কারণ ফুটাইয়া তুলিয়া এদেশের তরুণ-সম্প্রদায়ের সম্মুখে ধরেন তো বড় ভাল হয়। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়কে আমরা অনুরোধ করি, স্বর্গীয় অমৃতলাল দের যাহা কিছু পাইয়াছেন, তাহা অল্পে অল্পে সুবর্ণবণিক সমাচারে প্রকাশ করিয়া দেশের ও দশের উপকার করুন। তিনি অমৃতবাবুর পুস্তকগুলির যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মূল গ্রন্থগুলি দেখিবার বড়ই কৌতূহল হয়। শ্রীক্ষি. না. ঠা.

শোক-সংবাদ।

৺সরোজিনী সরকার—গিরিধিনিবাসী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার এম-এ মহাশয়ের সুযোগ্যা পত্নী माननীয়া সরোজিনী সরকার গত ২২শে বৈশাখ সোমবার অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় গিরিধির 'উপলাপথ' নামক স্বকীয় বাসভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। আমরা ইঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান এই সাধ্বী নারীর লোকান্তরিত আত্মাকে আপন স্নেহাশ্রয় দান করুন।

৺প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত—গত ২৮শে বৈশাখ রবিবার ঢাকা-বিক্রমপুর—বেজগাঁ-নিবাসী রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত তাঁহার আলিপুরের স্বকীয় বাসভবনে পরলোকগত হন। এই ভগবদ্‌বিশ্বাসী স্বনামধন্য পুরুষ স্বচেষ্টায় জীবনে বহু সুখ-সৌভাগ্য ও সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন। ইনি মহামান্য ত্রিপুরারাজের মাননীয় মন্ত্রীর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় মনসংযোগ করিয়াছিলেন। ইঁহার পরিবারবর্গের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার সদ্‌গতিবিধান করুন।

৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার রাত্রি ১॥০ ঘটিকায় সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ মহাশয় তাঁহার কালীঘাটের স্বকীয় বাসভবনে অকালে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৪৬ বৎসর হইয়াছিল। ইনি কর্ম্মজীবনের প্রথম হইতেই ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের ক্ষেত্রে পুরাবস্তুর আবিষ্কারে ও গ্রন্থরচনায় নানাভাবে আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। ১৯২৩ সালে সিন্ধুপ্রদেশে মহেঞ্জোদারোর পুরাবস্তু আবিষ্কারে তাঁহার প্রতিভার পূর্ণবিকাশ ঘটে। ইঁহার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। আমরা ইঁহার শোকার্ত্ত পরিজনদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

Tattwabodhini Patrika **Reg. No. C 462**

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৮তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে শ্রীরণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৮তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০১। সাল ১৩৩৭। শক ১৮৫২। খৃঃ ১৯৩০। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩১।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

২৯। মরণছোঁয়া।

মা! তোমার এই মরণছোঁয়া ছেলে রাস্তার এক ধারে পড়িয়া আছে। কেবল চাহিতেছি—কবে তুমি আসিয়া কোলে তুলিয়া লইবে। কত লোক যাইতেছে, কত লোক ফিরিয়া চলিয়াছে—কাহারও চক্ষু কি আমার দিকে একটীবারের জন্যও পড়িল না? চক্ষের জলে আমার গণ্ডদেশ তো ভাসিয়া গেল। জননী! তুমিও তো এদিক ওদিক কতদিকে যাইতেছ আসিতেছ—তোমারও কি এই পথভোলা ছেলেকে একটীবারও মনে পড়িল না? কাঁটায় কাঁটায় আমার দেহমন যে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে। দেখি—তুমি আমার সঙ্গে তোমার নাড়ীর যোগ কতদিনে রক্ষা কর। মা! তোমার বুকের ভিতর মুখখানি গুঁজিয়া রাখিয়া তোমার স্নেহের গন্ধে বিভোর হইবার জন্য প্রাণ উতলা হইয়া উঠিয়াছে। তোমার একটুখানি ভালবাসা পাইবার জন্য আমি আকুল হইয়া উঠিয়াছি। তাই বলিয়া আমার প্রাণের ব্যথা অন্য কাহারও নিকট জানাইবার জন্য দৌড়াইব না। আমার বুকের কান্না একমাত্র তোমার কাছেই জানাইব। আমাকে একবার তোমার ঐ সুবিশাল বক্ষে দুই হাত দিয়া চাপিয়া ধর—আমি তোমার স্নেহরসে আর্দ্র হইয়া যাই। তোমার প্রসন্ন মুখ একবার দেখাও, একবার তোমার মুখের বিমল হাসি দেখিতে দাও; একটুখানি আদর করিয়া একবার কথা কও। তোমাকে ছাড়িয়া জগত আমার কাছে শুষ্ক—মরুভূমি। তোমার কোলে বসিলেই দেখি যে, ভূধরসাগর, দ্যুলোকভূলোক সমস্তই তোমারই প্রেমে আচ্ছাদিত—ঐ প্রেমের ভিতরেই তোমার স্পর্শ, তোমার স্নেহহস্তের বেষ্টন অনুভব করি।

৩০। মা-নাম।

মা! কি মধুর নাম! সমস্ত মিষ্টরস নিংড়াইয়া যেন এই নামের সৃষ্টি হইয়াছে। মা-নামে কি গভীর শান্তি! ঐ নামের গুণেই বাতাস মৃদুমন্দ হিল্লোলে বহিতে থাকে, মাঠগুলি শস্যশ্যামল হইয়া উঠে; আকাশ সুনীল রঙ্গে রাঙ্গিয়া উঠে, ঘাসগুলি মাথা নাড়িয়া সুন্দর নৃত্য করিতে থাকে। ঐ নাম শুনিয়াই শারদ-প্রভাতের সোনালি মেঘগুলি কেমন সুন্দর হাসে; নিশীথের চন্দ্রমা প্রেমরসে অভিষিক্ত হইয়া সুধাধারা বর্ষণ করে। ঐ

নামটি আমার প্রাণে আজ বাজিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আমার কণ্ঠ প্রকৃতির সঙ্গে সুর মিলাইয়া গান করিতেছে। অনাদি অনন্ত জীবন ভেদ করিয়া তোমারই নাম আমার প্রাণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আজ আমার আনন্দের সীমা নাই। দিবসের জাগরণের উপর যখন স্বপ্নের আবরণ পড়ে, তখন নিদ্রাতেও তোমারই নাম প্রাণের মাঝে বাজিতে থাকে; আবার নিশার স্বপ্ন ছুটিয়া গিয়া প্রাণের মাঝে প্রভাতের জাগরণ যখন সাড়া দিয়া ওঠে, তখন সেই জাগরণেরও মধ্যে তোমারই নাম ঝঙ্কার দিতে থাকে। তুমি যখন আমাকে দুই বাহুতে জড়াইয়া আদর কর, সেই আদরের আনন্দের মাঝে তোমারই নাম মুহুর্মুহু বাজিয়া ওঠে; আবার আমার দোষের জন্য আমার উপর রাগ দেখাইয়া যখন আমাকে তোমার কোল হইতে নামাইয়া দাও, তখন সমস্ত মনপ্রাণকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া যে গভীর ক্রন্দন উদ্বেলিত হইয়া ওঠে, তাহারও ভিতরে তোমারই নাম ধ্বনিত হয়। উদয়াচলে কনকতপন উদিত হইয়া সুনীল আকাশকে যখন হাস্যময় করিয়া তোলে, তখনও তোমার নাম; আবার সেই আকাশের হাসিমুখখানি যখন জলভরা ঘন কালো মেঘে ঢাকিয়া যায়, তখনও তাহাতে তোমারই নাম। প্রাণের ভিতর দুঃখের জল যখন ভরিয়া যায়, তখন তাহার ভারে সংসার-সাগরে ডুবিতে ডুবিতে তাহার তল খুঁজিয়া পাই না। তল স্পর্শ করিয়া মৃত্যুর কবলে পড়িবার পূর্ব্বেই কেমন আশ্চর্য্যরূপে তোমার জীবন-মেখলা পরাইয়া দাও যে, তাহারই সাহায্যে হাসিতে হাসিতে আবার ভাসিয়া উঠি। তখন মৃত্যুর ভিতরেও জীবনের উৎস খোলা দেখিতে পাই।

৩১। বিজয়ী কর।

মা! আমাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর। ঐ দেখ—কয়েকজন ব্যাধ আত্মীয়তার মুখোস পরিয়া আমার সঙ্গে বড়ই ভাব করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আমি উহাদিগকে বড় ভয় করি। আমি বেশ বুঝিতেছি যে, উহারা আমাকে বেড়াজালে ধরিয়া বধ করিবার চেষ্টায় আছে। তোমার কাছে যাইবার পথে উহারা অনেকগুলি গভীর খাদ কাটিয়া রাখিয়াছে—উহাদের প্রাণের ইচ্ছা যে, ঐগুলির মধ্যে অন্তত একটাতেও পড়িয়া আমি বিনাশ প্রাপ্ত হই। উহাদের সাধ্য কি যে আমার বিনাশ সাধন করে? তুমি যে পথ-প্রদর্শক হইয়া প্রদীপ হস্তে আমার আগে আগে চলিয়াছ, সে কথা উহারা জানে না। শুধু আজ বলিয়া তো নহে—কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যে তুমি আমাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছ তাহা কে জানে? আমি জানি, তুমি আমাকে সকল বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিয়া পরিণামে বিজয়ীর মুকুট আমার মস্তকে পরাইয়া দিবে। আমি আর কাহারও দিকে চক্ষু ফিরাইব না—তোমারই মঙ্গল-দৃষ্টিতে আমার দৃষ্টিকে স্থির রাখিব। ভয়-ভাবনা কিছুমাত্র প্রাণে পোষণ করিব না। তুমি যে মন্ত্র দিয়াছ, তাহাই অন্তরে ধারণ করিয়া মঙ্গল ও বিজয় নিশ্চয়ই লাভ করিব। প্রতিদিন কৃতজ্ঞতার অশ্রু দিয়া তোমার চরণ ধুইয়া দিব। আমার বিষাদগীতিতে তোমার আগমনী উৎসব সম্পন্ন করিব।

৩২। প্রতীক্ষায়।

তোমার চরণধ্বনি আমার কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সেই মধুর ধ্বনিতে পথের ধূলিকণা পর্য্যন্ত প্রেমেতে ভরিয়া উঠিয়াছে। মলয় বায়ু তোমারই আগে আগে আসিয়া অতি নীরবে আমার কানে কানে চুপি চুপি তোমার আসিবার কথা বলিয়া গিয়াছে। মা! ইহারা আমার কাছে তোমার সংবাদ দিবে, তবে আমি জানিতে পারিব? আমি তাহা চাহি না। তুমি নিজে আসিয়া আমায় কোলে তুলিয়া লও। তোমার বিষয় তুমি আমাকে নিজে শিক্ষা দাও। জানি না, গোলাপ ফুলগুলি তুমি কোন্ হাতে রাঙ্গাইয়া দিয়াছ। তাহারা কেমন ছোট ছোট ঘাড়গুলি হেলাইয়া দুলাইয়া তোমার কথা সকলকে বারবার বলিতেছে। আমার হৃদয়খানি তোমার প্রেমের রক্তবর্ণে অমনি করিয়া রাঙ্গাইয়া না দিবে কেন? তোমার ঐ চরণখানি আমার বক্ষে রাখিলেই আমার সমস্ত মনপ্রাণ নিশ্চয়ই রাঙ্গিয়া উঠিবে। নীরব নিথর নিশীথে ঐ একটী ছোট—অতি ছোট পাখী কি সুন্দর শীষ দিয়া তোমারই নাম গায়

করিতেছে। মা! আমাকেও তুমি ঐ রকম গান করিতে শিক্ষা দাও, যাহাতে দিবানিশি ঐ ভাবে দিবসের কোলাহলে এবং নিশীথের নিস্তব্ধতিতে সকল সময়েই কেবলই তোমারই নাম গাহিতে পারি। নিশীথের চাঁদ কি অনুপম প্রেম-পূর্ণ একদৃষ্টিতে চাহিয়া তোমারই মঙ্গল ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। কবে তুমি আমারও চক্ষে ঐ রকম মঙ্গলদৃষ্টি খুদিয়া বসাইয়া দিবে, যাহাতে আমি তোমারই মুখের দিকে ঐভাবে অনিমেষদৃষ্টিতে চাহিয়া সুধাধারা অবিরাম পান করিতে পারি। শাদা শাদা ফুলগুলি তোমারই হাসি দেখিয়া কেমন সুন্দর হাসিতেছে। আমার হৃদয় হইতে কবে বিষাদমাখা গভীর বেদনা দূর হইবে আর ঐ সকল ফুলের মত হাসিতে পারিব—তোমার নামমাত্রে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে, তাহা তুমিই জান। মা! কাঁদিয়া কাঁদিয়া আর তো পারি না। আমাকে কি চিরকাল এই প্রকার দূরে দূরে ঠেলিয়া রাখিবে—তুমি কবে একটীবার কোলে তুলিয়া আমার সকল দুঃখজ্বালা দূর করিবে, আর আমি তোমার চরণ বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া আনন্দ ও শান্তি পাইব, তাহারই প্রতীক্ষা করিয়া আছি।

৩৩। তুমি আর আমি।

জননী! তুমি তো জান আমি তোমাকে কত ভালবাসি। একবার তোমা হইতে রাগ করিয়া বিপথে সরিয়া গিয়াছিলাম বলিয়া মনে করিও না যে আমি তোমাকে ভালবাসি না। তোমাকে ভাল না বাসিলে আমি বাঁচিব কি প্রকারে? একথা আমার মুখের কথা নহে—ইহা যে আমার প্রাণের কথা। মা! ইহলোকেই হউক বা পরলোকেই হউক—আমি আর তুমি—তুমি আর আমি—তোমাকে ছাড়িয়া আমার যে আর কেহই নাই। অনেক সময়ে মনে হয়, তোমা হইতে বারেকের জন্য যে সরিয়া গিয়াছিলাম, তাহা ভালই হইয়াছিল; তা-নইলে তোমার ভালবাসাই বা জিনিষটা যে কি, তাহাও স্পষ্টরূপে বুঝিতাম না, আর আমিই তোমাকে কত গভীর ভাবে ভালবাসি, তাহাও বুঝিতাম না। আমার সকলের ভিতর যে তুমি, আর আমিও যে তোমার সকলের ভিতর, তাহা খুব স্পষ্ট বুঝিয়াছি। এখন তুমি ইচ্ছা করিলেও আর আমাকে ছাড়িতে পারিবে না, আমিও তোমাকে ইচ্ছা করিলেও ছাড়িতে পারিব না। তোমার প্রসন্ন মুখের জ্যোতি এমন অবিরলধারে আমার মুখে আসিয়া পড়িতেছে; এখন আমি আর বৃথা ছায়ার দিকে ছুটিব না। আলো-ছায়ার মাঝে পড়িয়া, আশা-নিরাশার মাঝে পড়িয়া যখন আমি অনবরত দোল খাইতে থাকিব, আর শান্তি হারাইয়া ফেলিব, তখন মা! তুমি একটীবার কোলে তুলিয়া সেই ছেলেবেলার মত আদর করিও; আমি এখনও তোমার সেই শিশুই আছি—আমাকে তোমার শান্তিমাখা চুম্বন দিয়া আমার সমস্ত অশান্তি হরণ করিও। তুমিই আমার একমাত্র লক্ষ্যস্থল। আমার আর লক্ষ্যহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার তিলেক অবসর নাই। মা! একবার একটু দয়া করিয়া কাছে এসো—খুব কাছে এসো—আমার এই ছোট ছোট দুই বাহু তোমার দিকে বাড়াইয়া দিই, তোমাকে মা—মা বলিয়া একটুখানি আদর করিয়া প্রাণের মধ্যে তৃপ্তি পাই, শান্তি পাই।

চোরা বালি।

(১) দুর্নীতি প্রসারের কারণ

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজকাল এমন দিন যায় না, যেদিন সংবাদপত্র খুলিলেই দুশ্চরিত্র পুরুষের বা স্ত্রীলোকের দুর্নীতিপূর্ণ কাহিনী সুদীর্ঘ কাহিনীরূপে বর্ণিত না থাকে। সংবাদপত্র বলি কেন, মাসিকপত্র হাতে পড়িলেই ভয়ে ভয়ে খুলিতে হয়—না জানি উহাতে কত ভয়ানক অশ্লীল উপন্যাস দেখিতে পাইব। কোন সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতার তত্ত্বাবধারণে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইত। তাহাতে অতীব কদর্য্যস্থানে দুশ্চরিত্র ও মাতাল লোক-দিগের পরস্পরের মধ্যে যে ভাবে কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে, সেইভাবের কথাবার্ত্তা দিয়া সুসজ্জিত (?) করিয়া একটী উপন্যাস মাসের পর মাস প্রকাশ করা হইত। আমরা তো স্তম্ভিত হইতাম যে, দেশহিতৈষী রাজনৈতিক নেতা কেমন করিয়া এমন উপন্যাস প্রকাশ করিবার অনুমতি দিতেছেন। কেবল একজন বীরহৃদয় সাহিত্যিক ঐ প্রকার উপন্যাসপ্রকাশের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন।

ঐ উপন্যাসের অশ্লীলতা অনেকেরই অন্তরে আঘাত করিত, কিন্তু ঐ সাহিত্যিক ব্যতীত আর কেহই তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কিছু বলিতে সাহস করিতেন না,—ভয়, পাছে উক্ত রাজনৈতিক নেতার একটীমাত্র ইঙ্গিতে তাঁহার সর্ব্বনাশ হয়, অন্নসংস্থানও ঘুচিয়া যায়। একজন মনীষী সাধুব্যক্তি এই উপন্যাসের কারণে ঐ মাসিক পত্রকে তাঁহার গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। উপন্যাসলেখক তাঁহার ঐ উপন্যাসখানিকে নাকি বড়ই realistic বলিয়া বন্ধুবান্ধবের কাছে ঢাক বাজাইতেন। তিনি নিজের প্রশংসা করিয়া ক্লান্ত হইতেন না। এক সুপণ্ডিত ব্যক্তির নাম লইয়া বলিয়া বেড়াইতেন যে, তিনি পর্য্যন্ত উহার realistic সৌন্দর্য্যের বড়ই প্রশংসা করেন। শুনিতে পাই, এক ব্যক্তি ইহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য সেই পণ্ডিতব্যক্তির নিকট এবিষয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, তিনি লেখককেও চক্ষে দেখেন নাই এবং তাঁহার সেই উপন্যাসের এক অক্ষরও পড়েন নাই—প্রশংসা করা তো দূরের কথা। আমি জানি, অনেক পিতামাতাকে এই উপন্যাসের কারণে সশঙ্ক থাকিতে হইত, পাছে ঐ মাসিক-পত্র তাঁহাদের পুত্রকন্যাদের হাতে পড়ে এবং ঐ উপন্যাস পড়িয়া তাহাদের কচি মনে অশ্লীলতার দাগ অঙ্কিত হয়; তাঁহারা ঐ মাসিকপত্র ছেলেমেয়েদের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিতে বাধ্য হইতেন।

আর এখন—এখন পয়সার খাতিরে মাসিকপত্র যে অশ্লীলতম উপন্যাসে ভরিয়া উঠিতেছে। বহুকাল যাবৎ দেখিতেছি, অশ্লীলভাব বাংলা উপন্যাসে স্তরে স্তরে অধিক হইতে অধিকতর মাত্রায় উঠিতেছে। প্রথমে একটী সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসে অশ্লীলতা ক্ষীণধারায় দেখা দিল। তাহার পর আর একটী সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসে অশ্লীলতা বেশ একটু জোরে দেখা দিল। এই সকল উপন্যাসে অশ্লীলভাব ভালরূপ থাকিলেও তত প্রকাশ্যভাবে ফুটিয়া বাহির হইতে বোধ হয় সাহস করে নাই। ইহার পর, কয়েকটী সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসে অশ্লীলতা একটু প্রকাশ্যভাবেই বাহির হইতে লাগিল। তারপর, একটী সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসে অশ্লীলতা সপ্তম সুরে গান ধরিল। তারপর একটী উপন্যাসে সকলকে উপহাস করিয়া অশ্লীলতা একেবারে উচ্চ সপ্তকের মধ্যম সুরে বাজিয়া উঠিল। উপরোক্ত শেষ দুইটী উপন্যাসের অশ্লীলতা এতই বেশী যে, তাহার এতটুকু উদ্ধৃত করিয়া আমার লেখনী ও কাগজকলম কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না। লেখকদিগকেও ধিক্‌, তাঁহাদের উপন্যাসগুলিকেও ধিক্‌—মিস মেয়োকে যদি তাঁহার গ্রন্থের জন্য মহাত্মা গান্ধী Drain Inspector বলিতে পারেন, তবে এই সকল উপন্যাস-লেখকদিগকে আমরা যে কি বলিব তাহা ভাবিয়া পাই না। লেখকদিগের যদি স্ত্রীপুত্রকন্যা থাকে, তবে তাঁহারা তাঁহাদের হাতে সেই সকল উপন্যাস দিতে সাহস করিবেন বলিয়া তো আমাদের মনে হয় না; যদি সাহস করেন, তবে সে দুঃসাহস ধন্য বলিতে পারি না—পদদলিত করিবার যোগ্য। লেখকদিগের মন ঐ প্রকার অশ্লীলভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারে; কিন্তু আমরা কর্ম্মবীর হেনরি ফোর্ডের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারি যে দেশের কোন স্ত্রী বা পুরুষ, ছেলে বা মেয়েকে অশ্লীলতার পথে, অবনতির পথে লইয়া যাইবার অধিকার তাঁহাদের কাহারও নাই। আমরা বেশ জানি, আমাদের দৃঢ়তম বিশ্বাস আছে এবং জগতের ইতিহাস আমাদের সেই বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে যে, এই অশ্লীলভাবের ধারায় যদি বন্যা আসে তবে দেশে বালির পলি পাড়িয়া দেশকে উষর করিয়া তুলিবে; কিন্তু এই ধর্ম্মপ্রাণ পুণ্যভূমি ভারতভূমিতে তাহা হইবার আমাদের আশঙ্কা নাই। আমরা ইহা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, এই অশ্লীল ভাবের ধারা কিছুকালের মধ্যেই নির্ব্বাসিত হইবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হইবে যে, নির্ব্বাসিত হইবার পূর্ব্বে উহা অনেক যুবক-যুবতী, অনেক বালক-বালিকার মস্তক চিবাইয়া খাইবে।

অশ্লীলতা, তাহা ধর্ম্মের নামে হউক, সাহিত্যের নামে হউক বা আর্টের নামে হউক, বা অন্য যাহারই নামে হউক—অশ্লীলতা যে অবনতির কারণ, অশ্লীলতা যে মানুষকে পশুত্বের দিকে, ধ্বংসের পথে, মৃত্যুর মুখে লইয়া চলে, বোধ হয় জগতের প্রত্যেক দেশেরই ইতিহাস তাহার সাক্ষ্যপ্রদানে অগ্রসর হইবে। আমাদের দেশে কাপালিক, ভৈরবীচক্র প্রভৃতির আবির্ভাব, নেড়ানেড়ী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব—এসকল ধর্ম্মে অশ্লীলতা আনয়নের ফল ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। এই সকলের ফলে দেশ যে কিরূপ অধঃপাতে গিয়াছে, তাহা তো আমাদের প্রতি পদেই প্রত্যক্ষ হইতেছে। মানবজাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, মানুষ যতই উন্নতির পথে আরোহণ করে, ততই মনুষ্যেতর জীবজন্তুর অভ্যস্ত অশ্লীলতা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট হয়। শ্লীলতার মর্ম্ম অনুধাবন পূর্ব্বক দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, যে সকল বিষয় অতিরিক্ত অনুশীলনের ফলে মানবের রোগ আসে, শরীর জীর্ণ হয়, মন হীনবুদ্ধি হইয়া পড়ে এবং আত্মা নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হয়, সেই সকল বিষয়ের অতিরিক্ত অনুশীলনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া। সে সকল বিষয়ের সংযত ব্যবহারে শ্লীলতার ব্যাঘাত হয় না। কাম ক্রোধ প্রভৃতি যে ছয় রিপু আমাদের অন্তরে আছে,

সেগুলি ভগবৎপ্রদত্ত। সুতরাং ইহা স্থির যে, সেগুলির যে প্রকার ব্যবহার করিলে আমরা উন্নতি ও মঙ্গলের পথে চলিতে পারি, সেই প্রকার ব্যবহারের জন্যই ভগবান আমাদিগকে সেগুলি দিয়াছেন। কিন্তু অসংযত ব্যবহারের জন্য যে সেগুলি আমাদিগকে দেওয়া হয় নাই, তাহার সর্ব্বপ্রধান ও প্রত্যক্ষতম প্রমাণ হইতেছে যে, ঐরূপ ব্যবহারের ফলে আমরা রোগে পড়ি এবং আমাদের মন ভাঙ্গিয়া যায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ ও মাৎসর্য্য, এই ছয়টী প্রবৃত্তি ; অর্থাৎ ইহাদের অতিরিক্ত অনুশীলন আমাদের বড়ই অনিষ্টের কারণ হয় বলিয়া ইহাদিগকে রিপু বা শত্রু বলা হয়। কিন্তু সাধারণত কাম ব্যতীত অন্য রিপুগুলি আমাদের তত অনিষ্ট করে না, যত করে কাম-রিপু। এই রিপুগুলি সংযত ব্যবহারে বন্ধুর কার্য্য করে। কোন ব্যক্তি অন্যায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছে, তাহার উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাহাকে ঐ অন্যায় কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিলাম, ইহাতে ক্রোধ, আমার এবং সেই অন্যায়প্রবৃত্ত ব্যক্তি, উভয়েরই বন্ধুর কার্য্য করিল। যদি তাহাকে নিবৃত্ত করিতে গিয়া আমি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া সেই ব্যক্তিকে প্রহারে জর্জরিত করিতাম, তবে সে ক্রোধ আমার এবং সেই ব্যক্তির উভয়েরই শত্রুর কার্য্য করিত। এমনও দেখা যায়, শোনা যায় যে, ক্রোধোন্মত্ত হইবার ফলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহা খুব সাধারণ নহে। কাম ব্যতীত সাধারণত অন্য রিপুগুলি সহজে চিরকালের জন্য মানুষকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলে না। কিন্তু কামরিপু মানুষকে সহজেই পাগল করিয়া দেয় এবং অনেক স্থলেই চিরকালের জন্য অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। কামরিপুর সদ্ব্যবহারে উহা মানবের বন্ধু। কামভাবের সংযত ব্যবহারের ফলে সংসার সুচারুরূপে পরিচালিত হয়, সুসন্তান লাভ হয়। আর উহার অসংযত ব্যবহারের ফলে পরস্ত্রী প্রভৃতি সংসর্গ করিলে ভীষণ হইতে ভীষণতর রোগে পড়িতে হয় এবং দেহ-মন চিরকালের জন্য অকর্ম্মণ্য হয় ও জীবন দুর্বিবহ হয়। এই কারণে কামুক ব্যক্তিদিগের প্রকারান্তরে মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর কুকীর্ত্তি ঘোষিত হয়। এই কারণেই, সকল দেশের ও সকল জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রেই অন্যান্য রিপু অপেক্ষা কামরিপুরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ঘোষণা করা আছে।

বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশে দুর্নীতিপ্রসারের দুইটী প্রধান কারণ ও উপায় হইতেছে বারাঙ্গনা-পরিপুষ্ট অভিনয়শালা এবং বায়স্কোপ। আমি বারাঙ্গনাদিগকে ঘৃণা করিতে বলি না ; কোনও পাপীকেই ঘৃণা করিবার অধিকার আমার নাই, তাহা আমি বেশ জানি। আমি বেশ জানি যে, আমিও চোরের বা ডাকাতের অবস্থায় পড়িলে খুব সম্ভবতঃ চোর বা ডাকাত হইতাম। কিন্তু তাই বলিয়া চৌর্য্যবৃত্তি বা ডাকাতিকে যে ঘৃণা করিব না অথবা আপনাকে চোর ও ডাকাত হওয়া হইতে রক্ষা করিবার জন্য চোরডাকাতের সঙ্গে যে মিশিব না, কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই কথা কহিবেন না। কাদা ঘাঁটিলে সহস্র চেষ্টা করিলেও গায়ে কাদা কিছু-না-কিছু লাগা বন্ধ হইতে পারে না। সেইরূপ বারাঙ্গনা-পুষ্ট অভিনয়শালায় গেলে যত বড়ই সাধু হৌন না কেন, তাঁহার মনে যে এতটুকু দাগ লাগিবে না অর্থাৎ কামুকতা উদ্রিক্ত হইবে না, ইহা শপথ করিয়া বলিলেও আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই আজ প্রায় দশকুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ধনীদিগের মধ্যে ঐ প্রকার অভিনয় এবং বাইনাচ দেওয়া একটা রেওয়াজ বা প্রথা ছিল। সুখের বিষয়, বাইনাচ প্রথাটা কিয়ৎপরিমাণে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু অভিনয় দেওয়া প্রথা বজায় আছে। আমি ছাত্রাবস্থায় আত্মীয়ের বাটীতে দুইএকবার নিমন্ত্রণে গিয়া অভিনয় ও বাইনাচ উভয়ই দেখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। নিমন্ত্রণ-সভায় দশবারো বৎসরের বালকবালিকাদের মুখে যে সকল মন্তব্য শুনিয়াছিলাম, আজও তাহা স্মরণ করিলে নিজেরই প্রাণে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। যে সকল বালকবালিকা তাহাদের বাল্যাবস্থাতেই কুভাবের হাওয়ার মধ্যে গড়িয়া উঠে, তাহাদের নিকট উত্তরকালে চরিত্রের দৃঢ়তা প্রত্যাশা করা বৃথা।

আমি আমার শিশু ছেলেমেয়েদিগকে একবার বায়স্কোপে লইয়া গিয়াছিলাম। প্রথমে একটী ভাল বিষয় দেখান হইল, কিন্তু তাহার পর এমন অশ্লীল চিত্র দেখান হইয়াছিল যে, কোন ভদ্র ব্যক্তি তাহা দেখিতে পারেন কি না সন্দেহ করি—আমি অবশ্য ছেলেমেয়েদিগকে লইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সন্তানদিগকে যদি প্রকৃতই মঙ্গলের পথে, সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে পরিচালিত করা পিতামাতার অভিপ্রেত হয়, তবে তাঁহাদের সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে, দূরে থাকিলে পত্র-ব্যবহারের ভিতর সর্ব্বদা স্নেহপূর্ণ উপদেশ দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা স্বভাবতই অভিনয় ও বায়স্কোপ দেখিতে নিবৃত্ত থাকে। সংবাদপত্রে অনেকেই হয় তো দেখিয়াছেন যে, বাপমায়ের অনেক বুকচেরা ধন আদালতে স্বীকার করিয়াছে যে, তাহারা বায়স্কোপ দেখিয়াই দুষ্কার্য্য করিতে শিখিয়াছে। আমি এমন বলি না যে, বায়স্কোপ দেখিবে না। আমার মনে হয়, ছেলেদের এমন শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য যে তাহারা পিতামাতার বা অভিভাবকের

অনুমতি লইয়া যদি কোন ভাল বিষয় দেখানো হয় তবে তাহা দেখিতে যাইবে। হোষ্টেলে বা বোর্ডিংয়ে বালক-বালিকাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া পিতামাতার নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। আমি প্রত্যক্ষ জানি যে, হোষ্টেলে থাকিয়াই পিতামাতার দৃষ্টি রাখার অভাবে অনেক ছেলে বিগড়াইয়া গিয়াছে। আমি ইহাও দেখিয়াছি যে, নিষেধ থাকিলেও কোন বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী কয়েকজন মিলিয়া এক থিয়েটারে স্কুলের গাড়ী লইয়া চলিয়া গেলেন। আমি কাহারও কুৎসা করিবার জন্য এ সকল কথা বলিতেছি না। আজকাল শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদিগকে অনেক স্থলেই বোর্ডিং বা হোষ্টেলে না দিয়া উপায় থাকে না। আমার উদ্দেশ্য, পিতামাতার চক্ষু খুলিয়া দেওয়া, যাহাতে তাঁহারা বুঝিতে পারেন, কি ভাবে তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। হোষ্টেল ও বোর্ডিংয়ে যাঁহারা বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা আরও যে সকল কথা শুনিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে আমাদের অবসরও নাই, আর প্রবৃত্তিও নাই। আমাদের দেশে সংবাদপত্রমাত্রেরই সম্পাদক দেশহিতৈষীর সাজে সর্ব্বদাই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জন এই দুর্নীতিপ্রসারের বিষয় আলোচনা করিয়া অন্তরের সহিত ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে অগ্রসর হন? একদিকে এক কলম ডুকলম ভরিয়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুনীতিসমর্থক প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, অপর দিকে থিয়েটার প্রভৃতির প্রশংসাসূচক প্যারাগ্রাফের পর প্যারাগ্রাফ বাহির হইতেছে। পাঠক-পাঠিকা তো ভাবিয়া হতভম্ব—কঃ পন্থাঃ—দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন অথবা থিয়েটার প্রভৃতি দেখিয়া এক ঢিলে দুই পাখী মারিবেন—সংবাদপত্র সম্পাদকের প্রশংসা সমর্থন করিবেন এবং আমোদও উপভোগ করিবেন? বলা বাহুল্য, তাহারা শেষোক্ত পন্থাই অবলম্বনীয় বলিয়া স্থির করেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া নিজেদের অধঃপতনের পথও নিজে কাটিয়া প্রশস্ত করেন।

বর্ত্তমানে এদেশে দুর্নীতিপ্রসারের একটী নিগূঢ়, আমার মনে হয় মূল কারণ বা rootcause, আমাদের দাস-মনোভাব। পরাধীনতার অঞ্চল ধরিয়া বহুযুগাবধি মানুষ হইবার কারণে দাসভাব আমাদের মনোবৃত্তিসমূহকে এমন অধিকার করিয়া বসিয়াছে যে, আমাদের মনিবেরা যদি জল উচ্চ বলিলেন, তবে আমরা তাহাকে উচ্চতর না বলিয়া ক্ষান্ত হইব না। আজ ইংরাজজাতি আমাদের মনিব হইয়াছেন, কাজেই তাঁহাদের কথায় "ditto কাটিতেছি" বা সায় দিতেছি; ফরাসি-জাতি বা অন্য কোন জাতি যদি আমাদের মনিব হইত, তবে তাহাদেরই কথায় সায় দিতাম নিঃসন্দেহ। আমাদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দাসমনোভাবের কারণে বিলাত হইতে কাপড়-চোপড়ের মত, অন্যান্য জিনিসপত্রের মত, ধর্ম্ম বা সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে যে রকম ফ্যাষণের ঢেউ এদেশের উপকূলে আসিয়া লাগিতেছে, আমরা অমনি তাহা প্রাণে বরণ করিয়া লইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করি না। রুষিয়াতে, তুরস্কদেশে প্রচলিত ধর্ম্ম উঠাইয়া দেওয়া হইল; বিলাতের এক সম্প্রদায়, যাহাঁদের ঢাকঢোলের বেশী জোর আছে, তাঁহারা যেই বলিতে লাগিলেন যে ধর্ম্মকে দেশ হইতে বিদূরিত করিয়া চরম উন্নতিতে উঠিতেছি, অমনি দেশবাসীরা আর বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক মনে করিলেন না যে, প্রচলিত যে উপধর্ম্ম দেশকে অবনতির পথে লইয়া চলিতেছিল, সেই উপধর্ম্মই ঐ সকল দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, কিন্তু মানবের অন্তর্নিহিত সত্যধর্ম্ম নির্ব্বাসিত হয় নাই কারণ তাহা অসম্ভব; এবং দেশবাসীরা এই ধর্ম্মপ্রাণ ভারতভূমি হইতে মানবজীবনের সকল বিভাগই ধর্ম্মশূন্য আকারে গড়িয়া তুলিবার জন্য হৈচৈ লাগাইলেন। বিলাতের অনেকে বলেন যে, রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক রাখার দরকার নাই; অমনি এখানেও আমরা উহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে লাগিলাম যে, ঠিক কথা, রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে ধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই—রাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য রাজ্যলাভ বা দেশকে স্বাধীনতা দেওয়া এবং তাহার জন্য সুনীতি বা দুর্নীতি, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম যাহাই কেন অবলম্বন কর না, তাহাতে কোনই দোষ নাই, স্বার্থসিদ্ধি হইলেই হইল—The end justifies the means। আমরা দেখি না যে, অন্য দেশের কথা বলিতে চাহি না, অন্ততঃ ভারত সম্বন্ধে বলিব যে, ধর্ম্মকে ছাড়িলে স্বাধীনতা বা স্বরাজ কিছুতেই লাভ হইতে পারে না। যদি বা বিপ্লবের ফলে আজ স্বাধীনতার ছায়া লাভ হয়, কাল তাহা সমূলে মুছিয়া যাইবে।

অল্প কিছুকাল হইল, বিলাত হইতে এইরূপ একটা ফ্যাষণের হাওয়া আসিয়া এদেশে লাগিয়াছে, আর আমরাও তাহার অনুকূলে তালি দিতে শিখিয়াছি। সেটা হইতেছে psycho-analysis বা মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ। আমরা অনেকেই অবশ্য রুষীয় বা ফরাশি বা অন্য কোন ভাষায় ইবসেন, মেটারলিঙ্ক বা জোলার পুস্তক পড়ি নাই; ঐ সকলের ইংরাজী অনুবাদ পড়ি এবং ইংরাজী কাগজে প্রকাশিত ঐ সকল পুস্তকের সমালোচনা পড়ি না, গলাধঃকরণ করি। তর্কস্থলে আমরা বড়ই জোরের সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠি—বলেন কি মহাশয়, ইবসেন ইহা সমর্থন করেন, জোলা তাঁহার অমুক গ্রন্থে ঐ কথা বলিয়াছেন এবং মেটারলিঙ্ক তাঁহার Noble Prizeওয়ালা অমুক বইয়ে এইভাবে লিখিয়াছেন, সুতরাং এভাব যা

ঐ ভাব আপনি কিছুতেই অন্যায় বলিতে পারেন না, আর বলিলেই বা শুনিবে কে? এই প্রকার তর্কের জোরের জন্য আমাদের মত ভালমানুষের অনেক সময়ে নীরব থাকিতে হয়, মৌনী হইয়া ভগবানের নিকট দয়া ভিক্ষা করিয়া নিরস্ত থাকিতে হয়। এই মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের অর্থ আর কিছুই নয়—কেবল কামুকতা বা ছাগবৃত্তি সমর্থন করা। কৈ,ইহার ভিত্তির উপর তো অনেক গ্রন্থ বাংলায় বাহির হইয়াছে; কিন্তু অন্যান্য রিপুগণ এই বিশ্লেষণের সাহায্যে বিশেষভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে, তাহা দেখিয়াছি বলিয়া তো মনে হয় না। কেবল কামুকতাকেই বিশ্লেষণ করিয়া মনের আস্তাকুঁড় হইতে যে সকল দুর্গন্ধ দ্রব্য পাওয়া যায়, অধিকাংশ গ্রন্থেই তাহাই দেখান হইয়াছে। কামুকতার কারণে কুশিক্ষিত লোকের মনে অন্যায় ও অন্যায়তম এবং নিজের সর্ব্বনাশকর অনেক ভাব জাগিয়া উঠে। কিন্তু সেই সকল যে অমনি প্রকাশ করিয়া অপর পাঁচজনের অন্তরে কামুকতা উদ্রিক্ত করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যাইবে, সে অধিকার তাঁহাদের আছে বলিয়া কিছুতেই আমরা মনে করিতে পারি না। অসুস্থ ব্যক্তি অনেক সময়ে উদ্গার করে, কিন্তু আমরা তো কিছুতেই মনে করিতে পারি না যে, সেই উদ্গারের চিত্র অঙ্কিত করিয়া সাধারণের অন্তরে বীভৎস রসের সঞ্চার করা কোন চিত্রশিল্পীর পক্ষে সঙ্গত হইবে। ইহা আমরা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না যে, যাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থে এই কামুকতার চিত্র উজ্জ্বল আকারে প্রকাশ করেন, তাঁহারা বাহিরে না হউক, অন্তরে সেই সমস্ত ভাবের সঙ্গে একযোগে যুক্ত হন; তাঁহারা প্রকাশ্যে কামুকের কাজ নাই করুন, অন্তরে কামুকের কাজ নিশ্চয়ই করেন এবং কামুকতা নিশ্চয়ই উপভোগ করেন। সেদিন এক মাসিক-পত্রে প্রকাশিত একটী গল্পের এক সমালোচনায় দেখিলাম যে, মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের দোহাই দিয়া সেই গল্পের অন্যতর নায়ক নানা যুক্তিতর্কের দ্বারা তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে কুপথে চলিবার জন্য উৎসাহ দিতেছে। ইহা অপেক্ষা পশুত্ব আর কত নীচে নামিতে পারে জানিনা। তেমন লেখককে ধিক এবং তেমন মাসিক-সম্পাদককে ধিক, যিনি উহা প্রকাশ করেন। আজকাল যুবকযুবতী বালকবালিকা পাঠকপাঠিকার মনোবৃত্তি কিরূপ বিকৃত হইয়াছে, ঐ প্রকার মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি, উহাদের সম্পাদক ও লেখকগণ বলিতে গেলে বেচারী পাঠকপাঠিকার মনোবৃত্তি বিকৃত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন—তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিই। সম্প্রতি কোন সুপ্রসিদ্ধ বহুবিক্রীত মাসিকপত্রে একটী অতি অশ্লীল উপন্যাস ধারাবাহিকরূপে কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই কয়েক সংখ্যা নাকি একখানিও বাকী পড়িয়া থাকে নাই; উপরন্তু সেই কয়েক সংখ্যার জন্য এত দরখাস্ত বা demand পড়িয়াছিল যে, সেই পত্রের মালিক ঐ কয়েক সংখ্যা পুনঃপ্রকাশ বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন! একটী হাসির গল্প বলি—আমি একটা উপন্যাস লিখিয়া কোন সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্র সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পেশ করিলাম। তিনি সমস্ত দেখিয়া মন্তব্যসহকারে তাহা ফেরত দিলেন যে, গল্পটী অতি সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহা বর্ত্তমান মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের যুগে নিতান্তই অচল—কারণ ইহা বঙ্কিমী ধরণের হইয়াছে। আমি তো যতই ভাবি, ততই দুঃখে বেদনায় আমার বুক ভাঙ্গিয়া যায়, না ভাঙ্গিলেও পাথর মারিয়া আমার বুক আমার হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে ইচ্ছা হয়, যেন দেশবাসীর এ অধঃপতন আমাকে না দেখিতে হয়। হে ভগবান! শোন, আমার কাতর প্রাণের এই ব্যথার গান শোন, এই প্রার্থনা শোন—তোমার এই সোনার দেশ, তোমার এই সোনার সংসারকে রক্ষা কর, দুর্নীতিতে ভাসিয়া যাইতে দিও না। দুর্নীতির বন্যায় বুঝি বা তোমার এই পুণ্যভূমি, তোমার এই যজ্ঞভূমি ভারতবর্ষ ভাসিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। প্রভু—প্রভু! তুমি রুদ্রমূর্ত্তিতে একবার নামিয়া এসো—আমি দুই বাহু বাড়াইয়া তোমার চরণ ধরিয়া তোমাকে আবাহন করিতেছি—এসো, তুমি রুদ্রমূর্ত্তিতে এদেশে অবতীর্ণ হইয়া সকল দুর্নীতি, সকল পাপ দগ্ধ করিয়া দাও; ভারতবর্ষ আবার পুণ্যময় ভাস্বর মূর্ত্তিতে জগতের সম্মুখে আবির্ভূত হউক এবং তোমার জয়গানে মুখরিত হইয়া উঠুক।

হে বন্ধুগণ! আমার অন্তরের এই কাতর প্রার্থনা বিফল হয় নাই এবং অধিকতর সাফল্য অচিরে লাভ করিবে, ইহাতে তোমরা নিঃসংশয় হইও। আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঘটনাচক্রে আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ রায় বাহাদুর মহাশয়ের আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু বিষয়ে গুরুভার গ্রন্থ "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা"য় একটী ভূমিকা লিখিয়া দিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু স্থানাভাবে আমার প্রাণের অনেক কথা অনেক ব্যথা ইচ্ছা সত্ত্বেও উহাতে প্রকাশ করিতে পারি নাই। অবশেষে আমার "আর্ট ও সাহিত্য" গ্রন্থে আমার অনেক বক্তব্য খুলিয়া বলিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিলাম। ভাল করিয়া কাঁদিতে পারিলে প্রাণের ব্যথা অনেকটা হালকা হইয়া যায়। ঐ গ্রন্থ লিখিয়াও আমার প্রাণ প্রকৃতই অনেকটা লঘুভার হইয়াছিল। ঐ ভূমিকা লেখা বা ঐ গ্রন্থরচনা আমার কল্পনার সুদূর সীমার মধ্যেও ছিল না। আমি ঠিক জানি, যন্ত্রী ভগবান আমাকে তাঁহার হাতের যন্ত্র

করিয়া ঐ দুইটী লিখাইয়াছিলেন। সুতরাং উহার জন্য নিন্দা বা প্রশংসা সকলই তাঁহারই প্রাপ্য—উহার এক বিন্দুও আমার প্রাপ্য নহে। এই সূত্রে আমার আশাতীত ব্যক্তিগত লাভ হইয়াছে—সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল মহাশয়কে প্রকৃত বন্ধুরূপে লাভ। ঐ দুইটী অর্থাৎ ভূমিকা ও গ্রন্থ লেখানো যে ভগবানের ইচ্ছা, তাহার প্রমাণ এই যে, উহার ফলে দেশের অশ্লীলতার হাওয়া অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে—এখন অল্পবিস্তর অশ্লীলতাবিরোধী সুনীতিবায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমার মত একজন নগণ্য ব্যক্তির সমালোচনার ফলে দুই তিন স্থানে অনেক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের বিশেষভাবে কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল। যেদিন শুনিলাম যে, অশ্লীলতাপূর্ণ গ্রন্থসকল নাকি বালকবালিকা যুবকযুবতী পাঠকপাঠিকাদিগের জন্য লিখিত হয় না, কিন্তু প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদিগেরই জন্য লিখিত হয় বলিয়া কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছিল, সেইদিনই বুঝিলাম যে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে চলিয়াছে—তদা আশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়—দেশের হাওয়া এবার ফিরিবে। যেদিন শুনিলাম, কোন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক কৈফিয়ৎ স্বরূপে অশ্লীলভাষায় ইঙ্গিত করিলেন যে, যেহেতু গ্রন্থকারমাত্রেরই গ্রন্থে অশ্লীলতা আছে (?), অতএব অমুক গ্রন্থকারের অমুক গ্রন্থে অশ্লীলতা থাকা দোষাবহ নহে, সেইদিনই বুঝিলাম যে, ভগবান অশ্লীলতাকে নিজের আগুনে নিজেকে দগ্ধ করাইবার জন্য নামিয়া আসিয়াছেন; বুঝিলাম যে, দেশের হাওয়া বদলাইবার সূত্রপাত হইয়াছে—তদা আশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।

THE

BRAHMA SAMAJ

OR

HINDU THEISTIC CHURCH : ITS RISE AND PROGRESS.

[*G. S. Leonard—Late Assistant Secretary to the Asiatic Society of Bengal.*]

—•—

CHAPTER I.

The foundation of the Brahma Samaj by Raja Rammohan Roy.

(3)

29. His study of English, Greek and Hebrew languages.

It was in the twentieth year of his age, 1794, that he is said to have begun the study of the English language, though Kishory Chand states it to have been in his 22nd year. The *Itivritta*, or Bengali history of the *Samáj*, as written by the followers of Keshub Chunder Sen, and the *Tattwabodhiní Patriká*, agree in stating that it was his having made the acquaintance of some English people, that led him to the study of that language. It was certainly not acquired in his native village. He must have had, therefore, to take up his residence in Calcutta to prosecute his English studies. Kishory Chand says he made no marked progress in English for the next six years, but the *Itivritta* represents him as having successfully prosecuted his English studies though begun so late. The view however taken by Kishory Chand, appears to be the more correct one, as it is stated on good authority that Ram Mohun Roy all along had recourse to the Rev. Mr. Adam and Mr. Gordon, his friends, for the correction of his English writings. It was during his controversy with the Serampore Missionaries, occasioned by his celebrated work published in English, Sanskrit and Bengali, called "The Precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness," alluded to further on in this book, that he learnt Greek and Hebrew, the better to understand the original Bible. We have been informed that he learnt Hebrew in six months from a Jew, * This rapid progress in Hebrew was owing to his previous acquaintance with Arabic, Hebrew and Arabic being in fact kindred languages.

30. His entery into service.

We see now that the whole course of Ram Mohun Roy's education occupied a period of some 25 years, until he betook himself to business in 1803. According to the *Patriká* and Miss Collet, Ram Mohun entered employment during his father's lifetime, by whom he was again discarded on account of his continual controversies with Brahmans, and his interference with

* Rajnarain Bose informs us that this fact had been communicated to him by his father Nandakishore Bose, one of Ram Mohun Roy's earliest disciples.

their custom of burning widows, &c, Kishory Chand, however, dates his entry into employment after his father Ramkant Roy's death in 1803.

31. True Philanthropist.

The preceding portion of this article, treating of the youth and studies of Ram Mohun Roy, may perhaps be considered extraneous to an account of the *Samàj* and may well have been omitted, but a short account of the training Ram Mohun Roy underwent appeared to be necessary to show in what way it led to the great reform which he afterwards accomplished. It will serve, moreover, to show that his ambition for literary fame, although great, was not a merely ostentatious one, his great energies having been directed to the reformation of his country's religion, the improvement of the intellectual condition of his countrymen, and the promotion of whatever was conducive to their temporal interests, and the well being of society. Like a true philanthropist, he applied himself to all measures of public utility, and specially to the improvement of the laws and regulations of his country, upon which the weal or woe of a hundred millions of his fellow subjects depended.

32. His study of law and appointment as sheristadar under Mr. John Digby.

Actuated by these benevolent intentions, he employed himself with assiduity to master the regulations of the British Government as they were from time to time passed, since the administration of Lord Cornwallis in 1793. A knowledge of the judicial and revenue laws of the Government, added to his various other accomplishments, admirably fitted Ram Mohun Roy for any office under Government. His acquaintance with civilians procured him the post of *dewàn* or sherishtadar, (the highest office which a native could then aspire to), in the collectorate at Rungpore, under Mr. John Digby, under a written order or agreement signed by the latter that "Ram Mohun Roy should not be kept standing in his presence, or receive orders as a common amla from the huzoor,"

33. Mr. Digby's esteem for Ram Mohan Roy and the latter's opinion on Napoleon I.

The proverbial unhealthiness of Rungpore was no drawback to his enterprising spirit. In spite of the enervating effects of the climate he performed the various functions of his post with such energy and vigilance that it is said the more Mr. Digby knew him, the more he appreciated him. The esteem which they entertained for each other ripened into a warm friendship which was only terminated by death. They cultivated Oriental and English studies in conjunction, mutually aiding each other. Mr. Digby, many years after while in England, thus bears his testimony to the aquirements and opinions of his quondam *dewàn*. "By perusing all my correspondence with diligence and attention as well as by corresponding and conversing with European gentlemen, he acquired so correct a knowledge of the English language, as to be enabled to write and speak with considerable accuracy. He was also in the constant habit of reading the English newspapers, of which the continental politics chiefly interested him, and from thence he formed a high opinion of the talents and prowess of the Ruler of France, and was so dazzled with the splendour of his achievements, as to become sceptical as to the commission, if not blind to the atrocity of his crimes, and could not help deeply lamenting his downfall notwithstanding the profound respect he ever professed for the English nation ; but when the transports of his first sorrow had subsided, he considered that part of his political conduct, which led to his abdication, to have been so weak and so madly ambitious that he declared his future detestation of Bonaparte would be proportionate to his former admiration of him."

34. The reason of his taking service—practical knowledge of administration.

We read of Ram Mohun Roy's alternate residence in the Zillahs of Rungpore, Bhagulpore, and Ramgurh, until the year 1814, as *dewàn* or head officer to the collectors and judges of these districts, from which he was afterwards known by the

title of *dewánji*, until he obtained that of Ràjà on his embassy to England for the ex-emperor of Delhi. The main object of his taking service was not so much for the support of his family, which his brother then in possession of his ancestral properties could well afford to do, as it was to acquire a thorough practical knowledge of the working of the British administration, as well as to amass a sufficient sum to enable him to be independent. This he succeeded in doing, for he is said, "by serving in this line to have acquired as much money as enabled him to become a Zamindar with an income of Rs. 10,000 (£1,000) a year."

35. No reason to doubt his moral integrity.

His rapid accession to fortune has given rise to the following remarks by Kishory Chand, in which he questions the moral integrity of Ram Mohun Roy, "Whether the apostle of Hindu reform, like the high priest of inductive philosophy, sold justice, is a question, which, however interesting, we are not competent to decide. The evidence on the subject is too inconclusive to enable us to arrive at a decision." The writer of the above, if he had endeavoured, could very well have arrived at the discovery of the truth, that it was rather Ram Mohun Roy's integrity and industry, of which proof has already been deduced, and his protection of the rights of the people, rather than the prostitution of the powers with which he was entrusted, which led to his prosperity. If Kishory Chand had possessed any knowledge of the duties of a *dewán* in those early days, and the legal perquisites appertaining to the office recognized by Government, he would no more be entitled to wonder at Ram Mohun Roy's gains, than he would have occasion to be surprised at the immense profits realized by early traders to India in comparison with the profits of the merchants of the present day. It is no great achievement to amass by frugality and thrift a lakh of rupees after 10 years' service, the value of a dependant taluk of Rs. 10,000 per annum, when others have been known by a service of less than half or a quarter of that time, to have made a provision of ten times that amount.

36. His Help to Mr. Digby in the survey of Rungpore after the establishment of the permanent settlement.

The permanent settlement of zamindaries under Lord Cornwallis in 1793, and its ratification by the Court of Derectors some three years after, required a general survey and assessment of all lands in Bengal under European collectors, some of whom were empowered with the settlement of several districts at once. Mr. Digby had the charge of settling the districts of Rungpore, Dinajpore and Purnea, a work which kept him employed for three years, and in the execution of which he gained a lasting renown in the memory of the people for justice and probity, a result which he mainly due to the exertions of his *dewán*. It may be remarked here that, had Mr. Digby's *dewán* been so corrupt as he is suspected to have been, Mr. Digby himself would never have obtained renown for justic and probity. Ram Mohun Roy's proficiency in zemindary accounts and land surveying enabled him to make correct estimates, of the lands and their revenues ; and his acquaintance with all the cunning and dishonest devices of the amins and amlahs in furnishing false accounts and statements, proved useful in guarding his master against all errors and mistakes. This, together with the practical reforms he suggested regarding the ascertaining of rightful ownerships and descriptions of lands, &c., so endeared him to his master, that he ever after accompanied him wherever in his official capacity he was transferred, and also secured him the esteem and regard of the landed proprietors, who did not fail to testify their gratitude to him when he parted from them.

37. His study of Jaina religion and the begining of religion discussions.

Even at this early age, and when most of his time was employed in the public service, he used to convene nightly assemblies for the purpose of discussing religious subjects, exposing the inconsistencies of the Sastras, and the absurdities of idolatry. Many of the Marwari merchants of the

place were members of his club. He had to learn on their account, the Kalpa Sutra and other books appertaining to the Jain religion. He met. however, with much opposition from a counter-party headed by Gauri Kanta Bhattacharya, a learned Persian and Sanskrit scholar, who challenged him in a Bengali book entitled the "Gyàu Chandrikà." This man was *dewàn* to the Judge's Court at Rungpore, and his influence enabled him to gather a large body of men about him whom he hounded on to Ram Mohun Roy, but without any success.

38. His return to Calcutta in 1814 and residence at Maniktala.

After his service of 10 years he returned to Calcutta in 1814 (Saka 1736,) aged 40, and took up his residence in the suburbs of Calcutta in a garden house at Manicktolah, which he furnished in the English style. Thus we see at the age of 40 he carried into effect his long cherished plan of retiring from business and devoting the remaining portion of his life to the promotion of the great work.—his country's regeneration.

We shall now proceed to notice the labours of Ram Mohun Roy, commencing with his fortieth year in 1814 till the fifty-fourth year of his age, 1828, when his efforts were crowned with the success they merited in the final establishment of the *Samàj* in 1829 (Saka 1750,)

39. An Account of his Activities leading him to take up the role of a Religions Reformer.

Before, however, proceeding to state the different methods he employed to effect his purpose, let us trace the gradual steps by which Ram Mohun Roy came to renounce the Hindu religion, and acquire the religious knowledge which enabled him to perform successfully the role of a religious reformer. Descended from a line of rich and respectable Brahman zamindars, Ram Mohun was initiated in every religious ceremony of his order, and derived all the advantages which a liberal education could bestow. He acquired, on the one hand, a knowledge of the Hindu sastras, the Mahàbhàrat, the Ramayan, the Puranas and the Tantras, and on the other hand become conversant with Persian prose works and poems, while under his father's roof, at the age of fifteen. But while it might be supposed the Hindu sastras were confirming his belief in the Hindu religion, his Persian studies were undermining his faith in that religion, and leading him to a belief in the unity of God. Being placed in a dilemma by these contradictory systems of religion, he applied himself diligently to the investigation of such an important question untill his inquirries were crowned with success. He is related, like Solomon of old, to have wished for true knowledge and wisdom in preference to wealth and worldly power. For the attainment of this object, he made twenty-two *purascharanas*, or austere devotions, which cost him many thousands of rupees; and although he was not so fortunate in the fulfilment of his desires as Solomon, yet still he could not complain of the mental and physical powers he had been endowed with. It will no doubt be a matter of wonder in every judging mind to behold a Brahman boy, born and bred up amidst the prejudices and superstitions of an idolatrous family, leading a monotonous village life, unacquainted with different races and creeds of a city, coming, without assistance, to a knowledge of the "unity of Divine Nature," and boldly avowing his convictions of the fallacy of the popular religion of his country before he had attained his sixteenth year. Here it may naturally be asked, how our young reformer could have come to a knowledge of the unity of the Deity, and His spiritual nature, brought up as he had been from his infancy to reverence a multiplicity of gods, and to worship their graven images. This was done, says an anonymous writer, * by a sublimizing process applied by his powers of abstraction and analysis to the Christian and Hindu systems. He brought them into approximation, regarding with a philosophical eye as mere human corruptions, the additions to the sublime and simple truth above stated (i.e., the unity and spiritual nature of God), which both contain in its concrete form.

* Vide Asiatic Journal, Vol. 18, p. 199.

This will be clearly perceived when one analyzes the attributes of different gods and goddesses, which contain in the abstract the nature and spiritual essence of the Most High, which have been falsely applied to concrete forms by ignorance and craft. All objects of worship, no matter by whom worshipped, are invested with attributes of the divine ; divest them of these, and they will be found of themselves to be nothing. Ram Mohun Roy, when a boy found all the divinities of his country dignified with the appellation of Brahma ; he discarded them all, and knew only the great Brahma to be the sole object of worship. Hitherto, the worshippers of the Hindu gods had believed in the concrete images as sober realities, and had fought with each other for the supremacy of their favorite divinities, untill the abstract views of Ram Mohun Roy showed them to be nothing, and proved the qualities with which they were said to be endowed to belong to the selfsame Brahma, who is equally entitled to the adoration of all. It was thus by this method of abstraction that Ram Mohan Roy strove, not only to abolish the gross idolatry of his country but to unite all sects and creeds under one universal faith of the supreme and adorable Brahma, who is to be worshipped in spirit and in the human heart.

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পত্র।

(কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি-এ)

"বিদ্যাদর্শন"-নামক একখানি দুষ্প্রাপ্য বাঙ্গালা মাসিক-পত্র সম্প্রতি আমার হস্তগত হইয়াছে। ইহার কভারিং ও টাইটেল-পেজ না থাকায় সম্পাদকের নাম জানিতে পারা যায় না। ১৭৬৪ শকাব্দে আষাঢ়-মাস (১৮৪২ খৃষ্টাব্দে জুন-মাস) হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। ৬ সংখ্যা মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার মাসিক মূল্য ১৲ টাকা ও বাৎসরিক মূল্য ৮৲ টাকা। স্থানে স্থানে ইহার "বিজ্ঞাপন" দেখিয়া বোধ হইল, "সংবাদ-প্রভাকর"-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত এই "বিদ্যাদর্শন"-সম্পাদকের সবিশেষ সদ্ভাব ছিল, কারণ "বিদ্যাদর্শন"-পত্রের গ্রাহকগণের প্রদত্ত টাকা গুপ্ত মহাশয়ের নিকটে জমা হইত। (১)

এ পর্য্যন্ত যে সকল বাঙ্গালী বিলাত-যাত্রা করিয়াছেন, রাজা রামমোহন রায় তাঁহাদিগের মধ্যে প্রথম, এবং প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর দ্বিতীয়। দ্বারকানাথ দুইবার বিলাতে গিয়াছিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে, ৯ জানুয়ারি, রবিবার (১২৪৮ বঙ্গাব্দে, ২৭ পৌষ) দিবসে তিনি প্রথমবার বিলাত-যাত্রা করেন। যাইবার সময়ে এক এক স্থান হইতে তিনি ইংরাজীতে ৯ খানি পত্র লিখিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন, উক্ত মাসিক-পত্রের সম্পাদক মহাশয় তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া স্বীয় পত্রে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই পত্রগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল। পত্রগুলিতে অনেক কৌতূহল-জনক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের ৮৮ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার গঠন ও অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা পত্রগুলি পাঠ করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। ইংরাজী হইতে অনূদিত পত্রগুলি নিম্নভাগে অবিকল উদ্ধৃত হইল।—লেখক।

প্রথম পত্র।

দিগেল অন্তরীপ (২) ইং ১৮৪২ সাল ১৯ জানুয়ারী—

আমরা অদ্য প্রাতঃকালে এইস্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছি, এবং যথাসাধ্য এতৎ সুন্দর উপদ্বীপের কিয়দংশ দৃষ্টিকরণের জন্য পদব্রজে গমন করিতে অভিলাষ করিয়াছি ; সুতরাং এস্থল হইতে শীঘ্র গমনাবশ্যক হওয়াতে আমার এই পত্র অতি সঙ্ক্ষেপে লিখিত হইল। মান্দ্রাজ পরিত্যাগাবধি বায়ুর অবস্থা একরূপই আছে, এবং সামুদ্রিক পীড়া এপর্য্যন্ত আমাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই, ইহাতে বোধ করি, যে আমি ঐ রোগ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। গত দিবস বেলা দশ ঘণ্টার সময়ে আমরা লঙ্কা সন্দর্শন পূর্ব্বক তীরের সন্নিহিত হইয়া গমন করিতে

(১) "বিদ্যাদর্শন"-পত্রের প্রকৃত সম্পাদক কে, তাহা লইয়া বিষম গোলমাল আছে। রেভারেণ্ড লং-সাহেবের "বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা" দেখিয়া জানিতে পারা যায় যে, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে "বিদ্যাদর্শন"-নামক দুইখানি মাসিক পত্র বাহির হইয়াছিল। একখানির সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়কুমার দত্ত, এবং অন্যখানির সম্পাদক প্রসন্নকুমার ঘোষ। প্রথমখানিতে সাহিত্য ও নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয়খানিতে নীতিতত্ত্ব, ইতিহাস ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিত হইত। প্রথমখানি কয়েক বৎসর ও দ্বিতীয়খানি ৬ মাস মাত্র চলিয়াছিল। আমি যে "বিদ্যাদর্শন"-খানি পাইয়াছি তাহা ৬ মাস মাত্র চলিয়াছিল। ইহাতে মনে হয় যে, প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশয় ইহার সম্পাদক। আবার মনে হয়, অক্ষয়কুমার দত্তের "বিদ্যাদর্শনেই" প্রিন্স্ দ্বারকানাথের পত্রগুলির স্থানলাভ করা সম্পূর্ণ সম্ভবপর। ইহার মীমাংসা করা কঠিন। পাঠক মহাশয়দিগেরই উপর মীমাংসার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম।—লেখক।

(২) বোধ হয়, ইহা বর্ত্তমান সিলোনের অন্তর্গত Point de Galle নামক অন্তরীপ।—লেখক।

দেখিলাম যে জলের ধার অত্যন্ত নিবিড় নারিকেল-বনে আবৃত রহিয়াছে, এবং নানাপ্রকার পর্ব্বত-কন্দরাদি বৃক্ষসমূহেতে আচ্ছন্ন হইয়াছে—এরূপ মনোহর দৃষ্টি আমি এপর্য্যন্ত সম্ভোগ করি নাই—কে না কহিবেন যে পুস্তক পাঠ দ্বারা তাঁহার প্রত্যেক দেশের জ্ঞানোপার্জ্জন করা কদাপি সম্পূর্ণ ফলদায়ক হইবে না, যেহেতু এই মনোরম্য উপদ্বীপ দর্শন করিয়া আমি যেরূপ আনন্দানুভব করিয়াছি, তাহা পঞ্চশত গ্রন্থের উৎকৃষ্ট বর্ণনা পঠনদ্বারাও কদাপি লব্ধ হইত না। দৃষ্টিরূপ পুস্তকের ন্যায় অন্য কোন প্রকার বর্ণনা বস্তুর যথার্থ ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। আমি এইক্ষণে নিশ্চয় জানিলাম যে রামায়ণে স্বর্ণময় লঙ্কার উল্লেখ তাহা অপ্রকৃত নহে; যদিও তত্রস্থ মৃত্তিকা বস্তুতঃ স্বর্ণ নয়, কিন্তু পৃথিবী এস্থানে এ প্রকার প্রচুররূপে ফলবতী হইয়াছেন যে ইহার প্রত্যেক বিঘা ভূমির সহিত এক এক ক্ষুদ্র স্বর্ণখনির তুলনা হয়।

দ্বিতীয় পত্র।

সাগরস্থিত ইণ্ডিয়া নামক জাহাজ, ইং ১৮৪২ সাল ২৭ জানুয়ারী—

আমি পূর্ব্বপত্রে আমার ক্রমশঃ ভ্রমণের বিবরণ লিখিতে যে স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা আরম্ভ করিলাম, এবং এডেন নগরে উত্তীর্ণ হইবার মধ্যেই তাহা সমাপ্ত করিব; যে হেতু যে বাষ্পীয় জাহাজ বোম্বাই রাজধানী আগমন করিতেছে, উক্ত নগরে তাহার উদ্দেশ হইতে পারিবে। পূর্ব্ব লেখনে আমি জ্ঞাপন করিয়াছিলাম যে বর্ত্তমান মাসের অষ্টাদশ দিবসে বেলা ১০ ঘণ্টার সময়ে লঙ্কার তট আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, এবং বহুবিধ পর্ব্বত-কন্দরাদি এবং তৎ আবরণ স্বরূপ নারিকেলবন এবং অপরাপর বৃক্ষ—যাহা জলের ধার পর্য্যন্ত জন্মিয়াছে, অন্তঃকরণকে অত্যন্ত আহ্লাদিত করিয়াছিল। পরদিন বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে দিগেল অন্তরীপে নজর হইল। আদিমস্ পিক নামে এক পর্ব্বত আমরা অবলোকন করিলাম, যাহা (সকলে কহেন) সমুদ্রের উপর প্রায় ৬৬৬৬ হস্ত উচ্চ। এরূপ জনশ্রুতি আছে, যে এই পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি ২০ ফিট অর্থাৎ ১৩ হস্ত দীর্ঘ আদমের এক পদচিহ্ন আছে, কিন্তু হিন্দু ইতিহাস অনুসারে আমি অনুমান করি, যে মহাবীর হনুমান লঙ্কায় আগমন কালীন প্রথমে এই পর্ব্বতের উপরে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

সমুদ্রের সম্মুখবর্ত্তী এক পর্ব্বতোপরে তত্রস্থ দুর্গের অগ্রভাগ নির্ম্মিত আছে, এবং নগরের মধ্যে ক্ষুদ্র গিরি সকল অধিকদূর পর্য্যন্ত মগ্ন থাকাতে সুন্দর কোল (?) হইয়াছে। ঐ সকল পর্ব্বতের উপরে যে সকল দুর্জ্জয় তরঙ্গ প্রক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহার প্রতি অতিশয় শঙ্কার সহিত অবলোকন করিতে হয়। বৃহৎ বৃহৎ প্রবল জাহাজ ঐ সমস্ত স্ফুটিত তরঙ্গের মধ্যে পতিত হইলে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, কিন্তু কোলে (?) প্রবেশের জন্য এক উত্তম পরিষ্কৃত পথ রহিয়াছে। নজর করণান্তর দেখিলাম যে নানা ফল এবং উপদ্বীপের উৎপন্ন অন্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ নৌকাসকল আসিয়া আমাদিগকে বেষ্টন করিলেক। নৌকার আকৃতি এক প্রকার অসাধারণ, অতএব তাহার বর্ণনা লিখিতে অশক্ত হইতেছি।

প্রথমতঃ, আমি এক মনোহর ঘাট সন্দর্শন করিলাম, যাহা কলিকাতার ঘাট অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। পথসকলও অতি পরিচ্ছন্ন। বাস্তগৃহ এক তালা এবং যদ্যপি উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত নহে, কিন্তু অতিশয় পরিষ্কৃত এবং সুন্দর। দুর্গের দ্বারোপরে "১৬৬৮ সাল" এই তারিখ লিখিত আছে, কিন্তু দুর্গ এ প্রকার উত্তম দেখিলাম, বোধ হয় সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। সমস্ত নগর দুর্গপ্রাচীরে বেষ্টিত আছে, শকটাদি গমনাগমনের এক পথ ভেল হইতে কোয়ম্বো অবধি প্রায় ৩৫৷৷০ ক্রোশ ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এবং তাহার মধ্যে নারিকেল-বৃক্ষশ্রেণী অতি নিবিড়রূপে উন্নত হইয়াছে। বঙ্গদেশে যে সমস্ত ফল জন্মে, এস্থানেও প্রায় তাহাই উৎপন্ন হয়, বিশেষতঃ আম্র অতি বাহুল্যরূপে জন্মিয়া থাকে; কিন্তু তাহা পক্ব হইবার এক মাস মাস বিলম্ব প্রযুক্ত আমরা কেবল অপক্ব ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। কদলী, আনারস এবং কণ্টকি ফল অতি উৎকৃষ্ট স্বভাবে জন্মে। আমি এ স্থানে প্রথম বার "ব্রেড্ ফ্রুট-ট্রী" অর্থাৎ পিষ্টক-ফলের বৃক্ষ সন্দর্শন করিলাম, কিন্তু অকাল প্রযুক্ত তাহার ফল প্রাপ্ত হইলাম না। বঙ্গদেশস্থ এবং অত্রস্থ পুষ্প একরূপই, কিন্তু এস্থলে তাহাদিগের বর্ণের চাকচিক্য এরূপ উৎকৃষ্টতর যে আমি তাহা বর্ণনা করিতে পারি না, বিশেষতঃ জবাপুষ্প অতিশয় উজ্জ্বল; কোলের (?) অন্তর্ভাগে বাজার অতি সুনিয়মে স্থাপিত রহিয়াছে।

কতিপয় মুসলমান এবং কাথালিক-ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্য ব্যতিরেকে লঙ্কাবাসী সাধারণ লোক বৌদ্ধধর্ম্ম পালন করে। এস্থানে কিয়ৎসংখ্যক ওলন্দাজেরও বসতি আছে। বালক এবং বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য দুই পাঠশালা স্থাপিত আছে এবং তাহাদিগের সহায়ার্থে আমারদিগের মধ্যে অনেকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্বাক্ষর করিয়াছেন। এদেশস্থ লোক সামান্যতঃ সুশ্রী, কর্ম্মঠ, পরিষ্কৃত এবং মলয়দেশীয় মনুষ্যের তুল্য মুখশ্রীবিশিষ্ট; গার্হস্থ্য (পুরুষ) ভৃত্যগণ ইংরাজ-রমণীদিগের ন্যায় পশ্চাৎকেশে কচ্ছপের

অস্থিনির্ম্মিত চিরুণী ধারণ করে। এই বৃষ্টি আমাকে যেরূপ পরিতোষ প্রদান করিয়াছে তাহা লেখনেও বর্ণনা করিতে অশক্ত হইলাম।

ভৃতীয় পত্র।

কেরো নগর, ১৯ ফেব্রুয়ারী ইং ১৮৪২—

আমরা বর্ত্তমান মাসের একাদশ দিবসে প্রাতঃকালে সুয়েজ উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম, কিন্তু তৎস্থানে সামগ্রীপত্র বন্ধন-প্রেরণাদি কার্য্যে ব্যস্ত প্রযুক্ত লেখন পাঠাইতে পারি নাই। আমরা পরদিবসে সুয়েজ পরিত্যাগানন্তর আরব-অশ্বযুক্ত শকটারোহণ পূর্ব্বক প্রায় বিংশতি ক্রোশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম, কিন্তু ক্লান্তি বোধ হওয়াতে অনন্তর প্রত্যেক দুইদিন দশ ২ ক্রোশ ক্রমে গমন করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে অরণ্যভ্রমণের যে শঙ্কা ছিল তাহার বিপরীত ঘটনা হইল, যে হেতু তন্মধ্যে কোন ব্যতিক্রম বা কঠিনতা অনুভব করি নাই।

আমরা প্রতিদিন খাদ্য-ভোজনের পরে পদব্রজে গমন এবং অশ্বারোহণ করি, তাহাতে যে সকল আশ্চর্য্য বিষয় সন্দর্শন করিয়াছি, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। বাজার, নগর, দেবালয়, প্রাসাদ, উপবন, মন্দির প্রভৃতি শত শত দ্রব্যের চিন্তায় অন্তঃকরণ বিস্ময়াপন্ন আছে। যখন আমি সুপ্রাতে পাশার উদ্যান ও তন্মধ্যস্থ অট্টালিকা, পথ, কমলা-বন, পুষ্প, উৎস অর্থাৎ উবুই এবং সমুদয়ের সমগ্র শোভা ও গৌরব দেখিলাম তখন আমি আরবিয়ান নাইট নামক গ্রন্থে যেরূপ কেরো নগরের সৌন্দর্য্য পাঠ করিয়াছিলাম, তাহা বাস্তবিক জ্ঞান হইল। আমি নানা বিষয় সন্দর্শনে অত্যন্ত ব্যস্ত প্রযুক্ত এইক্ষণে ইহার কিঞ্চিন্মাত্র লেখিতে অবসর প্রাপ্ত হইলাম না। মাল্তায় যথেষ্ট অবকাশ হইবেক, অতএব তৎস্থান হইতে যথাসাধ্য লিখিয়া প্রেরণ করিব।

চতুর্থ পত্র।

আলেগ্জান্দ্রিয়া, ২৮ ফেব্রুয়ারী ইং ১৮৪২—

এস্থলের হোটেল অতি সন্তোষজনক, এবং ইউরোপের রীতিক্রমে প্রস্তুত হইয়াছে, কেবল ঘরের মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে না। নগরের যে অংশে ইউরোপীয় লোকের বসতি, সে স্থানে অতি সুন্দর তেতালা অট্টালিকার সহিত শোভিত, এবং কেরো নগরের অপ্রশস্ত পথের তুল্য পরিষ্কৃত আছে, তদ্দেশীয় লোকের বাসস্থানও প্রায় তদ্রূপ।

আমি সম্প্রতি পাশার প্রাসাদ দর্শন করিয়া আসিয়াছি। এই ভবন কেবল নদীর ধারে স্থাপিত আছে, এবং উত্তর পার্শ্বে সমুদ্র দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে। করাশীয় লোক ইহার এরূপ সুন্দর রচনা করিয়াছে, যে আমি কেরো নগরে যাহা দর্শন করিয়াছি, তৎসমুদয় অপেক্ষা ইহাকে উৎকৃষ্টতর বোধ হইল। আমার ইচ্ছা হয় যে এই গৃহ তাঁহার অধিকার হইতে আমার উদ্যানে সঞ্চালিত হয়।

ইহার নিকটস্থ এক মনোরম্য স্নানাগার সমুদ্রতীরে বিরাজমান আছে। যে গৃহ ঐ স্নানাগারকে ধারণ করে, তাহা সাগর মধ্যে ৬০ ফিট পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট আছে, এবং তিন দিক হইতে জল আসিয়া তত্রস্থ এক পাত্রে পতিত হয়। ঐ পাত্রের দীর্ঘ-প্রস্থ পরিমাণে ৪০ ফিট, এবং তাহার গভীরতা ৪ ফিট। আমি যত গমন করি, ততই আশ্চর্য্য এবং মনোহর দ্রব্য নয়নদ্বারে উপস্থিত হয়, এবং প্রত্যেক নূতন বস্তুসমুদয় পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুকে আচ্ছন্ন করে।

পঞ্চম পত্র।

মাল্তা, ১৯ মার্চ্চ ইং ১৮৪২—

কেরো এবং আলেকজান্দ্রিয়া যথাসাধ্য সন্দর্শন করিয়া অনন্তর মাল্তায় উপস্থিত হইয়াছি। আমরা অতি সুখদায়ক স্থানে অবস্থিতি করিয়াছি; আমারদিগের সম্মুখস্থ নগরসমুদয়, এবং ভ্রমণের উপযুক্ত একস্থান অতি সৌন্দর্য্যের সহিত দৃশ্য হয়। আমারদিগের ভবন অতি সুসজ্জীভূত, ও দিবারাত্রি অগ্নিবিশিষ্ট থাকে এবং স্বগৃহের তুল্য পরিতোষজনক হয়। গত দুই মাস জলে স্থলে ভ্রমণান্তর কিয়ৎকাল বিরাম করিতেছি, তাহাতে চিন্তা করি না, যেহেতু এইক্ষণে আমি পূর্ব্বলেখ্য পত্র-সকল লিখিতে পারিব, এবং ভবিষ্যতে দৃশ্য দেশসমুদয়ের বৃত্তান্ত পাঠ করিব।

এস্থানের যে পর্য্যন্ত দেখিয়াছি, তাহাতে ইহাকে প্রায় অগম্য বোধ হয়, নগর অতি পরিষ্কৃত পর্ব্বতোপরি স্থাপিত এবং চতুর্দ্দিকে সুদীর্ঘ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত আছে। অত্রস্থ কোল (?) শিল্পকৃত জ্ঞান হয়, এবং খালের ন্যায় এই উপদ্বীপের নানা অংশে প্রবিষ্ট আছে। আমরা এইক্ষণে ইউরোপের বাতস্বভাব অনুভব করিতেছি, দিবারাত্রি সমান হইলেও বায়ুর পরিবর্ত্তন হইতেছে। দিনের মধ্যে দুই ঘণ্টা প্রায় সমান থাকে না। সকলে কহে যে এতৎ অপেক্ষা অধিকতর শীতল দেশে গমন করিতে হইবেক না, ইহা যদি যথার্থ হয়, তবে কলিকাতার লোক আমাকে শীতের ভয় প্রদান করিত, তাহা দূরীভূত হইল। আমরা ৯ ঘণ্টার সময়ে খাদ্য ভোজন করি, পরে কিয়ৎকাল ভ্রমণ ও রৌদ্র-সেবন করি। ১২ ঘণ্টার সময়ে কিঞ্চিৎ আরাম করি, পুনর্ব্বার ইতস্ততঃ গমন করি, দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার সময়ে দ্বিতীয় ভোজন করি, এবং দুর্গোপরি অধিকক্ষণ ভ্রমণ করিয়া গৃহে গমনপূর্ব্বক চা-পান করি। দিবসের অবশিষ্ট সময় লেখন-পঠনে ব্যয় হয়। আমরা সন্ধ্যাকালে প্রায় ১২ জন একত্র হইয়া গান-বাদ্যের আলোচনা পূর্ব্বক

অতি আহ্লাদে কাল ক্ষেপণ করি। এইরূপে যাত্রী ভয়ের কাল যাহা শঙ্কার সহিত চিন্তা করিতাম, অতি সুরম্যরূপে যাপন হইতেছে। আমরা আগামী মাসের প্রথম দিবসে এ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া নেপ্‌লস্‌ নগরে গমন করিব; তৎস্থানে কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিয়া রুম, ফ্লোরেন্স, বিনিস, কোলইস্‌ প্রভৃতি স্থানে একাদিক্রমে উপস্থিত হইব; অনন্তর ডোবর ও লণ্ডন নগর সন্দর্শন করিব।*

উৎসবানন্দ-রামমোহন রায়-সংবাদ।

(২)

(ডাঃ ভি. রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

৺শ্রীরামঃ।

বহ্ন্যাদিভূতগুণরূপবিবর্জ্জিতোঽসৌ দিক্কালব্যোম-নিখিলং পরিপশ্যতীহ। যঃ সর্ব্বদা শুক-সনাতনবিজ্ঞগীত-শুশ্রূষাশ্রয়মিহ ভবেৎ কুতঃ এব ভীতঃ॥ বিষ্ণুরিব স্বরূপ-তশ্চোপাধিতো বান্যোঽস্তীতি শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যত্বেন মন্বা-নানাং বিদুষাং বচনৈঃ সংজাতদুঃখহর্ষাঃ কেনচিৎ কথঞ্চিৎ নিবেদ্যন্তে। নহি কেঽপি বৈষ্ণবাঃ সচ্চিৎসুখানন্তবিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত-দেহেন্দ্রিয়প্রাণা ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কদাচিদপি নির্গুণত্বং প্রতিপাদয়ন্তি, প্রত্যুত নিখিলসদ্‌গুণ-রত্নরত্নাকরত্বেনৈব তমুপদিশন্তি; এতৎপ্রমাণান্যপি কেষাঞ্চিৎ সুকৃতানামেব কর্ণকুহরগোচরাণি স্যুঃ। যে কেচিৎ ক্ষীরোদকশায়ি-ভগবদুপাসকা বৈষ্ণবাস্তেঽপি গুণাবতার-ত্বেনৈব প্রখ্যাতগুণস্য বিষ্ণোর্ন নির্গুণত্বং প্রতিপাদয়ন্তি। সত্ত্বগুণোপাধিবৈশিষ্ট্যং সর্ব্বত্রাদূষণম্‌, অতএব বৈকুণ্ঠনাথো-পাসকা অন্যেঽপি ইলাবৃতাদিনববর্ষেষ্বহিতভবানীনাথাদ্যু-পাসিতচরণসংকর্ষণাদিরূপোপাসকাশ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানাং ত্রয়াণামপি সৃষ্ট্যাদ্যর্থপ্রগৃহীতবিগ্রহাণাং গুণাবতারত্বেনৈব চৈকাত্ম্যং ন কদাচিৎ স্বরূপতো ভেদতা। অপি চ। অপি যশ্চাণ্ডালঃ শিব ইতি বাচং বদেৎ, তেন সহ সংবসেৎ তেন সহ সংবদেৎ তেন সহ ভুঞ্জীতেতি। অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্‌ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভিঃ শিববিষ্ণুনাম্নামপি পরমপাবনত্ব-কথনেন স্কান্দপাদ্মাদৌ, নামমহিম্ন্যর্থবাদ-মাত্রমিতি মন্য-মানানাং নারকিত্ব-স্মরণেন চ, নামনামিনোরভেদত্ব-নির্ণয়াদপ্রাকৃতত্বপ্রতিপাদনেন চ তয়োর্নামভিরেব সর্বেষাং প্রাপ্তসর্ব্বাভীষ্টত্বং চ স্যাৎ। ইত্যেব আনন্ত এব বিষ্ণুশিবয়োঃ পৃথগীশ্বরদৃশো মূঢ়জনান্‌ নামাপরাধি-ত্বেন নারকানেব কথয়ন্তি; তথাহি শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং ধিয়াঽভিন্নং পঠেৎ স খলু হরিনাম্না-হিতকর ইত্যাদি সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ। হরেরপ্যপরাধান্‌ যঃ কুর্য্যাদ্বিপদপাংসনঃ। নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ। নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো-হ্যপরাধাৎ পতত্যধ ইত্যাদি; অতএব তয়োর্ভেদমননে কেষাঞ্চিদপি ন শ্রেয়ঃ। এতদর্থকাঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়ো বহ্ব্যঃ সন্তি সুকৃতিভির্জনৈঃ শ্রুতা এব। অতো হরিহরোপাসকৈঃ সহ ন কেচন বিবদন্তে, তেষাং মতন্তু সর্ব্বসজ্জনমনোরঞ্জন-মিতি। অথ ত্রয়াণামেকাত্মত্বেঽপি কেচিদ্ভাগবতাভিজ্ঞা বিষ্ণূপাসকাঃ সত্ত্বতনোর্বাসুদেবাৎ নৃণাং শ্রেয়াংসি স্যুরিতি ভগবৎস্বামিপাদা ভাবার্থদীপিকাদৃষ্ট্যা চৈবং প্রতিপাদয়ন্তি। তথাহি গুণত্রয়ে তমস্তু ভূতোপাদানত্বাদাধিভৌতিকং, রজ-শ্চেন্দ্রিয়বর্গ-কারণত্বয়াঽধ্যাত্মিকং, সত্ত্বন্তু দেবস্রষ্টৃত্বাদাধি-দৈবিকং নিয়ন্তৃ; তদুপহিতো বিষ্ণুরেবেশঃ। ন চ তদুপহিতত্বে স্বরূপে কাচিৎ ক্ষতিস্তমস এবাবরকত্বং, রজস এবান্যথা-ভানহেতুত্বং; সত্ত্বস্য তু নাবরকত্বং নান্যথাপ্রত্যায়কত্বং কিন্তু যথাবাঞ্ছিতস্বরূপস্ফুরণপক্ষপাতিত্বমেবাতঃ সচ্চিদানন্দা-নন্তবিগ্রহো বাসুদেবাখ্যো বিষ্ণুরেবেশঃ। অতএব বৃদ্ধৈঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্য-পূজ্যপাদৈরীশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগদিত্যত্রানুপপদেশ-শব্দস্য সঙ্কোচমনভিপ্রেত্য নিরতিশয়ত্বেন সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বমধ্যবস্যেশ-পদব্যাখ্যানে পরমে-শ্বরঃ পরমাত্মেতি-শব্দাভ্যাং বিষ্ণুরেব সম্মতঃ, নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম আত্মা নারায়ণঃ পর ইতি শ্রুতেঃ। কঃ প্রজাপতি-রিত্যুক্ত ঈশোঽহং সর্ব্বদেহিনাম্‌ আবাং তবাঙ্গসংভূতৌ তস্মাৎ কেশবনামবানিতি শিববচনাচ্চ তস্যৈব পরমেশ্বরত্ব-পরমাত্মত্বনির্ণয়াৎ স এবাবাস্যম্‌ আবসিতুং যোগ্যং স্থানমাধারঃ সত্তাস্ফূর্ত্তিপ্রদো যস্য তদিদং পরিদৃশ্যমানং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ কিঞ্চিৎ জগত্যাং জগৎ তস্যৈবাবাস্য-মাবসিতুং যোগ্যং ব্যাপ্যমিতি বা স্বপ্নদৃগনুগততদাধারক-স্বপ্নপ্রপঞ্চবৎ। অত্র জগতীশব্দো ভূমিবাচকঃ সমস্তভূত-ভৌতিকপ্রপঞ্চোপলক্ষণঃ, জগচ্ছব্দস্তু গচ্ছতীতি জগদিতি ব্যুৎপত্ত্যা প্রবৃত্তাত্মকেন্দ্রিয়াদ্যাধ্যাত্মিকোপলক্ষণস্তয়োরুচি-তমেব স্বনিয়ন্ত্রীশানুগতত্বম্‌। অনেনেশ-শব্দেনাধিদৈবিক-ত্বদ্যোতকেন তদাবাস্য-কথনেন চ বসন্ত্যস্মিন্‌ ভূতানীতি বাসু ইতি ব্যুৎপত্ত্যা সর্ব্বস্য বাসুদেবনিয়ম্যত্বং তদধিষ্ঠানক-ত্বং চ ধ্বনিতম্‌। ন চ প্রপঞ্চস্য বাসুদেবাধিষ্ঠানকত্বে প্রপঞ্চে তদ্বিগ্রহপ্রতীত্যপেক্ষা শুক্তীদমংশস্য রৌপ্য-ভানেঽপি নীলপৃষ্ঠাদেরভানবৎ, তদুক্তং ব্যাপক-বিগ্রহা-ব্যক্তত্বং ভগবতা ময়া ততমিদং কৃৎস্নং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্যেতি চ। কেচিত্তু ত্রয়াণামেকাত্ম-ত্বেঽপি অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতা-র্হণাম্ভঃ সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কো নামলোকে ভগবৎপদার্থ ইত্যাদি শ্লোকবিচারেণ যয়োঃ সৈবকত্বমেক-স্যৈব সেব্যত্বং ব্যাহরন্তি ন তু তেঽপি তয়োরীশ্বরত্বং

---

* প্রবর্ত্তক জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৭ সাল।

প্রতিপাদয়ন্তি। যৎ ব্রহ্মণো জীবত্বং সম্ভাবয়ন্তি কদাচিৎ তৎখলু কচন করে কশ্চিৎ প্রকৃষ্টজীব উপাসনয়া ব্রহ্মত্বং প্রাপ্নোতি তদভিপ্রায়েণেতি সর্ব্বমনবদ্যং। ইদানীমিদানীন্তনো যঃ কশ্চিৎ শৈবোঽদ্বৈতে পরমানন্দতত্ত্বে শিবস্বরূপে সমবধারিতমনা অপি যৎ শ্রীকৃষ্ণস্য নির্গুণত্বং শ্রুত্বা চুকোপ তদনতিশোভনম্, অনুশীলিতাঽদ্বৈততত্ত্বানাং তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতাম্ ইত্যাদি শ্রুত্যা কোপাদিবিষয়ানিরূপণাৎ। স চ কৈবল্যাদ্যুপনিষদো ন দৃষ্টা ইতিহাসপুরাণাদীনি চ নাবলোকিতানীতি যদাক্ষিপতি তদপি বৈষ্ণবাণাং নাত্যননুকূলং বহুগ্রন্থকলাভ্যাসবর্জ্জনস্য ভক্ত্যঙ্গতয়া বিহিতত্বাৎ গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্বহূনিতি স্মৃতেঃ বহুগ্রন্থকথাকন্থারোমন্থেন বৃথৈব, কিম্ অন্বেষ্টব্যং প্রযত্নেন তত্ত্বজ্ঞৈর্জ্যোতিরান্তরমিত্যাদিভ্যশ্চ। এবং শিবস্যানীশ্বরত্বং কৈরপি বৈষ্ণবৈর্ন প্রতিপাদিতং। বস্তুতস্তু ত্বম্পদার্থস্যাপি সগুণত্বং ন ঘটতে কিমুত তৎপদার্থলক্ষ্যীভূত-সদানন্দঘনরূপস্য শিবস্যেতি। যত্তু কোপাবেশেন ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদীনাং শ্রীশিবাদভিব্যক্তিরুক্তা তদপি তেষাং ন বিরোধায় ভবতি, গর্ভোদকশায়িনো মহাবিষ্ণোরেব শিবত্বাৎ মৎস্যাদ্যবতারিত্বাচ্চ। অথ শ্রীকৃষ্ণস্য শিবভক্তত্বপ্রতিপাদকোঽয়ং শৈবঃ কেন চ পৌরাণিক-বৈষ্ণবেণ পৃচ্ছ্যতে কিং নিত্যধামস্থিতো নিত্যলীলোঽখিল-সৌভগবান্ ভগবান্ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহো যোগেশ্বরেশ্বরঃ কদাচিৎ শিবমপূজয়ৎ বৈবস্বতমন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশতি-চতুর্যুগীয়-দ্বাপরে স্বয়মবতীর্য্য বা। নাদ্যস্তস্য স্বধামবিহারান্যতমকর্ম্মানুপযোগাৎ ন হি কয়াপি শ্রুত্যা স্মৃত্যা বা স্বমহিম্যভিরতস্য তস্যান্যারাধকত্বং দর্শিতং। তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি, ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে, বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ, পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদোঽস্যামৃতং দিবি, ইত্যাদি-শ্রুতিভিঃ তস্যৈবাস্বতন্ত্রপরমেশ্বরত্বকথনাৎ। দ্বিতীয়ে ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাম্ ইত্যুক্তদিশা লোকসংগ্রহার্থ-নানাকর্ম্মকরণপূর্ব্বক-দুষ্টবিনাশেন সাধুসংরক্ষণেন চ ধর্ম্মস্থাপনার্থং স্বয়মবতরতি; অতএব ব্যাস-নারদ-যুধিষ্ঠিরাদীনামপি চরণবন্দন-পূজাদিকং করোতি, তেন লোকবত্তু লীলাকৈবল্যাদিন্যায়াৎ ন পরমেশ্বরত্বহানির্নাপি তদ্ভক্তত্বঞ্চ যতস্তৈরপি তথাত্বেনৈব সংমানিতোঽভূৎ। কিঞ্চ শ্রীকৃষ্ণস্য ব্যাসাদিভক্তত্বমপ্রসিদ্ধং তেষাঞ্চ তদ্ভক্তত্বং চাতিপ্রসিদ্ধং; তথা শিবস্য গঙ্গাধরত্বেনৈব বিষ্ণুভক্তত্বমীশ্বরত্বঞ্চাভিব্যক্তং, বিষ্ণোস্তু শিবভক্তত্বেঽপি পরমেশ্বরত্বমতো ন কশ্চিদ্ বিবাদাবসরঃ। যো হি হরিহরোপাসকো বিষ্ণুশিবপ্রতিপাদকানি শ্রুতিস্মৃতিবাক্যানি বৈষ্ণবশৈবাভ্যাং পঠিতানি স্তুতিনিন্দাপরাণীতি মত্বা যদ্বিষাদ তত্র সম্যক্ত্বং, [illegible]ষাং বচনানাং নিন্দাপরত্বাভাবাৎ যথাবস্থস্বরূপনির্ণায়কত্বাবগমাৎ স্তুতিপরত্বশ্রবণেন বিষাদস্যানৌচিত্যাচ্চ। স চ স্বয়মপি দ্বয়োরৈকাত্ম্যপ্রতিপাদকানি স্তুতিপরাণি বচনানি পপাঠেতি অলমতিবিস্তরেণ। অথেদানীং লোচনগোচরীকৃত-কেবলপক্ষপাতব্যামোহিতচিত্ত-নামমাত্র-শৈব-বৈষ্ণবাঃ পরদুঃখেন দুঃখিতমানসাঃ কারুণ্যাব্ধয়ো হরিহরোপাসকাদ্যনুগ্রহপরবশা বৈদিকাঃ প্রত্যক্তত্ত্ববিদ আচার্য্যকল্পা একত্বমনুপশ্যন্তো মায়াকার্য্যত্বেনৈবাব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তানাং নামরূপাণাং পরিচ্ছিন্নপদার্থানাং সত্যাশ্রিতত্বেনৈবাধিষ্ঠানসত্তয়া সত্যবত্তাসমানানাং যথোক্তশ্রুত্যা ব্রহ্মত্বং বর্ণয়ন্তো নিত্যবিজ্ঞানানন্দবিগ্রহাধিষ্ঠানকত্বেন দেবাদিস্থাবরপর্য্যন্তবস্তুনঃ সুখানন্তবিগ্রহত্বে চানুৎপন্নবিপ্রতিপত্তয়োঽধিগতানন্দাঃ পরমমঙ্গলায়না যথাসুখং বিজয়ন্তাং, তন্মতং পুনঃ কেষাং বিরক্তচিত্তানাং নানুসন্ধেয়ম্। এতদনুসন্ধানাভাবে রাগদ্বেষাদিক্লেশানপগমাৎ বৈরাগ্যাদীনামপ্যাত্মজ্ঞানান্যতমফলান্তরাভাবাচ্চ যে কেচিৎ কেবল-বিতণ্ডাচ্ছল-নিগ্রহাগ্রহগ্রাহগৃহীতাঃ শুষ্কতার্কিকাস্তৈরপি নৈষা মতিস্তর্কেণাপনেয়া তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিতি শ্রুতিসূত্রে শ্রুত্বা স্বমতপরিহারেণান্যতমমনুসন্ধেয়মেব ন তূপেক্ষণীয়ং। শার্করাক্ষ্যারুণ্যাদীনামুদরদহরোপাসকানাঞ্চোদর্কফলত্বেনৈবাদরণীয়ং, তদুপাসনানাং চিত্তশুদ্ধিসাধনত্বেনাভিহিতত্বাৎ ভগবতোঽখণ্ডানন্দস্বরূপসেবনস্যৈব চিত্তশুদ্ধিফলত্বঞ্চাভিহিতম্; অতস্তস্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি, তমেব বিজানীথ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ, বাচো বিম্রাপনং হি তৎ, তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়, একস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবেৎ, একো দেবঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেত্যাদ-শ্রুত্যর্থদর্শিনামেকাদশীয়ানাং শ্রৌতমার্গাভিনিবেশিতমনসাং মুমুক্ষূণাং তস্মিন্ন বিবাদাবসরপ্রসঙ্গঃ। কেবলং অত্যক্তকাম্য-নিষিদ্ধকর্ম্মাভ্যস্তদুর্ব্বাসনাবাসিতমানসেভ্যঃ শুষ্ককর্ম্মকর্ম্মঠেভ্যো যন্ন রোচতে তেন জগতামনির্ব্বাচ্য-জ্ঞানকারণকত্ববাদিনাং ব্রহ্মবিদাং কাচন ন হানির্যতঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নস্যৈবাধিকারিত্বাৎ; অতোঽন্যে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত-দেবাদিস্থাবরপর্য্যন্ত-বস্তুমাত্রদৃষ্টয়ো ভগবতঃ সুখানন্তবিগ্রহে চিচ্ছক্তিপতৌ বিবদমানা যাবন্তি নামরূপাত্মকানি বস্তূনি সত্যত্বেনৈব পশ্যন্তো বংভ্রম্যমাণাঃ কেবলং ক্লেশভাগিনঃ স্যুস্তৈরলং সম্ভাষণমিতি। যে তু ভগবতো নামরূপগুণলীলাদীনাং চিচ্ছক্তিকার্য্যত্বেন নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো জায়তে, ক্ষণপরিণামিনো ভাবা ঋতে চিচ্ছক্তিং, মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্ত ইত্যাদ্যুক্তিদৃষ্ট্যা পরমসত্যত্বম্ অনুভবন্তো মায়িকপ্রপঞ্চজাতস্য চাধিষ্ঠানসত্তয়া সত্যবৎ প্রতীয়মানত্বেনৈব মিথ্যাত্বং ব্যাহরন্তো বিশিষ্টাদ্বৈতিন ঔপনিষদৈরনুগৃহ্যমাণা ভগবৎসেবানুকূলমানসা জগজ্জীবানুগ্রহপরবশাঃ সমধিগতব্রহ্মবিদ্যা যোগভ্রষ্টকল্পাঃ কৃতার্থা এব। তেষাং সংদর্শনস্পর্শনস্তুত্যভিনন্দনসেবাপরিপ্রশ্নাদিভিরপি মুমুক্ষূণাং অতীব শ্রেয়ো ভবেদিতি। (সাবশেষঃ)

নানাকথা।

আমরা বাঁচি—সেদিন বঙ্গবাসীতে "বিলাতে বর্ণবিদ্বেষ" শিরস্ক একটী সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যাপারটা এই যে, এক ইংরাজরমণী নাচিবার জন্য একটী ঘর ভাড়া লইবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ঘরের মালিকেরা যেই শুনিলেন যে, উক্ত রমণী একজন ভারতীয়ের সহিত নৃত্য করিবেন, অমনি তাঁহারা ঘর ভাড়া দেওয়া বন্ধ করিলেন। বঙ্গবাসী এই উপলক্ষে একটু দুঃখের ক্রন্দন কাঁদিয়াছেন। আমরা তো ইহাতে হরষের হাসি হাসিয়া বলিতে চাই—"আমরা বাঁচি, যদি এই প্রকার বর্ণবিদ্বেষের কারণে দেশের ছেলেদের ইংরাজ-রমণীদের সঙ্গে নৃত্য বন্ধ হইয়া যায়"। মনে পড়ে, এক ধনী ব্যক্তি এই কলিকাতায় Globe Theatreএ ধুতি-চাদর পরিয়া কি এক অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রবেশ নিষিদ্ধ—ঢুকিতে পান নাই। তিনি আবার সেই কথা লইয়া সংবাদপত্রে ventilate করিতে লাগিলেন যে, থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের কি অন্যায়! আমরা সে ক্ষেত্রেও ভাবিয়াছিলাম যে, ঐ প্রকার বালাই দূর হইলে অর্থাৎ দেশীয়দিগকে সর্ব্বতোভাবে থিয়েটারে যাইতে না দিলে আমরা বাঁচি। এক্ষেত্রেও আমরা বলি, বিলাতের কোনও হোটেলে বা কোথাও ভারতীয় কাহাকে নৃত্য করিতে না দিলে আমরা বাঁচি। ভারতীয় কাহারও সহিত কোন ইংরাজ-রমণী নৃত্য না করিলে আমরা বাঁচি—আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটা মহা উদ্বেগের হাত হইতে বাঁচি।

ভবিষ্যৎগণনা—মঁসিয়র ক্লেমাঁসো যখন ভারতে আসেন, সেই সময়ে লর্ড রেডিং তাঁহার নিকট এক ফকিরকে হাজির করেন। ক্লেমাঁসো ফকিরকে জিজ্ঞাসা করেন যে "আর কতদিন বাঁচিব?" তদুত্তরে ফকীর বলেন—"তুমি এখনও যতদিন বাঁচিবে, তদপেক্ষা নয়গুণ বেশী বাঁচিয়াছ।" ক্লেমাঁসো বলিলেন, "তবে আমি ৯০ বৎসরে পদার্পণ করিব না।" এই ভবিষ্যবাণী ঠিক হইয়াছিল। (Illustrated Weekly-quoted in E. B. Times 11-1-30) আমার মত অনেকে দেখিয়াছেন যে, জ্যোতিষীদের কতকগুলি কথা ঠিক হয় এবং কতকগুলি হয় না। এই প্রকার অন্বয় ও ব্যতিরেক স্থল উভয় ধরিয়া জ্যোতিষশাস্ত্রকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বেশ ভাল-রূপ দাঁড় করানো যাইতে পারে। আগে ইহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড়াক, তাহার পর ইহার ফলাফল অর্থাৎ ইহার সাহায্যে অতীত এবং বিশেষত ভবিষ্যৎ বলিতে পারিলে ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তাহা বিবেচনা করা যাইতে পারে। আমাদের বিশ্বাস, অতীত ও ভবিষ্যৎ জানিতে পারিলেও তাহা দ্বারা মূল ধর্ম্মনীতির উপর কোনপ্রকার আঘাত পড়িবে না।

ঘুষের প্রাবল্য—আজকাল ইংরাজেরা দোষ দেন যে, এদেশীয়েরা বড় ঘুষখোর। সেদিন Statesman কাগজে (১৪. ২. ৩০) একজন লিখেছেন যে, হুইটলি সাহেব নাকি তাঁহার মন্তব্যে লিখেছেন যে, 'এদেশীয়-দের ধারণা যে ঘুষ লওয়া বন্ধ হতে পারে না'। তার পর, লেখক একটী scout বালকের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলেছেন যে scout দলে মিশলে ঘুষ উঠে যেতে পারে। ঘুষের স্রোত যে রকম প্রবল হয়ে উঠেছে, তাতে এদেশীয়দের ঐ প্রকার ধারণা হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু এই ধারণা এল কেন—আসবার কারণ কি? যেদেশে পথে বহুমূল্য জিনিস পড়িয়া থাকিলেও কোন পথিক তাহা স্পর্শ করিত না, সেদেশে এ প্রকার ঘুষের ভাব আসে কি করে? আমাদের বিশ্বাস বিদেশীয়দের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং অর্থশোষণ প্রভৃতির কারণেই এইটী এসেছে। মদ্যপান তো এদেশে বিদে-শীয়দের আগমনের পূর্ব্বে ভদ্রলোকদের মধ্যে শুধু প্রচলিত যে ছিল না তা নয়, কিন্তু অত্যন্ত হেয় বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু বিদেশীয়দের আসা অবধিই সুরাপানের ঐ যে বিষপান করবার একটা নেশা এল, আজ পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টাতেও সে নেশা দূর হচ্ছে না। এই প্রকার সুরাপান ও তদনুষঙ্গী দুর্নীতিপোষণের পরি-ণামে যখন দেশবাসীর নৈতিক ভিত্তি শিথিল হয়ে গেল, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শতবিধ উপায়ে দুচক্ষে অর্থশোষণের ফলে ফল্গু নদীর মত অন্তঃসলিল আকারে কিন্তু গভীর-ভাবে দারিদ্র্য দেশের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে দেশকে অন্তঃসার-শূন্য করে ফেলতে লাগল, তখন ঘুষ লওয়ার দিকে ঝোঁক হওয়া তো স্বাভাবিক। ক্রমে দারিদ্র্য যতই বাড়তে থাকবে, ঘুষ লওয়াও ততই স্থায়িত্ব লাভ করবে, ইহা তো খুবই স্বাভাবিক। Scoutগণ নূতন নূতন প্রতিজ্ঞা গ্রহণের ফলে হয় তো ঘুষ লইতে অস্বীকার করবে, কিন্তু দারিদ্র্য দেশবাসীর পৃষ্ঠে যে প্রকার প্রচণ্ড আঘাত করছে, এভাবে আঘাত চলতে থাকলে তাহাদিগকে ঘুষ লওয়ার হাত হইতে রক্ষা করা কঠিন হবে। দেশীয়দের ক্ষুদ্র প্রাণ, তাই তাহারা দু-চার পয়সা দু-চার আনা ঘুষেই খুশী হয়; কিন্তু বিদেশীয়দের তাতে মন উঠে না—তারা চায় মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার। আমরা তো সংবাদপত্রে পড়ি, আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যে ransome প্রভৃতি কতবিধ আকারে ঘুষের রাজ্য চলিয়াছে। এদেশেও কত বড় বড় উচ্চপদস্থ বিদেশীয় কর্ম্মচারী বৃহদাকার ঘুষ লওয়া এবং তাহার কারণে তাহাদের transferএর কথা অথবা শাসনমর্য্যাদা রক্ষার জন্য

অ-transferএর কথাও শোনা যায়। যে সকল ঘটনার কথা লইয়া সংবাদপত্রে খুবই আন্দোলন আলোচনা হইয়া গিয়াছে, সেই সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে; কিন্তু সে সকল ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিয়া আমরা পত্রিকাকে কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না।

আমাদের বক্তব্য—ঘুষ বল বা যে কোন দুর্নীতি বল, তাহা নির্মূল করিতে গেলে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর মূল সংস্কার করিতে হইবে এবং বিদেশীয়দিগের কর্তৃক নির্ম্মম অর্থশোষণ দূর করিতে হইবে। শিক্ষাপ্রণালীর ভিত্তি দাঁড় করাইতে হইবে বিশুদ্ধ অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের উপর। ইহা করিলে সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতিই বিদূরিত করা সহজ হইবে। যিনি যাহাই বলুন না কেন, ইহার বিপরীতে উদ্ধারের আশা নাই। ঐ যে গবর্ণমেণ্ট বলেন, কোন ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না—কথাটা খুবই ঠিক; কিন্তু অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের উপর শিক্ষাপ্রণালীকে দাঁড় করাইলে কোনও ধর্ম্মেই হস্তক্ষেপ করা হইবে না, অথচ দেশবাসীর হৃদয়কে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল বৈপ্লবিক ভাব হইতে ধীর সুবিবেচনার পথে ফিরাইয়া আনা সহজ হইবে, গবর্ণমেণ্টকে এইটুকু সময় থাকিতে বুঝিতে হইবে।

দীর্ঘায়ু নারী—গত ১৯. ২. ৩০. এর Liberty পত্রে দেখি যে, Mrs. Mary Buckland নামে এক ইংরাজ মহিলার বয়স ১১৯ বৎসর হইয়াছে। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। এখনও তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি সতেজ আছে। তিনি বলেন, তাঁহার এই দীর্ঘজীবন লাভের কারণ "Early to bed and early to rise" অর্থাৎ সকাল-সকাল শয়নে গমন ও সকাল-সকাল শয্যাত্যাগ, এই মন্ত্রের কঠোর সাধন। এই মন্ত্রসাধনের ফলেই যদি এতটা দীর্ঘায়ু লাভ হয়, তবে সেই সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যবিধানের অন্যান্য নিয়ম পালন করিলে না জানি আরও কত দীর্ঘজীবন লাভ হইতে পারে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করিতেন বলিয়াই তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার একটী দাঁতও পড়ে নাই। আমাদের দেশে ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম—প্রত্যূষে ব্রহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া স্রোতস্বতীর জলে স্নান করা এবং প্রভাতের "বীর" হাওয়া সেবন করিয়া ভগবানের নাম করা। এই নিয়ম দীর্ঘজীবন ও স্বাস্থ্য লাভের অমূল্য সহায়। ইহার ফলে যে শতাধিক বৎসর সহজে ও সুস্থদেহে বাঁচা যাইতে পারে, তাহাতে বোধ হয় আর সংশয় থাকে না; আর, আমাদের ঋষিদের দুইশত বৎসর জীবনলাভের প্রতি সংশয়ও কমিয়া আসে।

ভৃগুসংহিতা—আমরা বহুকাল যাবৎ ভৃগুসংহিতার কথা শুনিয়া আসিতেছি। আমার এক প্রতিবেশী বন্ধু কাশীতে অবস্থান কালে তথাকার সুপ্রসিদ্ধ ভৃগুসংহিতা আশ্রমে নিজ জীবনের ভবিষ্যৎ গণনা করাইয়াছিলেন। তিনি বলেন, তাঁহার সম্বন্ধে গণনাগুলি আশ্চর্য্যরূপ মিলিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। এক জ্যোতিষীর নিকট আমিও কতকগুলি গণনা করাইয়া আসিয়াছিলাম—তাহার কতকগুলি আশ্চর্য্য মিলিয়া গিয়াছিল, আবার কতকগুলি কিছুমাত্র মিলে নাই। আমার ইহা বলা উদ্দেশ্য যে, ফলিত জ্যোতিষকে নিতান্তই তুচ্ছ করা সঙ্গত নহে, বিজ্ঞানের চক্ষে তাহার পক্ষাপক্ষ ভালরূপ বিচার করা কর্ত্তব্য। গত ১৬ই ফাল্গুনের হিতবাদীতে দেখি যে, কাশীধামের ভৃগুআশ্রমে (১নং অগস্ত্যকুণ্ড) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন ভাদুড়ীর (৮পি, এম, বাকচির দৌহিত্র) নিকট "কতক অংশ" ভৃগুসংহিতা আছে, কিন্তু তাহাই প্রায় ২০০/ দুই শত মণ ওজন হইবে। মীরাটেও নাকি কতক অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মূল্য ২৫৲ টাকা। বম্বে হইতে একখানি বাহির হইয়াছে, তাহা একেবারে অসম্পূর্ণ; আন্দাজ দুইশত খানি হাল পত্রিকা আছে। জয়পুরের মহারাজার লাইব্রেরিতে সম্পূর্ণ অংশ আছে। মহারাজার হুকুম ব্যতীত দেখা যায় না। যদি কেহ বৈজ্ঞানিক ভাব লইয়া এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা করেন, তাহা হইলে ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে যে কুসংস্কার আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই আমরা উপরে দুইচারি কথা বলিলাম। ইহার ফলে যদি আমরা অদৃষ্টবাদের অতিরিক্ত পক্ষপাতী হই, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের কথা হইবে।

সগোত্রে বিবাহ—গত ৩রা চৈত্রের বঙ্গবাসীতে দেখি, "গৌহাটী কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মুকুলময়ীর বিবাহ ২৪শে মাঘ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহের প্রধান উল্লেখযোগ্য কথা সগোত্রে বিবাহ। হেমবাবু এবং বর উভয়েই ঢাকা জেলার অন্তর্গত মহেশ্বরদী পরগণার অধিবাসী। ইঁহাদের মধ্যে সগোত্রে বিবাহ একেবারে অসাধারণ ঘটনা নহে। অনেকে সগোত্রে বিবাহ অশাস্ত্রীয় মনে করেন।" আমরা যতদূর জানি, সারস্বত শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগেরও ভিতর সগোত্রবিবাহ প্রচলিত আছে। Necessity has no law—মত্যকার প্রয়োজন আইনের বাঁধন মানে না। এই যে অনেক স্থলে "ভরার মেয়ে" পার হয়ে যায়, তারও কারণ ঐ প্রয়োজন। কাহারও বিয়ের দরকার হইল, ভরার মেয়ে পাওয়া গেল, তখন মন-ভোলানো কতকগুলো ছুতা করিয়া তাহাকেই বিবাহ করিল। কে খোঁজ করিবে যে, সে

মেয়ে সগোত্র বা অসগোত্র? হিন্দু উচ্চজাতি ও ভদ্রসমাজেও যে সগোত্র বিবাহ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা বোধ হয় অনেকেরই জানা আছে। কোথাও বা অপ্রকাশ্য-ভাবে মন্ত্রাদি পড়াইবার কালে গোত্রাদির অংশটুকু চাপা-চুপি দিয়া অশ্বত্থামা হত ইতি গজ ভাবে মন্ত্র পড়ানো হয়; কোথাও বা প্রকাশ্যভাবে মেয়েকে নামেমাত্র গোত্রান্তরিত করিবার কথা বলা হয়। বিবাহের ঠিক আগেই কন্যাকে নিজের আত্মীয় বা পুরোহিত বা অন্য কোন বন্ধুকে "যেন" দিয়া গোত্রান্তরিত করা হয় এবং পরক্ষণেই তাহার পূর্ব্বগোত্রের সহিত সমগোত্র বরের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। সগোত্র বিবাহের বাধা মানিবার বর্ত্তমানে কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া দেখা যায় না। আমরা যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়াও শাস্ত্রে সগোত্র বিবাহের অবৈধতা কোথাও দেখি নাই। মনুসংহিতার একটী বিধান হইতেছে পরবর্ত্তী কালে ঐ অবৈধতা কল্পনার মূল। কিন্তু তাহাতে আছে—অসগোত্র ও অসপ্রবর কন্যা দ্বিজাতিগণের বিবাহে প্রশস্ত মাত্র। হইতে পারে, সেকালে একগোত্রের পুত্রকন্যা এত কাছাকাছি হইয়া পড়িত যে, অনেক ক্ষেত্রে সগোত্র বিবাহ প্রার্থনীয় বোধ হইত না। কিন্তু যে ক্ষেত্রে সেরূপ কাছাকাছি সম্বন্ধ হইবার সম্ভাবনা হইত না, সেক্ষেত্রে যে উহা নিষিদ্ধ হইত না, মহাভারতাদি আলোচনা করিলে তাহা মনে হয়—বলিতে কি, শতকরা ৯৯ স্থলে বিবাহকাহিনীতে গোত্রের উল্লেখই দৃষ্ট হয় না। কৌলিন্যের অতিমাত্র বাঁধনের প্রবর্ত্তক যেমন বল্লাল সেন, তেমনি অস্তত বঙ্গদেশের আচার-ব্যবহারে অতিমাত্র অযথা বাঁধনের প্রবর্ত্তক হইলেন রঘুনন্দন। দেশের যে সময় আসিয়াছে, তাহাতে যদি আমরা এই ধ্বংসোন্মুখী হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিতে চাই, তবে ঐ সকল অসঙ্গত ও অতিরিক্ত বাঁধন ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে—নচেৎ সম্মুখে জাতির মৃত্যু—নিশ্চিত মৃত্যু—মৃত্যু অনিবার্য্য।

ক্ষয়রোগে স্বর্ণব্যবহার—সেদিন সংবাদপত্রে দেখি যে, হল্যাণ্ডের কোন চিকিৎসক বলেন যে স্বর্ণঘটিত ঔষধের ব্যবহারে ক্ষয়রোগে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। আমাদের আয়ুর্ব্বেদে তো ক্ষয়রোগে স্বর্ণঘটিত বিবিধ ঔষধ ব্যবহারের বিধান আছে। এদেশবাসী সকলের মিলিতভাবে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিলে দেশের পক্ষে মঙ্গল।

বারিপূজা—মুরসিদাবাদ অঞ্চলে অগ্রহায়ণ মাসে শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে 'বারিপূজা' নামে একটী পূজা প্রচলিত আছে। কোন পঞ্জিকাতে উহার উল্লেখ নাই। স্ত্রীলোকেরাই এই পূজা করে। পুরোহিতেরা ইহা ঠিক বলিতে পারেন না। কেহ বলেন—ইহা সূর্য্যপূজা, কেহ বা বলেন—ইহা হরিষষ্ঠী। তদনুযায়ী পূজা হয়। কেহ বা অন্য দেবতার নাম করেন। ইহার প্রকৃত তত্ত্ব কেহ লিখিয়া পাঠাইলে সাদরে পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারি। এই প্রশ্নটী গত ২৬শে পৌষ সংখ্যার হিতবাদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কোন উত্তর প্রকাশিত হইতে দেখি নাই।

নারীধর্ম্ম।

(৺সুখদাসুন্দরী দেবী মজুমদার)

বরকে বাটীতে আহ্বান করিয়া তাহাকে যথাশক্তি অলঙ্কৃতা কন্যা সম্প্রদান করাকে ব্রাহ্মবিবাহ, যজ্ঞস্থ ঋত্বিক্‌কে দক্ষিণাস্বরূপ যথাশক্তি অলঙ্কৃতা কন্যা দান করাকে দৈব, বিবাহ-গোমিথুন গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যাদান করাকে আর্ষ-বিবাহ, "তোমরা দুইজনে একত্র ধর্ম্ম আচরণ কর" এই কথা কন্যা এবং জামাতার প্রতি বলিয়া প্রার্থী বরকে কন্যাপ্রদান করাকে প্রাজাপত্য বিবাহ, পণ-গ্রহণপূর্ব্বক কন্যাদান করাকে আসুর বিবাহ, পরস্পর অনুরাগপ্রযুক্ত শপথপূর্ব্বক পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হওয়াকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ, যুদ্ধে কন্যা অপহরণ পূর্ব্বক বিবাহ করাকে রাক্ষস বিবাহ, এবং ছলনা করিয়া কন্যাহরণপূর্ব্বক উদ্বাহ-সূত্রে বদ্ধ হওয়াকে পৈশাচ বিবাহ বলিয়া বৈদিক ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এই অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম বিধানে বিবাহিতা নারীর গর্ভজাত সন্তান একবিংশতি পুরুষকে পবিত্র করে।

চন্দ্র স্ত্রীলোকদিগকে শৌচ, গন্ধর্ব্ব তাহাদিগকে মধুর-ভাষিতা এবং পাবক তাহাদিগকে সমস্ত বস্তুর অপেক্ষা অধিকতর পবিত্রতা প্রদান করিয়াছেন; অতএব স্ত্রীগণ পবিত্র। যে সংসারে দম্পতির পরস্পর আনুকূল্য থাকে, সেখানে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের নিত্য বৃদ্ধি হয়।

ভূত-যজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ, দেব-যজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, এবং মনুষ্য-যজ্ঞ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ ভারতনারীদের নিত্য কর্ত্তব্য।

স্ত্রীলোকদের প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রা হইতে উঠিয়া শ্বশুর-শ্বশ্রূ, ভর্ত্তা, মাতা-পিতা প্রভৃতি গুরুজনদিগকে প্রত্যক্ষ বা উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করা উচিত। মহিলাদের অত্যুচ্চস্বরে কথা বলা, কটূক্তি করা, অতিরিক্ত কথা বলা, অপ্রিয় বাক্য বলা, অলীক কথা বলা, কাহার সহিত বিবাদ করা, এবং অপরিমিত ব্যয় করা অধর্ম্ম। স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মঅর্থ-বিরোধিনী হইবেন না। পতির ধর্ম্ম-কার্য্যে ও অর্থসাধনে নারীদের আনুকূল্য করা পরম কর্ত্তব্য। অনবধানতা, চিত্তচাঞ্চল্য, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, বঞ্চনা, অভিমানিতা

খলতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা, নাস্তিকতা, অসন্তোষ, এবং কপটতা প্রভৃতি সমস্ত দোষ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করা মহিলাদের পরম কর্ত্তব্য। সর্ব্বদোষ পরিমুক্ত হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুমোদিত সেবাব্রত অবলম্বন-পূর্ব্বক গার্হস্থ্য জীবনযাপন করাই মহিলাদের পরম নৈতিক ধর্ম্ম।

স্নানাবগাহনে শরীর পবিত্র হয়, প্রিয় সত্যভাষণে রসনা বিশুদ্ধ হয়, এবং ধর্ম্মচিন্তায় আত্মা পবিত্র হয়। অতএব প্রত্যহ স্নানাবগাহন করিয়া পবিত্র দেহে রন্ধন করা, সকলকে প্রিয় সত্য-সম্ভাষণে আপ্যায়িত করা, এবং সর্ব্বক্ষণ ধর্ম্মচিন্তা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

অতিথি-অভ্যাগত, শ্বশুর-শ্বশ্রূ, ভাসুর-দেবর, পতি-পুত্র, দাস-দাসী, গৃহপালিত পশু-পক্ষী—পরিবারস্থ সমস্ত পোষ্যবর্গকে যথাশক্তি পরিতৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া নারীদের অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করা উচিত। ভোজনকালে আগত সখী সম্বন্ধী ও বান্ধবদিগকে ভোজন করান কর্ত্তব্য।

পরিবার বলিতে কেবল স্বামী-স্ত্রী নহে—শ্বশুর, ভাসুর, দেবর, দাসদাসী, গৃহপালিত পশুপক্ষী প্রভৃতি সমস্তই পরিবার শব্দের অন্তর্গত। শ্বশুরকে জন্মদাতা পিতার ন্যায়, শ্বশ্রূকে জন্মদাত্রী মাতার ন্যায়, ভাসুরকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায়, ভাসুর-পত্নীকে জ্যেষ্ঠা সহোদরার ন্যায় সর্ব্বক্ষণ ভক্তি করা কর্ত্তব্য; দেবরকে কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায়, দেবর-পত্নীকে কনিষ্ঠা সহোদরার ন্যায় স্নেহ করা উচিত; দাসদাসী, গৃহপালিত পশু-পক্ষী, ভাসুর-পুত্রকন্যা, দেবর-পুত্রকন্যা প্রভৃতিকে নিজের গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় স্নেহ করা এবং সর্ব্বদেবময় অতিথিকে ভক্তি করা নারীদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

সংসারে ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তর সমস্ত কার্য্যই নারীদের স্বহস্তে সম্পাদন করা একান্ত কর্ত্তব্য; দাসদাসীর প্রতি নির্ভর করিয়া জড় পদার্থের মত বসিয়া থাকা অনুচিত। কার্য্য না করিলে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়, শরীরে বিবিধ রোগ প্রবেশ করে, মানসিক ভাব কলুষিত হয়।

পরমেশ্বর আমাদিগকে সমস্ত কর্ম্ম করিবার জন্য হস্ত-পদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়,এবং সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করিবার জন্য চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা সংসারে কর্ম্ম না করিলে এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানালোচনা না করিলে পাপে ইহকাল-পরকাল নষ্ট হয়। অতএব কি ধনী, কি দরিদ্র, কি রাজা, কি প্রজা, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ—সকল পরিবারের নারীদেরই বাটনা বাটা, তরকারী কাটা হইতে রাজসূয় যজ্ঞ পর্য্যন্ত সাংসারিক ছোট-বড় সমুদয় কর্ম্ম স্বহস্তে সম্পাদন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অতি প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে উঠিয়া পরিবারস্থ সমস্ত লোকের, এমন কি গৃহপালিত পশু-পক্ষীরও, স্বাস্থ্য কেমন আছে, তৎসম্পর্কে খবর লওয়া উচিত। যদি পরিবারের কাহার কোন প্রকার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে তাহার পরিচর্য্যা করা নারীদের প্রধান কর্ত্তব্য।

আজকাল প্রাচীন ভারত-মহিলাদের মত নারীরা রোগীপরিচর্য্যা ও শিশুপরিচর্য্যা জানেন না; এইজন্য বর্ত্তমান কালে কি সহর, কি পল্লী—সর্ব্বত্র প্রায় সর্ব্ব-পরিবারে ষড়ঋতুতে সমানভাবে রোগ লাগিয়া রহিয়াছে। পরিবারের কর্ত্তারা ডাক্তার-কবিরাজের ও রোগীচর্য্যা-কারিণীদের মাহিনা দিতে দিতেই এক প্রকার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতেছেন। প্রাচীনকালে এরূপ ছিল না। প্রাচীন ভারতে মহিলারা সকলে যথারীতি বিদ্যালয়ে আয়ুর্ব্বিজ্ঞান স্বাস্থ্যবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেন না, তথাপি তাঁহারা সকলেই আয়ুর্ব্বিজ্ঞান-স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বিধি-ব্যবস্থা মুখে মুখে অভ্যাস করিয়া রাখিতেন, এবং তদনুরূপ রোগীপরিচর্য্যা ও শিশু-পরিচর্য্যা করিয়া পরিবারস্থ সকলকেই সুস্থ, সবল, নীরোগ এবং দীর্ঘজীবী করিয়া রাখিতে পারিতেন।

বর্ত্তমানে জন্মমৃত্যুর সরকারী রিপোর্ট দেখিলে শিশুর মৃত্যুসংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ নারীদের আয়ুর্ব্বিজ্ঞান-স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অনভিজ্ঞতা। শিশুরা নিজের শরীরের অবস্থা কিছুমাত্র বুঝিতে পারে না, তাহাদের স্বাস্থ্যের জন্য নারীদেরই দায়িত্ব অধিকতম। কিন্তু নারীরা অজ্ঞতানিবন্ধন আয়ু-র্ব্বিজ্ঞান-স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্মত বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে শিশু পরিচর্য্যা করিতে পারেন না; এবং তাহারই বিষময় ফলে শিশুদের মৃত্যুসংখ্যা দিনের দিন বর্দ্ধিতাকার ধারণ করিতেছে।

প্রভাতী।

(কথক শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

রাগিণী আশাবরী—তেওরা।

মঙ্গলোজ্জ্বল উদারগীতি-ধ্বনিত মহাগগন
সুপ্রভাত, প্রণিপাত! বিশ্বনাথ হে ভব-মণ্ডন!
অরুণালোকপ্লাবিত অম্বরতলে
গলিত স্বর্ণরশ্মিধারা তটিনী চলে
গাহে বিহঙ্গ বৈতালিক-দলে জয় জয় বিশ্বপাবন।
উদ্ভাসিত হাসিত প্রকৃতি
গীতি-মুখরিত করিছে আরতি
প্রথমাঞ্জলি প্রথম প্রণতি চরণে করিছে অর্পণ।
ফুল্ল কুসুম মন্দ সমীরে
প্রণতি করিছে অবনত-শিরে
সকল কণ্ঠে গাহে গম্ভীরে জয় জয় জগবন্ধন।

ঋগ্বেদের গঠন প্রণালী।

(৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ঋগ্বেদ সংহিতার দুই প্রকার বিভাগ দেখা যায়ঃ— এক অষ্টকে বিভাগ, এক মণ্ডলে বিভাগ। অষ্টক বিভাগ হইতেছে,—সমস্ত ঋগ্বেদ প্রায় সমান মাত্রায় আট ভাগে বিভক্ত, তাই একএকটা ভাগের নাম অষ্টক। প্রত্যেক অষ্টক আবার আট অধ্যায়ে বিভক্ত, তাহা হইলে সর্ব্বসমেত চৌষট্টি অধ্যায় হইল। প্রত্যেক অধ্যায় কমবেশী তেত্রিশ বর্গে বিভক্ত; সকল অধ্যায়ই যে ঠিক তেত্রিশ বর্গে বিভক্ত তাহা নহে—সর্ব্বশুদ্ধ দু'হাজার ছয় বর্গে বিভক্ত। সকল অধ্যায় ৩৩ বর্গে বিভক্ত হইলে ২১১২ বর্গ হইত। প্রত্যেক বর্গে প্রায় পাঁচটী করিয়া ঋক আছে। এমতে ঋগ্বেদ অযুত ঋকের সমষ্টি।

দ্বিতীয় প্রকার বিভাগ হইতেছে মণ্ডলে। এ অনুসারে দশ মণ্ডল, পঁচাশি অনুবাক, এক হাজার-সাতেরো সূক্ত এবং দশ হাজার পাঁচশত আশি ঋক্। সূত্রপ্রণেতা ঋষিবংশ অনুসারে এই বিভাগ। প্রথম এবং দশম মণ্ডলের সূক্তসকল নানা ঋষির রচিত। দ্বিতীয় মণ্ডলের সূক্ত গৃৎসমদ ঋষিবংশের; তৃতীয় মণ্ডল বিশ্বামিত্রের; চতুর্থ বামদেবের; পঞ্চম অত্রির; ষষ্ঠ ভরদ্বাজের; সপ্তম বশিষ্ঠের; অষ্টম কণ্বের; এবং নবম মণ্ডল অঙ্গিরা ঋষির রচিত। এই ঋষিদিগের নামে ঋষিবংশ বুঝিতে হইবে। প্রতি মণ্ডলে দেবতাপরাম্পরায় সূক্তসকল শ্রেণীবদ্ধ আছে। অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল সূক্ত তাহাই প্রথমে, তারপরে ইন্দ্র, তারপরে অন্য দেবতা। প্রথম আট মণ্ডলে এইরূপ। নবম মণ্ডলের সমস্ত সূক্ত সোমলতার উদ্দেশে। এই নবম মণ্ডলের সঙ্গে সামবেদের অত্যন্ত যোগ; ইহার এক তৃতীয় অংশ প্রায় সামবেদে উদ্ধৃত। তেমনি দশম মণ্ডলের সঙ্গে অথর্ব্ববেদের ঘনিষ্ঠতা।

ঋগ্বেদের এইরূপ যে মণ্ডলে বিভাগ, এ বিষয় প্রথম ঐতরেয় আরণ্যকে, এবং আশ্বলায়ন ও সাঙ্খ্যায়নের দুই গৃহ্যসূত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। আর, ঋগ্বেদের প্রাতিশাখ্যেতে দশ বিভাগের কথাই আছে এবং যাস্কমুনিও এই দশ বিভাগই স্বীকার করেন; এইজন্য তিনি ঋগ্বেদকে দশতয়ী বলেন। কাত্যায়নের অনুক্রমণী কিন্তু অষ্টক এবং অধ্যায় বিভাগ অবলম্বন করিয়া রচিত। এখন যে ঋকসংহিতা প্রচলিত, উহা শাকল বংশের শৈশিরীয় শাখা। ইহার আর এক শাখার কথা কখন কখন শোনা যায়, তাহা হইতেছে বাস্কলসংহিতা; উভয়ের মধ্যে বড় প্রভেদ নাই। যাস্ক একজন শাকল্য ঋষির নাম করেন, তিনি ঋক্সংহিতার পদপাঠের রচয়িতা; শুক্লযজুঃশতপথ ব্রাহ্মণে বিদেহ দেশের জনক রাজার সভায় শাকল্যবিদগ্ধ নামে পণ্ডিতের উল্লেখ আছে—তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

প্রবাদ আছে, শাকলদিগের সহিত শুনকদিগের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগ। আরও কথিত আছে, শৌনক ঋগ্বেদ রক্ষার্থে উহার ঋষি, ছন্দ, দেবতা, অনুবাক, সূক্ত, পদ্যবিধান এবং পদ্যের পদচ্ছেদ করিয়া একটা অনুক্রমণী প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বৃহদ্দেবতার বিষয় পরে বলা যাইবে। ইহা ব্যতীত তিনি ঋকের প্রাতিশাখ্য এবং একটী স্মার্ত্তসূত্র এবং একটী কল্পসূত্রও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্য আশ্বলায়নের কল্পসূত্র প্রস্তুত হইলে পর, তিনি নিজের কল্পসূত্র বিনষ্ট করিলেন। এই সকল একজন শৌনকের দ্বারা হওয়া কিছু অসম্ভব নহে, অথবা শৌনক-শ্রেণীর দ্বারা হইলেও হইতে পারে; কিন্তু ঋক্সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডল শৌনকের নামে কথিত। বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের সর্পসত্রে পূর্ব্বে যে মহাভারত ও হরিবংশের কথা কহিয়াছিলেন, তাহা যে শৌনকের নৈমিষারণ্যের যজ্ঞে বৈশম্পায়ন পুত্র সৌতি পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন, সেই শৌনকের সঙ্গে ঋক্সংহিতার শৌনককে অভিন্ন বলা হয়। অতএব ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের শৌনক এবং আশ্বলায়নের গুরু নৈমিষারণ্যের শৌনক যদিও একই ঋষিবংশের, তথাপি ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। বিশেষতঃ যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণে দুইজন ভিন্ন ভিন্ন শৌনকের নাম উল্লিখিত আছে—এক ইন্দ্রোত শৌনক ইনি পারীক্ষিত জনমেজয়ের যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন; আর একজন স্বৈদায়ন শৌনক—ইনি উদীচ্য, উত্তর প্রদেশে তাঁহার বাস।

পাঞ্চাল বাভ্রব্য ঋকসংহিতার ক্রমপাঠ রচয়িতারূপে উল্লিখিত হয়েন। অতএব কুরুপাঞ্চাল ও কোশল বিদেহের লোকগণই (শাকল্য ইহার অন্তর্ভুক্ত) ঋগ্বেদ এবং যজুর্ব্বেদ সংহিতায় বদ্ধ করিবার বিষয়ে প্রধান। তখন ঐ দুই রাজ্যের বোধ হয় বিশেষ প্রাদুর্ভাব সময়।

কিন্তু বেদের ঋক ধরিতে গেলে আমাদিগকে অনেক পূর্ব্বে যাইতে হয়। পূর্ব্বকার দেবদেবীর আখ্যান (ঠাকুরদিগের কথা) এবং ভূগোল দ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

তখনকার দেবদেবীর বৃত্তান্তে—শিশুদিগের কল্পনার ন্যায় দেবদেবীর উপন্যাস পাওয়া যায়। গ্রীক ও পারস্য জাতির উপন্যাসের সঙ্গে এই সকলের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। নিম্নে এইরূপ কতকগুলি কথার উল্লেখ করিতেছি:—যেমন, মনুষ্য মৃত হইলে তাহার আত্মা অনিলে পরিণত হয়, তাহাকে পক্ষবান পবন বিশ্বাসী কুকুরের ন্যায় যথাস্থানে লইয়া যায়। তবে স্বর্গের

সমুদ্রস্বরূপ বরুণ জগৎকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। স্বর্গের পিতা দ্যৌষ্পিতা, পৃথ্বী মাতা।

আকাশের জল যেন উজ্জ্বল অপ্সরা, সূর্য্যের কিরণ যেন গাভী মাঠে চরিতেছে; কৃষ্ণবর্ণ মেঘ বৃত্রাসুর এই সকল অপ্সরা ও গরুকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, এবং মহাবল ইন্দ্র বিদ্যুৎ বজ্রচালনা দ্বারা বৃত্রাসুরকে হনন করিতেছেন।

ঋগ্বেদের প্রাচীনত্বের আর এক প্রমাণ এই, যে, দুই দেশের দুই মহাকাব্যের মূল ঋগ্বেদের মধ্যে পাওয়া যায়। উভয়ত্রই স্বভাবের আবির্ভাবের সামান্য রূপক বর্ণনাকে ইতিহাসের আকারে সাজাইয়াছে। পারসিদিগের বেদ আবেস্তা, তাহাতে এই দেবাসুরের মল্লযুদ্ধ অন্তরীক্ষ হইতে মর্ত্ত্যে নামান হইয়াছে—প্রকৃতিরাজ্য হইতে নীতিরাজ্যে আনীত হইয়াছে: এক জন পুত্রৈষণা করিয়া ভক্তিভরে সোমযাগ করিয় ছিল, তাহাতে তাহার এক বীর পুত্র জন্মে, সে জগতের পবিত্রতা হরণোদ্যত দুর্জ্জয় সর্প অসুরকে বিনাশ করে। ইহাকেই আবার পারস্য কবি ফরদুসী ইতিহাসের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। সেই যুদ্ধকে ইরাণদেশে ঘটাইয়াছেন। আবস্তে সেই সর্পের নাম হইতেছে 'আজিদহক'; বেদে 'আজিকে' 'অহি' বলে, 'দহক' এর বৈদিক হয়ত 'দাসক'; আবস্তের 'আজিদহক' তবে বেদের 'অহিদাস' হইল। পারস্য মহাকাব্যে ইহাই আবার রূপান্তরিত হইল এইরূপ:—ইরাণের সিংহাসনে জোহাক নামে এক অত্যাচারী রাজা হইল, ফিরেদুন্ তাঁহাকে সংহার করিয়া পীড়িত লোকদিগকে উদ্ধার করিলেন এবং স্বাধীনতা ও সন্তোষ স্থাপন করিলেন। ফেরেদুন্ মহাকাব্যের,—ত্রৈতন্ বেদের; আবেস্তাতে আছে 'থ্রএতওনো', অতএব বেদের প্রকৃতির খেলা হইতে কাব্যে এবং পরে তাহা হইতে আবার ইতিহাসে পরিণত হইতে কোন্-না তিন চার হাজার বৎসর গিয়াছে। এইরূপ পারস্যের জেমশীদ বেদের যম ও আবস্তের যিম; যথা পারসী কইকবুস্ বেদের কাব্য উষনস্, আবেস্তের কবউশ্; তেমনি পারসী কায়খোসরু হয়ত বেদের সুশ্রবস্, আবেস্তের হুশ্রবংহ্। হিন্দুস্থানের প্রবাদ পারস্য গল্পের আর এক দিক মাত্র। এমন কি যজুর্ব্বেদের সময়েও ঋগ্বেদের সময়ের গল্পটা অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহাতে ইন্দ্রকে কলহ ও হিংসাপ্রিয় দেবতা করিয়া ফেলিয়াছে, যে কেবল প্রকাণ্ড অসুরকে নীচ ধূর্ত্তমি দ্বারা জয় করে। আবার কাব্যের মধ্যেও ইন্দ্রের হয় পূর্ব্বোক্ত ভাব রাখিয়াছে নয় ইন্দ্রকে মনুষ্যশূরে পরিণত করিয়াছে, যেমন অর্জ্জুন হইল ইন্দ্রের অবতার যিনি অসুরকে ও তাহার অবতারস্বরূপ বিপক্ষ রাজাদিগকে যুদ্ধে নিহত করিলেন। এইরূপে মহাভারত-রামায়ণের প্রধান প্রধান যত সব ব্যক্তি কর-দূসির রাজাদের মত ভাল করিয়া দেখিতে গেলেই অপ্রধান হন। কেবল ইতিহাসের সাধারণ ঘটনাটা থাকিয়া যায়, যাহার উপর পুরাকালের দেবতাদিগের গল্প উপন্যস্ত হইয়াছে; মনুষ্যগণ বিস্মৃতি সাগরে লীন হইয়া যান। তাহাতে কেবল কবির সৃষ্টি অনুভূত হয়।

তৃতীয়ত, ঋগ্বেদের গানেতেই সেই রচনাকালের সময় স্থান ও অবস্থা বিবৃত হয়। ঋগ্বেদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত পুরাতন ঋকসমূহে আর্য্যদিগকে সিন্ধুনদীর দুই পারে দলে দলে পরস্পর-বিরোধী ও বিবাদে রত হইয়া বাস করিতে দেখা যায়; সেখানে তাহারা গবাদি চারণপূর্ব্বক যাযাবর জীবন যাপন করিত। তাহারা পৃথকরূপে বা ক্ষুদ্র সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিত। আপনাদের মধ্যে সর্ব্বদা সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিত। যাগযজ্ঞ সকলে মিলিয়া মিশিয়া করিত। প্রতি পরিবারের পিতা আপনার বাড়ীর পৌরোহিত্য-কার্য্য সম্পন্ন করিতেন—অগ্নিকে স্বহস্তে জ্বালাইতেন, গৃহ্য অনুষ্ঠানবিধি আপনি সম্পন্ন করিতেন এবং দেবতাদিগের স্তোত্র আরাধনা করিতেন। বড় বড় সাধারণ যজ্ঞের সময়, সেটা যেন সমগ্রদলের উৎসব হইত; সেই যজ্ঞ, দলপতি রাজা করিতেন, তাহাতে বিশেষ বিশেষ পুরোহিত সকল নির্দ্দিষ্ট হইত,—যাহারা ঐ সকল ক্রিয়াতে বিশেষ দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিত। যজ্ঞের পৌরোহিত্য-কার্য্য লইয়া ক্রমে তাহাদিগের মধ্যে বিদ্বেষভাব হইতে দেখা গিয়াছে—তাহার মধ্যে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বংশের শত্রুতা চিরপ্রসিদ্ধ; বেদের সময় হইতে পুরাণের সময় পর্য্যন্ত সে শত্রুতা বরাবর চলিয়াছে, ইহার কারণ আর কিছু নয় কেবল তখনকার ক্ষুদ্র এক রাজা কর্ত্তৃক বিশ্বামিত্রের পরিবর্ত্তে বশিষ্ঠকে পৌরোহিত্যে বরণ করা লইয়া মাত্র। ব্যক্তিবিশেষের পৌরোহিত্যে দলবিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইলে সেই পুরোহিতের গৌরব বৃদ্ধি হয়। এইরূপে সে অন্যান্য পুরোহিতগণের ঈর্ষ্যার স্থল হয়। কিন্তু সেই পূর্ব্বকালে যজ্ঞের বাহিরে আর পুরোহিতদিগের আধিপত্য বিস্তার হইতে দেখা যায় না। এখনো জাতির অবতারণা হয় নাই, সকলেই বিশ্' কিনা বসতিকারী। তাহাদিগের রাজার নাম হইতেছে বিশ্পতি; রাজবংশের মধ্য হইতে তিনি হয়ত সাধারণ সম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইতেন। স্ত্রীরা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন ছিল। ভাল ভাল কবিতা স্ত্রীকবি ও রাণীদিগের নাম বহন করে। অত্রি-ঋষির কন্যা তন্মধ্যে একজন প্রধান। বিবাহ অতি পবিত্রভাবে দৃষ্ট হইত।

পতি ও পত্নী উভয়েই গৃহের নিয়ন্তা ; এইজন্য পতি ও পত্নীকে একত্রে দম্পতী বলিত, দম্পতি দ্বিবচন ; দম্‌ শব্দে গৃহ অর্থাৎ উভয়েই গৃহের পতি। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও সেই সকল ঘটনার অধিদেবতাদিগের অধীনতা স্বীকারেই তাহাদিগের ধর্ম্মভাব ব্যক্ত হইত ; কিন্তু দেবতাদিগেরও মনুষ্যের সহায়তায় নির্ভর করিতে হইত, এইরূপ একপ্রকার সামঞ্জস্য বিধান হইয়াছিল। তখনকার নির্দ্দোষ অবস্থায় পাপের ভাবের সর্ব্বতোভাবে অভাব, এ কারণ সেই সময়কে সত্যযুগ বলায় বাধা নাই। তুমি আমাকে ধন-ধান্য দাও, আমি তোমাকে যজ্ঞ দ্বারা বৃদ্ধি করিব, এইরূপ লেনদেনের ভাব—পরিবর্ত্তের ভাব, ভিক্ষার ভাব নাই ; এইরূপ তখনকার স্বাধীন বিক্রম, আত্মগৌরব এখনকার অপেক্ষা পুরুষত্ব প্রকাশক। হিন্দুস্থানের জল-বায়ু দ্বারা ক্রমে সে ভাব লোপ পাইতে লাগিল। যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণে আছে, ব্রাহ্মণেরাই সিন্ধুনদীর তীর হইতে হিন্দুস্থানে বাস করাইবার প্রধান কারণ ;—কখন কখন তাহাদিগের ইচ্ছার প্রতিকূলেও।

যদিও ঋকের গানের প্রবৃত্তি এতটা প্রাথমিক কালে, কিন্তু ঋকসংহিতা বদ্ধ হইবার সময় অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এ সময়ে ব্রাহ্মণজাতির আধিপত্য দেশ দাঁড়াইয়াছে ; পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাহা কুরুপাঞ্চাল ও কোশল বিদেহদিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাবের সময়ে। আবার যেমন অধিকাংশ গান হিন্দুস্থানে প্রবেশের সময় রচিত, তেমনি কতকগুলি গান সংহিতা হইবার সমকালীন প্রস্তুত হইয়া উহাতে নিবিষ্ট হইয়াছে, সে সকলের সঙ্গে অথর্ব্ববেদের সঙ্গে মিল আছে।

গ্রন্থপরিচয়।

সুগন্ধি কেশতৈল প্রস্তুত প্রকরণ— "এদেশের কথা" বুকডিপো হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান —২২, আর, জি, কর রোড, শ্যামবাজার, কলিকাতা। এটী মাত্র ২৪ পৃষ্ঠার ৫"×৩" পুস্তিকা। দাম লেখা নাই, কিন্তু চারি আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে পাওয়া যায়।

প্রকাশক দেশহিতের উদ্দেশ্য লইয়া ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশকের উদ্দেশ্য সফল হউক। অন্তত যদি দেশবাসীরা সুগন্ধি তৈলের পশ্চাতে রাশি রাশি অর্থব্যয় না করিয়া এই পুস্তিকা দৃষ্টে নিজ নিজ ব্যবহারের জন্যও তৈল প্রস্তুত করেন, তাহাতেও অনেক উপকার বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু সুগন্ধ করিবার জন্য যে সকল উপকরণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই বিদেশীয়। বিদেশীয় সৌখীন দ্রব্যের প্রতি আসক্তি আর কেন আনিয়া দেওয়া ? দেশকালের অবস্থা বুঝিয়া প্রকাশক ঐ সকল উপকরণ উল্লেখ করিয়াছেন বুঝিতেছি। উহার সঙ্গে তিনি যদি দেশীয় মাথাঘসার মসলা উল্লেখ করিতেন, তবে আমরা বড়ই সুখী হইতাম। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে আমাদের কথাগুলি স্মরণে আনিবেন। শুধু কেশতৈল কেন ? আমরা প্রকাশকের নিকট এইরূপ খুব অল্পদামে অল্প মূলধনে ছোটখাটো ব্যবসায়ের বহি ক্রমাগত পাইতে আশা করি।

Industry Year Book & Directory.—আমরা এই ইংরাজী পুস্তকটির একখণ্ড সমালোচনার্থে উপহার পাইয়াছি। এই গ্রন্থটির তথ্যসংগ্রহ ও সাজাইবার প্রণালী দেখিয়া আমরা এই মনে করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছি যে, আমাদের দেশ হইতে আমাদের দেশবাসীদ্বারা এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে পারে। ইহাতে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা অন্য "বর্ষগ্রন্থে" বা Year bookএ পাওয়া যায় না—এমন কি আমাদের নিকট দেবতার আসনে উপবিষ্ট সাহেবদিগের রচিত নির্ভুল ? বর্ষগ্রন্থেও পাওয়া যায় না। ইহা যে কেবল ব্যবসায়ীরই উপকারে লাগিবে তাহা নহে—সাধারণ লোকেও ইহা হইতে অনেক কথা জানিতে পারিবেন। ইহার অন্তর্ভুক্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানের হাটবাজারের নাম, দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের সমালোচনা, ডাইরেক্টরী, টেক্‌নিক্যাল বা হাতে-হেতেড়ে শিক্ষাদানের বিদ্যালয়সমূহের নিয়মাবলী প্রভৃতি বিষয় ব্যবসায়িগণের বিশেষ উপকারে লাগিবে। এই সকল বিষয় এরূপভাবে সাজাইয়া অন্য কোন ডিরেক্টরীতে দেওয়া আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। ইহার একটি বিষয়ে আমরা সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তাহা এই যে, এই স্বদেশীয় যুগে তিনি যদি স্বদেশী দ্রব্যবিক্রেতাদের পৃথক্ একটি অংশ রাখিতেন ত' গ্রন্থটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে তিনি এতৎ প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। পরিশেষে আবার বলি, এই গ্রন্থ আমাদের দেশের গৌরব। মূল্যও সুলভ—মাত্র ৫৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান ২২ নং শ্যামবাজার ব্রিজরোড্, কলিকাতা। ক্ষে. না. ঠা.

ছবিঃ—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত। মূল্য ১৷৹ টাকা।

এই গ্রন্থে পঞ্চাশটি গান আছে ; সুর তাদের নানা প্রকার হলেও কথার বিষয় একই, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি।

একদিকে সুর, অপর দিকে কবিতা, মাঝখানে গান। কবির পৌরোহিত্যে সুর ও কথার শুভবিবাহ— 'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ' মন্ত্রে সুসম্পন্ন হলে তবেই গান

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ফুটে ওঠে। কিন্তু লোকসমাজেও যেমন, সঙ্গীতক্ষেত্রেও তেমনই, এরূপ শুভসম্মিলন লাখে এক মেলে।

সব গানের কথাকে যে কবিতা হতে হবে, এমন নিয়ম থাকতেই পারে না; কারণ কবিতাকে যেমন ছন্দের বাঁধন মেনে চলতে হয়, গানকে তেমনি মেনে চলতে হয় সুর ও তাল। সেইজন্য সব গানই যে বিনা-সুরে সুপাঠ্য হয়, তা নয়; এস্থলেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। মোটের উপর বোধ হয় বলা যেতে পারে ধ্রুপদ অঙ্গের গানকে কবিতার ছাঁচে ঢালাই করা অপেক্ষাকৃত সহজ, খেয়াল অঙ্গের গানকে নয়।

শেষে একটি রামপ্রসাদী সুর ছাড়া বাকি প্রায় সব গানই যাকে বলে ওস্তাদী গান ভাঙ্গা, অর্থাৎ কালোয়াতী ঢঙের হিন্দী গানের সুরে বাঙ্গলা কথা বসানো। এ কাজ আদি ব্রাহ্মসমাজের গোড়াপত্তন থেকে করা হয়ে আসছে, সুতরাং ব্রহ্মসঙ্গীতকে একটি হিন্দী সুরের রত্নাকর বলা যেতে পারে। এই সঙ্গীতের একটি চয়নিকা যিনি স্বর-লিপিসহ প্রকাশ করবেন, তিনি হিন্দু সঙ্গীত তথা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের একটি মহা উপকার সাধন করবেন।

আলোচ্য গ্রন্থের কোন গানই স্বকর্ণে শোনবার সুযোগ আমার ঘটেনি। সঙ্গীতে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হওয়াটা বিশেষ আবশ্যক। তবে অল্প সময়ের মধ্যে চোক বুলিয়ে যেটুকু মানস-কর্ণে শুনতে পেয়েছি, তা'তে সুর অনেক-গুলিই ভাল মনে হল, আর গান যেগুল ভাল লাগ্‌ল, তার মধ্যে "ওঁ পিতা নোঽসি", "বেলা চলে যায় তোমা পানে চেয়ে", আর "শান্ত সন্ধ্যা এল" উল্লেখযোগ্য।

"পিতা নোঽসি" তেওরা ছন্দে বাঁধবার চেষ্টা না করে, চারমাত্রার তালে বাঁধলে যেন ভাল হত মনে হয়; কারণ শ্লোক-গুলির কোন নিজস্ব বাঁধা ছন্দ নেই, অথচ তেওরা তাল ঝোঁকপ্রধান।

"বেলা চলে যায়"-এর কথার সঙ্গে সুরের ভাব, অথবা সুরের সঙ্গে কথা খাপ খেয়েছে; দুই রাগিণীর মিশ্রণেও নূতনত্ব আছে। "শান্ত সন্ধ্যা" সম্বন্ধেও একই বক্তব্য। অন্যান্য গানেও তাল ফেরতা প্রভৃতি নানারকমে নূতনত্ব আনবার চেষ্টা করা হয়েছে দেখলুম। তবে পূর্ব্বেই বলেছি কানে না শুনলে, শুধু শুষ্ক স্বরলিপিতে যথার্থ রস পাবার আশা বৃথা।

যে বাণীদেবীর পরিশ্রম ও সাহায্য বিনা তাঁর পিতার এই মনস্কামনা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব ছিল, তিনি এই বইয়ে পিতৃঋণ কতক পরিশোধ ক'রে ধন্য হয়েছেন, দেখে সন্তুষ্ট হলুম। তাঁর নাম উত্তরোত্তর সার্থক হোক, এই আশীর্ব্বাদ করি।

আমার সব চেয়ে কি ভাল লেগেছে সত্য বল্‌ব? —প্রথম পৃষ্ঠার ছবিটি। কারণ গান আসে, যায়, চলে যায়; কিন্তু দাদামশায়-নাতির সম্বন্ধটি চির-নূতন ও চির-পুরাতন। ওতে বড় মধুর একটি রস ফুটে উঠেছে। মধুরেণ সমাপয়েৎ।

কমলালয়, বালিগঞ্জ
৩০শে আষাঢ়, ১৩৩৭ } শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

গার্হস্থ্যসংবাদ।

জন্মদিবস।—৩৯নং আণ্টনিবাগান লেনে স্বনামধন্য স্বর্গীয় ৺উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভবনে তাঁহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান যতীন্দ্রকুমার মজুমদারের পুত্র শ্রীমান গীতীন্দ্রকুমারের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে গত ২৯শে আষাঢ় সোমবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় একটী পারি-বারিক উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল। আদিব্রাহ্ম-সমাজের পদ্ধতি অনুসারে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় উপাসনা ও শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল সঙ্গীতাদি করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে সমবেত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের ভূরিভোজনের আয়োজন হইয়াছিল। ভগবান শিশুটীকে দিন দিন কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

শোকসংবাদ।

৺মহেশ চন্দ্র ঘোষ—গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ বৃহ-স্পতিবার সাধুচরিত্র ও সুপণ্ডিত মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্ত-রত্ন মহাশয় হাজারিবাগ-সহরে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৬২ বৎসর হইয়াছিল। ইনি তত্ত্বালোচনা ও জ্ঞানান্বেষণে আমৃত্যু নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। রূপদেহের আবরণ ভেদ করিয়াও আত্মা যে কিরূপে আপন মহিমায় দীপ্যমান হইয়া উঠে, তাহার নিদর্শন ইঁহার জীবনে সুব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ভগবান এই তত্ত্বদর্শী সাধক পুরুষকে আপন সত্যস্বরূপে বরণ করিয়া লউন।

৺প্রমথলাল সেন—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র, তদীয় আদর্শের একনিষ্ঠ অনুগামী, নববিধানের প্রচারক, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের অন্যতম ট্রাষ্টী এবং উপাসকমণ্ডলীর সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথ-লাল সেন গত ১৫ই আষাঢ় সোমবার অপরাহ্ণ ৩-১৫ মিনিটের সময় ৮৪নং আপার সারকুলার রোডে 'শান্তি কুটীর'-ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। এই ধর্ম্ম-প্রাণ চির-কৌমার্য্যাবলম্বী মহাত্মা বৃহত্তর নববিধান-পরিবারকেই স্বীয় পরিবাররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে কখনও বদ্ধ হন নাই। ইঁহার সাধনাপূত দিব্যজীবন চিরদিন মানবকে ঊর্দ্ধলোকের আভাস প্রদান করিবে। আমরা ইঁহার সুবৃহৎ পরি-বারকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান এই ভক্ত সাধককে আপন স্নেহাশ্রয় দান করুন।

৺মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বেহালা ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম উৎসাহী সভ্য মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিগত ২৫এ আষাঢ় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি মধ্যে মধ্যে উক্ত সমাজে এবং আবশ্যকমত ভবানীপুর-ব্রাহ্মসমাজে আচা-র্য্যের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিনয়ী ও নিরহ-ঙ্কারী ছিলেন। উপনিষদাদিতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বেহালা ব্রাহ্মসমাজের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা বিরল। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C 462

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৮-তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাকমাশুল ৶০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে শ্রীরণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৮তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০১। সাল ১৩৩৭। শক ১৮৫২। খৃঃ ১৯৩০। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩১।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৩৪। নিদ্রায় ও জাগরণে।

মা! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আমায় তুমি গর্ভে রক্ষা করিয়া সুগন্ধ কুসুমের মত আমাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলে। ঘুমাইবার যখন সময় আসিল, তখন তুমি কেমন সুন্দরভাবে আমাকে তোমার কোলে লইয়া মৃদুলমধুর সুরে কত ঘুম-পাড়ানি গান গাহিয়া আমার চক্ষে ঘুম আনিয়া দিতে। কখন্ যে ঘুম আসিল তাহা জানিতেও পারিতাম না। তোমার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া কেমন নিশ্চিন্ত মনে সুখে ঘুমাইতাম। আর তুমি—তুমি অনিমেষ দৃষ্টিতে জাগ্রত থাকিয়া আমার মুখের উপর তোমার স্নেহের কোর খুলিয়া দিতে। সে কি সুন্দর—সে কি সুখের। আবার যখন জাগরণের সময় আসিল, তখন তুমি তোমার সেই স্নেহমাখা মৃদুস্বরে জাগরণগীত গাহিতে গাহিতে আমাকে জাগাইয়া তুলিতে। আমি জাগিয়া উঠিয়াই দেখি, তোমার ঐ স্নেহমাখা মধুমাখা দৃষ্টি আমার দৃষ্টির উপর পড়িয়া আছে। তোমার ঘুম নাই, জাগরণ নাই—তোমার একই চিন্তা, একই ধ্যান, আমি কিসে নিরাপদ হই; আমি কিসে সুখে শান্তিতে থাকি। মা—সেই সমস্ত কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি আমি-হারা হইয়া যাই। যেই একটু মানুষ করিয়া তুলিলে, কোথা হইতে গর্ব্ব আসিয়া আমাকে ফুসলাইয়া তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। মা! আবার সেই রকম দৃষ্টিতে তুমি আমার দিকে চাও, আর আমাকে আত্মহারা করিয়া দাও। আমার গর্ব্ব-দর্প সমস্তই চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়াছি। আমার অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি যখন আমায় কোলে লইয়া দোল দিতে, তখন মাঠের ঘাস আমার দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া আনন্দে কুটিকুটি হইত; নদী-নির্ঝরিণী সকল কত নব নব তানে গান রচনা করিয়া আমাকে শুনাইত; বাতাস আমার সঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিত; চাঁদ কতবার আমার হাতে ধরা দিত, আর কপালে বিজয়টীকা দিয়া যাইত। এখন কেবল দুই গাল বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। বসিয়া আছি—কবে আবার তুমি সেইরকম কোলে লইয়া দোল দিবে—কবে আবার আকাশ, বাতাস, জল সকলই আমার নিকট মধুময় হইবে।

৩৫। আহারে বিহারে তুমি।

মা। তুমি যে আমার কি, তাহা কাহাকে

বোঝাই? বোঝাইবই বা কি—আমিই কি তাহা ঠিক বুঝিয়াছি? শুধু এইটুকু জানি, এইটুকু বুঝিয়াছি যে তুমি আমার মা। জানি না, অন্যের মা তাহার কাছে কি জিনিষ—অন্যেরা তাহাদের মাকে কি ভাবে গ্রহণ করে। কিন্তু আমার মা—আমার কাছে সব; তোমাতেই আমার সব, আর আমার সবেতেই তুমি। আমার আহারে বিহারে তুমি; আমার শয়নে জাগরণে তুমি। তুমিই আমার জীবনের কেন্দ্র, সকল ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিভূমি। তোমাকে পাইয়াছি বলিয়াই আমার জীবন আজ পর্য্যন্ত রাখিয়াছি, নইলে কোথায়—কোন্ বাতাসে যে মিশিয়া যাইতাম, তাহা কে জানে? মা! যে গান গাহিয়া তুমি আমাকে তোমার কোলে জাপটাইয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলে, তাহা মনে করিলেও ইচ্ছা হয় আবার তুমি সেই রকম কোলে জাপটাইয়া ধর, আর আমি গলিয়া গিয়া অশ্রু হইয়া তোমার বক্ষ চিরদিন ভিজাইতে থাকি। বিপদের ঘন অন্ধকার যখন আমায় ঘিরিয়া ফেলে, তখন তোমার ঐ বিমল শুভ্র জ্যোতিভরা মুখখানি চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, আর সমস্ত অন্ধকার কেমন করিয়া যে কাটিয়া যায়, আমি তাহার কিছুই জানিতে পারি না। তোমাকে দেখিয়াই আমি দুঃখবিপদের কথাই মনে স্থান দিতাম না—কত আশাভরসা লইয়া স্বর্গ-মর্ত্ত্যের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতাম। শৈশবে তোমার কোলে শুইয়া যে মুখ দেখিয়াছিলাম, আজ জীবনের এই সন্ধ্যাবেলায়—মা—আর একবার আমায় কোলে লইয়া তোমার সেই মুখখানি দেখাও।

৩৬। বাঁধনে।

মা! আমাকে এমন কঠিন বাঁধনে বাঁধিয়াছ কেন? আমি চাই তোমার সঙ্গে অহরহ থাকিতে আর ঘুরিতে, কিন্তু তুমি আমাকে জানি না কি দোষে এই অন্ধকার ঘরে কঠিন বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিলে—কেন? এই অন্ধকার ঘরে বসিয়া জ্ঞানলাভ করিতে হইবে? তেমন জ্ঞানে আমার কোনই প্রয়োজন নাই। আমার মন দিবানিশি চায় তোমার সঙ্গে মুক্ত আলোকে মুক্ত বাতাসে ছুটিয়া বেড়াইতে; আর খেলিতে খেলিতে যা-কিছু জ্ঞানের মণিমুক্তা কুড়াইয়া পাই, ছুটিয়া যাই তোমার নিকট নিবেদন করিতে। তোমারই দেওয়া জ্ঞান তোমারই কাছে আনিব দেখাইব; তুমি আমার জ্ঞানের উন্মেষে আনন্দের হাসি হাসিবে; উৎসাহের বাণী শুনাইয়া আমাকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহিত করিবে—ইহাই তো আমি চাই। তাহার বদলে এ কি? আমাকে আঁধার ঘরে বন্ধ করিয়া জ্ঞান শিখাইবার উদ্যোগ? ইহা নিশ্চয়ই তোমার কাজ নয়, অন্য কোন নির্ব্বোধের কাজ। যাই হউক, মা! অন্ধকারে থাকিয়া থাকিয়া মনপ্রাণ সমস্তই জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। আমি এই কারাগার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাই, তুমি আমার সহায় হও। আমার পার্শ্বে আসিয়া যদি আমাকে তোমার প্রসন্ন মুখ না দেখাও, তবে পদে পদে কেন আমাকে জানাও যে আমি তোমার সন্তান? দাও—মা—আমাকে ছাড়িয়া দাও; আমাকে ভাসিয়া যাইতে দাও। যেখানে উপরে অনন্ত নিম্নে অনন্ত, বামে অনন্ত দক্ষিণে অনন্ত, সেই দেশে ভাসিয়া চলিব—শূন্য প্রাণে ভাসিয়া চলিব—তোমাকেও ডাকিব কি না জানি না। যখন—জীবনের শেষ দিনে যদি তুমি আসিয়া আমার মাথাটী তোমার কোলে তুলিয়া লও—যদি লও, তবেই আবার তোমাকে মা বলিয়া জাপটাইয়া ধরিব।

৩৭। তোমার গানে।

মা! ছেলেবেলায় তুমি আমায় কোলে লইয়া যে গান গাহিতে গাহিতে আমাকে দোল দিয়াছিলে এবং আমার চক্ষু ফুটাইয়া তুলিয়াছিলে, আর একবার তুমি আমাকে কোলে লইয়া সেই গান গাহিয়া আমাকে শোনাও, আর আমার চোখের উপর তোমার নিশ্বাস বুলাইয়া দাও। তোমার সেই গানের অস্ফুট ধ্বনি আমাকে বড়ই পাগল করিয়া তুলিতেছে। আমার প্রাণপিঞ্জরের পাখী কতপ্রকারে কত ভঙ্গীতে তোমার সেই গানের অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তবু সে কি ঠিক তোমার গান গাহিতে পারে? তোমার গানের একটুখানি যাহা প্রাণে জাগে, সেই একটুখানিই আমাকে গানে গানে গানে সুরে সুরে সুরে কোন্ অনন্তের দিকে টানিয়া লইয়া চলে। তোমার সেই গানের সঙ্গে ভালবাসার যে অফুরন্ত ধারা

নামিয়া আসিয়াছে, আজ পর্য্যন্ত তাহার বিরাম নাই। সেই গানের অস্ফুট ধ্বনি প্রাণে জাগে, আর আমি জানি না আমার কি হয়—আমার সমস্ত হৃদয়খানি সাগরের জোয়ারের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া তোমারই চরণতটে আছড়াইয়া আছড়াইয়া মরিতে চায়। মা! তোমার সেই ভালবাসার বিনিময়ে দিবার উপযুক্ত আমার কিছুই নাই—কেবল অশ্রু আছে। মা! আমার ইচ্ছা হয়, তোমার চরণতলে বসিয়া দিবানিশি কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হই, যতক্ষণ না আমার অশ্রুর শেষবিন্দু শুকাইয়া যায়। তোমার সে গান ব্যক্ত করিবার মত আমার ভাষা নাই, ভাব নাই। তুমি নিজে আমার প্রাণে তাহার যেটুকু শোনাও, সেইটুকুতেই আমি মুগ্ধ—আমি মুগ্ধ। তোমার সেই গানের একটুখানিই আমার প্রাণে কত ভাষা আনে, কত ভাব আনে, আমার চোখের সম্মুখে কত অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য স্বপ্নরাজ্যের দুয়ার খুলিয়া দেয়, তাহা আমি জানি আর তুমি জান। মনে হয়, সেই একটুখানিই সূর্য্য চন্দ্র গ্রহতারকার সমস্ত অঙ্গ, প্রত্যেক অণুপরমাণু গানের মিষ্ট সুরে ছাইয়া ফেলিয়াছে। তোমার সেই গানে আর একবার আমায় ডুবাইয়া দাও।

৩৮। আত্মসমর্পণ।

জগতের বুকে নিসুপ্তি ছাইয়া আছে। কি জানি কেন, আজ একটী পাখীরও শীষ শোনা যাইতেছে না। মা! আমার প্রাণে কিন্তু শান্তি নাই, চোখে একটী নিমেষের জন্যও ঘুম নাই। সকল সময়েই তোমাকে পাইবার জন্য, তোমার চরণতলে বসিয়া, আর কিছু নয় কেবল সমস্তক্ষণ তোমাকে মা-মা বলিয়া ডাকিবার জন্য প্রাণের ভিতর কেমন একটা হা-হুতাশ জাগিয়া আছে। তুমি যতক্ষণ না আমায় তোমার চরণে ডাকিয়া লও, যতক্ষণ না পিঠে শিরে তোমার ঐ স্নেহমাখা হাত বুলাও, ততক্ষণ আমি আর কিছুতেই শান্তি পাই না। জানি না, সমস্তক্ষণ মা-মা বলিয়া ডাকিলে তোমার ভাল লাগে কি না, আমার তো খুবই ভাল লাগে—আমি যে না ডাকিয়া পারি না। ঐ মা-নামেরই চারিদিকে আমার যত কিছু কল্পনা, যত কিছু চিন্তা, যত কিছু স্বপ্ন। যতক্ষণ ঘুমের ঘোরে থাকি, ততক্ষণ যেন বেশ থাকি, কোনই ভাবনা-চিন্তা থাকে না। ঘুমের ঘোর যেই এতটুকুও কাটিতে থাকে, প্রভাত হউক বা না হউক, অমনি আমার সমস্ত প্রাণটা তোমার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, তোমার কোলে মাথাটী গুঁজিয়া আপনাকে হারাইয়া ঘুমাইতে চায়। তোমার আর আমার মাঝে যাহাতে এতটুকু ব্যবধান না থাকে, তোমার আর আমার মাঝে এক কেশাগ্রের মত স্থানেও যাহাতে অপর কেহ অধিকার না পায়, তেমনি করিয়া তোমার সঙ্গে আমি মিশিয়া থাকিতে চাই। যতই কেন ঝড়ঝটিকা মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাক না, আমার কোনই ভয় থাকিবে না, দুদণ্ড নিশ্চিন্তমনে আত্মহারা হইতে পারিব—আপনাকে ভুলিতে পারিব। মা আমার—জননী আমার! শৈশবে যেমন তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আমি সম্পূর্ণ নির্ভয় ছিলাম, খুবই সুখে শান্তিতে নিশ্চিন্তমনে খেলা করিয়া বেড়াইতাম; তুমি সেই রকম আর একবার কাছে আসিয়া দাঁড়াও, আমার যাহা কিছু আছে, সকলই তোমার চরণে সমর্পণ করিয়া দিই—আমার বলিয়া একগাছি তৃণও রাখিতে চাই না। দিবার নামেতেই আমার হৃদয়ে আশ্চর্য্য বল আসিতেছে—সমস্ত ভয় বিদূরিত হইতেছে। আমার হৃদয়ভার যাহা কিছু, তাহা সঙ্গে সঙ্গেই নামিয়া গিয়াছে। এখন অবধি আমি জানি, আমার অন্নবস্ত্রের জন্য, আমার সংসারের জন্য আমাকে আর ভাবিতে হইবে না—তুমিই সে ভার লইবে। তোমার চরণের আশ্রয় পাইলাম, তোমার ঐ প্রসন্নমুখে হাসি ফুটিল, আমারও জীবনে প্রভাত বিকশিত হইল। আমার জীবনের এই জীর্ণতরী নূতন হইয়া উঠিল—সংসার আর তোমার চরণের মাঝখানে তোমার মুখের বাণী বহন করিবার জন্য সেতুস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। আমার জীবনের মরুভূমি আজ তোমার স্নেহের রসধারায় ভাসিয়া গেল—সরস হইয়া উঠিল। আমার জীবন আজ শতসহস্র ফুল্লকুসুমের সুগন্ধে ভরিয়া উঠিল। আমার জীবনের কুঞ্জবনে কলকণ্ঠ শত বিহগ কি মধুর গান গাহিয়া উঠিল—তোমায় আমায় একি যোগ—একি যোগ!

উৎসব।

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম, এ,)

ভগবানের তিনটি রূপ বা শক্তি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বে প্রতিবিম্বিত। আমরা যেদিকে তাকাই না কেন, ক্ষুদ্র বৃহৎ, উচ্চ-নীচ প্রাণবান্ কিম্বা প্রাণহীন সকল বস্তুর মধ্যে ভগবানের ঐ তিনশক্তির যে কোন একটি ক্রিয়াশীল দেখতে পাব। সর্ব্বত্র সর্ব্ব বস্তুতে বিশ্বব্যাপী সৎশক্তি দেদীপ্যমান—যেখানে প্রাণের স্পন্দন অণুবীক্ষণের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে না, সেখানেও ভগবানের সৎশক্তি শান্ত নিশীথের নীলিম গগনে ছায়াপথের শুভ্র সুন্দর তারকামালার মত জল্ জল্ করে উঠে। তারপর যখন আর একটু অগ্রসর হই—তখন চিৎশক্তির খেলা ভূতধাত্রী ধরিত্রীর বিশাল ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে। সেখানে প্রাণের স্পন্দন জেগে উঠেছে; অনুভূতির অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা অলক্ষিতে বয়ে চলেছে—ভগবানের এই চিৎশক্তি বৃক্ষাবলীর মধ্যে লক্ষ্য করেই মহর্ষি মনু উদাত্তস্বরে গেয়ে উঠেছেন—'অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেষাং সুখদুঃখ সমন্বিতা' ;—কিন্তু এখানেও একটা জিনিষের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে—প্রাণ আছে, ঘটিকাযন্ত্রের টুক্ টুক্ শব্দের মত ধুক্ ধুক্ কচ্ছে; সুখদুঃখের অনুভূতি আম্রগর্ভ শরীবৃক্ষের মত অভ্যন্তরেই রয়ে গেল—বাহ্যবিকাশ সম্ভব হল না। অবশেষে শেষস্তরে উপনীত হয়ে দেখা গেল আনন্দ বা হ্লাদিনীশক্তি উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছে যেমন ছুটে চলে নির্ম্মল স্বচ্ছ জল-প্রবাহ গ্রামজনপদ বিধৌত করে, গিরিদরী উল্লঙ্ঘন করে, উষরমরুর ধূসরবক্ষে শ্যামলিমার অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়ে তুলে।

ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবের মধ্যে ভগবানের এই হ্লাদিনী শক্তি বিশ্বের অন্যান্য প্রাণিগণের চেয়ে সমধিক পরিস্ফুট। আনন্দশক্তি কখনো লুকিয়ে থাকতে পারে না—সে ফুটে বেরুতে চায় প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক বাক্যে, প্রত্যেক গতিভঙ্গীর অভ্যন্তর দিয়ে। আগুন যেমন ছাই-চাপা থাকে না, একদিন না একদিন দীপ্ত গরিমার উজ্জ্বল শিখা বিকীর্ণ করে আপনাকে প্রকাশ করে তোলে; ভূগর্ভস্থ সলিলরাশি যেমন উৎসমুখে আপনাকে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দেবার জন্য সচেষ্ট, আনন্দও তেমনি বিশ্বের সর্ব্বত্র—সরসীর ফুটন্ত কমলদলের অভ্যন্তরে, তটিনীর মৃদু কলরবে, বনানীর মর্ম্মরশব্দে, নিশীথিনীর স্তব্ধ নীরবতায় আপনাকে ছড়িয়ে দিতে চায়। ফুল যেমন প্রভাতের বুকে রূপরসগন্ধে বিকসিত হয়ে সূর্য্যরশ্মিগণের পথে আপনাকে মেলে ধরে, আনন্দও তেমনি চায়, যিনি সকল আনন্দের আনন্দ, সকল মঙ্গলের নিলয়; সকল হিতের আধার, যাঁহার অপার স্নিগ্ধকরুণা নিদাঘের তপ্ত মধ্যাহ্নে বারিধারারূপে আত্মপ্রকাশ করে, বাসন্তীমলয়ের মৃদুল হিল্লোলে কুসুমকুঞ্জের গোপন বুকে যাঁর বাণী নিসর্গের অংশে অংশে নীরব কাব্য রচনা করে বিদ্যমান,—তাঁরই চরণে নিজের হৃদয়ভাণ্ডারের যা কিছু সব নিবেদন করে রিক্ত হয়ে যাক।

ভগবানের চরণে আনন্দ নিবেদনের প্রয়াসেই মানবীয় সভ্যতায় উৎসবের মূলকারণ। সাধারণতঃ দেখা যায়; যখনই কোন লোক আনন্দের আতিশয্যে অভিভূত হয়ে পড়ে, তখনই সে চায়, তার হৃদয়ের মধ্যে যে উৎসধারা কঠিন পাষাণ ভেদ করে উদ্ভূত হয়েছে, তাই আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধবের মধ্যে প্রকাশ করুক। তবেই পরিপূর্ণ হবে আনন্দের আস্বাদন, তবেই পরিপূর্ণ হবে আনন্দের অপূর্ব্ব বিকাশ।

মানুষ প্রাণের নিভৃত কন্দরে যে আনন্দভাণ্ডারের সন্ধান পায়, উৎসবের ব্যপদেশে তাই সর্ব্বত্র ছড়িয়ে দিতে চায়; দ্যুলোকে ভূলোকে শুনবার জন্য লালায়িত হয়, আনন্দের একটা অশরীরী রাগিণীঝঙ্কার।

শ্রুতি বলেছেন "আনন্দেন ইমানিভূতানি জাতানি, আনন্দেন ইমানিভূতানি জীবন্তি" আনন্দেই নিখিলবিশ্বের প্রাণীগণের জন্ম এবং আনন্দেই তারা বেঁচে আছে।

শ্রুতির এই উক্তি আমরা জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করতে পারি। যেখানে আনন্দপ্রবাহ ছুটে চলেছে, সেখানেই প্রাণের স্পন্দন, সেখানেই আলোকের বন্যা, উৎসবের কর্ম্মপ্রচেষ্টার অশ্রান্ত কোলাহল; যেখানে আনন্দের অভাব সেখানেই দৈন্য, সেখানেই অন্ধকার, সেখানেই মৃত্যুর স্তব্ধতা!

বিকাশই জীবনের পূর্ণ পরিণতি, বিকাশই আনন্দের স্বধর্ম্ম, এই তত্ত্ব উপলব্ধি করে দার্শনিক-প্রবর হেগেল বলেছেন Absolute is becoming অর্থাৎ বিকাশই ভগবানের স্বরূপ, বাস্তবিকই তাই; কবি যেমন স্বরচিত কাব্যের মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশ সাধন করেন, কর্ম্মী যেমন কর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে নিজের স্বরূপকে ফুটিয়ে তোলেন, ভগবানও তেমনি এই বিশ্বগ্রন্থের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাঁরই বিকাশ,—এই অণুপরমাণু, নীল নভোমণ্ডলের দিগন্তব্যাপী বক্ষে শুভ্রসুন্দর মেঘমালা, বনানীর নিভৃত লতিকাবিতানের কুসুমগুচ্ছ; তাঁরই বিকাশ সীমাহারা মহাম্বুধির অনন্ত নীলিমা, ছায়াপথ-খচিত নিশীথিনীর তমোময় বসনাঞ্চল; তাঁরই বিকাশ নগাধিরাজ হিমালয়ের কুন্দেন্দু-শঙ্খ-ধবলা তুষারমালার উপর সমুদিত রক্তাম্বরা ধূসরকুন্তলা উষার মোহিনীমূর্ত্তি। যে দিন এ বিকাশ লুপ্ত হবে, সেদিন প্রলয় হবে, সেদিন ভগবান্‌টির ভগবান বা Absolute

রূপে প্রতিভাত হবেন না—সেদিন তাঁকে একটা Abstract power without concrete manifestation বা বিকাশহীন অব্যক্ত শক্তিরূপে কল্পনা করা ভিন্ন গত্যন্তর থাক্‌বে না; সেই অব্যক্ত শক্তির সঙ্গে মানুষের কোন সম্পর্ক থাক্‌তে পারে না—তিনি আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈত ব্রহ্মের সঙ্গে কিম্বা নাগার্জ্জুনের বিরাট্ শূন্যের সঙ্গে তুলনীয়, 'নেতি নেতি' যার একমাত্র স্বরূপ।

মানবজীবনের মধ্যেও আনন্দের বিকাশ অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টাতেই আমরা উৎসবের আয়োজন করি; নৈলে আমাদেরও জীবনের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য লুপ্ত হবে, সুতরাং তখন আমরা ঠিক জীবিত বলে নিজেকে মনে কর্‌তে পার্‌ব না!

মানুষকে যতদিন ধরাবক্ষে বেঁচে থাক্‌তে হবে, ততদিন তাকে আত্মবিকাশের জন্য উৎসবের আয়োজন কর্‌তেই হবে। উৎসবের মধ্য দিয়ে নিত্য নিত্য ভূমানন্দের দিকে তাকে ছুটে যেতে হবে, দূরে পরিহার করে সাংসারিক দুঃখদৈন্যের বিরাট্ যন্ত্রণা, অভাব-অভিযোগের তীব্র মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ, ব্যর্থতার বিরাট জ্বালা! নতুবা যে মুহূর্ত্তে সে উৎসবের আনন্দ-রাজ্য পরিহার করে ছুটে চলে যাবে দূরে—দূরে—নিরানন্দের তমোময় পথে; তখন শুকিয়ে আসবে তার প্রাণের প্রবাহ, রুদ্ধ হবে অনাবিল সহজসরল গতি; তখন সেই মানবের জীবন পরিণত হবে ঊষর মরুপ্রান্তরে—যার মধ্যে বৃক্ষলতা নেই, বনস্পতির শ্যামল শোভা নেই, নির্ঝরের কলগান নেই—আছে জড়তার এক অন্তহীন বালুচর!

উৎসব সব জাতির মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান। কিন্তু যে উৎসব খণ্ড আনন্দের বিকাশ সাধন না ক'রে অখণ্ড আনন্দের ধারা ফুটিয়ে তুল্‌তে পারে—অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মত ভূমানন্দের বিকাশে সমর্থ, সেই উৎসবই বরণীয়, সেই উৎসবই কাম্য।

যা খণ্ড, তা অনন্তকে টেনে আন্‌তে পারে না; অখণ্ডই অখণ্ডের জনক। ক্ষণস্থায়ী খণ্ড আনন্দের প্রলোভনে আমরা যে উৎসবে মত্ত হই, তা দু'দিন পরে শুষ্ক ফুলদলের মত ম্লান হয়ে যায়; তার স্মৃতি বিলুপ্ত হয়, সুতরাং পার্থিব জগতের বিষয় নিয়ে যে উৎসব বা আনন্দের বিকাশ তা ক্ষণস্থায়ী, খণ্ড ও পরিণামে বিলুপ্ত; কিন্তু যাঁর আনন্দের ধারা—ব্রহ্মাণ্ড বিপ্লাবিত করে বিপুলবাহা গঙ্গার জলস্রোতের মত অবিরামগতিতে ছুটে চলে দিকে দিগন্তরে, তাঁকে নিয়ে যে উৎসব, তাঁকে নিয়ে যে আনন্দের বিকাশ তাই অবিনশ্বর, তাই চিরস্থায়ী শাশ্বত অখণ্ড। চন্দনের সৌরভ যেমন চন্দনের অঙ্গ অঙ্গে সমভাবে বিদ্যমান থাকে, ফুলের মত শুকিয়ে গেলে নষ্ট হয় না, তেমনি ব্রহ্মকে নিয়ে যে উৎসব, যে আনন্দের বিকাশ তা চিরদিন সমভাবে জীবনের উপর দিয়ে ধ্রুবতারকার উজ্জ্বল-জ্যোতি বিকাশ কর্‌বে; সাংসারিক দুঃখ-সুখ-দ্বন্দ্বের মধ্যে আমাদিগকে হাত ধরে অভীষ্ট পথে নিয়ে যাবে; সংসার-সমুদ্রে পথহারা জীবনযানকে দিক্-নির্ণয়ে সহায়তা কর্‌বে।

প্রত্যেকের প্রাণের পরতে পরতে, হৃদয়-গুহার নিভৃত কন্দরে যে আনন্দ-উৎস উৎসারিত হয়ে উঠ্‌ছে, তারই বাহ্যবিকাশে উৎসুক ভক্তবৃন্দ উৎসবে সমাগত। কে কবে, কোন্ মাহেন্দ্র লগ্নে ব্রহ্মকৃপা লাভ করেছেন, স্বাতী-নক্ষত্রের বৃষ্টিধারা যেমন শুক্তির বুকে মুক্তা ফুটিয়ে তোলে, তেমনি কোন্ সাধক পুণ্যমুহূর্ত্তে পরব্রহ্মের করুণাধারা লাভ করে পার্থিব জগতের ধূলিলীন আশা-বাসনার উদ্দাম আস্ফালনকে জয় করতে সমর্থ হয়েছেন, দম্ভ-অহংকারের বিস্তৃত হস্তের বাইরে দাঁড়িয়ে দ্যুলোকে ভূলোকে, আকাশে বাতাসে পরব্রহ্মের মহিমার জ্যোতি দীপ্যমান দেখেছেন; আবার কে কবে মায়া-কুহকিনীর কুহকবলে আত্মবিস্মৃত হয়ে ভুলে গিয়েছি যে আমরা অমৃতের পুত্র; মায়ামোহের অধিকারের বাহিরে আমাদের স্থান—পরব্রহ্মের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে গিয়ে আপাতমধুরকে তাই আপনার বলে জড়িয়ে ধরেছি; পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা দ্বারা এই ভ্রম অপনোদনের জন্যই তো উৎসবের আয়োজন। উৎসবের ব্যপদেশে এই শিক্ষা যেন হৃদয়ে হৃদয়ে বহন করে নিয়ে যেতে পারি—পরব্রহ্মের উপাসনাই যেন জীবনের সারবস্তু বলে গ্রহণ করতে পারি, যা-কিছু মিথ্যা, যা-কিছু মালিন্য-কালিমা-ভরা, তাকে পরিহার করে যেন প্রাণ নিত্যসুন্দরের চরণতলে লুটিয়ে পড়ে; ভুলে গিয়ে নিজের অপূর্ণতা—সঙ্কীর্ণতা, মান-যশ-প্রতিষ্ঠার নিষ্ফল আরাব।

সকলেই জ্ঞাত আছেন, আজ যে ছায়াচিত্র বৈদ্যুতিক আলোক সাহায্যে রঙ্গভূমির শুভ্র-যবনিকার উপর প্রতিফলিত হয়ে জীবন্তের মত প্রতিভাত হচ্ছে, তাহা খণ্ড খণ্ড ফটোচিত্রের সমষ্টি। যতক্ষণ ঐ ফটোচিত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থান করে, যতক্ষণ তাহাদের মধ্য দিয়ে গতিশক্তি সঞ্চারিত না হয়, ততক্ষণ তারা বিচ্ছিন্ন, প্রাণহীন জড়চিত্র মাত্র। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে যন্ত্রসাহায্যে তাদের মধ্যে গতিশক্তি অনুপ্রবিষ্ট হ'ল অমনি সব যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিকের কুহক-দণ্ডস্পর্শে সঞ্জীবিত হল, পাতালপুরীর সুপ্ত রাজকন্যার মত সোণার কাঠিস্পর্শে শত শত বৎসরের নিদ্রা পরিহার করে জেগে উঠল; ঠিক তেমনি বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত পরব্রহ্মের উপাসকগণ যখন উৎসবের ব্যপদেশে সম্মিলিত হন, তখনই তাঁদের মধ্যে পরব্রহ্মের অখণ্ড মাধুরী প্রস্ফুট হয়ে উঠে, সকলের প্রাণের মধ্যে ভক্তির গতিশক্তি সঞ্চারিত হয়, দেশে দেশে

কালে কালে যে সমস্ত সাধক পরব্রহ্মের চরণমূলে সিদ্ধি লাভ করে কৃতকৃতার্থ হয়ে গেছেন—যুগযুগান্ত-সঞ্চিত তাঁদের ভাবের অনুপ্রেরণা ছায়াচিত্রের মত আমাদের প্রাণে নবীন স্পন্দন জাগিয়ে তোলে, প্রাণের বীণায় বেজে ওঠে এক উদাত্ত ঝঙ্কারে :—

—আজো যার বাণী
তারায় তারায় শুধু করে কাণাকাণি!

(ক্রমশঃ)

বিজয়।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সাথীরা আমার কে কোথায় আছে—
ঐ দেখ দূরে পতাকা উড়িছে
বাতাসের সাথে পত পত করে—
জানত নিশ্চয়—বিজয় ঘোষিছে।
সহায় সৈনিক আসিছে ছুটিয়া—
বিজয় নিকটে—দেরী নাহি আর।
দুর্গ ছেড়োনাকো—ধরে থাকো দৃঢ়—
হুহুঙ্কারে কর জয়ধ্বনি তাঁর।
ঐ শোন ভেরী বাজে মাভৈঃ-রবে—
প্রাণে আসে প্রাণ আকাশ বিদরি'।
সাহস দিছেন সেনাপতি সদা—
চল আগে—তাঁর জয়ধ্বনি করি'।

ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ।

(সদানন্দ শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস, রায়সাহেব)

ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতেছে দেখিয়া গত তিন বৎসর ধরিয়া আমি এ বিষয়ে নেতাগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছি। গত মাঘোৎসবের সময় সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে আমি "Our Mission Work" নামক একটি ইংরাজী প্রবন্ধও পাঠ করিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধটি Indian Messenger প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকাগুলিতে যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধেয় সভাপতি ডাক্তার হেমচন্দ্র সরকার মহাশয় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ Indian Messengerএ প্রকাশ করেন। সুবোধ পত্রিকায়ও ইহা প্রকাশিত হয়। অতঃপর ব্রাহ্মসমাজের পরমহিতৈষী প্রফেসর উপেন্দ্রনাথ বল মহাশয় Manchester Theological Collegeএর অনুকরণে City Collegeএ একটি Theological College স্থাপনের প্রস্তাব করেন। ইহা সুবোধ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের নাম "A Scheme for the Training of Brahmo Workers"। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে এ সম্বন্ধে অনেকেরই চক্ষু খুলিয়াছে। ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই।

কিন্তু theoritical বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হইলেও এখনও practical কার্য্য কিছুই হয় নাই। যতদিন না আমরা মৃতপ্রায় বর্ত্তমান সমাজগুলিকে সজাগ করিতে পারিব, ততদিন কোন বিশেষ ফল লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং আমি পুনরায় বলিতেছি যে আমাদের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য বর্ত্তমান সমাজগুলিকে জাগরিত করা। এজন্য আমাদিগকে কয়েকটি বিষয়ের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(১) ভারতবর্ষের যে যে স্থানে সমাজ আছে, সেই সেই স্থানে প্রচারক পাঠাইয়া সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা, সভ্যসংখ্যা, আর্থিক অবস্থা, কি প্রকারে সমাজের উন্নতি হইতে পারে, সমাজের তত্ত্বাবধানে প্রচারকার্য্য চালাইবার সুবিধা হইতে পারে কি না, ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিষয় অবগত হওয়া চাই। যদি প্রচারক পাঠাইবার সুবিধা না হয়, তাহা হইলে পত্র দ্বারা এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

(২) অন্ততঃ মাসিক একবার এই সকল সমাজের সহিত পত্রব্যবহার করিয়া পরস্পর যোগ-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। এজন্য একখানি সুলভ মূল্যের মাসিক পত্র প্রকাশ করিলে আরও ভাল হয়। ডাক খরচও অনেক বাঁচিয়া যায়। পত্র লিখিলে প্রতি পত্রে (২½ তোলার জন্য) এক আনা, বুক-প্যাকেটে (৫ তোলার জন্য) আধ আনা খরচ হইবে; কিন্তু সংবাদপত্র এক পয়সায় যাইবে। এতদ্ভিন্ন ক্রোড়পত্ররূপে পুস্তিকাদিও পাঠান যাইতে পারে। যদি কোন স্বতন্ত্র সংবাদপত্র প্রকাশ করা সম্ভবপর না হয় অথবা তাহার ব্যয় অধিক বলিয়া বোধ হয়, তবে কোন বর্ত্তমান মাসিক পত্রিকার সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারা যায়। আবশ্যক হইলে আমাদের Message পত্রিকা অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য এ নিমিত্ত ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রত্যেক সমাজ যদি এক কাপি করিয়া Message গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অতি সহজেই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। তৎপরে ইহা দ্বারা ফললাভ হইলে একখানি স্বতন্ত্র পত্রিকা প্রকাশ করিবার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। Messageএর বার্ষিক চাঁদা সডাক ১৲ মাত্র। সুতরাং ইহা বিশেষ ব্যয়সাধ্য হইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না

করেন যে আমরা নিজের স্বার্থের জন্য এ প্রস্তাব করিতেছি। Message এখন দেশে বিদেশে আদরণীয় হইয়াছে। ইহার গ্রাহকসংখ্যাও বর্দ্ধিত হইতেছে। আমরা ইহার জন্য এখন তত ব্যাকুল নহি; তবে যদি Message ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে আসে তাহা হইলে আমরা সুখী হইব, এই মাত্র।

(৫) যদি অর্থাভাবে কোন সমাজ উঠিয়া গিয়া থাকে অথবা উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল সমাজকে অর্থসাহায্য করিবার বন্দোবস্ত করা উচিত। অবশ্য এজন্য কিছু চাঁদা উঠাইবার আবশ্যক হইবে। এরূপে যদি আমরা একটি সমাজকেও কালগ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের অনেক মঙ্গল হইবে। আমরা ভগবানের আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করিতে পারিব।

(৬) দেশের যে যে স্থানে ব্রাহ্মগণ বাস করেন বা কর্ম্ম উপলক্ষে অবস্থান করেন, সেই সেই স্থানের উৎসাহী যুবকগণ দ্বারা একটি "Band of Lay Missionaries" নামক সঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে। আমরা অবগত আছি যে মফঃস্বলের অনেক ব্রাহ্ম, বিশেষতঃ ব্রাহ্ম যুবক একটু সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলে এই Lay Missionaryর কার্য্য করিতে পারেন। এক সময়ে এই সকল Lay Missionaryগণ অনেক স্বার্থ ত্যাগ, অনেক কষ্ট স্বীকার, অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও প্রাণপণে ব্রাহ্মসমাজের ধ্বজা উড্ডীয়মান রাখিয়াছিলেন। ইঁহাদের সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে আমাদের প্রচারকগণ বড় কিছু সুবিধা করিতে পারিতেন না; সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ ইঁহাদিগের নিকট চিরঋণী। বলা বাহুল্য, এই সকল Lay Missionaayর অভাবে আজ আমরা দীন দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা সত্ত্বেও ইঁহারা সমাজের কর্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক বড়ই উপেক্ষিত হইতেছেন। আমাদের নেতাগণ মনে করেন যে কয়েকটি বড় বড় সমাজের সহিত সংস্পর্শ রাখিলেই তাঁহারা ধন্য হইবেন। লাভালাভের প্রতিই তাঁহাদের এখন বিশেষ লক্ষ্য থাকে অনুমিত হয়।

(৫) ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বর্ণাশ্রম-জাতিভেদ না থাকিলেও বিদেশী সভ্যতার অনুকরণে ছোট-বড় জ্ঞানটা বিশেষ পরিলক্ষিত হইতেছে। দরিদ্র কর্ম্মীগণ যতই উৎসাহী এবং কর্ম্মক্ষম হউন না কেন, আজকাল ব্রাহ্মসমাজ যেন তাঁহাদিগক দূরেই ঠেলিয়া রাখিতে চান বলিয়া মনে হয়; সুতরাং তাঁহারা যে ব্যথিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে অবহেলা করিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

(৬) আমাদের আর একটি ব্যাধি যাহাকে ইংরাজীতে বলে "The cult of imitation," আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। আমরা দেশের সমাজগুলিকে অনাদর এবং উপেক্ষা করিয়া বিদেশী Unitarian সমাজের ধামাধরা হইতে চলিয়াছি। Unitarian Societyর সাহায্য ভিক্ষা করিবার জন্য আমরা বড়ই লালায়িত হই। এই Unitarian সমাজ খৃষ্টান সমাজের একটি অঙ্গমাত্র। ইহা আমাদের দেশের ঔপনিষদ ও বৈদান্তিক ব্রাহ্মসমাজ হইতে অনেক দূরে। অথচ আমরা আজ এই সকল সমাজের সহিত একযোগে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিতেছি। ইহা হইতে আমাদের সমাজের যে কত ক্ষতি হইবে, তাহা অনেকেই এখন বুঝিতে পারিতেছেন না। ইঁহাদের সহিত একযোগে কর্ম্ম করিলে আমরা যে অচিরে একটি খৃষ্টান-সমাজের শাখারূপে পরিণত হইব, তাহার আর সন্দেহ নাই। এদেশে আমাদিগকে হিন্দুসমাজের মধ্যে কার্য্য করিতে হয়। যে সকল উদারচিত্ত হিন্দু এখনও আমাদের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারা উহার ফলে ক্রমেই সরিয়া দাঁড়াইবেন। আমরা জানি, অনেক ব্রাহ্মসমাজ এই সকল উদার হিন্দুসজ্যের জোরে এখনও দাঁড়াইয়া আছেন। ইঁহারা আমাদের নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইলে যে কি বিষময় ফল হইবে তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন? Unitarian Christian Societyর সহিত আমার বিশেষ সহানুভূতি থাকিলেও আমি উপরিউক্ত কারণে তাঁহাদের সহিত একযোগে প্রচার-কার্য্য করা উচিত বিবেচনা করি না। আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় এবং বিশিষ্ট ব্রাহ্ম বন্ধু এ সম্বন্ধে একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন "The Brahmo Society must refuse to be a second fiddle to the Unitarian Church. We can co-operate with them but cannot identify with them so closely as to be misunderstood by our own people among whom we have to work and with whom we have to live. I would rather like to see the Unitarian Society absorbed in the Brahmo Somaj than have the mournful sight of our Somaj being assimilated and absorbed in the former." আমরা ব্রাহ্মমাত্রকেই এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

(৭) আমাদের আর একটি ব্যাধি দলাদলি ও গোঁড়ামি। মানবের কি বিষম ভ্রম! মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও আমরা দলাদলি ও গোঁড়ামির মোহ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না! এই দলাদলি ও গোঁড়ামিই আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ। আজকাল মৌখিক ঝগড়া মিটিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু আন্তরিক সদ্ভাব হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

আমি সকল সমাজের লোকের সহিত মিলিয়া ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। ভগবানের প্রেমরাজ্য ব্রাহ্মসমাজে এই অপ্রেমের আদর্শ দেখিয়া বাস্তবিকই আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি। পূর্ব্বে অনেকে আদিব্রাহ্ম-সমাজের দোষ দিতেন। কিন্তু আজ আদিব্রাহ্মসমাজ যে উদার ভাব লইয়া সকলের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা অনেকেরই অনুকরণীয়। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, অন্ততঃ তিন মাস অন্তর আলবার্ট-হলে সকল সমাজ মিলিয়া সমবেত উপাসনার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এই দলাদলি ও গোঁড়ামির জন্ম তাহা এখনও কার্য্যে পরিণত হইল না!

(৮) ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণের মধ্যে অনেকে আপনাদিগকে অনেক বড় জ্ঞান করিয়া থাকেন। ইহাও বৈদেশিক অনুকরণের কুফল। ধর্ম্মপ্রধান ভারতবর্ষের মত স্থানে ইহা একটি মস্ত ভুল। আমাদের দেশের প্রচারকগণকে "তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা"র পথ অবলম্বন করিতে হইবে। যে দেশে ঋষি-মহর্ষিগণ, সর্ব্বত্যাগী ছিলেন, যে দেশে বৌদ্ধ যতিগণ ভিক্ষু-পদবী ধারণ করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, যে দেশে শ্রীচৈতন্যদেব দ্বারে দ্বারে অকাতরে হরিনাম বিতরণ করিয়াছিলেন, সে দেশে বিদেশী ছাঁচে গড়া প্রচারকগণ যে কোথাও স্থান পাইতে পারেন না, ইহা অনেকে ভুলিয়া যান। সুতরাং উপরিউক্ত প্রচারক দ্বারা সমাজের কার্য্য যে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ব্রাহ্মসমাজে প্রচারক-জীবনের উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, সাধু অঘোর নাথ, সাধু হীরানন্দ—আরো এখন দেখাইতেছেন সাধু ব্যাস্বনী। অতি অল্প দিন মধ্যে সাধু ব্যাস্বনী প্রেমের ধারায় সিন্ধুদেশক জয় করিয়া ফেলিয়াছেন, পঞ্জাবেরও অধিক স্থান অধিকার করিয়াছেন। দিন দিন নানা স্থানে তাঁহার শক্তি-আশ্রমের শাখাপ্রশাখা গঠিত হইতেছে। তিনি একক কয়েক বৎসরের মধ্যে যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা সত্যই বিস্ময়জনক। তাঁহার সফলতার মূলমন্ত্র সারল্য ও বিনয়, সেবা ও আত্মত্যাগ। আমার বিশ্বাস যে আমাদের প্রচারকগণ, ব্যাস্বনীর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিলে অনেক সফলতা লাভ করিতে পারিবেন।

(৯) এই সকলের উপর আমাদের অর্থাভাব তো জানা কথা। সমাজের আয় ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। প্রচারকার্য্যের জন্য আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ কি কেহ কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

[লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার অন্তর ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। আমরাও তাঁহার প্রত্যেক কথাই খুবই অনুমোদন করি। বিদেশীয় অনুকরণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান হীন অবস্থার যে অন্যতর প্রধান কারণ, তাহা আদিব্রাহ্মসমাজ আবহমান কাল ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। ইউনিটেরীয় সমাজের সহিত মতে বা কার্য্যে অভিন্ন হওয়া সমীচীন নহে, তাহা মহর্ষিদেবের জীবদ্দশায় তত্ত্ববোধিনীতে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছিল। এই ভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া মহর্ষিদেব কখনই উক্ত সমাজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত স্বনার্থিগের আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হন নাই। উক্ত প্রবন্ধটি পুনঃ প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল। তং, সং,]

বিস্ময়ের পুনর্জ্জন্ম।

(শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল,)

য়ুরোপীয় সাহিত্য-সমালোচকগণের মতে রুশো ফ্রেঞ্চ রোমান্টিসিজমের জন্মদাতা। ফ্রান্সের চিন্তা-রাজ্যে ভাবের স্রোত ক্রমশ মন্দীভূত ও স্থানে স্থানে সীমাবদ্ধ অপ্রসর খাদে গতিহীন হইয়া চারিদিকের বায়ুকে যখন অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিয়াছিল, ফরাসি-সমাজের সর্ব্বাঙ্গে তখন নানাপ্রকার দুষ্ট ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের পথে আবিষ্ক্রিয়ার উদ্যম পাশ্চাত্যকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র নূতন ধর্ম্ম, নূতন সভ্যতা, নূতন আদর্শের সংবাদে উন্মত্ত করিতেছিল। রুশোর অমিত-শক্তি প্রতিভা পাষাণে নির্ম্মিত কারাগারের দ্বার কুঠারাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পর্ব্বতগুহে বদ্ধ জলরাশিকে সীমাহীন ক্ষেত্রের দিকে প্রবাহিত করিয়া নূতন ভাবধারার বর্ষণ হইতে যে আশ্চর্য্য প্লাবন সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে মানব-সমাজ—বিশেষত তদানীন্তন ফরাসি-সমাজ হইতে বহুকালের স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা অপসৃত হইয়াছিল। রুশো এইরূপে ফ্রান্সে যে বিপ্লব-প্রসবিনী শক্তিকে সাহিত্যের ভিতর দিয়া চিন্তা-রাজ্যে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, জারমাণি ও ইংলণ্ডের সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার বিকাশ দেখা যায়। জারমানিতে কান্ট (Kant) হেগেল (Hegel) ফিক্টে (Fichte) প্রভৃতি মনীষীগণ এবং ইংলণ্ডে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth), সেলী (Shelly) ও কীটস্ (Keats) প্রভৃতি কবিগণ এই নূতন ভাবরাশির প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছিলেন। দেশ-কাল-পাত্র ও সমাজবিশেষের অবস্থাভেদে সেই ভাবধারা বৈচিত্র্যময় অসংখ্য নূতন আদর্শ সৃজন করিয়াছে। ইহার ফলে প্রাচীন অব্যবহার্য্য আদর্শ মানুষের মনকে দিকে দিকে যে কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া বাঁধিয়াছিল তাহা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলেও শিল্প ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে আধুনিক সময়ে মানুষের চিন্তাশীলতা যে সকল সৌন্দর্য্যের নূতন সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহার অধিকাংশ

উপকরণ প্রাচীনতম যুগের আদর্শাগার হইতে গৃহীত হইয়াছে। সেই অতীত যুগে সর্ব্বপ্রকারে স্বাধীন মানব স্বভাবসিদ্ধ মানসিক প্রেরণার কৃপায় সভ্যতার উষালোকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, তাহার ফলে প্রাচীনতম সমাজে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, রুশোর ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে তাহার চিহ্নমাত্র ছিল না। সমাজ যুগের পর যুগ স্বার্থ-প্রণোদিত আইন-কানুন বিধি-ব্যবহার-শাসনে অপকৃষ্ট আদর্শকে অনুসরণ করিতে করিতে মানুষের চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু ও মানব-হৃদয়ের উচ্চ ভাবগুলিকে খর্ব্বাকৃতি করিয়াছিল। স্বাধীনভাবে কার্য্য করা ত দূরের কথা, স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেও মানুষ সাহসী হইত না। ফরাসি-সমাজের এই প্রকার শোচনীয় অবস্থায় রুশো একদিন মানব-সমাজের আদি যুগে সভ্যতার স্বাধীনতার রীতিনীতির ইতিহাস পাঠ করিলেন। তিনি মানুষের সরল স্বাভাবিক প্রকৃতির যে আভাস পাইলেন তাহাতে বিস্মিত হইয়া তাঁহার সমসাময়িক জগতে দুঃখ-দারিদ্র্য পরাধীনতা কদাচার চরিত্রহীনতা উৎপীড়ন অত্যাচার প্রভৃতি সামাজিক উন্নতির বিরোধী ব্যাপারগুলির কারণ বুঝিতে পারিলেন। রুশো সাহিত্যের ভিতর দিয়া মানুষের বিস্ময়োৎপাদন করিবার জন্য প্রাচীনতম সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে সঙ্কীর্ণ রীতিনীতি ও প্রথা, আইন-কানুন, বিধিব্যবস্থা যে আড়াল সৃষ্টি করিয়াছিল মানুষের দৃষ্টিপথ হইতে তাহা সরিয়া গেল। মানুষ বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে বিশ্বের দিকে চাহিল। বিস্ময়ের আদিযুগ আবার যেন ফিরিয়া আসিল।

রোমাণ্টিসিজম্ (Romanticism) অর্থাৎ বিস্ময়ের পুনর্জ্জন্ম (renaissance of wonder) আধুনিক সময়ে ফ্রান্সের শিল্প সাহিত্য ও সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। রুশো ফরাসি-জাতির হৃদয়ে যে প্রেরণা উদ্দীপন করিয়াছিলেন, তাহা ফরাসি-বিপ্লবের পরে নিবিয়া যায় নাই। উক্ত বিপ্লবে ফ্রান্সের চিন্তা-রাজ্যে যে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল তাহার আলোকে উনবিংশ শতাব্দীতে ভিক্টর হুগোর প্রতিভা সমুজ্জ্বল। হুগো বিগত শতাব্দীতে রোমাণ্টিসিজমের অগ্নিকে আর একবার প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ফ্রান্সের সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ হইতে যে সকল কবিতা জন্মলাভ করিয়াছিল, কুমারী তরু দত্তের কবি-কল্পনা তাহার প্রভাব যে উপেক্ষা করিতে পারে নাই "ফ্রেঞ্চ ক্ষেত্রে সংগৃহীত কবিতা-গুচ্ছ" (Sheaf Gleaned in French Field) তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ফ্রান্সে অবস্থানকালে তরু ও তাঁহার দিদি অরু এই সকল কবিতা সংগ্রহ ও ইংরাজি-পদ্যে অনূদিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কবিতাগুলির মোট সংখ্যা ১৯২, ইহার মধ্যে অরু কর্ত্তৃক অনূদিত কবিতার সংখ্যা মাত্র ৮। তরু দত্ত ফরাসি কাব্য-সাহিত্যে কতদূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিলেন তদ্বিষয় চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। যাহা হউক, তরুর অনূদিত কবিতাগুচ্ছের মধ্যে হুগোর কাব্য-গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত কবিতার সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বাস্তবিক, হুগোর প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ কবিগণের উপরেও সমধিক বলিয়া মনে হয়। হুগো যে বিগত শতাব্দীতে ইংলণ্ডের কাব্য-জগতে রোমাণ্টিসিজমের গুরু ছিলেন তাহা ইংলণ্ডীয় কবিরাই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

হুগোর প্রভাব বাঙ্গালী কবিগণের রচনাতেও অনুভূত হয়। রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার বড়াল হুগোর রচিত একাধিক কবিতা বাঙ্গালা পদ্যে অনূদিত করিয়াছেন। তবে, তাঁহারা হুগো-রচিত কাব্য-গ্রন্থের ইংরাজি সংস্করণ মাত্র পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এই দুইজন প্রতিভাশালী বাঙ্গালী কবির গুরু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর রচনায় আমরা যে মানবতার পরিচয় পাই, তাহারও উৎস হুগোর অনুকরণে রচিত ইংরাজি রোমাণ্টিক কবিতা বলিয়া মনে হয়। বিহারীলালের জীবনী-পাঠে জানা যায় যে, তিনি বায়রণ (Byron) ও সেলী (Shilly) প্রমুখ ইংরাজ-কবিগণের কাব্যগ্রন্থ উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছিলেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া যতগুলি ইংরাজ-কবি ফ্রেঞ্চ রোমাণ্টিসিজমের পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রচিত ইংরাজিকাব্য-গ্রন্থের প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবিদিগের উপর যে কত বেশী, তৎসম্বন্ধে ইংরাজিশিক্ষিত কাব্যামোদী বাঙ্গালী পাঠক উত্তমরূপে অবগত আছেন। আমরা কিন্তু এমন কথা বলি না যে, বিহারীলাল ও তাঁহার শিষ্যদ্বয় অনুকরণপ্রিয়তার বশবর্ত্তী হইয়া পাশ্চাত্যের নূতন ভাবধারাকে তাঁহাদের রচিত কাব্যে প্রাধান্য দিয়াছেন। ইংলিশ্ রোমাণ্টিসিজমের আলোকে তাঁহারা বিশ্বের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু প্রাচ্য মানবতা ও প্রাচ্য প্রকৃতিকেই তাঁহারা পরিস্ফুট সৌন্দর্য্যে বিকাশিত করিয়া বঙ্গভাষায় রচিত কাব্যের মারফৎ দেখাইয়াছেন। বিগত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইংরাজি সাহিত্য বাঙ্গালীর কবিহৃদয়কে আলোড়িত করিলেও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সমুদ্রযাত্রী বাঙ্গালীকে দেশ হইতে দেশান্তরে লইয়া গিয়া তাহার অন্তরে যে বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল, তাহাতে তাহার হৃদয় প্রসারিত ও কল্পনা উত্তেজিত হইয়াছিল। যে বাঙ্গালী ঘরের কোণে বসিয়া নির্ব্বাপিতপ্রায় জাতীয় জীবনের একটুখানি আলোকে

দুই-চারিটা পুরাতন জিনিস লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, সে এক্ষণে দিগন্ত-প্রসারিত বিশ্বের দিকে চাহিয়া যে বিস্ময়াবিষ্ট হইবে, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বৈদিক যুগে আর্য্যজাতি যখন ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহাদের মনও পারিপার্শ্বিক নূতন জগতের দিকে আকৃষ্ট হইয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিল। অবস্থাবিশেষে মানবের মনে এইরূপে যখনি বিস্ময়ের আবির্ভাব হইয়াছে, তখনি তাহার কবি-হৃদয় কাব্যাকারে বাহির হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীনতম সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের কাব্য-জগতে বিস্ময়ের বৈচিত্র্যময় ভাবলীলার অভিনয় আমাদিগকে যে সকল প্রাচীন আদর্শের সংবাদ দেয়, ধর্ম্মবিপ্লব রাষ্ট্রবিপ্লব সমাজবিপ্লব সেই আদর্শগুলিকে বিনষ্ট না করিলেও তাহাদিগকে আর্য্য-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের সামিল করিয়া রাখিয়াছিল। বাস্তবিক, আমাদের জাতীয়-জীবন পাশ্চাত্যের সংশ্রবে না আসিলে বিস্ময়ের বিপ্লবময়ী শক্তির পুনর্জ্জন্ম এদেশের কাব্য-সংসারে সম্ভবপর হইত না। মধুসূদন, বিহারীলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, হেমচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশের জ্যোতিষ্কগণ তাহা হইলে কোনও কালে চক্রবালের ঊর্দ্ধে উদিত হইতেন না। যে ভাবময়ী ভাষা ও কাব্যের সাহায্যে বাঙ্গালী আজ সর্ব্বত্র আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে, তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তাহা হইলে কেহ কল্পনা করিতে পারিত না। ইংরাজি-শিক্ষার সহিত বিস্ময়ের পুনর্জ্জন্ম বঙ্গদেশেই যে সর্ব্বপ্রথম সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহার কারণ বাঙ্গালীরাই সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছিল। শুধু ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য কেন, য়ুরোপের অন্যান্য জীবন্ত ভাষা ও সাহিত্যেও বাঙ্গালীরাই সর্ব্বপ্রথমে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। যে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আধুনিক বঙ্গভাষাকে রোমান্টিসিজমের উপযোগী ছাঁচে ঢালিয়া নূতন করিয়া প্রস্তুত করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই, তাহার পূর্ব্বেই নবজাত বিস্ময়ভাব বাঙ্গালী কবির লেখনী হইতে ইংরাজি-কবিতার আকারে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বঙ্গদেশের কাব্য-জগতে দেখা দিয়াছিল।

চোরা বালি।

(২) দুর্নীতি প্রসারের ফল

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আর্টের দোহাই দিয়া হৌক বা অন্য যাহা কিছুর দোহাই দিয়া হৌক, দুর্নীতি প্রবেশ করিলেই তাহার অপরিহার্য্য ফল অবনতি। ধর্ম্মে দুর্নীতি আসিতে দাও, সত্যধর্ম্মের মুক্ত স্বাধীনতা হইতে তুমি সরিয়া যাইতে বাধ্য হইবে; গুরুবাদ প্রভৃতি শতবিধ পরাধীনতার শৃঙ্খল স্বভাবতই তোমার পায়ে আসিয়া চাপিয়া ধরিবে। সাহিত্যে দুর্নীতি প্রবেশ করিতে দাও, বিষবৃক্ষের বীজ ছড়াইবার কাজ হইবে—তাহার ফলে মৃত্যু—মৃত্যু—মৃত্যু। ভগবানের চরণে করযোড়ে এই প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদিগকে মৃত্যু হইতে দূরে রাখেন।

আমরা স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে? অন্তরে যদি পচ ধরে, তবে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে কে? যক্ষ্মারোগীর ন্যায় দুর্ব্বল ও অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তি কি সুস্থদেহ সতেজ ব্যক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে পারে, না জয়লাভ করিতে পারে? যক্ষ্মা রোগীর দৃষ্টান্ত আনা কোন প্রকারে অসঙ্গত মনে করি না। কয়জন সংবাদ রাখেন যে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের শতকরা ৭৫ জনের দেহে বিষম বিষরোগের বীজ (Venereal disease) দেখা দিয়াছে? যে আর্টের ফলে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে হয়, দেশের পৃষ্ঠে পাদুকাপ্রহার সহ্য করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, দেহ-মন জীর্ণ হইয়া যায়, দূর করিয়া দাও সেই আর্ট—সেই আর্ট পায়ের তলে দলিয়া দাও—দলিয়া দাও। আমার কয়েকজন বন্ধু তাঁহাদের পুত্রাদির বিবাহ উপলক্ষে বাইনাচ দেওয়া হইবে কি না আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি তাহার বিরোধী মত বলায় তাঁহারা প্রত্যেকেই ঐ আর্টের দোহাই দিয়া উহা সমর্থন করিলেন এবং আমার নিষেধ না মানিয়া কার্য্যত বাইনাচ দিলেন, কিন্তু—কিন্তু তাহার ফলে প্রত্যেক বন্ধুই পরিণামে ধনে প্রাণে মজিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই যুক্তি ছিল এই যে, বাইনাচ ভারতের একটা প্রধান আর্ট—আপনি কি বলেন উহা উঠাইয়া দিতে? আমি বলি, যাহার ফলে মানুষের, সমাজের, পরিবারের ও দেশের সর্ব্বনাশ হয়, চুলোয় যাক সেই আর্ট, ধরাপৃষ্ঠ হইতে সেই আর্ট বিলুপ্ত হউক—তাহাতে মঙ্গলই হইবে; জগতের দুর্গন্ধ অস্বাস্থ্যকর বায়ু অপসৃত হইয়া সুগন্ধ পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইয়া স্বাস্থ্য আনয়ন করিবে—সে তো ভালই।

আমাদের এই দুঃখদৈন্যে পূর্ণ দারিদ্র্যক্লিষ্ট দেশে—যেখানে অধিকাংশ লোক এক বেলাও পেট ভরিয়া আহার পায় না, সেই দেশে যাঁহারা দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে দ্বিধা করেন না, তাঁহাদের মনোবৃত্তির কথা কি আর বলিব? ভগবান বজ্রদণ্ডে তাঁহাদের লেখনী বিখণ্ডিত করিয়া দিন।

আমরা বিলাতের অনুকরণে সাহিত্যে বিষবীজ ছড়াইতেছি। সে দেশ স্বাধীন—আজ তাহার অধিবাসীদের যখনই

মনে হইবে যে, এই কার্য্যের ফলে দেশের অনিষ্ট হইতেছে, আর অমনি সমস্ত দেশের জনমত তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে এবং তাহার প্রতিবিধান না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইবে না। বিবাহ-বিচ্ছেদ (divorce) সম্বন্ধীয় মকদ্দমাসমূহের বিবরণ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনার আদ্যন্ত বর্ণনাসহ বিলাতী সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইত। কিন্তু যেই তাহারা বুঝিল যে, উহার ফলে দেশের অনিষ্ট হইবে, সমাজ আরও অধঃপাতে যাইবে, পাঠকদিগের মন কলুষিত হইবে, অমনি জনমত আইনের দ্বারা (?) উহা রহিত করিল। সংবাদপত্রপাঠকেরা লক্ষ্য করিবেন যে, আজকাল বিবাহচ্ছেদের মকদ্দমা বিলাতী সংবাদপত্রে সংক্ষেপে প্রকাশিত হয়।

বিলাত পরাধীন দেশ নয়; আমাদের দেশের মত তাহার গলায় হাতে পায়ে আটেঘাটে পরাধীনতার বেড়ী দেওয়া নাই। তাই বিলাতের লোকেরা "ফুর্ত্তি" (অথবা স্ফূর্ত্তি) করিতে করিতে যেই ঘৃণ্যতম রোগের বিষবীজ দেহে প্রবেশ করাইল—শতকরা ৯০ জন যখন সেই বিষের প্রকোপে জর্জ্জরিত হইবার উপক্রম হইল, তখন সেখানে উহার প্রতীকারের উপায় সন্ধানের জন্য কমিশন বসিল এবং উপায়ও আবিষ্কৃত হইল। কিন্তু—কিন্তু আমাদের এই দুর্ভাগ্য পরাধীন দারিদ্র্যক্লিষ্ট দেশে—পরাধীনতার চাপ দৃঢ়তর করিবার জন্য অর্থ ব্যয়িত হইলেও দেশের প্রকৃত উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য, রোগ-শোক বিদূরিত করিবার জন্য বেশী টাকা খরচের কথা উঠিতেই পারে না! দেশের আয়ের যে মোটামুটী একটা সীমা আছে। সেই আয় হইতে তুমি একবিষয়ে অতিরিক্ত খরচ করিলে অপর বিষয়ে ন্যায্য খরচ করাও অসম্ভব হইয়া উঠে। ইহার উপর দুর্নীতি প্রসারিত করিয়া যদি দেশের যেটুকু আয়ের সম্ভাবনা ছিল, লোককে দুর্ব্বল করিয়া সেই আয়টুকুরও পথ ক্ষীণ হইতে ক্রমশ ক্ষীণতর করিবার ব্যবস্থা করা হয়, তবে আমাদের আর আশা কোথায়? এই সেদিন যে রোমরাজ্য পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল, তাহাও স্বাধীন তাহাও প্রধান বলিয়াই, যখন তাহার অধিবাসীরা দেখিল যে রাজ্য ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রতাপে ছারখার হইতে চলিয়াছে, অমনি তাহার কারণসন্ধান ও প্রতীকারের উপায় আবিষ্কারের জন্য কমিশন বসিল এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা হইল। কিন্তু ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতির কৃপায় আমাদের দেশ তো ছারখার হইতে বসিয়াছে। এ সকলের কারণসন্ধানের জন্য কমিশন বসাইবার বোধ হয় কোনই প্রয়োজন নাই। ধনী-দরিদ্র চাষাভূষা এদেশবাসী যে কোন লোককে ইহাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিবে, সে-ই এক নিশ্বাসে কারণগুলি বলিয়া যাইতে পারে—জলনিকাশের পথরোধ, অজ্ঞতা, অনশন প্রভৃতি। কিন্তু তাহার প্রতিকারের কি ব্যবস্থা হইতেছে? এই সেদিন সংবাদপত্রে দেখিলাম, সৈন্য, পুলিশ প্রভৃতির জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয়, দেশবাসীর চিকিৎসা, দেশবাসীর শিক্ষা প্রভৃতির জন্য তাহার অনেকগুণ কম অর্থ খরচ হয়। জলপথ রুদ্ধ হইল, কিন্তু তাহা খুলিবার জন্য যদি রেলপথ নির্ম্মাণে বিশেষ বাধা হয়, তবে সে জলপথ খোলা বিশেষ সহজসাধ্য হয় না। শিক্ষার অভাবে, এখনও কলেরা উপস্থিত হইলে অজ্ঞ পল্লীবাসীরা ওলাবিবির পূজা দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে চায়, তাহার ফলে কলেরার কাস্তেতে গ্রামবাসীরা মুঠো-মুঠো মারা পড়ে। অনশনে পল্লীবাসীদের দেহ যখন জীর্ণ-শীর্ণ হয়, তখন উপযুক্ত বাসস্থান লাভ করিয়া ম্যালেরিয়ার বিষ সেই সকল দেহে স্থায়ী বাসা বাঁধে। আর কত বলিব?

দেশের দুর্দ্দশা ও তাহার কারণ এক-একটী করিয়া বর্ণনা করিতে গেলে একটী মহাভারত হইতে পারে। ইহার উপর, ভাবিলে প্রাণ যে ভাঙ্গিয়া যায়, মন যে দুঃখের চাপে নীরব হইয়া পড়ে—মুখে একটী কথাও যে সরে না—ইহার উপর, তোমরা দুর্নীতির বীজ চারিদিকে ছড়াইয়া দেশকে মৃত্যুর অভিমুখে, ধ্বংসের অভিমুখে বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর করিতে উদ্যত হইয়াছ! কাঁদিয়া কাঁদিয়া অশ্রুজলে একটা মহাসাগরও প্রস্তুত হয়, তথাপি অশ্রুজল যে থামিতে চাহে না। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের কর্ম্মবীর হেনরি ফোর্ড অর্থে ঢলঢল, গৌরবে ঝলঝল, শিক্ষায় সমুজ্জ্বল স্বদেশের নেতা ও নেত্রীগণের যাঁহারা মদ্যপানের সমর্থন করেন, তাঁহাদের উদ্দেশে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যদি বুঝিতেন যে, তাঁহাদের ঐ মত-সমর্থনের ফলে দেশের কত স্ত্রী-পুরুষের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই উহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেন। আমরাও তাঁহার ঐ উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারি যে, তাঁহারা যদি পল্লীবাসী স্ত্রী-পুরুষের দুর্দ্দশা উপলব্ধি করিতেন; যদি তাঁহারা দেখিতেন ও বুঝিতেন যে পেট ভরিয়া এক বেলাও আহার করিতে না পাইয়া, গায়ে পরিবার উপযুক্ত বস্ত্রের অভাবে, তাঁহাদের দেশের মা, ভাই, ভগ্নী, পুত্রকন্যাদিগের কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহাদের অন্তরে যদি এতটুকু মনুষ্যত্ব থাকে, এতটুকু দয়া-স্নেহ থাকে, তবে তাঁহারা কখনই দুর্নীতিপ্রসারে সহায়তা করিতে উদ্যত হইতেন না। সহরে বসিয়া দেশের দুরবস্থা কল্পনায় সম্যক আনিবার চেষ্টা করা বৃথা।

দেশের হাওয়া যে বদলাইতে সুরু হইয়াছে। দেশের আকাশে দুর্নীতির মেঘ কাটিয়া গিয়া শীঘ্রই সুনীতির ভানু পুনরায় সমুজ্জ্বল আকারে দেখা দিবে, তাহার সুলক্ষণসমূহ চারিদিকেই প্রকাশ পাইতেছে। যাঁহারা

খ্যাতিপ্রতিপত্তি আজ সমগ্র জগত জুড়িয়া, সেই বিশ্ববিশ্রুত পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ যখন ঘোষণা করিয়াছেন যে, সাহিত্যে আর্টের নামে অশ্লীলতা পোষণ করা কিছুতেই সঙ্গত নহে এবং অশ্লীলতা সাহিত্যে কিছুতেই স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না; যখন সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেদিন উপন্যাসপাঠিকা অনেকগুলি তরুণীর নিকট হইতে এই সুমঙ্গলবাণী বহন করিয়া আনিয়া যুবকসমাজে সংবাদপত্রের সাহায্যে broadcast বা বহুবিস্তৃত করিলেন এবং প্রকারান্তরে তাহা সমর্থন করিলেন; সেদিন রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভায় যখন সুপ্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ ঔপন্যাসিক ডাঃ শ্রীনরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত তরুণসমাজকে বলের সহিত উপধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সত্যধর্ম্মকে অবলম্বন করিবার উপদেশ ও অনুরোধ করিলেন, তখনই বুঝিলাম, ভগবান কঠোরকোমল মূর্ত্তিতে দেশবাসীর অন্তরে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তাঁহার শক্তি কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ ইটালির মত একরত্তি দেশ নহে যে, তাহার এক স্থানে অতিবিলাস দুর্নীতি প্রভৃতির কারণে ক্ষত হইলে শীঘ্রই তাহা উহার সর্ব্বাঙ্গে বিসর্পিত হইবে। ভারতের অন্তরে পুরাকালের ঋষিমুনিরা এমন এক ব্রহ্মশক্তি সঞ্চারিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, এদেশ সহজে মৃত্যুমুখে পড়িতে পারে না, মরিতে মরিতেও বাঁচিয়া উঠে—এক স্থানে ক্ষত হইলে দেশের চতুর্দ্দিক হইতে জনমতের মঙ্গল স্রোত আসিয়া তাহাকে বৃদ্ধি পাইতে দেয় না।

ইহা যেন কেহ না মনে করেন যে, আমরা বিলাতী ঢংয়ের দুর্নীতিরই নিন্দা করি, দেশী ঢংয়ের নিন্দা করি না। গুণাগুণ অল্পবিস্তর পৃথক হইলেও বিলাতী হুইস্কিও মদ, আর দেশের ধান্যেশ্বরীও মদ—আমরা দেশের মঙ্গলের জন্য উভয়কেই সাগরপারে নির্ব্বাসিত করিতে প্রস্তুত আছি। সেইরূপ বাহিরের আকারে প্রকারে ন্যূনাধিক পার্থক্য থাকিলেও বিদেশী ঢংয়ের দুর্নীতিও দূর হইতে পরিত্যাজ্য, দেশী ঢংয়ের দুর্নীতিও দূর হইতে পরিত্যাজ্য। সাহিত্যে জোলা প্রভৃতি সাহিত্যিকের realisticএর দোহাই দিয়া প্রচারিত দুর্নীতি যেমন ঘৃণিত, সংস্কৃত সাহিত্যে আদিরসের নামে দুর্নীতিপ্রচারও সেইরূপ ঘৃণিত; উভয়ই একই প্রকার মুদগরপ্রহার পাইবার উপযুক্ত। ইহা তো জানা ঐতিহাসিক সত্য যে, ভারতে আদিরসের আবির্ভাব ও প্রভাব দেশের অবনতির অবস্থাতেই ব্যক্ত হইয়াছিল এবং ঐ আবির্ভাব ও প্রভাবের কারণেই দেশ অতি দ্রুতগতিতে অবনতির পথে নামিয়া চলিয়াছিল; নিজেকে বাঁধিবার জন্য পরাধীনতার পাশ নিজেই রচনা করিয়া দিয়াছিল। আমরা যদি ইতিহাসের অভিজ্ঞতা হইতে কিছুমাত্র শিক্ষা লাভ না করি; যদি আমরা দুর্নীতিপ্রচারে বিরত না হই; ভোগলালসা তৃপ্তির উপায়স্বরূপে কিছু অর্থ নিজের পকেটে আনিবার জন্য যদি আমরা ঘরের কড়ি বিদেশকে দিয়া Paris pictures প্রভৃতি দেশবাসীর হস্তে তুলিয়া দিই এবং ঘরে ঘরে প্রতি গৃহস্থের গৃহাঙ্গনে যক্ষ্মারোগের বিষবীজ প্রোথিত করিবার ব্যবস্থা করি, তবে কি আর বলিব—সে জাতির বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? তেমন জাতির তো মৃত্যুই শ্রেয়। সম্বাদপত্রে দেখিয়াছিলাম যে, যুদ্ধের সময় বিমানযান হইতে জর্ম্মণগণ শত্রুগণের মধ্যে যক্ষ্মাবীজে, টাইফয়েস বীজে ভরা লজেঞ্চুশ ফেলিয়া দিত, যাহাতে শত্রুগণ বংশানুক্রমে কিছুকালের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। যাঁহারা ধর্ম্মে হউক, সাহিত্যে হোক বা সহৎতে হউক, দুর্নীতির বীবীজ বিস্তারে সহায়তা করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহারা কি সত্য সত্যই চান যে, তাঁহাদের ভাই-ভগ্নী, তাঁহাদের পুত্রকন্যা, তাঁহাদের সন্তানসন্ততি বংশানুক্রমে কিছুকালের জন্য অকালে জরাজীর্ণ হইয়া দুঃখদৈন্য পরাধীনতার চাপে নিষ্পিষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পড়িতে থাকিবে? ইহলোকে তাঁহাদের যে কষ্টভোগ করিতে হইবে, তাহা তো তাঁহারা ভোগ করিবেনই; পরলোকে গিয়াও কি তাঁহারা শান্তি পাইতে পারিবেন? কখনই নয়। ভগবানের ধর্ম্মরাজ্যে তাহা কখনই সম্ভব নহে।

এদেশে দুর্নীতিপ্রসারের আর একটী ভীষণ উপায় আবিষ্কৃত ও অবলম্বিত হইয়াছে ও হইতেছে। সেটীর নাম মহিলানৃত্য। ইহার সমর্থক ও প্ররোচকদিগের অনেকে ইহাকে বালিকানৃত্য বলিয়া সমর্থন করিতে উদ্যত হন। অনেকস্থলে বয়স্কা মহিলাদিগের সঙ্গে অল্পবয়স্কা বালিকাদিগের সংমিশ্রণ থাকাতে তাঁহারা ইহাকে বালিকানৃত্য বলিয়া আপনাদের মনকে প্রবোধ দিতে চান—তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই মহিলানৃত্যও ঐ দাসমনোভাবের ফলে বিলাতী ঢংয়ের আমদানী এবং এখানেও ঐ আর্টের দোহাই। ঐ যে বিলাতী সম্বাদপত্রে কথায় কথায় এ-লেখক, ও-লেখক, সে-লেখক মস্ত মস্ত প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় বলেন যে নৃত্যে আর্টের চূড়ান্ত প্রকাশ পায়—ব্যস্, আমরাও অমনি শিক্ষাদীক্ষামত "তা বটেই তো, তা বটেই তো" বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া তাহার পক্ষে মত প্রকাশ করি। অশিক্ষিত জনসাধারণ অমনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিবে আর বলিবে—বাহবা বাহবা অমুলালের কি নূতন কথাই না শুনিতেছি; আমরা আত্মতুষ্টি লাভ করিলাম যে লোকে ভাবিতেছে যে, আমরা কত বড় একটা pioneerগিরি করিতেছি; কিন্তু আমরা মনে মনে জানি যে, আমরা কত ক্ষুদ্র, বিলাতী জিনিসের

'হজ্ম'করণ করা ছাড়া আমাদের আসলে কোন ক্ষমতাই নাই। এই মহিলানৃত্যপ্রবর্ত্তন যে কত বড় অনিষ্টের কারণ হইয়া পড়িয়াছে তাহা একমুখে ব্যক্ত করা যায় না। এতই অনিষ্ট ঘটিয়াছে যে, ইহার সমর্থক ও প্রবর্ত্তক অনেককে এই ভাবের কথা বলিতে শোনা গিয়াছে—ঐ যা! এ কি হোল, আর্টের উদ্দেশ্যে এই মহিলানৃত্যের প্রবর্ত্তন করা হইল, আর এ কি হোল! এইখানেই হইল প্রকৃত নেতৃত্বের অভাব, প্রকৃত দূরদর্শিতার অভাব। নেতাদিগের লক্ষ্য রাখা উচিত যে, ঢিলটা ছুড়িলাম, কোথায় গিয়া পড়িবে—যেন ভাল জিনিষের উপর পড়িয়া তাহা নষ্ট না করে। কিন্তু এমন করিয়া ঢিল ছুড়িলাম যে, তাহার ফলে ভাল জিনিষ নষ্ট হইল। আমাদের মতে সেরূপ ক্ষেত্রে আমার ঢিল ছোড়া পরিত্যাগ করাই উচিত এবং তাহা পরিত্যাগেই আমার প্রকৃত বীরত্ব, প্রকৃত নেতৃত্ব প্রকাশ পাইবে।

বালিকানৃত্য না বলিয়া মহিলানৃত্য বলিবার কারণ এই যে, অধিকাংশ স্থলেই বারো চৌদ্দ বৎসর হইতে কুড়ির ঊর্দ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বয়সের মেয়েদিগকে নৃত্যে নামিতে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। একবার কোন মহিলাবিদ্যালয়ের সংপৃক্ত নীতিবিদ্যালয়ের পারিতোষিক-সভায় আহূত হইয়া উপস্থিত হইলাম। দর্শকদিগকে উক্ত সভায় যে সকল বিষয় দেখানো হইবে, তন্মধ্যে একটী বিষয় ছিল বিলাতী ঢংয়ের বিশেষ একটা নৃত্য। নৃত্য করিলেন দুইটী "বালিকা" অর্থাৎ কুমারী, কিন্তু তাঁহাদের বয়স আঠারো বা কুড়ি বৎসরের কম কিছুতেই নহে। নৃত্য দেখিয়া আমার মাথা তো লজ্জায় অবনত হইয়া গেল। মাতৃজাতির, আমার জননীর স্বজাতির এত বড় অপমান ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই। এমন স্থানে বসিতে বাধ্য হইয়াছিলাম যে, চলিয়া আসিবারও উপায় ছিল না। কাজেই নীরবে সেই অপমান সহিতে লাগিলাম। আমার পশ্চাতে জন-দুই তিন নিমন্ত্রিত দর্শক দাঁড়াইয়া নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যকারিণীদেরও পরিচ্ছদ ও অঙ্গভঙ্গীর সমালোচনা করিতেছিলেন। তাঁহাদের সমালোচনা শুনিয়া প্রাণ হইতে ক্রমাগত এই প্রার্থনা বাহির হইতেছিল—বসুধা দ্বিধা হও, আর আমাকে এ দৃশ্য দেখিতে যেন না হয়, আর এ সমালোচনা যেন শুনিতে না হয়। শুধু সমালোচনার দোষ দিলেই বা চলিবে কেন? সেই মেয়েদের কি পিতামাতা অথবা কোন অভিভাবক বা অভিভাবিকা ছিলেন না? তাঁহারা কোন্ লজ্জায় তাঁহাদিগকে নাচিতে পাঠাইলেন তাহা ভাবিয়া তাঁহাদিগেরই প্রতি ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করে। নীতিবিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরই কি বুদ্ধি-বিবেচনা হইল যে, তাঁহারা এই নৃত্যের অনুষ্ঠান করিলেন? এখানেও ঐ আর্টের দোহাই! [illegible] গুম হইয়া গেলাম কথায় কথায় বিলাতী ঢংয়ে বিলাতী ছাঁদে আর্টের দোহাই শুনিয়া।

এই যে মহিলানৃত্যের নামে শত সহস্র দর্শক জোটে, তোমরা কি ভাব যে, উহাদের সকলেই ঐ নৃত্যের ভিতর আর্টের পরাকাষ্ঠা দেখিবার জন্য গিয়াছেন? সকলেই জানেন যে, তাহা নয়। বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী যে স্কুলের টিফিনের পয়সা বাঁচাইয়া, দুর্ব্বল দেহকে দুর্ব্বলতর করিয়া মহিলানৃত্য দেখিতে ছুটিয়া যায়, তাহার কারণ আর কিছু নয়—নিজেদের অন্তরে অন্তর্নিহিত কামুকতাকে জাগাইয়া তুলিবার ইচ্ছা। আমাদের দেশেও শোনা যায় ও প্রধানত "নাট্য" সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদিতে পড়া যায় যে, নৃত্য প্রচলিত ছিল। ঠিক কথা—ইহা অসম্ভব নয়। কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসরের চর্চ্চা, আলোচনা ও সমালোচনার ফলে এদেশের শীলতা বা সহবত নির্ব্বিচারে স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে জনসাধারণের সমক্ষে ভদ্রমহিলাদের নৃত্য কখনও সমর্থন করে নাই—উহা সাধারণের উপেক্ষিত নটীসম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। কেন? কারণ উহার ফলে চরিত্র স্খলিত হওয়াই শতকরা ৯৯'৯ ভাগ সম্ভব; উহা সমর্থন করিলে সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করা এক-প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এদেশের শীলতা বহুযুগের সাধনার ফল; সহস্র সহস্র বৎসরের পরীক্ষার কষ্টিপাথরে মাজাঘসার ফলে দাঁড়াইয়া গিয়াছে; যে বিলাতী শীলতার বহিশ্চাকচিক্যে এদেশের অপরিণত-বুদ্ধি তরুণসম্প্রদায় মুগ্ধ হইতেছেন, আমাদের জানিয়া মনে রাখা দরকার যে, তাহার পরীক্ষা সবেমাত্র আজ কয়েক শতাব্দী আরম্ভ হইয়াছে। নৃত্যকারিণী এবং দর্শকবৃন্দের অন্তরে কামুকতা-বৃদ্ধি যে অভিভাবকদিগের মহিলানৃত্যে সম্মতিদানের একটী প্রধান কারণ, তাহার একটী বিশেষ প্রমাণ এই যে, নৃত্যপক্ষপাতীদিগের মহলে একটী গুজব চলিত হইয়াছে যে, ইহার ফলে বিবাহ সহজসাধ্য হয়! আর, সেই একই নিশ্বাসে তাঁহারা বলেন যে, তাহাও তো কিছু অন্যায় নহে। এই ভাবের ভিতর অন্তর্নিহিত একটা সমাজবিধ্বংসী ঘৃণ্য ভাব যে লুক্কায়িত আছে, নৃত্যসমর্থকদিগের মধ্যে অনেক জ্ঞানী গুণী লোক থাকিতেও যে তাঁহারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না, ইহাই আশ্চর্য্য।

নৃত্যসমর্থকদিগের অনেকে আবার আস্ফালন করিয়া বলেন যে, পূর্ব্বে সঙ্গীতও সাধারণের অনাদরের ও ঘৃণার বস্তু ছিল; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণ তাঁহাদের পুত্র-কন্যাদিগকে জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধেও সঙ্গীতশিক্ষা দিতে সাহস করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ তাহা জন-সমাজের শান্তি ও মঙ্গলবিধানের অন্যতম উপাদান বলিয়া

গৃহীত হইতে পারিয়াছে ; সেইরূপ তাঁহারাও পথপ্রদর্শক অগ্রণী বা pioneer স্বরূপে নৃত্য প্রবর্ত্তন করিতেছেন, কিন্তু পরিণামে সেই নৃত্য সমাজের মঙ্গলনিদানরূপে গৃহীত হইবে ! কি হাসির কথা ! যাঁহারা এরূপ তুলনা করেন, তাঁহাদের বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া স্তম্ভিত হই ! ব্রহ্মসঙ্গীতের ফলে কামুকতাবৃদ্ধির কোনই সম্ভাবনা ছিল না—তাহার ফলে জনসমাজের মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল আসিবার কোন কথাই ছিল না ; আর নৃত্যের ফলে কামুকতা বৃদ্ধি হওয়া নিতান্তই সম্ভব। ব্রহ্ম-সঙ্গীতের পরিণাম সমাজসংরক্ষণ এবং মহিলানৃত্যের পরিণামফল সমাজ-ধ্বংস।

উপসংহারে, আমার অশ্রুই একমাত্র সম্বল। সেই অশ্রু ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া দিতেছি এবং তাঁহাকে কাতরকণ্ঠে ডাকিয়া বলিতেছি—হে ভগবান ! তুমি না রক্ষা করিলে দেশটা গেল—তুমিই রক্ষা কর, তুমিই রক্ষা কর। আর আমি প্রত্যেক পিতামাতার প্রত্যেক ভাই-ভগ্নীর চরণ ধরিয়া মিনতি করি যে, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতি হইতে নিজ নিজ আত্মীয়স্বজন-দিগকে শৈশব অবধি দূরে রাখিতে অভ্যস্ত করুন। দেশে বীর্য্য আসুক, তেজ আসুক।

তিব্বতী ভাষায় সূর্য্যস্তব।*

(সংগ্রাহক—শ্রীহেরম্বনাথ ভট্টাচার্য্য)

খ্যেন্-কি-ৎছেন-ঠেন্-পা-ৎচাম-পী
জিক্-পা-কুন্-লে-রাব্-তু-ক্যাব্-দ্জো-চিগ্।
জোন্-মে-দে-ছেন্-ঞে-বাক্-জোন্-পা-রী
হলা-মো-উ-সের্-চেন্-লা-ছাক্-ৎছাল-লো।
সোল্-লো-তো-থো-হলা-মো-উ-সের-চেন্
দাগ্-রে-ডয়া-কো-ঙ্-লা-জিন্-লাব্-ৎচোল।
হলা-মো-খ্যো-কি-দাগ্-লা-ক্যাব্-তু-সোল্।
চেন্-সেন্-ছুক্-ঠুগ্-থুক্-থাঙ্-উল্-ফোঙ্-সোক্
ঠাক্-রাঙ্-থোম্-বোই-জিক্-লে-ক্যাব্-তু-সোল্।

অর্থ।

তোমার নাম স্মরণ করিলেই তুমি সমস্ত ভয় হইতে রক্ষা কর। পরম-কল্যাণময়ী পুরঃসঞ্চারিণী কিরণময়ী দেবীকে নমস্কার করি (তিব্বতী ভাষায় সূর্য্য স্ত্রীলিঙ্গ)। নমো নমো জয় জয় কিরণময়ী দেবী ! আশীর্ব্বাদ কর অধমের আশা সফল হোক্। হে দেবী ! অধমকে রক্ষা কর। হিংস্র জন্তু, বিষধর সর্প, বিষ, দারিদ্র্যাদি ও উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে পতনের ভয় হইতে অধমকে রক্ষা কর।

---

* তিব্বতে ভারতীয় ধর্ম্মের প্রভাবের পরিচয় স্বরূপে 'শাকদ্বীপি-ব্রাহ্মণে'—১৩৩৬ ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত হইল। তঃ সঃ

THE BRAHMA SAMAJ
OR
HINDU THEISTIC CHURCH : ITS RISE AND PROGRESS.

[*G. S. Leonard—Late Assistant Secretary to the Asiatic Society of Bengal.*]

CHAPTER I.

The foundation of the Brahma Samaj by Raja Rammohan Roy.

(4)

40. Another extraneous source from which he derived light on the formation of the first principles of his religion.

There was another extraneous source also from which Ram Mohun Roy derived great light on the subject of his inquiry,—the formation of the first principles of his religion. His early initiation in Persian made him acquainted with the sublime and unalterable monotheism of the Semitic races of mankind, whose leading article of faith consists in the doctrine, "God is and without a partner." This he found to agree with the Hindu dogma that "Brahma is one without a second.", which the Vaishnava sect, to which his family belonged, had transposed to, "There in one Vishnu without an equal," and had falsely applied in the concrete to their favorite god, Krishna. He then looked round and found the neighbouring Saktas and Saivas of Bengal upholding similar dogmas, that there was only one Kali or Siva, whom they worshipped in the concrete. Finding thus almost every set and sect of people believing in their particular deity as the one only God of nature, he abstracted the divine Entity from those crude forms, and boldly proclaimed his faith in the formless God who was worshipped under various forms by different people. He plainly stated, in his first unpublished Bengali essay against the image worship of the Hindus, that he quite agreed with them in the adoration of the Being represented with attributes worthy of the divine nature but differed from them in doing homage to hte crude forms of men and women which

they had set up to represent the infinite God who is not limited or circumscribed by time or space, as is plainly declared in their own Sastras or sacred books. He employed the same argument a few years after, when he had fully mastered Arabic, and the doctrine preached in the Koran, in his *Tuhfat-ul-Muahhidín*, or Attack on Muhammadanism, against the circumscribed position which the Koran assigns to God as sitting like an earthly potentate on his throne in the heaven of heavens, with Mahomet sitting by him as his prime minister, and the body of attendant angels waiting upon him for the ministration and execution of his imperial behests. Such attributes though very grand and sublime in the light in which the Semitic races view the Almighty, and exactly corresponding to the exalted notions which the early Aryans entertained of the Most High in their ideal representation of the ethereal Indra, sitting in glory in the synod of the gods, were most unworthy and incompatible with the true nature of God, whose entity viewed in a philosophical light fills all space and time, and whose essence also is co-ordinate with infinity and eternity.

41. The Doctrine of Ram Mohan Roy not a new one, but a revival of the true monotheism inherent in Hindu and mahomedan theology.

This sublime view of divine nature, though quite in accordance with the theories of Vedantic and Sufyistic doctrines, which were highly revered by all spiritual worshippers among Hindus and Muhammadans, brought upon Ram Mohun Roy the united batteries of both parties, whose obstinate tenacity in the belief of concrete forms prevented them from comprehending the abstract nature of the Deity. It may be well asked in this place why was not the inherent and catholic monotheism of the Hindus and Muhammadans, which became evident to Ram Mohun Roy in his boyhood, also made evident to other of his idol worshipping countrymen, who still delight in reverencing images of their own making, and obstinately persist in clinging to their false beliefs in the face of their palpable contradiction in their own sacred writings. The reason of this will be perceived when we reflect upon the natural tendency of mankind in general to the concrete, and their incapacity to comprehend the abstract. Add to this the deep-rooted bigotry and prejudice of the vulgar for their own preconceived notions and beliefs, which, however wrong and erroneous, they will still persist to maintain, notwith-standing every reason shown to the contrary. The doctrine of Ram Mohun Roy, therefore, though nothing new in itself, and claiming no other merit than being a revival and elucidation of the true spirit of theism, inherent to the whole machinery of Hindu and Muhammadan theology, secures still to its reviver the lasting fame of being the first Hindu who reformed it from the perversions of post-Vedic ages, and boldly proclaimed it to the world. The same doctrines and the same truth had for years been taught to Bengali and Muhammadan students in their youth, but not one of them had the understanding to receive them in their true light, or the courage to proclaim them in defiance of prevailing errors of custom. Let us now see in what manner he communicated his convictions to his countrymen.

42. Four methods adopted by Ram Mohan Roy in propagating his doctrine.

Ram Mohun Roy employed four different methods to assail the errors and superstitions of his countrymen :—*viz.*, lectures and remonstrances with his nearest friends and relatives ; the dispensing of public and private education to his pupils and students ; written as well as oral discussions with his opponents ; and lastly preaching his doctrine to the public at large in the *Samáj*, through pundits and Bhattacharyas employed as ministers. His fame and extraordinary talents attracted some of the greatest men of the Hindus at that time, among whom Gopi Mohun Thàkur, Baidyanath Mookerjia, Joykishen Sing, Kasinath Mullick, Brindaban Mitra, son of Ràjà Pitamber Mitra, and grandfather of Dr. Rajendralala Mitra, Gopinath Munshi, Ràjà Kali Sankar Ghosal, Ràjà Badan Chander Roy, and Dwarkanath

and Prasanna Kumar Thâkurs were his constant visitors. His anti-idolatrous preachings, however, gradually estranged many of these rich men, who used to come to consult him on business matters, and profit by his legal advice, with the honorable exception of Dwarkanath Thâkur, Raja Kali Sankar Ghosal, Joykishen Sing and Gopinath Munshi, who remaied steadfast in their attachment to him. Among these friends Joykishen Sing did not long remain, for he seceded on a subsequent oceasion and spread the false report of the practice of killing calves at the private assemblies of the *Samâj*. These desertions, however, had little or no effect upon Ram Mohun Roy, who possessed a spirit not easily daunted, and a firmness and intrepidity not to be shaken by obstacles or oposition, and who boldly maintained the cause of his Maker and of truth by every means in his power.

43. His early activities in the propagation of theism.

Already at the early age of fifteen Ram Mohun Roy had ventured to expose Brahmanism by composing a pamphlet in Bengali, which denounced as false and absurd the doctrines it preached. This attempt was premature, and occasioned his departure from home. The "*Tuhfat-ul-Muahhidín*," written in Persian with an Arabic preface, against polytheism and universal idolatry, and the special doctrine of incarnation and revelation, was published thirteen years after, and was the next step he took in vindicating his religious opinions. The work, however, by which he distinctly made known his sentiments on this vital point, was a "Translation of an Abridgment of the Vedant, or Resolution of all the Veds," which was published in English in 1816. Prior to this Hindustani and Bengali translations of this work had been distributed among the natives free of cost. In the introduction, he states that his object in publishing it was to convince his countrymen of the true meaning of their sacred books, and thereby enable them to "contemplate, with true devotion, the unity and omnipresence of Nature's God," and to prove to Europeans that "the superstitious practices, which deform the Hindu religion, have nothing to do with the pure spirit of its dictates."

44. The Precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness.

This bold declaration of his belief was shortly afterwards followed by a translation into Bengali of the principal chapters of the Vedas, with a view, he says, in the introduction, of "explaining to his countrymen the real spirit of the Hindu Scriptures, which is but the declaration of the unity of God." Many other works succeeded this, all tending to prove the unity of God, and the existence of this truth in the Hindu Sastras. In 1819, after having acquired a knowledge of Hebrew, and carefully studied the Bible, he put forth anonymously his work "The Precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness," which consists of selections principally from the first three Gospels. In the preface to this work, he speaks of the gospels in the following terms: "This simple code of religion and morality is so admirably calculated to elevate men's ideas to high and liberal notions of one God who has equally subjected all living creatures, without distinction of caste, rank or wealth, to change, disappointment, pain and death, and has equally admitted all to be partakers of the bountiful mercies which he has lavished over nature, and is also so well fitted to regulate the conduct of the human race in the discharge of their various duties to God, to themselves, and to society, that I cannot but hope the best effects from its promulgation in the present form." The publication of the above work brought upon the author an attack from the Serampore Missionaries in the *Friend of India*, under the title of "Observations on certain ideas contained in the Introduction to the 'Precepts of Jesus'." Ram Mohun Roy replied under the signature of "A Friend to Truth," in an appeal to the Christian public in defence of his work, wherein he contends that a collection of the precepts only of the Gospel was best adapted to recommend it to the natives of India, two fifths of whom were Musulmans, believers in one God; and he endeavours to show the reasonableness of

the Unitarian doctrine, and that those of the Trinity and Atonement are not consonant with the Scriptures. The discussion, however, did not terminate here. Dr. Marshman in turn replied, which produced a second appeal in Ram Mohun Roy's own name, which is interesting as disclosing what may be regarded as his confession of faith which is as follows: "That the Omnipotent God, who is the only proper object of religious veneration, is one and undivided in person; that in reliance on numerous promises found in the sacred writings we ought to entertain every hope of enjoying the blessings of pardon from the Merciful Father, through repentance, which is declared the only means of procuring forgiveness for our failures; and that he leads, such as worship him in spirit, to righteous couduct, and ultimately to salvation through his guiding influence, which is called the Holy Spirit, given as the consequence of their sincere prayer and supplication."

45. The great object of his life.

It would be out of place here to mention the many works he put forth from time to time, inculcating not only this religious belief, but advocating also educational social and political reforms, all calculated to ameliorate the condition of the people of India. He courted opportunities for dispute with all comers, and the persevering zeal with which he laboured and tho expense he incurred, in the advancement of his cause, could not but be ultimately rewarded with success. Mr. Arnot states "the great object of his life was to establish a new sect in his native country, the basis of whose creed was to be the unity of God."

46. His earnest wish to estaplish a common place of worshipping One True God.

Let us now consider the preliminary steps which this zealous patriot took, the many difficulties and disapponintments he had incessantly to encounter, and the numerous obstacles and impediments he had to surmount, for the formation of a *Samáj* or body of *Bráhmas* or spiritual worshippers of the One True God, and the establishment of a public place of worship in the metrepolis of India, where it was his most earnest wish to see the various nations, who congregate in this great emporium of commerce, join one day in doing homage to their common Father at one alter. He lived to lay the foundation, but did not live to witness the consummation, of his object. He left the solemn charge to his friends and disciples, and like a second Solon or Lycurgus departed to return no more.

47. Atmya Sabha established in 1815.

The first step he took towards the advancement of his object, the year after he settled in Calcutta, was the establishment of the Atmiya Sabha or "Friendly Society", in 1815, at his own garden house at Maniktolah. For the next two years it was removed to Ram Mohun Roy's house at Simla* and Shashtitolah, but in the following year was again set up in Maniktotah. The service was conducted one evening in the week, with recitations of the Vedas, accompanied with hymns (as done at Banaras), the practice of explaining the text not being in vogue at that time.

48. The meetings of the Atmya Sabha.

Siva Prasad Misra was the first reciter, and Govinda Mala the first chanter. Dwrakanath Thakur attended service now and then, but Braja Mohun Majumder and some others were constant worshippers, and were the first to openly embrace the faith, in consequence of which they were reviled and accused of being libertines and atheists. The meetings of this Society continued to be held at Ram Mohun Roy's house until ho was prevented from being present in person, by some vexatious lawsuits which bad been instituted against him. In consequence of this, the meetings were sometimes held at the house of Brindaban Mitra, at Rájà Kali Sankar Ghosal's in the suburbs, and at Beharilal Chaubey's at Tula Bazar, till 1819. In this year a meeting was called at the last mentioned place composed of the richest and most

* Situated, N. E. Corner of Calcutta.

learned natives of the age, headed by Raja Radha Kant Dev on one side and Ram Mohun Roy on the other for the purpose of religious discussion. The most important objection raised was by Subrahmanya Sastri, who deprecated the recital of the Vedas, on account of the absence of pure Brahmans in Bengal. A sullen silence ensued in the assembly, and no one present stood up to contradict the thesis. Ram Mohun at last rose, and, after an animated discussion, completely controverted the opinion of his opponent. At this time the meetings of the above Society were discontinued for two years, owings to the aforesaid civil suit which had been instituted against Ram Mohun Roy by his nephew.

49. Civil Suits instituted against him by the Raja of Burdwan.

Soon after the dismissal of this case, the Maharaja of Burdwan, Tejchand, the father by adoption of the present Maharaja, who had been inimical to Ram Mohun's father, became so incensed at his openly declared heresy, that he instituted a civil suit against him in the Provincial Court of Calcutta, in 1823, for a large balance due from Ram Mohun's father, on an instalment bond, with a view no doubt to harass and annoy him. His defence on this occasion was, that inheriting no portion of his father's property he was not responsible for his debts.

প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পত্র।*

(কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি-এ)

(২)

ষষ্ঠ পত্র

বেলেতা, মাল্‌তা, ৩রা এপ্রেল ১৮৪২

আমি মারী ভয়ের শঙ্কা হইতে মুক্তি পাইয়া যে যে কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা এইক্ষণে আপনাকে লিখিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে প্রথম দিবসে আমরা মান্নুয়েল নামক স্থানে যাত্রা করিলাম। এক সেতু দ্বারা মহাদ্বীপের সহিত তৎস্থানের সংযোগ আছে। আমরা সেই সেতুর উপর দিয়া গমনপূর্ব্বক বেলেতার আগমন কালীন তদ্দেশকে মনোহররূপে দৃষ্টি করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত লার্ড আকলেণ্ড এক অনুরোধ-পত্র প্রদান করাতে তত্রস্থ শাসনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত সার এইচ্ বৌবেরি সাহেব আমাকে অতিশয় সমাদরের সহিত আহ্বানপূর্ব্বক সুদৃশ্য সমুদয় বিষয় প্রদর্শন করিলেন। এ স্থান যদিও ক্ষুদ্র, কিন্তু নানা প্রকার সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। নাইট এবং গ্রাণ্ড মাষ্টারদিগের গৃহ ও ধর্ম্মালয় সকল চিত্র, অস্ত্রাগার, চিত্রিত বস্ত্র, চিত্রিত এবং খোদিত শুক্তি-প্রস্তরাদি ও অন্য অন্য বিবিধ মনোরম দ্রব্যের সহিত আমার অন্তঃকরণকে অত্যন্ত আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে অধিককাল এদেশে অবস্থান করিয়া পরিতুষ্ট হইতে পারিলাম না। আমি প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ গমন করি এবং প্রত্যেক বারের ভ্রমণে নূতন বিষয়ের প্রশংসা করিতে হয়। যখন এই ক্ষুদ্র স্থান আমার চিত্তকে এ প্রকার আকৃষ্ট করিলেক, তখন বোধ করি যে মহাদ্বীপের যাহা দর্শন যোগ্য, সময়ের অল্পতাবশতঃ তাহার অত্যল্প দৃষ্টি করিতে পারিব। সেণ্ট জানের গির্জ্জাসন্দর্শনে কাথলিক ধর্ম্মালয়ের গৌরব ও মহত্ত্বের কিঞ্চিদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা নাইটদিগের কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে; এবং স্বর্ণ, রজত পাষাণের অলঙ্কার, চিত্র, অধিক মূল্যবান প্রস্তর, এবং চিত্রিত ও খোদিত শুক্তি-প্রস্তরাদিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এবম্প্রকারে শোভিত অট্টালিকা-রচনায় অবশ্যই অনেক ধন ব্যয় হইয়া থাকিবেক। ইহার সমষ্টিদর্শন অতিশয় গুরুতর এবং কুহকতুল্য, কিন্তু আমি তদ্বর্ণনা করিতে সাহস করি না; যেহেতু ইহার সৌন্দর্য্য আমার ভাবনার অতীত; এবং সকলে কহে যে এতদ্গৃহ এরূপ সুন্দর হইলেও রুমনগরস্থ সেণ্টপিটরের গির্জ্জার তুল্য নহে। সেস্থান যে কি অদ্ভুত বিষয় তাহা আমি এইক্ষণে চিন্তাতেও আবাহন করিতে পারি না; যেহেতু তাহার অপেক্ষা ইতর যে সেণ্টপিটরের গির্জ্জা, তদ্দর্শনে গত দিবসের অধিকভাগ যাপন করিয়াছি, তথাপি প্রচুররূপে দৃষ্টি করিতে অশক্ত হইয়াছি, এবং তজ্জন্য অদ্য পুনর্ব্বার ভ্রমণ করিতে বাসনা করিতেছি। আমরা ভারতবর্ষস্থ ঠাকুর বাটীর ব্যয় এবং সৌন্দর্য্য বিষয়ে সর্ব্বদা কথোপকথন করি, যবনেরা তাহারদিগের মসজিদের অতি গৌরব করে, এবং আপনারা গির্জ্জার অতি আদর করেন; কিন্তু এইক্ষণে আমি জানিলাম যে, তাহারা ক্ষণকালের নিমিত্তেও কাথলিক ধর্ম্মালয়ের সহিত তুল্য হইতে পারে না।

* ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে, ৯ই জানুয়ারি, রবিবার, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথমবার বিলাতযাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি নানাস্থান হইতে যে ৯ খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, "বিদ্যাদর্শন"-সম্পাদক প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশয় তাহা ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা-ভাষায় অনুবাদ করিয়া নিজ পত্রে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। তৎকালে (৮৮ বৎসর পূর্ব্বে) বাঙ্গালা-ভাষার গঠন ও অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা পত্রগুলি পাঠ করিলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। পত্রগুলি অবিকল উদ্ধৃত হইল।—লেখক

গত রাত্রি আমি নাটক-দর্শনে গিয়াছিলাম। আমার প্রতি ইহা আর এক নূতন বিষয়, এবং আমি নাট্য-মন্দিরের প্রকাশ্য শোভায় অতি পরিতুষ্ট হইয়াছিলাম। তত্রস্থ আসন পঞ্চ শ্রেণীতে সজ্জীভূত হইয়া উপর্য্যুপরি ভাগে অবস্থিতি করিতেছে; কেবল দুঃখের বিষয় এই যে আমারদিগের দেশে উষ্ণ হয় প্রযুক্ত এরূপ আসন-বিন্যাস সম্ভবে না। আমি গতকল্য অতি আহ্লাদের সহিত কুইন নামক জাহাজ এবং তাহার এড্‌মিরাল অর্থাৎ পোতাধ্যক্ষের আগমন দর্শন করিলাম। ইংরাজ পোত-দলের মধ্যে এই জাহাজ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, অতি সুদৃশ্য এবং ১২০ কামান ধারণ করে। আমি তাহা দর্শন করিতে এবং তদ্দ্বারা আনন্দ প্রাপ্ত হইতে কল্য গমন করিব।

সপ্তম পত্র

মাল্‌টা, ৮ এপ্রেল ১৮৪২

আমি কুইন নামক জাহাজ এবং তাহার পোতাধ্যক্ষ আমার প্রাচীন বন্ধু স্যার এডোয়ার্ড ওয়েন সাহেব ও তাঁহার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক অতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, এবং শ্রেষ্ঠতম মানেয়ারে যাহা দৃশ্য পবর্ণরের সঙ্গ বশতঃ তাহা উত্তমরূপে সন্দর্শন করিয়াছিলাম। এস্থলে কেবল লার্ড, ডিউক, ব্যারোনেট প্রভৃতি জাহাজি এবং যোদ্ধৃকর্ম্মচারী দৃষ্ট হয়, তাহারা বিদেশীয় ব্যক্তিগণের প্রতি অতিশয় দয়া এবং সুশীলতা ব্যবহার করে। সুস্থতার জন্য অনেক ইংরাজ এ স্থলে সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন, ফলতঃ এই দেশ ইউরোপীয় লোকের প্রতি উত্তমাশা অন্তরীপের ন্যায় সুখসেব্য। কুইন জাহাজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাণ্ডতর, অতএব বোধ করি যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে আর অন্য জাহাজের দর্শন প্রয়োজন হইবে না। আমি গত পত্রে মেং ক্রেয়র সাহেবের সহিত পরিচয়ের প্রসঙ্গ লিখিয়াছিলাম। আমি তাঁহার দ্বারা অতিশয় আদৃত হইয়াছি, এবং তাঁহার গ্রাম্য গৃহ দৃষ্টিপূর্ব্বক অতি আনন্দিত হইয়াছি, যে স্থলে তাঁহার এক উৎকৃষ্ট উদ্যান আছে, এবং সেই উদ্যান এক ক্ষুদ্র গিরির উপরে স্থাপন পূর্ব্বক ক্রমোত্থিত পথ দ্বারা শৃঙ্গোপরি পর্য্যন্ত উত্থাপিত হইয়াছে। সেই শৃঙ্গোপরে দণ্ডায়মান হইলে নগর এবং দেশ অতিশয় সুদৃশ্য হয়। অপরন্তু আমি অস্ত্রাগার এবং জাহাজাদি নির্ম্মাণালয় অবলোকন পূর্ব্বক তত্রস্থ প্রত্যেক বস্তুর শৃঙ্খলা এবং বিন্যাস দেখিয়া প্রফুল্ল হইয়াছিলাম। আমি প্রার্থনা করি যে আমারদিগের বন্ধু রোস্তমজি এস্থলে উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিবেন। আমি জ্ঞাত হইলাম যে ইংলণ্ডস্থ এবং তত্রস্থ জাহাজ-নির্ম্মাণালয় একরূপ; তবে কিনা ইংলণ্ডের উক্ত কর্ম্মালয় সকল অধিক প্রশস্ত। অদ্য প্রাতঃকালে আমি ইন্‌ফ্যাণ্ট স্কুল অর্থাৎ শিশুশিক্ষার্থ পাঠশালায় গমন পূর্ব্বক অতি বিস্ময়াপন্ন হইলাম; কেবল ছয়মাস হইল ইহার সংস্থাপন হইয়াছে, ইতিমধ্যেই শিশুগণ আশ্চর্য্য উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং এ প্রকার সুন্দররূপে ইহার কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়, যে পাঠশালাকে কোন বিষয়ের প্রতিবন্ধক জ্ঞান না করিয়া শিশুগণ সর্ব্বদাই তত্র অবস্থানেচ্ছু হয়। আমি গত দিবস সিভাবিচিয়া নগর দর্শন করিয়াছিলাম, যাহা ফিনিসিয়ানদিগের অধিক কালের এই উপদ্বীপের রাজধানী ছিল। এই নগর এখান হইতে ছয় ক্রোশ। যদবধি নাইটেরা ইহার অধিকারী হইয়াছে, তদবধি তাহারা এ স্থানে এক মনোহর গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়াছে, যাহাতে কিয়দ্ ঘণ্টা অতি আনন্দের সহিত যাপন হইতে পারে। এই গির্জ্জা সেণ্টপালের নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং ইহার চিত্র ও অলঙ্কারসকল তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত বিশেষতঃ প্রকাশ করে, কিন্তু ইহা সেণ্টজানের তুল্য গুরুতর নহে। অধিকন্তু এ স্থানে কাথলিক যাজকের বিদ্যালয়, গোরস্থান এবং সেণ্টপালের গহ্বর আছে। নগর অত্যন্ত সুদৃশ্য এবং উপদ্বীপের উচ্চতর ভাগে সংস্থাপিত রহিয়াছে। আকাশ এবম্প্রকার পরিষ্কৃত ও সুন্দর যে সিসিলী উপদ্বীপ হইতে এটনা পর্ব্বত পঞ্চাশৎ ক্রোশ দূরস্থ হইলেও আমরা এখান হইতে দেখিতে পারি। দুইএক দিবসের মধ্যে আমি এদেশ হইতে প্রস্থান করিব; কিন্তু আমি এস্থলে এরূপ সুখ এবং হর্ষ পূর্ব্বক কালযাপন করিয়াছি এবং প্রত্যেক মনুষ্য দ্বারা এরূপ আদরাপন্ন হইয়াছি, যে এ স্থানের পরিত্যাগের চিন্তা করিতেও আমি বিষণ্ণ হই।

অষ্টম পত্র

নেপল্‌স্, ২০ এপ্রেল ১৮৪২

সিসিলী এবং তত্রস্থ এটনা পর্ব্বত, মসীনা নামক সুন্দর নগর, ইউলিয়ান উপদ্বীপ ও স্ট্রম্বোলি অনলাধার পর্ব্বত সন্দর্শন করিয়া অনন্তর এই আশ্চর্য্য নগরে উত্তীর্ণ হইয়াছি। এস্থলে আমি নগরের সৌন্দর্য্য এবং পম্পিয়াই নগরের ভগ্ন দ্রব্য দর্শনে অতি ব্যস্ত আছি। পর্ব্বতশৃঙ্গের শোভা, প্রাসাদ, নির্ঝর, গির্জ্জা, আশ্চর্য্য দ্রব্যালয়, প্রতিমা, চিত্র, পুস্তকালয়, সামান্য গৃহ, চিকিৎসালয়, উদ্যান, ধর্ম্মশালা প্রভৃতি এরূপ বহু বিষয় আমার সময় অধিকার করিয়াছে, যে আমি তাহারদিগের প্রতি কেবল দৃকপাত করিতে শক্ত হইয়াছি। আমি ইউরোপস্থ যে সমুদয় নগর দেখিয়াছি, তন্মধ্যে নেপল্‌স্ শ্রেষ্ঠতম। সকলে কহে যে এরূপ অনেকধা উত্তম বিষয় মহাদ্বীপের অন্য কোন স্থলে একত্র দৃষ্ট হইতে পারে না। এদেশ মাধুর্য্য এবং প্রফুল্লতাজনক—শীতোষ্ণের পরিমাণ ৬৫ অংশ; এবং তত্রস্থ হোটেল এরূপ উৎকৃষ্টরূপে সজ্জীভূত যে তাহার

তুলনায় কলিকাতার সর্ব্বধনসজ্জা গণ্য হইতে পারে না। লোকের জনতা বিষয়ে আমি এইমাত্র বলি যে দিবারাত্রি শত শত শকট গমনাগমন করিতেছে। প্রধান প্রধান গলি কলিকাতার রাজপথ অপেক্ষা তিন গুণ প্রশস্ত, তথা ধূলীমাত্র নাই। যেহেতু তাহারা সানবদ্ধ এবং পদগ পথিকদিগের নিমিত্তে রাজপথের উভয় পার্শ্বে অন্য সানবদ্ধ পথ আছে। প্রায় সকল বিক্রয়শালা গ্যাসের আলোকে দীপ্তিমান হয়; সন্ধ্যাকালে কি শোভা হয়। কতিপয় খাওয়া বিক্রয় শালা এরূপ সজ্জীকৃত এবং আলোক-বিশিষ্ট হয় যে আমি তথায় আর একদিন সন্ধ্যার সময় যাপন করিয়াছিলাম। ইউরোপের সকল নাট্য-শালা অপেক্ষা সানকার্লো বৃহত্তর। তাহার গৃহরচনা এবং অন্য অন্য অন্তর্ব্বর্ত্তী ব্যাপার বর্ণনা করণের প্রয়োজন নাই। গানবাদ্য এবাশীশব্যালেট (এক প্রকার নৃত্য) এবং তৎসমভিব্যাপারে শত শত সুন্দরী রমণী এবং সুন্দর তরুণ মনুষ্য বিদেশীয় ব্যক্তিকে অনায়াসে প্রমত্ত করিতে পারে, ইহা সন্দর্শন করিয়া কলিকাতার নাটক-শালার নিকট বিদায় লইলাম। আমি এস্থলে এক রইল রোড ও বাষ্পীয় শকট দেখিলাম। যখন তাহা আমার নিকট দিয়া ধাবমান হয়, তখন আমার মনের ভাব কি প্রকার হইয়াছিল তাহা ভাবনা করুন। আমি কল্য রুম নগরে যাত্রা করিব। এই আমি যে চতুরশ্বযুক্ত আপন শকটে ভ্রমণ করি, যাহার অশ্বপথও ক্রোশান্তে পরিবর্ত্ত হয়, তাহাতে কল্য ২৩ তারিখে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তৎস্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারিব; আমরা দিবসের কিয়ংকাল ভ্রমণ পূর্ব্বক রজনীতে বিশ্রাম করি।

নবম পত্র

রোম নগর, ২৬ এপ্রেল ১৮৪২

দুইদিন পথ পর্য্যটনের পরে আমরা বর্ত্তমান বাসের ত্রিংশ দিবসে এ স্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছি। আমরা শকটা-রোহণে একদিন ৩৫।৷০ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম, অথচ কিঞ্চিন্মাত্র শ্রান্তি হয় নাই; আমার সুস্থতা কিরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে ইহাতেই আপনি বিবেচনা করুন, যেহেতু আমি ভারতবর্ষের মধ্যে বিনা ক্লেশে চাপক পর্য্যন্ত গমন করিতে শক্ত হইতাম না। যে দেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী পথ দ্বারা আমরা আগমন করিয়াছি, তাহার ভূমি অতিশয় ফলবতী, এবং সুন্দররূপে তাহার কর্ষণ হইয়া থাকে; বস্তুতঃ গমনকালীন বোধ হইয়াছিল যে আমরা কোন উৎকৃষ্ট উদ্যানে ধাবমান হইতেছি। সমুদয় পথ অতি উত্তম, প্রশস্ত, কঠিন এবং চৌকষ এবং সেই পথ পাতুক (?) স্থানের মধ্য দিয়া এবং পর্ব্বত আরোহণ ও বেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করাতে চতুর্দ্দিকে বস্তুশোভা অতি মনোহর এবং গৌরবান্বিত; বিশেষতঃ এরূপ উচ্চস্থানে শকটারোহণ আমার পক্ষে এক নূতন ব্যাপার জ্ঞান হইল। আমি নিম্নভাগে দৃষ্টি করিয়া মধ্যে মধ্যে দুর্ব্বল এবং বিহ্বল হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার শকট এরূপ অনা-য়াসে ধাবিত হইতে লাগিল যে চৌরঙ্গী এবং গঙ্গাতীরস্থ পথ অপেক্ষাও এই বর্ত্ম সহজতর বোধ হইল। এই স্থানের বিষয় আমি কিঞ্চিন্মাত্র বলিতে পারি না, যেহেতু দর্শন ব্যতীত ইহার প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না, বর্ণনা ইহার প্রকৃত ভাব প্রকাশ করিতে পারে না, প্রত্যেক বস্তু বৃহৎ পরিমাণে স্থাপিত আছে। মালতা নগরস্থ সেন্টজানের গির্জ্জা এবং নেপল্‌স নগরের অন্য অন্য দেবালয় এ স্থলের সেন্টপিটরের গির্জ্জার তুলনায় অতি নীচতা প্রাপ্ত হয়। সেন্টপিটর গির্জ্জার আকৃতি অপর কথিত দেবালয়গণের বিংশতি গুণ এবং তাহার শোভা ও সজ্জা উক্ত পরিমাণে শ্রেষ্ঠতর। এক ব্যক্তি প্রতিদিন তাহাতে নূতন নূতন প্রশংসাযোগ্য মনোহর ব্যাপার দর্শন করিতে শক্ত হয়। আশ্চর্য্য দেবালয়, পুস্তকালয়, প্রাসাদ, প্রতিমা, চিত্র, ভগ্নদ্রব্য ধ্বংস প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তু এইরূপ প্রশস্ত এবং রোমনগর সৌন্দর্য্য ও গুরুতা বিষয়ে অদ্যাপি অতুল্য রহিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। তত্রস্থ বাতস্বভাব অতি সুখজনক, আকাশ পরিষ্কৃত এবং যে প্রকার শীতল তাহাতে ব্যজন আবশ্যক হয় না। আমরা সন্ধ্যাকালে উক্ত স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক বায়ুসেবন করি। এদেশ পীড়িত ব্যক্তির স্বাতব্য যেহেতু অধিক শীতল বা অধিক উষ্ণ নহে। আমি এইক্ষণে নিশ্চয়রূপে জানিতেছি যে এরূপ অপেক্ষা আর অধিকতর সুন্দর বস্তু আমার দৃষ্টি হইবে না। আমি প্রধান প্রধান বিষয় সংক্ষেপে লিখিতেছি, যখন আমারদিগের পরস্পর সাক্ষাৎ হইবে, তখন তাহা আহ্লাদের সহিত পাঠ করিব; কিন্তু স্বভাবের সহিত তুলনা করিলে, সে বর্ণনা অতি ক্ষুদ্র হইবে। আমি গত দিবসে আমারদিগের গমস্তা প্রিন্স টর্লোনিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, তাহার বার্ষিক আয় ৯৫০০০০৲ টাকা এবং দপ্তরখানা এক উত্তম অট্টালিকায় স্থাপিত আছে যাহা পাষাণের মূর্ত্তি এবং চিত্রাদির সজ্জাদিতে ভূষিত রহিয়াছে। আমরা যে কোন ভাস্কর বা অন্যান্য শিল্পকারীর নিকট গিয়াছিলাম সেই ব্যক্তিকেই টর্লোনিয়ার কোন দ্রব্য না কোন দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে দেখিলাম। তিনি আপনার নগর বা গ্রামস্থ গৃহের নিমিত্তে প্রচুর ধন ব্যয় করেন, কিন্তু বেলা ১০ ঘণ্টাবধি ২ প্রহর ৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত রহেন, এবং তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি শীলতা ও বন্ধু ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিনি, এবং তাঁহার অংশিগণ আমারদিগের নিকট আগমন পূর্ব্বক অনেক দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যদি মনুষ্যের ধন

থাকে তবে চিত্র-প্রতিমাদি শিল্পবিষয়ে তাহার ব্যয় করিবার উপযুক্ত স্থান এইদেশ। যদিও তৎসমুদয় ক্রয় করিতে আমার দৃঢ় অভিলাষ আছে, কিন্তু পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক এইক্ষণে তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। আমি অদ্য বৈকালে পোপের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তাঁহার আকৃতি অতি সুন্দর এবং ভক্তিজনক, তিনি অত্যন্ত আদরের সহিত আমাদিগকে আহ্বান করিলেন এবং আহ্লাদিত হইলেন যে তাঁহার প্রভুত্বকালীন ভারতবর্ষীয় লোক এই প্রথমবার রোমনগর সন্দর্শন করিল। তিনি আপন অট্টালিকার পুস্তকালয়ে আমারদিগকে গ্রহণ করিলেন, তাহার এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত কদাচ দৃষ্টি বিস্তার হয়, এবং তাহা পুস্তক ও হস্তলিপিতে পরিপূর্ণ আছে। এই অট্টালিকা দ্বাদশ সহস্র কুঠরীতে বিভক্ত এবং প্রাচীন শিল্পকারিদিগের নির্ম্মিত চিত্র এবং প্রতিমাতে পূর্ণ রহিয়াছে। * †

উৎসবানন্দ-রামমোহন রায়-সংবাদ।

(৩)

(ডাঃ ভি, রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

অপরে কেবলা দ্বৈতিনো হি ব্রহ্মাদিতৃণান্তস্য জগতঃ প্রাতীতিক-সত্তাকত্বং ব্রুবন্তো ভগবদ্বিগ্রহাদীনাং চিচ্ছক্তি-বৃত্তিবিশেষাণাং—নৈতদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ ইত্যাদিনা সর্ব্বেন্দ্রিয়-দেবাবিষয়ত্বেন মুক্তগম্যত্বেন চ স্বয়ংপ্রকাশমানানাং দৃশ্যত্বকল্পনয়া মিথ্যাত্বং প্রতিপাদয়ন্তো—জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাং। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥ ইতি। যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে। কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা॥ সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা চান্ধ্যজড়মূকতা। যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন চিন্তয়েৎ॥ অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো-জনাঃ॥ ইত্যাদিপ্রমাণসংঘাতাৎ বহির্মুখানামাত্মঘাতিত্বাদি-স্মরণেনৈব শোচ্যা ইব বৃথৈব বর্ত্তন্তে; তজ্জ্ঞানাদেরপি ভক্তিব্যতিরেকেণ সিদ্ধ্যভাবাৎ তদনুষ্ঠিতস্বধর্ম্মাদেঃ সুতরাং প্রমাত্বং, তদর্থকানি প্রমাণানি বহূনি সন্তি। শ্রীগুরুপরমেশ্বরভক্ত্যৈব উপনিষদর্থঃ প্রকাশতে চেতি শ্রূয়তে—যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরাবিত্যাদি, বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিত ইত্যাদি, অনন্যপ্রোক্তা গতিরত্র নাস্তি, আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ, নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, অন্যেন প্রোক্তা সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ ইত্যাদি-শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিভ্যো গুরুকারুণ্য-রহিতানাং কেবল-বেদানুগতিমাত্রেণ তত্ত্বজ্ঞানাদেরসৌলভ্যত্ব-কথনাৎ তে তু কেবলং নির্বিশেষেঽশেষে পরে ব্রহ্মণি লয় এব পরম-পুরুষার্থ ইতি মন্যমানা নিত্যপ্রকটিত-চিচ্ছক্তিবিলাসস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সা পরানুরক্তিরীশ্বরে ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি শ্রুতিসূত্রাভ্যাং লক্ষিতমপি তদ্ভজনমজানন্তঃ ভ্রংশিত-পুরুষার্থঃ পণ্ডিতম্মন্যা মায়িকজীবান্ বিবোধয়িষবো হি সমুৎসহন্তে। তাংশ্চোপহস্য কিঞ্চিৎ কেনচিদ্ভগবদনুরাগিণা গীতং পঠতি যথা—বরং বৃন্দাবনে শূন্যে শৃগালত্বং স ইচ্ছতি। ন তু নির্বিষয়ং মোক্ষং মন্তুমর্হতি গৌতম॥ ইতি। স চ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যনির্ণীত-প্রমেয়াণ্যেব সর্ব্বাণ্যুপদিশতি, শুষ্ক-তর্ককর্ম্মাত্মজ্ঞানিনশ্চানাদৃত্য শ্রুতিভিস্তদনুগতযুক্ত্যা চ ভগবতঃ পারতম্যং, সর্ব্ববেদগম্যত্বং, জগৎসত্যত্বং, জীবভেদং, জীবানাং হরিদাসত্বং, বিষ্ণ্বংঘ্রিলাভো মোক্ষঃ, আত্যন্তিকী ভক্তিরেব তৎসাধনমিতি চ প্রতিপাদয়তি। তস্য পরতমত্বং শ্রীগোপালোপনিষদি—কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েদিতি, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি—জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জ্জন্মমৃত্যুপহানিঃ। অথ তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহ-ভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলম্ আপ্তকামঃ, এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্য-মেবাত্মসংস্থং নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ। গীতাসু—মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়॥ ইতি। হেতুত্বা-দ্বিভুচৈতন্যানন্দত্বাদি-গুণাশ্রয়াৎ, নিত্যলক্ষ্ম্যাদিমত্ত্বাচ্চ কৃষ্ণঃ পরতমো মতঃ। হেতুত্বং যথাহুঃ শ্বেতাশ্বতরাঃ—একঃ স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিঃ স্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ। যশ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ পাচ্যাংশ্চ সর্ব্বান্ পরিণাময়েদ্ য ইতি। বিভুচৈতন্যানন্দত্বং যথা কাঠকে—মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ইতি। বিজ্ঞান-সুখরূপত্বমাত্মশব্দেন কথ্যতে। অনেন মুক্তগম্যত্ব-ব্যুৎপত্তে-রিতি তদ্বিদঃ॥ বাজসনেয়িনশ্চাহুঃ—বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি। গোপালোপনিষদি চ—তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম্ ইতি। মূর্ত্তত্বং প্রতিপত্তব্যং চিৎসুখ-স্যৈব রাগবৎ। বিজ্ঞানঘনশব্দাদ্ধি কীর্ত্তনাচ্চাপি তস্য তৎ॥ দেহদেহিভিদা নাস্ত্যত্রেতৈনেবোপদর্শিতং। মূর্ত্তস্যৈব বিভুত্বং যথা মাণ্ডুকে—বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বমিতি। হ্যস্থোঽপি নিখিলব্যাপী আখ্যানামূর্ত্তিমান্বিভুঃ। যুগপদ্ধ্যাতৃবৃন্দেষু সাক্ষাৎকারাচ্চ তাদৃশঃ॥ শ্রীদশমে চ—ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরং। পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ॥ তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজং। গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥ ইতি। গীতাসু চ—যথা ততমিদং সর্ব্বং

* "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের" প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীরামকমল সিংহ, এসিষ্টাণ্ট লাইব্রেরিয়ান শ্রীশশীপ্রসেবক নন্দী ও তদীয় সহকারী শ্রীঅনাদিভূষণ দাস মহাশয় উক্ত "বিদ্যাদর্শন" কাগজখানি আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এই হেতু আমি তাঁহাদিগের নিকটে চির-কৃতজ্ঞ রহিলাম।—লেখক

† 'প্রবর্ত্তক' আষাঢ় ১৩৩৭ হইতে উদ্ধৃত।

জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং॥ অচিন্ত্যা শক্তিরস্তীশে যোগশব্দেন চোচ্যতে। বিরোধভঞ্জিকা সা স্যাদিতি তত্ত্ববিদাং মতং॥ আদিনা সার্ব্বজ্ঞং মাণ্ডুকে যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদিতি, আনন্দিত্বঞ্চ তৈত্তিরীয়কে—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। ন চিন্ময়ং ধর্ম্মিণো ধর্ম্মভেদভানং। বিশেষতঃ, যস্মাৎ কালঃ সর্ব্বদাস্তীত্যাদিধীর্বিদুষামপি। এবমুক্তং নারদপঞ্চরাত্রে—নির্দ্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মক-শরীরগুণৈশ্চ হীনঃ আনন্দমাত্রঃ করপাদমুখোদরাদি-সর্ব্বত্র স্বগতভেদবিবর্জ্জিতাত্মা ইতি। নিত্যলক্ষ্মীকত্বং বিষ্ণুপুরাণে—নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী। যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম॥ ইতি। বিষ্ণোস্তু শক্তয়স্তিস্রস্তাসু যা কীর্ত্তিতা পরা। সৈব শ্রীস্তদভিন্নেতি প্রাহ শিষ্যান্ প্রভুর্মহান্॥ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি—পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ, প্রধানঃ ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশ ইতি চ। বিষ্ণুপুরাণে চ—বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাঽপরা। অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে। পরৈব বিষ্ণ্বভিন্না শ্রীরিত্যুক্তং। তত্রৈব—কলাকাষ্ঠানিমেষাদি কালসূত্রস্য গোচরে। যস্য শক্তিন শুদ্ধস্য প্রসীদতু স নো হরিরিতি॥ অখিলাম্নায়বেদ্যত্বং গোপালোপনিষদি—যোঽসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈর্গীয়তে ইতি, কাঠকে—সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। হরিবংশে চ—বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে। সাক্ষাৎ-পরম্পরাভ্যাঞ্চ বেদা গায়ন্তি মাধবং। সর্ব্বে বেদান্তাঃ কিল সাক্ষাদপরে তেভ্যঃ পরম্পরয়া। কচিৎ কচিদবাচ্যত্বং যদ্বেদেষু বিলোক্যতে। কাৎস্ন্যেন বাচ্যং ন ভবেদিতি স্যাৎ তত্র সঙ্গতিঃ। অন্যথা তু তদারম্ভো ব্যর্থঃ স্যাদিতি মে মতিঃ॥ শব্দপ্রবৃত্তিহেতূনাং জাত্যাদীনামভাবতঃ। ব্রহ্ম নির্দ্ধর্ম্মকং বাচ্যং নৈবেত্যাহুর্বিপশ্চিতঃ॥ সর্ব্বৈঃ শব্দৈরবাচ্যে তু লক্ষণা ন ভবেদতঃ। লক্ষ্যঞ্চ ন ভবেদ্ধর্ম্মহীনং ব্রহ্মেতি মে মতং॥ অথ বিশ্বসত্যত্বং—স্বশক্ত্যা সৃষ্টবান্ বিষ্ণুর্যথার্থং সর্ব্ববিজ্জগৎ। ইত্যুক্তে সত্যমেবৈতৎ বৈরাগ্যার্থমসদ্বচঃ॥ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি—য একো বর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি। বিষ্ণুপুরাণে চ—একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথেত্যাদি। ঈশাবাস্যোপনিষদি—স পর্য্যগাচ্ছুক্রমিত্যাদৌ, যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্য ইতি। মহাভারতে চ—ব্রহ্ম সত্যং তপঃ সত্যং সত্যঞ্চৈব প্রজাপতিঃ। সত্যা ভূতানি জাতানি সত্যং ভূতময়ং জগদিতি॥ আত্মা বা ইদমিত্যাদৌ বনলীন-বিহঙ্গবৎ। সত্যং বিশ্বস্য মন্তব্যম্ ইত্যুক্তং বেদবাদিভিঃ॥ বিষ্ণুজো জীবানাং ভেদঃ শ্বেতাশ্বতরাঃ পঠন্তি—দ্বা সুপর্ণা সযুজা ইত্যাদি, তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি। মাণ্ডুকে—যদা পশ্যঃ পশ্যতে। কাঠকে—যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি গৌতম। গীতায়াং—ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ। সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ এষু মোক্ষেঽপি ভেদোক্তেঃ স্যাৎ ভেদঃ পারমার্থিকঃ। ব্রহ্মাঽহমেকো জীবোঽস্মিন নান্যে জীবা নচেশ্বরঃ। মদবিদ্যাকল্পিতাস্তে স্মৃতিরিতীক্ষং চ দূষিতং। অন্যথা নিত্য ইত্যাদি-শ্রুত্যর্থো নোপপদ্যতে। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্ একো বহূনাং যো বিদধাতি কামানিত্যাদীতি। একস্মাদীশ্বরাচ্চেতনাৎ তাদৃশাস্মিথঃ। ভিদাস্তে বহবো জীবা স্তেন ভেদঃ সনাতনঃ॥ প্রাণৈকাধীনবৃত্তিত্বাদ্বাগাদেঃ প্রাণতা যথা। তথা ব্রহ্মাধীনবৃত্তের্জগতো ব্রহ্মতোচ্যতে॥ ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে, প্রাণ ইত্যাচক্ষতে, প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবন্তীতি। ব্রহ্মব্যাপ্যত্বতঃ কৈশ্চিৎ জগদ্ব্রহ্মেতি মন্যতে। যদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে—যোঽয়ং তবাগতো দেব সমীপে দেবতাগণঃ। স ত্বমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ সর্ব্বগতো ভবান্॥ ইতি। উপাধৌ প্রতিবিম্বিতং তেন পরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম জীবরূপং স্যাৎ। উপাধিবিগমে তু ব্রহ্মৈক্যমিত্যাহুঃ কেবলাদ্বৈতিনঃ। তন্নিরাকর্ত্তুমাহ—প্রতিবিম্বপরিচ্ছেদপক্ষৌ যৌ স্বীকৃতৌ পরৈঃ। বিভুত্বাবিষয়ত্বাভ্যাং তৌ বিদ্বদ্ভির্নিরাকৃতৌ॥ ব্রহ্মণো বিভুত্বান্নৈরূপ্যাচ্চ ন তস্য প্রতিবিম্বঃ, পরিচ্ছেদাবিষয়ত্বাস্বীকারাচ্চ ন তস্য পরিচ্ছেদঃ, বাস্তবে পরিচ্ছেদে তু টঙ্ক-ছিন্নপাষাণবদ্বিকারাপত্তেঃ। অদ্বৈতং ব্রহ্মণো ভিন্নমভিন্নং বা ত্বয়োচ্যতে। আদ্যে দ্বৈতাপত্তিরন্তে সিদ্ধসাধনতাশ্রুতেঃ॥ অলীকং নির্গুণং ব্রহ্ম প্রমাণাবিষয়ত্বতঃ। শ্রদ্ধেয়ং বিদুষাং নৈবেত্যুচিরে তত্ত্ববাদিনঃ॥ জীবানাং ভগবদ্দাসত্বং শ্বেতাশ্বতরাঃ পঠন্তি—তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং—পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যমিতি॥ স্মৃতিশ্চ—ব্রহ্মা শম্ভুস্তথৈবার্কশ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ। এবমাদ্যা স্তথৈবান্যে যুক্তা বৈষ্ণবতেজসা॥ ইত্যাদ্যা। সব্রহ্মকাঃ সরুদ্রাশ্চ সেন্দ্রা দেবা মহর্ষিভিঃ। অর্চ্চয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং হরিমিত্যাদ্যা চ॥ পাদ্মে চ জীবলক্ষণে—দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচনেতি। ভগবৎপ্রাপ্তের্মোক্ষত্বং যথা—জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশোপহানিরিত্যাদি, একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য ইত্যাদি চ। বহুধা বহুভিবে শৈর্ভাতি কৃষ্ণঃ স্বয়ংপ্রভঃ। তমিষ্ট্বা তৎপদে নিত্যসুখং তিষ্ঠন্তি মোক্ষিণঃ॥ একান্তভক্তের্মোক্ষসাধনত্বং চ—যস্য দেবে ইত্যাদি। তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং। তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্‌গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ, অমায়য়ানুবৃত্ত্যা বৈষ্ণবোদাহৃ

স্বগোহস্মিয়িত্যেবং প্রকারেণ গুরুকারুণ্যলব্ধজ্ঞানেন শাস্ত্রা-র্থ্যালোচ্য ভগবদ্ভক্তিমেব কর্ত্তব্য কৃতকৃত্যঃ সন্বিরাজতে। যস্যামতং মতং তস্য মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবচমেনৈব প্রোবাচেতিদর্শনাৎ অজ্ঞমজ্ঞঃ কমপি কিঞ্চিন্ন বক্তি—যৎ কদাচিদোপনিষদানপ্রাপ্য কথঞ্চিৎ পৃচ্ছতি তৎ খলু সঙ্গতং খলু সাধুনামুভয়েষাং সম্মতঃ। যৎ সম্ভাষণ-সংপ্রশ্নৈঃ সর্ব্বেষাং বিতনোতি শমিত্যাদিরীত্যা পিবত ভাগবতং রসমালয়ম্ ইত্যুক্ত-দিশা চ সৎসঙ্গেন তৎকথাশ্রবণেন চ ভগবদ্রসাস্বাদনমেব পুরুষার্থশিরোমণিত্বেন জানন্নেব নামার্থেতি অনাপৃষ্টস্তু না ব্রূয়াদিতি শ্রুত্যা প্রশ্নাভাবে জ্ঞানিনামুপদেশস্য নিষেধশ্রবণাচ্চেতি চ; ইত্যেবমেবং-নিবেদনানন্তরং তেনৈব তু জগন্মিথ্যাত্ববাদিনাং বিশ্ব-সত্যত্ববাদিনাং প্রপঞ্চানির্ব্বাচ্যত্ববাদিনাং চান্যোন্য-মতপ্রোঢ়িমাবিষ্কারেণ কক্ষীকৃতপক্ষপাতানাং বচনৈর্দে।-দূয়মানান্তঃকরণেন কেবল-শুষ্ককর্ম্মাত্মজ্ঞানপরাহুপহসতাং ব্যাহারেণ কথঞ্চিদাশ্বস্যমানসেন ভগবদ্বিগ্রহস্য সত্যত্ব-বাদেন লব্ধমোদেন ক্রোড়ীকৃতবিশিষ্টাদ্বৈতিনা পরাকৃত-কেবলাদ্বৈতিনাং বাক্যজাতেন সংজাতসুখাতিশয়েন কিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপ্যন্তে চ তে। কিমহো মনোমাত্রবিলসিতানাত্ম-ভূতানাং দেবাদিস্থাবরপর্য্যন্তানাং জগতাং সত্যত্ব-মিথ্যাত্বা-নির্ব্বাচ্যত্বপ্রতিপাদনপক্ষপাতেন ব্যাকুলীকৃতবুদ্ধয়ো লোকায়তিকা ইব বৃথৈব কালং নির্য্যাপয়ন্তো মনুষ্যত্বং বিফলায়ন্তে ভবন্তঃ, অনাত্মবিচারে বেদতাৎপর্য্যাভাবাৎ! ন চ পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্নিতিশ্রুত্যা ইন্দ্রিয়াণাং প্রপঞ্চবিষয়ত্ব-কথনেন তদস্তি ইতি বাচ্যং; ফলবদর্থাববোধকস্য বেদস্যাফলেন্দ্রিয়প্রপঞ্চ-বিষয়ত্বপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্যাসম্ভবাৎ, শ্রুতিপ্রামাণিকত্বে তস্য বাধাহসম্ভবাচ্চ ভ্রান্তিপ্রতীত্যনুবাদেন য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরো যময়তি যস্যাত্মা শরীরম্ ইত্যাদিশ্রুতি-সিদ্ধস্যান্তরাত্মনো ভগবতস্তদবিষয়ত্বাপাদনে তাৎপর্য্যাৎ, তাৎপর্য্যার্থস্যৈব শব্দার্থত্বস্বীকারাচ্চ যথা বিষং ভুংক্ষ্বেতি বাক্যার্থস্য বিষভোজনে ন তাৎপর্য্যং কিন্তু পরগৃহভোজন-নিষেধ এব তদ্বদত্রাপীতি সুধিয়াহনুসন্ধেয়ম্। যদ্যদত্রানু-কূলতর্কাদিকং তত্তৎ পশ্চান্নির্দ্দেক্ষ্যতি। যজ্জীবন্মুক্ত-বিষয়প্রশ্নোত্তরতয়া ভবদ্ভির্লিখিতং তদযুক্তমিবাভাতি বিশেষবশেষতয়া লিখনানবকাশতয়া চ ন বিবৃতঃ। স্বয়মেবা-ভবিষ্যদিব জায়তে যদা ভগবদিচ্ছায়াঃ ফলদাতৃত্বং, বিদুষো ন স্বাতন্ত্র্যমননমিতি। স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব পরেচ্ছয়া। যথাযোগ্যং বিবেচন্তু সুধিয়ঃ সমদর্শিনঃ ॥

শ্রীউৎসবানন্দশর্ম্মণাং, ১৯শে আশ্বিন ১২২৩। স্বাক্ষর করা এই প্রত্যুত্তর শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরবচন্দ্র দত্তের দ্বারা পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশের সীমানির্দ্দেশ।*

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী বার্-এট্-ল)

বাঙ্গালী বিচ্ছিন্ন থাকিবে না

সাইমন কমিশনের রিপোর্টের প্রথম খণ্ডের ৬০ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত মন্তব্য আছে,—

"বাংলা দেশের বর্ত্তমান আয়তন পুনঃ সীমানির্দ্দেশের ফল। এক্ষণে আসাম ব্যতীত গবর্ণর-শাসিত অপরাপর সমস্ত প্রদেশ অপেক্ষা বাংলাদেশ আয়তনে ক্ষুদ্র এবং ইহার ৪৬৫০০০০০ লোকের ঘন বসতির পরিমাণ গ্রেট ব্রিটেন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক।"

আমি উপরিলিখিত মন্তব্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বঙ্গব্যবচ্ছেদ রহিত হইবার ফলে যে বিহার ও বাংলার মধ্যে পুনরায় জনপদ বিভাগ করিয়া বাংলাদেশকে নূতনভাবে গঠিত করা হইয়াছিল, উক্ত মন্তব্যে তৎসম্বন্ধেই বলা হইয়াছে।

বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ রহিতের পর

আমি বঙ্গব্যবচ্ছেদ-রহিত-আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলাম। বঙ্গব্যবচ্ছেদ রহিত হইলে আমি ও আমার সহকর্ম্মী অনেকেই সন্তুষ্ট হইলাম বটে, কিন্তু আমাদের মনে একটা দুঃখ হইল এই যে, বঙ্গভাষাভাষী অনেক জনপদকে বাংলাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল। আমাদের তদানীন্তন রাজনৈতিক নেতা পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "এক্ষণে এই ব্যবস্থাই গ্রহণ কর। লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গব্যবচ্ছেদ রহিত সম্বন্ধে বিলাতে ভারতসচিবের নিকট যে সকল চিঠিপত্র লিখিয়াছেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাতে একথা নিশ্চয় মনে হয় অবিলম্বে পুনরায় প্রদেশসমূহের সীমানির্দ্দেশ হইবে, তখন আমরা আবার বঙ্গভাষাভাষী সকল লোককে এবং সকল জনপদকে এক বৃহত্তর বাংলার অন্তর্ভুক্ত করিবার সুযোগ পাইব।"

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় এই প্রশ্ন আর উত্থাপিত হয় নাই। কিন্তু মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবার সময় আমরা পুনরায় এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া গবর্ণমেণ্টকে পীড়াপীড়ি করিব ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের প্রবল কোলাহলে সকলে সেই প্রয়োজনীয় কথা ভুলিয়া গেলেন।

আর নীরব থাকা কর্ত্তব্য নহে

বর্ত্তমান সময়ে আবার দেখা যাইতেছে প্রাদেশিক সীমানির্দ্দেশের কথা পুনরায় উঠিয়াছে। এখনও এই

---

* অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ।

অতি প্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া কি আমাদের নীরব থাকা কর্ত্তব্য? এই সমস্যাই যে আমাদের জীবন-মরণের সমস্যা।

গ্রেট ব্রিটেনে বে-কার সমস্যাই প্রধান। অতিরিক্ত লোকসংখ্যাকে কিরূপে বাহির করিয়া দেওয়া যায়, ইহাই সেখানে প্রধান চিন্তার বিষয়। বাংলাদেশের লোকের ঘনবসতি গ্রেট ব্রিটেন অপেক্ষাও অধিক এবং ভদ্রলোক-শ্রেণীর মধ্যে এবং সাধারণ লোকের মধ্যে বে-কার অবস্থা, দারিদ্র্য দুঃখ গ্রেট ব্রিটেন অপেক্ষা আরও গুরুতর। তথাপি আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে কোন মনোযোগ দিতেছেন না। পুরাতন নেতাদের কথা এখন কেহ গ্রাহ্য করেন না। তথাপি আমি বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটা কথা এখানে বলিতেছি।

জীবন মরণের সমস্যা

আমার মনে হয়, যখন ভবিষ্যতে পুনরায় প্রদেশ-সমূহের সীমানির্দ্দেশ হইবে, তখন ভাষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সীমা নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। এইরূপ করা হইলে লোকসংখ্যার ঘনত্ব কমিয়া যাইবে এবং বে-কার সমস্যার সমাধানের পথ সুগম হইবে।

ভাষার দিক হইতে না হইলেও, যে নীতির অনুসরণে বঙ্গব্যবচ্ছেদ রহিত হইয়াছিল, তাহার দিক হইতেও আমরা পুনরায় প্রাদেশিক সীমানির্দ্ধারণের দাবী করিতে পারি।

বঙ্গব্যবচ্ছেদ-আন্দোলনের সময় এবং তাহার পরেও আমরা যে দাবী করিয়াছিলাম, আমি পুনরায় সেই দাবী ঘোষণা করিতেছি। পাকুড় মহকুমা, মানভূম জেলা এবং সিংভূমের অন্তর্গত ধলভূম বাংলা দেশের অন্তর্ভুক্ত করা হউক।

মানভূম ও সিংভূমের অধিবাসীগণ, এমন কি ঝাড়খণ্ডের লোকেরাও বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অন্তর্গত। চৈতন্য মহাপ্রভু পুরী যাইবার সময় সুবর্ণরেখা নদী অতিক্রম করিয়া ঝাড়খণ্ড হইয়া গিয়াছিলেন এবং এই সকল স্থানের অধিকাংশ অধিবাসীকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। পশ্চিম-বঙ্গের বৈষ্ণব গোস্বামী-গণ মানভূম ও সিংভূমের লোকদিগের গুরু। শুধু তাহাই নহে,—সুবর্ণরেখার পশ্চিম তীরে যাহারা বাস করে তাহারাও এই গোস্বামী প্রভুদের শিষ্য।

ভাষাই সীমানির্দ্দেশের ভিত্তি

মানব-বিজ্ঞান হিসাবে দেখিতে গেলে অবশ্য দেখা যায়, মানভূম ও ধলভূমের লোকের সহিত ছোটনাগপুরের অধিবাসীদের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এই প্রকার দৈহিক গঠনের সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া ভারতে জনপদের সীমা নির্দ্দেশ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বাংলা দেশের উত্তরপূর্ব্ব ও পূর্ব্বভাগের লোক-সমূহ অধিকাংশ মঙ্গোলিয় জাতির সহিত মিশ্রিত। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা হয়ত আর্য্যজাতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন, কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ যে বাঙ্গালী মিশ্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং ভাষার উপরে ভিত্তি রাখিলেই প্রদেশসমূহের সীমা নির্দ্দেশ হইতে পারে, আর কিছুতেই নহে।

এই হিসাবে গোয়ালপাড়া ও শ্রীহট্ট জেলা বাংলা দেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। সাইমন কমিশনের রিপোর্টে ইহার বিশেষ উল্লেখ আছে। কিন্তু এই সম্বন্ধে কমিশনের সদস্যগণ কোন পরামর্শ দেন নাই। যদি বাঙ্গালীরা এবিষয়ে আন্দোলন না করে এবং যাহা-দিগকে আমরা বাংলাদেশের মধ্যে আনিতে চাই তাহারাও যদি তদ্রূপ দাবী না করে, তবে ভবিষ্যতে প্রদেশের সীমা-নির্দ্দেশের সময় এই সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই। আসাম ব্যবস্থাপক সভায় এসম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে কমিশনের সদস্যগণ তাহা লক্ষ্য করিয়া-ছেন। কিন্তু ছোটনাগপুরে যে বঙ্গভাষাভাষী লোক আছে, ইহা তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। মান-ভূম ও ধলভূম শিক্ষায় ধর্ম্মে ও সামাজিক ব্যবস্থায় উন্নত স্থান। এইসকল স্থানের লোকদিগকে ছোটনাগপুরের অনুন্নত অধিবাসীদের সঙ্গে জড়িত করিয়া রাখিলে তাহাদের প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হয়।

বাঙ্গলার স্বাস্থ্যনিবাস

বঙ্গভাষাভাষী এই সকল স্থানের লোকদিগকে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করিবার আর একটি কারণ আছে। নিম্ন বঙ্গের অধিবাসী অপেক্ষা এই সকল স্থানের লোকেরা অধিকতর স্বাস্থ্যবান। সুতরাং ইহাদের মধ্য হইতে জনসাধারণের কার্য্য করিবার উপযুক্ত কর্ম্মচারী অনেক পাওয়া যাইতে পারে। বাংলাদেশের সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ লোকেরা ম্যালেরিয়ার আক্রমণে অথবা অন্য কোন ব্যাধিতে স্বাস্থ্য নষ্ট হইলে পুনরায় স্বাস্থ্যলাভার্থ এই সকল স্থানে গমন করিয়া থাকে। বাংলা দেশের স্বাস্থ্য-কর স্থানগুলিকে এইরূপে বাদ দিয়া বিহারপ্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করাতে বাংলার প্রতি নিতান্ত অবিচার হই-য়াছে। অথচ বিহারপ্রদেশে স্বাস্থ্যকর স্থানের অভাব ছিল না।

বাংলাদেশ সম্বন্ধে কমিশনের সদস্যগণ তাঁহাদের মন্তব্য শেষ করিবার সময় উপসংহারে বলিয়াছেন,—"ম্যালেরিয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও আছে, কিন্তু বাংলাদেশে যেমন ম্যালেরিয়ার আক্রমণে সর্ব্বনাশ ঘটি-য়াছে এমন আর কোথাও হয় নাই। ম্যালেরিয়ারা দরুণই বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি ও কর্ম্মক্ষমতা কমিয়া

গিয়াছে। যদিও ইহা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত, তথাপি আমরা বাংলা গবর্ণমেন্টের স্বাস্থ্যকর্ম্মচারীর রিপোর্টের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।" [১ম খণ্ড, পৃঃ ৬২।

বাংলার দুর্ভাগ্য

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের আন্দোলনের পর হইতে ভারত-গবর্ণমেন্ট বাংলাদেশকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখেন না। ১৯১২ সালে বঙ্গব্যবচ্ছেদ রহিত হইলেও বঙ্গদেশ উন্নতির পথে নানা বাধা প্রাপ্ত হইতেছে। রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইল। ইহাতে বাংলাদেশের গৌরব হ্রাস পাইয়াছে এবং তাহার অধিবাসীদের রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা কমিয়া গিয়াছে। বাংলাদেশ আয়তনে সকল প্রদেশ অপেক্ষা (আসাম ব্যতীত) ক্ষুদ্র হইয়াছে। বাংলার যে সকল স্থান স্বাস্থ্যকর ও খনিজ-সম্পদে পূর্ণ সেই সকল স্থান বিহার-প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অথচ বিহারের ভাষার সহিত সে স্থানের অধিবাসীদের ভাষার কোন সাদৃশ্য নাই। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড-শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তনের সময় বাংলার উপর যে এই সকল অবিচার হইয়াছে তাহার কোন প্রতিকার হয় নাই। ষ্ট্যাটুটারী কমিশন নিযুক্ত হইলে এই সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে এইরূপ আশা আমরা পাইয়াছিলাম। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে নেতৃগণ বিপথে চালিত হইয়া বাংলার জীবন-মরণের সমস্যার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন।

বাংলার উপর আর একটা অবিচার করা হইয়াছিল। বাংলাদেশের লোকসংখ্যার ঘনত্ব অধিক। পাটের রপ্তানী শুল্কের টাকা অথবা ইনকাম ট্যাক্সের টাকা বাংলাদেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য প্রয়োজন। কিন্তু মেষ্টনী ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশ এই সমস্ত হারাইয়া একেবারে অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছিল। আমরা তখন শাসনপদ্ধতিকে সফল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিব এই অঙ্গীকার দিয়া ভারত-গবর্ণমেণ্টকে এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদকে মেষ্টনী ব্যবস্থায় ৬৩ লক্ষ টাকা রেহাই দিতে সম্মত হইয়াছিলাম।

"চোরা বালি" সম্বন্ধে পত্র।

[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যে পাঠকগণের কিরূপ সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, সুবিজ্ঞ বহুদর্শী সাহিত্যিক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল মহাশয়ের নিম্নে প্রকাশিত পত্রখানি হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। তঃ সং]

কৃষ্ণনগর,
৩১।৭।৩০

প্রিয়বরেষু—আমাদের তত্ত্ববোধিনীতে আপনার সাহিত্যিক কথাবার্তাটী বেশ উপভোগ্য—অবশ্য, যাঁদের উপরে, তাঁদের পক্ষে সেরূপ নয়, ভরসা করি। "ভরসা করি" বলিলাম, কেন-না, ঐজাতীয় লেখকদের পৃষ্ঠ-চর্ম্ম গণ্ডারের ন্যায়। তাঁরা তাঁদের গল্পে ও উপন্যাসে কি লিখচেন, তা যে জানেন না, এমন নয়। তাঁরা বিলক্ষণ জানেন যে, এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এবং যুগযুগান্ত-ব্যাপী মানসিক অবনতির ফলে কর্ম্মপ্রচেষ্টাহীন ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য জাতির sex-urge যৌবনারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই ধূমায়িত হতে আরম্ভ করে। তাতে শুষ্ক ইন্ধনের যোগান এবং মৃদু-মধুর ব্যজন করলে বেশ কিছু অর্থাগম হয়। সাহিত্যিক নামের সঙ্গে অর্থসঙ্গতি তাঁদের পক্ষে দুর্দ্দমনীয় লোভের বিষয় হয়ে পড়েছে। তাই তাঁরা কামালয়ে কামচর্চ্চা ক'রে যে বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তাই বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রেমের নামে চালাচ্চেন। এর ফলাফল যে তাঁরা জানেন না, তা নয়। তবু যে তাঁরা একাজে উঠে-পড়ে লেগেচেন—মানবহৃদয়ের পশুভাব-স্বরূপিণী কামরূপিণী (—) দালালি করছেন, সেটা প্রধানতঃ পেটের দায়ে—যাকে ইংরাজীতে বলে—"Selling their souls for a mess of potage." শুধু সাহিত্যে কেন? সব কাজেই ত এই অধঃপতিত জাতির কার্য্যপ্রণালী ঐরূপ! সকল সাহিত্যেই কাম ও প্রেম দুয়েরই ছবি পাওয়া যায়। সৎসাহিত্যে কামকে কাম বলিয়াই দেখান হয় এবং তাহাও সুসংযতভাবে ইঙ্গিতে এবং তাহাও বৈপরীত্যে প্রেমের ছবিকে উজ্জ্বলতর করবার উদ্দেশ্যে means to an end ভাবে। কিন্তু আমাদের দেশে বিলাতী আমদানি এই যে-সকল গল্প ও উপন্যাস—উহাদের উদ্দেশ্যই নিছক কামচর্চ্চা। প্রেমের নামে এই কামচর্চ্চার নাম দেওয়া হয় "আর্ট"! আর্ট না, কার্ট! (একে বৃদ্ধ, তায় ক্রুদ্ধ; গ্রাম্যতাটুকু মাপ করিবেন) যাহা হউক, মধ্যে মধ্যে কশাঘাত করতে থাকুন, ফল হোক, আর না হোক; "মা ফলেষু কদাচন"। ফলে, এর মৃত্যুবাণ পাঠক-পাঠিকাদের সচেতন প্রতিক্রিয়ার ভিতরে। এজাতির মঙ্গল যদি ভগবানের বিধানে থাকে, তবে প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। আজকাল এ স্রোতে যেন ভাঁটা পড়িবার উপক্রম দেখা যাচ্ছে। আপনিও এটা বেশ লক্ষ্য করেছেন।

দেশের কথা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আয়—প্রত্যেক ভারতবাসীর গড়ে দৈনিক আয় ৴৬ (ছয় পয়সা) (চার পয়সা ?) বৎসরে ৩৪৶১০ (২০৲ টাকা ?)।

দেনা—একমাত্র ইংলণ্ডেরই নিকট ভারতের লোক পিছু গড়ে ৪২৲ টাকা। সুতরাং ভারতবাসীর আয় অপেক্ষা শতকরা ২২৲ টাকা দেনা বেশী।

ইহা ব্যতীত ভারতবাসীর আর কোন দেনা আছে কি না, তাহা জানি না। ভারতের credit না থাকিলে এত অধিক ঋণ করিবার অধিকার পাইত কি প্রকারে? সুতরাং ভারত নিশ্চয়ই ভাগ্যবান্!

বিলাতী সিগারেটের প্রসার

দেশ যে কি প্রকার তর্-তর্ করিয়া অধঃপাতের দিকে চলিতেছে, তাহার নমুনা দিই। একমাত্র সিগারেটের ধোঁয়ার প্রেনে দেশের কত টাকা বিদেশে যাইতেছে, এবং তাহারই সঙ্গে দেশবাসীর স্বাস্থ্য ও মনের কি প্রকার সর্ব্বনাশ হইতেছে, কত ঘরে সিগারেটের পয়সা যোগাইবার জন্য ঘোরতর অশান্তি আসিয়াছে, সেগুলি একবার দেশবাসীকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

খৃষ্টাব্দ	আমদানি সিগারেটের মূল্য	আমদানি সিগারেটের মূল্য
১৯২৪—২৫	১,৭৪,৮৫৯৲	১,২০,৮৩,৪২৩৲
১৯২৫—২৬	২,০৫,২৭৭৲	১,৫৮,৮০,৭২১৲
১৯২৬—২৭	১,৬৬,৭৬৯৲	১,৯৪,৬১,১৪৮৲
১৯২৭—২৮	২,০০,৮৬৪৲	২,৩৯,৯৬,৩১৯৲
১৯২৮—২৯	২,৭৪,২১৮৲	২,৪০,৯০,২৬০৲

আমদানী বিদেশী তামাকের দাম	বঙ্গদেশে সিগার ও সিগারেট কাটতির মূল্য
১,৯৭,৮৮,৫৯৩৲	৪৭,৩০,৯৪৯৲
২,১৩,৩৫,৫৪৩৲	৪৭,৩০,৯৪৯৲
২,৫৬,১০,৬৬৯৲	৫৬,৩২,২৩৯৲
২,৯১,৩২,৩৪৬৲	৭৬,০১,৯৩২৲
২,৯৪,৫৯,৫২৮৲	৭৮,৬৮,৮৩৫৲

মাদক দ্রব্যের হিসাব—

সমগ্র ভারতে মাদক-দ্রব্য হইতে সরকারের মোট ২০ কোটী টাকা আয় হইয়া থাকে। আবগারী বাবতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আয় হয় মাদ্রাজে—ইহার পরিমাণ ৫ কোটী টাকার উপর। তাহার পরে বোম্বাইয়ের স্থান। ১৯২৬—২৭ সনে বোম্বাইয়ে ৪ কোটী টাকার উপর আবগারি আয় হইয়াছে। বাংলা দেশের গত ৫ বৎসরের আবগারি আয় ও ব্যয় নিম্নরূপ ছিল :—

	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)
১৯২৪-২৫	২ কোটি ১৫ লক্ষ	১১ লক্ষ
১৯২৫-২৬	২ কোটি ২৮ লক্ষ	২৫ লক্ষ
১৯২৬-২৭	২ কোটি ২৫ লক্ষ	২৪ লক্ষ
১৯২৭-২৮	২ কোটি ২৪ লক্ষ	২৩ লক্ষ
১৯২৮-২৯	২ কোটি ২৫ লক্ষ	২৩ লক্ষ

বিলাতী সিগার, সিগারেট ও তামাক প্রভৃতির আমদানি এবং আবগারীর আয় দেখিয়া শুধু গবর্ণমেণ্ট কেন, যে কোন বিদেশীয় ব্যক্তিই বলিতে পারে যে, ভারতবাসীরা নিশ্চয়ই ধনের সাগরে ভাসিতেছে। একথা তাহাদের বলিবার অধিকারও যে নাই তাহা বলিতে পারি না। তাহারা তো আমার ঘরের হাঁড়ির খবর দেখিতে পাইতেছে না অথবা দেখিতে চায় না। তাহারা বাহিরে বাহিরে যাহা দেখিবে তাহারই উপর তো বিচার করিবে। বেশী কিছু বলিতে চাহি না। মোটামুটি উপরে যাহা পাইয়াছি, তাহাই ধরিয়া দেখা যাক।

মাদ্রাজের আবগারী আয়	৫,০০,০০,০০০
বোম্বাইয়ের " "	৪,০০,০০,০০০
বঙ্গদেশ " "	২,২৫,০০,০০০
বিদেশী তামাক আমদানির মূল্য	২,৯৪,৫৯,৫২৮৲
" সিগারেটের মূল্য	২,৪০,৯০,২৬৩৲
" সিগারের মূল্য	২,৭৪,২১৮৲
মোট	১৭,০৩,২৪,০০৯৲

[টীকা—আমি যথাসম্ভব উপরোক্ত তালিকার শেষ বৎসরের অঙ্ক ধরিয়াছি]

তবেই দেখা যাইতেছে ভারতের অধিবাসীর বিলাতের নিকট যে ঋণ আছে, তাহার উপর প্রকারান্তরে এই সাড়ে সতেরো কোটী টাকা প্রতি বৎসর ঋণ চাপিয়া বসে। ইহার শেষই বা কোথায় এবং ইহার ফলই বা কি? এই ভাবে যদি ক্রমাগত ঋণ বাড়িয়া চলিতে থাকে তবে তো একজন অন্ধ ব্যক্তিও বলিতে পারিবেন, ইহার পরিণাম-ফল ভারতবাসীর অনাহারে মৃত্যু, বিশেষত যখন তাহার দৈনিক আয় গড়ে মাত্র ছয় পয়সা। আমরা তরুণসম্প্রদায়ের নিকট করযোড়ে মিনতি করি, তাঁহারা সিগার, সিগারেট ও মাদক-দ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জ্জন করুন, দেখিবেন, তাঁহারা কত দিকে কত শান্তি লাভ করিবেন।

আমাদের নিজেদের অবস্থা জানা কর্ত্তব্য মনে করি। এই কারণে গত বৈশাখের আর্থিক উন্নতিতে সুলিখিত 'আর্থিক ভারত' প্রবন্ধ হইতে কতক অংশ আগামী বারে উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা করিতেছি।*

---

* এই অংশের মূল কথা আর্থিক উন্নতি বৈশাখ ১৩৩৭ হইতে গৃহীত।

গ্রন্থপরিচয়।

(ডাঃ শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস-সি)

Bhanja Dynasty of Mayurbhanj and their Ancient Capital Khiching. By Rai Bahadur R. P. Chanda, Superintendent, Archeological Section, Indian Museum, and published by P. Acharya, B.Sc., of Archeological Department, Mayurbhanj.

উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ-রাজ্যের প্রাচীন পরিত্যক্ত রাজধানীর পুরাতত্ত্বের কয়েকটি কথার আলোচনা। নাতিদীর্ঘ—সাকল্যে সাতটি প্রস্তাব। বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থাদি হইতে সার সংগৃহীত এবং রাজব্যয়ে পরিচ্ছন্ন ও সুখপাঠ্য অক্ষর-বিন্যাসে, বহুল প্রয়োজনীয় চিত্রসম্ভারে সুপরিপাটি পরিচ্ছদে বাঁধান। বাহির হইতে অভ্যন্তর আরোও মনোরম। সাতটি প্রস্তাবের মূল-চারিটি সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের পূর্ব্ব-প্রকাশিত ভিন্ন ভিন্ন 'প্রবন্ধমালা' হইতে সংগৃহীত। অবশিষ্ট তিনটি প্রবন্ধ পরিশিষ্টে স্থান পাইয়াছে। উহার একটি সুবিখ্যাত পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিক Lieut. Tickellএর "Hodesum" পর্য্যটনের বিবরণী হইতে উদ্ধৃত। উহা ১৮৪০ খৃঃ-অঃ এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণেলে, নবম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিশিষ্টের অন্য দুইটি অংশ কনিংহামের সহকারী Mr. J. D. M. Belgarএর লিখিত খিচিং ও ভানপুরের ভগ্নস্তূপের বিবরণ হইতে গৃহীত। ১৮৭৪-৭৫ এবং ১৮৭৫-৭৬ সালের Archeological Survey of Indiaর বার্ষিক বিবরণীতে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

লেফটেনেন্ট টিকেলের এবং মিঃ বেলগারের বিবরণী পড়িয়া না দেখিলে রায় বাহাদুর চন্দ মহাশয়ের গভীর গবেষণার অতুল্য মূল্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। লেঃ টিকেল খিচিং ও তাহার সন্নিহিত ভগ্ন স্তূপসমষ্টি সিংহভূম জিলার একটি দুরাধিগম্য প্রান্তে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরোধী কোনও এক বিস্মৃত জনপদের পার্ব্বতীয় ভৌমিকের পরিত্যক্ত সমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষের চিহ্ন মনে করিয়াছিলেন। লেঃ টিকেলের পরিদর্শনের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে মিঃ জি, ডি, এম, বেলগার, ভগ্ন দেউল-রাজি ও বিগ্রহাদি সরাসরিভাবে দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা সুগঠিত ভগ্ন মন্দিরটিই প্রাচীনতম এবং উহা শশাঙ্কের সমসাময়িক। আর পশ্চিম ও অগ্নিকোণের মন্দিরগুলি রাজা মুকুন্দদেবের কীর্ত্তি এবং জীর্ণসংস্কারগুলি উত্তর-ভারতের বাস্তুশাস্ত্রের পদ্ধতি অবলম্বনে রাজা মানসিংহের আত্মকৃত। বেগলারের ভানপুর সম্বন্ধে মন্তব্য আরও অদ্ভুত। তিনি গুমসুরের রাজপরিবারকে ময়ূরভঞ্জের বংশ-সম্ভূত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। আরও অদ্ভুত তাঁহার সিদ্ধান্ত বা অনুমান যে ময়ূরভঞ্জরাজ 'পিয়াদশী' সম্রাট অশোকের বংশধর হওয়াই সম্ভব। ময়ূরকে তিনি মৌর্য্য হইতে অভিন্ন বলিয়াছিলেন। বোধ হয় মুরা হইতে যে "মৌর্য্য" তাহা তিনি জানিতেন না; এবং ময়ূর শব্দ হইতে যে "মৌর্য্য" শব্দ ব্যাকরণের কোনও প্রকরণেই নিষ্পন্ন হয় না, তাহাও জানিতেন বলিয়া বোধ হয় না। ময়ূরভঞ্জ রাজপরিবার সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং অবিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়কুলাগ্রগণ্য চিতোর ও জয়পুরের কোনও শাখা হইতে উদ্ভূত বলিয়া তাঁহারা দাবী করিয়া থাকেন। অশোক মুরা-তনয় প্রথম মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। দিব্যাবদানে অশোকের মাপিতানীর গর্ভজাতত্ব সম্বন্ধে প্রসঙ্গ আছে। মৌর্য্য-সম্রাট অশোক, পরিণত বয়সে একজন গোঁড়া বৌদ্ধ, দিব্যাবদানে লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধ সম্রাট অশোক জীবহিংসা-নিবারণ ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিলোপ সাধন করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত মৌর্য্য সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাজ্ঞাপক ৮৪০০০ ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বেলগার কিনা সেই মৌর্য্য সম্রাট অশোককে সূর্য্যবংশী ক্ষত্রিয়-রাজবংশের পূর্ব্ব-পুরুষ কল্পনা করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর চন্দ মহাশয় চারিটি প্রবন্ধে ময়ূরভঞ্জ রাজপরিবারের পরিচয়, প্রস্তর-শিল্পে ও দেউলগঠন-ভঙ্গী হইতে অতি দক্ষতায় সহিত উদ্ধার করিয়াছেন। চন্দ মহাশয় ভাস্কর ও বাস্তু-শাস্ত্রবিৎ এবং অবয়বের সৌন্দর্য্যতত্ত্বের সুদক্ষ বিশ্লেষণকারী। তিনি মন্দির, শিখর ও মুখমণ্ডপপ্রকৃতির স্বভাব ও অভাব হইতে এবং বিগ্রহ, দ্বারী, সহচর ও সহচরীদের গঠন ও ভঙ্গিমা হইতে যে সব অপূর্ব্ব তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন আমরা সংক্ষেপে এইস্থলে সেগুলির উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিব।

উৎকলের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ভঞ্জরাজবংশের বাস। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর কয়েকখানি তাম্রশাসন হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন নিঃসম্পৃক্ত বংশ এই একই নামে পরিচিত উত্তরভাগে খিঝিঙ্গে এবং দক্ষিণভাগে খিনজালি-মণ্ডলে। খিনজালি বংশের আদি স্থান বনজুলবাক, বর্ত্তমানে বোদ্, দশপাল এবং গুমসুরে এই বংশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। দক্ষিণভাগের ভঞ্জরা কাশ্যপগোত্রীয় এবং ইহাঁরা খন্দপ্রচলিত নামে নিজেদের নাম করণ করিয়া থাকেন এবং ইহাঁদের পরিবারে খন্দজাতির আচার-ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে। ইহাঁরা অণ্ডজ (অন্ত্যজ ?) বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেন। উত্তর ভাগের ভঞ্জেরা ময়ূরভঞ্জের রাজপরিবার বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁদের প্রাচীন রাজধানীর নাম খিঝিঙ্গ বা খিচিং। এই স্থানের ভগ্ন চামুণ্ডা-মূর্ত্তি কিঞ্চকেশ্বরী নামে পূজিত। এই কিঞ্চকেশ্বরীই আবার ময়ূরভঞ্জরাজের কুলদেবী। ময়ূরভঞ্জের দলিলপত্রের শিরোদেশে জগন্নাথের নামের পার্শ্বেই এই কুলদেবীর নাম লিখিত হয়। বীরভদ্র এই বংশের আদিপুরুষ। তাঁহাকেই আদিভঞ্জ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। কেঁউঝড় ও কনিকার রাজবংশদ্বয় ময়ূরভঞ্জ রাজপরিবারের শাখা বলিয়া গণিত। সম্ভবতঃ মূলে ময়ূরভঞ্জ বংশ শৈব-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; কেননা আদি দেউলটি শিবালয়। তারপরই ঠাকুরাণীশালা বা কিঞ্চকেশ্বরীর মন্দির। এখনও বর্ত্তমান রাজধানী বারিপদায় কিঞ্চকেশ্বরী পূজিতা হইতেছেন। এই দেবীর প্রতিষ্ঠাকাল হইতে শৈব-ভঞ্জবংশ শাক্তসম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিলেন। মহারাজ বৈদ্যনাথ ভঞ্জই প্রথমে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তখন হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ময়ূরভঞ্জ রাজপরিবার বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী। প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ঠাকুরাণীশালার বহির্ভাগে একটি বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তির পাদফলকে যে খোদিত লিপি আবিষ্কার করেন, তাহা

হইতে জানা যায় যে, রাজা রাজভঞ্জ ধরণী ও কীর্ত্তি নামক দুইটি কারিকরের সাহায্যে খোদিত করাইয়া ১শ শতাব্দীতে খিচিংএ এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। এই বোধিসত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আরও কয়েকটি বুদ্ধমূর্ত্তি এই ভগ্নস্তূপে পাওয়া গিয়াছে। ভঞ্জরাজবংশে বৌদ্ধপ্রীতির নিদর্শনের অভাব নাই। প্রত্নতত্ত্ববিৎ চন্দ মহাশয় ভাস্করশিল্পের সৌন্দর্য্যাভিব্যক্তিতে বিশেষজ্ঞ। তিনি দেখাইয়াছেন খিচিংয়ের মূর্ত্তিসংগ্রহে এবং দেউলের কারুকার্য্যে তিনটি বিশিষ্ট স্তরের সন্ধান পাওয়া যায়। (১) উড়িষ্যার নিজস্ব প্রণালী (২) উত্তরাপথের কলম আর (৩) গৌড়ের স্বভাবানুকরণ প্রচেষ্টা। রায় বাহাদুর ইহার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছেন। ভুবনেশ্বরের প্রতিমার আদর্শে মূর্ত্তির মুখাবয়ব গোল ও বিস্তৃত। উড়িষ্যার আদর্শে গঠনভঙ্গিমা ও দাঁড়াইবার ঠামে বিশেষত্ব লক্ষণীয়। বক্রভাব ও বঙ্কিম হেলন উৎকল ভাস্করশিল্পীর বিশিষ্টতা। সমসাময়িককালে গৌড়ের (বঙ্গ ও বিহারের) সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিকৃতি, স্থির, ধীর, সরল ঠাম এবং নিম্নভাগ ঋজু। খিচিংয়ের দেউলের বহির্ভাগের কারুকার্য্য, উড়িষ্যার আদিম প্রণালীর এবং উহা উড়িষ্যারই নিজস্ব। প্রাচীন রাজধানীর ভঞ্জ-অধিপতি উড়িষ্যার স্বদেশী শিল্পী (সলাত) দ্বারা দেউলের বহির্ভাগের কারুকার্য্য উড়িষ্যার নিজস্ব চিরন্তন প্রণালীতে খোদিত করাইয়াছিলেন। কিন্তু দেউলাভ্যন্তরের দেবপ্রতিমা গৌড়ীয় শিল্পীর সাহায্যে গৌড়ীয়ভাবে ও প্রণালীতে খোদিত করাইয়া থাকিবেন। এই বিদেশী ভাবের ও প্রণালীর পরিপোষক এবং বাহিরের শিল্পীর আহরণকর্ত্তা ও আহ্বানকারী ভঞ্জভূপতি সম্ভবতঃ দেশান্তরাগত। খিচিংয়ের ভগ্ন প্রতিমা ও খণ্ডিত দেউল ময়ূরভঞ্জের রাজবংশের এই পূর্ব্বপরিচয়ের আভাস জানাইয়া দিতেছে। প্রস্তরে খোদিত এই সাক্ষ্য সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অতীত।

সংবাদ।

পুণ্যাহ।—গত ১৪ই শ্রাবণ বুধবার শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে কালীগ্রাম-পরগণার শুভ 'পুণ্যাহ'-কর্ম্ম পতিসর সদর কাছারীতে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষ্যে আহূত হইয়া আদিব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় তথায় গমন করিয়াছিলেন। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ণে ১০ ঘটিকায় প্রচুর বাদ্যোদ্যম ও প্রভূত আড়ম্বর সহ পুণ্যাহের শুভ সূচনা বন্দুকের শব্দে দিকে দিকে বিঘোষিত হয়। অতঃপর পত্র পুষ্প ও মাল্যাদিতে সুসজ্জিত সভাগৃহ আমলা-কর্ম্মচারী ও সমবেত প্রজাপুঞ্জে পূর্ণ হইলে বেলা সার্দ্ধ দশ-ঘটিকায় সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র সরস্বতী বেদান্ততীর্থ-মহাশয়কে অগ্রণী করিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করেন। সভাগৃহের মধ্যস্থলে একটী উচ্চ বেদিকায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পুত্রগণের প্রতিকৃতিগুলি পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইয়া সুন্দর শোভা পাইতেছিল। বেদান্ততীর্থ মহাশয় বেদীগ্রহণপূর্ব্বক যথারীতি ব্রহ্মোপাসনান্তে সমবেত প্রজাগণকে উদ্দেশ করিয়া পুণ্যাহ সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়ের নেতৃত্বে পুণ্যাহের যথারীতি প্রচলিত অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও সমবেত প্রজাপুঞ্জ ও রবাহূত অতিথি-অভ্যাগতের জন্য অপরাহ্ণে দধি-চিপিটকের সুবৃহৎ ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। উক্ত ভোজ-নির্ব্বাহের জন্য ৬৫।০ মণ দধি, ৩৭।০ মণ চিপিটক ও ২০।০ মণ গুড়ের প্রয়োজন হইয়াছিল; ইহা ব্যতীত, পুণ্যাহের পরদিবস প্রাতঃকালে সমবেত অনাথ-আতুর ও দরিদ্রজনগণকে নববস্ত্র বিতরিত হইয়াছিল।

শোকসংবাদ।

রায় বাহাদুর ৺চুনীলাল বসু।—গত ১৭ই শ্রাবণশনিবার রাত্রিশেষে প্রসিদ্ধনামা কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব সেরিফ রায় বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বসু সি,আই, ই মহোদয় তাঁহার রাঁচির বাসবাটীতে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ক্রম প্রায় সপ্ততি বর্ষ হইয়াছিল। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ইনি একজন চরিত্রবান্ ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। যোগ্যতার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ১৮৮৬ সালে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন এবং ৩৪ বৎসর কাল নানাস্থানে সুনামের সহিত কাজ করিয়া শেষ জীবনে অবসর গ্রহণ করেন। এই অবকাশে তিনি বাঙ্গালীর খাদ্য ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কয়খানি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা ব্যতীত, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটের অন্ধাশ্রম ইঁহার অপর একটী অনন্যসাধারণ সুন্দর কীর্ত্তি। সুপণ্ডিত চুনীলাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ও সিনেটের সদস্য ছিলেন। রায় বাহাদুর ডাঃ চুনীলালের এই আকস্মিক মৃত্যুতে প্রগাঢ় শোকমগ্ন ইঁহার পুত্র-কন্যা ও পরিজনদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি; ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার সদ্গতি বিধান করুন।

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C 462

একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দ্বাবিংশ কল্প—চতুর্থ ভাগ

সংখ্যা ১০৪৫ ১৮৫২ শক ভাদ্র

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৮তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাকমাশুল ৶০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৮তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০১। সাল ১৩৩৭। শক ১৮৫২। খৃঃ ১৯৩০। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩১।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৩৯। যাইবার পথে

মা! সংসারে আমার যাহা কিছু কাজ সকলই যখন সারা হবে, যখন আমার ওপারে যাইবার সময় হবে, তখন তোমার প্রসন্ন মুখের জ্যোতিতে সম্মুখের সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করিয়া দিও। যখন আমার এই জীর্ণতরীতে ছিন্ন পাল তুলিয়া দিব, তখন আমাকে শান্তিতে চলিতে দিও। তখন তুমি দেখো, যেন ঝড় ও তুফানে আমার এই ক্ষুদ্র তরীখানি অতল সাগরে না তলাইয়া যায়। ঝড় যদি বা ওঠে, তখন আমার তরীতে তুমিই কর্ণধার হইয়া তাহার হাল ধরিয়া বসিও।

আমি সুগন্ধ ফুল বড় ভালবাসি। আমার পথের দুই ধারে তোমার মুখের হাসি ফুলের আকারে ফুটিয়া উঠে, এবং সেই সকল ফুল হইতে তোমারই নিশ্বাসের সুবাস বাহির হইয়া আমার মর্ম্মস্থলকে স্পর্শ করে।

যে প্রাণ তুমি আমায় দিয়াছ, তাহার উপর তুমি তোমার মোহন অঙ্গুলির কোমল পরশ বুলাইয়া দাও; তাহার ভিতর হইতে শত নব গান শত নব তান ঝঙ্কার দিয়া উঠুক। সে গান আর সে তান আমি নিজেও নির্ব্বাক হইয়া শুনি, আর সুরনর যে যেখানে আছে, তাহারা সকলেও নির্ব্বাক হইয়া স্তিমিত নয়নে শুনিতে থাকুক।

মা! কি যাদুমন্ত্রই না জানি তুমি জান! পাছে তোমার নাম গাহিতে গিয়া সংসার ছাড়িতে হয়, তাই তোমার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সমস্ত সংসার আমার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু তুমি আমার কানে মধুর মা নামটী যেমন শুনাইলে, অমনি কোথা হইতে সংসারের সমস্ত জীর্ণ কাহিনী প্রাণের উপর হইতে খসিয়া গেল, আর নূতন নূতন শ্যামল আশাভরসায় প্রাণটা ভরিয়া উঠিল। যে অনাহত গান প্রাণের ভিতর বাজিয়া উঠিল, তাহার নিকট ইহলোকের শত রাগরাগিণী লজ্জায় থামিয়া গেল। তোমার মধুর মা নাম জপ করিতে করিতে আমার সমস্ত মনপ্রাণ মধুর রসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল, আর রসনা নীরব থাকিতে পারিল না—তোমারই অনন্ত নামের অনন্ত পদাবলীতে ভরিয়া উঠিল। তোমারই নামটী সম্বল করিয়া ভবসাগর পার হইয়া যখন তোমার চরণে গিয়া দাঁড়াইব, তখন কি শান্তি—কি শান্তি—কি শান্তি!

৪০। দীন-দুঃখী সন্তান

মা! আমার প্রাণের উপরে তুমি একটী চুম্বন দাও, আমিও খিলখিল করিয়া হাসি, আর

আমার হাসি দেখিয়া তুমিও হাস। তুমি আনন্দে আমার সর্ব্বাঙ্গ চুম্বনে ভরিয়া দাও; আমার দেহ বলিষ্ঠ হইয়া উঠুক, আমার মন সতেজ হইয়া উঠুক। তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। তোমার যাহা কিছু কাজ, সে সমস্তই আমার কাছে বসিয়া বসিয়াই করিতে হইবে। আমি তোমার হাতের খেলা দেখিব, আর আমার ছোট ছোট হাত-পা ছুড়িয়া আনন্দে ও নির্ভয়ে খেলা করিব। তুমি একটুখানি সরিয়া গেলেই আমার প্রাণটা যেন অন্ধকারে ঢাকিয়া যায়, আর আমি কাঁদিয়া উঠি, আমার সুখশান্তি সমস্তই হারাইয়া ফেলি। আমার কান্না শুনিয়া তো তুমি সরিয়া থাকিতে পার না—তখন তুমি ছুটিয়া আস, তোমাকে দেখিয়াই আমারও কান্না থামিয়া যায়—আমি হাসিয়া উঠি। আমার হৃদয় যখন দুঃখকষ্টে ভরিয়া উঠে, তখন মনে হয় যেন আমি বুঝিতে পারি তোমারও প্রাণে উহা কি প্রকার আঘাত দিতেছে। তাই তো তুমি ছুটিয়া আসিয়া তোমার বুকে আমায় তুলিয়া লও আর অজস্রধারে স্তন্যদান করিয়া আমার সমস্ত দুঃখ-কষ্টের অবসান কর। মা! ধূপকাঠির সুগন্ধ ধূম সুগন্ধে আকাশ ভরিয়া কে জানে কোথায় যায়; কিন্তু আমার মর্ম্মগাথা বুক-ভাঙ্গা রাগিণীতে ভুবন ভরিয়া, আমি বেশ জানি, তোমারই চরণতলে গিয়া পৌঁছায়। বিশালবক্ষে সাগর যেমন সুবৃহৎ নদকেও আপনার আশ্রয় প্রদান করে, সেইরূপ একটী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীকেও আশ্রয় দিতে দ্বিধা করে না। তেমনি মা! ভক্তি ধনে ধনী যাহাঁরা, তাঁহাদের গান তো তোমার কানে তোল-ই; আবার আমার মত অবোধ শিশুর আবোলতাবোল ভাষায় ব্যক্ত প্রাণের গানের অস্ফুট ধ্বনিও, আমি বেশ জানি, তোমার কানে পৌঁছায়। তাই তো আমি প্রাণ ভরিয়া তোমায় ডাকিলেই তুমি আসিয়া দেখা দাও। এসো মা! একবার এসো, আর তোমার এই অকৃতী দীনদুঃখী সন্তানকে কোলে তুলিয়া লও।

৪১। স্নেহের পরশ

মা! তোমার চক্ষু হইতে যে স্নেহের ঝোর আমার দিকে নিত্য বহে, সারাক্ষণ তাহাই দেখিবার জন্য আমার প্রাণ আকুলদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে; তাহারই মৃদুলমধুর কুলুকুলু ধ্বনি দিবানিশি শুনিবার জন্য আমি কান পাতিয়া বসিয়া থাকি। সংসারে তোমার অন্যান্য যে সকল সন্তানকে দেখিয়া লোকে মনে করে সুখী, তাহাদের রঙ্গ দেখিয়া চক্ষু গেল ক্ষরিয়া; ছোটখাটো বিষয় লইয়া তাহাদের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটির কোলাহল-কলরবে কান গেল বধির হইয়া। আমি ঐ প্রকার কোন কিছু চাই না; আমি চাই তোমাকে। আমার ক্ষুধা পাইলে তোমাকেই বলিব, তৃষ্ণা পাইলে তোমাকেই বলিব, তুমিই অন্নজল দিয়া আমাকে রক্ষা করিও। তুমি চারিদিকে যে সমস্ত ফুল ফুটাইয়া রাখিয়াছ, আমি তাহারই মধ্যে ঘুরিব ফিরিব; তাহারই বর্ণে আমার প্রাণটা রাঙ্গাইয়া তুলিব, আর তাহারই সুগন্ধে আমার যাহা কিছু সকলই সুবাসিত করিয়া তুলিব। শরতের আকাশ যখন প্রভাতে তোমার প্রথম চরণপাতে শতবর্ণে ঝকঝকিয়া ওঠে, তখন আমারও প্রাণটাকে সেই রঙ্গে রাঙ্গাইয়া লইব এবং সর্ব্বাঙ্গে তোমারই চরণে ছাপ তুলিয়া লইব। তোমার নামটী আমার প্রাণে জাগিয়া উঠিলেই প্রাণের ভিতর কত গান কত সুর যে বাহির হইবার জন্য আকুলিবিকুলি করিতে থাকে, আমি তাহা কাহাকে বুঝাইব? তুমি যখন তোমার স্নেহহস্তখানি আমার অঙ্গে বুলাইয়া দাও, তখন কি যে শান্তি পাই, একমাত্র অজস্র অশ্রু ব্যতীত তাহা বুঝাইবার অন্য ভাষা খুঁজিয়া পাই না। তোমার সেই স্নেহের পরশ যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে নিত্যই লাগে।

৪২। সন্ধ্যা আসে!

মা! তোমার সন্তান যে ধুলায় লুটোপুটি খাইতেছে—তাহা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ না? সারাদিন ধরিয়া ভাবনায় চিন্তায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইতেছি, তবু একটী লোকেরও প্রাণে দয়া হয় না যে, একবার মুখের কথাটী খসাইয়া জিজ্ঞাসা করে যে কেন কাঁদিতেছি। তুমি সেই যে আমায় প্রভাতের অরুণোদয়ে এখানে ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছ, আর তো তোমার দেখা নাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। আর কিছুক্ষণ পরেই ঘোর অন্ধকার ধরাবক্ষ ছাইয়া ফেলিবে। তখন আমি দাঁড়াইব কোথায়? চারিদিকে ভীষণ শ্বাপদসমূহের হুঙ্কার যতই কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে, ততই তো আমার প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া

উঠিতেছে। মনে বড়ই ধিক্কার আসিতেছে যে, কেন তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলাফেরা করিলাম না? মা! আর আমাকে এরকম শ্বাপদসঙ্কুল স্থানে রেখো না। মধ্যে মধ্যে তোমার মুখের বিমল জ্যোতি আমার চোখের উপর পড়িতেছে বলিয়া এখনও এস্থান হইতে উদ্ধার পাইবার আশা পোষণ করিতেছি। মা—এসো—একবার এসো। একমাত্র তোমারই নাম আমার জপমন্ত্র হইয়াছে। আমায় কোলে করিয়া যখন তুমি এখানে আসিয়াছিলে, তখন আমি তোমার স্নেহের যে সুবাস পাইয়াছিলাম, সেই সুবাস আজিও আমার প্রাণকে ভরিয়া রাখিয়াছে। মা! তুমিই আমার জন্মদান করিয়াছ; আমি ঠিক জানি, তুমিই আমাকে মরিবার পথে যাইতে দিবে না—বিনাশ হইতে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবে। হেথাকার অশান্তির তরঙ্গ আর সহ্য হয় না—একটুখানি শান্তি দাও—আমায় রক্ষা কর—আমাকে বাঁচাও। তুমি আমায় কোলে তুলিয়া লও—আমি তোমার বুকের উপর নিশ্চিন্ত মনে একটুখানি ঘুমাইয়া পড়ি।

৪০। একটানা স্রোত

মা! আমার শরীরের প্রত্যেক ধমনীতে যে রক্তস্রোত বহিতেছে, সেই রক্তস্রোতের প্রত্যেক বিন্দুতে তোমারই স্নেহপ্রেম উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। আমার হৃদয়ে যে ধকধকি ধ্বনি জাগিয়া উঠিতেছে, আমার জন্মগ্রহণের সময় তোমার যে স্নেহনিশ্বাসের ফুৎকারে আমাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছিলে, ঐ ধকধকির মধ্যে সেই নিশ্বাসেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। সংসারের এই যে কর্ম্মক্ষেত্রে আমি ছুটাছুটি করিতেছি, আর কোলাহল-কলরব বাড়াইয়া তুলিতেছি, তাহার মধ্যে তোমার আমাকে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা দেখিতেছি। সন্ধ্যা বেলায় যখন আমি চাঁদের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া আত্মহারা হইয়া যাই, তখন তুমি কোন্ অতর্কিত অবসরে স্তন্যদানে আমার প্রাণ ভরিয়া দাও। আমারও স্বপ্ন যখন সহসা ছুটিয়া যায়, তখন আমি আমার ছোট ছোট দুই বাহু বাড়াইয়া তোমাকে জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করি, আর তুমিও আমাকে তোমার স্নেহবক্ষে জাপটাইয়া ধরিয়া অজস্রধারে শান্তিসুধা বর্ষণ করিয়া আমাকে তাহারই সলিলে স্নান করাও। তখন আমার সমস্ত কথা, এমন কি সমস্ত প্রার্থনাও বন্ধ হইয়া যায়, কেবল আরও দাও, আরও দাও এই একই শব্দের আনন্দধ্বনি জাগিতে থাকে, আর দুই গাল বহিয়া আনন্দাশ্রুও ঝরিতে থাকে। মা! কত দীর্ঘ—দীর্ঘকাল, কত যুগযুগান্তর ধরিয়া কখনও বা তোমার কোলে উঠিয়া, কখনও বা তোমার আঁচল ধরিয়া সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে তোমারই সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি তাহা কে জানে? বেড়াইতে বেড়াইতে আজ আবার তোমারই সন্তানরূপে তোমারই সঙ্গে এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি! এখানকার কাজ যখন সাঙ্গ হবে, তখন আবার জন্মজন্মান্তরে তোমারই সন্তান হইয়া তোমারই সঙ্গে অনন্ত—অনন্ত কাল ধরিয়া চলিতে থাকিব; মধ্যে মধ্যে বিপথে পড়িতে গেলে তুমিই আমাকে হাতে ধরিয়া তোমারই পথে টানিয়া আনিবে—সেই স্পর্শে আমার দেহমন সমস্তই পবিত্র হইয়া যাইবে। এই চলাফেরার শেষ নাই—শেষ নাই; অথচ ইহাতেই শান্তি—চরম শান্তি। মৃত্যুর ঘূর্ণীপাক এড়াইবার জন্য তখন আর মধ্যে মধ্যে সমস্যামূলক এক-একটী প্রশ্নের খোঁটা ধরিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইতে হইবে না—জীবনপ্রবাহ তখন শান্তিময় একটানা স্রোতে বহিয়া চলিবে। সে পথে দিন নাই, রাত্রি নাই। দিবসের কর্ম্মকোলাহল নাই, নিশীথের বিশ্রামবাসনাও নাই। এক অপূর্ব্ব গোধূলি-আলোকে সারা পথই আলোকিত। কোনই কর্ম্ম নাই, অথচ নিবিড় কর্ম্ম চলিতেছে—তাহার বিরাম নাই। এই অফুরন্ত শান্তির মাঝেও যখন সময়ে সময়ে বড়ই ক্লান্তি আসে, তখন তোমার কোলে উঠিবার জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হয়। মা! তখন একবার সাড়া দিও, আর স্নেহের ডাকে ডাকিয়া কোলে তুলিয়া লইও।

ব্রাহ্মসমাজে "তুমি" ভাব।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

গত মাঘোৎসবের সময়ে নববিধানসমাজ হইতে "নববিধান-ঘোষণা ও তাহার পরিচয়" বলিয়া একখানি ক্ষুদ্র পত্রী বিতরিত হয়। তাহাতে লিখিত আছে—"ব্রহ্মানন্দ

কেশবচন্দ্র যখন আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন তিনি ভগবানকে প্রথম পুরুষে পরোক্ষভাবে সম্বোধন না করিয়া, প্রার্থনা ও আরাধনাযোগে যাহাতে তাঁহার সহিত উপাসকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তৎপ্রতি অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। তখন ভগবানকে প্রথম পুরুষে সম্বোধন করা রূপ পরোক্ষ সম্বন্ধের পরিবর্ত্তে, মধ্যম পুরুষ "তুমি"শব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়া তাঁহার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল।" আমাদের মনে হয়, এরূপ ভিত্তিহীন উক্তি দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের এই পুনর্মিলনের যুগে ঐতিহাসিক বিরোধেরও সৃষ্টি করা উচিত নয়।

১৭৬৬ শকের বৈশাখসংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ" এর বক্তৃতার শেষে দেখি "হে জগদীশ্বর এই মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা ব্রাহ্মদিগের প্রতি অর্পণ কর" এই প্রার্থনা আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, যখন কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে আগমন স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মাত্র দুই বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মসমাজ মাত্র ১৫ বৎসর চলিয়াছে, সে সময়েও দেবেন্দ্রনাথ ভগবানের সহিত "তুমি" দ্বারা প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন।

এইরূপ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ মানবের চিরন্তন অভিজ্ঞতার অন্তরতর সনাতন সত্য। এরূপ সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্যে, বলিতে কি, সত্যই আমরা কোন বিশেষত্ব উপলব্ধি করিতে পারি নাই। এখন, যখন নববিধান-সমাজ ইহার মধ্যে বিশেষত্ব দেখাইতেছেন, তাই আমরা উহার ঐতিহাসিক সত্যটুকু প্রকাশ করিলাম।

অক্ষয়কুমার দত্ত ১৭৬৮ শকের আষাঢ়সংখ্যায় তাঁহার বক্তৃতার শেষে লিখিতেছেন—"হে জগদীশ্বর, বিষয়েতে মগ্ন হইয়া যেন তোমাকে বিস্মৃত না হই এমত কৃপা আমারদিগের প্রতি প্রকাশ কর"। ১৭৬৯ শকে ভাদ্রসংখ্যায় "ব্রহ্মস্তোত্র" আছে—তাহার আদ্যন্তমধ্যে "তুমি" ভাব ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। মাঘ-সংখ্যায় "সংক্ষেপে ব্রহ্মোপাসনা" "ও নমস্তে সতে" সুপ্রসিদ্ধ স্তোত্র এবং "প্রার্থনা", যাহা আজও আদি-ব্রাহ্মসমাজের "বাধ্যায়"কালে পঠিত হয়, সন্নিবিষ্ট দেখি—এ সকলের মধ্যে "তুমি"ভাব সুপরিস্ফুট। ১৭৭০ শকের ফাল্গুনে একটি "ব্রহ্মস্তোত্র" "তুমি"ভাবে পরিব্যাপ্ত। ১৭৭২ শকের জ্যৈষ্ঠে একটি "ব্রহ্মস্তোত্র" "তুমি" ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ১৭৭৩ শকের ফাল্গুন মাসে "তুমি" ভাবে ব্যাপ্ত "ব্রহ্মস্তোত্র" প্রকাশিত হয়। ১৭৭৪ শকের চৈত্রসংখ্যায় সাম্বৎসরিক বক্তৃতার শেষে"তুমি"ভাবাত্মক প্রার্থনা সন্নিবিষ্ট দেখি। ১৭৭৪ শকের আশ্বিন-সংখ্যায় "ব্রহ্মোপাসনা"র মধ্যে একটী "তুমি" ব্যাপ্ত "স্তোত্র" সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ১৭৭৫ জ্যৈষ্ঠে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের মাসিক সমাজের বক্তৃতা "তুমি" ভাবে পরিব্যাপ্ত। ১৭৭৫ অবধি বক্তৃতার শেষে একটুখানি প্রার্থনার সংযোগ রাখা চলিতে লাগিল। ১৭৭৫ পৌষে "ব্রহ্মস্তোত্র" আছে। ১৭৭৬ শকের জ্যৈষ্ঠে "ব্রহ্মস্তোত্র" আছে। আষাঢ়ে "ব্রহ্মস্তোত্র" আছে। ভাদ্রে "ব্রহ্মস্তোত্র"। ১৭৭৭ জ্যৈষ্ঠে ব্রহ্মস্তোত্র আছে। ১৭৭৭ শ্রাবণে ব্রহ্মস্তোত্র। ভাদ্রে ব্রহ্মস্তোত্র। আশ্বিনে—ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের বক্তৃতা প্রার্থনাব্যাপ্ত। কার্ত্তিকে—ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা প্রার্থনাব্যাপ্ত। মাঘে—ব্রহ্মস্তোত্র। ১৭৭৮—জ্যৈষ্ঠে স্তোত্র। ভাদ্রে স্তোত্র। কার্ত্তিকে স্তোত্র। ১৭৭৯—জ্যৈষ্ঠে স্তোত্র। ত্রিপুরা-ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতায় প্রার্থনা। ফাল্গুন—সাম্বৎসরিক উৎসবের বক্তৃতায় প্রার্থনা। ১৭৮০ ভাদ্র—প্রাতঃস্তোত্র। আশ্বিনে—সায়ংস্তোত্র। কার্ত্তিকে—সামাজিক স্তোত্র। অগ্রহায়ণে স্তোত্র। পৌষে বেহালা সমাজে পঠিত স্তোত্র। মাঘে—আত্মনিবেদন। ফাল্গুনে—সাম্বৎসরিক বক্তৃতায় প্রার্থনা। চৈত্রে স্তোত্র। ১৭৮১ বৈশাখ—স্তোত্র। জ্যৈষ্ঠে—নববর্ষে প্রার্থনা। আষাঢ়ে—সংক্ষেপ ব্রহ্মোপাসনা ও স্তোত্র। শ্রাবণে—সংক্ষেপ ব্রহ্মোপাসনা ও স্তোত্র। এই বৎসরের জ্যৈষ্ঠ অবধি দেখি যে সিন্দুরিয়াপটি গোপাল মল্লিকের বাটীতে একটী ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হয়—কেশবচন্দ্র তাহার সম্পাদক ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। আশ্বিনে—ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মোপাসনাতে স্তোত্র ও প্রার্থনা সন্নিবদ্ধ। মাঘ—কেশবচন্দ্র অন্যতর সম্পাদক। ফাল্গুনে সাম্বৎসরিক উৎসবে ব্রহ্মস্তোত্র। ১৭৮২ অগ্রহায়ণে—পরিবারে প্রার্থনা। পৌষে ব্রহ্মস্তোত্র। চৈত্রে ব্রহ্মস্তোত্র। ১৭৮৩—বৈশাখে প্রাতঃকালে প্রার্থনা, নিদ্রার পূর্ব্বে প্রার্থনা, সম্পদে প্রার্থনা এবং বিপদে প্রার্থনা। জ্যৈষ্ঠে ব্রহ্মস্তোত্র। এ সময় কেশবচন্দ্র উত্তরপশ্চিমে দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে গিয়াছেন। তিতিক্ষার জন্য, পাপ হইতে পরিত্রাণের জন্য, মৃত্যুকালীন প্রার্থনা। আষাঢ়ে আত্মসমর্পণ। আশ্বিনে ব্রহ্মস্তোত্র। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রার্থনা। অগ্রহায়ণে—সায়ংকালের ব্রহ্মস্তোত্র। মাঘে—যৌবনকালের ব্রহ্মস্তোত্র। ফাল্গুনে—সাম্বৎসরিক উৎসবে প্রার্থনা। চৈত্রে—মধ্যাহ্নে ব্রহ্মস্তোত্র। ১৭৮৪—জ্যৈষ্ঠে ব্রহ্মস্তোত্র। বেহালা-সমাজে নববর্ষে প্রার্থনা। আষাঢ়ে রোগীর প্রার্থনা। এই শকেই কেশবচন্দ্র আচার্য্য পদে অভিষিক্ত। আত্মনিবেদন। শ্রাবণে—নিশীথের ব্রহ্মস্তোত্র। ব্রহ্মবাদিনীর প্রার্থনা। পিতার শ্রাদ্ধে যজমানের প্রার্থনা। অগ্রহায়ণে—নিবাধই ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতায় প্রার্থনা। ফাল্গুনে—নামকরণে ব্রহ্মস্তোত্র। সম্বৎসরিক উৎসবের বক্তৃতায়

প্রার্থনা। মাতার শ্রাদ্ধে এবং পিতার শ্রাদ্ধে প্রার্থনা। চৈত্রে—বেহালা সমাজের বক্তৃতায় প্রার্থনা। ব্রহ্মস্তোত্র। যজমানের প্রার্থনা।

আর অধিকদূর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই। উপরে যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে যে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে আগমনের বহু পূর্ব্বাবধিই প্রার্থনার ভাব, সুতরাং "তুমি" ভাব চলিয়া আসিতেছিল। এই ভাব মানুষের প্রাণের স্বাভাবিক ভাব, এবং ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়ের কারণই হইল ভগবানকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিবার অবসর পাওয়া। অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে এইরূপ ডাকার অপেক্ষা ভগবানকে জানিবার ব্যবস্থার দিকেই বেশী ঝোঁক দেওয়া হইয়াছিল। মহর্ষির ব্রাহ্মসমাজে যোগদান অবধিই, বিশেষত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ অবধিই ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে ডাকিয়া অন্তরাত্মাে বসাইবার ভাব খুবই প্রবল হইয়া উঠিল। এ প্রকার বিষয় লইয়া যে চুলচেরা বিচার করা হইবে, তাহা ইতিপূর্ব্বে আমাদের কেন, কাহারও মনে স্থান পাইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। এই প্রকার ছোটখাটো বিষয় লইয়া ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণের মধ্যে অযথা পার্থক্য বা invidious distinction স্থাপন করা আমরা কোন কারণেই সঙ্গত বা সমর্থনযোগ্য মনে করিতে পারি না। যেদিন ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বীজমন্ত্র যে "ভগবানকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা এবং এই প্রকার উপাসনা দ্বারাই মানবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়" বিঘোষিত হইয়াছিল, সেই দিন অবধি ভগবানের সহিত মানবের সাক্ষাৎ আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপনের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাকে যদি কেহ বিশেষ বিধান বা "নববিধান" বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই; আমরা কিন্তু ইহাকে পুরাতন ও চিরন্তন সনাতন বিধানেরই পুনরুদ্দীপন বলিয়া মনে করি। এই মিলনের যুগে বিভিন্ন শব্দের আভিধানিক পারিভাষিকত্ব বিলুপ্ত হইয়া ব্রহ্মোপাসকমণ্ডলীর মধ্যে প্রীতি ও মিলনের ভাব যতই গাঢ়তা ও গভীরতা লাভ করিবে, ততই মঙ্গল।

উৎসব।

(২)

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ)

যা ব্যষ্টি হয়ে, বিচ্ছিন্ন হয়ে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়েছিল, উৎসবে তা সমষ্টির আকারে আত্মপ্রকাশ করে, তা পুঞ্জীভূত হয়ে দেখা দেয়। পাঁচটি দীপশিখার সম্মিলিত জ্যোতি যেমন নিমেষে অন্ধকার কক্ষকে সমুজ্জ্বল করে তুলতে সমর্থ, তেমনি পাঁচটি ভক্তের সম্মিলিত প্রাণের আত্মনিবেদন পরব্রহ্মের চরণতলে উপনীত হবেই হবে। আতস কাচের সাহায্যে সূর্য্যের রশ্মিগুলিকে যদি এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করা যায়, তবে যেমন সেখানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে, তেমনি যেখানে সাধকের ভক্তি-প্রীতি কেন্দ্রীভূত সেখানে ভগবানের করুণাধারা উৎসমুখে ফুটে উঠতে বাধ্য।

তাই, উৎসবের মধ্যে আমরা পাই ভগবানের পূর্ণতম বিকাশ, আনন্দের অফুরন্ত উৎস, যার রসমাধুরী-ধারা কোন কালে নিঃশেষ হয়ে যাবে না। বকুলবৃক্ষের মূলে নৈদাঘী পবনের মৃদুল হিল্লোলে নিপতিত বকুলফুল যখন অযত্নে ভূমিশয্যায় শয়ান থাকে, তখন সে যেমন পথিকের নজরেই আসে না, কিন্তু যখন গৃহস্থ-বালিকার কোমল হস্তের সুনিপুণ কৌশলে সূত্রের সমবায়ে সেই উপেক্ষিত কুসুমরাশি মাল্যে রূপান্তরিত হয়, তখন তা মুনিজনমনোলোভা; তেমনি পৃথক্‌ভাবে গণনা করতে গেলে যদিও সাধকের হৃদয়-নিহিত ভাববিন্দু তাদৃশ আকর্ষক নয়; কিন্তু যখন উৎসবক্ষেত্রে সম্মিলিত ভক্তের ভাবরাশি ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়ে আকাশগঙ্গার আকারে পরব্রহ্মের চরণতলে উপনীত হবে, তখন তা কিছুতেই উপেক্ষার বস্তু নয়—তখন তা নিয়ে আসবে দুঃখ দৈন্য নিপীড়িত জীবনে শান্তির অমিয়-নির্ঝর।

উৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা আরও দু'টি অমূল্য জিনিষ লাভ করি—সাম্য ও মৈত্রী। এই উৎসব-প্রাঙ্গণতলে পরব্রহ্মের মন্দিরদ্বারে সকলেই সমান—রাজাপ্রজা, ধনী-দরিদ্র, দাতা-ভিক্ষুক, গুণবান্ গুণহীন,—এই সমস্ত পার্থিব জগতের বৈষম্য-বিভিন্নতা কোন্ দূর-চক্রবালে তিরোহিত, সকলেই পরব্রহ্মের উপাসক, সকলেরই কণ্ঠে এক ধ্বনি—ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তারপর যখন ভেদের গণ্ডী, সামাজিক এবং জাগতিক বিভিন্নতা-বৈষম্যের গণ্ডী, মান-যশ-লালসার গণ্ডী ভেঙ্গে দিয়ে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করতে পারি আমরা সকলেই সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবানের সন্তান, তখন সমবেদনায়—সহানুভূতিতে হৃদয় ভরে উঠে; যাদের এতদিন দূরে রেখেছিলাম, তাদের প্রাণভরে আলিঙ্গন কর্ব্বার জন্য ছুটে যাই—কারণ তারা যে আমার ভাই, বড় আপনার, বড় আদরের।

উৎসবক্ষেত্রেই উৎসবের কাজ সাঙ্গ হয়ে যায় না; উৎসবের অবসানে যখন গৃহে গিয়ে সংসারের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে যাই, তখন যদি কোন সময়ে লালসা-রাক্ষসী মোহিনীমূর্ত্তিতে আমাদের সত্যপথচ্যুত করতে ধেয়ে আসে; স্বার্থপরতা

শত বাহু বিস্তার করে মানসরাজ্য গ্রাস করতে ছুটে যায়; আর সেই মায়া-মোহের কুহকজালে আবদ্ধ আমি —যদি বিপথে ভ্রমণ করতে ইচ্ছা করি, অমনি উৎসবের দীপালোকিত মন্দিরপ্রাঙ্গণ শান্ত স্নিগ্ধ দীপ্তিতে সকলের পুরোভাগে ফুটে উঠে—জলদগম্ভীর নির্ঘোষে বলে—কি নিয়ে এসেছিলে উৎসব-প্রাঙ্গণ হতে অন্তর-আধারে নিহিত করে? আজ তোমার এ কি আচরণ? তুমি যে অমৃতের পুত্র—ব্রহ্মের চরণে সমর্পিতজীবন তুমি—এ দৌর্ব্বল্য তোমার সাজেনা। অমনি আত্মজ্ঞান ফিরে আসে, লজ্জায় ভূমিতলে লুটিয়ে পড়ি!

সেদিনই জীবনে প্রকৃত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, যেদিন পরব্রহ্মের পুণ্য চরণে জীবন উৎসর্গ করে সংসার-সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা অবলীলায় পার হয়ে যেতে পারি, যেদিন লালসা-মায়া-মোহজাল বিচ্ছিন্ন করে সত্যের মুক্ত তোরণে সাম্য-মৈত্রীর বেদিকাতলে দণ্ডায়মান হয়ে বলতে পারি, "দাও প্রভো, আমাকে তোমার পূত চরণতলে আশ্রয় দাও, সংসার-গহন-বনে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান্ আমি, আমাকে হাত ধরে ঈপ্সিত পথে নিয়ে চল"। জীবনে উৎসব সার্থক হবে সেদিন যেদিন দেখতে পাব, পুষ্পিত তৃণবীথির অন্তরালে, প্রভাতের শিশিরবিন্দুখচিত প্রস্ফুটিত কমলদলে, নির্ঝরিণীর চঞ্চল তরঙ্গরঙ্গে, মহাসমুদ্রের নীল জলরাশির উপর নিপতিত নৈশগগনের দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নায়—"ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্"।

সত্য সত্য উৎসবের আনন্দ-বিকাশে কৃতকৃতার্থ হব সেদিন, যেদিন নিখিল চরাচরের সর্ব্বত্র—বাসন্তী সমীরের উচ্ছ্বাসে সপ্তস্বরা বীণার প্রাণোন্মাদকারিণী রাগিণীর মধ্যে, স্তব্ধ রজনীর মধ্যভাগে দূর নদীবক্ষে নাবিকের করুণ ভাটিয়াল গানে, পাপিয়ার আত্মহারা করুণ তানে, শিশুর অস্ফুট-ভাষে, পণ্ডিতের তর্কনৈপুণ্যে—শুনতে পাব —"ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্"।

যেদিন অন্তরে বাহিরে বিশ্বজগতে পরব্রহ্মের ভূমানন্দ চারিদিকে জেগে থাকবে, যার সংস্পর্শে ভুলে যাব সংসারের হিংসাদ্বেষ-পরশ্রীকাতরতা, নির্ব্বিকারচিত্তে সহ্য করতে পারব দুঃখ-দৈন্য-অভাব-অভিযোগের তীব্র যন্ত্রণা, আলিঙ্গন করতে পারব, ভাই বলে জাগতিক সমস্ত নরনারীকে—সেই দিনই জীবনে সত্য সত্যই উৎসবের বোধনগান প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে উঠবে। আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত করে গম্ভীরমন্দ্রে নিনাদিত হবে—ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

আর তা যদি না হয়, যদি জীবনে সে শুভ মুহূর্ত্ত না আসে, মঙ্গলময়ের মঙ্গলহস্ত সম্পদে বিপদে আমার রক্ষার্থ সম্প্রসারিত না দেখি, তবে বুঝতে হবে, জীবনে সত্য উৎসব হয়নি, মিথ্যার ডালি দিয়ে জীবনকে ভরিয়ে দিয়েছি, ভণ্ডামির মুখোস পরে শুধু লোকের চোখে ধুলো দিইনি, পরন্তু নিজেকেও প্রতারিত করেছি। প্রকৃত উৎসব হয়নি, জীবনকে ব্রহ্মপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে পারিনি,—ব্যর্থ হয়ে গেছে সব,—"মিছে দ্বারে সহকার-শাখা, মিছে শুধু মঙ্গলকলস।"

বিশ্বব্যাপী পরব্রহ্মের যে মহামহোৎসব দিবসরজনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যে উৎসবে চন্দ্রতারকার দীপমালা ধরণী-বক্ষ উদ্ভাসিত করে, কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুমমালা উজ্জ্বল আনন্দে হেসে উঠে পূজার ডালি সাজিয়ে দেয়, বিহঙ্গের কলনিনাদ তটিনীর মৃদুল কল্লোলের সঙ্গে একীভূত হয়ে দিকে দিগন্তরে পরব্রহ্মের গুণগান করে বেড়ায়, স্নিগ্ধ পবনের সন্তাপহারী হিল্লোলে কোন দূর স্বর্গরাজ্যের প্রাণ-মাতানো মন-ভোলানো সৌরভ বহন করে নিয়ে আসে, সে উৎসবের ছবি যেন পদে-বিপদে শয়নে-স্বপনে, কর্ম্মে-বিরামে রোগে শোকে হৃদয়ে মনে প্রাণে অনুভব করি, আর সঙ্গে সঙ্গে বলি—প্রভু আমারও জীবনযাত্রা তোমার এ শাশ্বত নিত্য উৎসবের অন্তর্ভুক্ত করে নাও—সার্থক হোক আমার জীবন, সফল হোক আমার আনন্দবিকাশের প্রচেষ্টা।

আষাঢ়ের এই শান্ত স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় যাঁহারা পরব্রহ্মের উপাসনায়, ব্রহ্মপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাগত হয়েছেন এই আষাঢ়ের বৃষ্টিধারার মত পরব্রহ্মের অনন্ত করুণাধারা তাঁদের উপর বর্ষিত হোক; দূরে যাক তাঁদের রোগ-শোক-দুঃখ-দৈন্য; দূরীভূত হোক বাসনা-কামনা; অপার অন্তহীন ব্রহ্মের মঙ্গলময়ী বাণী হৃদয়ে হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হোক।*

তরুদত্ত ও রোমাণ্টিসিজম্।

(শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল,)

কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ১৮৩৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মধুসূদন দত্ত ও রামবাগানের দত্ত-কবিরা সে সময়ে ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করিয়াছেন। ১৮৪৯ সালের "কলিকাতা রিভিউ" নামক সুপরিচিত মাসিক পত্রিকা পাঠে জানা যায় যে, উক্ত দত্ত-কবিরা তখন ইংরাজী কবিতারচনায় সিদ্ধহস্ত হইয়াছেন। মধুসূদন ও রামবাগানের দত্ত-কবিদের মধ্যে অনেকেই একাধিক য়ুরোপীয় ভাষা, বিশেষতঃ ফরাসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তরু দত্তের পিতা গোবিন চন্দ্র দত্ত ও তাঁহার আত্মীয়গণের রচিত "দত্তদের পারিবারিক আলবাম" (The Dutt Family Album) নামে কাব্য-গ্রন্থে ও গিরিশচন্দ্র দত্তের রচিত "চেরী ব্লসমস্" (Cherry Blossoms) নামক কবিতা-পুস্তকে আমরা রোমাণ্টিসিজমের যে

* ভবানীপুর-ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে গত ১ই আষাঢ় সায়ং উপাসনায় বিবৃত।

প্রভাব অনুভব করি, তাহাতে বহির্জ্জগত ও কবির আত্মকথা, এই দুইটি বিষয়ের সংবাদ পাই। এতদ্ব্যতীত, বিদেশের অসংখ্য চিত্রও তাঁহারা অঙ্কিত করিয়া আলোচ্য দুইখানি কাব্য-গ্রন্থে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। "আলবামের" আধারে রক্ষিত জারমান ও ফ্রেঞ্চ কবিতা হইতে পদ্যময় ইংরাজী ভাষায় অনূদিত রচনার সংখ্যা বিংশাধিক। "আলবামের" কবিরা রোমাণ্টিসিজমের গ্যালারি হইতে আদর্শ সংগ্রহ করিয়া মোগল-ভারত, রাজপুত-বীরত্ব ও হিন্দু বীরনারীর অনেকগুলি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। রামবাগানের দত্তবংশীয় হিন্দু ও খৃষ্টান কবিদিগের যে সকল পদ্যময় রচনায় দেশাত্মবোধের ছায়াপাত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যাও কম নয়। উক্ত খৃষ্টান কবিদিগের মধ্যে তরুদত্ত ব্যতীত অপর কেহ পৌরাণিক আদর্শ কাব্যের বিষয়ীভূত করেন নাই। রামবাগানের দত্তবংশীয় হিন্দু কবিদিগের সকলেই কিন্তু ইংরাজী কাব্যের আসরে প্রাচীনতম হিন্দু আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রায় বাহাদুর শশীচন্দ্র দত্ত ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়, যোগেশ চন্দ্র ও রমেশ চন্দ্র, বঙ্গদেশে সেই ইংরাজিয়ানার দিনে রামায়ণ ও মহাভারতের বিস্তর চিত্র যে পদ্যময় ইংরাজী ভাষার ফ্রেমে সাজাইয়াছিলেন, তাহার কারণ ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের রোমাণ্টিক্ কবিগণ তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে অতীতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া প্রাচীন আদর্শ হইতে অনেক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক শেলী ও কীটসের কাব্যে প্রাচীন গ্রীক কাব্য-সাহিত্যের দেবদেবীগণের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। রায় বাহাদুর শশীচন্দ্র দত্তের "সুমেরুর স্বপ্ন" (Vision of Sumeru) ইংরাজ-কবি সাদে-রচিত (Southey) "কেহামার অভিশাপ" (Curse of Kehama) নামক মহাকাব্যে বর্ণিত সুমেরুর বর্ণনার অনুকরণে লিখিত বলিয়া আমাদের সন্দেহ হয়।

বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করিয়া অতীতের প্রতি কবিহৃদয়ের এই যে টান, ইহা রোমাণ্টিসিজমের অন্যতম বিশিষ্টতা। ইহার তলে তলে সমাজ-সংস্কারের একটা প্রবল ইচ্ছা যে বিদ্যমান ছিল, তাহা শুধু অনুমানসাপেক্ষ নহে। রোমাণ্টিসিজমের হাওয়া যে সকল দেশে বহিয়াছে সেখানে কাব্য-সাহিত্যের ভিতর দিয়া কবিরা ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের যতটা উপকার করিতে পারিয়াছেন, আচার্য্যগণ বেদীতে বসিয়া সদুপদেশদানে ততটা উপকার করিতে পারিয়াছেন কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয়। রামবাগানের বাহিরে ইংরাজি ভাষার অন্যান্য হিন্দু কবিরাও পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্যের কৃপায় বিস্ময়ের বশীভূত হইয়া সময়োপযোগী অসংখ্য ইংরাজী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরও সৌন্দর্য্যদৃষ্টি ঘরে বাহিরে সকল স্থানে নূতনতর আদর্শকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। বাস্তবিক, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশের সাহিত্য-জগতে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল তাহার একমাত্র কারণ ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি-হৃদয়ে বিস্ময়ের পুনর্জ্জন্ম।

ইংরাজী ভাষার বাঙ্গালী রোমাণ্টিক কবিদিগের মধ্যে তরুদত্তের স্থান সর্ব্বোচ্চ। তিনি শৈশবাবধি ফরাসি ভাষায় পদ্য ও গদ্য সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কবি-জীবন গঠিত ও কবিহৃদয় প্রসারিত হইয়াছিল। রোমাণ্টিক ফ্রেঞ্চ কবিদিগের অনেকেই তরুদত্তের সমকালে জীবিত ছিলেন। এই মহিলা-কবি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমসাময়িক ফরাশি লেখকদিগের রচনা পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনীপাঠে জানা যায় যে, প্রতি সপ্তাহে তিনি বিদেশী ডাকযোগে ফ্রেঞ্চ ভাষায় লিখিত একাধিক সাময়িক পত্রিকা প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার পিতা গোবিনচন্দ্র দত্ত পরিবারবর্গের সহিত য়ুরোপ হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিবার পরে ফরাসি সাহিত্যিকগণের লিখিত বিস্তর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তরু দত্তের জন্য ফ্রান্স হইতে আমদানি করিয়াছিলেন। ফ্রান্সকে তরু দত্ত যে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন তাহার প্রমাণ কবির রচিত "ফ্রান্স" শীর্ষক কবিতা ব্যতীত অন্যান্য রচনাতেও পাওয়া যায়। ফ্রান্সের রাজনীতি সম্বন্ধেও তরু রীতিমত আলোচনা করিতেন ও তৎসম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছিলেন। তরু দত্তের ফ্রান্স রোমাণ্টিসিজমের দ্বিতীয় যুগের ফ্রান্স, ভিক্টর হুগো ও তাঁহার শিষ্যগণের ফ্রান্স। ভিক্টর হুগোর আদর্শে যে সকল ফরাশি কবি তরু দত্তের যুগে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ফরাসি কাব্য-জগতে সুপরিচিত। ভিগ্নি (A. de Vigny) সেন্ট বোভ্ (Sainte-Beuve), গটিয়ার (T. Gautier), গ্রামণ্ট (F. de Gramont), সোলারি (G. Soulary) প্রভৃতি কবিগণ কাব্য-সাহিত্যের ভিতর দিয়া নূতন ভাবরাশির ধারা-বর্ষণে সেই বিস্ময়ের যুগে ফরাশি পাঠকগণকে বিস্ময়াভিভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন। জারমান-ইহুদী কবি হিন্ (Henri Heine) ফ্রান্সে অবস্থান করিতেন ও বিস্তর উৎকৃষ্ট কবিতা ফরাসি ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। য়ুরোপের অন্যান্য কয়েকজন কবিও ফরাসি ভাষায় অনেক সুন্দর কবিতা রচনা করিয়া উক্ত ভাষার কাব্য-কুঞ্জে মানবহৃদয়ের বিস্ময়ভাবকে সঙ্গীত-মুখর করিয়াছিলেন। তরু দত্তের রচিত ফ্রেঞ্চ কবিতার সংখ্যা খুব কম হইলেও ফরাশি গদ্যে লিখিত যে সকল পত্র শ্রীমতী ক্লারিশা বেডারকে তিনি কলিকাতা

হইতে ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে রোমান্টিসিজমের প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত হয়। তরুদত্তের রচিত "ডি আর্ভার্স" নামে সুবিখ্যাত ফ্রেঞ্চ উপন্যাসে সদা-জাগ্রত বিস্ময়ভাবের সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। বহু সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি সাহিত্যিক ও সমালোচক এই উপন্যাসের প্রশংসা শতমুখে করিয়াছেন। বঙ্গনারীর ফরাসি-ভাষায় আশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তি ও চরিত্র-চিত্রণ শিল্পে দক্ষতা ফরাসি-জগৎকে বিস্মিত করিয়াছিল। রোমান্টিসিজমের যুগে তরু দত্ত যদি আলোচ্য উপন্যাস না লিখিতেন, কিম্বা যদি তিনি ক্লাসিকাল্ (classical) আদর্শে এই উপন্যাস রচনা করিতেন, তাহা হইলে ফরাসি সমালোচকগণ হয়ত এই বিদেশিনীকে অতটা প্রসংসার যোগ্য পাত্রী মনে করিতেন না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ফ্রাঙ্কো-জারমান যুদ্ধাবসানে রাজতন্ত্র ফ্রান্স হইতে চিরকালের তরে বিতাড়িত হইলে জনতন্ত্রের আবির্ভাবের সহিত সেই যে বিস্ময়ের দ্বিতীয় যুগ ফ্রান্সে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার ফলে স্বাধীনতার নব-ভাবসিক্ত বিশ্ব-মানবতা নূতন শক্তি লাভ করিয়াছিল। সে শক্তির দিগন্তব্যাপী লীলা-ভূমিতে প্রাদেশিক বা ভৌগোলিক সংকীর্ণতার স্থান ছিল না। রুশোর দুর্দ্দান্ত কল্পনা-প্রসূত রোমান্টিসিজমের পরিণতি, যাহা রক্তাক্ত ফরাসি-বিপ্লবের দিনে য়ুরোপের সর্ব্বত্র বিরাট তাণ্ডবের আয়োজন করিয়াছিল, তাহার অনুরূপ কোনও কিছু এই নূতন শক্তিতে সম্ভবে না। বিস্ময়ের পুনর্জ্জন্ম ফ্রান্সের যে কাব্য-সাহিত্যকে ফ্রাঙ্কো-জারমান যুদ্ধের পূর্ব্বে হুগোর যুগে ও তাহার পরবর্ত্তী সময়ে ইংরাজ-কবি আদর্শ স্থানীয় করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি পৃষ্ঠায় বিশ্ব-প্রেমের বার্ত্তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। তরুদত্তের "ডি আর্ভাস" ও "ফরাসি-ক্ষেত্রে সংগৃহীত কবিতা-গুচ্ছ" কিন্তু ফ্রেঞ্চ সমালোচকগণের নিকট যতটা বিস্ময়-মিশ্রিত প্রশংসা লাভ করিয়াছে, তাহার তুলনায় ইংরাজ সমালোচকগণের নিকট যৎসামান্যই সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইংরাজসমালোচক পদ্যময় ইংরাজি ভাষায় রচিত তরু দত্তের "গাথা ও কাহিনী"র (Ballads and Legends of Hindusthan) যতটা পক্ষপাতী, ফরাসি ভাষায় সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার উদ্যমের ততটা পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয় না। তরু দত্তের উপর ফ্রেঞ্চ রোমান্টিসিজম যতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, ইংলিশ্ রোমান্টিসিজম ততটা প্রভাব বিস্তার করে নাই। তাহা হইলেও ইংরাজি-সাহিত্যে তিনি রোমান্টিসিজমের যতটা আলোক পাইয়াছিলেন তাহাও নগণ্য নহে। "গাথা ও কাহিনী"র ভাবাপরিচ্ছদে ও রচনা-শিল্পে ইংলিশ্ রোমান্টিসিজমের প্রভাবই অনুভূত হয়।

তরু দত্তের জীবনীপাঠে জানা যায় যে, তিনি জারমান ভাষাতেও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। জারমান রোমান্টিসিজমের প্রভাব কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার কাব্যে পরিস্ফুট না হইলেও "গাথা ও কাহিনী"তে তিনি যেভাবে বিষয়নির্ব্বাচন করিয়াছেন ও "ডি আর্ভাসে" সমাজ-তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ হয় যে, জারমান রোমান্টিসিজম প্রাচীন ভারতে কর্ত্তব্যের আদর্শকে চিনিয়া লইবার জন্য যে বিচারশক্তির দরকার ও পাশ্চাত্যে দাম্পত্য-নির্ব্বাচনে স্বাতন্ত্রের পরিণাম যে শোকাবহ তৎসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য যে বহুদর্শিতার প্রয়োজন, তাহা লাভ করিবার উপযোগী সাধনা সম্বন্ধে তাঁহাকে সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিল। ফ্রান্স জারমনি ও ইংলণ্ডের সাহিত্যজগতে বিস্ময়ভাবের আবির্ভাব হেতু যে উন্মাদনার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারও প্রভাব তরু দত্তের কল্পনা-মন্দিরে জাঁকিয়া বসিয়াছিল। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে তরু দত্তের উপর য়ুরোপীয় রোমান্টিসিজমের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, ফরাসি ভাষার কাব্য-সাহিত্য হইতে সংগৃহীত ও অনূদিত "কবিতা-গুচ্ছে" আমরা ভিক্টর হুগো প্রমুখ ফরাসি ভাষার কবিদিগের দেশাত্মবোধ ও বিশ্ব-মানবতার প্রভাব যেমন অনুভব করি, "গাথা ও কাহিনীতে" তেমনি ইংলিস রোমান্টিসিজমে প্রকৃতিপূজার যে সমারোহ দেখা যায় তাহার প্রভাব অনুভব করি। জারমান রোমান্টিসিজমের প্রভাব আমরা তরু দত্তের রচনায় বিশেষভাবে অনুভব না করিলেও কবির কল্পনাকে যে তাহা সংযম শিক্ষা দিয়াছিল ও তাঁহার চিন্তাশীলতাকে যুক্তির বাহিরে যাইতে দেয় নাই, এই অনুমান অসঙ্গত নয়। "ডি আর্ভাসে"র সুবৃহৎ চিত্রাধারেই কিন্তু আমরা বিস্ময়ভাবের বৈচিত্র্যময় বিকাশ দেখিতে পাই।

রোমান্টিসিজমের পাঠশালায় তরু দত্তের প্রধান গুরু ছিলেন ভিক্টর হুগো। হুগো রোমান্টিসিজমের অর্থ "সাহিত্যে উদারনীতি" (Liberalism in Literature) বুঝিয়াছিলেন। এই গীতি হুগো-রচিত কবিতা ও পদ্যময় রচনা, তাহার অনুবাদ ও আদর্শজাত কাব্যের মারফৎ রোমান্টিসিজমের যে বীজ দেশ-দেশান্তরের কাব্য-ক্ষেত্রে অকাতরে ছড়াইয়াছিল তাহার ফলে বঙ্গদেশেরও কাব্য-কানন ইংরাজি পদ্যে, বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গভাষায় রচিত অসংখ্য উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতায় ভরিয়া গিয়াছে। গীতিকবিতা হৃদয়ভাব প্রকাশ করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণ যে ইহার মূল্য বুঝিতেন বঙ্গভাষায় সুবৃহৎ পদাবলী-সাহিত্য তাহার প্রমাণ। যে জাতি ভাব-প্রবণ তাহাদের সাহিত্যেই গীতি-কবিতা কাব্যাংশ সৃষ্টি করে। বাঙ্গালী জাতির

হৃদয়ের ভাবরাশি সেইজন্য বিগত ছয়-সাত শত বৎসর যাবত গীতিকবিতার ভিতর দিয়াই বিকশিত। তরু দত্তের কবিত্বপ্রতিভাও সেইজন্য পাশ্চাত্য রোমান্টিসিজমের সংস্রবে আসিয়া জাতীয় হৃদয়ভাবের অনুকূল হুগো ও অন্যান্য ফরাসি কবিদের রচিত গীতি-কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। বাঙালীর ন্যায় ভাবপ্রবণ ফরাসি জাতির কবি-হৃদয়ে রোমান্টিসিজমের যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, উদারনীতির সুধাবর্ষণে তাহা বৈচিত্র্যময় পত্র-পুষ্প-ফলভারাক্রান্ত বৃক্ষে পরিণত হইয়া ফরাসি ভাষার কাব্যকাননে মানবহৃদয়ের শত-সহস্র ভাবকে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে বিকশিত করিয়াছিল। তরু দত্তের "কবিতা-গুচ্ছ" বিশ্লেষণ করিলে আমরা শুধু ফ্রেঞ্চ রোমান্টিসিজমের সংবাদ প্রাপ্ত হইব না, এই মহিলা-কবির হৃদয়ভাব কিরূপে ও কোন্ দিক দিয়া ক্রমবিকাশের পথে কবির প্রতিভাকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধেও উপাদেয় তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিব। কবির হৃদয়ে বিস্ময়ের আবির্ভাব বঙ্গদেশে ইংরাজি ভাষার কাব্য-সংসারের ভাগ্যলিপিতে এক অভিনব ও অভাবনীয় ব্যাপারের সূচনা করিয়াছিল। এদেশের মহিলা-কবিদিগের সম্বন্ধে দশ বৎসর পূর্ব্বে "লণ্ডন কোয়ার্টার্লি রিভিউ" (London Quarterly Review) নামক পত্রিকায় মিঃ ই, জে, টমসন্ (Mr. E. J. Thomson) লিখিয়াছেন,—* * * "And first of all the many things that must be done and sought, this elementary justice must be rendered, and woman be free to expand and find herself; and Taru Dutt, in her greatness of soul and her greatness of mind, will no more be a solitary and astounding phenomenon, but the first-born star in a heaven of many lights."

আর একজন সমালোচক মিঃ টমসনের কথায় সায় দিয়া সেই সময়ে "কলিকাতা রিভিউ" নামক (The Calcutta Review) পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন,—

"Certainly a race that has produced women, poets like Mrs, Naidu and Taru Dutt has no need to apologise for the intellectual qualities of its women."

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

বেহাগ—তেতালা।

পরাণ ছুটে তোমার পানে দিবস রজনী
প্রিয়তম যেমন তটিনী ধায়্ সিন্ধু পানে।
প্রাণনাথ হে মোরে দেখা দাও—
আঁখি জলে আকুল নয়ন।

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি—সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী।

II {মা গা সা গা। পা পা নধা না I র্সা না ধপপা -া।
প রা ণ ছু ০ টে তো০ মা র পা নে০ ০ ০

-া মা মা গা (গমধপপা)} গা। মা ধপপা -া মা। গাঃ রঃ সরা সসা I
০ ০ ০ ০০০০০ দি ব স০০ ০ র জ ০ নী০ ০০

I সা সা ধপা না। সা সা -া গমা। ধপপা -া মা গঃ মঃ। পনা -া -া না I
প্রি য় ০০ ত ০ ম ০ যেম ন০০ ০ ০ ০ ত টিনী ০ ০ ধা

I র্সা র্সর্গা র্রর্সর্সাঃ নঃ। না না ধপা পা II
য় সি ন্ধু০ ০ ০ পা ০ নে০ ০

১ ৩
[র্সা র্গা] ২´ [নধা র্সা]
-া। -া {পা না না। র্সাঃ নঃ র্রর্সর্সা -া I -া র্সা -া না। না ধনর্সা না ধপপা।
প্রা ণ না ব ধু হে মো রে দে খা দা

১ ২´
। (মগা) } -া মগা গমা পনা। -া র্সর্সা নধা না I র্সা র্সর্গা র্রর্সর্সাঃ নঃ।
ও আঁখি জলে আ কু ল ন

৩
। নধা র্সনা ধপা মপা IIII
র ন

১ম তান ২´ ৩
I প প ন র্স র্র ন—ধপপা। -ঃ মাঃ পমঃ মগা মঃ ধপপা II
তোমা আ

২য় তান ১ ২´ ৩
গা। মা ধপপা -া। -া গা মা -া I পগা -া -া রসা। সা -া -া -া।
দি ব স

১ ২´
। ন্ স গ ম পা—ম প ম প। মপা গা মা গা I -া গ ম প ন—ধ প।
র জ নি প্রি

৩
। ম প ন ধ র্স—II
র

৩য় তান ২´ ৩
I প প ন র্স র্র র্র র্স ন ধ প প ন। র্স র্র র্স ন ধ প প ধ—মঃ II
তোমা আ

৪র্থ তান ২ ৩
I ন্ স গ ম প প ম গ র স ন্ স। গ ম প ন র্স র্র র্স ন ধ প প ধ II
তোমা আ

৫ম তান
২´ ৩ ১
I র্সা না ধপপা -া। র্সা -া না -া। ধপপা -া -া -া। মা -া গা -া I
র পা নে

২´ ৩ ১
I ন্সা গমা পাঃ গঃ। মা গা -া -া। গমপা -া গা মা। গা -া রসসা -া I
দি ব স র জ নী

২´ ৩ ১
I রা সন্া -া ন্া। সা গা সা গা। ন্সা গমা পা পমা। গা মা গা -া I
প্রি য ত ম যে ম ন ত টি নী ধা য়

২´ ৩
I গা মা পনা র্সর্রা। র্সনা ধপা পধা পপা II
বি ন্ধু পা নে

ষষ্ঠ তান

২´ ০

I নঃ নঃ পঃ নঃ নঃ পঃ র্সঃ র্সঃ | নঃ নঃ পঃ নঃ নঃ ঋঃ পঃ পঃ |
তোমা আ

০ ১

| গঃ মঃ পঃ পঃ মঃ গঃ ঋঃ সঃ | ন্‌ঃ সঃ গঃ গঃ সঃ গঃ গঃ সঃ I

২´ ৩ [র্সঃ র্সঃ]

I পঃ পঃ মঃ গঃ ঋঃ সঃ ন্‌ঃ সঃ | নঃ নঃ র্সঃ র্সঃ নঃ ধঃ পঃ পঃ II

অন্তরার তান

২´ ৩

I ঋপধা নর্সর্ঋা র্গা র্ঋর্সনা | র্ঋর্সনাঃ০ ধপঋ০ পনা ধনা |
প্রাণনাথ হে— • • • ••• • •• • •• • ••• •• •• প্রাণনাথ হে ইত্যাদি।

এই তানগুলি প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য নহে। যাহাদের তালে বেশ একটু অধিকার জন্মিয়াছে তাহাদের জন্য। যেখানে মাত্রাহীন অক্ষরে তান লিখিত হইয়াছে সেখানে বুঝিতে হইবে সেই সব স্বরগুলি একটি তালের মধ্যে গেয়। স্বরলিপিপ্রণালী এখনও অসম্পূর্ণ বলিয়া আপাততঃ এইরূপে লিখিত হইল।

"——" নির্দেশ করে সুরের কালের স্থায়ীত্ব। হ্রস্ব হইলে অল্পকাল স্থায়ী যথা "—"। দীর্ঘ হইলে অধিকক্ষণ স্থায়ী যথা "———"।

রামেশ্বরের পথে।

(শ্রীনিধিরাজ হালদার)

দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ করবার ইচ্ছা নিয়েই জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি মাদ্রাজ রওনা হয়ে গেলাম। ইচ্ছা ছিল ওয়ালটেয়ারে দু'এক দিন থাকব, কিন্তু কেন জানি না কে যেন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ করে দিল; কাজে কাজেই যখন ওয়ালটেয়ারে গাড়ী এসে থামল, তখন আর সেখানে থাকার ইচ্ছা মোটেই হল না। কিন্তু সারারাত ও একটা দিনের গোটা আট ঘণ্টা রেলে কাটাবার পর স্নান-আহার করবার ইচ্ছা আপনিই এল; কাজেই আধঘণ্টা সময়ের মধ্যে মাথাটা ধুয়ে এক হিন্দু হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হলাম; কিন্তু হোটেলের অবস্থা দেখে আমার ক্ষুধা যেন আপনাআপনিই কমে গেল। কারণ কেবল তেঁতুল ও লঙ্কার প্রভুত্ব আমাকে আতঙ্কে ফেলেছিল। মনে মনে ভাবলাম নাই-বা খেলাম ভাত দু'একদিন; কিন্তু খাওয়াত চাই কিছু, কারণ এ লম্বোদরের জন্যই তো সারা দুনিয়া মারামারি করে মরছে। যাই হোক, অনেক আরাধনা করে কিছু কমলালেবু ও কলা কেনা গেল; মনে মনে ভাবলাম এ যা হোক একেবারে সন্ন্যাসীর আহার। নিরম্বু উপবাসের চেয়ে এ অনেক ভাল। এই বলে মনকে সান্ত্বনা দিয়ে সে যাত্রা নিস্তার পেলাম। যাত্রাপথের পথিক আমরা, আবার আমাদের যাত্রা সুরু হল। ইঞ্জিন তার কর্ম্মের পথে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলতে সুরু করে দিলে। পিছনে পড়ে রইল কত ঝোপ-ঝাপ নালা-ডোবা চাষার ঘর-বাড়ী গাছ-পালা মাঠ আর মাঠ। আমাদের ট্রেনখানা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে; তার কর্ত্তব্যের বিরাম নাই। ঠিক এমনি সময় আমরা এসে উপস্থিত হলাম গোদাবরী নদীর উপর। লোহার পুল—নীচে বালির বিস্তীর্ণ চর। মাঝে মাঝে জল যে নেই তা নয়। জলের উপর দিয়ে ভেলার মত দু-চার নৌকা পাল তুলে বেয়ে যাচ্ছে। কি সুন্দর এই দৃশ্য!

নদীর ধারে ক্ষুদ্র গ্রাম মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর আমরা অলস পথিক রূপমুগ্ধের মত রূপই দেখে চলেছি। মনে করি এই বুঝি আমাদের কর্ত্তব্য, এই বুঝি কাজ। হঠাৎ চেয়ে দেখি আমরা গোদাবরীর পুল পার হয়ে চলে এসেছি। উদ্দাম তরঙ্গের মত চলেছি। সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত। দূরে বহুদূরে থেকে থেকে যেন আলেয়ার আলোর মত জোনাকির ঝাঁক জ্বলছিল নিভছিল। ভগবানের চরণে প্রণাম করে বললুম, হে ভগবান! ধন্য তুমি—ধন্য

তোমার অপরূপ সৃষ্টি! রাত্রি তখন গভীর নয়, বোধ হয় দশটা কি এগারটা। চেয়ে দেখি আবার পুল; সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপ করে জানলাম কৃষ্ণানদী। নাম তার সার্থক হয়েছে, জল তার ঘন কাল। নীচে কাল জল, উপরে নীল আকাশ; আকাশের গায়ে তারকা; মনে হচ্ছে যেন তারা এক-একটী হীরকখণ্ড। শুভ্র চন্দ্রমার রূপালী কিরণের সঙ্গে নক্ষত্রগুলিও এসে কাল জলকে আলিঙ্গন করছে। সেই মনোরম দৃশ্য লেখনী দিয়ে বর্ণনা করা যায় না, উপভোগ ছাড়া অনুভব করা চলে না। ইচ্ছা হয়েছিল নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণ খুলে সে দৃশ্য উপভোগ করি। কিন্তু গাড়ী ত আর দাঁড়াবে না। আজও আমার কর্ণে কৃষ্ণার কুলুধ্বনি বীণার ঝঙ্কারের মত বাজছে। দেখতে পাচ্ছি কালো জলের গায়ে নীল আকাশের প্রতিচ্ছবি। তাই সেদিনকার মত আজও আমার মাথা আপনাআপনিই শ্রদ্ধায় শ্রীভগবানের চরণে নত হয়ে আসছে।

গাড়ীতে একটা মাদ্রাজী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হল, নামও তাঁর জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি কাছেই একটা ষ্টেশন থেকে উঠেছিলেন। কথায় কথায় তিনি আমায় বল্লেন, "আপনি যদি কিছু মনে না করেন—" আমি বাধা দিয়ে বল্লাম "স্বচ্ছন্দে আপনি বলতে পারেন; যথাসাধ্য আপনার কথা রাখতে আমি চেষ্টা করব।"

তিনি আর কোনও কথা না বলে তাঁর বাসকেট্ থেকে একটা সুপক্ক কলা বার করে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন এ এইখানকারই কলা, আপনি দয়া করে ইহা খেয়ে দেখলে সুখী হব।

আমি বল্লাম, এ আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি বিদেশী আমায় বন্ধু ভেবে দিচ্ছেন; এর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমার মুখে সে কলার স্বাদ এখন লেগে রয়েছে; এমন সুন্দর, এত মিষ্টি কলা আমি আমার জীবনে কখনও খাইনি। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আমরা গাড়ীতে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ঘণ্টা-তিনেক কোন রকমে একটু গড়িয়ে নেবার পর ঘুমের নেশা কতকটা কেটে গেল। মাদ্রাজী ভদ্রলোকটীও উঠে বসলেন। তিনি আমার সঙ্গে কলিকাতার বিষয় অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। কথায় কথায় জানতে পারলাম তিনি কলিকাতার খিদিরপুরে সামান্য একটা বাসাবাড়ী ভাড়া করে থাকতেন এবং নিকটবর্ত্তী কোন একটা অফিসে সামান্য কেরাণীর কাজ করতেন। সামান্য যা বেতন পেতেন তাতে আধপেটা খেয়ে কোন রকমে দিনগত পাপ ক্ষয় হত। তার পর হাসতে হাসতে বললেন "এই ত আমাদের কেরাণীর জীবন"। আমি বল্লাম, আপনারাই ত আপনাদের জীবনটাকে এমনি দুর্ব্বিষহ করে তুলেছেন, এর জন্যে অন্যকে দায়ী করা খুবই অন্যায়। কেন আপনাদের দেশে কি কিছু জমির অভাব আছে? চাষ করতে পারেন না? লেখাপড়া শিখে কেরাণীর জীবন যে যাপন করতে হবে, এমন কিছু বাঁধাধরা নিয়ম আছে? এই যে আপনি আমায় কলা খাওয়ালেন, স্বচ্ছন্দে আপনি ঐ কলার চাষ করতে পারেন, এতে লাভ বই লোকসান হবে বলে অন্ততঃ আমার ত মনে হয় না। তারপর তাঁকে বুঝিয়ে বল্লাম, এই যে কোথায় সুদূর বিকানীর মাড়োয়ার—সাত সমুদ্দুর তের নদীর কথা ছেড়েই দিলাম,—সেখানকার লোক শুধু লোটা-কম্বল সঙ্গে নিয়ে এসে কলিকাতার মত মহানগরীর উপর বড় বড় যে ইমারত হাঁকিয়ে দরজার সামনে ভোজপুরী দরওয়ান খাড়া করে রাখে, সে কি কেরাণীগিরি করে? তারা ইংরাজির ধার ধারে না—যদি ইংরাজি কিছু দরকার হয় তাহলে ঐ আপনার-আমারই মত কেরাণীকে দিয়ে কাজটি করিয়ে নেয়, আর মাস গেলে মজুরী দেয় ২৫৲।৩০৲ টাকা। মনে করবেন না যে আমি ইংরাজী পড়ার দোষ দিচ্ছি। আমাদের mentality এমনই হয়ে পড়েছে যে চাকরী পেলেই আমরা মনে করি যে আমাদের সাতপুরুষ উদ্ধার হয়ে গেল। আরও বল্লাম, মশাই অবাক হবেন চাকরী পাবার জন্যে অনেকে আবার দেব-দেবীর কাছে পূজা মানত করে রাখে! চাকরী পাবার জন্যে যে জাতির এত আরাধনা, তার কখনও উন্নতি হয়? এ চাকরীর নেশা যতদিন না কাটবে ততদিন আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে—বলে ক্ষান্ত হলাম। সমস্ত শোনবার পর ভদ্রলোকটী বললেন, আপনার কথা ত ঠিক, কিন্তু উপায় কিছু বলে দিতে পারেন? বল্লাম যারা চোখ চেয়ে অন্ধ হয়ে আছে তাদের পথ কে দেখাবে বলুন? আমরা যে নেশায় মসগুল হয়ে আছি, যতদিন না সে নেশা টুটবে ততদিন আমরা পথ দেখতে পাব না। ভদ্রলোকটি তাঁর বাসায় যাবার জন্য আমায় অনেক অনুনয়-বিনয় করে ভোর রাত্রে নেমে গেলেন।

যখন মাদ্রাজ ষ্টেশনে এসে নামলাম তখন ভোর সাড়ে ছটা। আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আমার এক আত্মীয় তাঁর একটী বন্ধুর সহিত অপেক্ষা করছিলেন। দুরাত্রি ট্রেণে যাপন করবার পর আবার কোলাহলপূর্ণ মহানগরী মাদ্রাজ সহরে এসে উপস্থিত হলাম। ষ্টেশনে অনেক চট্টাজি-টিকিট থাকলেও ইচ্ছা হচ্ছিল আমি

ট্রামে করে বাসায় এলাম। ষ্টেশন থেকে আমাদের বাসা প্রায় দু'তিন মাইলের পথ—নাম Triplicane; সমুদ্রেরও খুব কাছে—৬।৭ মিনিটের রাস্তা। যখন বাসায় এসে পৌঁছুলাম হঠাৎ কানে এসে একটা বিরাট গর্জ্জন পৌঁছুল, বুঝলাম সমুদ্রের গর্জ্জন; কারণ যখন পুরীধামে ছিলাম তখনও সব সময় ঐ রকমেরই গর্জ্জন এসে কানে পৌঁছত। ইচ্ছা হল, যাই সমুদ্রের ধারে গিয়ে বালির উপর খানিক গড়াগড়ি খাই—কিন্তু দুদিন Train Journeyর পর শরীর এতই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে, একটু বিশ্রাম না করে আর পারলাম না—কাজেই ঠিক করলাম বৈকালে প্রাণ ভরে সমুদ্রের হাওয়া খাব।

আহারের পর গাঢ় নিদ্রা।

নূতন লোক—পথ-ঘাট ত আর জানা নেই; কাজেই বাসার একজনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ট্রিপলিকেন থেকে বেরিয়ে আমরা Ice House Roadএ এসে পড়লাম। আমার পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করলাম Ice House Road কেন—এ রাস্তায় কি বরফের বাড়ী আছে? আমার কথা শুনে তিনি বললেন, বরফের বাড়ী নেই বটে তবে Ice House বলে একটা বাড়ী আছে; কারণ যখন ভারতবর্ষে বরফের কল ছিল না, তখন বিলাত থেকে জাহাজে করে বরফ এসে এই বাড়ীতে জমা হত, সেই কারণে এর নাম হয়েছে Ice House। বরাবর ঐ রাস্তা ধরে যখন ঐ বাড়ীটার কাছে এসে পৌঁছুলাম, তখনই দূরে সমুদ্র দেখতে পেলাম। বাড়ীটাও সাধারণ বাড়ীর চেয়ে কিছু বড় —পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু সমুদ্রকে দেখে আর কি বাড়ীর কথা মনে পড়ে? পিচ-বাঁধান রাস্তা পার হয়ে ছুটলাম সমুদ্রের তীরে।

এখানে রাস্তাটার কিছু বর্ণনা করা দরকার। রাস্তার একধারে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবার জন্যে লম্বা সরু পথ— আর এক ধারে ফুটপাত, ফুটপাতের ধারে কেয়ারী করা দু'চারটে ফুলগাছের বাগান—সোজা চলে গেছে। তারই নীচে বিস্তীর্ণ বালুকাময় বেলাভূমি, তার পর বিশাল সমুদ্র। যাঁরা সমুদ্র দেখেছেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন এখানকার দৃশ্য কি রকম। প্রায় সন্ধ্যা হব হব হয়েছে, সূর্য্য ডুবতে শুরু করেছে। এক দিকে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ বালুময় বেলাভূমির পাদদেশে আছড়ে আছড়ে পড়ছে, আর এক-দিকে সমুদ্রের নীল জলের সঙ্গে নীল আকাশ মিশেছে; সেইখানে অস্তমিত রবি ডুবুডুবু—যেন সমুদ্রের বুক চিরে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঠিকরে পড়ছে, আর তারই মধ্যে একটা গোলাকার আগুনের থালা লুকোচুরি খেলতে খেলতে লুকিয়ে পড়ছে! এমন প্রাণমাতানো দৃশ্য দেখতে কার না ইচ্ছা হয়? সে দৃশ্যের মাধুর্য্য এমনি যে আপনাকে আপনি ভুলিয়ে দেয়। বালির উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল যেন প্রকৃতি হাসতে হাসতে ধরায় নেমে এসে তাঁকে আলিঙ্গন করছে। দেখতে দেখতে 'লাইট হাউসের' আলো জ্বলে উঠলো। আমরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, মনে মনে ভাবলাম পৃথিবীতে সবই সুন্দর। ফুলের গন্ধে ভ্রমর যেমন আপন-হারা হয়ে ফুলের মধু খুঁজে বেড়ায়, আমিও তেমনি প্রকৃতির রূপকে নিংড়ে বার করে নেবার জন্যে আপন-হারা হয়ে খানিক ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগলাম।

সবে সন্ধ্যা হয়েছে। রাস্তার দুধারে সারিবন্দি বিজলি বাতি জ্বলে উঠলো। বাসাবাড়ীর পথে ফিরলাম। বালুচরের উপর মরা শুক্তি-শামুক মুলীয়ার জাল ও তাদের মাছধরা নৌকা।

রাস্তায় আসতে আসতে ঠিক হল কাল আমরা অ্যাকোয়েরাস দেখতে যাবো। শুনলাম তাতে নাকি সমুদ্রের অনেক রকম মাছ আছে—দেখবার জিনিস বটে। রাত্রে খানিক গল্পগুজব করবার পর নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় নিলাম।

THE

BRAHMA SAMAJ

OR

HINDU THEISTIC CHURCH: ITS RISE AND PROGRESS.

[*G. S. Leonard—Late, Assistant Secretary to the Asiatic Society of Bengal.*]

CHAPTER I.

The foundation of the Brahma Samaj by Raja Rammohan Roy.

(5)

50. His dispute with Mr. Tytler.

Owing to these lawsuits, and the troubles and annoyances to which they gave rise, Ram Mohun was unable to take for the present any further measures for the establishment of the *Samáj*, but he contented himself with giving private lectures to his pupils, and conducting all polemical disputes in writing. It was about this time (1823) that some warm disputes were being carried on between himself and Mr. Tytler, brother of Dr. Tytler, Principal of the Hindu College and Medical school, and the Serampore Missionaries, in the *Hurkaru* and *Friend of*

India, on the truth of the Christian religion in which, his disciples maintain that he had, the advantage.

51. Wm. Adam embraced Unitarian.

Shortly after these discussions, the Serampore missionary, Mr. Wm. Adam, embraced the Unitarian faith at the persuasion of Ram Mohun Roy, for which he was tauntingly called the "Second-fallen Adam," by his enemies, and delivered a series of weekly lectures, in a hall above the *Hurkaru* office. At these lectures Ram Mohun Roy, with his sons and some distant relatives, as well as his disciples, Tarachand Chakerburty and Chunder Sekhar Dev, both afterwards managers of the Burdwan Raj, and others, were regular attendants.

52. The first idea of founding the Brahmo Samaj.

It was while returning from one of these lectures one evening, that Tarachand and Chunder Sekhar remarked on the seeming impropriety of being obliged to have recourse to foreigners for religious instruction, when their own scriptures afforded as much knowledge of the subject as any other, and suggested the necessity of founding a Hindu Monotheistic Church. Ram Mohun Roy was immediately struck with the suitableness of the suggestion and hastened to consult his friends Dwarkanath Thàkur and Roy Kalinath Munshi, as to the feasibility of the idea. A meeting was accordingly held at Ram Mohun Roy's house, when the above-mentioned gentlemen in conjuction with Prasanna Kumar Thàkur and Mothuranath Mullick, agreed to afford as much assistance as they could. Chandra Sekhar Dev was then desired to settle the price of a piece of land at Simla, in Calcutta, south of Sib Narain Sarcar's house, but the site not being deemed favourable to the object in view, the *Samàj* was at once commenced at a hired house belonging to Kamal Lochan Bose, * at Jorasanko on the Chitpore Road. This was in 1828, from which the beginning of the *Bràhma Samàj* of Calcutta dates.

* Commonly called Feringhee Kamal Bose on account of his being in the service of Portuguese merchants. The house now belongs to Huronath Mullick.

53. The first mode of devotional service used in the Brahmo Somaj.

Here the service used to be held every Saturday evening between 7 and 9 P. M. Two Telugu Brahmans were attached to the *Samàj* for the recital of the Vedas, and Utsavànanda Vidyàvàgisa read the texts of the Upanishads, which were next explained in Bengali by Ram Chandra Vidyàvàgisa. On the establishment of the *Samàj* it was largely attended by the Hindus of calcutta.

54. The foundation of the present (Adi) Brahmo Somaj.

Tarachand Chukerburty was the first Secretary appointed. Soon after its opening, as the funds of the *Samàj* began rapidly to increase, a parcel of land was purchased and a house erected upon it, where the first meeting of the present *Samàj* was held on the 11th Magh 1751 (Saka) corresponding to the end of January 1829, the day on which its anniversary is still celebrated. The anniversary of the *Samaj* was for some time celebrated in September (Bhâdra), when large numbers of pandits used to be invited to it for encouragement, and most liberally rewarded with donations by the three grandees, Dwarkanath Thàkur of Calcutta, Kalinath Roy Munshi of Taki in Jessore, and Mothuranath Mullick of Howra, who were the leading triumvirate of the *Samàj*,

55. The effect of the Brahmo Samaj on the then Hindu Society : the establishment of the Dharma Sabha.

The influence of the *Samaj* triumvirate led to the propagation of the religion among their adherents, both within and beyond the limits of Calcutta, while the various able publications of its founder and the preachings in the *Samaj*, tended to circulate the truth of its doctrines with irresistible force. The rising generation of Hindus, struck with the simplicity of the faith, eagerly embraced and acknowledged the truth of *Brahmaism*, but the old and bigoted set obstinately opposed the reform, beheld with alarm its progress, and became its bitterest enemies. Such a state of things naturally created much anxiety and misery in many a family circle, whose members had taken

opposite sides. This circumstance, together with the measures adopted by Ram Mohun Roy for the aboslishment of the practice of Suttee, led to the establishment of the Dharma Sabha in opposition to the *Samaj*.

56. The Kaumudi vs, the Chandrika.

It was about this time that Ram Mohun Roy started the *Kaumudi*, a weekly periodical in Bengali, in order to uphold *Brahmaism* and anti-Sutteism, and to expose the malice of its opponents. This measure was opposed by the *Chundrika* another periodical, the organ of the Dharma Sabha party.

57. Dharma Sabha abolished.

At the close of 1829, however, a death-blow was struck at the Dharma Sabha, from which it never recovered, by the wise enactment of Lord William Bentinck, which abolished the horrid and revolting practice of Suttee, a custom which that institution had warmly advocated.

58. Ram Mohun Roy—one of the deputation to Lord Bentinck for his abolishing the suttee system.

On this occasion, in spite of the personal outrage threatened by the Anti-abolitionists, Ram Mohun Roy was one of the deputation, who presented an address to the Governor General, embodying the grateful acknowledgements of the enlightened portion of the native community for this "everlasting obligation" conferred on their country.

59. His efforts for the elevation of the Hindu Society.

Thus, we see the indefatigable exertions of Ram Mohun Roy, for the establishment of the *Brahma Samaj*, and the abolition of the barbarous practice of Suttee, crowned with success, and a step made towards female emancipation and education. The efforts made by this true patriot for elevating the moral and intellectual condition of his countrymen cannot be sufficiently lauded, and deserve the lasting gratitude of his countrymen. It is, however, to be remarked with regret, that though many years have elapsed since his death, the Hindu community have omitted to raise a suitable memorial to perpetuate his memory.

60. He left for England as ambassador of the Emperor of Delhi.

Ram Mohun Roy had entertained for many years a desire to visit Europe. Towards the latter end of 1830 many events conspired to help his design. He had successfully established the *Brahma Samaj*; he had won the suit brought against him in the provincial court; Sutteism had been abolished; and lastly the Emperor of Delhi had made overtures to him to proceed to England as his ambassador, conferring upon him at the same time the title of *Raja*. He left for England in November 1830, making the following arrangements for the management of the *Samaj* during his absence. Bissumbhur Das was nominated to be secretary, and the late Maharaja Ramanath Thakur, Kalinath Munshi and Radhaprasad Roy, eldest son of Ram Mohun, to be trustees of the *Samaj*. These gentlemen conducted the *Samaj* as usual, with the

61. The time of service changed to Wednesday.

exception of changing the time of service from Saturday to Wednesday.

62. Extract from the Trustdeed of the Brahmo Samaj.

Before concluding the history of the first epoch of the *Brahma Samaj* under Ram Mohun Roy, we subjoin a portion of the Trust-deed, executed in 1830 between the founder and his colleagues and trustees, from

which will be learnt the anti-idolatrous nature of the religious reformation and the mode of divine service which his genius had contrived and his energy had established.

"That they (the Trustees), their survivors, "heirs and assigns, shall and do from time "to time and at all times hereafter, permit "and suffer the said messuage or building, "lands, tenements, hereditaments, and "premises with their appurtenances, to be "used, occupied, enjoyed, applied and ap- "propriated, as and for a place of public "meeting of all sorts and descriptions of "people, without distinction, as shall behave "and conduct themselves in an orderly, sober, "religious and devout manner, for the wor- "ship and adoration of the eternal, un- "searchable, and immutable Being who is "the Author and Preserver of the Universe, "but not under or by any other name, desig- "nation or title, used for and applied to any "particular Being or Beings by any man or "set of men whatsoever, and that no graven "image, statue of sculpture, carving, painting, "picture, portrait, or the likeness of any "thing shall be admitted within the said "messuage, building, land, tenements, "hereditaments and premises, and that no "sacrifice, offering, or oblation of any kind, "or of any thing shall ever be permitted "therein, and that no animal or living crea- "ture shall within or on the said meassuage, "&c., be deprived of life, either for religious "purposes or for food, and that no eating or "drinking (except as shall be necessary by "any accident for the preservation of life,) "feasting or rioting be permitted therein or "thereon ; and that in conducting the said "worship and adoration, no object, animate "or inanimate, that has been, or is, or shall "hereafter, become, or be recognized as an "object of worship by any man or set of men "shall be reviled or slightingly or contemp- "tuously spoken of or alluded to either in "preaching, praying, in the hymns or other "mode of worship that may be used or "delivered in the said messuage or building : "and that no sermon, preaching, discourse, "prayer or hymns be delivered, made, or "used in such worship, but such as have a "tendency to the promotion of the contem- "plation of the Author and Preserver of the "Universe, to the promotion of charity, "morality, piety, benevolence, virtue, and "strengthening of the bonds of union be- "tween men of all religions, persuasions, "and creeds, and also that a person of good "repute, well-known for his knowledge, piety "and morality, be employed by the said "Trustees, &c., as a resident superintendent, "and for the purpose of superintending the "worship so to be performed as is herein- "before stated and expressed, and that such "worship be performed daily, or at least "as often as once in seven days, &c. &c."

The provisions of the above deed constitute a canon of religious belief, and describes a catholic church for the worship of the God of all nations, of which the Hindus may justly be proud.)

63. Raja Ram Mohun Roy's Death in 1833.

The Raja Ram Mohun Roy died in England in 1833 and the management of the *Samaj* devolved first upon Dwarkanath Thàkur and Ramchandra Vidyavagisa and subsequently upon Devendranath Thàkur, its progress and condition under whom we shall proceed to narrate, in Chapter II.

উৎসবানন্দ-রামমোহন রায়-সংবাদ

(৪)

(ডাঃ তি, রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

ব্রহ্মাখ্যং পরানন্দং ব্রহ্মাদীনামগোচরং। কার্য্যকারণনির্ম্মুক্তং সত্যং পরং উপাস্মহে॥ ভবতা পরমভাগবতেন বৈষ্ণবেণ প্রথমতো যৎ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য, ক্ষীরোদশায়িনো বিষ্ণোঃ বৈকুণ্ঠনাথস্য, ত্রয়াণাং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানাঞ্চ সগুণত্বং শরীরবত্ত্বঞ্চাভিহিতং তৎ সম্যগেব; দিক্‌কালাকাশমূর্ত্তীনাং করণগোচরাণাং সগুণত্বপরিচ্ছিন্নত্বয়োর্যুক্তত্বাৎ প্রশংসিত-হরিহরোপাসকমতো ভবান্ সাধুবিষদ্ভিঃ স্তবনীয়শ্চ। যত্তু ত্রয়াণাং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানামৈক্যমীশ্বরত্বঞ্চাঙ্গীকৃত্য তেষ্বেকস্য বিষ্ণোঃ সেব্যত্বং ব্রহ্মমহেশ্বরয়োঃ সেবকত্বং ব্যাহৃতং, তত্তু সকলসদ্যুক্তিবিরুদ্ধং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণতন্ত্রাদিশাস্ত্রাণামনভিমতং ভবদুক্তবিরুদ্ধঞ্চ; একাত্মত্বে দ্বিত্বাদিবিরহাৎ সেব্যসেবকভাবস্যাসম্ভাবনীয়ত্বাৎ একস্য সেব্যত্বেঽপরয়োঃ সেবকত্বে বিনিগমনাবিরহাৎ সেবকত্বপরমেশ্বরত্বয়োর্বিরোধিধর্ম্মত্বে নৈকধর্ম্মিত্বানুপপত্তেশ্চ বিষ্ণোঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্বসূচনায় ব্রহ্মেশানাভ্যাং শ্রেষ্ঠত্বাখ্যানায় চ পরমাত্মপরা ঈশাবাস্যমিত্যাদয়ো দশোপনিষদীয়া যা যাঃ শ্রুতয়ঃ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধকেবলকষ্টসাধ্যব্যুৎপত্তিবলাৎ যথা ভবতা ব্যাখ্যাতাস্তথা তৈরেব যুক্ত্যা তাঃ সর্ব্বাঃ শ্রুতয়ঃ শিবস্য সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মত্বায় বিষ্ণুতঃ সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠত্বায় চ শিবোপাসকৈর্ব্যাখ্যায়েরন্। বরঞ্চ শ্রুতীনাং সগুণপ্রতিপাদকত্বাঙ্গীকারে ঈশেশানেশ্বর-পদানাং কোষবলাদ্ব্যবহারবলাচ্চ শিব এব প্রসিদ্ধা শক্তিঃ প্রতীয়তে; এবং সৌরৈঃ সূর্য্যস্য ব্রহ্মত্বায়, শাক্তৈঃ শক্তেঃ প্রাধান্যায় তা এব শ্রুতয়ঃ সমুদাহ্রিয়েরন্। যদ্যেবং ত্বয়ৈব কৃষ্ণোপনিষদাদীনাং বিষ্ণুপরাণাং শ্রুতীনাং দশোপনিষদীয়-শ্রুতিভিঃ সার্দ্ধমেকবাক্যতায়ৈ সর্ব্বাসাং শ্রুতীনাং বিষ্ণুপরত্বং কথয়ামঃ, তর্হি কৈবল্যোপনিষদাদীনাং শিবপরাণাং শ্রুতীনাং তাভির্দশোপনিষদীয়শ্রুতিভিরেকবাক্যতার্থং যাবতীনাং শ্রুতীনাং শিবপরত্বং শৈবাঃ কথয়েয়ুঃ, এবং কালিকোপনিষদাদীনাং তাভিরেকবাক্যতার্থং শাক্তাদিভিরপি শক্ত্যাদিপরত্বেন সর্ব্বাঃ শ্রুতয়ো ব্যাখ্যাতব্যাঃ। হা হন্ত! স্বপক্ষপক্ষপাতাঃ সোপাধিকোপাসকা লোকাঃ স্বস্বমতানুকূল্যায় অন্যোন্যাকর্ষণেন বেদমস্মান্ সংঘর্ষয়ন্তি ব্যাকুলায়ন্তি চ। কিঞ্চ যথা বিষ্ণুপরায়ণেন ভবতা বিষ্ণোঃ প্রাধান্যায় ভগবদ্গীতাশ্লোকাঃ শ্রীভাগবত-বিষ্ণুপুরাণ-পদ্মপুরাণ-বচনানি লিখিতানি, তথৈব শিবভক্তিমদ্ভিঃ সাধুভির্জ্জনৈঃ শিবস্য শ্রেষ্ঠত্বায় মাহেশ্বরগীতা-স্কান্দ-শৈব-লৈঙ্গ-ভারতীয়-বচনানি নানাতন্ত্রবচনানি চ পঠ্যন্তে; অত্রৈকত্র মান্যত্বমপরত্রামান্যত্বমমন্তব্যং বিনিগমকাভাবাৎ। কিঞ্চ যদ্বিষ্ণোর্মাহাত্ম্যায় নারদপঞ্চরাত্রিবচনং ভবতা দর্শিতং তত্রাপি শক্তেরুৎকৃষ্টত্বায় শক্তিভক্তিমদ্ভিঃ কোটিশ আগমোক্তানি বচনানি পরমোৎসাহমধীয়ন্তে। তেষু কানিচিৎ বচনানি লিখ্যন্তে, তথা নির্ব্বাণতন্ত্রে—ততঃ কালীং মহাবিদ্যাং ভক্ত্যা তু মুরলীধরঃ। আরাধ্য বহুযত্নেন বৈকুণ্ঠাধিপতির্ভবেৎ। গোলোকাধিপতির্দেবঃ স্তুতিভক্তিপরায়ণঃ। কালীপদপ্রসাদেন সোঽভবল্লোকপালকঃ। লোকানাং রক্ষণার্থায় সস্ত্রীকো মুরলীধরঃ। সমারাধ্য ভদ্রকালীং গোলোকে নিবসেৎ সদা। নির্ম্মাল্যং কালিকা-দেব্যা গৃহ্যতে বিষ্ণুনা সতা। অতশ্চ পালকো বিষ্ণুর্মহাসত্ত্বপরায়ণঃ। ত্বদাজ্ঞাং প্রাপ্য দেবেশি সৃজ্যতে পদ্মযোনিনা। ত্বদাজ্ঞয়া পাতি লোকান্ এষ বিষ্ণুঃ সনাতনঃ। প্রথমপটলে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায়াঞ্চ—দ্বিতীয়ো জায়তে পুত্রো বিষ্ণুঃ সত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ। ইত্যাদি। সত্ত্বগুণাশ্রয়ত্বাদ্বিষ্ণো রজস্তমোগুণবিশিষ্টাভ্যাং ব্রহ্মশিবাভ্যাং যৎপ্রাধান্যং ভবদ্ভিরুক্তং তত্র শৈবাঃ প্রপঞ্চময়জাগ্রদবস্থায়া অধিষ্ঠাতুর্বিষ্ণুতো মুক্তিকল্প-সুষুপ্ত্যধিষ্ঠাতুর্ভগবতঃ শিবস্যৈব প্রাধান্যকথনেনোত্তরং দদতে। অত্র মহাভারতে দানধর্ম্মে মহেশ্বরং প্রতি বিষ্ণুরুবাচ—নমোঽস্তু তে শাশ্বত-সর্ব্বযোনয়ে ব্রহ্মাধিপং ত্বামৃষয়ো বদন্তি। তপশ্চ সত্ত্বঞ্চ রজস্তমশ্চ ত্বামেব সত্যঞ্চ বদন্তি সন্তঃ। ইত্যাদি। তথা তত্রৈব—তমব্যয়মনৌপম্যমচিন্ত্যং শাশ্বতং প্রভুং। নিষ্কলং সকলং ব্রহ্ম নির্গুণং গুণগোচরং। যোগিনাং পরমানন্দমক্ষরং মোক্ষসংজ্ঞিতমিত্যাদি চ পঠন্তস্তত্ত্ববিদস্ত্রিগুণাধিষ্ঠাতারং রজস্তমোগন্ধবিবর্জ্জিতং নির্গুণঞ্চ ভগবন্তং শিবং মন্যমানা ন কিঞ্চিৎ সন্দিহন্তীত্যলমতিজল্পনেন। যচ্চোক্তং ভবতা বৃদ্ধৈঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যপূজ্যপাদৈরীশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ইত্যত্র নিরুপপদেশশব্দব্যাখ্যানে পরমেশ্বরঃ পরমাত্মেতিশব্দাভ্যাং বিষ্ণুরেব সম্মত ইতি, তত্তু ভবৎকল্পিতমেব ন তু পূজ্যপাদস্যাচার্য্যস্য কদাপ্যেতন্মতং, যত উক্তং ভাষ্যে—ঈশাবাস্যমিত্যাদয়ো মন্ত্রা আত্মনো যাথাত্ম্য-প্রকাশনেনাত্মবিষয়ং স্বাভাবিকমজ্ঞানং নিবর্ত্তয়ন্তঃ শোকমোহাদিসংসার-বিচ্ছিত্তিসাধনমাত্মৈকত্বাদিবিজ্ঞানমুৎপাদয়ন্তীত্যেবমুক্তাভিধেয়সম্বন্ধপ্রয়োজনান্ মন্ত্রান্ সংক্ষেপতো ব্যাখ্যাস্যামঃ। ঈশা ইতি ঈষ্টে ইতি ঈট্ তেন ঈশা ঈশিতা পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা স হি সর্ব্বমীষ্টে সর্ব্বজন্তূনামাত্মা সন্ তেন স্বেন আত্মনা ঈশা বাস্যম্ আচ্ছাদনীয়ং কিম্ ইদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ যৎ কিঞ্চিৎ জগত্যাং পৃথিব্যাং জগৎ তৎ সর্ব্বম্ ইত্যাদি। যদপি লিখিতং শ্রীকৃষ্ণস্যৈব নির্গুণত্বশ্রবণেন শৈবস্য কোপোঽভবত ইতি তদেবাত্যন্তমসঙ্গতং, বৈষ্ণবস্য বিষ্ণুতঃ শিবস্য প্রাধান্যশ্রবণাৎ শৈবস্য শিবতো বিষ্ণোঃ প্রাধান্যশ্রবণাৎ এবং সর্ব্বেষাং তত্তদ্দেবোপাসকানাং

স্বেষ্টদেবতাতোঽন্যদেবতানামুৎকর্ষশ্রবণাৎ ক্রোধস্য স্বভাবসিদ্ধত্বাৎ ; কিন্তু প্রেপ্সিতব্রহ্মতত্ত্বানাং সর্ব্বত্রৈকত্বমনুপশ্যতাঞ্চ ন কস্যাপি স্তুতৌ শ্রেষ্ঠত্বশ্রবণে বা কচিৎ কোপলেশস্যাপ্যুৎপত্তিঃ। যচ্চোক্তং কৈবল্যোপনিষদাদীনাং শিববিষয়ক-পুরাণেতিহাসানাঞ্চাদর্শনং বৈষ্ণবাণামশুকূলমেব বহুগ্রন্থকলাভ্যাসবর্জ্জনস্য ভক্ত্যঙ্গতয়া বিহিতত্বাদিতি তদতীবাশ্চর্য্যং ভবাদৃশানাং বিদুষামযোগ্যঞ্চ ; ন হি বিষ্ণুবিষয়ত্বাৎ বেদৈকদেশস্য পুরাণেতিহাসাদীনামেকদেশস্য চ গ্রাহ্যতা, শিববিষয়ত্বাৎ তস্যৈব বেদস্য তেষাং পুরাণাদীনাঞ্চাপরদেশস্যাগ্রাহ্যতা কয়াচিৎ সদ্যুক্ত্যা শাস্ত্রপ্রমাণেন বা সঙ্গচ্ছতে ; কিন্তু সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি, একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা সর্ব্বশ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসাদীনি পরব্রহ্মণ এব প্রতিপাদকত্বেন বিদুষামাদর্ত্তব্যানি গ্রাহ্যাণি চ ; গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্বহূনিত্যাদি-ভবল্লিখিত-নিষেধবচনন্তু সমূলকত্বেৎ তদানীশ্বরবাদিগ্রন্থাভ্যাসবিষয়কং বেদিতব্যং। অবিষ্ণুবিষয়কাণাং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসাদীনাং সমাধানং কর্ত্তুমশক্তুবতাং বৈষ্ণবাণাং পলায়নস্য সমীচীনোঽয়ং পন্থাঃ যৎ স্বমতপ্রতিকূলশাস্ত্রাভ্যাসনিষেধ ইতি। যদবোচৎ ভবান্ যত্র যত্র বিষ্ণ্বাদিজনকত্বং শিবস্য শ্রূয়তে স্মর্য্যতে চ, তত্র তত্র শিবপদং গর্ভোদকশায়িমহাবিষ্ণুপরমিতি ; তত্রাকর্ণয়তু যথা ভবদ্ভির্বৈষ্ণবৈঃ স্বমতস্থাপনায় রুদ্র-ত্র্যম্বক-মহেশ্বর-শিবাদিপদানাং শক্তিগ্রাহককোষাপ্তবাক্য-ব্যবহারাদিকমনাদৃত্য কেবলপক্ষপাতবলাৎ গর্ভোদকশায়িনি মহাবিষ্ণৌ শক্তিঃ কল্প্যতে, তথা যত্র যত্র ব্রহ্মশিবসেব্যত্বেন বিষ্ণুরুক্তঃ তত্র তত্র কৃষ্ণবিষ্ণুনারায়ণাদি-শব্দানামপি আনন্দকাননবাসিনি মহারুদ্রে শক্তিকল্পনে কো বাধকঃ ? এবং স্বস্বমতস্থাপনায় পরস্পরশক্তিকল্পনে শক্তিগ্রাহকাণাং কোষাদীনাং নৈষ্ফল্যং শাস্ত্রতাৎপর্য্যোচ্ছেদশ্চ স্যাৎ অতো যৎকিঞ্চিদেতৎ। যত্তূক্তং গোলোকরূপ-নিত্যধামস্থায়িনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অন্যারাধকত্বমসম্ভবমেব, তস্যৈব পৃথিব্যামবতীর্ণস্য কৃষ্ণস্য তু ব্যাসনারদযুধিষ্ঠিরাদীনাং শিবস্য চ সেবনং তল্লোকসংগ্রহার্থমেব ; অনেন তেষাং সেব্যত্বং কৃষ্ণস্য সেবকত্বং বস্তুতো নায়াতীতি। তত্রাপি শ্রূয়তাং স্বধামস্থায়িনঃ কৃষ্ণস্য শিবশক্তিপরায়ণত্বং সর্ব্বথৈব সম্ভবতি ; যথোক্তং নির্ব্বাণতন্ত্রে—গোলোকাধিপতিং কৃত্বা ভক্তং রক্ষতি যঃ শিবঃ। তস্য দেবস্য মাহাত্ম্যং বিস্তারাৎ শৃণু চণ্ডিকে ইত্যাদি। ভুব্যবতীর্ণস্য তু বিষ্ণোঃ শিবসেবনং প্রসিদ্ধতরং ভবদ্ভিঃ স্বীকৃতঞ্চ। লোকা বর্ণগুরূন্ বান্ধবগুরূংশ্চ সম্মানয়ন্তু এবং শিবং পূজয়ন্তু ইতি লোকশিক্ষার্থৈ ব্যাসাদীনাং শিবস্য চ সেবনং কৃষ্ণেণ কৃতম্ ইতি যথা ভবতা কল্প্যতে তথা ভবাদৃশাদ্বৈতবাদীনাং বিষ্ণোশ্চ স্তবনং যৎ শিবেন বিহিতং তদপি লোকসংগ্রহার্থমেবেতি কুতো ন কল্প্যতে বিনিগমনাবিরহাৎ কল্পনায়া উভয়ত্র সত্ত্বাৎ। যদপ্যুক্তং শৈব-বৈষ্ণবপঠিতবিষ্ণুশিবভেদসূচক-বচনাকর্ণনাদ্ধরিহরোপাসকস্য বিষাদোঽনুচিত এবেতি তদপ্যনুচিতং বিষ্ণুশিবয়োর্ভেদশ্রবণাৎ বিষাদস্য স্বভাবতো যুক্তত্বাৎ। প্রত্যক্‌তত্ত্ববিদামেকত্বমনুপশ্যতাং যদ্বিজয়মাকাঙ্ক্ষীৎ তৎ পরস্বার্থদর্শিনঃ পরোপকারব্রতস্য ভবতো যুক্তমেব। যত্তু কেবলকুতর্কো ন পরমার্থসাধকঃ, দহরোপাসনা চিত্তশুদ্ধ্যর্থা, কাম্য-নিষিদ্ধকর্ম্মাসক্তচিত্তা মুক্তিবহির্ভূতাঃ, ঈশ্বরে বিবদমানাঃ সম্ভাষণানর্হা ইতি ভবতো মতং তদস্মাকমপ্যভিমতমেব। যত্তু বিশিষ্টাদ্বৈতিনো ভগবদ্বিষ্ণুসেবিনঃ সংস্কৃত্য কেবলাদ্বৈতিনো ব্রহ্মাদিতৃণান্তস্য জগতঃ প্রাতীতিকসত্তাকত্বং মন্যমানান্ আত্মন্যভিরতান্ বিনিন্দ্য মুক্তিং তুচ্ছীকৃত্য চ ভক্ত্যুৎকর্ষস্থাপনায় বরং বৃন্দাবনে শূন্যে শৃগালত্বং স ইচ্ছতি ইতি শ্লোকমপাঠীং তত্তু সর্ব্বথৈবোত্তরাযোগ্যং বেদ-দর্শন-স্মৃতিভ্যঃ সর্ব্বথা বহির্ভূতত্বাৎ। ঈদৃশাধিকারিবিষয়ে শ্রীমদ্ভিস্তার্কিকৈর্যদলেখি ন তদহমন্যামহে, তদ্যথা যুষ্মৎকৃতে খঞ্জনমঞ্জুনাক্ষি শিরো মদীয়ং যদি যাতি যাত্বিতিকৃত্বা পরদারাদিষু প্রবর্ত্তমানাঃ বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং বৃণোম্যহং ইতি বদন্তোঽবিবেকিনো ন মুক্ত্যধিকারিণঃ ইতি মুক্তিতঃ শৃগালত্বং প্রশংসতো মুমুক্ষূনুপহসতো বিজাতীয়রুচিমতঃ প্রত্যুক্তং শাস্ত্রপ্রমাণদর্শনেন।

(সাবশেষঃ)

মূলের অনুসন্ধান।*

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

মূল অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি জ্ঞানের বিকাশের অব্যবহিত ফল। যতই জ্ঞান বিকশিত হইতে থাকিবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মূলতত্ত্ব বাহির করিবার প্রয়াস মানবের অন্তরে আপনা হইতেই জাগিয়া উঠিবে। এক সময় ছিল, যখন বাসুকির মাথা নাড়া ভূমিকম্পের কারণ বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। ইন্দ্রধনুর বিকাশ আকাশে সন্দর্শন করিয়া লোকে বুঝিত যে, ইন্দ্রদেব তাঁহার ধনু বাহির করিয়া তাহার সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রভায় বজ্রের বাণ ধরাতলে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বিক্ষুব্ধ করিতেছেন। কিন্তু যেদিন হইতে জ্ঞানের আলোকে গবেষণা চলিতে আরম্ভ করিল, সেই দিন হইতেই সরস কল্পনা মানবের চিত্তক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়া গেল, মানুষ বুঝিতে পারিল ভূমিকম্প বা রামধনুর কারণ অন্য। বর্ত্তমানে গঙ্গার প্রাণদ স্পর্শ লাভ করিয়া লোকে সন্তুষ্ট হইতে

---

* বিগত ৩রা ভাদ্র বুধবার শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় আদি-ব্রাহ্মসমাজে বেদী হইতে যে উপদেশ দেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

চায় না, তাহার মূল উৎপত্তিস্থান সন্দর্শন করিবার জন্য লোকে হরিদ্বার অতিক্রম করিয়া গোমুখী অভিমুখে ধাবিত হয়। সেখানে গিয়াও সে পরিতৃপ্ত হয় না, বুঝিতে পারে গঙ্গার মূল আরও উচ্চে—আরও সুদূরে। ব্রহ্মপুত্রের মূল খুঁজিতে খুঁজিতে বুঝা গিয়াছে যে, তাহার উৎপত্তি-স্থান হিমাচলে নহে,—কিন্তু হিমালয়ের অতীত স্থান তিব্বতে। এইরূপে যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, মূল অনুসন্ধানের অদম্য চেষ্টা কি ভূগোল কি খগোল-বিদ্যায়, কি চিকিৎসাবিষয়ে, কি মনস্তত্ত্বে, কি পদার্থদর্শনে, কি রসায়ন-শাস্ত্রে, কি ইতিহাসে—সকল স্থানেই চলিতেছে। জল যাহা আমাদের নিত্য পেয়, তাহারও বিশ্লেষণে উহা যৌগিক পদার্থ বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। রসায়নের আবিষ্কার-ফলে জানা গিয়াছে যে, জল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সমষ্টি মাত্র। যখন প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করি, তখন জানিতাম, মূল পদার্থের সমষ্টি ৬৩টি মাত্র; কিন্তু বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর আলোচনা-ফলে বিদিত হইয়াছি যে, মৌলিক পদার্থের সংখ্যা ৬৩টি অপেক্ষা অনেক অধিক। ক্রমে যতই দিন যাইবে, জ্ঞানের আলোক যদি ম্লান হইয়া না যায়, মূল পদার্থের সংখ্যা যে আরও বর্দ্ধিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

কেবল যে বাহিরের পদার্থনিচয়ে মূল অনুসন্ধান-চেষ্টা চলিতেছে তাহা নহে, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের ভিতরেও মূল অনুসন্ধানের চেষ্টা চলিতেছে। তাই প্রকৃত ধর্ম্ম আজকালকার দিনে নিরবচ্ছিন্ন দেশাচার বা কুলক্রমাগত প্রাচীন পদ্ধতির ভিতর আবদ্ধ নহে; প্রকৃত ধর্ম্মের বহিরঙ্গে যে সমস্ত আবর্জ্জনা বা ভস্ম স্তূপীকৃত হইয়া উহার অন্তরস্থ সত্যের আলোককে একেবারে নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিয়াছিল, মূলের অনুসন্ধান-চেষ্টায় তাহা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতেছে। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া পৌরাণিক কাহিনী ও প্রচলিত ধর্ম্মের কোন কোন অংশ লইয়া যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা চলিতেছে, তাহাও মূল অনুসন্ধান-চেষ্টারই অব্যবহিত ফল। ঐরূপ ব্যাখ্যা সর্ব্বাংশে সঙ্গত না হইলেও, সত্য-আবিষ্কারের দিকে তাহার গতি।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন প্রচলিত ধর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের সামঞ্জস্য দেখিতে না পাইয়া অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে ছুটিতে হইয়াছিল মূল প্রাচীন উপনিষদের দিকে। অন্যান্য দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া সকল ধর্ম্মের মূলে যে সারসত্য রহিয়াছে, তাহার সাহায্যে আত্মপক্ষকে সুদৃঢ় করিয়া তবেই তাঁহাকে সুপ্রাচীন একেশ্বরবাদের প্রচার ও পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছিল।

আমরা প্রতি সপ্তাহে ভগবানের নাম গান করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে মিলিত হই। কিন্তু আমাদের মধ্যে মধ্যযুগে যাঁহারা চিন্তাশীল ছিলেন, তাঁহারা কেবলমাত্র উপাসনালয়ে আসিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহারা ব্রহ্মোপাসনার মূল প্রবর্ত্তন-কাল অনুসন্ধান করিতে গিয়া জানিতে পারিলেন যে, কমল বসুর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র হইতে ইহার প্রবর্ত্তনা। ইহা জানিতে পারিয়া এই মহনীয় দিনকে স্মরণে রাখিবার জন্য তাঁহারা এই পবিত্র ভাদ্রোৎসবের সূচনা করিয়া যান। তদবধি ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে মন্দিরে কয়েক দিবসব্যাপী এই উৎসবের সূচনা হইয়াছে। রাজার প্রবর্ত্তিত আরও পূর্ব্বের "আত্মীয় সভার" ব্যাপার যাহা কয়েক বৎসর চলিয়া পরে স্থগিত হইয়া গিয়াছিল, উহা তাঁহারা গণনার মধ্যে আনয়ন করেন নাই। ভাদ্রোৎসবে ব্রহ্মোপাসনার সূচনার ভিতর দিয়া মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের অসীম সাহস, তাঁহার অদম্য অধ্যবসায়, অসীম শাস্ত্রজ্ঞান—তাঁহার বিরাট হৃদয়ের পরিচয় আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে। জ্ঞানের আলোক যখন কোন বিরাট হৃদয়ে একবার জ্বলিয়া উঠে, তখন তাহার সম্মুখে পাষাণসমান বাধা ও শত সহস্র প্রতিকূলতা থাকিলেও সেই অনন্ত বহ্নি-শিখায় উহা ভস্মীভূত হইয়া যায়। রাজা যদি সময়ের আহ্বানে বিধাতার বিধানে আবির্ভূত না হইতেন, তাহা হইলে জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্যসাধনে অসমর্থ হইয়া আজিও আমাদিগকে নানা সমস্যার মধ্যে বিচরণ করিতে হইত। প্রাচীনত্বের সঙ্গে যোগরক্ষা করিতে না পারিয়া আমরা শুষ্ক হৃদয় লইয়া অবস্থান করিতাম। আমাদের আর দুর্গতির অবসান হইত না। প্রাণও যাক তথাপি আবর্জ্জনাবিহীন একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, একেশ্বরবাদের মঙ্গল বারতা জনসাধারণের ভিতরে জাতিনির্ব্বিশেষে ঘোষণা করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। জীবন বিপন্ন, নিজ গাত্রাচ্ছাদনের ভিতরে অস্ত্র লইয়া সেই বিপুলবপু বিপুল উৎসাহের সহিত কমল বসুর বাটীতে স্থাপিত ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিতেন। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর সত্যকে যে কেমন করিয়া রক্ষা ও প্রচার করিতে হয়, আমরা জানি না, ইহা হইতে সমুজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত আর কোথায় মিলে? সত্যের নিকষে পরীক্ষিত এমন সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের তুলনা আর কে কোথায় দেখিয়াছে?

এমন প্রাণ-জুড়ান ও জ্ঞান-জুড়ান ধর্ম্ম ভাগ্যবলে আমাদের মিলিয়াছে। যাহাতে ইহার গাম্ভীর্য্য ইহার পবিত্রতা ইহার সার্ব্বভৌমিকতা রক্ষা পায়, তাহার জন্য ভগবানের প্রাণদ আশীর্ব্বাদ চাই। তিনি আমাদিগকে এই গুরু-গম্ভীর পবিত্র ধর্ম্মপালনের শক্তি ও শ্রদ্ধা বিধান করুন।

যুবক মদনমোহন।

(শ্রীরত্নমালা দেবী)

অলঙ্কার-শাস্ত্র সম্পূর্ণ করিয়া মদনমোহন কিছুদিন জ্যোতিষ-শাস্ত্র পাঠ করেন। পরে দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ করিয়া স্মৃতি পড়িতে আরম্ভ করেন। স্মৃতিশ্রেণীতে উঠিয়া তর্কালঙ্কার বিংশতি বৎসর বয়সে 'বাসবদত্তা' রচনা করেন। কথিত আছে, তর্কালঙ্কার ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরকে পরাস্ত করিবার অভিলাষে বাসবদত্তা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা সম্পূর্ণ হইলে তিনি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গে তুলনায় সমালোচনা করিয়া বিদ্যাসুন্দরকে বাসবদত্তা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জানিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, জীবনে আর কবিতা লিখিবেন না। তাহার পর শিশুশিক্ষা প্রথমভাগের শেষাংশের কবিতাগুলি ব্যতীত তিনি আর কবিতা লেখেন নাই। তিনি দীর্ঘজীবী হইলে পরিণতবয়সে কবি-চূড়ামণি হইতেন, ইহা নিঃসন্দেহ।

তিন বৎসর স্মৃতিশ্রেণীতে পড়িয়া তৃতীয় বৎসরের শেষে তিনি স্মৃতির পরীক্ষা দেন। একশত একবিংশতি প্রশ্নের মধ্যে তিনি অষ্টচত্বারিংশৎ প্রশ্নের সুন্দর উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। আর কোন ছাত্রই তাঁহার উর্দ্ধে যাইতে পারে নাই। তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর উভয়েই স্মৃতির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জজ্ পণ্ডিতের নিকট সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই পরীক্ষার পর ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে তর্কালঙ্কার ছাত্রজীবন সমাপ্ত করেন।

বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া প্রথমেই তিনি কলিকাতা বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এক বৎসর পরে বারাসত গ্রেবর-স্কুলে প্রধান পণ্ডিতের পদে উন্নীত হইয়া তথায় কিছুদিন কার্য্য করত তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ফোর্টউইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তথায় দুই বৎসরকাল অতি সুচারুরূপে অধ্যাপনা করিয়া ছাত্রগণের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন; এমন কি, ইংলণ্ডীয় ছাত্রেরাও তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তর্কালঙ্কারের নাম শুনিলেই তাঁহারা উদ্দেশে নমস্কার করিতেন। ফোর্টউইলিয়ম কলেজে দুই বৎসর কার্য্য করিয়া তর্কালঙ্কার কৃষ্ণনগর কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিয়োজিত হয়েন। কৃষ্ণনগর কলেজের প্রাচীন ছাত্রগণ অনেকেই তাঁহার নিকট উপকৃত হইয়াছিলেন। উক্ত কলেজের প্রধান পণ্ডিতের আসন বৎসরকাল অলঙ্কৃত করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক-পদে অভিষিক্ত হয়েন। এই এই সময় তাঁহার যশঃসৌরভ দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হইতে থাকে। তাঁহার অবস্থানকালে সংস্কৃত কলেজ উজ্জ্বল শোভা ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার সুমধুর বচনবিন্যাস ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ছাত্রদিগের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিত। ক্রমে ক্রমে তাঁহার যশঃসৌরভ ইংরাজ-মণ্ডলীতেও বিকীর্ণ হইয়া পড়িল।

এই সময় তাঁহার পারিবারিক জীবন কিছু দেখাইব। তর্কালঙ্কারের জননী বিশ্বেশ্বরী দেবী অতি পতিপ্রাণা সাধ্বী ভগবদ্‌ভক্তিময়ী ছিলেন। তিনি রূপে গুণে লক্ষ্মীর সমান ছিলেন। তর্কালঙ্কারের পিতা পঞ্চদশ বৎসরেই তর্কালঙ্কারের বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহে তাঁহার একান্ত অনিচ্ছা থাকিলেও পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ছিল। কৈশোর জীবনের প্রারম্ভেই মদনমোহন নদীয়া জেলার ধর্ম্মদা বরিগাছি-নিবাসী শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যের পরমাসুন্দরী সুশীলা দশমবর্ষীয়া কন্যা মুক্তকেশী দেবীর সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন। তখন তাঁহার বয়স পূর্ণ পনর বৎসর। তখনকার হিন্দুসমাজ বাল্যবিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী ছিল। কারণ বালিকা বধূ আসিয়া যেমন পতি বা পতির আত্মীয়স্বজনকে আপন করিয়া লইতে পারিত, তেমনই নিজেও তাহাদের সঙ্গে অভিন্নভাবে মিশিয়া যাইত। অধুনা বয়ঃস্থা কন্যারা শ্বশুরবাটী আসিয়া সেরূপ নিঃস্বার্থভাবে স্বামীর পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনকে আর স্নেহের চক্ষে দেখে না; এবং নিজেরাও স্বামীর প্রেমে আপন অস্তিত্বটুকু আর পূর্ব্ববৎ বিসর্জ্জন দিতে পারে না। বধূ স্বামিগৃহে আসিয়াই এখন নিজের স্বার্থের পথটী খুঁজিয়া থাকে। এই সব কারণেই বোধ হয় আমাদের সমাজে বাল্যবিবাহের প্রথা ছিল। তাহার পরিণাম মঙ্গল বই অমঙ্গল ছিল না। *

মদনমোহন বিবাহ করিয়া পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসিলেন। বিবাহের এক বৎসর পরে মদনমোহনের পিতা নববধূকে স্বগৃহে আনয়ন করিলেন। মুক্তকেশী অত্যন্ত লজ্জাবতী শান্তস্বভাবা সুশীলা ছিলেন। তিনি স্বামিগৃহে আসিয়াই শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা ও পরিচর্য্যা দ্বারা গৃহস্থালীর ছোট ছোট কার্য্যগুলি করিয়া ননন্দাদের প্রতি স্নেহমমতাময়ী হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই সকলের হৃদয় জয় করিয়া লইলেন।

দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর অতীত হইল। পূজার ছুটী, কলেজ বন্ধ। ছুটী উপলক্ষে মদনমোহন বাটী আসিয়াছেন। মুক্তকেশীর বয়স তখন তের বৎসর। তিনি কিশোরী। মদনমোহনের একান্ত ইচ্ছা নব-পরিণীতা পত্নীকে লইয়া একটু আনন্দ করেন। কিন্তু বধূটী বড়

* লেখিকার এই মন্তব্যের সহিত অনেকেরই মতান্তর ঘটিবে। আমরাও উহার বিরুদ্ধে বহু প্রমাণপ্রয়োগ পাইয়াছি। তঃ সং

যেত না। কারণ, দিনের বেলা স্বামি-সম্ভাষণ তখন হিন্দুসমাজের প্রচলিত রীতির বহির্ভূত হওয়ায় সকলের নিন্দার্হ হইবার ভয় ছিল। এজন্য কিশোরী বধূ খুব সাবধানে থাকিতেন।

আমার মাতামহী রূপগুণবতী রমণী ছিলেন। তাঁহার হৃদয়টী দয়া, ভক্তি, প্রেম ও ভালবাসায় পূর্ণ ছিল। তর্কালঙ্কারও সুরসিক পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পারিবারিক জীবন বড় সুখের ছিল। মাতামহী নারায়ণের লক্ষ্মীর ন্যায় স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী ছিলেন। কখন স্বামীর সঙ্গে তাঁহার বিবাদকলহ, মতান্তর বা মনান্তর হইত না। স্বামীর সেবা করিয়া তিনি কৃতার্থ হইতেন। স্বামীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করা এবং তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করাই, তাঁহার চিরন্তন স্বভাব ছিল। মাতামহী অত্যন্ত শ্রমপরায়ণা ছিলেন, সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও বিশ্রাম করিতেন না। তিনি স্বহস্তে অনেক সাংসারিক কার্য্য করিতেন। পাককার্য্যে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঁহার প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন এত পবিত্র ও এত সুস্বাদু হইত যে, তাহা বলিবার নয়। তর্কালঙ্কারের একটী পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। সে বাহিরের লোকের জন্য ডালভাত সিদ্ধ করিত। কিন্তু মাতামহী প্রতিদিন স্বহস্তে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া স্বামী ও কন্যাদিগকে এবং ননদ ও আত্মীয়স্বজনকে পরিতৃপ্তরূপে আহার করাইতেন। আজীবন তাঁহার এই পাককার্য্যের ভার ছিল। আমার মাতামহীর হৃদয়টি দয়ায় ভরা ছিল। কেহ যদি মধ্যাহ্ন সময়ে আসিয়া বলিত—মা! আজ আমার আহার হয় নাই। আমার মাতামহীর বিশাল নয়নদুটী অমনি জলে ভরিয়া উঠিত। বলিতেন, আহা নাপিত বৌ? আজ তোর খাওয়া হয় নাই? এই বলিয়া নিজের অন্নব্যঞ্জনগুলি তাহাকে দিয়া নিজে মুড়িমুড়কি জল খাইতেন; ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

তর্কালঙ্কার যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হইয়া কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বদাই তাঁহার বাসায় আসিতেন ও মেয়েদের কোলে পিঠে করিয়া তাহাদের লইয়া খেলা করিতেন। আমার মাতামহী বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেবর বলিয়াই জানিতেন এবং তর্কালঙ্কারও বিদ্যাসাগরকে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিতেন। কতদিন মধ্যাহ্নকালে মাতামহী আহারে বসিয়াছেন, এমন সময় বিদ্যাসাগর ও তর্কালঙ্কার কলেজ হইতে বাটী আসিলেন। মাতামহী মাথায় একটু কাপড় টানিয়া দিয়া পিছু ফিরিয়া বসিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য আসিতে আসিতে তাঁহার ভোজনপাত্রের নিকট আসিয়া বসিয়া বলিলেন, বৌঠাকরুণ! আর খেতে পাবে না;—জগন্নাথের মহাপ্রসাদগুলি আমার; এই বলিয়া মাতামহীর অবশিষ্ট অন্নগুলি খাইয়া বলিতেন, তর্কালঙ্কার ভায়া! আজ জগন্নাথের মহাপ্রসাদ খেলুম। মাতামহী আর কি করিবেন? হাস্যমুখে বলিতেন, ঠাকুর-পো! আজ বুঝি আধপেটা খেয়ে কলেজে গিয়েছিলে? এই বলিয়া মুখ-হাত ধুইয়া একথালা জলখাবার সাজাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে খাইতে দিতেন। তখন উভয় বন্ধুতেই সন্দেশ-রসগোল্লাগুলি কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতেন। এইরূপে দিনে দিনে উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। বিদ্যাসাগর যে সকল লোকহিতকর দেশের কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন, মদনমোহন তাঁহার সহিত ঐ সকল কার্য্যে যোগদান করিয়া তাঁহার সহকারীরূপে সকল কার্য্যই করিতেন। বিদ্যাসাগর সর্ব্বদাই মদনমোহনের কল্যাণ চিন্তা করিতেন। রামগোপাল ঘোষ, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সকলে মদনমোহনের সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন।

দেশের কথা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কোন্ প্রদেশে কত জমীতে ধান হয় এবং কি পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহার হিসাব :—

(জমীর পরিমাণ হাজার একর)

দেশ	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯
বঙ্গদেশ	২০৭৯৩	১৮৬৮২	২১৪০৪
বেহার-উড়িষ্যা	১৪৪৪৬	১৩৪৭৬	১৪৩৫৩
ব্রহ্মদেশ	১১৯৯৬	১২৩৫৩	১২৫৪৫
মাদ্রাজ	১০৯৬৮	১০৫৩০	১১০২৭
যুক্তপ্রদেশ	৭২৩৯	৭৩৩৬	৭০৯১
মধ্যপ্রদেশ	৬০০৩	৬০৫৪	৬১৭১
আসাম	৪৪৫১	৪০২১	৪৪৩৯
বোম্বাই	৩৪৫৯	৩৫১৯	৩৩৩১

(ফসলের পরিমাণ হাজার টন)

দেশ	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯
বঙ্গদেশ	৭৯৬৯	৬৪৯৩	৯৬৭৬
বেহার-উড়িষ্যা	৫৫৫৬	৪৩৭৮	৫৫৮৯
ব্রহ্মদেশ	৪৭৩৯	৪৮৮৬	৫৮৪১
মাদ্রাজ	৪৯৪৭	৫৩৮৩	৫০৭৪
যুক্তপ্রদেশ	২১৭৯	২১৯৫	১১১৫
মধ্যপ্রদেশ	১৭০৬	১৭৫০	১৬৫৪
আসাম	১৫২৭	১৩০৮	১৫৬২
বোম্বাই	৪৫২৪	১৫১৭	১৫৬২

১৯২৮-২৯এ সুবৃষ্টি ফসল বৃদ্ধির কারণ।

কত লক্ষ গাঁট কাঁচা পাট রপ্তানি হইয়াছে তাহার হিসাব।

	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯
লক্ষ গাঁট	৪৫	৪৯	৪৯
লক্ষ টাকা	২৬,৭৮	৩০,৬৬	৩০,৩৫

বঙ্গের যৌথ কারবার।

১৯৩০ সালের মে মাসে বঙ্গদেশে মোট ৯২৫৩০০০০৲ টাকা মূলধন সহ ৩৫টী যৌথকারবার রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। তাহার বিবরণ।

ব্যাঙ্কিং	৫টি	৮৫০০০০৲ টাকা
লোন	১টি	৫৫০০০০৲ "
লগ্নি	ঐ	২০০০০৲ "
বীমা	ঐ	৪০০০০০৲ "
মোটর ট্রাক্টর	ঐ	২০০০০৲ "
ছাপাখানা	ঐ	১০০,০০০৲ "
এজেন্সি	৬টি	৩৩০০০৲ "
কাঠের জিনিষ	১টি	২০০০০৲ "
সিগারেট	ঐ	১০০০০০০৲ "
বিবিধ ব্যবসায়	৯টি	৩০৪০০০০৲ "
কল-কারখানা	১টি	২০০০০৲ "
চা-বাগান	ঐ	২০০০০০৲ "
হোটেল	২টি	১৫০০০০০৲ "

উপরের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, পরের ধনে পোদ্দারি করিবার জন্য আমরা খুব পটু।

(হিন্দু, আষাঢ়—১৩৩৭)।

বিক্রয় হইয়াছে—

	১৯২৭ সালে	১৯২৮ সালে
	কোটী লক্ষ	কোটী লক্ষ
চাল	৩৩, ২০ টাকা	৩৪,০০ টাকা
ডাল	১, ৭৫	১,৮৭
গম	৪,০৭	৫,৭৩
খইল	২,৫২	৩,১৪
তৈলবীজ	১৯,০৯	২৬,৬৯
হাড়	১,২৫	১,২৮

(বঙ্গবাণী, ১৮ বৈশাখ—১৩৩৭)

আমাদের দেশে একটা ভুল ধারণা, তাহা অবশ্য বিদেশীয় ঋদ্ধিশাস্ত্র হইতে অন্যান্য তথাকথিত ঐতিহাসিক মিথ্যার ন্যায় পাইয়াছি যে, এই যে দেশের জিনিষ বিক্রয় করিয়া ঘরে এত টাকা আসিল, ইহার ফলে দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কিন্তু আসল কথা এই যে, এই টাকার সদ্ব্যবহার যে কিরূপে করিতে হয়, আমরা এখনও সে শিক্ষা যথারীতি পাই নাই। এই টাকা যেই হাতে আসিল, অমনি আমরা তাহা ভোগবিলাসে ও ঘৃণ্য বাবুয়ানায় খরচ করিলাম। সিগারেট আছে, সস্তা এসেন্স আছে, সিনেমা বায়স্কোপ আছে, আর থিয়েটার ও ঘোড়দৌড়ের জুয়ার আড্ডা আছে—যত ইচ্ছা টাকা ওড়াও। এক দিকে তো ঘরের চাল-ডাল প্রভৃতি জীবনধারণের উপযোগী জিনিসগুলি বিদেশে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছি। এখন আবার হাতে পাওয়া টাকাও এদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে ফুকফাক করিয়া হাত হইতে ঝাড়িয়া ফেলিলাম। কাজেই তাহার ফলে জিনিসে আর টাকায় সর্ব্বপ্রকারে দেশে দারিদ্র্য আনিয়া ফেলিলাম। ইহার পরিণামে যে মরণ ঘনাইয়া আসিবে, তাহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির অগোচর থাকিতে পারে না। অনেকের মতে অন্যায় উপায়ে দারিদ্র্য আনিবার ফলেই "গত ৫০ বৎসরে প্রায় ৩ কোটী লোক খেতে না পেয়ে মারা গেছে"। হয়, দেশের লোকদিগকে খাওয়াইবার উপযুক্ত পরিমাণ চাল-ডাল সঞ্চিত রাখ, অথবা ঐ সকল বিক্রয় করিয়া যে টাকা হস্তগত হইল, সেই টাকা দ্বারা উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রভৃতি ক্রয় করিয়া তাহার সাহায্যে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি কর। আলস্য ও বিলাস পদতলে দলিত কর, তবেই দেশ আবার জাগিয়া উঠিবে। ভোগবিলাসে ডুবিয়া থাকিবে আর স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা করিবে, ইহা অসম্ভব—তোমার অন্তরে স্বাধীনতা পাইবার প্রকৃত প্রাণেরই অভাব ইহাতে সূচিত হইতেছে। অন্তরের স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত কর, বাহিরের স্বাধীনতা সহজেই হস্তগত হইবে।

পত্রিকাপরিচয়।

বিশ্ববাণী—শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া এম-এ, ডি-লিট্ (লণ্ডন) কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ৪র্থ বর্ষ, বৈশাখ—১৩৩৭।

'বিশ্ববাণী' পত্রিকাখানিকে এবারে চতুর্থ বর্ষে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পরিহার করিয়া একটী স্থায়ী সম্পাদকীয় পরিষদের দ্বারা পরিচালিত হইতে দেখিয়া উদারহৃদয় তত্ত্বপিপাসুব্যক্তিমাত্রই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। বিশ্বের কল্যাণকল্পে তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ যে সকল অমৃতময় শাশ্বত বাণী রাখিয়া গিয়াছেন, প্রধানতঃ সহজ ভাষায় নানাভাবে সেই চিরন্তন সত্যগুলিকে জগৎসমক্ষে প্রকাশ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হইল। ইহাতে জ্ঞানগর্ভ নানা তথ্য ও গবেষণামূলক প্রবন্ধের সমাবেশ হইয়া থাকে। ইহা ভারতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মুখপত্র হইলেও কোন সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে—সার্ব্বজনীন ভাবে প্রতি মানবের কল্যাণকল্পেই ইহার চেষ্টা

নিয়োজিত। মুখরোচক গল্প দিয়া পাঠকের চিত্তহরণ করিবার প্রবৃত্তি ইহার নাই—সকল প্রবন্ধই স্বাধীন চিন্তার উদ্বোধক ও কল্যাণপথের প্রদর্শক। এইজাতীয় পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমানে যে কত অধিক, তাহা সুধী পাঠক মাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান বর্ষ হইতে অধিকতর ব্যাপকভাবে নানাজাতীয় তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধের অবতারণা দ্বারা পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি হইবে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। আমরা ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ভারতের সাধনা—শ্রীবিধুভূষণ দত্ত এম-এ, সম্পাদিত। প্রথম বর্ষ, আষাঢ়—১৩৩১।

এই অভিনব পত্রিকাখানি গত কয়েক মাসের মধ্যে সুধীসমাজের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় উদ্ভ্রান্ত মানব যাহা চাহিতেছিল, ইহাতে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভারতের অধঃপতনের মূলে যে আত্মবিস্মৃতি বা জাতীয় ভাবে অশ্রদ্ধা বিদ্যমান, উহা দূরীভূত করিয়া ভারতকে ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করাই ইহার পরিচালকমণ্ডলীর প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। ইহা পাঠে প্রত্যেক হিন্দু নিজেকে বুঝিবার সুযোগ লাভ করিবেন। বিজাতীয় ভাবপ্লাবিত পরানুকরণরত ভারতকে পুনরায় স্বদেশী-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইলে এইজাতীয় ভারতীয় বৈশিষ্ট্যখ্যাপক তত্ত্বমূলক প্রবন্ধাবলীর বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। এই পত্রিকাখানি সগৌরবে বাঁচিয়া থাকুক, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহা কামনা করি। উপসংহারে পাঠকবর্গকে অনুরোধ করি যে, বৃথা গল্পপাঠে সময় নষ্ট না করিয়া এইজাতীয় পত্রিকা পাঠ করুন,—আনন্দ ও কল্যাণ এক সঙ্গে পাইবেন।

গ্রন্থপরিচয়।

বন্ধু আমার।—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা। ৫৫ নং আপার চিৎপুর রোড—কলিকাতা।

পরম পূজনীয় মনীষী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোমহোদয়ের 'বন্ধু আমার' পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম—আমারও প্রাণের মধ্যে এক সুতীব্র জাগরণ জাসিল। লেখক যথার্থই বন্ধুকে প্রকৃতভাবে জানিয়াছেন ও চিনিয়াছেন। তাই তাঁহার অন্তরে আবেগভরা উচ্ছ্বাসগুলি চিরবন্ধুর চরণে নিবেদন করিয়া হৃদয়ে পরাশান্তি লাভ করিয়াছেন। যিনি এই নশ্বর জগতে সেই নিত্যসখা চিরসুহৃদকে জানিয়াছেন, তিনিই এমর সংসারে চির অমরতা লাভ করিয়া তাঁহার অমৃত রস আস্বাদন করিতে পারেন। আমরা এই সংসার-নাট্যশালায় আসিয়া বৈচিত্র্যময় জগতের বুকে শুধুই রূপ রস শব্দ ও গন্ধাদিতে চিরমুগ্ধ হইয়া সেই চিরবন্ধুকে ভুলিয়া থাকি। তাই আমরা বন্ধুকে চিনিতেও পারি না। কিন্তু হৃদয়-মন্দিরে সেই বন্ধুর দর্শন লাভ করিয়া প্রকৃষ্টরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ প্রাণের এই আবেগময় মধুর উচ্ছ্বাসগুলি বন্ধুচরণে অঞ্জলি দিয়া জীবনের সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি শত শত ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহার 'বন্ধু' পড়িতে পড়িতে সময় সময় আমি আত্মহারা হই। বন্ধুর মধুর ডাক যেন আমারও প্রাণে সাড়া দেয়। মনীষী ক্ষিতীন্দ্রনাথ যে সেই নিত্যসখার চরণে অকপটে আত্মসমর্পণ করিয়া সেই আনন্দস্বরূপ পরমব্রহ্মের রসধারা উপলব্ধি করিয়াছেন,তাহা তাঁহার বন্ধু পড়িলেই বুঝা যায়। যে প্রকৃত বন্ধু লাভ করিতে পারে নাই, তাহার বন্ধুর প্রতি এই নিগূঢ় প্রেম আসিবে কোথা হইতে? তাঁহার বন্ধুটী যে একেবারে নিখাদ খাঁটি সোণা, তাঁহার সহিত কপটতা চলে না। তাই পরমহংসদেব বলিয়া গিয়াছেন, ভাবের ঘরে চুরি চলে না। 'বন্ধুর' প্রথম উচ্ছ্বাস হইতে শেষ উচ্ছ্বাস পর্য্যন্ত আদ্যন্ত বন্ধুপ্রীতিতে ভরা। তাঁহার বন্ধুপ্রেমের উচ্ছ্বাস যেন সকলেরই মরমের প্রতি তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দেয়। অনেক সময় পড়িতে পড়িতে নয়নে জল আসে। তিনি সরল হৃদয়ে অকপটে বন্ধুকে যে প্রাণের উচ্ছ্বাসগুলি নিবেদন করিয়াছেন, তাহা ভক্ত হৃদয়ের গোপন ব্যথার অর্ঘ্য। তাঁহার এগোপন ব্যথার প্রতি অর্ঘ্য তাঁহার চিরসখা চিরবন্ধু নিশ্চয়ই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রাণের এই উচ্ছ্বাসগুলি যেন ভাগীরথী-নির্ঝরের পুণ্য-পূত পবিত্র ধারার মত মানবহৃদয়কে প্লাবিত করিয়া অশ্রান্ত কলতানে ছুটিয়াছে। তাঁহার হৃদয়ের গোপনবাণী, প্রাণের কাতর নিবেদন—যাহা তিনি একান্তে বসিয়া ভগবৎচরণে অঞ্জলি দিয়াছেন—উহা যেন পুষ্প-ধূপ-চন্দনের সৌরভে ভরা। তাঁহার ব্যথিত প্রাণের এই উচ্ছ্বাস করুণার আবেগে পূর্ণ, যেমন মধুর তেমনি সরল ও প্রাঞ্জল। অনন্ত ভাবধারাসম্মিলিত প্রীতি-নিবেদনগুলি জীবন্তভাবেই যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভগবৎচরণে গ্রন্থকারের এই আত্মনিবেদন আমি মস্তকে রাখিয়া ধন্য হইলাম।

—শ্রীরত্নমালা দেবী।

পিকোচ্ছ্বাসম্‌—শ্রীসত্যচরণ সেন প্রণীত। ৮।১ সি, মধুর সেনের ফুলবাগান, কলিকাতা হইতে শ্রীশরৎ চন্দ্র দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্যের উল্লেখ নাই। ডবল ক্রাউন আকারে ৸৹+১৩৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

'পিকোচ্ছ্বাসম্‌' সংস্কৃত ভাষায় রচিত কতকগুলি কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলিতে যুগপৎ কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য উভয়ই বিদ্যমান দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য লেখক স্বয়ং উহাদের বাঙ্গালা ও ইংরাজী অনুবাদ পর পর প্রদান করিয়াছেন। অধুনা যাঁহারা কেবলমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যের সেবা করেন, তাঁহাদেরও সকলের মধ্যে এইজাতীয় শ্লোকরচনা-নৈপুণ্য সর্ব্বত্র সুলভ নহে; এজন্য এই ক্ষুদ্র কাব্যের রচয়িতা সত্যই প্রশংসার্হ। লেখকের ধর্ম্মভাব ও দার্শনিকতা তাঁহার রচনার সর্ব্বত্র একটী অনবদ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা 'পিকোচ্ছ্বাসম্‌' পড়িয়া আনন্দলাভ করিয়াছি।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ। আমরা বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের ইং ১৯২৯ সালের কার্য্যবিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি উহা পাঠে জানা যায় যে, ১৭৮৩ শকের ১০ই আষাঢ় তারিখে বরিশালে কয়েকটি যুবার চেষ্টাতে সমবেত উপাসনার প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় জীবিত আছেন। তিনি প্রথম যুগে উহার আচার্য্য ছিলেন। কিছুকাল পরে ৺রাখাল চন্দ্র রায় চৌধুরী পঠদ্দশায় উহাতে যোগ দেন। তাঁহার বাটীর একটি প্রকোষ্ঠে উপাসনার কার্য্য চলিত। কিন্তু তাঁহার পিতামহাশয় নিষেধ করিলে প্রান্তরে বা কখন নদীতীরে উপাসনা চলিতে লাগিল। শ্রদ্ধেয় ৺দুর্গামোহন দাস, হরিশ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺গিরিশচন্দ্র মজুমদার ও সর্ব্বানন্দ দাস প্রমুখ মহোদয়গণের বিশেষ চেষ্টায় ইং ১৮৬৫ সালের ১লা নবেম্বর সমাজমন্দির নির্ম্মিত হয় এবং পরে উহার ট্রষ্টডীড প্রস্তুত হয়। বিগত বৎসরে শ্রীমনমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্য এবং শ্রীসত্যানন্দ দাস, শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরাজকুমার ঘোষ, শ্রীমন্মথমোহন দাস ও শ্রীললিত কুমার বসু সহকারী আচার্য্য নিযুক্ত ছিলেন। বলা বাহুল্য; মনমোহন বাবু বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের প্রাণস্বরূপ। উক্ত ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত চারিটি প্রতিষ্ঠান আছে,—(১) ব্রাহ্মিকাসমাজ। (২) ব্রাহ্মবন্ধুসভা। (৩) ছাত্রসমাজ। (৪) আনন্দময়ী হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়। বিগত বর্ষে মোট আয়ের পরিমাণ ২১০৭৲ টাকা, ব্যয় ১৭২০৲ টাকা এবং মজুত ছিল ৩৮৭৲ টাকা। সমাজমন্দিরে উপাসনাকালে ব্রাহ্মসমাজের লোক অপেক্ষা হিন্দুসমাজের পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা অধিক হয়, কোন কোন সময়ে খৃষ্টিয়ান ও মুসলমান বন্ধুগণও যোগ দেন। ইহা সুলক্ষণ বলিতে হইবে। কার্য্যবিবরণী পাঠে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে প্রাণ আছে; জাতিনির্ব্বিশেষে সকলে যে ইহাতে যোগ দেন, ইহা সত্যই সুলক্ষণের পরিচায়ক। আমরা এই ব্রাহ্মসমাজের ভাবী সবিশেষ উন্নতি কামনা করি।

শোকসংবাদ।

৺উর্ম্মিলা দেবী—বিগত ২৫শে শ্রাবণ রবিবার সাধারণব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পত্নী উর্ম্মিলা দেবী অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আপনার সুমধুর ব্যবহারে অনেকের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সহধর্ম্মিণীর বিয়োগে উৎসাহী ও কর্ম্মনিরত সতীশবাবুর উদ্যম শিথিল হইয়া না যায় এবং তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ না হয়, ইহাই ভগবানের নিকট আমাদের কামনা। সতীশ বাবু নিজে সুশিক্ষিত ও ধর্ম্মপ্রাণ। তিনি ভগবানের এই কঠোর বিধান বরণ করিবার শক্তি অচিরে লাভ করিতে পারিবেন, এবং বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে শান্তি ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বিগত ৮ই ভাদ্র সোমবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে উর্ম্মিলার আদ্যকৃত্য হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেরম্ব চন্দ্র মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র বেদীর কার্য্য সম্পন্ন করেন। আমরা সতীশ বাবুর এই দারুণ দুর্দ্দিনে তাঁহার প্রতি আমাদের সমবেদনা জানাইতেছি এবং ভগবানের সন্নিধানে পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি।

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C 462

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৮তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার **শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী** ডি, এস্‌সি

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৷৴৹ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে শ্রীরণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৮তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০১। সাল ১৩৩৭। শক ১৮৫২। খৃঃ ১৯৩০। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩১।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৪৪। চিরসঙ্গী।

মা! দীর্ঘ—দীর্ঘ পথ চলিয়াছে। পথের সীমা তো দেখি না। সুখদুঃখের ভিতর দিয়া এখনও যে কতদূর চলিতে হইবে, ভাবিয়া কোনই কূল-কিনারা পাই না—ভাবিলেই প্রাণ আতঙ্কে আকুল হইয়া উঠে। এই বিজন পথে তোমার মত চির-সঙ্গী না পাইলে কি চলা যায়? এখানে সুখের সঙ্গী অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু তাহারা কতক্ষণের সঙ্গী? যতক্ষণ তাহাদিগকে সুখ দিতে পারি, ততক্ষণই তাহারা সঙ্গে থাকিতে চায়। সুখ দিবার ক্ষমতাও যখন চলিয়া যায়, দেখিতে দেখিতে তাহারাও কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। আমি যে বিজন পথে চলিতেছিলাম, সেই বিজন পথেরই একধারে আমায় ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়—আমার শত ডাকেও তাহারা বারেকেরও জন্য সাড়া দেয় না। তখন প্রাণটা যে কি রকম কাঁদিয়া ওঠে, তাহা একমাত্র তুমিই জান। তখন তুমি আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াও আর আমার জীর্ণ প্রাণে তোমার স্নেহহস্ত বুলাইয়া দাও—আমার সমস্ত দুঃখকষ্ট জ্বালাযন্ত্রণা মুহূর্ত্তের মধ্যে ভুলিয়া যাই। মা! তোমারই স্তন্য আমার দেহের প্রতি রক্তবিন্দুর ভিতর দিয়া আজ পর্য্যন্ত বহিতেছে এবং তোমাকে লাভ করিবার জন্য আমার হৃদয়ে দিবানিশি অবিশ্রাম ধক্‌ধকি জাগাইয়া তুলিতেছে। তুমি শৈশব অবধি অন্তরে যে বলবীর্য্য বিধান করিয়াছ, তাহারই বলে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত দুঃখ—সকল কষ্ট অতিক্রম করিয়া তোমার চরণে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি। তোমাকে চাহিয়া যখন তোমাকে পাই না, তখন প্রাণের ভিতর যে কষ্ট আসে, যে মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তাহার নিকট কোনও দুঃখ কোনও কষ্টই দাঁড়াইতে পারে না। তাই একবার তোমার দেখা পাইলে তিলেকের জন্যও তোমার সঙ্গ ছাড়া হইতে চাই না। মা! একবার তুমি স্নেহের সুরে কাছে ডাক আর স্নেহভরে এই সন্তানকে তোমার আবেষ্টনে জড়াইয়া ধর। প্রাণের মধ্যে অশান্তির যে আগুন জ্বলিতেছে, তাহা নিভিয়া যাউক। আমার সঙ্গে আর লুকোচুরি খেলা খেলিও না। তুমি আমার কাছে লুকাইয়া থাকিলে আমি কি তোমাকে ধরিতে পারি? তুমি দেখা না দিলে অশ্রুই আমার একমাত্র সম্বল।

৪৫। তুমি আর আমি।

মা! তোমার মত মাকে যখন মা বলিতে পারিয়াছি, তখন তো আমার সকল দুঃখ ঘুচিয়া

গিয়াছে আমার অশ্রু মুছিয়া গিয়াছে। মা! তোমার মত মাকে যখন মা বলিতে পারিয়াছি, তখন তো সকল সুখ আমার হস্তগত হইয়াছে। সহস্র রত্নখনি, অফুরন্ত সুখশান্তির সহস্র উৎস আমার সম্মুখে খুলিয়া গিয়াছে। বিশ্বজগত আমার নিকট মধুময় হইয়া গিয়াছে। আজ আমার কল্যাণ ও সুখবিধানের জন্য প্রকৃতি মুক্তহস্ত। নদীগুলি আজ তোমারই ঘুমপাড়ানি গান মৃদুমধুর সুরে কানে আনিয়া দিতেছে। মলয় বায়ুর মৃদুল হিল্লোল তোমারই গাত্রের সুগন্ধ বহন করিয়া আনিতেছে। আমার মনে হইতেছে, আমি যেন কোন্ অত্যুচ্চ পর্ব্বতের শিখরে বসিয়া আছি—নীরবে—নির্জ্জনে—অতি নির্জ্জনে। মনে হইতেছে—জগতে কেহ নাই—একেবার কেহ নাই—কেবল মা—তুমি আর আমি। আমার দিকে তুমি কি অপূর্ব্ব স্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছ, আর আমিও তোমার সেই স্নেহদৃষ্টিতে আমার দৃষ্টি লাগাইয়া আছি—প্রাণের ভিতর কত মধুময় ভাব একটীর পর একটী আসিতেছে আর চলিয়া যাইতেছে—ফুরায় না। তোমার নামে আমার হৃদয়ে যে গান ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছে, তাহারই কি মধুর—মধুর প্রতিধ্বনি গানের চারি সীমা ছাইয়া ফেলিতেছে। সেই প্রতিধ্বনি আমিও নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া শুনিতেছি, আর তুমিও তাহা একমনে শুনিতেছ—মনে হইতেছে, বিশুভ্র প্রভাতশিশিরের মত তোমার আশীষ আমার মস্তকে নিঃশব্দে নীরবধারায় ঝরিতেছে। দ্যুলোকের স্নেহধারার সঙ্গে সাগরের উচ্ছ্বসিত আনন্দ মিলিত হইয়া যেমন ঘন নিবিড় জলস্তম্ভের সৃষ্টি করে, সেইরূপ তোমার প্রেমধারার সঙ্গে আমার আনন্দ মিলিত হইয়া এক সুন্দর প্রীতিস্তম্ভের জন্মদান করিয়াছে।

৪৬। জীবনশেষের পূজা।

মা! জীবনের খেলাধুলা সাঙ্গ হয়ে গেছে। এখন শুধু তোমার কোলে একটুখানি ঘুমাইয়া বিশ্রাম করিয়া আবার নূতন জীবন লইয়া বাহির হইবার ইচ্ছা হইতেছে। মা! এখন একটুখানি ঘুমাইতে দাও। আমার চোখের পাতে তোমার যাদুহাত বুলাইয়া দাও, যাহাতে স্বপনেও তোমারই মুখ অন্তরে সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। জীবনের সঙ্গী!—জীবনের সঙ্গী! তাহাদের তো একমাত্র চেষ্টা যে তোমা হইতে আমার মনটীকে দূরে সরাইয়া দেয়। কিন্তু কৈ—জীবনের এই সন্ধ্যাবেলায়—যখন দুএকটী সঙ্গী পাইলে মন খুলিয়া প্রাণের কথা দুচারিটী বলিতে পারিলে প্রাণটা হালকা হইতে পারে বলিয়া মনে হয়—কৈ—জীবনের এই সন্ধ্যাবেলায় সে সমস্ত সঙ্গীরা কোথায়? প্রতিধ্বনিই একমাত্র সাড়া দিয়া বলিতেছে—কোথায়? মা! আর না—সঙ্গী আর চাহি না—এখন আমার জীবনের সঙ্গী তুমি, আর তোমার জীবনের সঙ্গী আমি—এইটুকুই চাই। এই মিলনের গান আমাকে জীবনভোর গাহিতে দাও—তাহার ঝঙ্কারে আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠুক। ধরণীর বক্ষে নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতে ঘুমাইতে ফুলগুলি যেমন সুখের স্বপ্ন দেখিয়া সর্ব্বদাই হাসিতেছে, মা! তেমনি তোমার বুকে আমি যেন ঘুমাইয়া পড়ি, আর সুখের স্বপ্নে আনন্দে ডুবিয়া যাই। মেঘের উপর চড়িয়া, মা! তোমার যে রাজ্যে মেঘ নাই, সেই রাজ্যে যাইতে ইচ্ছা হয়—ইচ্ছা হয়, তোমার ঐ চক্ষু আমার দিকে চাহিয়া থাকুক, আর আমি সংসারের সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা মন হইতে নামাইয়া অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের জন্য গভীর নিদ্রায় ডুবিয়া যাই। অনেক ঝড়-ঝটিকা খাইয়া আজ তো জীবনের এই শেষ-ভাগে আসিয়া পৌঁছিয়াছি; আর সে ঝড়ঝটিকার সঙ্গে সংগ্রাম করিবার শক্তিও নাই, ইচ্ছাও নাই। এখন ইচ্ছা হয়—এই জীর্ণ তরীখানি শান্তিনদীতে ভাসাইয়া দিই—অল্প অল্প ঢেউ খাইতে খাইতে যদি বা ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে যেন তাহা তোমার চরণতলে পৌঁছিয়া যায়। জীবন-প্রভাতে তুমি আমাকে যে সমস্ত সুগন্ধ ফুল দিয়াছিলে, হতভাগ্য আমি সে সমস্তই যে কোথায় হারাইয়া আসিয়াছি, তাহা তো জানি না। এখন তোমার কোলে শুইবার আগে তোমার চরণপূজার জন্য কতকগুলি সন্ধ্যামাণিক ফুল তুলিয়া আনিয়াছি। মা! হৃদয়ঘসা চন্দনে সেই সমস্ত ফুল মাখাইয়া তোমার চরণে দিতেছি—ঠেলিয়া ফেলিও না—এই দীনদুঃখী সন্তানের পূজার উপকরণ বলিয়া গ্রহণ করিও। পূজা সাঙ্গ হইলে তুমি আমাকে কোলে লইয়া ঘুমপাড়ানি গান গাহিয়া

আমাকে ঘুম পাড়াইও। যে গান তুমি আমাকে শিখাইয়াছিলে, সে সমস্তই তো ভুলিয়া গিয়াছি; এখন দেখি, তোমার মুখের গান শুনিয়া আবার কোন নূতন গান প্রাণে জাগিয়া উঠে কি না।

কৃতার্থতা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

প্রত্যেকেরই প্রাণে অনেক সময়েই এই প্রশ্ন জাগিয়া উঠে, আমি যে সকল কাজকর্ম্ম করিতেছি, তাহাতে সাফল্য লাভ করিতেছি কি না, অথবা যদি বা না করিয়া থাকি, তবে কি উপায়ে সাফল্য লাভ করিতে পারি। এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে গেলে প্রথমেই বুঝিতে হইবে, সাফল্য কাহাকে বলে। অনেক কাজে আমি রাশি রাশি হাততালি কুড়াই, কিন্তু সে সকল কাজে আমি নিজে হয়তো প্রাণের ভিতর বেশ একটা শান্তি বা আরাম লাভ করিতে পারি না; আবার অনেক কাজে আমি হাততালির হ পর্য্যন্ত পাই না, জনসাধারণের নিকটে এতটুকু বাহবা পাই না, প্রশংসা লাভ করি না, কিন্তু সে সকল কাজে নিজেদের অন্তরে যথেষ্ট তৃপ্তি পাই—প্রাণের ভিতর সাড়া পাই যে, আমি যে কাজ করিয়াছি, সে কাজ প্রকৃতই ভাল কাজ হইয়াছে—প্রশংসা পাই বা না-ই পাই। প্রশ্ন হইতেছে এই যে, এই দুই প্রকার কাজের মধ্যে কোন্ কাজটাকে বস্তুত সফল বলিয়া গ্রহণ করিব?

অনেকে মনে করেন, আমার মনে যে কাজ ভাল বলিয়া সাড়া পাওয়া যায়, সেই কাজই বস্তুত সফল; কারণ কাজ করিতেছি আমি—আমিই যদি আমার কাজে প্রাণে শান্তি পাইলাম, আনন্দ পাইলাম, তবে তাহাকে সফল বলিব না তো কি বলিব? এই কথার ভিতর যে খুবই সত্য আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যে কাজের ফলে মানুষ অন্তরে আনন্দ লাভ করে, এই অশান্তিময় সংসারে উপেক্ষার দাবানলের মধ্যেও প্রাণে শান্তি লাভ করে, সে কাজকে ভাল বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি ভগবান যে প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরে নিহিত করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং সে প্রবৃত্তিকে স্বীকার না করিয়া মানুষ যাইবে কোথায়? এই প্রকার প্রবৃত্তিরই বশে জর্ম্মনির সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ইম্যানুয়েল ক্যাণ্ট তাঁহার প্রবন্ধরাশি আশি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ফেলিয়া রাখিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। সত্যই তো, এই প্রকার প্রকৃতি থাকাতেই মানবসমাজে কর্ত্তব্যমূলক নীতিবাদ সমুত্থিত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। এই প্রবৃত্তি যাঁহাদের অন্তরে প্রবলরূপে জাগ্রত থাকে, তাঁহারা হাততালির বড় একটা ধার ধারিতে চাহেন না, প্রশংসা পাইবার দিকে তাঁহাদের কোন লক্ষ্যই থাকে না। যখন তাঁহারা নিজেদের কাছে নিজেদের কাজের প্রশংসা পান, তখন তাঁহারা সে কাজ বাহিরে প্রকাশ করার পক্ষে আপত্তি করেন না। তখন তাঁহারা মনে ঠিক বুঝিতে পারেন যে, আজ না হৌক কাল, কাল না হৌক দশদিন পরে, দশ দিন পরে না হৌক, এক বৎসর পরে, অন্তত শতাব্দী পরেও তাঁহাদের কাজের প্রকৃত মূল্য জনসাধারণ বুঝিতে পারিবে—এইরূপ প্রশংসার প্রলোভন, হাততালির ব্যর্থ মুখরতার প্রলোভন অতিক্রম করিবার সক্ষমতাতেই ইঁহাদের মহত্ব, মহাপুরুষত্ব। রাজা রামমোহন রায় যখন ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণ-মন-ধন ঢালিয়া দিলেন, তখন তিনি হাততালির প্রলোভন এড়াইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বলিতে পারিয়াছিলেন—'আমি যে কাজ করিতেছি, আমার সমসাময়িক লোকেরা তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিলেও শতাব্দী পরে জনসাধারণ তাহার মূল্য বুঝিতে পারিবে'। যে "ব্রাহ্মধর্ম্ম"গ্রন্থের তাৎপর্য্য, যে "ব্রাহ্মধর্ম্মের" ব্যাখ্যান পড়িয়া পাঠক মুগ্ধ হন, আমরা জানি, প্রথম খসড়া দেবানুপ্রাণিত হইলেও তাহার উপর সংশোধন করিতে করিতে যতক্ষণ না মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজে তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন, ততক্ষণ তিনি তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করেন নাই। বঙ্গের শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধাদিতে সংশোধনের পর সংশোধন করিয়া যতক্ষণ না আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেন, ততক্ষণ তিনি তাহা প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন; এমন কি, মুদ্রাযন্ত্রে চলিয়া গিয়াছে এবং মুদ্রিত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে, তখনও তিনি চিন্তা করিতে করিতে যদি একটা অক্ষর বা একটা অবচ্ছেদের (paragraph) পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন বিবেচনা করিতেন, তাহা সংসাধিত করিবার জন্য তাঁহার কি ব্যস্ততা—যন্ত্রালয়ের কর্ম্মীরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিত। আমরা ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কেও দেখিয়াছি—আত্মতৃপ্তির শেষ পর্য্যন্ত না পাইলে তিনি কিছুতেই নিজের প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেন না। ইঁহাদের সংশোধিত "কপি"র অবিকল নকল প্রকাশ করিলে ইঁহাদের মহাপুরুষত্বের মূল সুন্দররূপে বুঝা যায়।

আত্মতৃপ্তি অবশ্যই চাই। কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণের তৃপ্তির দিকে কি লক্ষ্য রাখিব না? তাহা নহে। কাজ করিতেছি, বক্তৃতা করিতেছি, উপদেশ দিতেছি বা প্রবন্ধ লিখিতেছি—এ সকল কাহার জন্য? জনসাধারণেরই তো মঙ্গলের জন্য বল, বা আনন্দবিধানেরই জন্য বল। তখন আমার কাজে যাগতে

জনসাধারণের তৃপ্তি হয়, মঙ্গল হয়, সেদিকে আমার যে লক্ষ্য রাখিতে হইবে তাহা তো অপরিহার্য্য। কিন্তু জনসাধারণের প্রকৃত তৃপ্তি বা মঙ্গলসাধন এক কথা, আর জনসাধারণের নিকট হাততালি লাভ করিয়া আহ্লাদে গলিয়া যাওয়া আর এক কথা। জীবজন্তুর তত্ত্ববিৎ সুবিজ্ঞ অধ্যাপকেরা যদি জীবজন্তুবিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়া শ্রোতৃবর্গের নিকট হাততালি পাইবার উদ্দেশ্যে তৎসম্বন্ধীয় প্রকৃত তত্ত্ব উপদেশ করিবার পরিবর্ত্তে কয়েকটী জীবজন্তুর নৃত্য মাত্র প্রদর্শন করেন, তবে তাহাতে শিক্ষকের শিক্ষকতা কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হইল বলিয়া কিছুতেই বলিতে পারিব না। শিক্ষক বেশ বোঝেন যে উহা ফাঁকিদারি কাজ হইল, তিনি উহাতে প্রকৃত আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। যাঁহারা প্রকৃত মহাপুরুষ তাঁহাদের ধারণাই এই যে, যে কাজে তাঁহারা নিজেরা আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন, একসময়ে না একসময়ে জনসাধারণও তাহাতে নিশ্চয়ই তৃপ্তিলাভ করিবে। এই কারণে প্রকৃত মহাপুরুষেরা অনুপ্রাসাদির ছটার পশ্চাতে আত্মগোপন না করিয়া তাঁহারা যে সত্যটুকু অন্তরে সত্য সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, জীবনের মন্ত্ররূপে ধারণ করিতে পারিয়াছেন, সেই সত্যটুকুই তাঁহাদের কাজে কর্ম্মে, প্রবন্ধে ও বক্তৃতাদিতে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন এবং সক্ষম হন; তখন সেই সত্য জনসাধারণের নিকট প্রকাশিত হইলে তাহাদেরও অন্তরে তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে সাড়া দেয়।

এখন দেখিতে হইবে যে জনসাধারণ কাহাকে বলে। সাধারণত জনসাধারণকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—এক, যাহারা নিজেরাই আপনাদিগকে অপরের মহত্ত্ব, অপরের কাজকর্ম্মের অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলে; আর দ্বিতীয়, যাহারা অপরের হাতের মোমের পুতুল—ভাল হোক বা মন্দ হোক, অপরের মতামতের উপর নিজেদের মতামত ছাড়িয়া দেয়; নিজেরা চিন্তা করিবার কোনই অবসর পায় না—অপরের মতামতের দ্বারা নিজেদের মতামত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাঙে গড়ে। মহাপুরুষেরা নিজেদের ছাড়িয়া অপর যাহাদের প্রশংসা বা সমর্থন চান, তাহারাই প্রথম শ্রেণীর জনসাধারণ। আর হঠাৎ বড়লোক হইবার ইচ্ছায় অনেকে সাধারণত যাহাদের হাততালি পাইবার আশায় উন্মুখ হইয়া থাকেন, পূর্ব্বপশ্চাৎ না ভাবিয়া যাঁহারা জনসংঘের মুখরোচক কাজে প্রবৃত্ত হন বা বক্তৃতাদি দেন, তাহারাই ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। একথা যদি কেহ বলেন যে, মহাপুরুষেরা নিজের কাজের জন্য কাহারও নিকট প্রশংসা বা সমর্থনের অপেক্ষা রাখেন না, তাহা সত্য নহে। তাঁহারা প্রশংসা বা সমর্থন চান, কিন্তু সে প্রধানত ঐ প্রথম শ্রেণীর লোকের কাছে। তাঁহারা জানেন যে ঐ প্রথম শ্রেণীর লোকেরা তাঁহার কাজ সমর্থন করিলে পরিণামে দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরাও তাহা সমর্থন করিতে বাধ্য হইবে। ইংরাজীতে একটী কথা আছে—playing to the gallery। থিয়েটারের গ্যালারির মাশুল হইল সর্ব্বাপেক্ষা কম এবং সেই কারণে গ্যালারিতে যাহারা যায়, তাহাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং তাহাদের রুচিও সুমার্জ্জিত নয়। কিন্তু ঐ গ্যালারি হইতেই থিয়েটারের মালিকদের আয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কাজেই ভাল বিষয়ের অভিনয়ের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্যালারিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কুরুচিপূর্ণ কোন বিষয়ের অভিনয় করা হয়। আমরা বাল্যকালে বিজ্ঞাপন দেখিতাম, "বুদ্ধদেব" অভিনয়ের পর "ভূতের নাচ" এই রকম একটা কিছুর অভিনয় হইবে। মহাপুরুষেরা স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে বা কোনও কারণেই এই পথের পথিক হইতে চান না।

বলা বাহুল্য অনেকেই স্বার্থসাধনের প্রলোভন এড়াইতে পারেন না। অভাবে অনেকেরই স্বভাব নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু শত অভাবেও স্বভাবকে নষ্ট হইতে না দেওয়াতেই মহাপুরুষের মহত্ত্ব। যাহাতে স্বভাব নষ্ট হয়, যাঁহারা এরূপ অভাবে পড়েন নাই তাঁহাদের প্রতি ভগবানের কৃপা বর্ষিত হইয়াছে। কিন্তু এমনও অনেক লোক দেখা যায়, শত অভাবেও যাঁহারা নিজেদের স্বভাব, নিজেদের সংস্কার বিনষ্ট হইতে দেন না। তাঁহারা আমাদের নমস্য। সেই সকল মহাপুরুষদের কাজের ভিতরেই প্রকৃত সাফল্যের মূল অন্তর্নিহিত থাকে। বাহির হইবার কিছুমাত্র অবসর পাইলেই ফাটিয়া ফুটিয়া তাহা বাহির হইয়া পড়ে।

এমনও অনেক স্থলে দেখা যায় যে, অভাব না থাকার কারণেই উন্মুখী মহাপুরুষের মহত্ত্বের কুঁড়ি অকালেই শুকাইয়া গেল। অভাব না থাকার কারণেই তাহার মনের দৃঢ়তা ভাসিয়া যায়, এবং দৃঢ়তার ফলে যে মহত্ত্ব জাগিয়া উঠিবার সম্ভাবনা হইত, তাহাও অকালে অন্তর্হিত হইল, আর ফুটিতে পারিল না।

সুতরাং অভাব থাকা বা না থাকা কৃতকার্য্যতা বা সাফল্যলাভের অপরিহার্য্য কারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। আমার অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি, অভাব ও অভাব না থাকার সামঞ্জস্যের মধ্যেই, নিজের আত্মতৃপ্তি এবং মার্জ্জিত রুচি ও শিক্ষিত জনসাধারণের তৃপ্তির সামঞ্জস্যের মধ্যেই সফলতা বিকশিত হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সম্ভব। ইহা বুঝিয়া মার্কিন ক্রোরপতির বিধবা পত্নী তাঁহার শিশুপুত্রকে অভাব ও অভাব না থাকার মাঝামাঝি থাকিবার উপযুক্ত অর্থ দিতেন—শৈশব অবধিই তাহাকে বুঝিতে দিতেন না যে, সে এক মহাধনীর পুত্র। উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, সমত্বং যোগ উচ্যতে—সকল বিষয়ে সামঞ্জস্যের উপর দাঁড়াইতে পারাই যোগ এবং তাহাই সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার ও সফলতা লাভ করিবার মূল নিদান।

রামায়ণের কথা।

(শ্রীবীরেশ্বর সেন)

আমার প্রবন্ধটী প্রকাশ করিয়া এবং স্বয়ং তাহার সমালোচনা করিয়া সম্পাদক মহাশয় আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন বলিয়া মনে করি। * সেজন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। প্রবন্ধটী কেন লিখিয়াছিলাম সে বিষয়ে হেতুবাদ বা কৈফিয়ৎ স্বরূপ আমি দুইএকটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু তাহা বলিবার পূর্ব্বে দশরথ-জাতকটী পাঠকদিগের গোচর করা আবশ্যক।

জাতকটীর সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—"পূর্ব্বকালে বারাণসীতে দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার ষোল সহস্র পত্নী ছিল। তাঁহার প্রধানা মহিষীর গর্ভে যথাক্রমে রাম পণ্ডিত, লক্ষ্মণ কুমার এবং সীতাদেবীর জন্ম হয়। তাহার পর সেই মহিষীর মৃত্যু হয়। তাহার পর আর এক পত্নীকে দশরথ প্রধানা মহিষী করেন। এই মহিষীর গর্ভে ভরত কুমারের জন্ম হয়। ভরতের বয়স যখন সাত বৎসর তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে রাজা করিবার জন্য দশরথকে পীড়াপীড়ি করেন। ইহাতে দশরথ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট এবং রুষ্ট হইলেও ভরতের মাতার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সম্মত হন। তিনি দৈবজ্ঞদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তিনি আর দ্বাদশ বৎসর কাল জীবিত থাকিবেন। তিনি তখন রাম ও লক্ষ্মণকে কোন সামন্ত রাজার আশ্রয়ে বা বনে গিয়া বাস করিতে বলেন; কেননা তিনি বিবেচনা করিলেন যে, তাঁহারা গৃহে থাকিলে ভরতের মাতা তাঁহাদিগকে বিষ দিয়া বা অন্য কোন উপায়ে হত্যা করিবেন। রাম ও লক্ষ্মণ রাজাজ্ঞায় বনগমন করিলেন। সীতাও তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন। তাঁহাদের শোকে নয় বৎসর পরেই দশরথের মৃত্যু হইল। অমাত্যগণ ভরতকে রাজা করিতে অসম্মত হইলেন। ভরত তখন রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে ফিরাইয়া আনিতে গেলেন। কিন্তু রাম তাহাতে এই বলিয়া সম্মত হইলেন না যে, দশরথ তাঁহাদিগকে বার বৎসর পরে ফিরিয়া রাজ্য গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন; সুতরাং নয় বৎসর পরে ফিরিলে তাঁহার আদেশ সম্পূর্ণ পালন করা হইবে না। রাম তাঁহার এক জোড়া পাদুকা ভরতকে দিয়া তাহাই সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া তাঁহার (রামের) নামে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে বলিলেন। ভরত তাহাই করিলেন। ইহার পরে তিন বৎসর পূর্ণ হইলে লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া রাম নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং সীতাকে প্রধানা মহিষী করিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন।"

—৪৬১ সংখ্যক জাতক।

এই জাতক হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে সীতা ছিলেন রামের সহোদরা ভগিনী—কোন দূর সম্পর্কীয়া ভগিনী নহেন।* আমি ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রথমে এই বিবরণ পাঠ করি, তখন বৌদ্ধেরাই রামায়ণোক্ত "জনক" শব্দের অর্থ পিতা এই ভাবিয়া এই জাতক রচনা করিয়া তাঁহাদের অজ্ঞতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই বিবেচনা করিতাম। এখন আমি অশীতিপর বৃদ্ধ। এখন ঈশানচন্দ্র ঘোষ প্রকাশিত জাতক পড়িয়া এবং আমার এই দীর্ঘজীবনে কি ধর্ম্মবিষয়ে কি সাংসারিক বস্তুবিষয়ে আমার কত পুরাতন বিশ্বাস নবাবিষ্কৃত সত্যের আঘাতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে ইহা স্মরণ করিয়া এবং রামায়ণের মূলগত কথা যে ঐতিহাসিক বলিয়া বিশ্বাস ছিল তাহা বাস্তবিকই দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কি না ইহা নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে সাহিত্যিক আলোচনা আহ্বান করিয়াছিলাম। এরূপ বিষয়ে সত্য নিরূপিত হইলে জগতের লাভালাভ কিছুই হয় না বটে, কিন্তু সত্যনির্ণয় জন্য আন্দোলন অবশ্যই উপভোগ্য হইবারই সম্ভাবনা—যদি সেই আন্দোলনে তুচ্ছতাচ্ছিল্য, গালাগালি ও অনুচিত বিদ্রূপ না থাকে। ফুটবল খেলায় যে দলেরই জয় হউক তাহাতে জগতের ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, কিন্তু মনোমালিন্যহীন দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখিলে দর্শক মাত্রেরই হর্ষ হয়।

রামায়ণে জনক রাজা, তাঁহার পরিবার, তাঁহার রাজ্য প্রভৃতির বিস্তৃত বর্ণনা থাকিলেও আমি তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই; তাহার কারণ এই যে জনক-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ত্যাগ করিয়া বাল্মীকি যদি ইচ্ছা করিয়া অর্থান্তর অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি তৎসম্বন্ধে একটা গল্পও সৃষ্টি করিতে পারেন। যবন যে একটা দেশের নাম (১) ইহা ভুলিয়া গিয়া অথবা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইয়াই পুরাণকার লিখিয়াছেন যে বশিষ্ঠের গাভীর মুখ হইতে যে সেনা জন্মিয়াছিল তাহারাই যবন। অসুর-শব্দের পৌরাণিক অর্থ সুরবিরোধী নিন্দনীয় জাতিবিশেষ; অথচ বেদে ইন্দ্রাদি দেবতাকে অসুর বলা হইয়াছে দেখিয়া সায়ণ তাহার অর্থ করিলেন দিব্যাস্ত্রপ্রক্ষেপকুশল। আবার ম্যাক্সমূলের

* তত্ত্ববোধিনীর গত বৎসরের চৈত্রসংখ্যা দ্রষ্টব্য।

* এই জাতকটী যে কল্পনাপ্রসূত গল্প নহে, তাহার কোন প্রমাণ দেখা যাইতেছে না। তঃ সং

(১) বালকাণ্ডের ৫৫ সর্গে দেখিতে পাই যে বশিষ্ঠের শবলা নামক ধেনুর মূত্রদ্বার হইতে যবন, অপান হইতে শক, লোমকূপ হইতে কিরাত প্রভৃতি জাতি জন্মিয়াছেন। এই সংবাদ যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য তাহা বলাই বাহুল্য। অন্য পক্ষে যবন যে গ্রীক যুনান বা ইউনান দেশের নাম তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা উত্তমরূপে প্রমাণ করিয়াছেন।

কুমারিল ভট্টের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অহল্যাজার শব্দের অর্থ অহল্যাকে অর্থাৎ রাত্রিকে জীর্ণ করেন যিনি অর্থাৎ সূর্য্য (২); কিন্তু এই প্রকৃত অর্থ ত্যাগ করিয়া পুরাণকার ইন্দ্র, গৌতম, প্রজাপতি ও উষা প্রভৃতির কুৎসিত গল্প রচনা করিয়াছেন।*

আমার নিজের বিশ্বাস এই যে রামের কথাই হউক বা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কথাই হউক, সকল কথাই ঘটনার বহুশত বৎসর পরে কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল। সকলেই অবগত আছেন যে কোন ঘটনার বিবরণ অবিলম্বে লিখিয়া না রাখিলে তাহার নানা শাখা-প্রশাখা হয়। এমনও হয় যে ঘটনার এক বিবরণ অন্য বিবরণের সম্পূর্ণ বিরোধী। মহাভারতের কোন কোন স্থান যে পরস্পরবিরোধী বিবরণে পূর্ণ তাহা যদি আমার আয়ুতে কুলায় তাহা হইলে পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব। রামের কথাও সেইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ বিবরণে বিভক্ত হইয়াছিল। তাহার এক বিবরণ লইয়া রামায়ণ রচিত এবং অন্য বিবরণ লইয়া দশরথ-জাতক রচিত হইয়াছিল। হয়ত ভারতে আর্য্যদের আগমনের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে যখন ভারতে অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় জাতি বাস করিত, রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনা সেই সময়েই হইয়াছিল এবং বহুশত বৎসর পরে আর্য্যেরা সেই সকল ঘটনা পল্লবিত করিয়া সংস্কৃত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, আমি এই প্রবন্ধে রামায়ণ এখন আমরা যেমন পাইতেছি, তৎসম্বন্ধেই কয়েকটা কথা বলিব।

রামায়ণের আরম্ভেই বাল্মীকি লিখিয়াছেন যে তিনি নারদের মুখে রামচরিত শুনিয়াছিলেন। নারদ যাহা বলিয়াছিলেন বাল্মীকি তাহা প্রথম অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিলেন। রামায়ণের অবশিষ্ট ভাগ সম্বন্ধে বাল্মীকি জানাইয়াছেন যে তাহা তিনি ব্রহ্মার বরে ধ্যানে অবগত হইয়াছিলেন। কোন বিষয় ধ্যানে অবগত হওয়ার অর্থ আমি এই বুঝি যে, তাহা কল্পনাপ্রসূত এবং বাস্তব জগতে তাহা কখনই ঘটে নাই।* রামায়ণে বাল্মীকির যে অদ্ভুত কল্পনা দেখা যায়, জগতের অন্য কোন কাব্যে বোধ হয় তাহার তুলনা নাই। কিন্তু মনঃকল্পিত হইলেও প্রায় সকল কাব্যেই বিশেষতঃ মহাকাব্যে অল্প বা অধিক ঐতিহাসিকতা থাকিবেই থাকিবে; কেননা সকল কবিই পারিপার্শ্বিক অথবা প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা idealize বা কাব্যোচিত করিয়া কাব্য রচনা করিয়া থাকেন। বাল্মীকিও নিশ্চয়ই এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত ছিলেন না। অতএব তাঁহার রামায়ণ হইতেও অনেক বিষয়ে সত্যের সন্ধান পাই। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে যখন রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা অতিথি হইলেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে আহারের জন্য একটা বৃষ দান করিয়াছিলেন (৩)। ইহা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে গো-মাংস ভক্ষণের প্রথা ছিল। লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর সীতাকে রাম মৈরেয় নামক (৪) মদ্য বড় আদর করিয়া পান করাইতেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে মদ্যপানও পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। ভরদ্বাজের আশ্রম এবং লঙ্কার বর্ণনায় বাল্মীকি দধিপক্ক মাংসের (৫) উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা

(২) প্রজাপতিস্তাবৎ প্রজাপালনাধিকারাদাদিত্য এবোচ্যতে। স চারুণ-বেলায়াম্ উষসমুদ্যন্নভ্যেতি সা তদাগমনাদুপজায়ত ইতি তদ্দুহিতৃত্বেন ব্যপদিশ্যতে। তস্যাং চারুণকিরণাখ্য-বীজনিক্ষেপাৎ স্ত্রী-পুরুষসংযোগ-বদুপচারঃ। সমস্ততেজাঃ পরমৈশ্বর্য্য-নিমিত্তেন্দ্রশব্দবাচ্যঃ সবিতৈবাহনি লীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যাশব্দবাচ্যায়াঃ ক্ষয়াত্মকজরণহেতুত্বাজ্জীর্য্যত্যস্মাদ্ অনেনৈবোদিতেন বেত্যহল্যাজার ইত্যুচ্যতে। ন পরস্ত্রীব্যভিচারাৎ।

ম্যাক্সমুলর-ধৃত কুমারিলবচন।

* এই সকল বিষয়ে আলোচনার জন্য পৃথক্ প্রবন্ধ আবশ্যক। দুই চারি কথায় এই সকল বিষয়ে মীমাংসা সম্ভব নহে। তং সং

* ধ্যানে অবগত হওয়া বলিতে আমরা বুঝি একাগ্রমনে চিন্তা করা। তং সং

(৩) তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রস্য ধীমতঃ।
উপানয়ত ধর্ম্মাত্মা গামর্ঘ্যমুদকং ততঃ॥
অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৪ অ, ১৭ শ্লোক।

[গম্ অর্থে বৃষ ধরিলে হইবে কেন? 'গাম্' (অর্থাৎ গো) আহারের জন্য অনুমিত হয় না। মুনির আশ্রমে প্রাণীবধ নিষিদ্ধ। এখানে গো'শব্দে দুগ্ধবতী গাভীও বুঝাইতে পারে। অথবা 'গো'শব্দে জলকেও বুঝায়। কিন্তু আবার উদক শব্দেরও প্রয়োগ আছে। তাহা হইলে একটি পানার্থ, অন্যটি হস্ত-পদপ্রক্ষালনের জন্য বুঝিলে অসঙ্গত হয় না। তং সং]

(৪) সীতামাদায় হস্তেন মধুমৈরেয়কং শুচি।
পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচীমিব পুরন্দরঃ॥
উঃ কাঃ ৪২ সর্গ ১৯ শ্লোক।

[আমরা মদ্যপানের পক্ষপাতী না হইলেও বৈদ্যগ্রন্থ এই কথা বলেন,—
কিন্তু মদ্যং স্বভাবেন যথৈবান্নং তথা স্মৃতম্।
অযুক্তি-যুক্তং রোগায় যুক্তিযুক্তং যথামৃতম্।
মনুষ্যের পক্ষে অন্ন যেমন উপকারী, মদ্যও তদ্বৎ। অধিক পরিমাণে সেবিত হইলে ইহা রোগকর, যথাবিধি পীত হইলে ইহা অমৃততুল্য। অধিকন্তু মৈরেয় জিনিষটা কি,—
সীধুরিক্ষুরসৈঃ পক্বৈরপক্বৈরাসবো ভবেৎ।
মৈরেয়ং ধাতকীপুষ্প-গুড়-ধান্যাম্ল-সংহিতম্।
সীধু অর্থে সির্কা, ধাতকীপুষ্প অর্থে ধাতকী বা ধাইফুল। ইক্ষুরস হইতে সম্ভবতঃ এই ক্ষীণবীর্য্য আসব প্রস্তুত হইত। এই মদ্য বা আসব বর্ত্তমানের বিলাতী তীব্রবীর্য্য আয়ুঃক্ষয়কর পদার্থ নহে। তং সং]

(৫) দধি-সৌবর্চ্চলাযুতান্।
সুন্দরকাণ্ড ১১ অঃ ১৬ শ্লোক।

হইতে বোধ হয় যে তখন হয় ত গন্ধের অর্থাৎ মসলার প্রচলন ছিল না। দশরথের মৃত্যুর পর ভরতকে কেকয় হইতে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য যে সকল দূত প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদের গমন এবং প্রত্যাগমনের পথের যে বর্ণনা রামায়ণে আছে তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, বাল্মীকি সেই সকল দেশের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত ছিলেন। রামায়ণ হইতে ইহাও বুঝা যায় যে তখন সমস্ত দেশে অশান্তি মারামারি কাটাকাটি চলিতেছিল। তখন নরহত্যা করা যে একটা বড় পাপ বলিয়া বিবেচিত হইত তাহা বোধ হয় না। অস্ত্রশস্ত্রের অচ্ছেদ্য হইবার জন্য চেষ্টা করাটাই লোকের সর্ব্বপ্রধান অভিলাষ ছিল। রামের অভিষেকের পূর্ব্বদিন কৌশল্যা যেরূপে দেবারাধনা করিয়াছিলেন তাহাতে বোধ হয় পৌত্তলিকতা এখনকার মতই ছিল। অথচ জ্ঞানের চর্চ্চাও যে না হইত এমন নহে; জাবালি প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিত সর্ব্বপ্রকার উপধর্ম্মের উপরে অবস্থান করিতেন।*

অন্য পক্ষে কোনও বিষয়ে বাল্মীকি তথ্য-নিরূপণ না করিয়াই লিখিয়াছেন। লঙ্কার রাজধানী লম্ব নগরের (৬) সংবাদ তাঁহাকে যদি কোন সত্যপ্রিয় অধ্যাপক দিত তাহা হইলে তিনি কখনই লিখিতেন না যে ভারত ও লঙ্কার মধ্যবর্ত্তী সাগরের পরিসর ছিল এক শত যোজন।†

এখানে অবান্তরভাবে একটা জিজ্ঞাসার উদয় হয়। লম্ব হইতেই কি বর্ত্তমান কলম্বো নামের উৎপত্তি হইয়াছে? মনে আর একটা প্রশ্ন এই উঠে যে অনুরাধাপুরের কথা শুনিয়া ত বাল্মীকি লম্বের বর্ণনা করেন নাই?

বাল্মীকির আর একটা ভৌগোলিক জ্ঞানাভাবের দৃষ্টান্ত দিব। মহাভারতের আদি ও বনপর্ব্বে অতি স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ হস্তিনাপুরের উত্তর দিকে (৭) অবস্থিত। ইহা আসাম বা অন্য কোন স্থান হইতে পারে না। যদিও ভারতবর্ষের জনসাধারণের এবং উইলসন, কনিংহাম প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতদেরও বিশ্বাস যে, আসামেরই প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ। বাল্মীকি কিন্তু কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ৪২তম অধ্যায়ে সুগ্রীবকে দিয়া বলাইয়াছেন যে কিষ্কিন্ধ্যা হইতে পশ্চিম দিকে বহু শত যোজন দূরে প্রাগ্‌জ্যোতিষ অবস্থিত (৮)।

বাল্মীকি লক্ষ্মণ ও সীতার চরিত্র অনবদ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু রামচরিত্রের অনেক দোষেরও উল্লেখ করিয়াছেন; যখনই এইরূপ করিয়াছেন প্রায় তখনই রামকে সমর্থন করিয়া কখন কখন রামেরই মুখ দিয়া একটা কৈফিয়ৎ দেওয়াইয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে এবং ধর্ম্মসাহিত্যে এইরূপ হেত্বাদ বা কৈফিয়ৎ প্রচুর আছে, কিন্তু তাহা প্রায়ই মূল্যহীন এবং বালকোচিত। ইহার একটা দৃষ্টান্ত, পাণ্ডবেরা পাঁচ ভ্রাতায় মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করার কৈফিয়ৎ সকলেই অবগত আছেন।

প্রথমেই পরীক্ষা করা যাউক, রাম সমগ্র পিতৃসত্য পালন করিয়াছিলেন কি না। দশরথের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই যখন রামকে বনবাস হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য ভরত অনুনয় করিলেন, তখন রাম তাঁহাকে বলিলেন "আমাদের পিতা যখন তোমার মাতা কৈকেয়ীকে বিবাহ করেন, তখন তিনি কৈকেয়ীর পিতাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে কৈকেয়ীর গর্ভজাত

[বর্ত্তমান সময়েও দধির সহিত মৎস্যমাংস পাকের নিয়ম দেখা যায়। সুতরাং ইহাতে এরূপ বুঝায় না যে তৎকালে অন্য রন্ধন মসলার অসদ্ভাব ছিল। তং সং]

* এই সকল বিষয়ে প্রমাণ উদ্ধৃত করা আবশ্যক ছিল। তং সং

(৬) স লম্বশিখরে লম্বে লম্বতোয়দসন্নিভে।
সুন্দরকাণ্ড ৩ সর্গ ১ শ্লোক।
যুদ্ধকাণ্ডের অন্যস্থানেও লম্বের উল্লেখ আছে বলিয়া স্মরণ হইতেছে।

† সিংহল, লঙ্কা কি না তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে এবং আলোচনা চলিতেছে। তং সং

(৭) রাজসূয়যজ্ঞের পূর্ব্বে অর্জ্জুন উত্তরে দিগ্বিজয় করিতে গিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষে উপনীত হইলেন।

আদিপর্ব্ব ৩ হইতে ৯ শ্লোক। পুনশ্চ অশ্বমেধপর্ব্বের ৭৫ অধ্যায়ের প্রথম উত্তরদিকেই প্রাগ্‌জ্যোতিষের অবস্থানের কথা আছে। ৭৬ অধ্যায়ে তথাকার ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্তের পরাজয়-বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে। তাহার পর ৭৭ অধ্যায়ে সিন্ধুদেশ-বিজয়ের কথা আছে। সভাপর্ব্বের ১৪শ অধ্যায়ে ভগদত্তকে পশ্চিমদিকের এবং যবনদেশের রাজা বলা হইয়াছে। বনপর্ব্বে ৫৪ অধ্যায়ে কর্ণের দিগ্‌বিজয়েও দেখিতে পাই যে কর্ণ উত্তরদিকে গিয়া ভগদত্তকে জয় করেন।

(৮) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ৪২ সর্গে ২৭।৩০।৩১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

সুতরাং মহাভারত ও রামায়ণের সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষ ভারতবর্ষের পূর্ব্বোত্তর ভাগকে বলিব না। পরবর্ত্তী সময়ে ভগদত্তনামা অন্য এক রাজা আসামে এক রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজ্যের নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাখেন। এই প্রাগ্‌জ্যোতিষই মৎস্যপুরাণে, সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভে, গুণাঢ্যের বৃহৎকথায় বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় এবং আরও নানা পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে। মহাভারতে প্রাগ্‌জ্যোতিষের যেমন পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে তাহা আসামের মত দূরবর্ত্তী স্থান নহে।

[ইহাতে ভৌগোলিক জ্ঞানাভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল না। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা অন্য দেশ জয় করিয়া তাহারও নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর রাখিয়া-

পুত্রই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবে (৯)। অতএব আমি রাজা হইতে পারি না—তুমিই রাজা হইবে।" সুতরাং পিতৃসত্য এই ছিল যে রাম মোটেই রাজা হইবেন না—ভরতই রাজা হইবেন। অতএব রামের চৌদ্দ বৎসর মাত্র রাজ্য গ্রহণ না করায় সমগ্র পিতৃসত্য পালন করা হয় নাই। বাল্মীকি ইহার কোন কৈফিয়ৎ দেন নাই। আমার বোধ হয় যে রামের রাজ্যপ্রাপ্তি না হইলে তাঁহার প্রতি ঘোরতর অবিচার হইবে বলিয়া দশরথের অমাত্যেরা রাম ও ভরতের মধ্যে এই সন্ধি করাইয়াছিলেন যে, রাম চিরকালের পরিবর্ত্তে মাত্র চৌদ্দ বৎসর সময়ের জন্য সিংহাসন হইতে বঞ্চিত থাকিবেন। *

ইহার পর বালীবধের কথা। রাম গোপনে বালীকে বধ করিয়াছিলেন। বাল্মীকি নিশ্চয়ই এই কার্য্যটাকে পাপ বলিয়া বিবেচনা করিয়াই রামের মুখ দিয়া বালীর প্রতি এই কথা বলাইয়াছেন যে "তুমি ভরতের প্রজা হইয়া স্বীয় ভ্রাতার পত্নীকে হরণ করিয়া ভরতের বধার্হ হইয়াছ। আমি সেই জন্য ভরতের প্রতিনিধি হইয়া তোমাকে বধ করিলাম।" (১০) একে ত মুমূর্ষু বালী এবং তাঁহার উপাংশু হত্যাকারী রামের পরস্পর সাক্ষাৎ এবং আলাপ করা সম্ভাবনাগণ্ডীর বহির্ভূত, তাহাতে আবার রাম যে ভরতের প্রতিনিধি ছিলেন এবং বালী যে তাঁহার প্রজা বা সামন্ত রাজা ছিলেন একথায়ও শ্রদ্ধা হয় না।

রাবণবধের পর সীতা যখন রামের সম্মুখে আনীত হইলেন তখন রাম তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার নিষ্ঠুরতার তুলনা হয় না। রাম বলিলেন "রাবণ তোমার সতীত্ব হরণ করিয়াছে। আমি তোমাকে আর গ্রহণ করিব না। তুমি লক্ষ্মণ বা সুগ্রীবের পত্নী হইয়া থাক অথবা যেথানে ইচ্ছা চলিয়া যাও।" সীতা উত্তর করিলেন "রাবণ আমার শরীর মাত্র স্পর্শ করিয়াছিল, কিন্তু আমার মন তোমাতেই ছিল।"

ইহার পর রাম তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এই কার্য্যটা বাল্মীকির সময়ে প্রচলিত প্রথার অনুরূপ হয় নাই বলিয়াই বোধ হয় বাল্মীক অগ্নিপরীক্ষারূপ একটা অতিপ্রাকৃত ও অবিশ্বাস্য ঘটনার সৃষ্টি করিয়া সীতার নির্দ্দোষিতার প্রতি রামের বিশ্বাস জন্মাইলেন। নতুবা পত্নীপদস্খলিতা নারীকে পুনর্গ্রহণ করা রামের সময়ে বোধ হয় তেমন নিন্দার কার্য্য ছিল না। রাম নিজে মধ্যস্থ হইয়া গৌতমকে দিয়া অহল্যাকে পুনর্গ্রহণ করাইয়াছিলেন, একথা রামায়ণেই আছে।

রাম সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন যে সীতা স্বেচ্ছায় রাবণের সহিত চলিয়া যান নাই; কেননা জটায়ু, হনুমান প্রভৃতি অনেকে তাঁহাকে জানাইয়াছিল যে রাবণ সীতাকে বলসহকারে লইয়া যাইবার সময়ে সীতা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছিলেন এবং অঙ্গ হইতে বসন-ভূষণ ফেলিয়া দিতেছিলেন; তথাপি কেন রাম সীতার সহিত এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেন?

সীতাকে নিরপরাধ জানিয়াও রাম যেভাবে তাঁহাকে বনে পাঠাইলেন, তাহাও ঘোরতর নিষ্ঠুরতা। একদিন উভয়ে বিশ্রম্ভালাপ করিতে করিতে তাঁহারা পূর্ব্বে বনবাসকালে মুনিদিগের তপোবনে যেরূপে মনের শান্তি ভোগ করিতেন সীতার মনে সেই পূর্ব্বস্মৃতির উদয় হইল। সীতা আর একবার তপোবন দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাম তাহাতে সম্মত হইলেন। তাহার পর রাম যখন একাকী অবস্থান করিতেছিলেন তখন তাঁহার গুপ্তচর গিয়া জানাইল যে কেহ কেহ সীতার চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছিল [১১]। রাম তৎক্ষণাৎ ইতস্ততঃ না করিয়া সীতাকে নির্ব্বাসন করা স্থির করিলেন। পরদিনই সীতাকে লইয়া এক জঙ্গলে ছাড়িয়া দিবার জন্য লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন। যাইবার সময়ে সীতা ভাবিলেন তিনি তপোবন দেখিতে যাইতেছেন, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। রাম তাঁহাকে প্রকৃত কথা জানিতেও দিলেন না। বাল্মীকি এই বলিয়া এই অপকার্য্যের কৈফিয়ৎ দিয়াছেন যে রাম প্রজারঞ্জনের জন্য সেই কার্য্য করিয়াছিলেন; যেহেতু প্রজারঞ্জনই রাজার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। এই কৈফিয়ৎটা একান্তই অগ্রাহ্য। সমস্ত প্রজা এক হইয়াও যদি বলিত যে তাহারা সীতার চরিত্রে সন্দেহ করে এবং রাম যদি বিশ্বাস করিতেন যে সীতার কোন দোষ নাই, তাহা হইলে তাহাদের মত তুচ্ছ করিয়া সীতাকে রক্ষা করাই কি রামের পক্ষে প্রকৃত বীরত্ব এবং ধর্ম্মকার্য্য হইত না? আর যদি সীতাকে নির্ব্বাসন করা তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, তাহা হইলে সীতাকে স্পষ্টভাবে দণ্ডাজ্ঞা জানাইয়া না দিয়া তাঁহার সহিত মিথ্যা আচরণ করিলেন কেন?

ছিলেন ইহা অসম্ভব নহে যেমন বর্ত্তমানে এডেন্‌ও ভারতের অন্তর্গত হইয়াছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে কালন্তীর অঞ্চলকে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বলা হইত বলিয়া স্মরণ হইতেছে। তং সং]

(৯) অযোধ্যাকাণ্ডের ১০৭ সর্গের ৩ শ্লোক যথা—ভরতের প্রতি রামের উক্তি—

পুরা ভ্রাতঃ! পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন্।
মাতামহে সমাশ্রৌষীৎ রাজ্যশুল্কমনুত্তমম্॥

* আগামী সংখ্যায় স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিব। তং সং

(১০) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ১৮ সর্গ।

(১১) উত্তরকাণ্ড ৪৩ সর্গ।

তাহার পর শম্বুক-হত্যা। শম্বুক ছিল একজন শূদ্র। সে ধর্ম্মাচরণ করিতেছিল। রাজ্যের অন্যত্র একটী ব্রাহ্মণ-বালকের মৃত্যু হইল। রামকে কয়েকজন ব্রাহ্মণ বুঝাইয়া দিলেন যে দ্বাপর-যুগে শূদ্রের ধর্ম্মকর্ম্ম করায় রামের পাপ হইয়াছে এবং সেই পাপের ফলে ব্রাহ্মণ-শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। রামও তাহাই বুঝিলেন এবং শম্বুকের শিরশ্ছেদন করিয়া নিজের পাপ ক্ষালন করিলেন। তাঁহার বুদ্ধিতে এ চিন্তার উদয় হইল না যে শূদ্র হইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিলে যদি পাপ হয়, তাহা শম্বুকেরই হইবে—রামের হইবে কেন? যদিই হয় তাহা হইলে একটী ব্রাহ্মণশিশুর মৃত্যু হইবে কেন? যদিই হয় তাহা হইলে রাজ্যের সকল ব্রাহ্মণ-শিশু মরিল না কেন? তাঁহার যদি কিছুমাত্র ব্যক্তিত্ব থাকিত তাহা হইলে তিনি এরূপে ব্রাহ্মণদের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া শম্বুক-বধরূপ মহাপাপ করিতেন না। কিন্তু হয় ত শম্বুক-বধের গল্পটা নারায়ণের বক্ষে ভৃগুর পদাঘাতের মত একটা মিথ্যা গল্প, (১২) যাহা কেবল ব্রাহ্মণদের প্রভুত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য কল্পিত হইয়াছিল। এই অনুমান সত্য হইলে রামচরিত্রের একটা গুরুতর কলঙ্কের অপনোদন হয়।

রামের জীবনের শেষ কলঙ্ক লক্ষ্মণবর্জ্জন। বাল্মীকি ইহার যে হেতুবাদ দিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। রাম বহু বৎসর পৃথিবীতে ছিলেন, সুতরাং তত কাল বৈকুণ্ঠ শূন্য ছিল। ইহাতে দেবতাদের বড় অসুবিধা হইল। তাঁহারা ব্রহ্মার কাছে গিয়া অভিযোগ করিলেন। ব্রহ্মা তখন রামকে শীঘ্র বৈকুণ্ঠে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিবার অভিপ্রায়ে কালপুরুষকে পাঠাইলেন। কালপুরুষ ব্রাহ্মণের বেশে রামের নিকট গিয়া বলিলেন যে রামের সহিত তাঁহার গোপনীয় কয়েকটা কথা আছে; এবং সেই কথা হইবার সময়ে যদি কেহ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে, তবে সেই ব্যক্তিকে বধ করিতে হইবে। রাম তাহাতে সম্মত হইলেন। কক্ষমধ্যে উভয়ের কথোপকথন আরম্ভ হইল। কক্ষের দ্বাররক্ষা করিতে লাগিলেন লক্ষ্মণ। এমন সময়ে দুর্ব্বাসা আসিয়া রামের সহিত অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন, নতুবা তিনি সমস্ত রাজপুরী ভস্ম করিয়া দিবেন। লক্ষ্মণ নিরুপায় হইয়া রামকে জানাইবার নিমিত্ত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রতি নির্ব্বাসনের আদেশ হইল। তিনি রাজপুরী হইতে বহির্গত হইয়া সরযূতে গিয়া ডুবিয়া মরিলেন। ইহার পর রামও অবশিষ্ট ভ্রাতাদিগের সহিত সরযূতে গিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাম কর্ত্তৃক সীতা ও লক্ষ্মণ বর্জ্জনের যে কারণ বাল্মীকি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মনুষ্যসমাজে সেইরূপ কারণ অসম্ভব। এই দুই কার্য্যের কি কোন গুপ্ত রহস্য আছে? এসম্বন্ধে রামায়ণে স্পষ্ট কিছুই নাই। কিন্তু যুদ্ধকাণ্ডে দেখিতে পাই যে যখন যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন একদিন জনরব উঠিল যে ইন্দ্রজিৎ সীতাকে হত্যা করিয়াছে। এই জনরব শুনিয়া লক্ষ্মণ শোকে এবং ক্রোধে এমন অভিভূত ও উত্তেজিত হইলেন যে, তিনি রামকে অধার্ম্মিক এবং বিবেচনাহীন বলিয়া (১৩) উপদেশ দান করিলেন। তিনি রামের প্রতি আরও বহু কটু বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সীতার জন্য লক্ষ্মণের এই শোকাতিশয্য দেখিয়াই কি রাম তাঁহাদের চরিত্রে সন্দিহান হইয়া তাঁহাদিগকে নির্ব্বাসন করিয়াছিলেন?

সকলেই জানেন যে রাম ছিলেন ত্রেতাযুগের লোক। কিন্তু উত্তরকাণ্ডের ৭৪ অধ্যায়ে এবং আরও কয়েকস্থলে রামকে দ্বাপরের লোক (১৪) বলা হইয়াছে কেন?

রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে, তখন তাহার বয়স হইয়াছিল কত? রামের পূর্ব্বপুরুষ মান্ধাতার সহিত রাবণ একবার যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহার পুত্র-পৌত্র হইয়াছিল। মনের ইচ্ছা থাকিলেও নারীহরণ করিবার উপযুক্ত শারীরিক সামর্থ্য কি তাহার ছিল? সীতার বয়স তখন অন্যূন একচল্লিশ বৎসর ছিল (১৫)।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সুগ্রীবের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পাই যে, তখন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে নরকাসুর রাজা

(১২) ভাগবতপুরাণ—১০ম স্কন্ধ, ৮৯ অধ্যায়, ৭৮-শ্লোক।

(১৩) যুদ্ধকাণ্ডে ৮২ সর্গে রামের প্রতি লক্ষ্মণের উপদেশ বা প্রচ্ছন্ন ভৎসনা এবং পরবর্ত্তী সর্গে সীতার শোকে লক্ষ্মণের রোদন।

(১৪) উত্তরকাণ্ডের ৭৪ সর্গে এবং তাহার পরে অনেক স্থানে রামকে দ্বাপরের লোক বলা হইয়াছে।

(১৫) অযোধ্যাকাণ্ডের ১১৮ সর্গে অনসূয়ার নিকটে সীতা আত্মপরিচয় দিবার সময়ে বলিতেছেন যে, তাঁহাকে বিবাহযোগ্য-বয়ঃপ্রাপ্তা (সুতরাং তখন তাঁহার অন্যূন ১৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল) দেখিয়া জনক চিন্তিত হইলেন। তাহার বহুবর্ষ পরে যখন তাঁহার পতিসংযোগসুলভ বয়স হইল তখন জনক তাঁহাকে বীর্য্যশুল্কা করিয়া তাঁহার স্বয়ম্বরা হইবার ব্যবস্থা করিলেন। রামের বয়স তখন ১৬; ইহা রামায়ণে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং সীতার বয়স তখন অন্যূন ১৫ বৎসর, অথবা ১৮ বৎসরও হইতে পারে; কেননা পুরাণে বয়োজ্যেষ্ঠা পত্নীর একাধিক উল্লেখ আছে। এখনও সেদেশে বরের বয়োজ্যেষ্ঠার সহিত বিবাহ হয়। যদি তর্কস্থানে ধরিয়া লওয়া যায় যে সীতা রামের বয়ঃকনিষ্ঠা ছিলেন, তথাপি তাঁহার বয়স অন্যূন ১৫ ছিল। কেননা তিনি পতিসংযোগসুলভবয়স্কা হইয়াছিলেন। "পতিসংযোগসুলভং বয়ো দৃষ্ট্বা তু মে পিতা।" ৩৪ শ্লোক। ইহার পর

ছিলেন। মহাভারত হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে কৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কি রামের সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী ছিলেন? সুগ্রীবের উক্তি যদি প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে এরূপ প্রক্ষেপের কারণ কি হইতে পারে?

অমিতাভ। (১)

(৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য)

(১)

বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতের এবং অন্তর্জগতের নানা ভোগ-তৃষ্ণার ও জ্ঞান-প্রচেষ্টার পরস্পর সংঘাতে আর্য্যাবর্ত্তে যে বিভিন্ন-সভ্যতার অভিব্যক্তি হয়েছিল, সেই সভ্যতায় ভগবান বুদ্ধদেব কি নূতন আলোক নিরঞ্জনা-তীরে বোধি-দ্রুমতলে সিদ্ধিলাভ করে দিয়েছিলেন, তার সত্য ইতিহাস তিনি স্বহস্তে আত্মজীবনীর আকারে লিখে রেখে যাননি, ইহাও যেমন সত্য; অপরপক্ষে ভগবান বুদ্ধদেবের বাহিরের জীবনের কতকগুলি তথ্য এবং তাঁর শিষ্যগণের লিখিত ও কথিত বাণীসকল একত্র সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করলেই যে তাঁর অখণ্ড ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানলাভ করব না,—ইহাও তেমনি সত্য। উদ্ভিদজগতে আমরা দেখতে পাই, জল মাটি হাওয়ার নিকৃষ্টতা ও উৎকৃষ্টতার উপর একই আদি পাদপের নানা সন্তানদের উন্নতি-অবনতি কতটা নির্ভর করে। স্থূলদেহ হতে স্থূলদেহে প্রাণধারার সঞ্চরণ যে শাস্ত্রে বর্ণিত হয়, সেই Biology শাস্ত্রেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

মন হতে মনে যে জ্ঞানের ধর্ম্মের প্রীতির ধারা বহে আসে, তাতে তারও চেয়ে কত গুরুতর, অদৃষ্টপূর্ব্ব পার্থক্য ফুটে ওঠে, ইহা অনিবার্য্য। নব সাধনপ্রণালীর দ্বারা যিনি প্রথম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, নবধর্ম্মের সেই প্রথম প্রবর্ত্তক হতে তাঁর প্রিয়তম শিষ্যে এবং সেই শিষ্য হতে তাঁর শিষ্যে জ্ঞানের ধর্ম্মের প্রীতির ধারা প্রবাহিত হয়, যেমন বৌদ্ধ এবং খৃষ্টধর্ম্মে হয়েছিল। আমরা দেখি, ক্ষেত্রের উৎকৃষ্টতা কিংবা নিকৃষ্টতার সঙ্গে সঙ্গে সে সকল ধারারও তীব্রগতির ও স্বাভাবিক দীপ্তির অল্পাধিক পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। খৃষ্টধর্ম্মে আমরা দেখতে পাই, যিশুখৃষ্টের সকল শিষ্য তাঁদের একই গুরু হতে একই ভাব গ্রহণ করতে পারেননি। ভক্ত ম্যাথিউতে যা আছে, জ্ঞানী মহলে তা নেই। এ সত্য আমাদের স্বীকার করতেই হবে। স্বয়ং বুদ্ধদেবের তুলনায় তাঁর প্রিয়তম শিষ্য আনন্দও তাঁর চেয়ে অল্পশক্তিসম্পন্ন ছিলেন—তাঁর চেয়ে নিম্নস্তরে বাস করতেন, সেই জন্যই গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ অনিবার্য্য হয়েছিল। সম্যক্‌সম্বুদ্ধপ্রবর্ত্তিত সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে বৌদ্ধগণের মধ্যেও মতবিরোধ হয়েছিল এবং সেইজন্য প্রকৃত বিষয়টী নিরূপণ করতে রাজগৃহে বৌদ্ধগণের প্রথম অধিবেশন হয় এবং তারপর একশত বৎসর পরে বৈশালিতে এবং বৈশালি-অধিবেশনে স্থবিরগণের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়ে অগ্রগতি বৌদ্ধগণের একটা স্বতন্ত্র অধিবেশন হয়। তারপর সম্রাট অশোক বৌদ্ধভিক্ষুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ ক'রে কাবুল হতে বঙ্গোপসাগর এবং হিমালয় হ'তে বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত তাঁর বিস্তৃত সাম্রাজ্যে বৌদ্ধ-প্রচারকদের প্রেরণ করেছিলেন; এবং ইহাতেও তৃপ্ত না হয়ে সিরিয়ায়, ইজিপটে, ম্যাসিডোনিয়ায়, সাইরিণেও ইপাইরসে সম্যক্‌সম্বুদ্ধপ্রবর্ত্তিত সাধনপ্রণালী প্রচার করবার জন্য আনন্দদীপ্ত চেষ্টা করেছিলেন; এবং তাঁরই চেষ্টার ফলে বৌদ্ধসাধনপ্রণালী ধীরে ধীরে তিমিরাচ্ছন্ন গগনে প্রথম জ্যোতির্লেখার ন্যায় নেপালে, তিব্বতে, চীনদেশে, জাপানে, মঙ্গোলিয়ায় এবং কাহারও বিশ্বাস উত্তর-আমেরিকায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এক বিশাল বৌদ্ধসমাজ উত্তরভারতে মহাযান এবং দক্ষিণ ভারতে হীনযান-বিভাগে বিভক্ত হয়েছিল তথাগতের নির্ব্বাণ-লাভের তিন শত হতে পাঁচশত বৎসরের মধ্যেই। প্রত্যেক বিভাগে চিন্তাপ্রণালীর বিশিষ্টতা দেখা যায় এবং আমাদের মনে হয়, সেই বিশিষ্টতাকেই মূলধর্ম্মের প্রাণ-স্বরূপ জ্ঞান করে—উহাকেই দৃঢ় ধারণ করে মহাযান ও হীনযানশাখা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর একান্ত শ্রদ্ধায় সাধন করতেন।

এই বহুধাবিভক্ত বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক যোগাচার ও মাধ্যমিক এই চারি দার্শনিক মত একখানি গ্রন্থে গেঁথে দিলেই যে ভগবান বুদ্ধের চিন্তার, ধর্ম্মের, প্রীতির স্বরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ পাবে, তা নয়; একএকটী বিশিষ্ট দার্শনিক মত সম্বন্ধেই

---

১২ বৎসর তিনি বিবাহিত জীবন অযোধ্যায় অতিবাহিত করেন। তাহার ১৩ বৎসর দশমাস পরে তিনি রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা হন। সুতরাং অপহরণকালে তাঁহার বয়স অন্ততঃ ১৫+১২+১৪=৪১ বৎসর হইয়াছিল।

[বীরেশ্বর বাবু রামচন্দ্র ও সীতার বয়স লইয়া অযথা আলোচনা করিয়াছেন: অরণ্যকাণ্ডের ৪৭ সর্গে সীতা বলিতেছেন—বনবাসের সময়ে রামের বয়স ২৫ বৎসর ও আমার বয়স ১৮ বৎসর ছিল; কিন্তু উহার কয়েক পংক্তি পূর্ব্বেই আছে (সীতা বলিতেছেন) আমি বিবাহের পর স্বামীগৃহে ১২ বৎসর অতিবাহিত করি। পরে ত্রয়োদশ বৎসরে রাজা দশরথ রামকে রাজ্য দিবার সংকল্প করেন; কিন্তু কৈকেয়ীর প্রার্থনায় তিনি রামের বনবাসের ব্যবস্থা করেন। সীতার বিবাহ তাঁহার যৌবনের প্রথম বিকাশেই হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় এই দুই উক্তির ভিতরে অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় বিবাহের পরে সীতার স্বামীগৃহে ১২ বৎসর অবস্থানের কথা প্রক্ষিপ্ত। ১৮ বৎসর পরে সীতা পূর্ণযৌবনা ও শোভনীয়া হওয়ার উহার পরেই রাবণ কর্ত্তৃক হৃতা হন। হরণ সময়ে তাঁহার বয়স ৪১ বৎসর থাকা অস্বাভাবিক। ঐ বয়সে যৌবনের শ্রী অন্তর্হিতপ্রায় হইয়া আইসে।]

আমাদের জ্ঞানলাভ হবে মাত্র। কোনো এক বিশাল বনস্পতির সকল শুষ্ক কিংবা সতেজ পত্র সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করাই মূল পাদপের বীজ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা নয়। অথচ উপাধিধারী বহু পণ্ডিতগণ এই পন্থাই অবলম্বন করেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকগণ যে যে দেশে গিয়াছিলেন, সেই সেই দেশের স্বাভাবিক বিশিষ্টতা বিলুপ্ত করে সিরিয়া হতে প্রশান্ত সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত এক কৃত্রিম যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যে করেননি, তার কারণ আমরা তথাগতের জীবনেই পাই। সংঘের উন্নতিসাধন প্রণালী সম্বন্ধে আনন্দ যখন তথাগতকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন "তোমরা প্রত্যেকেই তোমার তিমিরনাশন দীপ হও; তোমরা প্রত্যেকে তোমারই আশ্রয় হও; কোনো বাহিরের আশ্রয়ের শরণাপন্ন হইও না। যে সত্য দীপের মত উদ্ভাসিত হয়, সেই সত্যকেই দৃঢ় ধরে থাক, আশ্রয়স্থানরূপে দৃঢ় ধরে থাকো; তোমার বাহিরে যা কিছু আছে তাকে আশ্রয়দাতা জ্ঞান করো না।"

বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পরিপুষ্ট মানুষের মন হতে মনে বৌদ্ধধর্ম্মের সঞ্জীবনী ধারা বুদ্ধদেবের দেহরক্ষা করার পর পাঁচ শত বৎসরে প্রবাহিত হওয়াতে বৈচিত্র্য, এমন কি পরস্পর বিরোধ ঘটাই স্বাভাবিক; কিন্তু সম্যক্‌সম্বুদ্ধে পরস্পরবিরোধ ছিল না, বিচিত্র উপাদান-সকল এক অখণ্ড আলোকদীপ্ত হওয়ায় একটী পূর্ণ, অখণ্ডমূর্ত্তি লাভ করেছিল। একই বৌদ্ধসমাজ অথচ কত সাম্প্রদায়িকতা! এ সত্বেও আমাদের স্বীকার করতে হবে সকলেরই এবং প্রত্যেকেরই নির্ব্বাণলোলুপ চিত্তের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ধারা, একজনেরই দিকে, নীলিমায় স্নিগ্ধ ছায়াকোমল নিরঞ্জনাতীরের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিম হতে প্রবাহিত হত এবং এখনও হচ্ছে; তিনি কামকাঞ্চনত্যাগী, তৃষ্ণামুক্ত সাধনায় সিদ্ধ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ। সাম্প্রদায়িক দর্শনের কোন্ মত গ্রহণীয়, কোন্ মত বর্জ্জনীয় সে বিচারে লিপ্ত এবং সত্য বস্তু হতে বিক্ষিপ্ত না হয়ে, যে জন্য আজ আড়াই হাজার বৎসর নানা দেশের এত বিভিন্ন জাতির কোটী কোটী মনীষা একই নিরঞ্জনাতীরের বোধিদ্রুমতলবাসী সিদ্ধপুরুষের পানে কত সাংসারিক সুখদুঃখের, কত রাজ্যসাম্রাজ্যের উত্থানপতনের কুজ্ঝটিকার ভিতর দিয়েও চেয়ে আসছেন এবং এখনও চেয়ে আছেন, যাঁর অমিত আভায় মানবসমাজ উদ্ভাসিত, আজ জ্বালাময়ী তৃষ্ণার নানাদিকে বিক্ষিপ্ত মানবসমাজের দুর্য্যোগ রাত্রিতে শান্তিস্বরূপ সম্যক্‌সম্বুদ্ধের পূর্ণ ব্যক্তিত্বের স্মরণ এবং মনন নিশ্চিত কালোপযোগী হবে।

(২)

এ থেকেই প্রশ্ন উঠবে ব্যক্তিত্ব কি? আমরা 'ব্যক্তি' শব্দটী যখন তখন ব্যবহার করি সত্য, কিন্তু জ্ঞান-প্রীতি-কল্যাণ-তমসার মধ্য দিয়ে নানা বর্ণে রূপে ব্যক্ত হতে হতে অবশেষে বিশুদ্ধ শুদ্ধসত্বের দীপ্তিতে এক পূর্ণ অবয়ব, পরম সুন্দর স্নিগ্ধ মূর্ত্তি লাভ করেছে, এমন কয়জনে দেখতে পাই? সত্য মানুষে ব্যক্ত হলেই না তাকে সত্য ব্যক্তি বলতে পারি। আমাদের মধ্যে অধিকাংশের মন তমসার রসাতলে সুপ্তিতে মগ্ন থাকে, আমরা আমাদের মন দেখতে পাই না, সেইজন্য জানতেও পারি না; আমাদের মধ্যে জনকয়েক তৃষ্ণায় ছুটাছুটি করচে,—জগত জানবার তৃষ্ণায়, প্রকৃতিকে ভোগ করবার তৃষ্ণায়, আত্মশক্তিকে জয়ী করবার তৃষ্ণায়। এই প্রবৃত্তির স্ফুরণ—মানবসমাজকে জড়ত্বের কারাগার থেকে বাহির হয়ে শক্তি-সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপ দিতে এবং আত্মশক্তির পরীক্ষা করতে পিছন থেকে তাড়না—এও যেমন সত্য, সম্মুখের আলো জীবকে আহ্বান করচে, ইহাও তেমনি সত্য; বিজ্ঞানে, কর্ম্মক্ষেত্রে কিম্বা ভোগের বিলাসকাননেও সত্য আছে বিশ্বাস করে মানুষ শ্বেতকেশ প্রথার কিম্বা তুষারশীতল অজ্ঞতার কারাগার হতে বাহির হয়; সেই জন্যই আজ মানুষ প্রকৃতি সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করেচে, একশত বৎসর পূর্ব্বে এ জ্ঞান তার ছিল না; এজন্য কত নরনারী আত্মবিসর্জ্জন করেছে। মানবঅন্তরে এই তৃষ্ণা থাকার ফলেই মানুষ শান্তি লাভ করবার জন্য ব্যাকুল হয়, এই তৃষ্ণাকে হেয়জ্ঞান করে দেখবার উদ্দেশ্যে অমিতাভের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইনি; বরং আমরা বিশ্বাস করি যে, যে ব্যক্তি কিংবা জাতি জড়ত্বের রসাতলে সুপ্তিমগ্ন আছে, জ্ঞানতৃষ্ণায়, ভোগাকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল সে যতদিন না হয়, ততদিন নির্ব্বাণের শান্তিলাভ করবার অধিকার তার হয় না। জড়তাকে শান্তি জ্ঞান করবার যথেষ্ট কারণ আমাদের দেশের শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত উভয়শ্রেণীর মধ্যে থাকার দরুণই আমরা এই প্রসঙ্গ তুলেছি।

কিন্তু তৃষিত নরনারী শান্তিলাভ করেছে, আনন্দ পেয়েছে, আমাদের মধ্যে কয়জন? আলোর আহ্বানে বাহির হয়ে আলেয়ার মায়াজালে বদ্ধ হয়ে কত কোটী কোটী নরনারীকেই না অকালে জীর্ণপত্রের ন্যায় প্রত্যক্ষগোচর সংসার হতে ঝরে পড়তে দেখা যায়। কিন্তু ভগবান শাক্যসিংহে আনন্দময় শুদ্ধসত্ব বিশ্বমৈত্রী মূর্ত্তি-লাভ করেছিল। ভারতবর্ষের ভাস্করগণ ভগবান বুদ্ধদেবের এই শান্তিময় আনন্দস্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বই পাথর থেকে কুঁদে কুঁদে বিশ্বমানবের সামনে ধরেছিলেন। সেই সকল মূর্ত্তিতে আমরা দেখতে পাই, একই কালে ধ্যানলীনতা এবং সকল প্রাণীকেই অভয় দান করবার মৈত্রী। আমরা আজ বিশ্বমানবকে জিজ্ঞাসা করতে পারি, প্রাচীনতম সভ্যতায় কিংবা আধুনিক শিল্পকলায় ব্যক্তিত্বের এমন রূপ

আর কি দেখা যায় ? বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক দার্শনিক মতে বহু ত্রুটী থাকতে পারে ; কিন্তু শিল্পী যে অমিতাভের সত্য ব্যক্তিত্ব রূপায়িত করে তুলেছেন, তাতে মুমুক্ষু নরনারী শান্তি লাভ করে না এমন দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। অমিতাভের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তেই পৃথক পৃথকভাবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সাধক জ্ঞানের, প্রীতির, কুশলভাবের সাধন করতেন ; অমিতাভে সেই সকল বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ধারা একই ধ্যানলীনতার শান্তিতে বিধৃত হয়েছিল ; কেন না শান্তিই সত্য শক্তি। অমিতাভে আর্য্যাবর্ত্তের সাধনা পরিণত হয়েছিল। তিনি একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, অমিতাভ কোন কবির মনঃকল্পিত চরিত্র নন। রামায়ণে, মহাভারতে বহু মুনির জীবনকাহিনী পাঠ করি সত্য, কিন্তু রামায়ণ মহাভারত কিংবা পুরাণকে ইতিহাস বলা দুঃসাহসের কাজ। তাদের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য এই পর্য্যন্ত যে, আর্য্যাবর্ত্তে সে সময়ে ঐরূপ সাধন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল এবং কবিগণ তাঁদের মনঃকল্পিত চরিত্রে সেই ভাবটীকে রূপ দিয়েছিলেন। কিন্তু কাব্য ইতিহাস নয়। অমিতাভের ন্যায় সত্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি ব'লে সেই সকল মুনিদের স্থান করলে, ভ্রমে পতিত হতে হবে। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করতে পারি না, ঐতিহাসিক শাক্যসিংহও শিল্পীর কবির হাতে পড়াতে কবির মনঃকল্পিত চরিত্র হয়ে পড়েছেন।

(৩)

আর্য্যগণের ধ্যানের বস্তুর সঙ্গে তথাগতের ধ্যানের বস্তুর জাতিগত পার্থক্য আছে। তাঁর ধ্যানের বস্তুটী কি ? তাঁর আবির্ভাবের পূর্ব্বে আর্য্যগণ ধ্যান করতেন ইন্দ্রাদি দেবগণকে। এ ধ্যানে ও পূজায় সকামভাবই দেখা যায়। শত্রুসংহার করে জয়দান করবার যে প্রার্থনা, তাহা সকাম ভিন্ন আর কি ? উপনিষদেই আমরা প্রথম পাই "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।" কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাও যে উপনিষদে নেই তা বলা যায় না। আমাদের বিশ্বাস, প্রত্যেক উপনিষদই সত্য ও স্বাধীনভাবেই এক-একজন ঋষির দ্বারা রচিত হয়েছিল। উপনিষদের ঋষিগণ কোন সংঘের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, যেমন শঙ্করাচার্য্যের পর থেকে ভারতের সন্ন্যাসীগণ হয়েছেন। সেইজন্য উপনিষদের কোন ঋষি সগুণ, কোনো ঋষি নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞানে তন্ময়তা লাভ করবার জন্য সংসারে বীতস্পৃহ হবার উপদেশ দিয়েছিলেন। যা রূপে সুস্পষ্ট, বর্ণে পূর্ণ, তাকে প্রাপকত্ব নয় তাকে ধ্যান করা সম্ভব কি, অসম্ভব, এই বিচার মধ্যে আর্য্য মনীষিগণ যখন পড়েছিলেন, তখন যদুপতি আত্মার নির্গুণ অবস্থা স্বীকার করেও দৃঢ়কণ্ঠেই বলেছিলেন,—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৯।৩৪

এ সকল আর্য্য কবিদের, অর্থাৎ যাঁরা শব্দজগতে মনকে স্থির রাখবার অনুশীলন করতেন করতে শব্দকেও অতিক্রম করে ভবের বন্ধন হতেও মুক্তিলাভ করবার প্রণালী অবলম্বন করতেন, তাঁদের সাধনপ্রণালী। কিন্তু কবির পথ অবলম্বন করে সাধারণ মানুষের পক্ষে চলা সম্ভব নয় ; যেহেতু তাকে কখনো দুঃসহদীপ্ত বৈশাখের রৌদ্রে কিম্বা শ্যামায়মান শ্রাবণের জলধারায় জীবিকা অর্জ্জন করতে হবে। সংস্কৃত ভাষার ন্যায় একটী দুরূহ ভাষা শিক্ষা করাও এদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর যাগযজ্ঞের শোণিতরাঙিমা দেখে, জাতিতে জাতিতে রণক্ষেত্রে হত্যা দেখে সকাম বেদে হতশ্রদ্ধ হওয়াও এদের পক্ষে আশ্চর্য্য নয়। গীতাতেও আমরা সকাম যাগ যজ্ঞের নিন্দা দেখি।

তথাগত যে বস্তুতে ধ্যানলীন হয়েছিলেন এবং যা থেকেই প্রীতিলাভ করেছিলেন সেই বস্তু ইন্দ্রাদি দেবগণ নন—কোন শব্দ নয়, সেই বস্তু হচ্চে মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভূত এবং অবিচ্ছিন্ন ধারারূপে প্রবাহিত কুশলভাব।

দেহ-মনের কোনো অভাব, কোনো দুঃখ দূর করবার জন্য সকামচিত্তে যদি দেব-দেবীগণকে ধ্যান করা যায় কিম্বা পিতৃপুরুষগণকে স্মরণ-মনন করা যায়, তা হলে পরস্পর উপাস্যউপাসকের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় ; এবং এই ধ্যান কেবলমাত্র তাঁদের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতা নিজের অসামর্থ্য, নিজের দৈন্যও বোধ করেন এবং তাঁদের নিকট হতে সাহায্য লাভ করবার আশাতেই তাঁদের শরণাপন্ন হন। এধ্যান স্বার্থকলুষিত এবং গীতার কবি উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করেছেন যে ফলহেতু যাঁরা কর্ম্ম করেন, তাঁরা কৃপণ, "কৃপণাঃ ফলহেতবঃ"।

সিদ্ধার্থের ধ্যানলীনতার বিশেষত্ব এই যে তিনি ইহলৌকিক স্বার্থসিদ্ধির কিম্বা পারলৌকিক সদ্গতির আশায়, অবিচ্ছিন্ন ক্ষণিক সংস্কারের ধ্যানেই মুক্তি পাননি। সম্যক্‌রূপে বিচার করেছিলেন, সংস্কার ক্ষণিক, এবং কোন বস্তু মাত্রেরই অস্তিত্ব [illegible] অথচ তত্ত্ববিদেরা এমন এক বস্তু চান যার বিনাশ নেই, বিকাশ নেই—যাহা অনাদি, অনন্ত। তবে কি সম্যক্ সম্বুদ্ধের [illegible] কল্পনা মাত্র ? এবং বৌদ্ধগণের কল্পনা হবার নয় ?

[illegible] না

বস্তুকে যদি নিরপেক্ষভাবে মনন করি, তাহলে বুঝতে পারি যে সম্যক্‌সম্বুদ্ধের বাণী সত্য ; জ্ঞেয় বস্তু মাত্রই চিৎসমুদ্রের এক একটী ক্ষণিক লহরী। এ জ্ঞানের ঊর্দ্ধেও এক পরম অদ্বৈত জ্ঞান আছে—যখন জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় বস্তু এক হয়ে যায় ; সে প্রশ্ন স্থানান্তরে তোলা প্রাসঙ্গিক হলেও এখানে অপ্রাসঙ্গিক। বৌদ্ধ "রূপ-বিজ্ঞান-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার" সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে। বাহিরের বস্তুতে কোন বিকার হয় কি না তা জানবার কোন উপায় নেই, কিন্তু সেই বস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান মুহূর্ত্তেই নূতন ; কারণ চিৎসমুদ্রের লহরী সংস্কার মাত্রই ক্ষণিক। এর বিরুদ্ধে আপত্তি কোন জ্ঞানীই করতে পারেন না।

ধ্যেয় বস্তু দেব-দেবী না হলেও এবং তাঁদের সঙ্গে উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ না থাকলেও যে মুক্তি নেই, তাহাও সত্য নয় ; কেননা ভক্তের ভক্তি ততক্ষণ যতক্ষণ তিনি স্মরণ করেন যে, কোন এক সময়ে তিনি তাঁর উপাস্য দেবতার সমীপে ছিলেন ; এবং আশা করেন যে পুনরায় তাঁর সমীপে থাকবেন। এখানে স্মৃতি এবং আশাই সব, বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান কোথায় ? সেইজন্য ভক্তও মাঝে মাঝে দুঃখ পান ; এবং বৈষ্ণব কবিগণ বিরহের বেদনাকে যে অপূর্ব্ব শ্রী আলো দিয়েছেন, তাহা জগতের সাহিত্যে দুর্লভ। যিশুখৃষ্টকেও আমরা দুঃখে আর্ত্তনাদ করতে শুনি। কোন স্মৃতিই চিরযৌবনা নয়, মাঝে মাঝে শরতের কিংবা বসন্তের পূর্ণিমায় তাকে মিলনের মধ্যে মৃত্যুলাভ করে আবার যৌবন লাভ করতে হয়, ভক্ত কবিগণ তাহাও ঘোষণা করেছেন। পুরুষ-প্রকৃতির—জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের এই যে সম্বন্ধ, এখানেও দেখা যাচ্ছে দুঃখ হতে চিরদিনের জন্য বিদেহমুক্তি লাভ করবার উপায় নেই, মিলনে এবং বিরহে প্রকৃতি অভিব্যক্ত হতে থাকে মাত্র। ভক্তগণ ইহাই ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু সিদ্ধার্থের ধ্যানশীলতায় অতীতও যেমন নেই, ভবিষ্যৎও তেমনই নেই—আছে এক বর্ত্তমান। মনের মধ্যে উদ্ভূত কুশলভাবমূলক সংস্কার, ভাবরঙ্গের বিচিত্র তরঙ্গ নয়—এক স্নিগ্ধ শান্ত আনন্দউজ্জ্বল চেতনা। অষ্টাঙ্গমার্গের ভিতর দিয়ে যে মন প্রতিক্ষণেই অগ্রসর হয়ে থাকে, সেই মনে কুশলসংস্কার ব্যতীত আর কিছুই উদ্ভূত হতে পারে না। মন যখন অষ্টাঙ্গমার্গের সাধনপ্রণালীর দ্বারা স্বচ্ছ হয়, তখন ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভূত সংস্কারলহরীও অমৃতময়ী ভিন্ন কি অন্য কিছু হতে পারে ? আমরা জানতে পারি লহরীটকেই ; পূর্ব্বে কোন্ স্তব্ধতার মধ্যে উহা বিলীন ছিল, পরে কোন্ স্তব্ধতায় আবার বিলীন হবে তা বিজ্ঞানবুদ্ধির এলাকার মধ্যে কখনই আসে না ; এবং এজ্ঞানে ও ধ্যানে ধ্যেয় বস্তুর সঙ্গে কোনরূপ উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধও হবার নয়। এইরূপেই ব্রিজ-সমাজেরই অন্তর্গত যে এক মৌনাবলম্বী মুনিসম্প্রদায় ছিলেন, যাঁরা সকাম যাগযজ্ঞকে নির্ব্বাণলাভ করবার উপায় বলে স্বীকার করতেন না বলেই অবলম্বন করতেন না ; উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধবর্জ্জিত, স্মৃতি ও আশায় রাগমুক্ত যে ধ্যানশীলতা, তাহারই অনুশীলন করতেন,—মুনীন্দ্রে দেখতে পাই তাঁদের সাধনা সিদ্ধ বস্তুর পূর্ণরূপে এরূপে মূর্ত্তিলাভ করেছিল। শাক্যসিংহ কোন দিনই নিজেকে এই সাধনপ্রণালীর প্রথম প্রবর্ত্তকরূপে ঘোষণা করেন নি এবং মুনীন্দ্র বেদকে প্রমাণ ব'লে গ্রহণ করাও প্রয়োজন বিশ্বাস করতেন না ; কারণ তাহা ত স্মৃতি ও আশায় আদ্যোপান্ত না হউক, অধিকাংশই পূর্ণ। পাণ্ডিত্য মানুষের পক্ষে গৌরবের সন্দেহ নেই ; কিন্তু পণ্ডিতগণের মন ক্ষণে ক্ষণে অবিচ্ছিন্ন ধারারূপে উদ্ভূত কুশলভাবের সান্নিধ্যে যত না থাকে, তারও চেয়ে বেশী থাকে অতীতকালের কবি ও দার্শনিকদের হাতেগড়া শব্দজগতে—স্মৃতিতে ও আশায়। কবিদের ন্যায় তাঁরা আত্মার বাণী স্বকর্ণে শ্রবণ করেন না—তাতেই তন্ময় হন না। কুশলভাবে তন্ময়তা এবং উপনিষদের আত্মদর্শন একই। মনের মধ্যে উদ্ভূত কুশলভাবে তন্ময়তালাভের সাধনা না করে শব্দে, স্মৃতিতে ও আশায় মনকে কখনো এগিয়ে বা কখনো পেছিয়ে পড়তে রাশ ছেড়ে দিলে, মুমুক্ষু কখনো তন্ময় হতে পারেন কিনা সন্দেহ করবার কারণ আছে। মনকে প্রাণের রসাতল থেকে উঁচুতে তুলে প্রজ্ঞার আনন্দলোকে নিয়ে যাবার শক্তি যে শব্দের আছে, তা স্বীকার করি ; কিন্তু শব্দের সাহায্যেই আনন্দের সঙ্গে এই যে মিলন—ইহা স্থায়ী হয় না, হবারও নয় ; কারণ যার সাহায্যে শব্দের এই মিলন ঘটে থাকে, তাহা ক্ষণিক লহরীতেই অভিব্যক্ত হয়। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নব নব শব্দের সাহায্য সাধকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ; সেইজন্য একই বস্তুর এত অসংখ্য নাম। সকল ভক্ত একই নামে আনন্দ পান না। সকাম যাগযজ্ঞের সমর্থন করে যে বেদ, তাহাকেই অবলম্বন করে থাকলে মনীষী কখনো নির্ব্বাণলাভ করতে যে পারেন না, তা গীতার কবিও ঘোষণা করেছেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের ধ্যানশীলতার সঙ্গে সিদ্ধার্থের ধ্যানশীলতার পার্থক্য এইখানে এবং এ পার্থক্যটা গুরুতর। এ ধ্যানশীলতা বলিষ্ঠ মনের দ্বারাই হতে পারে। স্মৃতির ও আশার মায়ায় যে অভিভূত হয়ে থাকতে চায়, যার স্বভাবই ঐরূপ, তার পক্ষে এ ধ্যানশীলতা, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত সাধনপ্রণালী গ্রহণ করা সমীচীন নয় ; তাদের

তার ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই হবে। এবং মুনীন্দ্রও কবিদের শান্ত করবার জন্য রাজশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেননি, বরং তাঁদের মনে এক নূতন আলোক দান করেছিলেন; সেজন্য পৌরাণিক যুগের হিন্দুসভ্যতা ও ধর্ম্ম, বৌদ্ধ-যুগের পূর্ব্বের হিন্দুসভ্যতা ও ধর্ম্ম হতে বিভিন্ন,—হিন্দুসভ্যতার এবং হিন্দুধর্ম্মের মেরুদণ্ড ষড়্‌দর্শন এক হলেও।

উৎসবানন্দ-রামমোহন রায়-সংবাদ

(৫)

(ডাঃ ভি, রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

যৎপুনর্বৈষ্ণবোহয়ং মধ্বাচার্য্যমতমবলম্ব্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পারতম্যং, সর্ব্ববেদগম্যত্বং, জগতঃ সত্যত্বং, জীবভেদো, জীবানাং হরিদাসত্বং, বিষ্ণুত্বলাভো মোক্ষঃ, আত্যন্তিকী ভক্তিরেব তৎসাধনমিতি জগাদ; স্বমতস্থাপনায়—জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ, মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি, যঃ স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন, সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি, যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি। ওঁ ইত্যেতৎ। স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণম্ ইত্যাদ্যাঃ সাক্ষাদাত্মবিষয়িকা শ্রুতীঃ পাণিপাদাদ্যবয়বি-কৃষ্ণবিষয়িকা অকথয়ৎ। সর্ব্বে বেদান্তাঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণং প্রতিপাদয়ন্তি, তেভ্যোঽপরে পরম্পরয়েতি চ যৎ প্রাহ তত্র ক্ষণং চিত্তং সমাধায় শ্রূয়তাং—কোষাদিবলাৎ ব্যবহারবলাৎ প্রকরণবলাচ্চ যস্য যস্য শব্দস্য যো যোঽর্থঃ স্পষ্টং প্রতীয়তে, তত্তন্মুখ্যার্থপরিত্যাগপূর্ব্বক-কেবল-কষ্টসাধ্য-ব্যুৎপত্তিবললভ্য-গৌণার্থস্বীকারে ন কস্যাপি শাস্ত্রস্য সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনতাৎপর্য্যাণি নির্ণেতুং স্থিরীকর্ত্তুং চ কেনাপি শক্যেরন্; কিঞ্চ—একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম, যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যম্ অগন্ধবচ্চ যৎ, অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে। যদ্বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। মহান্তং বিভুম্ আত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি। অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। ন স্ত্রী ন পুমান্ যতো ইত্যাদিশ্রুতীনাং কোষাদিবলাৎ ভগবদ্ব্যাসাদিবৃদ্ধব্যবহারবলাৎ প্রকরণবলাচ্চ সর্ব্ববিশেষরহিতপরব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বমেব নিশ্চীয়তে। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, আহ হি তন্মাত্রং, অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিশব্দাৎ ইত্যাদিব্রহ্মসূত্রাণামপি তত্তদ্বলাদেব ব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বমেব নির্ণীয়তে ন হস্তপদাদ্যবয়ববিশিষ্ট-শ্রীকৃষ্ণপ্রতিপাদকত্বম্। তাসাং শ্রুতীনামেতেষাং ব্রহ্মসূত্রাণাঞ্চ কষ্টকল্পনয়া করচরণাদ্যবয়বশালী বনমালী শ্রীকৃষ্ণশ্চেৎ প্রতিপাদ্যঃ স্যাৎ, তদা অন্যেঽপি দেবা দেব্যশ্চ তথৈব কল্পনয়া তত্তৎপ্রতিপাদ্যাঃ কথং ন ভবেয়ুঃ? কৃষ্ণ এব পরো দেব ইত্যাদিকৃষ্ণোপনিষৎশ্রুতিবলাৎ বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্য ইত্যাদি গীতাবচনবলাৎ শ্রীকৃষ্ণবিষয়কপুরাণবলাচ্চ যদি শ্রীকৃষ্ণস্য পারতম্যং সর্ব্ববেদান্তবেদ্যত্বঞ্চ বর্ণ্যতে তদা ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম ইত্যাদিনানাশ্রুতিবলাৎ—সর্ব্বৈর্বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ স্মৃতিভিঃ সংহিতাভিঃ প্রতিপাদ্যোঽস্মি নান্যোঽস্তি প্রভুর্জগতি মাং বিনা ইত্যাদিশিববাক্যবলাৎ শিবগীতাবলাৎ শিবপ্রতিপাদকপুরাণবলাচ্চ সর্ব্বজ্ঞস্য পরমানন্দবিগ্রহস্য মহেশ্বরস্য শিবস্য পারতম্যং সর্ব্ববেদান্তপ্রতিপাদ্যত্বমপি কুতো ন স্বীক্রিয়তে? এবং কালিকোপনিষদি শ্রীদুর্গাদেবী প্রতিপাদকপুরাণনানাতন্ত্রাদিবলাৎ ভগবত্যাঃ সর্ব্বজগতাং মাতুঃ কালিকায়াঃ পারতম্যং সর্ব্ববেদবেদ্যত্বঞ্চ কথং ন বর্ণ্যতে? এবং সূর্য্যগণেশেন্দ্রপবনাদিপ্রতিপাদকশ্রুত্যাদিবলাৎ তেষামপি পারতম্যং সর্ব্ববেদবেদ্যত্বঞ্চ কথং নাঙ্গীক্রিয়তে? তদঙ্গীকারে তু—একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, য ইহ নানেব পশ্যতি, দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়মুৎপদ্যতে ইত্যাদিশ্রুতিপ্রতিজ্ঞায়া লোকানাং ব্রহ্মৈকত্ববিষয়কপ্রতীতেশ্চ মূলত এবোচ্ছেদঃ স্যাৎ। একস্মিন্নেব নির্দ্ধারিতয়োঃ পারতম্য-সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বধর্ম্ময়োরনেকধর্ম্মত্বস্যাভ্যুপগমাপত্তিশ্চ স্যাৎ; কিন্তু সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তাদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তত্ত্বমসি ইত্যাদীনাং, ব্রহ্মদাসা, ব্রহ্মকিতবা, মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত, অন্নং ব্রহ্মেত্যাচক্ষতে ইত্যাদীনাঞ্চ শ্রুতীনাং অর্থান্ বিভাবয়দ্ভিরদ্বৈতবাদিনস্তত্তৎশ্রুতিদর্শনে ন দেবতানাং তদিতরেষাঞ্চ ব্রহ্মন্যধ্যাসেনৈব ব্রহ্মত্বং পশ্যন্তো ব্রহ্মণঃ সর্ব্বগতত্বমেব মন্যন্তে, ন তু সজাতীয়-স্বগত-ভেদরহিতস্যাদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণো নানাত্বং, যথাহ বেদান্তে ভগবান্ বাদরায়ণঃ—অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দেভ্যঃ, ন বক্তুরাত্মোপদেশাদধ্যাত্মভূমা হ্যস্মিন্, শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ ইত্যাদি। যৎ জগতঃ সত্যত্বং মধ্বাচার্য্যেণ কথ্যতে, তচ্চেৎ ব্রহ্মণঃ সত্যতয়া স্বীক্রিয়তে, ন তু স্বভাবতঃ তদগুকুলমেব, যদি পরমাত্মানমনপেক্ষ্য স্বাতন্ত্র্যেণ জগতঃ সত্যত্বং তদালং ব্রহ্মণঃ স্বীকারেণ গৌরবাৎ; এবঞ্চ সতি চার্ব্বাকীয়-মাধবীয়মতয়োঃ কো বিশেষঃ। যৎ পুনর্জীবভেদমাহ তত্তু—মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি, মনসৈবেদমাপ্তব্যং, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ইত্যাদি-শ্রুতীনাং অবহেলনেনৈব—দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া, যতো বা

ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদ্যা ঔপাধিকং ভেদং দর্শয়ন্ত্যঃ স্থূলত্বোপদেশেন প্রথমাধিকারিণো ব্রহ্মবিদ্যায়াং প্রবর্ত্তয়ন্ত্যঃ শ্রুতয়স্তু আত্মজ্ঞানোপায়ভূতাঃ। প্রত্যক্ষীভূতস্য কার্য্যস্য ব্রহ্মসত্যতয়া সত্যবত্তাসমানস্য জগতো দর্শনেন হি তৎকারণং সত্যং জ্ঞানঘনন্তং ব্রহ্মাস্তীতি অনুভূয়তে, সোপাধিতয়া পরমাত্মানং কথয়ন্তীনাং শ্রুতীনাং গৌণত্বন্তু স্বয়মেবাপরাঃ অথাত আদেশো নেতি নেতি ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো ব্যঞ্জন্তি। যত্তু কেচিদ্বিষ্ণুভির্লাভো মোক্ষ ইতি, কেচিৎ শিবপাদাম্বুজলীনত্বং মুক্তিরিতি, কেচিৎ কালিকাচরণাম্বুজরেণুপ্রসাদঃ পরমপুরুষার্থলাভ ইতি, কিং বহুনা কেচিদ্বৃন্দাবনে শৃগালত্বপ্রাপ্তিরেব মুক্তিরিতি, কেচিৎ গঙ্গায়াং কচ্ছপাদি-যোনিপ্রাপ্তিঃ পরং শ্রেয় ইতি মন্যন্তে তত্তু স্বস্বরুচিবৈচিত্র্যাদেব। কিঞ্চ শাস্ত্রস্য শাস্ত্রান্তরং বিবরণমিত্যনাকর্ণিতবত্তির্বিবাদার্থধৃত-বেদান্তসম্মতাদ্বৈতবাদকানি ন্যায়াদিশাস্ত্রাণি বিশেষতোঽনালোচিতবস্তির্মধ্বাচার্য্যতন্মতানুয়ায়িভিরেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মৈব বেদান্তস্য বিষয়ঃ, স্বরূপানন্দাবাপ্তির্মোক্ষো বেদান্তস্য প্রয়োজনমিতি বেদান্তসিদ্ধ-পক্ষং বিপক্ষবদ্দূরতঃ সমুৎসৃজ্য জীবভেদো বেদান্তসম্মতঃ বিষ্ণুভির্লাভো মোক্ষশ্চেতি বিনৈব সৎপ্রমাণং কল্প্যতে। নহি তর্কশাস্ত্রাদিষু বিবাদার্থং দ্বৈতবাদো বেদান্তসম্মত ইতি কৃত্বা কচিদ্ধৃতঃ, নবা বিষ্ণুভির্লাভো মোক্ষ ইত্যপি কুত্রচিদ্গৃহীতঃ, কিন্তু বেদান্তসম্মতোঽদ্বৈতবাদঃ স্বরূপানন্দাবাপ্তির্মোক্ষ ইত্যেবাবতারিতঃ কিমহো পক্ষপাতেন দৃষ্টমপ্যদৃষ্টায়তে শ্রুতমপ্যশ্রুতায়তে। জাত্যাদিধর্ম্মরহিতস্য ব্রহ্মণঃ শক্ত্যা লক্ষণয়া বা ন কিঞ্চিচ্ছব্দবাচ্যত্বমিতি যন্মধ্বাচার্য্যোঽচকথৎ তত্ত্বদ্বৈতবাদিনাং নানভিমতং—যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি, যদ্বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে, অথাত আদেশো নেতি নেতি ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ইত্যাদিস্মৃতিভিশ্চ শব্দানাং ব্রহ্মস্বরূপে প্রবৃত্তেরসম্ভবস্যৈব বোধিতত্বাৎ, কিন্তু প্রতিবোধবিদিতং মতং শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো বাচং, যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধলদ্যুক্ত্যা চ অনীর্ব্বচনীয়ঃ কশ্চিজ্জগতামধিষ্ঠাতা নিয়ন্তা চাস্তীতি নিশ্চীয়তে। ব্রহ্মণো বিভুত্বাদরূপাচ্চ ন তস্য প্রতিবিম্বঃ, পরিচ্ছেদবিষয়ত্বাস্বীকারাচ্চ ন তস্য পরিচ্ছেদ ইতি যদ্দূষণপরত্বেন মধ্বাচার্য্যঃ কথয়ামাস তত্ত্বদ্বৈতমতানভিজ্ঞতয়ৈব নহি বস্তুতঃ সর্ব্ববিশেষরহিতস্য সর্ব্বব্যাপিনো ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বঃ পরিচ্ছেদশ্চ সম্ভবতি, ন বাঽদ্বৈতবাদিভিঃ স্বীক্রিয়তে; কিন্তু প্রতিবিম্বোপময়া একস্য বস্তুন উপাধিভেদাৎ নানাত্বেন ভানং, পরিচ্ছিন্নোপমানেন চাবয়ববত্তিতস্য বিভোরুপাধিতঃ পরিচ্ছিন্নত্বেনাবভাস ইত্যেবাদ্বৈতবাদিনাং তাৎপর্য্যং। ন হি শাস্ত্রতো ব্যবহারতো বা সর্ব্বধর্ম্মৈরুপমা সম্ভবতি। নহি চন্দ্রবন্মুখমিত্যুক্তে মুখস্য দেবত্বম্ আকাশস্থত্বং কলঙ্কবত্ত্বম্ উভয়োঃ পক্ষয়োর্বৃদ্ধিহ্রাসশালিত্বমায়াতি। অদ্বৈতং সুখমানন্দো বিজ্ঞানমিচ্ছা ইত্যাদয়ো ব্রহ্মণো ন ভিন্না, একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া। বিচার্য্যমানে ত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোঽবশিষ্যতে॥ জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ। বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ॥ ইত্যাদি-বচনানি চ শ্রোতব্যো মন্তব্য ইত্যাদি-শ্রবণাৎ ব্রহ্মোপাসনার্থান্যেব ন ত্বদ্বৈতসাধকানি, অতো ন মধ্বাচার্য্যোক্ত-সিদ্ধসাধনতাদোষস্যাত্রাবসরঃ। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ, অদৃষ্টো দ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা অস্থূলমনণু অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ আহ হি তন্মাত্রং ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণাঽনির্দ্দেশ্যো নিগুণে গুণবৃত্তয়ঃ নির্ব্বিকারো নিরাধারো নির্ব্বিশেষো নিরাকুলঃ গুণাতীতঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ ইত্যাদিষু শ্রুতি-সূত্র-পুরাণতন্ত্রেষু সৎস্বপি অলীকং নিগুণং ব্রহ্ম প্রমাণাবিষয়ত্বত ইতি যন্মাধবীয়ং বচনং তদেবাপ্রমাণং। বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণং যস্য প্রমাণং লভেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাদ্বচনং প্রমাণং॥ ইতি স্মরণাৎ ভগবৎকৃষ্ণকলেবরস্য সত্যত্বং বদতা ক্রোড়ীকৃতবিশিষ্টাদ্বৈতবাদকেন অদ্বৈতবাদিনঃ প্রপঞ্চবাদিনো মত্বা মনুষ্যত্বং বিফলায়ন্তে ইতি যদ্ব্যাক্ষেপি তেন তু এবং বদতস্তস্যৈবোপরিব্যাখ্যাতঃ বেদান্তবেদ্যত্বেনাঽবিজ্ঞানতাং প্রপঞ্চং মিথ্যাত্বেনৈব পদ্যন্তাং কেবলাদ্বৈতবাদিনাং মিথ্যাভূতপ্রপঞ্চবিচারস্যাসম্ভবাৎ ন হি প্রপঞ্চং মিথ্যাত্বেন জানন্তঃ প্রপঞ্চমেব বিচারয়ন্তীতি কদাপি সম্ভবতি। পরেশপ্রভো সর্ব্বরূপবিনাশিন্ন নির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য। অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব জগদ্ভাসকাধীশ্বরাধীশ নিত্য॥

ওঁ তৎসৎ। ৩১ আশ্বিন ১২২৩। পূর্ব্বের প্রাপ্ত প্রত্যুত্তরের এই উত্তর শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র দত্তের দ্বারা দেওয়া যায়।

"জননী আমার" ॥

ঝিঁঝিট—তাল রাগ

আজি ধীরে ধীরে কাল বেলা তীরে
আসিয়া দাঁড়ালে কালের আড়ালে।
কে তুমি আমারে ডাক বারে বারে   কাঁদ মোর তরে ডাক স্নেহ ভরে
ত্যজিছ আমারে হে মোর জননী
কত মা আদরে দিবস রজনী।
তোমারে চাহিয়া ভ্রমি পথে পথে   চলেছি বাহিয়া একাকী এ স্রোতে,
তমসা রজনী তপন তরণী
চলেছি বাহিয়া একাকী জননী।

গান—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী সঙ্গীতভারতী

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II মা পা | ধা -া -া ধা | ধা ণা | ধপা -া -া -া I ধা মা | র্সা -া -া না |
আ জি ধী ০ ০ রে ধী ০ রে০ ০ ০ ০ কা ল বে ০ ০ লা

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| র্সা না | র্রর্সা -া -া ণা I ধা ণা | ণা -া -া ণা | ণা -া | র্সা -া -া ণা I
তী ০ রে০ ০ ০ ০ আ সি য়া ০ ০ দাঁ ড়া ০ লে ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I ধা ধা | ধা -া -া ণা | র্সণা -া | ধা -া -া পা II
কা লে র ০ ০ আ ড়া ০ লে ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I ধা ধা | ধা -া -া ধা | ধা -া | ধা -া -া ণা I ণা র্সা | র্সা -া -া র্সা |
(১) কে তু মি ০ ০ আ মা ০ রে ০ ০ ০ ডা ক বা ০ ০ রে
(২) তো মা রে ০ ০ চা হি ০ য়া ০ ০ ০ ভ্র মি প ০ ০ থে

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| র্সর্না র্রা | র্রা -া -া -া I র্রা র্গা | র্রা র্সা -া না | র্সা না | র্সা -া -া ণা I
(১) বা০ ০ রে ০ ০ ০ কাঁ দ মো ০ ০ র ত ০ রে ০ ০ ০
(২) প০ ০ থে ০ ০ ০ চ লে ছি ০ ০ বা হি ০ য়া ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I ধা ধা | ধা -া -া ণা | র্সণা -া | ধা -া র্সা -া I র্সা না | র্সা -া -া না |
(১) ডা ক স্নে ০ ০ হ ভ ০ রে ০ ০ ০ ত্য জি ছ ০ ০ আ
(২) এ কা কী ০ ০ এ স্রো ০ তে ০ ০ ০ ত ম সা ০ ০ র

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| র্সা না | র্সা -া -া -া I র্সা না | র্সা -া -া না | র্সা না | র্রর্সা -া -া ণা I
(১) মা ০ রে ০ ০ ০ হে মো র ০ ০ জ ন ০ নী০ ০ ০ ০
(২) জ ০ নী ০ ০ ০ ত প ন ০ ০ ত র ০ ণী০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I ধা ণা | ণা -া -া ণা | ণা -া | র্সা -া -া ণা I ধা ধা | ধা -া -া ণা |
(১) ক ত মা ০ ০ আ দ ০ রে ০ ০ ০ দি ব স ০ ০ র
(২) চ লে ছি ০ ০ বা হি ০ য়া ০ ০ ০ এ কা কী ০ ০ জ

০ ১
| র্সণা -া | ধা -া -া পা IIII
(১) জ ০ নী ০ ০ ০
(২) ন ০ নী ০ ০ ০

সাধারণতঃ ঝিঁঝিট রাগিণীর সুরগুলি খাদের দিকে বেশীর ভাগ হয় বলিয়া অনেক ওস্তাদ মধ্যমকে সা করিয়া গাহিয়া থাকেন, শুনিতে অধিকতর শ্রুতিমধুর হয় বলিয়া। উপরোক্ত গানটির স্বরলিপিও মধ্যমকে সা করিয়া লিখিত হইয়াছে।

THE

BRAHMA SAMAJ

UNDER

DEVENDRANATH THAKUR.

CHAPTER II.

1. Death of Raja Ram Mohun Roy and the great loss to the Brahma Samaj and to India in general.

Before proceeding to give an account of Devendranath Thakur's conduct of the *Samáj* amidst the neglect and desertion of most of its members after the death of Ram Mohun Roy, the decrease of its funds and followers at that time, the attacks subsequently of hostile parties, and the schisms of its own flock, it will be necessary to narrate the state of the Church, and the vicissitudes it encountered, after the departure of its illustrious founder.

The sad intelligence of Ram Mohun Roy's demise at Bristol on the 27th september 1833, on the eve of his embarkation for his native land, arrived in Calcutta at a time when the hearts of his friends and followers were eagerly looking forward to the Raja's return, and great hopes were entertained of his exertions for the advancement and elevation of his countrymen. The *Samáj* was thunderstruck at the sudden and unexpected death of its philanthropic leader, and all its members considered it a deathblow to the sanguine hopes they had hitherto entertained of its future aggrandizement. The Raja's friends were filed with grief and dismay at the loss of a patron by whose honest councils they could benefit no more, and their deprivation of a compatriot, whom, as fame had reported, they were eagerly expecting to prove of immense value to his country, by his elevation to a seat in the Legislative Council of India. Even his bitterest enemies, the Conservative Hindus, in spite of the antipathy they felt to his reformatory plans and principles, deplored in his death the evanescence of their national glory, and acknowledged him as the pride of their country, whom but shortly before they had denounced as the pest of the land. Others again who had but lately miscalled him an incarnation of *Kalí*, the presiding evil deity of this *Kaliyuga* or iron age, now pronounced him the greatest genius India had produced since the days of the great reformer, Saukaracharya. Even his Christian acquaintances, with whom he had disagreed on religious matters, lamented his loss with sincere acknowledgment of his extraordinary talents. A just tribute has been paid to his memory by the late Dr. Marshman, in his History of Bengal, where he says, " he was the most enlightened native who had appeared for a long time in Bengal." His friend, Dr. Duff, who is related by Kishory Chand never to have made mention of his name afterwards but with mingled emotions of gratitude and veneration, is said to have expressed wonder and regret at his non-conversion to Christianity at his last moments in a Christian land, a circumstance which has given much cause for exultation to the followers of Monotheism. Mahomedans are still heard to honor him with the title of *Zabardast Moulavi*, or surpassing scholar or doctor. The hopes of his family too, at the success of his embassy to England, were nipped in the bud, and deep was their disappointment to be thus thwarted in their prospects and ambition.

2. Observance of caste rules even at his death.

The *Samaj* lamented his loss in a pathetic *oraison junebre*, which will be found in the beginning of Devendranath Thakur's "Twenty-five Years' Narrative of the Church if the said phrase could be properly applied to a discourse, which was delivered many years after the death of Ram Mohun Roy. It is truly affecting to read this oration in the original, but as it chiefly expatiates on the life and actions of the great champion of truth, sketched in Chapter I., it is needless to dwell on its contents here and recur to the subject. Fortitude, however, enabled his friends to submit to the stern decree of fate, and consolation was given to them in the thought that he had breathed his last amidst friends and sincere admirers, in a land of peace and freedom. The *Itivritta* impugns the conduct of the countrymen of Ram Mohun Roy, and anti-

cipates the ingratitude and injustice with which they would have treated the distinguished patriot on his return from England. It sums up by asserting that he would most probably have been excommunicated, and the Dharma Sabha would, without doubt, have pronounced him an outcast for having crossed the seas, and sojourned in a Christian country, among a Christian people, whom they regarded as *Javans* and *Mlechchas*, although the Raja had, with scrupulous concern, strictly observed the rules of caste up to his last moments, as is related by Dr. and Miss Carpenter in the English journals of the day. At a dinner given to the Raja by the Court of Directors, he is said to have only touched the rice and water, without tasting anything. He observed the same restriction at the two entertainments given in honor of him by Louis Phillippe, king of France. Dr. Carpenter says, "he had the sacred thread on his shoulder down to his last moment, and was very apprehensive lest his dead body should be interred according to Christian rites." Miss Collet says that his Brahman companion Ramaruttun performed his funeral rites. The burial, instead of the burning of his corpse, was no violation of the funeral ceremony prescribed by the Hindu religion for a *Brâhma* or *Brahmachari*.

3. Reason suggested for the observance of caste rules.

But all this concern for caste was not because the Raja laid any stress on its intrinsic value, but as a matter of necessity for the protection of his temporal interests and the success of the religious cause undertaken by him. In temporal matters, the Hindu Law debars an outcast from many rights and privileges, which are essential to life. Under these circumstances the Raja's religious reformation, which was the grand object of his life, would have severely suffered, in fact would have been totally ruined, as no one would incline his ear to listen to the religious instruction given by an outcast, unless he was prepared to run the risk of being outcasted himself. This fact is one of the great stumbling blocks to the conversion of Hindus to Christianity. If Christian proselytism had been carried on by means of Brahmanic ministration, as was done by Father Beschi in the Deccan, a method which obviated the risk of losing caste, instead of the means then, and still, in vogue, there is no doubt that a much wider diffusion and conversion to Christianity would have resulted.

Had not the Raja felt all the concern for caste mentioned above, his very friends and disciples would not only have been obliged to forsake him, but would have also had to renounce their faith and belief in *Brahmaism*, for fear of caste excommunication. From the predominance of caste restrictions even at this day, one may well imagine how much more peremptory and severe they must have been some forty years back, when the full light of Western civilization had not as yet dawned in the East, nor British Legislation busied itself in curbing and curtailing any of its absolute prerogatives, but left established custom as an arbitrary autocrat to rule over the Hindu people.

4. Monument raised over Raja's grave by Dwarkanath Tagore and works done by friends to keep Rajash's memory alive.

Among the whole host of the Raja's friends, we find Dwarkanath Thakur alone exhibiting the most striking example of true friendship. He followed his master to England, wept over his silent grave, and caused, as Miss Collet says, a handsome monument of oriental structure to be raised over the remains of his friend at Arno's Vale cemetery at Bristol. But if the saying of Johnson, that the best monument which could be raised to the memory of an author is to publish a collected edition of his works, be true, the friends and followers of Ram Mohun Roy have not been backward in this respect, however indifferent the Hindu nation in general has been in testifying their respect to the pride of their country in monumental brass or stone. One of the friends of the Raja, the Zamindar of Telinipara, Annada Prasad Banerjee, undertook to publish a re-edition of many of the Râjâ's works, but did not live to complete his under taking, having published only the Pathya-

pradâna. The Tattwabodhini Sabhâ rendered much service by the publication, in a revised form, of some of his prefaces to the Upanishads. Rajnarain Bose, President of the *Adi Brahma Samaj*, and Pandit Ananda Chandra Vedantavagish, late minister of that *Samâj*, have lately published a collected edition of his Bengal works. It is however, a shame to the heirs and inheritors of his estates, now rolling in affluence, to have done nothing towards commemorating the memory of their talented ancestor by the publication of the works on various subjects, penned by him with great labour which were left unprinted owing to his sudden departure to England, and untimely death.

5. Management of the Samaj after Raja's Death.

After the death of the Raja the *Samaj* fell into several hands, and passed successively under the management of its ablest and most worthy members, who though renowned for their able management of vast commercial and Zamindary concerns and ventures proved inadequate to the discharge of this important and sacred office.

The guidance of the spiritual concern of a religious body of men, opposed on every side by antagonists of different creeds and persuasions, required too much of their attention to be a grateful work. They were all men of great learning and ample means, sufficient for the management of a long established institution; but the band of *Brâhmas*, which was still in its infancy, and composed only of the most enlightened and daring few, required leaders possessed of energy and boldness in the cause of truth and religion, such as animated of the founder of the *Samáj*. The fate of a newly-founded religious association is in every way parallel to that of a newly-founded city or state, which, in order to secure its prosperity and perpetuity, must needs be propped and supported by extraordinary talents and virtues in the persons of its successive leaders.

6. Personality of the Raja.

Ram Mohun Roy was a man gifted by nature with vigorous powers both of mind and body, and just as his bodily constitution enabled him to bear the rigours of every climate, so did the organization of his mind qualify him to contend with the errors and prejudices of both Hindus, Mahomedans and Christians, against all of whom he fought and wrote, and all of whom he strove to reconcile to one general standard of Unitarianity, by evidence deduced from their own revelations and scriptures. His profound acquaintance with all their writings gave great weight and indisputable authority to whatever he brought forward against them. His commanding and majestic appearance made him conspicuous in every circle, his sonorous voice gave him an ascendancy in every assembly, while his judicious counsels and sound views secured him a decided superiority over others, and enabled him to quell with an almost absolute sway, the disputes and differences of his friends and followers. So Miss Collet bears witness of him in this respect, "His cultivated mind, dignified presence, and generous character, won him universal regard and esteem." He brought over many to the cause of *Brahmaism*, by winning their hearts, by giving them sound counsel in worldly matters, which his uncommon intelligence, and his profound and extensive knowledge of human nature, and human transactions enabled him to give with the greatest facility and ease. The grand arcanum of reconciling men of different minds and opinions was well known to him and he could not only induce men of different faiths and creeds to join him in the all absorbing work of Brahmic reformation, but possessed an equal facility in reuniting men having personal enmity to one another and influencing them to co-operate with him in the furtherance of the cause of truth and liberty for the promotion of the common weal.

7. Members indifference to the Samaj on Raja's Death.

The flock without the pastor dispersed, and the champions and friends of *Brahmaism* on the death of their leader, appeared in their true colors. There was no supernatural incentive, as in the case of other and older religions, to induce the *Brâhmas* to hold their ground. The great Zamindars,

Roy Chowdries, Munshies, Mullicks, and Singhs, who had gathered round the standard of reformation, now began to falter and fail, and ceased attending the church which they had contributed to raise. The *Itivritta* is very severe upon these turncoats, and describes them as a party of boys, joining in a festive diversion for a while, and then returning to the lap of their domestic usages and customs, as soon as the spell of that merriment was over. It is true they did not entirely desert the standard of reformation, because they had to carry on a continued *dala-dali* or party agitation against the Dharma Sabhà, which, as Kishory Chand says, was all but omnipotent ; but they ceased to think of religion as a matter of their eternal concern and to contribute towards the support of the *Samaj* In fact, they remained quite indifferent to religious matters, and whilst entertaining great freedom of thought and sentiment, still conformed in their domestic circles, to all the idolatrous rites and ceremonies of their country.

8. Indifference of the then-trustees and Raja's disciples.

But to return to our subject—the management of the *Samàj*—we have seen that the late Maharaja Rama Nath Thàkur, and Prasanna Kumar Thákur, who had been appointed trustees by the trust deed of the founder, were men too much occupied with their wordly concerns to perform the parts so solemnly entrusted to their charge in the sacred cause of religion. The former is well-known as a distinguished member of the Legislative Council of Bengal, and the latter as the Head Government Pleader in the Sudder Court of Calcutta. Much good has of course been done by these gentlemen in their political and legal careers, to the people at large. Prasanna Kumar Thakur is known as the originator of the *Reformer*, a weekly paper, and as the author of several useful works on law, as well as for his large endowment for a Professorship of Hindu Law in the Presidency College. The public services of the late Maharaja Rama Nath Thakur are too well known to need comment here. Yet, after all, the *Samàj* is under little or no obligation to their patronage, influence, or liberality. In fact, both these rich men declined to fulfil the trusts imposed on them. Tarachand Chukerburty, a disciple of Raja Ram Mohun Roy's and a man of learning, probity, and true faith, and one whom we have mentioned before as ably seconding the Raja in the establishment of the *Samaj*, and who had acted the part of its Secretary from the beginning, and written some tracts on the *Bràhma* religion, left the *Samàj* for secular employment on the Raja's departure for England. This gentleman Tarachand, signalized himself as head manager :of the Burdwan Raj, in conjunction with his colleague Chandra Sekhar Deva, another of the Raja's disciples and a man of eminent acquirements and high legal knowledge. Chandra Sekhar's "Vindication of Vedanta" against the attacks of Dr. Duff, to be found in the Vedanta Doctrines Vindicated, and his "Reminiscences of Ram Mohun Roy" lately published in the *Tattwabodhini Patrika* are both proofs of his piety and learning. Had these gentlemen exerted themselves heart and soul in the cause of their religion during the absence of their master, there was every likelihood of the pristine prosperity of the *Samàj* having been secured, but they were called away to business, and it was left without a proper guide to decline and decay.

দেশের কথা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভারতের জনসংখ্যা।—দেশের চাষী শতকরা ৯০ জন।

১৯.১. Census reportএ—

ব্রিটিশ ভারতের ২৪৭০ লক্ষ লোকের মধ্যে ১৭৮০ লক্ষ চাষী।

১৯১৮ সনে মৃত্যুহার জন্মহারের প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছিল এবং মৃত্যুসংখ্যা পল্লীগ্রামেই খুব বাড়িয়াছিল। ১৯০১ হইতে ১৯১১ সনের মধ্যে ২০,৭৯৫, ৩৪০ জন লোক অর্থাৎ ৭.১ বাড়িয়াছে।

১৯১১ হইতে ১৯২১ সনের মধ্যে ৩, ৭৮৬,০৮৪ জন লোক অর্থাৎ ১.২ বাড়িয়াছে। বৃদ্ধির হার প্রায় শতকরা ৬ কমিয়াছে। ১৯২৮ সনে বাংলা দেশের বাহিরেই মৃত্যুসংখ্যা খুব বেশী দেখা যায়।

জমির উর্ব্বরা শক্তি—

১৯১৫ হইতে ১৯২৫ সন অবধি ধানচাষ প্রভৃতির হিসাব হইতে বুঝা যাইবে যে, উৎপাদিকা শক্তি সমান ছিল। ১৯২০ সনের পূর্ব্বের কুড়ি বৎসরের ফসল তুলনা করিলে মনে হয় যে উৎপাদিকা শক্তি কিছু কমিয়াছে। বৎসরান্তে ফসল সমান থাকিতেছে, অথচ জনসংখ্যা বাড়িতেছে।

জনসংখ্যা—

৯৯,৮৩২,০৯৬ পুরুষ—১৫ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক
৯৪,৬৫৭,০৭৭ স্ত্রীলোক— " " "
১২৪,৫৫৩,৩০৭ বালক-বালিকা ১৫ বৎসরের নিম্নবয়স্ক

৩১৮,৯৪২,৪৮০ মোট জনসংখ্যা

ইহাদের জন্য আবশ্যক ফসলের পরিমাণ—

পুরুষ পিছু ২ পাঃ হিঃ— ৩৩,২৭৭,৩৬৫ টন
স্ত্রীলোক পিছু ১$\frac{৩}{৮}$ পাঃ হিঃ— ২৭,৪৪,৮৭৯ টন
বালক ইঃ পিছু ১ পাঃ হিঃ— ২০,৭৪২,২১৮ টন

সর্ব্বশুদ্ধ ৮১,০৬৪,৪৬২ টন

ফসল হয় কত ?

১৯০০ অবধি ১৯২২ সনের গড়পড়তা হিসাবে দাঁড়ায়—

ধান (মিলিয়ন বা ১০ লক্ষ টন হিঃ) ৩২.৩
গম ৮.৭
বার্লি ৩.৩
ভুট্টা ২.৫
ছোলা ৪.৮
অন্যান্য ২৪.৪

সর্ব্বশুদ্ধ উৎপন্ন ফসল......৭৬.০

ঐ কয় বৎসরের গড়পড়তা রপ্তানি—

ধান (মিলিয়ন বা ১০ লক্ষ টন হিঃ) ২.২
গম ১.৩
বার্লি ... ... ×
ভুট্টা ... ... ×
ছোলা ... ... ×
অন্যান্য ... ১.০

সর্ব্বশুদ্ধ রপ্তানি ৪.৫

উৎপন্ন ফসল হইতে বাদ পড়িবে—

নষ্টবাবদ শতকরা ১০ হিসাবে :—৭.৬ মিঃ টন
পশুখাদ্য বাবত ১২.২ মিঃ টন
বীজের বাবত ২.০ মিঃ টন
রপ্তানি বাবত ৪.৫ মিঃ টন

মোট ২৬.৩ মিঃ টন

ব্যবহারের জন্য বাকী থাকে ৪৯.৭ মিঃ টন
কিন্তু দরকার ৮১ মিঃ টন

দেখা যাইতেছে, উদ্‌বৃত্ত ফসল হইতে মাত্র অর্দ্ধেক লোকের সংস্থান হয়।

পতিত জমির পরিমাণ—

১৯২১-২২ সনে দেখি—

সার্ভে অনুযায়ী জমির পরিমাণ—৬০৬,৬১৯,০০০একর
বন ৮৫,৭১৯,০০০ "
চাষযোগ্য পতিত ১৫১,১৭৩,০০০ "
চাষের জন্য অপ্রাপ্য ১৫৩,১৭৮,০০০ "
অনুর্ব্বর ৫০,৫৫৪,০০০ "
চাষী ২২৩,৯৮৪,০৭০ "

চাষের জমি পতিত জমির পরিমাণ প্রায় সমান, কিছু কম।

পতিত জমি চাষের ফসল কি হইতে পারে—

১ম বৎসরে পুরাতন জমির $\frac{২}{৩}$ হিঃ—
৭৬ মিঃ টনের $\frac{২}{৩}$ = ৫০.৬ মিঃ টন
২৬.৩ মিঃ টনের $\frac{২}{৩}$ = ১৭.৮ মিঃ টন

প্রথম বারের মত রপ্তানি ৪.৫ মিঃ টনে স্থির থাকিলে (যদিও তাহা অসম্ভব) বাড়তি হয় মাত্র ৩২.৮ মিঃ টন।

যদি সারা ভারতবর্ষ চাষ করা হয়, তবে ফসল পাইতে পারি (৪৯.৭ + ৩২.৮) বা ৮২.৫ মিঃ টন। উপস্থিত জনসংখ্যার না হয় পোষণ হইতে পারে ধরা গেল। লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে উপায় ?

১৯০০ সালে আমেরিকায় গড়পড়তা ১ বর্গ মাইলে মাত্র ২৫ জন লোক ছিল।

ভারতের কোচিন অঞ্চলে এক বর্গ মাইলে ৬৬২ জন লোক থাকিত। বেলজিয়ম এবং ইংলণ্ডে ইহা অপেক্ষাও কম।

উপরের উক্তি হইতে দেখা যায়, শুধু চাষ হইতে মানুষের—অন্ততঃ একটা জাতির জীবন ধারণ অসম্ভব। ব্যবসায় প্রভৃতি অর্থাগমের অন্যান্য উপায় অবলম্বন আবশ্যক।

আমেরিকার অবস্থা—

	১৮৮০,	১৮৯০,	১৯০০,	১৯১০,	১৯২০
চাষ	৪৪·৩	৩৭·৭	৩৫·৭	৩৩·২	২৬·৩
প্রফেসন	৩·৫	৪·১	৪·৩	৪·৪	৫·২
গার্হস্থ্য বা চাকরী	১৯·৭	১৮·৬	১৯·২	৯·৮	৮·২
ব্যবসা ও যানবাহন	১০·৭	১৪·৬	১৬·৪	১৬·৬	১৭·৬
শিল্প	২১·৮	২৫·০	২৪·৪	২৭·৮	৩০·৮

(সংখ্যাগুলি হইতে তিনটী শূন্য বাদ দেওয়া হইয়াছে)

দেখা যায় যে আমেরিকাও এখন ব্যবসায় ধরিতেছে। জাপানে একবার লোকবৃদ্ধির সমস্যা আসিয়াছিল। তখন জাপান উত্তর আমেরিকায় লোক চালান দিয়া বাঁচিয়া গেল। এখন আমেরিকা তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে।

কৃষিবিদ্যালয়ের সংখ্যা—

ভারতে ৬৮টী কৃষিকলেজ, ১৬টা কৃষিস্কুল এবং ১টা কৃষিগবেষণাগার আছে। মোট ছাত্র ১১৫০

ফ্রান্সে— ৭১টা কলেজ ও ২২০০ ছাত্র

বেলজিয়মে ৭০টা কলেজ ও ৫০০০ ছাত্র

ডেনমার্কে ৯৯টা কলেজ ও ৯৫০০ ছাত্র

ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গের একাউনটেণ্ট জেনারেল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মূল্যবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া বলিলেন—শস্যের অভাবের জন্য দাম বেশী হইয়াছে। রপ্তানি না করিয়া যদি সমস্ত ফসল ভারতবর্ষেই রাখা যায়, তবে দাম কমিতে পারে। গবর্ণমেণ্টের মনের মত কথা না হওয়ায় তাঁহারা তাহা অস্বীকার করিয়া বলিলেন—ফসল সমান হইলেও জনসংখ্যার বৃদ্ধিই মূল্য বৃদ্ধির কারণ। তাঁহারা আরও বলিলেন—কিনিবার ক্ষমতা থাকিলেই হইল, ফসল থাক বা নাই থাক। ফসলের দাম বাড়াতে চাষীদের বেশী আয় হইতেছে, সুতরাং ইহাই ভাল।

এখন কথা হইতেছে, সমস্ত বস্তুরই দাম বাড়িলে ঐ যে অতিরিক্ত পয়সা পাইল, তাহার ক্রিনিবার শক্তি বাড়িল কি প্রকারে? উহা একটা myth মাত্র।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, এদেশে রপ্তানি "বাড়তি মাল" হইতে হয় না; ব্যবহার্য্য মাল হইতেই হয়।

বলা বাহুল্য যে আমরা আর্থিক উন্নতি (বৈশাখ ১৩৩৭) অবলম্বনেই উপরে যাহা কিছু বলিয়া আসিয়াছি। রপ্তানি বন্ধ করিলে যে ভারতবাসী দুমুঠা ভাত খাইয়া অনেকাংশে বাঁচিবার পথ পায়, তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, পুরী চাউল রপ্তানির একটী প্রধান স্থান। আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন একবার বয়কটের জোর propaganda চলিয়াছিল, সেই সময় আত্মত্যাগী ৺গোপবন্ধু দাস জাহাজওয়ালাদিগকে রপ্তানির জন্য চাউল দিতে উড়িষ্যাবাসীকে নিষেধ করিয়াছিলেন। রপ্তানির জন্য চাউল দেওয়া তো বন্ধই হইয়া গেল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই অনেক মণ চাউল পুরীর সমুদ্রতীরে রপ্তানির জন্য জমা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গোপবন্ধু দাসের আদেশে সেই চাউলও জাহাজে উঠাইবার জন্য কুলি পাওয়া গেল না। অনেকে তাঁহাকে ঐ জমা চাউল ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া ছাড়িবার আদেশ দিলেন না। তাহার ফলে সেই জমা চাউল পচিয়া গিয়া অনেকের ক্ষতি সাধন করিল বটে, কিন্তু তাহার "moral effect" হইল যে, আর কেহই রপ্তানির জন্য চাউল বিক্রয় করিতে সাহস করিল না। ফলে, সে বৎসর চাউল পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় খুবই সস্তা হইয়াছিল। যতদূর মনে পড়ে, উড়িষ্যাবাসীরা দুমুটো ভাত ভাল করিয়া খাইতে পারিয়া তাঁহার নাম ধন্য ধন্য করিয়াছিল।

লেখক এই প্রসঙ্গে জন্মনিরোধের ব্যবস্থা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। আমরাও "বর্ষে বর্ষে পুত্রকন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা"র নিশ্চয়ই পক্ষপাতী নই। কিন্তু যে প্রণালী অবলম্বনে আজকাল জন্মনিরোধের ব্যবস্থা করিতে বলা হয় এবং এই উপলক্ষে যেভাবে দুর্নীতিপরিপোষক প্রবন্ধাদি ও বিজ্ঞাপনাদি মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রসমূহের অঙ্গসমূহ ছাইয়া ফেলিতেছে, আমরা সে প্রণালীর পক্ষপাতী নহি। আমাদের মতে শাস্ত্রসম্মত পন্থা অবলম্বন করিয়া সন্তান উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হউক—দেখিবে, দেশের দারিদ্র্যের একটা গুরুতর কারণও নির্ব্বাসিত হইবে, এবং যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারাও দীর্ঘায়ু ও বলিষ্ঠ হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার প্রচেষ্টা।

[নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি, শিলং—লাবান হইতে শ্রীপ্রসন্ন কুমার মজুমদার শাস্ত্রী মহাশয় গত ৮।১০।৩০ তারিখে আমাদিগকে লিখিয়াছেন। খাসিয়াদের মধ্যে পত্রলেখকের ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের স্বার্থহীন প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম; ইহার পতাকা যাঁহারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্রে উহা উত্তোলিত রাখেন, তবে ইহার মাহাত্ম্য-দর্শনে চারিপাশের বহু লোক স্বতই উহার তলদেশে সমবেত হইবে। চিরদিনই জগতে "সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্‌" এই মহতী উক্তি পত্রখানির সর্ব্বত্র ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। তং সং]

মহাত্মন্‌!

আমার বিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করুন। আমাদের কমিটিতে আসাম গবর্ণমেন্টের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রমোদ চন্দ্র দত্ত সি-এস্‌, মহাশয়কে সভাপতি ও খাসিয়া ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত শিবচরণ রায়কে সহকারী সভাপতি মনোনীত করিয়াছি। কমিটির নিয়মাবলি ছাপা হইলে একখণ্ড আপনার নিকট পাঠান যাইবে।

খাসিয়া পাহাড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ২৫টি স্বাধীন সামন্ত রাজ্য আছে। এই রাজ্যগুলি প্রজাতন্ত্র। প্রত্যেক স্বাধীন সামন্ত-রাজ্য প্রজা-নির্ব্বাচিত "সীয়েম" (Seim) "উহাদাদার" (Wahadadar) "সর্দ্দার" "লিংদোহ" (Lingdoh) নামধেয় নায়ক কর্ত্তৃক শাসিত। এই সমস্ত সীয়েম, উহাদাদার ও সর্দ্দারের সাহায্য পাওয়ার খুব সম্ভাবনা দেখা যায়। আগামী জানুয়ারী মাস হইতে প্রত্যেক 'পুঞ্জী'তে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব বলিয়া আশা করি।

খাসিয়া ভ্রাতাভগিনীগণ আদিসমাজের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ করিতেছেন।

খাসিয়াদের মধ্যে বর্ণভেদ, জাতিভেদ নাই। তাহারা ব্রাহ্মণের প্রভাব মান্য করে না। তাহাদের মধ্যে গুরুবাদ, পৌরোহিত্য প্রভৃতির কোন প্রভুত্ব নাই। তাহারা মূর্ত্তিপূজার বিরোধী।

খাসিয়া ভ্রাতাভগিনীগণ অতিশয় সরল, তাহাদের হৃদয় স্নেহ ও দয়ার পরিপূর্ণ। তাহারা সত্যবাদী। চৌর্য্য, শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতার সহিত তাহাদের এখনও পরিচয় হয় নাই। তাহারা একেশ্বরবাদী। তাহারা বলে "পরমেশ্বরে ভক্তি রাখিয়া সমস্ত দিন কর্ম্ম করাই আমাদের ধর্ম্ম; এবং তাহা দ্বারাই পরমেশ্বরের উপাসনা করা হয়"। ফলতঃ বলিতে গেলে "তস্মিন্‌ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" এই মন্ত্রই খাসিয়া ভ্রাতা-ভগিনীদের ধর্ম্মজীবনের মূল আদর্শ।

একজন খাসিয়া ভদ্রলোকের কয়েকটি কথা আপনার অবগতির জন্য নীচে লিখিলাম।

"যীশুখৃষ্ট মানুষ, তিনি ঈশ্বর নহেন। ঈশ্বর অনন্ত, অসীম, নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ। ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না—তিনি বাক্যমনের অগোচর। তাঁহার প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ নাই। একমাত্র অনুভূতিই তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ। সমগ্র জগতই তাঁহার প্রতীক। ঈশ্বর অমুক দেশে, অমুক মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এই কথা মূর্খের উক্তি। মানুষের মধ্যে জাতিভেদ, মূর্খতার লক্ষণ। বৈষম্য অজ্ঞতার ফল। যত কিছু গুণ আছে, তন্মধ্যে সাম্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। বাবু, আমরা খাসিয়া; আমরা গীর্জ্জাতে গেলেও খৃষ্টান নহি।"

সংবাদ।

পান্ধারপুর অনাথ আশ্রম।—পান্ধারপুর নিরাশ্রয়ের আশ্রয়নিকেতন বোম্বাই প্রার্থনাসমাজের আশ্রয় দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে। ১৮৭৫ অব্দে মুনসেফ রাও বাহাদুর লালশঙ্কর চন্দ্রভাগা নদীর তীরে বেড়াইতে বেড়াইতে সদ্যোজাত এক পরিত্যক্ত শিশুকে নিরাশ্রয় অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাহাকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া এক দুগ্ধবতী ধাত্রীর হস্তে তাহার লালনপালনের ভার অর্পণ করেন। অনুসন্ধানে তিনি পরে জানিতে পারেন যে পবিত্র তীর্থ পান্ধারপুরে অনেক গর্ভবতী বিধবা আসিয়া এইরূপে তাহাদের সদ্যপ্রসূত জীবিত সন্তানগুলিকে নদীতে নিক্ষেপ করিয়া কখনও বা তীরে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। এই নিদারুণ শিশুহত্যার কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়া যায় এবং তিনি অনন্তনারায়ণ দাস্তেকারের ও অপরাপরের সাহায্যে পরিত্যক্ত অনাথ সদ্যোজাত শিশু পালনের আশ্রম Foundling Home) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৬ সালে দারুণ দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত দুস্থ পিতামাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত বহুল সন্তানসন্ততির ভার ঐ সময়ে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করেন। কিন্তু সরকারের পূর্ত্তকার্য্য বন্ধ হইয়া গেলে তাহারা আবার নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। ইহা দেখিয়া লালশঙ্কর অর্থসংগ্রহ করিয়া ১৮৭৮ সালে এক নিরাশ্রয়-ভবন (Orphanage) প্রতিষ্ঠা করেন। চতুর্ভুজ মুরারজি নামক জনৈক বিরাটহৃদয় ভাটিয়া নিজ হইতে আট হাজার টাকা প্রদান করিয়া এবং বাহির হইতে তিন হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া মোট এগার হাজার টাকা ব্যয়ে উহার উপযুক্ত একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। বোম্বাই এর তদানীন্তন লাট স্যার রিচার্ড টেম্পল ঐ গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মুনসেফ লালশঙ্কর অন্যত্র বদলি হইবার সময় উহার পরিচালনভার বোম্বাই প্রার্থনাসমাজে অর্পণ করিয়া যান। প্রয়োজন অনুসারে ঐ গৃহটির আকৃতি মধ্যে মধ্যে এতই বির্দ্ধিত হইয়াছে যে, ঐ জমিতে আরও বির্দ্ধনের স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। এইজন্য নিকটের দুইখানি বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছে। ১৯২৮।৩০এ মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত দুই বৎসরের যে কার্য্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে উহার পরিচালনের জন্য একজন উপাধিধারী ডাক্তার, একজন সুশিক্ষিত ধাত্রী, ১০ জন সহকারী ধাত্রী এবং ৩০ জন পরিচারিকা উক্ত আশ্রমে নিযুক্ত রহিয়াছেন। সদ্যোজাত পরিত্যক্ত শিশুগণকে স্তন্য দান করিবার জন্য দুগ্ধবতী ধাত্রী যথাসম্ভব নিযুক্ত করা হয়। এতদ্ব্যতীত গোদুগ্ধ, কৃত্রিম দুগ্ধ (Glaxo)ও সুমিষ্ট ফলেরও ব্যবস্থা আছে।

নানাস্থান হইতে সংগৃহীত এইরূপ শিশুসন্তানের মধ্যে মৃত্যুর হার কমাইবার জন্য সহরের বাহিরে স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে জমি সংগ্রহ করিয়া তাহার উপরে অট্টালিকা-

নির্ম্মাণের চেষ্টা চলিতেছে। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি সদয়; এবং ইহার সাহায্যকল্পে ৫০০ টাকা করিয়া বার্ষিক সাহায্য দান করেন। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ পঁইত্রিশ হাজার টাকা। আশ্রম চালাইতে গিয়া চৌদ্দ হাজার টাকা ঋণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার অস্তিত্ব সাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত দানের উপরে নির্ভর করে।

এই আশ্রমে যে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র শিশুর প্রাণ রক্ষা পাইতেছে, তাহা নহে; নিরাশ্রয় বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা স্ত্রী—যাঁহারা ক্ষুদ্র শিশুর জননী, তাঁহারাও এখানে স্থান পান। তাঁহাদের চরিত্রবিশোধন এবং নৈতিক শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা এই আশ্রমে চলিতেছে, আমরা এই আশ্রমের কল্যাণ কামনা করি এবং এই সুন্দর ও অত্যাবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করিবার জন্য মুক্তহস্ত জনসাধারণকে আহ্বান করি। যাঁহারা সাহায্য করিয়া ধন্য হইতে চান, তাঁহারা বোম্বাই প্রার্থনাসমাজের সহিত পত্রব্যবহার করুন।

বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ।—বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথের সম্প্রতি স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে, এ সংবাদে সকলেই ব্যাকুল। রবীন্দ্রনাথ আপনার প্রতিভাবলে সমগ্র জগতে যেস্থান অধিকার করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতার প্রভাবে পাশ্চাত্যভূমিতে যে চমকের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সত্যসত্যই অদ্ভুত ও অনন্যসাধারণ। তিনি ভারতীয় আদর্শকে এত উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট উহা যেভাবে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহাতে বহির্মুখী ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য ভূখণ্ড তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিতেছে। রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের বাহিরে অবস্থান করিলেও তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের ও ব্যক্তিগত প্রভাবের উপর ভারতের মুক্তিপথ যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করিতেছে, ইহাই আমাদের ধারণা। ভগবান তাঁহাকে নিরাময় করিয়া তুলুন এবং তিনি যে পথের পথিক সে পথে বিচরণ করিবার আরও অজস্র শক্তিসামর্থ্য দান করুন, ইহাই আমাদের কামনা। ভারতের এই ঘোর দুর্দিনে আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। আমরা তাঁহার কর্ম্মবহুল আরও সুদীর্ঘ জীবনের প্রয়াসী। শ্রীচি. চ.

গ্রন্থপরিচয়।

চতুর্ব্বেদীয় পুরুষসূক্ত—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় জ্যোতিঃশাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত।

বেদমন্ত্রের অর্থবিচার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া গ্রন্থকার প্রচলিত ভাষ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেও স্থানে স্থানে স্বকৃত ব্যাখ্যায় যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। যুক্তিসহ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মূলে গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য ও বিচারশক্তি বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত, গ্রন্থকার যে বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়া সাধনাদ্বারা মন্ত্রগুলির প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন তাহার প্রমাণ আলোচ্য গ্রন্থের বহুস্থানে পাওয়া যায়। বেদমন্ত্রকে সঙ্গত করিতে হইলে অন্ধের ন্যায় সকল সময়ে ভাষ্যের অনুসরণ করা চলে না। গ্রন্থকার সেইজন্য প্রাচীনতম যুগে মন্ত্রবিশেষের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল, তাহা বর্ত্তমান আলোকে ঠিক সঙ্গত নয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেও মন্ত্রের প্রাণবস্তু যে সত্য ও অপরিবর্ত্তনীয় তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। রূপকের আবরণ উন্মোচন করিয়া গ্রন্থকার বিশ্বের অন্তরাত্মার সন্ধান পাইয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই কারণে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের নিকট আদৃত হইবে আশা করা যায়। সৃষ্টি-তত্ত্বের উপর নূতন আলোক বিকীর্ণ করিয়া গ্রন্থকার 'বিরাট পুরুষের' যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিতগণ তাহা পাঠ করিয়া বিমুগ্ধ হইবেন। চাতুর্ব্বর্ণের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাও অকাট্য যুক্তির উপর ন্যস্ত। বৈদিক মন্ত্রাদি ও পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থের এই প্রকার বিশদ আলোচনা অনুসন্ধিৎসাকে জাগাইয়া দেয়।

ব্যবসার পথে—ক্রাউন ১৬ পেজী আকারে ৫ ফর্ম্মায় সমাপ্ত। ২২নং আর, জি, কর রোড—"এদেশের কথা" বুকডিপো হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৷৷০ আনা।

প্রকাশক পুস্তকখানিতে সুচিন্তিতভাবে ব্যবসায়ের মূলনীতি, মূলধন, ক্রয়বিক্রয়, কর্ম্মতৎপরতা প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিয়া সমগ্র কর্ম্মক্ষেত্রে একটা ব্যবসায়াত্মক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া জাতির অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠাকে সর্ব্বতোমুখী সমৃদ্ধির পথে গতিশীল করিবার যোগ্যতা অর্জ্জনের এবং অর্থনৈতিক দুর্দশা লাঘবের কয়েকটী সহজ ও সরল পথের ইঙ্গিত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রবল অর্থসমস্যার উদ্ভব হইয়াছে এবং বেকারসংখ্যা যেরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচারে জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ হইবে। ব্যবসায়-পরাঙ্মুখ বাঙ্গালীকে ব্যবসায়ী জাতিরূপে গড়িয়া তুলিবার এই সাধু প্রচেষ্টা সার্থক হউক। ব্র. চ.

কর্ম্মচারীনিয়োগ।—আগামী ১০ই কার্ত্তিক ১৩৩৭ অবধি শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর বি-এল আদি-ব্রাহ্মসমাজের সহযোগী সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ সিংহ এম-এ, বি-এল আদিব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। নূতন বন্দোবস্ত না করা পর্য্যন্ত এই বন্দোবস্ত বলবৎ থাকিবে। ইতি

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ট্রাষ্টী ও সম্পাদক,—আদিব্রাহ্মসমাজ।
৭ই কার্ত্তিক, ১৩৩৭

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০শে কার্ত্তিক রবিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সপ্তপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসবে প্রাতে ৭টার পরে উপাসনা, অপরাহ্ণ ৩টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৬টার পরে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। সাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

সম্পাদক।

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C 462

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দ্বাবিংশ কল্প—চতুর্থ ভাগ

সংখ্যা ১০৪৭ — ১৮৫২ শক কার্ত্তিক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৮তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৶০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে
পাঠাইতে হইবে।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মহারাজ শ্রীহৃষীকেশ লাহা কে, সি, আই, ই

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৮তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০১। সাল ১৩৩৭। শক ১৮৫২। খৃঃ ১৯৩০। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩১।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৩৭। তোমাকেই চাই।

মা! তোমার নামে প্রাণের মধ্যে কত কথাই জাগিয়া উঠে। মনে হয়, প্রাণের সমস্ত কথাই একসঙ্গে বলিয়া শেষ করি, কিন্তু বলিতে গিয়া দেখি, তাহার আর শেষ হয় না। আবোলতাবোল কতই বকিয়া যাই—মনে হয়, তোমারই সঙ্গে কথা বলিতেছি, কিন্তু তাহার শেষ খুঁজিয়া পাই না। তোমার নামে কতই আশা, কতই ভরসা জাগিয়া উঠে। আমার মরা প্রাণে আশা-ভরসার বন্যা নামিয়া আসে। তোমার নামে মা! সুন্দর ও পবিত্র সঙ্গীতের শত অফুরন্ত উৎস খুলিয়া যায়, আর সেই সমস্ত গানের ঝরণা আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়—মনে হয়, সেই ঝরণায় ডুবিয়া মরিলেও যেন তোমারই কোলে শুইয়া থাকিব—তাহাতেও কি সুখ, কি আনন্দ, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে পারি না। তোমার নাম করিলে হৃদয়ে যে আনন্দের উদয় হয়, নিশার অবসানে অরুণোদয়ের আনন্দে তাহার আভাসমাত্র পাওয়া যায়। তোমার নামটীকে অবলম্বন করিয়া আমি যুগযুগান্তর ধরিয়া কোথায় যে চলিয়াছি তাহা জানি না। তোমার নামই আমার কৌস্তুভমণি। জন্মজন্মান্তর ধরিয়া তোমারই কোলে কত যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহা জানি না। মা! মা! আমি আর কিছুই চাহি না। জন্মজন্মান্তরে যে কোন জন্ম লাভ করি, তোমারই কোলে যেন শুইয়া সেই জন্ম লাভ করি, তোমাকেই যেন মা বলিয়া জানিতে পারি, নিত্যকাল যেন তোমাকেই মা বলিবার অধিকার লাভ করি। সম্মুখের সুদীর্ঘ পথ আমার কাছে সমস্তই অজানা। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি চলিয়াছি, আর চলিব—আমার কোনই ভয় নাই; ভয়ভাবনা আমাকে স্পর্শমাত্র করিতে পারিতেছে না। তোমাকে মা বলিয়া ডাকিবার জন্য ব্যাকুলতা আমার প্রাণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে বলিয়াই দুঃখবিপদকেও প্রাণের ভিতর বন্ধুরূপে বরণ করিয়া লই। আমার রসনা শত রসনা হইয়া মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকুক, আমার দুই বাহু তোমার দিকে বাড়াইয়া দিই, তুমি আমাকে কোলে তুলিয়া লও। তোমার হাসি আর আমার হাসি মধ্যপথে মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করুক।

৩৮। তুমি জ্ঞান ও ধ্যান।

মা! জন্ম অবধি তুমিই আমার জ্ঞান, তুমিই আমার ধ্যান। ভূমিষ্ঠ হইয়া যখন নয়ন খুলিলাম,

তখন তো তোমারই ঐ হাসি হাসি প্রসন্নমূর্ত্তি সর্ব্বপ্রথম নয়নের পথে আসিয়া দাঁড়াইল। মা! সেই অবধি তুমি যে কি স্নেহপ্রেমের ধারায় আমাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছ, তাহা আমি ছাড়া আর কে জানিবে? আমার সকল জ্ঞান ও সকল চিন্তার মধ্যে যেমন তুমিই একমাত্র উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতেছ, সেইরূপ মা! আমি ঠিক জানি, তোমারও সকল কার্য্যে সকল চিন্তার মধ্যে আমি উজ্জ্বল আকারে জাগিয়া আছি। আমি যেখানেই যাই, তোমার অনিমেষ নয়ন আমার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতে থাকে। পূর্ণিমা রাতে আকাশ যখন তোমারই হাসিতে ভরিয়া সুন্দর হইয়া উঠে, তখন তুমি আমাকে কোলে লইয়া ঐ চাঁদ দেখাইতে দেখাইতে তাহা হইতেই একটুকরো নামাইয়া আনিয়া আমার কপালে বিজয়তিলক পরাইয়া দাও। আমিও ঐ চাঁদের মুখে তোমারই প্রসন্ন মুখের সুবিমল প্রভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই— ঐ চাঁদের জ্যোৎস্নায় তোমারই মুখ দেখিতে থাকি—আমার মুখে একটী শব্দও বাহির হয় না। মনে হয়, কত যুগযুগান্তর ধরিয়া তোমারই কোলে কত জন্মই না জানি ধরিয়াছিলাম—কত যুগযুগান্তর ধরিয়া তোমারই কোলে জন্মগ্রহণ করিব। তোমার কোলে যেন চিরকাল ঐ শিশু হইয়া খেলা করি— সমস্ত ভয়ভাবনা হইতে আমাকে মুক্তি দাও। মা আমার! তুমি বড় সুন্দর, তুমি যে উপায়ে এমন সুন্দর হইয়াছ, আমার প্রাণের ভিতর অতি নীরব বাণীতে সেই উপায়গুলি বলিয়া দাও, যাহাতে আমিও দেহে মনে সুন্দর হইয়া তোমার সন্তানরূপে সংসারে ঘুরিতে ফিরিতে পারি। আমাকে বুকে লইয়া যে গান গাহিয়া আমার চোখ ঘুমে ঢাকিয়া দাও, সেই গান মা তুমি গাও— গাও—আমি তাহা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়ি—সংসারের সমস্ত ভাবনা ভুলিয়া যাই—কেবল দুই বাহু বাড়াইয়া তোমাকে জড়াইয়া ধরিয়া ঘুমাইয়া পড়ি। তোমার বক্ষের বেষ্টনে আমাকে নিত্য রক্ষা কর।

৪৯। শান্তি দাও।

মা! তুমি কোথায় আছ? এসো—নিকটে এসো। তোমার বিমল স্পর্শে আমার দেহ মন ও আত্মা সকলই বিশুদ্ধ হোক। মা! তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইও না। আমার জীবন আমি তোমার কাছেই পাইয়াছি। সেই জীবন আমি তোমারই চরণে নিবেদন করিয়া দিয়াছি। আমার এই ছোট্ট জীবনতরীখানি তোমারই নাম লইয়া এই ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল সংসারসাগরে ভাসাইয়া দিয়াছি। তাহার ঢেউয়ের ধাক্কায় আমি কিছুই সামলাইতে পারিতেছি না। মা! তুমি আমার এই জীবনের হালখানি আসিয়া ধর, আর ইহাকে নিরাপদে কূলে আনিয়া দাও। এমন কূলে তুলিয়া দিও, যেখানে কাঁটার বনে উঠিয়া ক্ষতবিক্ষত হইতে না হয়। এমন কূলে তুলিয়া দিও, যেখানে যখন ইচ্ছা তোমার কাছে যাইবার সরল পথ পাই। তোমার কাছে যাইবার পথে আমাকে আর যেন কোন বাধা পাইতে না হয়। মা! তোমার প্রসন্ন মুখের জ্যোতি আমার কাছে শত সূর্য্যের জ্যোতি অপেক্ষা অনেক বেশী। তোমার প্রসন্ন মুখের প্রভার নিকট শত পূর্ণচন্দ্রের সুধামাখা জ্যোৎস্নাও হার মানিয়া যায়। তোমার প্রসন্ন মুখের হাসি ভাবিলেও আমার বুকের ভিতর কত যে আনন্দ তোলপাড় খাইতে থাকে, তাহা বলিতে পারি না। যেদিন তুমি জন্ম দিয়াছ, সেইদিন অবধি আমার সমস্ত আশাভরসা তোমারই চরণে নিবেদন করিয়া দিয়াছি। এখন সেগুলিকে তোমার চরণে পৌঁছিবার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া লও। আমার যাহা কিছু, সমস্তই তুমি কাড়িয়া লইয়া নিজের করিয়া লও। এখানে যে প্রদীপ জ্বালাইয়া কাজকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা নিভাইয়া দাও, আর তোমার জ্যোতিতে সেই প্রদীপখানি জ্বালাইয়া দাও। আমার শত্রুমিত্র সমস্তই ঘুচাইয়া দাও। কেবল জানি তুমি আর আমি। আমার আর কেহই নাই, আমি আর কাহাকেও জানি না। মা! এই সংসারঅরণ্যের ভীষণ শ্বাপদগণের দাঁতমুখখিঁচানিকে আমি ভয় করি—তুমি আমাকে এখানে একা ফেলিয়া দূরে যাইও না। আমার প্রাণ আতঙ্কে কাঁদিয়া উঠিতেছে। সংসারভাবনা আমা হইতে কাড়িয়া লইয়া আমাকে শান্তি দাও।

৫০। আমায় পাগল কর।

মা! তোমার নামে আমায় পাগল করিয়া

দাও। তোমার ভালবাসায় আমায় সমস্ত সংসার ভুলিয়া যাইতে দাও; আবার আমার ভালবাসায় মা! তুমিও আপনাকে ভুলিয়া যাও। তাহা হইলেই আমরা দুইজনেই খুব সুখী হইতে পারিব—মাঝে আর কেহ ব্যবধানরূপে দাঁড়াইতে পারিবে না; আমাদের দুজনের মাঝে আর কোন কিছু অন্তরাল থাকিবে না। মা! তুমি আমার দুই বাহুতে আমায় জাপটাইয়া ধরিয়া আদর করিবে; আর আমি—আমার এই ক্ষুদ্র দুটী বাহু বাড়াইয়া তোমায় জাপটাইয়া ধরিবার চেষ্টা মাত্র করিব—পারি বা নাই পারি। তোমার চক্ষে আমি চক্ষু মিলাইয়া দিব, আর—আর তুমিও আমার চক্ষে তোমার চক্ষু মিলাইয়া দিবে। উহাতে যে কি সুখ, প্রাণের ভিতর কি যে আনন্দ পাওয়া যায়, যাহার জননী আছে, সে ছাড়া আর কেহই তাহা বুঝিতে পারিবে না। তোমার এই পাগল সন্তান যখন দুঃখে কাতর হইয়া তোমাকে ডাকিয়াছিল, অশ্রুবিন্দু যখন দুই গাল বহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়াছিল, তখন কি আশ্চর্য্য উপায়ে সেই অশ্রুবিন্দুসকল প্রেমের হার হইয়া তোমার চরণে গিয়া পড়িয়াছিল, আর তুমি আমার আকুলতা জানিয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার ভাঙ্গা প্রাণকে জোড়া লাগাইলে! মা! তোমাকে দেখিলে আমার চোখে ঘুম আর আসিতে চায় না—দিন হইতে রাত, আবার রাত হইতে দিন, কেবলই তোমারই পানে চাহিয়া থাকিতে প্রাণ চায়। তোমার নাম ভাল করিয়া গাহিতে আমায় শিখাও। আমি নিজেরই মনে দিনে রাতে অবিশ্রামে গাহিয়া চলিব। যাহার ইচ্ছা, সে পাগলের কাছে আসিয়া দুদণ্ড বসিবে, আর মায়ের নাম গান করিতে শিক্ষা করিবে। আমি কাহাকেও আর কোন কিছুই শিখাইতে পারিব না। তোমার নাম গান করিতে করিতে যাহাতে ঐ চরণতলে ঘুমাইয়া পড়িতে পারি, প্রভাতে উঠিয়া আবার তোমার প্রসন্ন মুখের হাসি দেখিতে পাই, সেই আশীর্ব্বাদ দাও।

ভগবদ্‌বিশ্বাস ও উপাসনার সাংসারিক উপকারিতা।

(শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবদ্‌বিশ্বাস ও উপাসনার আধ্যাত্মিক মূল্যের বিষয়ে অনেক লোকই অনেক কথা বলিয়াছেন; কিন্তু আমি আজ ভগবদ্‌বিশ্বাস ও উপাসনার সাংসারিক লাভালাভের কথা আলোচনা করিব। ঐ যে মুদী মুদীখানায় চাল্‌ডাল বিক্রয় করিতেছে, ঐ যে কুলী মস্তকে পর্ব্বতপ্রমাণ বোঝা বহিতেছে, ঐ যে কেরাণী কলম পিষিয়া অঙ্গুলি ক্ষয় করিতেছে, উহাদের ভগবদ্‌বিশ্বাস ও উপাসনার কোন প্রয়োজন আছে কি? আমরা এখন পরলোকের কথা ছাড়িয়া ভগবদ্‌বিশ্বাস ও উপাসনা দ্বারা সাংসারিক কি উপকার হওয়া সম্ভব, মাত্র তাহাই আলোচনা করিব। মুদীর কথাই ধরা যাউক। ধরা যাউক যে, পাশাপাশি দুইটি মুদীর দোকান আছে—একজন মুদী আস্তিক ও অন্যজন নাস্তিক। প্রথম ধরা যাউক যে দুই মুদীরই লাভ হইতেছে। নাস্তিক মুদীর লাভ হওয়ায় তাহার আনন্দ করিবার ইচ্ছা আসিতে পারে। তখন তাহার আনন্দের ধারণা মত নৃত্যগীত ভোজাদিতে অর্থব্যয় করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক; ফলে অমিতাচারের ফলস্বরূপ তাহার শরীর-মন দুর্ব্বল হইয়া অসুস্থ হওয়ায় তাহার সঞ্চিত অর্থ রোগমুক্তির জন্য ব্যয়িত হওয়াও সম্ভব। আবার অসুস্থ হওয়ায় তাহার দোকান পরিচালনায় বিশৃঙ্খলা আসিয়া আরও অর্থক্ষতির কারণ হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু আস্তিক মুদীর লাভ হওয়ায় সে আনন্দলাভার্থে হরিসংকীর্ত্তন দিতে পারে—সদ্‌গ্রন্থ ক্রয়পূর্ব্বক পাঠ করিতে পারে; এই সমস্ত সৎকার্য্যে শরীর-মন দুর্ব্বল হইবার পরিবর্ত্তে সবলই হয়—সে ভগবানের প্রসন্ন হস্ত দেখিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে স্বীয় কর্ম্মে নিমগ্ন হয়। তাহার মনে অসদিচ্ছা অসচ্চিন্তা স্থান না পাওয়ায় তাহার শরীর-মন দিন দিন উন্নত হইতে থাকে; ফলে দিন দিন তাহার যত্নের ফলে তাহার দোকানেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে।

এইবার ধরা যাউক যে দুই মুদীর কোন বিপৎপাত—যথা দোকানে ভীষণ ক্ষতি হইল। নাস্তিক মুদী বিপদে অধীর হইয়া উঠিবে—এমন কি উন্মাদও হইতে পারে; কিন্তু আস্তিক মুদী ভগবানের মঙ্গলময়ত্বে বিশ্বাস করে বলিয়াই এই বিপদেও ধৈর্য্য সহকারে তাঁহার মঙ্গল ইঙ্গিত বুঝিবার চেষ্টা করে ও নিজ বুদ্ধিমত তাহা বুঝিয়া পুনরায় উন্নতির চেষ্টা ও তৎসহ ভগবৎপ্রসাদ ভিক্ষা করে। মঙ্গল ইঙ্গিত বুঝিতে না পারিলেও সে অধীর হয় না, কিন্তু নিজেকে বুঝাইতে থাকে যে "না বুঝিলেও

ইহা কোন মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে"; এইরূপে ধৈর্য্য-সহকারে উন্নতির চেষ্টা করে। প্রত্যেক আস্তিক ও নাস্তিকের জীবনে একমাত্র বিশ্বাসের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের কারণে এতই প্রভেদ হয়। আস্তিকের পুত্রের রোগ হইলে নাস্তিকের পক্ষে ধীর মস্তিষ্কে রোগীর সেবা তত সম্ভব নহে, যত সম্ভব আস্তিকের পক্ষে; কারণ আস্তিক ভগবানে নির্ভর করিয়া ধৈর্যসহযোগে ভগবদ্-আদেশ বুঝিয়া যে যে চিকিৎসকের প্রয়োজন মনে করেন তাহাদের হাতে ও ভগবানের হাতে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন।

বৎসর কতক পূর্ব্বে সূর্য্যে কতিপয় কলঙ্ক চিহ্ন দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ প্রলয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এই প্রলয়ের বাণী কয়েকজনের মনে ভয়ের সঞ্চার করিলেও অধিকাংশ লোকই তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু মনে করা যাউক যে, যদি ঐ প্রলয়ের ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য হইত; যদি লোকে জানিতে পারে যে অমুক দিন প্রলয় অবশ্যম্ভাবী এবং উহা অতি নিকট-বর্ত্তী, পৃথিবীর প্রলয়ের দিন নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলে কে কিরূপ ব্যবহার করিবে তাহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর। নাস্তিক-দের মধ্যে কেহ কেহ প্রলয়ের নামে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিবেন, অন্য কতক নাস্তিক 'মরিয়া' হইয়া "হেসে খেলে নাও—দুদিন বই ত' নয়" নীতির অনুসরণ করিবেন; আবার আর এক শ্রেণীর ভাগ্যবাদী নাস্তিক "ভাগ্যে যাহা আছে তাহা হবে এ জগতে" বলিয়া শেষদিনের প্রতীক্ষায় থাকিবেন।

এতদ্ভিন্ন আর এক চতুর্থ শ্রেণীর নাস্তিক আছেন, যাঁহাদের মত "সবার উপরে মানুষ বড়, তার উপরে নাই"। মনুষ্যত্বধর্ম্মে বিশ্বাসী এই শ্রেণীর নাস্তিকগণ বলেন মানুষের যদি কোন ধর্ম্মের প্রয়োজন থাকে তাহা হইলে মনুষ্যত্বধর্ম্ম এবং ভবিষ্যৎ মনুষ্যজাতির উন্নতির চেষ্টা; এতদ্ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মেরই প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রলয়কালে যখন মনুষ্যজাতিই ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে, তখন আর মনুষ্যজাতির উন্নতি-চেষ্টার এই যে ধর্ম্মবাদ তাহাতে আর প্রয়োজন কি থাকিতে পারে? সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রলয়কালে মনুষ্যের শান্তি ও নিশ্চিন্ততালাভের জন্যও অন্ততঃ, ভগবানের মঙ্গলময়ত্বে ও পরলোকে বিশ্বাস প্রয়োজন।

কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র প্রলয় অর্থাৎ মৃত্যু আমাদের চক্ষুর সম্মুখে অহরহঃ ঘটিলেও মহাপ্রলয় কিছু নিত্যই ঘটিতেছে না; সুতরাং আমাদের দেখিতে হইবে যে আমাদের প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবনে অধ্যাত্ম-বিশ্বাসের কোন প্রয়োজন বা মূল্য আছে কি না, অধ্যাত্ম বিশ্বাস বলিতে আমি ভগবন্মঙ্গলত্বে ও পরলোকে বিশ্বাস বুঝিতেছি। সংসারের কষ্টিপাথরে অধ্যাত্ম বিশ্বাসের কোন মূল্য আমরা যদি দেখিতে পাই, তবেই তাহা লাভের চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, অন্যথা বেগার খাটিয়া লাভ কি? মহর্ষিগণ পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে, সাংসারিক উন্নতিলাভার্থেও এই বিশ্বাসের বিশেষ প্রয়োজন আছে। সাধারণ লোক যে উন্নতিলাভকে জীবনের সাফল্যলাভ হইল বলিয়া বিবেচনা করে, সেই সামান্য উন্নতিলাভার্থেও বিশ্বাসের বিশেষ প্রয়োজন আছে। উপরে সামান্য মুদীর উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এইস্থানে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করি। কোন্ গ্রামে একটিও মুদীখানা ছিল না। প্রায়ই দেখা যাইত যে, যে কোন মুদী মাসকতকের জন্য মুদীখানা চালাইয়াই তাহা বন্ধ করিতে বাধ্য হইত। এই সময়ে ভিন্নগ্রাম হইতে একটি মুদী আপনার সুবৃহৎ পরিবার লইয়া সেই গ্রামে মুদীখানা খুলিল। গ্রামের মোড়লগণ তাহাকে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী মুদীগণের দুর্দ্দশার কথা বলিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু দেখা গেল, তাহার দোকানের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিই হইতেছে। ইহার কারণ কি? সে যে খুব একজন পাকামুদী বা চালাকচতুর ছিল তাহা নহে। এই মুদীটির মৃত্যুর পর তাহার স্থান অপর এক মুদী অধিকার করিলেও সে বেশীদিন টিঁকিতে পারে নাই। এখন সেই মুদীখানা বন্ধ আছে। আজ পর্য্যন্ত অপর কেহই সেই গ্রামে মাসকতকের বেশী মুদীখানা চালাইতে পারে নাই।

ইহার কারণ কি? যে মুদীটি আজীবন ঐ গ্রামে দোকান চালাইতে পারিল, তাহার সাফল্যের হেতু কি? অন্যেরাই বা পারিল না কেন? ইহার কারণ প্রথমোক্ত মুদীর ধর্ম্মভাব, ভগবানে ও পরলোকে বিশ্বাস। খরিদ-দারেরা তাহার দোকানে আদর-যত্ন পাইত, খাঁটী জিনিষ পাইত; সে কাহারও একপয়সাও ক্ষতি করিত না, ফলে লোকের তাহার উপর বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। সে ভিক্ষুককে বিমুখ করিত না, লোকের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইত, শোকদুঃখে ভগবানের মঙ্গলভাব দেখাইয়া সান্ত্বনা দিত, পরলোকে মিলিত হইবার আশা দিত এই সকল কারণে লোকে তাহার দোকানে দুই দণ্ড বসিতে তাহার সহিত আলাপ করিতে ভালবাসিত, তাহার উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত।

তাহার মনের ভিতরে ভিতরে সর্ব্বদাই ভগবানের মঙ্গলময়ত্বে ও পরলোকে বিশ্বাস জাগ্রত থাকিত। তাহার ফলে সে সাংসারিক সুখসম্পদকেও যেমন প্রসন্নচিত্তে ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ করিত, দুঃখবিপদকেও

কোন মঙ্গলের জন্যই তাঁহারই প্রেরিত বলিয়া তেমনই প্রশান্তচিত্তে সহ্য করিত, ফলতঃ সে কিছুতেই আত্মহারা হইত না। অতিশয় দুঃখকষ্টের মধ্যেও ভগবানে ও পরলোকে বিশ্বাস তাহাকে কেন্দ্রচ্যুত হইতে দিত না; কারণ তাহার বিশ্বাস ছিল, এই জগতে যত দুঃখকষ্টই আসুক, সে যদি ধর্মপথে অবিচলিত থাকে তবে পরলোকে সুখ নিশ্চিত। শুধু তাহাই নহে, সে দুঃখবিপদে অধীর না হইয়া বরং তাহা হইতে শিক্ষালাভের চেষ্টা করিত; কারণ তাহার বিশ্বাস যে ভগবান মঙ্গলময় সুতরাং এই দুঃখবিপদও তিনি কোন মঙ্গলের জন্যই পাঠাইয়াছেন। অধীর হইবার পরিবর্ত্তে এই মঙ্গলটা কি সে তাহাই জানিবার চেষ্টা করিত। মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে ভীত ত হয়ই নাই, বরং পরলোকে যাইতেছে বলিয়া লোকে যেমন বিদেশ হইতে স্বদেশে যাইতে আনন্দ পায়, তদপেক্ষাও আনন্দিত হইয়াছিল। তাহার মত লোকই মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে—"ওহে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়,—ও-ভয়ে কম্পিত নয়, আমার হৃদয়"। এই লোকের ভগবানে ও পরলোকে বিশ্বাস সরাইয়া লও, তাহা হইলেই দেখিবে যে এই লোকের প্রশান্তভাবের মূল ভিত্তিই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; ফলে তাহার জীবনও আর পাঁচজন মুদীর মতই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। আর পাঁচজনের মতই সে সুবিধা পাইলেই খরিদ্দারকে প্রবঞ্চনা করিতে ইতস্ততঃ করে না এবং সুখ বা দুঃখ দ্বারা আর পাঁচজনের মতই সেও সম্পূর্ণ অভিভূত হইয়া পড়ে; ফলে দোকান খুলিলেও মাসকতকের মধ্যেই তাহাকেও দোকান গুটাইতেই হইবে সন্দেহ নাই।

নাস্তিক ও আস্তিক উভয়ের কার্য্যক্ষমতা একইরূপ হইলেও নাস্তিক অপেক্ষা আস্তিকের কার্য্য অধিকতর সুচারু হইবেই; কারণ নাস্তিক কার্য্য করে নিজের সুখের জন্য বা লোককে দেখাইবার জন্য; কাজেই লোকের দৃষ্টি এড়াইতে পারিলে সে প্রবঞ্চনাদিতে কুণ্ঠিত হয় না; কিন্তু আস্তিক মনে করে ভগবানের দৃষ্টি সর্ব্বত্র এবং ভগবানের প্রীতির জন্যই সে কাজ করিতেছে, সুতরাং সে প্রবঞ্চনাদির ইচ্ছা পর্য্যন্ত করিতে পারে না; কারণ তাহা হইলেই সে ভগবানের চক্ষুতে অপরাধী হইবে। ফলতঃ ভগবানের প্রীতির জন্য সে যথাশক্তি কার্য্যটি সুন্দরভাবে করিতে চেষ্টা করে। আস্তিক অপেক্ষা নাস্তিকের পাপে ডুবিবার এবং পাপের ফলে নানাবিধ রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা বেশী; কারণ নাস্তিক নিজের সুখকে বা রোগ ও লোকভয়কে বড় করিয়া দেখে; সুতরাং যেখানে লোকের জানিবার সম্ভাবনা নাই অথচ নিজের সুখ পাইবার সম্ভাবনা, সেরূপ স্থলে নাস্তিকের পক্ষে পাপের প্রলোভন সামলান খুবই দুঃসাধ্য; কিন্তু সেরূপ স্থলেও ভগবানের সর্ব্বতোদৃষ্টিতে ও অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকায় আস্তিক ভগবানের দৃষ্টি এড়াইবার উপায় নাই বলিয়া কোন লোক না থাকিলেও এবং সুখের অজস্র সম্ভাবনা সত্ত্বেও—এমন কি, পাপের ফলে যে রোগ সেই রোগপ্রতিষেধের উপায় জানা থাকিলেও, সেই পাপ প্রলোভনকে অনায়াসেই জয় করিতে পারে। কোন বিদেশী কারখানার মজুরদের কার্য্যশক্তি (effiency)র পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছিল, এই সমুদয় কারণে নাস্তিক মজুর অপেক্ষা আস্তিক মজুরদের কার্য্যশক্তি অধিক। নাস্তিক মজুরের কার্য্যশক্তি তাহার পারিবারিক সুখদুঃখের অনুপাতে হ্রাসবৃদ্ধি হয়। যেদিন তাহার গৃহে কোন সুখের কারণ উপস্থিত হয়, সেদিন সে স্ফূর্ত্তির সহিত সুন্দর কাজ করে; কিন্তু যেদিন কোন কারণে তাহার মন খারাপ থাকে, সেদিন তাহার কাজ খুবই খারাপ হয়; কারণ সেদিন সে যেমন-তেমনভাবে কাজ সারিতে পারিলে বাঁচে। কিন্তু আস্তিক মজুরের কাজ সবদিনই সুন্দররূপে হয়, কারণ পারিবারিক সুখদুঃখ তাহার উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; কারণ সে ভগবানের মঙ্গলময়ত্বে বিশ্বাস করে, ফলে সুখই হউক বা দুঃখই হউক, তাহার মন বিশেষ কিছু চঞ্চল হয় না। সে বিপদ কাটাইবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া ভগবানের উপর সব সঁপিয়া নিশ্চিন্তমনে কার্য্যে যায়। তদুপরি সে মনে করে ভগবান সমস্ত দেখিতেছেন; অতএব মনিবের কাজে শৈথিল্য করিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন, তজ্জন্য সে মন দিয়া সযত্নে কাজ করে। এই পরীক্ষার ফলে সেই কারখানা আস্তিক মজুরদের নাস্তিক মজুর অপেক্ষা অধিক বেতন দিয়াও রাখিত।

ফট্‌কার বাজারে তেজীমন্দীর কারবার চলিতেছে। বাজার ক্রমশই নামিয়া যাইতেছে। অনেক ক্ষুদ্র কারবারী সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে—বড় বড় ব্যাপারীদের মধ্যে অনেকে বেশ একটু ধাকা খাইয়াছে। ব্যাপারীদের প্রধানগণ মিলিত হইয়া নানা পরামর্শ করিতেছে, কিভাবে আবার বাজার উঠাইতে পারা যায়। এইরূপ গভীর সঙ্কটসময়ে প্রধানগণের একজন কিয়ৎক্ষণের জন্য এই দল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিজের নির্জ্জন কক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। অন্যান্য প্রধানগণ তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। "তাঁহার ঐ ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি যে পরামর্শ দিবেন সেইমত কাজ করিলেই এই বিপদে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে; কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে এইরূপ ভীষণ সঙ্কট উপস্থিত হইলেই তিনি ঐ ঘরে গিয়া দ্বাররুদ্ধ করেন; এবং কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর নিষ্ক্রান্ত হইয়া যে পরামর্শ প্রদান করেন, তদনুযায়ী কাজ করিলে প্রায়ই এইরূপ সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া সাফল্য

লাভ করা যায়। বোধ হয়, উপরের ঘরে গিয়া নির্জ্জনে তিনি শান্তভাবে চিন্তা করিতে পারেন।” ইহাই হইল অন্যান্য প্রধানগণের অভিমত।

প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু এই যে, নির্জ্জনে তিনি চিন্তা করিতে যান বটে কিন্তু সে চিন্তা সাধারণভাবে চিন্তা নহে। তিনি অতীব ধর্ম্মপরায়ণ এবং তিনি ব্যবসায়-ক্ষেত্রেও এই ধর্ম্মপরায়ণতা লইয়াই আসিয়াছেন; তিনি ধর্ম্মকে অবসর সময়ের কাজ মনে করেন না কিন্তু জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের প্রত্যেক কাজের সহায়ক মনে করেন। ঈশ্বরকে তিনি নিত্যসঙ্গী বলিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করেন; ইহার ফলে তিনি কর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইতেই কোনরূপ বিপদে পড়িলেই ভগবানের পরামর্শ লইয়া কাজ করেন; বিপদে পড়িলেই অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও তিনি বর্ত্তমান সাংসারিক অবস্থা ভুলিয়া গিয়া উপাসনার সাহায্যে ভগবানের সহিত যোগযুক্ত হইতেন এবং তাহার ফলে ভগবানের আশীর্ব্বাদ-ধারায় তাঁহার শরীর-মন স্নিগ্ধ হওয়ায় তিনি ভগবানের আদেশ মত ধীরমস্তিষ্কে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেন এবং নিজ বুদ্ধিমত ভগবানের আদেশ বুঝিয়া শান্তচিত্তে সেই পথে চলিতেন। তিনি কখনও জীবনে কোন কাজে বিফল হন নাই, ইহা তাঁহার গর্ব্বের তত কারণ ছিল না, যত ছিল এই যে, তিনি যে শক্তির সাহায্যে চিরকাল জয়লাভ করিয়া আসিতেছেন তাহা তিনি এমন এক উৎস হইতে পাইতেছেন, যে উৎস অনন্ত শক্তিময় এবং যে উৎস হইতে শক্তিপ্রার্থনায় তাঁহাকে আজ পর্য্যন্ত একবারও ব্যর্থ হইতে হয় নাই।

অতি বড় নাস্তিকও প্রার্থনার শক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না। যিনি প্রার্থনা করেন, তিনি যদি সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে না-ও বিশ্বাস করিতে পারেন যে ভগবান তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়া সম্পূর্ণরূপে তাহা পূর্ণ করিবেন, তথাপি প্রার্থনার ফলে ভগবানকে সহায় মনে করায় তাঁহার আত্মনির্ভরতা যে বহুপরিমাণে বৃদ্ধি পায় তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রার্থনার পূর্ব্বে তিনি যে উৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, ভগবান তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন নিশ্চয়—এই দৃঢ় বিশ্বাসের ফলে প্রার্থনার পরে তাঁহার উৎসাহ এবং কাজেই কার্য্যক্ষমতাও যে সহস্রগুণ বৃদ্ধি পায়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রার্থনার এইরূপ প্রত্যক্ষ উপকারিতার জন্যই বোধ হয় প্রার্থনা বিশ্বব্যাপী হইতে পারিয়াছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, প্রার্থনা যে শুধু মানুষের সখের বা খেয়ালের বস্তু তাহা নহে, কিন্তু জীবনের পূর্ণ সাফল্য লাভের জন্য তাহা একান্তই প্রয়োজনীয়। প্রার্থনার একটি বিশেষ ফল এই যে তাহা মানুষকে জীবনসংগ্রামে যুদ্ধ করিবার প্রচুর শক্তি প্রদান করে। কিন্তু ইহাও হইল প্রার্থনার নিতান্তই সামান্য ফল। প্রার্থনা ও ভগবদ্বিশ্বাস মানুষের ছোটখাটো কাজে খুবই সাহায্য করে, সন্দেহ নাই,—দোকানের উন্নতিতে সাহায্য করে, খাটিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, তেজীমন্দী কারবারে মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে সাহায্য করে, গৃহে রোগ হইলে ধীর মস্তিষ্কে রোগীর সেবাশুশ্রূষা করিতে সাহায্য করে; কিন্তু সময়ে সময়ে সংসারে প্রার্থনা আরও মহত্তর ফল প্রদর্শন করে। মানুষ যখন প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চাহে, মানুষ যখন আপনার প্রবৃত্তিস্রোতের গতিরোধ করিতে চাহে, অথচ পারে না—যখন বিরুদ্ধ শক্তির প্রবলস্রোত তাহাকে ডুবাইতে আসে কিন্তু সেই স্রোতের গতিরোধ মানুষের নিজ শক্তিতে কুলাইয়া উঠে না, সেই ভীষণ সঙ্কটকালে প্রার্থনার শক্তি ও সৌন্দর্য্য সুন্দরভাবে অনুভব করা যায়—তখনই প্রার্থনার শ্রেষ্ঠতম ফল দেখিতে পাওয়া যায়।

উত্তর মেরু আবিষ্কারক স্কটের জীবনী পাঠ কর। চতুর্দ্দিকে প্রকৃতির বিরুদ্ধ শক্তি তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, মৃত্যুর ছায়া চক্ষের উপর ঘনাইয়া আসিতেছে, সেই সময়েও ঈশ্বরবিশ্বাসী তাঁহার পত্নীকে লিখিতেছেন—“মহিমময় ভগবান্ আমাকে ডাকিতেছেন। আমিও আমি শান্তিতে চলিলাম।”

ব্যভিচারী পুত্র ঘৃণ্য আমোদে প্রমত্ত। ভক্তিমতী জননী বৎসরের পর বৎসর পুত্রের কল্যাণকামনায় প্রার্থনায় রত। বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া যাইতেছে; পুত্র ব্যভিচারে রত। অবিশ্বাসীগণ হাসিতেছে—“এই ত' উপাসনার ফল”। বহু বৎসর পরে অকস্মাৎ একদিন পুত্রের মতি ফিরিল। জগৎ এক ব্যভিচারীর পরিবর্ত্তে সেণ্ট অগষ্টিনকে লাভ করিল। এই হঠাৎ পরিবর্ত্তন কিরূপে সম্ভব হইল? অবিশ্বাসীগণ কোনই উত্তর দিতে পারিবেন না। বিশ্বাসীগণ বলিবেন, প্রার্থনার ফলে ভগবদ্‌আশীর্ব্বাদ এই পরিবর্ত্তন আনিয়াছে।

যুক্তরাজ্যের পেনিসিলভ্যানিয়ার প্রতিষ্ঠাতা কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত বিলিয়াম পেন জীবনে যত কাজ করিয়াছেন অত কাজের শক্তি তিনি কিরূপে পাইতেন ইহা জিজ্ঞাসা করায় পেনের কোন আত্মীয় প্রশ্নকর্ত্তাকে পেনের গৃহে লইয়া গিয়া দুইটি চিহ্ন দেখাইয়া বলেন “পেন যে কিরূপে এত কাজ করিতে পারিতেন, এই তাহার কারণ দেখুন”। প্রশ্নকর্ত্তা তাহার অর্থ বুঝিতে না পারিলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন “পেন প্রত্যেক কাজের আগে অবনতজানু হইয়া এই গৃহতলে এই স্থানে ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার জীবনব্যাপী জানুর ঘর্ষণে এই স্থান

খোদিত হইয়াছে। ভগবানের আরাধনাই তাঁহার কার্য্য-সিদ্ধির মূল।"

অতীতকালের ন্যায় বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও ভগবান প্রার্থনা শুনিয়া তাহার উত্তর দেন কিনা, ইহা পরীক্ষার জন্যই বিলাতের জর্জ মূলার অনাথ আশ্রম স্থাপন করেন এবং কাহারও নিকট ভিক্ষা না করিয়াও কেবলমাত্র ভগবচ্চরণে প্রার্থনা দ্বারাই তিনি চিরকাল ঐ অনাথ আশ্রম চালাইয়া আসিয়াছেন।

বিদেশী উদাহরণেই বা প্রয়োজন কি? আমাদের দেশেই কি উদাহরণের অভাব আছে? ভারতের বর্ত্তমান জাগরণের অন্যতম প্রধান নেতা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় শৈশবে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে বিভোর হইতেন। যৌবনে তিনি দ্বাবিংশতিবার পুরশ্চরণ করেন, প্রৌঢ়াবস্থায়ও ভগবানের নামজপ ও প্রচারই তাঁহার সম্বল হইয়াছিল; এবং তিনি অন্তিমেও প্রণবজপ করিতে করিতেই দেহত্যাগ করেন। রামমোহনের শক্তির, কার্য্যসাফল্যের মূল এই ভগবদারাধনা। রামমোহনের সহায়ক ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক—সাংসারিক উন্নতির শিখর-দেশে সমাসীন দ্বারকানাথ ঠাকুরেরও উন্নতির মূল-কারণ ভগবদারাধনা। তিনি যখন আরাধনায় বসিতেন তখন যে কেহই আসুক না কেন—কিবা সাহেব কিবা দেশীয় সকলকেই আরাধনা সমাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইত। সেকালের ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির কারণ আরাধনা। একালের ব্রাহ্মসমাজের পতনের কারণ উপাসনার অভাব। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, পণ্ডিত শিবনাথ, কর্ম্মবীর আনন্দমোহন এবং মহারাষ্ট্রের বিচারপতি রাণাডে প্রভৃতি সেকালের ব্রাহ্মগণ সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ইঁহারা সকলেই নিয়মিত উপাসনা করিতেন। সেকালের কথা ছাড়িয়া দিলেও একালেও যাঁহারা সাংসারিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন উহাও তাঁহাদের প্রার্থনারই ফল। মহাত্মা গান্ধীর সাফল্যের মূল যে প্রার্থনা ও গভীর ঈশ্বরবিশ্বাস তাহা তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই পরিচয় পাওয়া যায়। সাংসারিক খ্যাতিপ্রতিপত্তির দিক দিয়া দেখিতে গেলে বর্ত্তমানকালে লর্ড সিংহের মত কেহই জীবনে সাফল্য লাভ করেন নাই। তিনি নিয়মিত উপাসনা করিতেন। এইরূপে অধিকাংশ ব্যক্তির সাংসারিক উন্নতির কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, তাহা হয় তাঁহার আপনার আরাধনার ফল অথবা পারিবারিক উপাসনা ও ধর্ম্মশিক্ষার ফল। ফলতঃ ধর্ম্ম পারত্রিক কি ঐহিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতির সর্ব্বপ্রধান সহায়। এই সত্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজে ঘোষিত হইয়াছে যে "একস্য তস্যৈবোপাসনয়া ঐহিকং পারত্রিকঞ্চ শুভম্ভবতি"। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, খুব নিম্নদিক দিয়া দেখিলেও—সম্পূর্ণ সংসারের দিক দিয়া দেখিলেও ভগবদ্‌বিশ্বাস ও উপাসনার বিশেষ প্রয়োজন আছে।*

অমিতাভ।

(২)

(৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য)

আশা কি? না বর্ত্তমান হতে ছিটকে সামনের দিকে, কল্পিত ব'লেই শব্দের দিকে মনের দৌড়িয়ে যাওয়া ভিন্ন ত আর কিছুই নয়। স্মৃতি কি? সামনের দিকে এগিয়ে না গিয়ে মনের পিছনের দিকে ফিরে চাওয়া। মানুষ অষ্টাঙ্গমার্গে পা ফেলে অগ্রসর হয় না বলেই, তার মনে কুশলভাব উদ্ভূত হয় না; রিপুর অধীন মনে কেবল তৃষ্ণাই নানা রূপে বর্ণে রঙীণ হয়ে ওঠে; সেজন্য সাধনার অনেক সময়ে আনন্দ পায় না, যদিও মনে করে আনন্দ লাভ করা যেতে পারে। এইরূপে স্মৃতির ও আশার মায়া-পুরীতে শব্দজগতেই থাকতে চায়, তার বাহিরে আসতে সাহস করে না—ভয় করে; তার বাহিরে ত কোন সত্য বস্তু নেই,—সবই শূন্য। এ চেষ্টায় রসলোলুপতা থাকলেও—রসানুভূতি কখনো কখনো প্রগাঢ় হলেও, চিরন্তন শান্তি ও আনন্দ পাবার উপায় ইহা কখনই নয়। দুঃখ কি? 'খ'এর অর্থাৎ আকাশের—চিদাকাশের মলিনতা-যুক্ত হওয়াই দুঃখ। এ মলিনতা থেকে মুক্ত হওয়া আর চিদাকাশের স্বাভাবিক জ্ঞান প্রীতি ও আনন্দ প্রকাশ হতে দেওয়া একই কথা। উপনিষদও এই কথা বলেন। শ্রেষ্ঠ উপনিষদগুলিতে ভক্তির চেয়ে জ্ঞানকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। একটা উপমা দেবার প্রলোভন সামলাতে পারচি না। বাঙ্গালার সমতল-ক্ষেত্রের চেয়ে দার্জ্জিলিং পাহাড় উচ্চতর এবং সেখানকার বায়ু বিশুদ্ধতর, আকাশও স্বচ্ছতর—প্রাণ-মনকে সজীব করে; কিন্তু গৌরীশঙ্করের শৃঙ্গ তার চেয়ে উচ্চতম। সেইরূপ ইন্দ্রিয়জ সুখদুঃখ নিয়ে যে জীবন যাপন করে, তার চেয়ে মনসিজ-রসের লোলুপ হয়ে যে সকল কবি প্রকৃতির কাননে কাননে ভ্রমণ করেন, তাঁদের সুখদুঃখ শ্রেষ্ঠতর সন্দেহ নেই; কিন্তু তাঁদের এই সুখদুঃখ সূক্ষ্ম ভাবময় শরীরের হলেও, তারও চেয়ে সূক্ষ্মতম শ্রেষ্ঠতম আনন্দ আছে এবং যাঁরা সকল সময়েই কুশলভাবে তন্ময় হয়ে থাকেন, তাঁরাই তাহা লাভ করতে পারেন। ইহাই সত্য মুক্তি। দার্জ্জিলিং পাহাড় থেকে যেমন গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ দেখা যায় মাত্র, স্মৃতি ও আশার রাগে অনুরঞ্জিত কবিগণও

---

* গত ৫ই কার্ত্তিক বুধবার সায়ংকালে আদিব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে বিবৃত।

সেইরূপ শব্দজগৎ হতে আনন্দ ও মুক্তি দূর থেকে দেখেন মাত্র। উপনিষদের কবিগণ দূর থেকে আনন্দ দেখেছিলেন মাত্র; তা যদি না হ'ত তাহলে অবাঙ্মনসোগোচর আত্মা সম্বন্ধে এত অনুসন্ধিৎসা উপনিষদে স্থান পেত না।* কোন বস্তু লাভ করবার পর ত তার সম্বন্ধে আর কোন কিছু অন্বেষণ করবার থাকে না। উপনিষদের কবিগণ দূর থেকে যে ব্রহ্মনির্ব্বাণ দেখেছিলেন, সম্যক্‌-সম্বুদ্ধ তাহা লাভ করেছিলেন এবং তাহাতেই তন্ময় ছিলেন। এইজন্যই আমরা মুনীন্দ্র বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার জ্ঞান করি। স্মৃতির এবং আশার দিকে মনকে ছুটে যেতে না দিয়ে চিৎশক্তির, মননশীলতার একই কেন্দ্রে, ক্ষণিক সংস্কারে, কেন্দ্রীভূত আলোকপাত করা যে কি কঠোর তপস্যা, সাধকমাত্রেই তাহা জানেন,—বিশেষতঃ ইহা যখন ভাবরসাত্মক ভক্তিমার্গ নহে, শুষ্ক জ্ঞানমার্গ। ভাবরসাত্মক স্মৃতি এবং আশা যতদিন মনের উপর আধিপত্য করে, ততদিন এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় কিনা সন্দেহ। উপনিষদের কবিগণ এক-একখানি উপনিষদে—শব্দজগতে যার সম্ভাবনা দেখেছিলেন, মুনীন্দ্রের জীবনে তা সত্য হয়েছিল; তাই তিনি ওসম্বন্ধে কোনো কিছু বলবার আছে, প্রয়োজন মনে করেন নি। তিনি কবিও ছিলেন না, দার্শনিকও ছিলেন না; সম্যক্‌-সম্বুদ্ধ হবার জন্যই পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কবির কিম্বা দার্শনিকের স্থান তাঁর এক ধাপ নীচে।

আমরা কবি কিম্বা দার্শনিক হয়েও বাস্তব-জীবনে করি কি?

> হাতের বাহিরে যাহা, চাহি চাহি তাই ধরিতে;
> হাতের মুঠায় যাহা ফেলে দিই তাই ধূলিতে।

এর পরিণাম কি হয়?

> পিয়াসে মগন হই দিবানিশি
> আপনার মনে কত কাঁদি হাসি,
> কত ধরণের কত ছায়া আসি
> মন ভুলাইয়া রাখে মায়াতে।
> স্মৃতির আশার মরীচিকা আশে
> ছায়া হতে ছুটি ছায়াতে॥

দুঃখ ত তৃষ্ণা হতেই। একবার দুঃখের বৈরাগ্য অবলম্বন করে যে শান্তি—আনন্দ না পেয়েছে, তাকে তামসিকভাবে আচ্ছন্ন জড় প্রস্তরখণ্ডের মতই মনে হয়। জড় প্রস্তরখণ্ডের মত চিরকাল একই অবস্থায় থাকা মননশীল জীবের ধর্ম্ম নয়। নির্ব্বাণলাভ ও জড়ত্বলাভ একই অবস্থা—এ রকম অনেকেই বিশ্বাস করেন। আমরা দুঃখী হই—আকাশ মলিনতাযুক্ত হয়; কিন্তু এমনই মায়া যে একরূপে দুঃখী হয়ে আমরা আর একরূপে সুখী হবার আশা করে তদনুরূপ চেষ্টা করি; ভাবি, 'আপনার কায়া সীমায় ধরিতে পাব'। এইরূপে দিনের পর দিন যায়।

'যতদিন যায় উজ্জ্বল রাগে মোহিনী ততই টানে;' আমরা বিশ্বাস করতে চাই না যে আশা আমারই ছায়া, স্মৃতি আমারই ছায়া। মাঝে মাঝে যে একথা মনে পড়ে না, তা নয়।

> একি শুধু ভুল? মিথ্যা? ছায়া? মিথ্যা জীবন-মায়া।
> এই ছায়া মাঝে নাহি নাহি কোন চির সত্যেরই কায়া?

এর একটা কৈফিয়ৎও আমরা দিই—

> কোথা নদী রবে তবু তবু স্রোতে বহিয়া যদি না আসে?
> আপনার কায়া কোথায় পাইব ছায়ায় যদি না ভাসে?

অর্থাৎ দুঃখ পাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই,—এ রকম সান্ত্বনায় মন শান্ত করবার চেষ্টা করি; আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবতে থাকি অতীতের কথা, যাহা নানা পুরাণে গীত হয়েছে। বর্ত্তমানকে প্রত্যক্ষ করতে আমাদের সাহসে কুলায় না। যা এক সময়ে আমাদের সুখী করেছিল, তা স্মরণ করে সুখী হতে চাই; কিন্তু এ তৃষ্ণা কি রকম? না প্রিয়জনের শবের পাশে বসে তাকে জাগাবার জন্যে বার বার তার গা-নাড়া দেওয়া যে রকম, সেই রকম। সে ত গা-নাড়া পেয়েও চোখ খুলে চায় না, তাই দুঃখের উপর দুঃখ পাই। পুরাণ কথা মাঝে মাঝে আলোচনায় মনে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হয় সত্য, কিন্তু বর্ত্তমানকে কিছুতেই দেখব না পণ করে যখন-তখন পুরাণ কথা আলোচনা করলে মননশীলতার উন্নতি হয় না। আমার তৃষ্ণা আমাকে অশান্ত করতে পারে, কিন্তু মৃত অতীতকে প্রাণবন্ত করতে পারে না; তাই ঐরূপ চেষ্টায় দুঃখ পাই। আবার কখন সুখের আশায় ভবিষ্যতের পানে চাই, মরুভূমিতে পথিকের মরীচিকা আশে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার ন্যায়; এবং এর পরিণামও দুঃখ। অতীতের লয় হয় যে ক্ষণে, সে বর্ত্তমানে; তার সামীপ্যলাভ করলে ত কোনো তৃষ্ণা থাকে না। তার পরিণাম মহাভিক্ষু নাগসেন মিলিন্দ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হওয়াতে বলেছিলেন, "মহারাজ, ধ্যানলীনতার বহুগুণ। সমস্ত তথাগতই ধ্যানলীন হইয়া সর্ব্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন; তাঁহারা ধ্যানলীনতার সুকৃতগুণ স্মরণ করিয়া তাহা সেবন করিয়া থাকেন।" তারপর অষ্টাবিংশতি গুণের উল্লেখ করতে করতে বলেছিলেন "ধ্যানলীনতা অপ্রীতি খণ্ডন করে ও প্রীতি উপস্থাপিত করে; ভয় অপনীত করে, চিত্তকে একাগ্র করে, মনকে স্নেহযুক্ত করে, আনন্দ উৎপাদন করে, সাধককে নমস্য করিয়া দেয়, প্রীতিতে লইয়া যায়, প্রমোদ সম্পাদন করে, ভৌতিক পদার্থসমূহের স্বভাব দেখাইয়া দেয়; সংসারে জন্মগ্রহণকে বিনষ্ট করে ও সমগ্র শ্রমণতা অর্পণ করে।"

---

* এসম্বন্ধে অধিকতর: আলোচনা যায়া কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া হঠাৎ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ সঙ্গত নহে। তং সং

দ্বিজ-কবিগণের ওঁকার-গীতা উপলব্ধিতে দেখা যায় যে মুমুক্ষু আত্মাকে লাভ করলে এই সকল ফলই পান। শাক্যসিংহ আর্য্যাবর্ত্তের দ্বিজসভ্যতারই অন্তর্গত হয়েও তার সীমা অতিক্রম ক'রে লক্ষজগতেরও পরপারের বস্তু লাভ করে বিশ্বমানবের, বিশ্বজগতের হয়েছিলেন। কিসে? প্রীতিতে। কাল জীবগণকে মহামোহ-কটাহে সূর্য্যের অগ্নিতে, রাত্রি ও দিবার ইন্ধনে, মাস ও ঋতুর পরিঘট্টনের দ্বারা পাক করছে, এই যে সৃষ্টি সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বজনবিদিত বার্ত্তা,—অমিতাভে দেখা যায়, তিনি এই সৃষ্টিকে অন্তর দিয়ে বলছেন, "আলো পেয়েছি,—এবং এ আলো কেবল আমার মনেরই অন্ধকার যে নাশ করবে ও করেছে, তা নয়,—বিশ্বের সকল জীবকে অভয় দেবে"; এই প্রীতিধারার উৎস-মুখ দেখতে পাই তাঁর ধ্যানলীনতায়। সুজাতার পায়সান্নে পরিতৃপ্ত হওয়াতে যে প্রীতি—জীবের প্রতি করুণা,আলোর ন্যায় তাঁহার চিদাকাশে প্রকাশ হয়েছিল, সেই প্রীতিতে, সেই করুণায় তাঁর মন সেইক্ষণের জন্যই সে তন্ময় হয়েছিল তা নয়, সেই 'সম্যা' সমাধি থেকে তাঁর মন আর 'তন্হা'য় (তৃষ্ণায়) বিক্ষিপ্ত এক ক্ষণের জন্যও হয় নি—কোনো সিদ্ধ পুরুষের মনই হয় না। আমাদের সকল সময়ই স্মরণ রাখতে হবে যে, সিদ্ধার্থ কোনো দর্শনশাস্ত্রের সূত্র কিম্বা গোটা দর্শনশাস্ত্র নন, তিনি একজন সত্য ঐতিহাসিক মানুষ। প্রীতিতে সকল সময়ই সমাধিস্থ থাকার দরুণ পাপ ও পাপীকে জয় করবার যে উপায় তিনি অবলম্বন করেছিলেন, সেই উপায়টী আমাদের মনে হয় তাঁরই মনে প্রথম প্রকাশ হয়েছিল; সে উপায়টী হচ্চে অস্ত্রের বাহুবলের দ্বারা দুর্জ্জনকে সংহার না করে, তারই মনের মধ্যে নিজের মনকে জানবার আলো জ্বেলে দেওয়া। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ Kant এর Apperception ইহা ভিন্ন অন্য কিছু কি? এইখানে দ্বিজ-সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত বানপ্রস্থাবলম্বী সন্ন্যাসীগণ হইতে তথাগত স্বতন্ত্র। 'অক্রোধ' সন্ন্যাসীগণের ধর্ম্মের একটী লক্ষণ বটে, কিন্তু অস্ত্রধারী নৃপতির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকার আবশ্যকতা আর্য্য বেদজ্ঞ সন্ন্যাসী স্বীকার করতেন,—যদিও তিনি স্ব-হস্তে অস্ত্রধারণ করতেন না। গীতায় শ্রীভগবানও ঘোষণা করেছেন "কালোঽস্মি লোক-ক্ষয়কৃৎ..."। কপিলাবস্তু ত্যাগের পর এবং নির্ব্বাণলাভ করবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সিদ্ধার্থ যে কঠোর তপস্যা করেছিলেন, তাতে তাঁর দেহ হতে রক্তমাংসের পশুত্ব—হিংসার সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে গেছল। তার পর তিনি যে 'তনু' লাভ করেছিলেন, তাকে আমরা 'ভাগবতী তনু' বলতে পারি। গীতা হতেই জানতে পারি বহুপতিতে এক দিব্য প্রীতিময় ভাব থাকলেও যে মূর্ত্তি দেখে অর্জ্জুন সন্ত্রাসিত হয়েছিল, সেই "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ"এর ভাবও একেবারে অসম্ভব হয়ে ওঠে নি। শ্রীভগবানে কোনোরূপ হিংস্রতা থাকতে পারে না সত্য, কিন্তু তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রীতি ও অর্জ্জুনের সহিত সখ্যতাও থাকতে পারে না। কিন্তু আমরা দেখি তথাগতে কোন বিশেষ মানবের সহিত এক বিশেষ সখ্যতা ছিল না; পরে দেখব যে সখ্যেরও প্রতি তিনি মমতাশূন্য ছিলেন।

বেদ অবলম্বন করে যে দ্বিজসমাজ তখন সাধন-ভজন করতেন, তাঁরা ভক্তিমার্গাবলম্বী হয়েও মুনীন্দ্রকে কি চোখে দেখেছিলেন, যিনি বেদকে অবলম্বন করে সাধন করবার কোন প্রয়োজনই স্বীকার করেন নি এবং শুষ্ক-জ্ঞানপন্থী ছিলেন। আমাদের অনেক সময়ে মনে হয়েছে আরনল্ড সাহেবের Light of Asia, কিম্বা তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে যে সকল কবি তথাগত সম্বন্ধে কাব্য লিখেছেন, তাঁরা জ্ঞানপন্থীকে নানা ভাবে ও রসে আন্দোলিতরূপে দেখিয়েছেন বলেই তথাগতের সত্যস্বরূপ পরিবর্ত্তিত করে পাঠকের সামনে ধরেছেন। ইংরাজীতে যাকে বলে abandonment to feelings and emotions তথাগতে ঐ ভাবরসের স্রোতে গা-ভাসান দেওয়া থাকলেও, তাদের আলোর আহ্বানই তাঁর প্রকৃতিতে প্রধান ছিল; এবং এই নূতনত্ব থাকার দরুণ ভাব-প্রধান দ্বিজ-বৈদিকসমাজ তাঁর চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেছিল। এই শান্তস্নিগ্ধ প্রীতিকোমল সিদ্ধ পুরুষকে কোন বেদজ্ঞই হিংসার চোখে দেখেন নি,—তথাগতের শিশুপাল ছিল না। তা যদি থাকত, তাহলে সেই শিশুপাল তাঁকে ছলে বলে কৌশলে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করত; কিন্তু তা হয়নি, কেননা বিশেষ কোন একটা ভাবের প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা তিনি কখন করেন নি,—তিনি কাহাকেও বলেন নাই যে "আমারই ভক্ত হও"। আত্ম-প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টাই শত্রু সৃষ্টি ক'রে; কিন্তু যদি জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকেই বলা হয় "তুমিই তোমার তিমিরনাশন দীপ হও" তাহলে ত কেহই শত্রুতা করতে চায় না; বরং ভিতর থেকে 'দুঃখ'রূপ পাপ হতে মুক্তি পাবার স্বাভাবিক উপায় সে নিজের জ্ঞানের আলোতেই আবিষ্কার ক'রে, সে সত্যই একা—স্বাবলম্বী হয়। মানুষের মন ত নিয়তই তাকে জিজ্ঞাসা করচে "শান্তি কোথায়?" যাগযজ্ঞ কেন? অধ্যয়ন-অধ্যাপনাই বা কেন? মৃত্যুর অতীত অবস্থা লাভ করতেই না? যাগযজ্ঞে ত সে অবস্থা লাভ করা যায় না, তবে কিছুক্ষণের জন্য স্বর্গে বাস করবার অধিকার হয় মাত্র। সেখান থেকে পুনরায় মর্ত্ত্যে নামতে হয়। দেবগণকেও ত

অসুরগণের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। তাহলে তাহা ত পরম ধাম হতে পারে না। যাঁর মধ্যে তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়েছে, তাঁকে দেখলে দেবগণও আনন্দ পান— মানুষ ত দূরের কথা। সেইজন্য আর্য্যাবর্ত্তের মনীষিগণ তথাগতের অস্থির একটু সামান্য অংশও দাবী করেছিলেন এবং তারই উপর স্তূপসকল নির্ম্মিত হয়েছিল।

তবে কি তথাগত এখন অতীতের ইতিহাসের এক অধ্যায়মাত্রই হয়ে আছেন? কোনো সিদ্ধপুরুষের সাধনাই পুরাতন হয় না। কেন না তাঁরা চির-বর্ত্তমানের। তাঁদের সকলেরই মধ্যে দেখা যায় অষ্টাঙ্গ-মার্গে পা-ফেলে অগ্রসর হওয়াতে মনে ক্ষণের পর ক্ষণে কুশলভাবই উদ্ভূত হয়। এক সময়ে আর্য্যগণ অনার্য্যদের আবাসভূমি বাহুবলে অধিকার করে যেমন রাজ্য-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবার তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়েছিল, আজ য়ুরোপের শক্তিশালী নেশনগুলি দুর্ব্বল মানবসমাজকে গ্রাস করবার তৃষ্ণায় তেমনই জড়তার রসাতল হতে জেগে উঠেছে। এঁরাও ভাবপ্রধান ধর্ম্মের চেয়ে শুষ্ক বিজ্ঞানকেই অবলম্বন করেছেন, কিন্তু এঁদের বিজ্ঞানে আর তথাগতের বিজ্ঞানে আকাশ-মর্ত্তের পার্থক্য থাকার দরুণ বৈজ্ঞানিকগণের মনও শান্তিলাভ করতে সমর্থ হয় নি। কেন? য়ুরোপের বিজ্ঞানের প্রভাবে আমরা পিছন ফিরে কারণ জানতে চাই, সামনে চেয়ে পরিণাম জানতে ব্যাকুল হই; কিন্তু বর্ত্তমানকে যথাযথরূপে জানতে সত্যই ইচ্ছুক কি না, এ রকম একটা সন্দেহ মনে থেকে যায়। আর্টেও দেখতে পাই বর্ত্তমানকে প্রত্যক্ষ করার চেয়ে স্মৃতি ও আশার প্রভাবই প্রবল। তথাগত এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধটা এতদূর দেখেছিলেন যে তার বাহিরে সূর্য্যচন্দ্রের ত দূরের কথা, বিজ্ঞানও যে যেতে পারে না প্রচার করতেন। কিন্তু তাঁর বিজ্ঞানে যেতকেশ প্রথার দৌরাত্ম্য কিংবা নব নব theoryর কুজ্‌ঝটিকা দেখা যায় না। এসম্বন্ধে "মহানিদানসূত্র" হতে আমরা জানতে পারি, সে বিজ্ঞানে অতীতের স্মৃতির কিংবা ভবিষ্যতের নব নব আশার স্থান নেই; ক্ষণিক সংস্কার সম্বন্ধে সচেতন হওয়াই সব। সেই জন্য তথাগত-বিজ্ঞানে "সমথ" এবং "বিপস্সনা" মানুষ লাভ করতে পারে। "সমথে"র ফল রাগ-বিরাগ হতে প্রজ্ঞার বিমুক্তি; "বিপস্সনার" ফল অবিদ্যারাগ হতে প্রজ্ঞার বিমুক্তি। বিদ্যা কি? যার দ্বারা সমস্ত বিষয়ে প্রবেশ করতে পারা যায়। অর্থাৎ সমস্ত বিষয়কে যথাযথরূপে জানতে পারা যায়। "যথাযথ"রূপে,—আমার মনগড়া theoryর সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য কোন একটা ঘটনার ল্যাজামুড়া বাদ দিয়ে অবচ্ছেদ করে নয় কিংবা যেতকেশ প্রথার প্রকাবে পঙ্গু করে নয়। এ বিজ্ঞান য়ুরোপে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ছিল না, ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে মনোজগৎ, জড়জগৎ, গার্হস্থ্যজীবন, সমাজ-জীবন, বৈজ্ঞানিকগণ গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন বলেই শান্তি, সামর্থ্য, বিপস্সনা য়ুরোপখণ্ড করতে সমর্থ হয়নি।

কিন্তু এখনকার মনীষীদিগের অন্তরে এই প্রশ্ন উঠেছে যে, ঘটনাটী—বর্ত্তমানের ক্ষণিক লহমাটী যদি যথাযথরূপে জানা না গেল, তাহলে সে সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান কি লাভ করলাম? ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে দেখা যায়, দর্শনের সাহিত্যের জড়জগতের ইতিহাস লেখবার আকাঙ্ক্ষা কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণকে অস্থিরই করে তুলেছিল; এজন্য তাঁরা নানা দেশ থেকে নানা কালের তথ্য-সংগ্রহও অশ্রান্ত চেষ্টায় করেছিলেন। তাঁদের এ তৃষ্ণা হেয় বা নিষ্ফল হয়েছে বলতে পারি না; কিন্তু দর্শনেরই হউক, সাহিত্যেরই হউক, ভূস্তরেরই হউক কিংবা protoplasmএরই হউক,—স্মৃতি ও আশায় ঘটনা আচ্ছন্ন হলে তার অন্তর্নিগূঢ় সত্য মানুষ জানবে কি করে? সে ত বিদ্যা নয়, অবিদ্যা; এবং অবিদ্যা হতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হতেই দুঃখ। রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ উপভোগ করবার তৃষ্ণা হতেও যেমন দুঃখ জন্মে, মনের ভাব-ভাবনার প্রতি তৃষ্ণা হতেও দুঃখ সেই রকম জন্মে। বর্ত্তমানকে প্রত্যক্ষ না করা পর্য্যন্ত অন্তরে তৃষ্ণা থাকবেই থাকবে। আর্টিষ্টগণ, বৈজ্ঞানিকগণ জগদ্বিখ্যাত হয়েও শান্তি পান নি, এখনো পাচ্ছেন না; কেহ কেহ বিজ্ঞানের দিকে পিছন ফিরে সত্য অন্বেষণ করছেন, কেহ বা বিজ্ঞানকে এখনও ধরে আছেন। আমাদের দেশের সাধকগণের মধ্যে একটা উপলব্ধি আছে "অস্তি" "ভাতি" "প্রিয়"। আমি তাতে দেখতে পাই তথাগতের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হিংসা-বর্জ্জিত, আনন্দময় ও প্রীতিময়; কিন্তু আজ য়ুরোপের বিজ্ঞান হিংস্র Nationalismএর আশ্রয়েই পরিপুষ্ট। সেইজন্য য়ুরোপীয় Nationalistকে দেখলে আজ পৃথিবীর লোকেরা ভয় পায়; খেচর, জলচর জীবেরাও সন্ত্রস্ত হতে আরম্ভ করেছে; কেন না, এখন যুদ্ধ জলে এবং আকাশেও হচ্ছে।

জরামৃত্যুর গ্রাস হতে স্বয়ং উদ্ধার পাবার জন্য এবং জীবকে উদ্ধার করবার জন্য সিদ্ধার্থ যেমন একদা একা ভোগসুখের কপিলাবস্তু ত্যাগ করেছিলেন, আজ পৃথিবীর মনীষীগণের মধ্যে আবার সাড়া পড়েছে তেমনি একা বেরিয়ে পড়বার সমথের, বিপস্সনার সন্ধানে। যে প্রথার প্রতি আসক্তি মননশীলতা সংহার করে, সে আসক্তি ত্যাগ না করলে, কেবল প্রথাই ত্যাগ করলে সমথ এবং বিপস্সনা লাভ হবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই স্বাধীন হতে হবে, গতানুগতিক হওয়া জীবনের উদ্দেশ্য নয়;

জীবন ক্ষণে ক্ষণে নব নব লহরীতেই প্রকাশ হচ্ছে, জড়েরই সত্য অস্তিত্ব আছে জীবন্ত জগতে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না; এবং প্রত্যেক লহরী একা ও পূর্ণ। এই একাকীত্ব এই পূর্ণতা লাভ করবার জন্যই যারা সমিতি গঠন করে সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তাদের সেই একাকীত্বলাভ কখনই হয় না। সমিতি, সঙ্ঘ উপাদান সংগ্রহ করতে পারে মাত্র—অনুকূল অবস্থা পাইয়ে দিতে পারে মাত্র, কিন্তু মানুষকে সত্য সাধক করতে পারে না—একাকীত্বে অটলপ্রতিষ্ঠ করতে পারে না। সঙ্ঘের উপকারিতা ঐ পর্য্যন্ত।

আর্য্যাবর্ত্তে মনে হয়, শাক্যসিংহের মত এমন একা আর কেহই হন নি। তিনিই প্রথম একা হওয়ার পথ দেখিয়েছিলেন। তিনি যে কেবল কপিলাবস্তুর উপর যুবরাজের অধিকারই ত্যাগ করেছিলেন তা নয়, আর্য্যাবর্ত্তের সংস্কৃত ভাষায় ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞানসম্পদের উপরও অধিকার তিনি আর্য্য হয়েও ত্যাগ করেছিলেন; এবং যতদিন আমাদের চলতি ভাষায় তিনি জীবিত ছিলেন, সংস্কৃত ভাষার শব্দৈশ্বর্য্যের পানে লোভদৃষ্টিতে না চেয়ে যে সম্পদ স্বয়ং অর্জ্জন করেছিলেন, তাহাই সর্ব্বভূতহিতে রত হয়ে সাধারণ মানুষ যে পালিভাষা বুঝ্‌ত, সেই ভাষাতেই তাঁর নিজের সাধনালব্ধ সম্পদ দান করেছিলেন। বিশ্বসভ্যতায় সম্যক্‌সম্বুদ্ধের প্রভাবের যদি কোন অর্থ থাকে, তা হলে উহা এই যে, একাকীত্বে অটলপ্রতিষ্ঠ হয়ে মনের মধ্যে উদ্ভূত কুশলভাবে ধ্যানলীন হয়ে সর্ব্বভূতহিতে রত হওয়া। লোকহিতের জন্য অনেকেই অনেকরূপ দান পূর্ব্বেও করেছেন, এখনও করছেন; কিন্তু দ্বিজসমাজের সন্ন্যাসীও যেমন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এখনকার দিনের দাতাগণও সেইরূপ হয় কোনো ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কিংবা কোনো stateএর অন্তর্ভুক্ত হয়েই দান করেন। আন্তর্জ্জাতিক স্বার্থও দানবীরদের মনকে দানে প্রবৃত্ত করায়। এ ত একা হওয়ার আনন্দ হতেই আত্মদান নয়। আজকের দিনের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, সমাজ, য়ুনিভার্সিটি শোণিতসমুদ্রের ফেনিল তরঙ্গলীলার উপর একএকটী দ্বীপের ন্যায় ভাস্‌চে। যন্ত্রের হাতে দুর্ব্বলের ন্যায় আত্মসমর্পণ করতে মানুষকে বাধ্য হওয়াতে তার আত্মসম্মান ত বাড়চে না। এতে তার তৃষ্ণাই বাড়চে। পৃথিবীর সব মাটি বাজেয়াপ্ত করব, সকল লোককে আমার ধর্ম্মে দীক্ষিত করব, সকল সচেতন প্রাণীকে আমার অনুসরণ করতে বাধ্য করব—স্বাতন্ত্র্য আর কোথাও রাখ্‌ব না, কাহাকেও একা হতে, সত্যমুখী হতে দেব না; তাকে কথা কহাব—অবশ্য আমার মনোমত কথাই তাকে কহিতে দিব—এই যে তৃষ্ণা,—এতে ত সম্ভ্রম ও বিপজ্জনকতা নেই।

যেদিন কপিলাবস্তুর যুবরাজ ধীরে ধীরে সূতিকাগারে প্রবেশ করে কুসুমশয্যায় শয়ানা আলুলায়িত-কুন্তলা গোপাকে নবজাত শিশুকে বুকে নিয়ে নিদ্রা যেতে দেখেও তাঁর মনে জ্যোতির ন্যায় বিকাশ হয়েছিল "সে শান্তি,—সে নির্ব্বাণ কোথায়, যেখানে জরা-মরণ নেই?" যেদিন অতীতের সকল স্মৃতি আর তাঁকে বেঁধে রাখ্‌তে সমর্থ হয় নি, যেদিন তিনি কপিলাবস্তুর এবং আর্য্যাবর্ত্তের অর্জ্জিত সম্পদ ত্যাগ করে একা হলেন,—আর যেদিন নিরঞ্জনা-তীরে নির্ব্বাণ লাভ করলেন,—এই যে মাঝের ছয় বৎসর—এই সময়কার একাকীত্বের গভীরতা এবং দৃঢ়তা কি আমরা কল্পনা করতে পারি? নব সাধনপ্রণালী দেশদেশান্তরে প্রচার হওয়াতে যখন বহুলোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন, যখন সঙ্ঘ গড়ে উঠ্‌ল, তখনও তিনি একাকীত্বে অটল-প্রতিষ্ঠ, ধ্যানলীন। বিশ্বমৈত্রীর অমিত আভায় তাঁর চিত্ত উদ্ভাসিত। তাঁরই সৃষ্ট সঙ্ঘ তাঁকে বাঁধতে সমর্থ হয় নি, যেমন আর্য্যাবর্ত্তের বর্ণাশ্রমধর্ম্মও পারে নি। সঙ্ঘের উন্নতি সম্বন্ধে আনন্দকে তিনি যাহা বলেছিলেন, তাহাই উদ্ধৃত করে আজকের আলোচনা সমাপ্ত করব "তোমরা প্রত্যেকেই তোমার তিমিরনাশন দীপ হও, তোমরা প্রত্যেকেই তোমারই আশ্রয় হও; কোনো বাহিরের আশ্রয়ের শরণাপন্ন হইও না; যে সত্য দীপের মত উদ্ভাসিত হয়, সেই সত্যকেই দৃঢ় ধরে থাক,—আশ্রয়-স্থানরূপে দৃঢ় ধরে থাক; তোমার বাহিরে যা কিছু আছে, তাকে আশ্রয়দাতা জ্ঞান কোরো না।"

এমন একা, সত্যপ্রতিষ্ঠ অমিতাভের জন্মভূমি ভারতবর্ষ নয়, এঁর সত্য জন্মভূমি আনন্দলোকে।

সাহিত্য ও আদিরস।

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

[পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যাকে আদিরসই সাহিত্যের মূলমন্ত্র নয় এই বিষয়ে একখানি পত্র লিখিয়াছেন; সেই পত্রখানি আমরা সাদরে প্রকাশ করিলাম। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম অবধি আজ পর্য্যন্ত এই সত্যের প্রকাশ করিয়াছেন এবং সবলে ঘোষণা করিতেছেন। আজ কয়েক বৎসর যাবৎ এক সম্প্রদায়ের যুবকেরা বঙ্গসাহিত্যকে আদিরসপ্রধান করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য আড়েহাতে লাগিয়া গিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি যে সঞ্জীবনী এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই প্রধানত ইহার তীব্র ও সবল প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন। সুখের বিষয় ভগবানের কৃপায় এই প্রতিবাদের ফলে বর্ত্তমান সাহিত্যে আদিরসের পরিবর্ত্তে মঙ্গল ভাবের হাওয়া পুনরায় বহিতে সুরু করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত পত্রখানি বঙ্গের তরুণসম্প্রদায়ের আদিরসের

প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ বিদূরিত করিবে এবং সাহিত্যকে পুনরায় মঙ্গলভাবে গড়িয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিবে বলিয়া আশা করি। তঃ সং]

কল্যাণীয়েষু—

সাহিত্যের মূলতত্ত্ব কি সে সম্বন্ধে আমার মত ব্যাখ্যা করে আমি ইংরাজীতে একটা বক্তৃতা লিখেছি। অল্প কথায় বলা যায় না। এই বক্তৃতা প্রকাশ হলে আমার মত জানতে পারবে। সাহিত্য যে শ্রেণীর কাজ, সেই শ্রেণীর কাজ মানুষের আরো কতকগুলি আছে—যেমন চিত্রকলা।

আদিম গুহাবাসী মানুষ তার গুহার ভিত্তিতে ছবি এঁকে আনন্দ পেয়েছে—কেউ এঁকেচে হরিণ কেউ এঁকেচে মহিষ—এই ছবি আঁকার মধ্যে তারা যে আনন্দ পেয়েচে সে কি আদিরস? আমাদের দেশে সামমন্ত্রগানে সঙ্গীতের আদিমমূর্ত্তি দেখা দিয়েছিল, সে কি আদিরসের মূর্ত্তি?

মনের মধ্যে উৎসাহ বোধ করলে শিশুরা সম্ভবতঃ নাচতে থাকে—নৃত্যকলার এই হচ্চে প্রথম প্রকাশ—কিন্তু এ কি আদিরসের উৎসাহ? আদিরসের স্থান সাহিত্যে নেই একথা কেউ বলেনা; কিন্তু আদিরসই সাহিত্যের মূল উৎস একথা যে বলে সে সাহিত্যের মর্ম্মকথা জানে না। ব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলা হয়, তিনি স্বাভাবিক আনন্দ থেকে সৃষ্টি করেন; সৃষ্টির এই আনন্দকে কোন্ সংজ্ঞা অনুসারে আদিরস বলা যায়? প্রাণলোকে একদা স্ত্রী-পুরুষ ভেদ ছিল না, তখন এক জীব আপনাকেই বিভক্ত করে বংশবিস্তার করেচে, সৃষ্টির এই প্রণালীর মধ্যে আদিরস কোথায়? অথচ নিজেকে বহুলীকৃত করার মধ্যে নিশ্চয়ই আনন্দ আছে; সে আনন্দ সৃষ্টির আনন্দ—তাকে কি আদিরস-কীর্ত্তনীয়া আদিরসের কোঠার ফেলতে পারেন? ইতি ৯ই শ্রাবণ, ১৩৩৬।

"রামায়ণের কথা" সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

বৌদ্ধ জাতক-গ্রন্থপাঠে বীরেশ্বর বাবুর এইরূপ নিশ্চিত ধারণা হইয়াছে যে সীতা রামচন্দ্রের ভগিনী।* আমরা বলি, কেবলমাত্র জাতক-গ্রন্থকে নবাবিষ্কৃত সত্যের ভাণ্ডার এরূপ মনে করিয়া পূর্ব্বসংস্কারকে বিদায় দিলে চলিবে না। জৈনগণ বিশেষতঃ বৌদ্ধগণ নানাভাবে হিন্দুর আদর্শকে ও হিন্দুর শাস্ত্রোক্ত কাহিনীকে নিজ নিজ গ্রন্থে ম্লান ও বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। পরস্পরের মধ্যে বৈরীভাব ও অশ্রদ্ধার ভাব যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল, প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে তাহার নিদর্শন মিলে। জাতক-গ্রন্থের কাহিনীর সঙ্গে আবার জৈন-কাহিনীর মিল নাই, একেবারেই বিভিন্ন।

সীতা যে রামের ভগিনী নহেন এবং জাতকের উক্তি যে অশ্রদ্ধেয়, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমরা জৈন পদ্মপুরাণ হইতে রাম ও সীতার কাহিনী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। জাতক যদি প্রামাণ্য বলিয়া লেখকের ধারণা হয়, তবে উহার সমসাময়িক জৈনগ্রন্থ অপ্রামাণ্য হইবে কেন? জৈন-রামায়ণে আছে,—"একদিন মহারাজ দশরথ সভায় বসিয়া আছেন; এমন সময় মহর্ষি নারদ আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি ভ্রমণ করিতে করিতে লঙ্কায় রাবণের সভায় গিয়াছিলাম। সেখানে রাবণ এক জ্যোতিষীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কারণে আমার মৃত্যু হইবে?" জ্যোতিষী উত্তরে বলিলেন, রাজা দশরথের পুত্র ও রাজা জনকের কন্যা হইতে তোমার মৃত্যু ঘটিবে। বিভীষণ রাবণকে বলিলেন, আপনার চিন্তিত হইবার কারণ নাই; পুত্র বা কন্যা জন্মিবার পূর্ব্বেই আমি দশরথ ও জনকের শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিব। বিভীষণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি ত সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, এই দুই রাজার খবর কিছু বলিতে পারেন? আমি বলিয়া আসিয়াছি যে সত্বর ঐ দুই রাজার সংবাদ সংগ্রহ করিয়া বলিয়া যাইব। মহারাজ, আপনি কিছুদিন ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া দেশান্তরে যান। বিভীষণ আপনাকে বধ করিতে নিশ্চয় আসিবেন। আমি জনকের নিকট এই খবর দিবার জন্য চলিলাম। এই বলিয়া মহর্ষি নারদ দ্রুতবেগে বিদেহের রাজধানী মিথিলায় উপস্থিত হইলেন এবং জনককেও ঐরূপে সাবধান করিয়া দিলেন। তখন উভয়ের মন্ত্রীগণ উভয়কে ছদ্মবেশ ধারণ করাইয়া দেশান্তরে পাঠাইলেন, এবং দুই জনেরই দুই কৃত্রিম মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সভায় রাখিয়া দেওয়া হইল। এ বিষয় অন্য কেহ ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিল না। তাহার পর বিভীষণ অযোধ্যায় ও মিথিলায় গমন করিয়া দুই রাজারই প্রতিমূর্ত্তির মাথা কাটিয়া ফেলিলেন, এবং সেই দুইটি মাথা রাবণের নিকট লইয়া গিয়া দেখাইলেন। এই গর্হিত কার্য্য করায় বিভীষণের মনে অনুতাপ জন্মিল এবং তিনি প্রায়শ্চিত্তের জন্য জিন-মন্দিরে গমন করিয়া যথোচিত পূজার অনুষ্ঠান করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ভবিষ্যতে কখনও এরূপ মহাপুরুষ-ঘাতক পাপকার্য্য করিবেন না।

---

* গত আশ্বিন-সংখ্যায় "রামায়ণের কথা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এদিকে রাজা দশরথ ও জনক দুইজনে দিগ্বিজয় ভ্রমণ করিতে করিতে উত্তর-দিগ্‌বিভাগে 'কৌতুকমঙ্গল' নামক নগরে উপস্থিত হইলেন। এইখানে শুভমতি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কৈকেয়ী নামে এক অতি সুন্দরী কন্যা ছিল। রাজা দশরথ ও জনক ঐ কন্যার স্বয়ংবরসভায় দীন ও ছদ্মবেশে উপস্থিত হইলেন। কৈকেয়ী দশরথের গলায় বরমাল্য অর্পণ করিলেন। পরে তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্যে গমন করিলেন। কালক্রমে দশরথের চারি রাণীর গর্ভে চারিটী সুন্দর পুত্র জন্মিল। কৌশল্যার গর্ভে রাম, সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত ও সুপ্রভার (সুমিত্রা নহে) গর্ভে শত্রুঘ্ন।

বৈতাঢ্য পর্ব্বতের দক্ষিণে ও কৈলাস পর্ব্বতের উত্তরে যে সকল দেশ আছে তাহাদের মধ্যে এক দেশে সংযমী মূর্খ ম্লেচ্ছগণ বাস করিত। আন্তরঙ্গ নামক জনৈক ম্লেচ্ছ রাজা লুণ্ঠন করিতে করিতে জনক রাজার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাকে দুর্দ্ধর্ষ বুঝিয়া জনক ম্লেচ্ছ রাজার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রামলক্ষ্মণকে পাঠাইবার অনুরোধ করিয়া দশরথের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। রামলক্ষ্মণ আসিয়া ম্লেচ্ছ রাজাকে পরাভূত করিয়া দেওয়ায় রাজা জনক নিশ্চিন্ত হইলেন এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ রামচন্দ্রের সহিত নিজ কন্যা সীতার বিবাহ দেওয়ার সংকল্প মনে মনে স্থির করিয়া দশরথের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন।

উক্ত জৈন-পদ্মপুরাণে পরে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ আছে যে, সীতা রাজা জনকের স্ত্রী বিদেহার গর্ভজাতা। ঐ কন্যা জন্মিবার পূর্ব্বে তাঁহার একটি পুত্রও হইয়াছিল। ঐ অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে জনক তাহার নাম রাখিয়াছিলেন সীতা। চন্দ্রগতি নামে এক রাজা জনকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পুত্র ভামণ্ডলের সহিত সীতার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। উত্তরে জনক বলিলেন যে, ম্লেচ্ছগণ আমার রাজ্য আক্রমণ করিলে রামচন্দ্র তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া আমার রাজ্য রক্ষা করিয়াছেন; সেজন্য রামচন্দ্রের সহিত সীতার বিবাহ সম্বন্ধ আমি ইতিপূর্ব্বেই স্থির করিয়া ফেলিয়াছি। তথাপি চন্দ্রগতি রাজা জনককে নানারূপে বুঝাইতে লাগিলেন; কিন্তু জনক তাহাতে কর্ণপাত না করায় রাজা চন্দ্রগতির মন্ত্রী বলিলেন, আমাদের এখানে বজ্রাবর্ত্ত ও সাগরাবর্ত্ত নামক দুইখানি ধনুক আছে; যদি রামচন্দ্র ঐ ধনুকে গুণ পরাইতে সমর্থ হন তাহা হইলে সীতার সহিত রামের বিবাহে আপত্তি নাই। অন্যথায় ভামণ্ডলের সহিত উহার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইবে।

রাজা জনক এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। নানা দেশের রাজা ও রাজকুমারকে নিমন্ত্রণ করা হইল। রামচন্দ্র সকলের সমক্ষে ঐ ধনুকে গুণ পরাইলেন এবং সীতা রামচন্দ্রের গলায় বরমাল্য দিলেন। জৈন পদ্মপুরাণে জৈন-ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করিবার জন্য বলা হইয়াছে যে, দশরথ ও জনক উভয়েই জৈনধর্ম্মানুরাগী ছিলেন; এবং তাঁহারা জিনোক্ত দেবের পূজা করিয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে আছে যে "হস্তী দ্বারা তাড়িত হইলেও নিজ জীবনরক্ষার্থ জৈনমন্দিরে প্রবেশ করিবে না"; পরস্পরের মধ্যে এইরূপ বিরোধের সম্বন্ধ থাকিলেও জৈন-রামায়ণ সীতাকে রামের ভগিনী বলিতে সাহসী হন নাই।

'কারণ্ডব্যূহ' বৌদ্ধদিগের একখানি অতিপ্রামাণ্য সূত্রগ্রন্থ। এই গ্রন্থে তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে কিভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়াছেন, তাহার সংক্ষেপ পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল। কারণ্ডব্যূহের দশমপ্রকরণে আছে,—"বলী রাজা ভগবান মহাসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের পাদদ্বয়ে প্রণিপাত পূর্ব্বক রত্নের পীঠক (পিঁড়ি) প্রদান করত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, ভগবন্! অস্মদাদির ত্রাতা হও, আমাদিগকে ধর্ম্মপথ দেখাও, যাহাতে পুনরায় বন্ধন-দুঃখ ভোগ করিতে না হয়। আমি বারত্রয় পৃথিবী একচ্ছত্রা করিয়াছিলাম, পরে যজ্ঞ করিয়া পাত্রে দান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমি ক্ষত্রিয়ভার্য্যাগণের স্বামীসকলকে নিগড়-বন্ধনে বদ্ধ করিয়া তাম্রগুহাতে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই বদ্ধ গুহার মধ্যে পঞ্চ পাণ্ডব প্রভৃতি ছিলেন। সেই ক্ষত্রিয়গণের বক্ষে শিলার্পণপূর্ব্বক শৃঙ্খল দ্বারা তাহাদের হস্তপদ বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। সেই কারাগারের সাতটি দ্বার ছিল। সেই সময়ে অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ দশরথপুত্র এইস্থানে আগমন করেন। তিনি ঐ কারাগারের দ্বারে স্থাপিত সপ্ত পর্ব্বতই উৎপাটন করিলেন এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্ষত্রিয়গণকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির, সহদেব, ভীমসেন, অর্জ্জুন ও কৌরবগণের সহিত সমস্ত রাজগণ সেই সরল শব্দ শ্রবণ করিয়া আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দশরথপুত্র তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা জীবিত না মৃত?" তাঁহারা উত্তরে বলিলেন "আমরা জীবিত"। তখন তিনি সকলের বন্ধন ছেদন করিয়া দিলেন; এবং তাঁহারা নিজ নিজ রাজধানীতে চলিয়া গেলেন। এদিকে দশরথপুত্র অকস্মাৎ বামনরূপ ধারণ পূর্ব্বক মৃগাজিনের উত্তরীয় ধারণ করিলেন।" ইত্যাদি।

উক্ত গ্রন্থের "অবলোকিতেশ্বরাগমন" নামক নবম প্রকরণে আছে,—"দেবপুত্র মহেশ্বর অবলোকিতেশ্বরের পদদ্বয়ে পতিত হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। অবলোকিতেশ্বর বলিলেন, কুলপুত্র! নূতন সৃষ্টিতে তুমি

ভস্মেশ্বর নামক পূজনীয় তথাগত হইবে। অনন্তর উমা-দেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অবলোকিতেশ্বরের পদদ্বয়ে পতিতা হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। অবলোকিতেশ্বর বলিলেন, তুমি রাজা হিমবানের ভগিনী হইতেছ। আগামী জন্মে উমেশ্বর নামক পূজনীয় তথাগত হইবে; এবং সেই পর্ব্বতরাজের দক্ষিণ পার্শ্বে তোমার আবাসস্থান হইবে। ইহা শ্রবণে উমা দেবীও সম্যক্-জ্ঞান লাভ করিলেন।"

এখানে উমা দেবীকে চিত্রিত দেখি,—হিমালয়ের কন্যা নহে, কিন্তু ভগিনীরূপে। এরূপ ক্ষেত্রে সীতা যে রামচন্দ্রের ভগিনী বলিয়া জাতকগ্রন্থে বর্ণিত হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! জৈনগ্রন্থে বা বৌদ্ধগ্রন্থে উভত্রই দেখিতে পাই যে ঐ দুই ধর্ম্মের গৌরব প্রচার করিবার জন্য কি রামচন্দ্র, কি বলিরাজা, কি মহেশ্বর, কি উমা—সকলকেই ঐ ঐ ধর্ম্মের অনুরাগী ও আস্থাবান বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। আরও বিচিত্র এই, পাণ্ডব ও কৌরবগণকে দশরথপুত্র রামচন্দ্রের সমসাময়িক রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে! ব্যাপকভাবে সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনা না করিলে প্রকৃত মীমাংসাতে পৌঁছান যায় না, একথা বলা বাহুল্য।

বীরেশ্বর বাবু তাঁহার প্রস্তাবে অনেক অবান্তর কথার উল্লেখ করিয়াছেন; তাহার প্রত্যেকটীর উত্তর দিতে গেলে আমাদের এই প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া যায়, এই ভয়ে তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। মহাভারতের কোন কোন অংশে যে পরস্পরবিরোধী কথা আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। উহা বিভিন্ন হস্তের লেখা ও প্রক্ষিপ্ত। বীরেশ্বর বাবু রামায়ণে ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাব দেখিয়াছেন। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে রামায়ণ মুখ্যভাবে একখানি কাব্য, গৌণভাবে ইতিহাস। সঠিক ভৌগোলিক জ্ঞান দিবার জন্য উহা রচিত হয় নাই। সীতার বনবাস প্রভৃতি উত্তরকাণ্ডের অন্তর্গত। ঐ অংশ বাল্মীকির রচিত নহে এবং উহা মূল রামায়ণে পরবর্ত্তী সময়ে সংযোজিত হইয়াছে। উক্ত উত্তরকাণ্ডের লেখক তাঁহার রুচিমত উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা হইলেও উহার ভিতরেও পাঠ করিবার ও চিন্তা করিবার যথেষ্ট উপকরণ আছে। রামায়ণ একখানি কাব্যগ্রন্থ। উহাকে কাব্যের দৃষ্টিতে না দেখিয়া এবং তদানীন্তন প্রচলিত আচারাদির উপর অযথা কটাক্ষ করিয়া উহার নির্ম্মম সমালোচনা সমীচীন মনে করি না।

পরিশেষে সীতা যে 'অযোনিসম্ভবা' এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে যাঁহারা দেবচরিত্র লইয়া অবতীর্ণ হন, লোকে তাঁহাদের সমুজ্জ্বল চরিত্র দেখিয়া আপনা হইতেই বলিয়া উঠে যে কোন পার্থিব নরনারীর মিলনে তাঁহাদের উদ্ভব হয় নাই। পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহাদের সম্বন্ধে নানা কাহিনীর সৃষ্টি হইয়া ক্রমে উহা বিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাই পাশ্চাত্য ভূমিখণ্ডেও লোকের বিশ্বাস বহুদিন হইতে দৃঢ় হইয়া রহিয়াছে যে যীশুখৃষ্ট কুমারীর গর্ভজাত। মানুষের ঔরসে তাঁহার জন্ম হইলে তাঁহার জীবন এত সমুচ্চ হইত না। সীতার অযোনিসম্ভবা পরিচয়ও তাঁহার ভাস্বর চরিত্র হেতু এইরূপে কল্পিত ও আরোপিত। কেবলমাত্র সীতাকে কেন, পঞ্চকন্যার মধ্যে অন্যতমা দ্রৌপদীকেও অযোনিসম্ভবা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উল্লেখ আছে যে, দ্রৌপদী "যজ্ঞকুণ্ড-সমুদ্ভবা" যজ্ঞকুণ্ড হইতে তাঁহার উদ্ভব। আমাদের মনে হয়, সীতা-শব্দের 'লাঙ্গলপদ্ধতি' অর্থাৎ 'লাঙ্গলের দাগ' এই অর্থটির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই কবির উর্ব্বর মস্তিষ্ক সীতার উৎপত্তি লাঙ্গলপদ্ধতি হইতে এরূপ কল্পনা করিয়াছে। প্রথমে নামের সঙ্গে নামীর অর্থগত ঐক্য থাকে না। পরবর্ত্তী জীবনে কীর্ত্তিলাভ করিলে উহা কল্পিত হয়।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য যে সমালোচকের দৃষ্টিতে মহাকাব্য পাঠ করিলে চলিবে না; তাহাতে কাব্যের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার অক্ষমতা আসিয়া পড়ে। মহাকাব্য বলিয়া পরিচিত হোমারের ওডিসিতে অনৈসর্গিক কাহিনীর যথেষ্ট সমাবেশ আছে। তাহার ভিতরে ভৌগোলিক প্রকৃত তত্ত্ব বাহির করিবার চেষ্টা, বা স্থান-সকলের ভৌগোলিক আপেক্ষিক দূরত্ব নিরূপণের প্রচেষ্টা, বা ইতিহাসের মূল সত্য বাহির করিবার আয়াস নিতান্ত অসমীচীন। কাব্যকে কাব্যের দৃষ্টিতে পড়িতে হইবে ও তাহার রস গ্রহণ করিতে হইবে। বীরেশ্বর বাবু এই বৃদ্ধ বয়সেও পাঠরত, ইহাতে আমরা সন্তোষ লাভ করিলাম। কেবলমাত্র জাতকের উপর নির্ভর করিতে গিয়া কিন্তু তাঁহাকে দিশাহারা হইতে হইয়াছে। পরিশেষে আমরা ইহাও বলিতে চাই যে, রামায়ণ হইতে ইতিহাস ও ভূগোলের যতটুকু উপাদান পাওয়া যায় তাহাতেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে। সে সময়কার আচার-বিচার, রাজধর্ম্ম ও প্রজাপ্রীতির উন্নত আদর্শই আমাদিগের গ্রহণীয়।

বীরেশ্বর বাবু তাঁহার প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে রামচন্দ্রের পক্ষে বনগমনরূপ পিতৃসত্য সম্যক্‌ভাবে প্রতিপালিত হয় নাই। আমরা রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ১২১তম সর্গের বর্ণনায় দেখি, রাজা দশরথ স্বর্গ হইতে বিমানযোগে মর্ত্ত্যে আসিয়াছেন। দশরথ রামকে ক্রোড়ে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন,—"এক্ষণে তুমি অনুরক্ত ভরতের সহিত গিয়া মিলিত হও, আমি ইহা দেখিতে ইচ্ছা করি। তুমি আমার প্রীতিকামনায় লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত নির্দ্দিষ্ট বনবাস-

কাল অতিক্রম করিলে। তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল। অতঃপর রাজা হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘজীবী হও। রাম কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, পিতঃ! আপনি কৈকেয়ী ও ভরতের প্রতি প্রসন্ন হউন। 'পুত্রের সহিত তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম' এই বলিয়া আপনি কৈকেয়ীকে যে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে ক্ষমা করুন। রাজা দশরথ রামের বাক্যে সম্মত হইলেন।"

ইহার উপর বীরেশ্বর বাবু আর কি বলিতে চান? *

THE BRAHMA SAMAJ

UNDER *DEVENDRANATH THAKUR.*

CHAPTER II.

(2)

9. Radha Prasad Roy, and his want of interest in the Brahma Samaj.

It was at this juncture that the management of the *Samaj* naturally devolved upon Radha Prasad Roy, the eldest son of the Raja, and the third nominee of the trust deed, a man thoroughly versed in the Persian, Arabic, Hindustani, Bengali, Sanskrit and English languages, and like his father conversant with the laws and regulations of his country, qualifications which had enabled him to fill many important situations in Mufusil courts, and procured him the title of *chhota Dewanji*, or young Dewan for ever afterwards. In the histories of the *Samaj* Radha Prasad is represented as more actuated by motives of final piety in the preservation of his father's institution, than any real regard or admiration for the religion which it taught. During his stay in Calcutta, from the departure of his father to England until his death, he did his utmost to maintain the *Samaj* on its former footing : but he was obliged to proceed to Delhi, to obtain the monies due to his father from the ex-Emperor, who adroitly detained him, to the detriment of his father's estates and to the injury of the *Samaj*. On his return, however, he ceased to take that active interest in the *Samaj* which he formerly had done, a circumstance which has led Devendranath Thakur to doubt the sincerity of his *Brahmic* faith. Here, however, it should be mentioned, in vindication of Radha Prasad, that his acquaintances affirm that it was not so much a want of faith in the religion of their father on the part of the pure hearted Radha Prasad and the more worldly-minded Rama Prasad, his younger brother, as a want of means, which prevented them from taking an active part in the furtherance of the *Samaj* after their father's death. They were left involved in debt by their father, who had spent his last rupee in the cause of reformation, had mortgaged his zemindary, and had been forced by pressing need to accept employment in the service of the ex Emperor of Delhi, and to proceed to a foreign country at the eve of his life. The same cause drove the sons also from their home; the one far off to Delhi, where he was not befriended by a better fortune, and the other to a Deputy Collectorship in the Muffusil. It was not until long after that Rama Prasad rose to eminence at the bar of the Sudder Court, and amassed a vast fortune which he left in the possession of his immediate heirs. He was ultimately created, for the first time in the case of a native, a Judge of that court, but was unfortunately prevented from enjoying the dignity, by to his premature and sudden death. At this point of his prosperity he could have proved very serviceable to the *Samaj*, had not the *Samaj* then been under the protection and patronage of the pious and opulent Devendranath Thakur than whom a better patron could not be found, and with whom he was diffident to share the honors of a divided patronage.

10. Dwarkanath Thakur becomes chief Supporter of the Samaj.

Let us now turn to the period when Radha Prasad had left the *Samaj*, to see who among the numerous friends of his late Father, came forward to offer their support and help. Dwarkanath Thakur was at this time the chief supporter of the *Samaj*, whose monthly expenses he reimbursed by a payment of Rs 80, as well as meeting all other expenses, such as the yearly distribution of charities to Pandits and others. It

---

* কাব্য ও ইতিহাস হিসাবে রামায়ণ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে। গ্রাহক ও পাঠকবর্গের অপ্রীতিকর হইবার আশঙ্কায় আমরা এই বিষয়ক আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখিতে মনস্থ করিয়াছি। বৈশিষ্টপূর্ণ কোন প্রবন্ধ হস্তগত হইলে তাহাই প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। তঃ, সং

was also at this time, the end of the Saka year 1754 (1832 A. D.,) that the firm of Messrs. Mackintosh & Co., the Treasurers of the *Samaj*, began to show signs of insolvency, and Dwarkanath Thakur had the foresight to draw out the funds of the *Samaj* amounting to Rs. 6,080 from the firm and deposit the same in his own treasury, as the capital of the *Samaj*.

This fund is now in the hands of his heirs, who have always continued to contribute liberally towards the support of the church, in conformity with the noble example of their illustrious ancestor.

11. Ram Chandra Ganguli succeeds Radha Prasad as Manager.

Ram Chandra Ganguli, Dewan to Dwarkanath Thakur was elected manager, to succeeed Radha Prasad in 1833 (Saka 1755). This gentleman managed for some years, with the patronage of Dwarkanath Thakur, and the assistance of a few other members who still continued to pay their subscriptions to maintain the *Samáj* on its former footing, and to distribute the customary annual donations.

12. Pandit Ram Chandra Vidyavagish—becomes a chief minister of the Samaj.

The office of *Pradhána Acharya* or principal minister of the church was worthily filled by Pandit Ram Chandra Vidyavagish, who had under the Raja been an expounder of the Hindu scriptures. Miss Collet corroborates this account in her historical sketch of the *Samaj*, in the following words ; "His friends, and latterly Dwarkanath alone, contributed to the necessary expenses of the institution, and Pandit Rama Chandra Vidyavagisa regularly acted as its minister. But the church gradually lost its vitality and seemed to be fading away, until it fell into the hands of the remarkable man of whose labours I have next to speak." The *Samáj* was not to benefit long from the patronage of Dwarkanath Thakur. Ill health obliged him to leave the city for change of air, till later on he came to the strange conclusion of visiting England, where like his lamented friend Raja Ram Mohun Roy, he died. From the account given in a MSS. history of the *Samaj* kindly lent to me by Rajnarain Bose, of the intimate relations existing between these two friends, and of their joint efforts in all undertakings for their country's good, especially of the establishment and patronage of the church, it appears that Dwarkanath Thakur's last visit to England in the declining state of his health, was an act of deliberate choice, in order that when dead, he might be laid beside the friend he had loved so well in life.

13. The Samaj saves from death by Dwarkanath Thakur and Pandit Ram Chandra Vidyavagish before Debendranath took over its charge.

After the departure of Dwarkanath Thakur to England the *Samáj* began rapidly to decline, though others date such decline from the departure af Raja Ram Mohun Roy, until its amalgamation with the Tattwabodhini Sabha in 1840 (Saka 1766). Miss Collet is also of this opinion. She says, "for about ten years after Ram Mohun Roy left India, the Brahma Samaj remained in a stationary condition." (The Itivritta gives the following sad account of the languishing state of the church, taken *verbatim* from the narrative of Devendranath Thakur mentioned before. "When I first joined the *Samáj* in Saka 1763 (1841 A, D.), I found the number of its attendants to be very few. The carpeting on the east of the pulpit was occupied only by five or six persons, among whom Shama Churn Mukerjea * was observed to be its only regular attendant. The chairs on the west were mostly unoccupied, or filled by a few unconcerned visitants.")

It was during these evil days that the *Samaj* owed whatever of its stability that remained, to the unflagging zeal and true fidelity of one individual—its venerable President and Minister, Pandit Ramchandra Vidyavagisa, who, assisted by Dwarkanath Thakur, had the courage and perseverance

* This gentleman was the brother-in-law of Devendranath Thakur. He composed some excellent Brahmic Hymns in Bengali.

to maintain his post amidst all persecutions and privations. He conducted the duties of his high office, together with other matters relating to the *Samáj*, for a period of twelve years, dating from the establishment of the institution till his death in Saka 1766 (A. D. 1844), when, poor as he was, he made a gift of Rs. 500 to the funds of the *Samaj*, an act which puts to the blush the rich heirs and wealthy friends of the founder. The MSS. history of the *Samaj*, referred to above, gives a full account of the life of this venerable minister, embracing his education, public services, and early connection with the Raja and his *Samaj*. Though it would be out of place here to give a full sketch of this pandit's career, still we think it pardonable to allude somewhat briefly to his life and services, not only on account of his devotion to the *Samaj*, but also because no other record of his worthy actions exists.

14. A short life of Ram Chandra Vidyabagish.

Ramchandra Vidyavagisa was a Bengali Brahman, born at Malapara, on the Hugli, on the 29th Magh 1707 Saka (A. D. 1785). He was the youngest of three brothers. His eldest brother, Nanda Kumar, who was afterwards known by his mendicant name of Hariharananda Tirthaswami Kulavadhuta, had betaken himself to an ascetic and wandering life. In one of his wanderings he met Ram Mohun Ray at Rungpore, and returned with him to Calcutta. Here he recommended his youngest brother Vidyavagisa to the Raja who found him well conversant with Sanskrit literature, and received him under his patronage. He was placed for his further education under the Raja's pandit, Siva Prasad Misra, who taught him the Upanishads and Vedanta philosophy. The Raja, observing his docility and intelligence, initiated him in the course he was intended to take in the cause of reformation, and made him successively fill the posts of a professor in his Vedic seminary, a reciter of Veda in the Friendly Society, and expounder of Vedanta in the *Brahma Samáj*. Vidyavagisa made remarkable progress in every branch of Sanskrit learning under the Raja, to whom he proved eminently useful. He was the first native to publish a Bengali Dictionary, and a treatise on Astronomy in his native language. He was afterwards employed in the Sanskrit College as Professor of Law, a post which he held for ten years to the satisfaction of all. He died at Banares of a paralytic stroke in Saka 1765 (A. D. 1843), in the 59th year of his age. Vidyavagisa's acquaintance with the Raja began with the latter's return from Rungpur; it grew with his settling at Calcutta; and was cemented into a lasting friendship by their unity of faith and purpose. The pandit became deeply attached to the Raja, assisted him in all his religious and educational institutions, and acted as his colleague in all social, civil and religious discussions. After being employed for ten years as Professor of Hindu Law in the Sanskrit College at Calcutta, he was removed by an European secretary of that institution on the pretext of his having given an erroneous opinion on some question connected with Hindu Law, though the real cause of his dismissal was said to have been his friendship for Ram Mohun Roy. His case was taken up by his able friend as his own. An appeal was made to the Court of Directors, who, upon due examination of its merits, not only pronounced the opinion given by the pandit to be right, but ordered his restoration to office.

The long experience of this pandit in the discharge of his ministerial duties, his thorough acquaintance with the Sastras, and more particularly his proficiency in the Vedanta doctrines, but, best of all, his firm belief in Brahmaism, and his ardent zeal and assiduous labours for its propagation, rendered him the fittest minister for the church at that time. Devendranath Thakur, speaking of the regularity of his attendance in his twenty-five years' narrative of the *Samaj,* says: "No summer's heat, nor winter's cold, no rain nor storm, neither the interruption of any domestic business, nor any other calling or occurrences, no sickness nor hindrance of any kind, could keep him from the sacred duty of attending the church on the appointed evenings, and discharging the important functions of his high office."

His ability as a preacher is spoken of in the history of the *Samaj* as of the highest order. All his sermons and speeches, and his expositions of Vedanta doctrines, published under the title of Sapta-dasa Vyakhyanas, or the seventeen discourses, are replete with religious and spiritual instruction, and breathe throughout a spirit of sincere faith and fervent devotion.

But his eloquent and learned sermons do not seem to have met with the appreciation they deserved. The times had changed. His audience too, instead of being composed of the old class, consisted of youthful students, puffed up with a recent knowledge of English and preferring more the style of modern eloquence to the solid gravity and deep learning exhibited in the argumentative discourses of the veteran pandit. His ignorance of English, and the bent the advent of English education had given to the native mind, made him incapable of adapting his discourses to the varied tastes and requisitions of his audience, and eventually led to his being unable to attract and engage their minds. They knew nothing of the Nyaya, Sankhya, Patanjala, and other philosophical systems on which the Brahman preacher dwelt, in elucidation of his Vedantic doctrines, nor was he acquainted with the theories of Kant, Cousin, Hume, or Berkeley.

These differences in tastes and opinions soon led to the almost entire abandonment of the *Samaj*; and the speedy dissolution of the church appeared to be but a matter of time, had not the timely and providential interposition of the young Devendra arrested its impending fall.)

তরুদত্ত ও সরোজিনী নাইডু।

(শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল)

মিঃ টম্‌সন্ ভারতের মহিলা-কবিদিগের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়া বঙ্গদেশে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই; কিন্তু তিনি বাস্তবিক মেধাবিনী বালিকা-কবি তরুদত্তের কথা স্মরণ করিয়া ভুলাইয়া গিয়াছিলেন। এদেশের পুরুষ ও স্ত্রী-কবিগণের রচনা সম্বন্ধে মিঃ টম্‌সনের সমালোচনা প্রায়ই ব্যাজস্তুতিতে পরিপূর্ণ। সেইজন্য তিনি বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও 'ধান ভানিতে শিবের গান' গাহিয়া আক্ষেপের সহিত বলিয়াছেন যে, যদি এদেশের হিন্দু বালিকারা পূর্ব্বোক্ত কবি তরুদত্তের ন্যায় অনূঢ়াবস্থায় জীবন যাপন করে ও যৌবনকালের পূর্ব্বে মাতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য না হয়, তাহা হইলে তাহাদের চিত্তবৃত্তি স্বাধীনভাবে স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে এবং তাহারা নারীত্বের মহত্ত্ব আত্মানুসন্ধান দ্বারা উপলব্ধি করিবে; আর তাহা হইলে তরুদত্ত সাহিত্যগগনে একটী মাত্র তারার ন্যায় শোভা পাইবেন না, কিন্তু আকাশভরা আলোকরাশির মধ্যে তাঁহার স্থান অধিকার করিবেন। এই শ্রেণীর সমালোচক বঙ্গীয় কাব্যাকাশের যদি কিছুমাত্র সংবাদ রাখিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে [illegible] মহিলা

কবিগণের আলোকে চন্দ্রাতপ সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। স্বর্গীয় গিরীন্দ্রমোহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে শ্রীমতী চারুলতা দেবী পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে যত মহিলা-কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই যে বাল্যাবস্থায় পত্নীত্বের চিহ্ন সীমন্তে ধারণ করিয়া নিজেদেরকে গৌরবান্বিতা মনে করিতেন, একথাও উক্ত সমালোচকগণ নিশ্চয়ই শুনেন নাই। বঙ্গভাষার উৎকৃষ্ট উপন্যাস-রচয়িত্রীদিগের মধ্যে কয়জন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ন্যায় সাবালিকা অবস্থায় পদার্পণ করিবার পরে বিবাহিতজীবনের শৃঙ্খলার মধ্যে আসিয়াছেন?

যথার্থ প্রতিভা শুধু বিবাহের বন্ধন কেন, কোনও বন্ধন মানে না। মিসেস্ এলিজাবেথ ব্যরেট্‌ ব্রাউনিং (Mrs. Elizabeth Barrett Browning) বাল্যজীবনে বহু বৎসরাবধি রোগ-শয্যায় শায়িতা হইয়া যে সকল সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার অনুরূপ কোনও কিছু ইংলণ্ডের স্ত্রী বা পুরুষ-কবিদের মধ্যে কয়জন সে বয়সে সুস্থ দেহে রচনা করিয়াছেন? বিবাহ-বন্ধনের ন্যায় ব্যাধিগ্রস্ত দেহের বাধা যদি প্রতিভাশালী কবির ললিত-কলা চর্চ্চার অন্তরায় হইত, তাহা হইলে তরুদত্তের লেখনী "গাথা ও কাহিনী", "ডি আর্ভার্স" ও "কবিতা-গুচ্ছ" রচনা করিতে পারিত না। আসল কথা, তরুদত্ত যে শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ সাধারণ শ্রেণীর সমালোচকের পক্ষে ঠিক করা অসম্ভব। সেইজন্য আমরা তরুদত্তের প্রতিভার পিছনে কখনো কখনো ব্যাজস্তুতিময় সমালোচনার একটা অনিশ্চিত ছায়া দেখিতে পাই। তরুদত্ত যে একজন খুব বড় কবি, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি যে বাঙ্গালীর মেয়ে! তবে বোধ হয় তিনি খৃষ্টান ছিলেন বলিয়া এত বড় কবি হইয়াছিলেন; কিন্তু গস্‌ (Edmund Gosse), ডারমেস্‌টেটার (Darmesteter), তাসি (Tassy) প্রভৃতি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সমালোচকগণ যে তরুদত্তকে হিন্দু কবির পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন! তাহা হইলে, বোধ হয় তরুদত্ত বিবাহ করেন নাই, আর সেই জন্যই তিনি কবিত্বের উচ্চতম শিখরে পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন। এই প্রকার অন্যায় যুক্তি শুনিয়া হাস্য সংবরণ করা যায় না। প্রতিভা জিনিসটা যে কি তাহার স্বরূপ উপলব্ধ করা সহজ নহে। রোড্‌ওবডের অতি ক্ষুদ্র এক টুক্‌রা কুটীর বহুসহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান হইতে কোন্ শক্তির সাহায্যে সঙ্গীতের স্বর-লহরী গ্রহণ করে তাহা আমরা জানি না। ভগ্নস্বাস্থ্য ও রুগ্ন দেহ লইয়া ব্যাধিকাতরি তরুদত্তও যে অজ্ঞাত-শক্তির সাহায্যে বড় কবি হইয়া-

ছিলেন, হিন্দুবেষী সমালোচক তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে না পারিলেও তাঁহার প্রতিভা যে সুদূর পাশ্চাত্যের রোমান্টিসিজমের আলোকে সমুজ্জ্বল তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কবির শৈশবাবস্থায় সেই আলোকের রশ্মিরেখা যে বঙ্গদেশে দেখা দিয়াছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালী কবির রচিত ইংরাজী কাব্যগ্রন্থসকল তাহার প্রমাণ। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের আলোক কিন্তু বিগত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে তরুদত্তের প্রতিভার দর্পণে সর্ব্বপ্রথম প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। ১৯১৫ সালের "কলিকাতা রিভিউ" পত্রিকায় আর একজন সমালোচক (Ac: Vieme) এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হওয়ায় নিম্নে উহার ভাবানুবাদ প্রদান করিলাম।

"তরুদত্ত কর্তৃক রচিত 'হিন্দুস্থানের গাথা ও কাহিনী' (Ballads and Legends of Hindusthan) প্রকাশিত হইলে বুঝা গেল যে, ভারতে উচ্চ অঙ্গের কাব্য ইংরাজী ভাষার ছাঁচে রচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার বহু পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায়ের যুগে অবশ্য ইংরাজী রচনা ভারতের মনস্বিগণের মধ্যে সব সময়ে প্রচলিত ছিল। তাহা হইলেও, ধর্ম্ম ও রাজনীতিবিষয়ক বাদানুবাদের সীমা বস্তুতঃ এই শ্রেণীর ইংরাজী রচনা অতিক্রম করিত না। ইংরাজি কাব্যরচনা-ক্ষেত্রে যৎসামান্য উদ্যম বঙ্গদেশেই আবদ্ধ ছিল ও তাহাতে দুইজন প্রতিভাশালী ব্যক্তিরই প্রভাব অনুভূত হইত। ইঁহাদের একজনের নাম ডিরোজিও (Derazio), যিনি জাতিতে ইউরেশিয়ান্; এবং অপরের নাম কাপ্তেন রিচার্ডসন্ (Capt. Richardson)। ইঁহারা উভয়েই কবি ছিলেন। * * * যে সকল প্রতিভাবান্ শিক্ষিত ব্যক্তির সমবেত চেষ্টায় বঙ্গদেশে সাহিত্যের পুনর্জন্ম হয়, তাঁহাদের কর্ম্মজীবন ও আদর্শ যে উক্ত দুইজন কবি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। * * * তরুর 'গাথা ও কাহিনী' যাহা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার উৎকৃষ্ট দান, তাহাতেও দেখা যায় যে, বাস্তব-জগৎ তাঁহার আবাসস্থান নহে, প্রাচ্য-জগতও নহে,—কিন্তু তিনি নিজের জন্য একটী সম্পূর্ণ নূতন জগৎ সৃজন করিয়াছিলেন, যাহার কিয়দংশ তাঁহার নিজের দেশবাসিগণের প্রচলিত কাহিনী হইতে তাঁহার কবি-কল্পনা সৃষ্টি করিয়াছিল এবং বেশীর ভাগ যাহা বোধ হয় তাঁহার আজীবন ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজী কাব্যপাঠের ফলস্বরূপ।"

এদেশের ইংরাজী পদ্যরচনা-ক্ষেত্রে তরুদত্তের ন্যায় আর একজন মহিলা-কবি বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্যের উপদেশ মত রোমান্টিসিজম্-প্রসূত নূতন ভাবধারা তাঁহার কাব্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা যে, এই

দুইজন কবি-ই বাঙ্গালীর মেয়ে। তরুদত্ত ফরাসি তাঁহার কাব্যমন্দিরে সর্ব্বপ্রথম প্রবেশ করিয়া বিস্ময়ভাব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু কিন্তু এড্‌মণ্ড গস্‌ প্রদর্শিত পথে ইংরাজী কাব্য-জগৎ হইতে বিস্ময়ভাবের নূতন আদর্শ সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন।

"সরোজিনী নাইডু রচিত 'বার্ড অব্‌ টাইম' (Bird of Time) নামক কবিতাপুস্তকের প্রস্তাবনাতে মিঃ এডমণ্ড গস্‌ লিখিয়াছেন যে, কাব্যক্ষেত্রে তাঁহার সর্ব্ব-প্রথম উদ্যম রবিন্‌ (Robins) ও চাতকপক্ষী (Skylarks) এবং ইংলণ্ডের বাহ্যপ্রকৃতির দৃশ্যাবলীর চিত্র লইয়া ব্যস্ত ছিল। মিঃ গস্‌ তাঁহাকে এমন কিছু জগতকে দান করিতে বলেন যদ্দ্বারা ভারতের হৃদয়ভাবের অভিব্যক্তি, ভারতবাসীর চিত্তবৃত্তির যথার্থ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, প্রাচীন ধর্ম্মের মূলভিত্তি ও প্রাচ্যের অন্তর্জ্জগদান্দোলনকারী গূঢ় রহস্যের অস্তিত্ব (যাহা প্রতীচ্য স্বপ্নেও ভাবে নাই যে সম্ভবপর ছিল) সম্বন্ধে উপলব্ধি করা যায়। মিঃ গসের এই উপদেশের জন্য সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যজগৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ; কারণ এই উপদেশ অনুসরণ করিয়া সরোজিনী নাইডু "সুবর্ণদ্বারের পথে" পৌঁছিয়াছিলেন। তদবধি নাইডুজায়া এমন কিছু রচনা করেন নাই, যাহাতে খাঁটি ভারতীয় বা প্রাচ্যের প্রেরণা অনুভূত হয় না। * * * ইংরাজীয়ানা ভাবে অভিভূত হইয়া তিনি বালিকাবয়সে ইংলণ্ডে বিদ্যাশিক্ষার্থ গমন করেন; তথা হইতে যখন তিনি প্রত্যাগমন করেন, তখন তাঁহার কবি-হৃদয়ে দেশাত্মবোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে।" (Ace Vieme in the Calcutta Review, 1915)।

তরুদত্ত প্রতিভার আলোকে যাহা আবিষ্কার করিয়া-ছিলেন, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সদুপদেশের কৃপায় তাহার সন্ধান পাইয়াছিলেন। তরুদত্ত "গাথা ও কাহিনী"তে প্রতীচ্যকে প্রাচীন ভারতের আদর্শ চরিত্রের চিত্র উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার উক্ত কাব্যে সেইজন্য অতীতের হৃদয়স্পন্দন অনুভব করা যায়। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর "সুবর্ণদ্বারের পথে" (The Tray to the Golden thershold) কিন্তু বর্ত্তমানেরও হৃদয়স্পন্দন অনুভূত হয়। ব্যক্তিগত চরিত্রের চিত্রে তিনি জাতীয়হৃদয়ের ভাবধারা পরিস্ফুট করিয়াছেন; নাইডুজায়া বর্ত্তমানের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহার কাব্যে এদেশের জীবন্ত জাতির হৃদয়ভাবের সংবাদ পাই। "গাথা ও কাহিনী"তে তরুদত্ত ব্যক্তিত্বকে প্রাধান্য দিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন। শ্রীমতী নাইডু তাঁহার পারিপার্শ্বিক জগতে যাহা দেখিয়াছেন ও দেখিতেছেন তাহাতে উদ্বুদ্ধ জাতীয়তা, বিশেষতঃ বিবিধপ্রকারে সংবদ্ধ মানবের সংস্রবে আসিতে হইয়াছে; আর সেই কারণে আমরা তাঁহার পরিণত বয়সে রচিত কাব্যে জাতীয় মনস্তত্ত্বের প্রভাব দেখিতে পাই। সে যাহা হউক, এই দুইজন বাঙ্গালী মহিলা-কবি এদেশে ইংরাজি ভাষার কাব্যজগতে নূতন আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। তরুদত্তের সমকালে সাগরপারের বাগ্দেবী কাব্যসাহিত্যের ভিতর দিয়া বিস্ময়ের যে বার্ত্তা এদেশে বিঘোষিত করিয়াছিলেন, তাহাতে বঙ্গভারতীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। তরুদত্ত সেইজন্য এক হিসাবে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন আলোচ্য 'বিস্ময়ের যুগে'র প্রথম ও শেষ কবি। তরুদত্তের পরবর্ত্তী সময়ে বঙ্গভাষার কাব্যসাহিত্যে বিস্ময়ের পুনর্জ্জন্ম যেদিন হইল, সেদিনের বিশ্ব-আলোড়ন-কারী ঘটনা কাব্যাকারে প্রকাশ করিবার শক্তি রবীন্দ্র-নাথ ব্যতীত অপর কোনও কবির নাই। বিশ্বকবি "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" নামে অমর কবিতায় আধুনিক বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় সেই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

দেশের কথা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আদমসুমারী।

প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা।

খ্রীঃ অঃ	ভারতে	ইংলণ্ডে ও ওয়েল্‌সে	ফ্রান্সে
১৮৭১	২১৫	৩৮৯	১৭৯
১৮৮১	২২৭	৪৪৫	১৮২
১৮৯১	২২৯	৪৯৭	১৮৫
১৯০১	২১০	৫৫৮	১৮৮
১৯১১	২৩২	৬১৮	১৮৯
১৯২১	২২৬	৬৪৯	১৮৪

যদি উপরোক্ত তালিকাকে একটা সাধারণ ভিত্তির উপরে অর্থাৎ শতকরা হিসাবের উপর দাঁড় করানো যায়, তবে তালিকাটি নিম্নের আকারে দাঁড়াইবে।

আদমসুমারী খ্রীঃ অঃ	ভারত	ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স	ফ্রান্স
১৮৭১	১০০	১০০	১০০
১৮৮১	১০৫'৫	১১৪'৪	১০৪'৬
১৮৯১	১০৬'৫	১২৮	১০৬'৩
১৯০১	৯৭'৬	১৪৩'৪	১০৮
১৯১১	১০৭'৯	১৫৮'৮	১০৮'৬
১৯২১	১০৫'১	১৬৬'৮	১০৫'৭
প্রতি দশ বৎসরে গড়পড়তায় বৃদ্ধি	১'০২	১০[illegible]	১'১৪

ফ্রান্সে দুর্নীতি প্রভৃতির ফলে লোকসংখ্যা যে সাধারণত ইউরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অল্প, তাহা আমরা বাল্যকাল অবধি সংবাদপত্রাদিতে পড়িয়া আসিতেছি। কিন্তু এই বিশাল ভারতবর্ষে ইতিপূর্ব্বে দুর্নীতির প্রাবল্যের অভাব হইলেও লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার ফ্রান্স অপেক্ষাও কম দেখা যাইতেছে। আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কারণের সন্ধান পাইতে অধিক বিলম্ব হইবে বলিয়া মনে হয় না। *

জ্ঞাতব্য তথ্য।

১। ভারতে শুধু ১০ বৎসরে (১৮৯১-১৯০০ খৃঃ)—১,৯০,০০০,০০ (১ কোটী ৯০ লক্ষ) প্রাণী দুর্ভিক্ষের প্রকোপে ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া মরিয়াছে।

সমস্ত পৃথিবীতে ১১০ বৎসরে (১৭৯০-১৯০০ খৃঃ)—৫০,০০,০০০ (৫০ লক্ষ) লোক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছে।

তাই ভারতের বড়লাট লর্ড ডফরিন বলিয়াছেন—"ভারতের অধিকাংশ লোকই খাদ্যের অভাবে দিন কোন রকমে কাটাইয়া দেয়।" (Vide "Prosperous British India")—হিন্দুরঞ্জিকা।

২। ১ বৎসরে প্রতি ১০০০এ ৩১০ শিশু কলিকাতায় মারা যায়। (স্বাস্থ্য—অগ্রহায়ণ ১৩৩৬)

৩। বাংলায় প্রায় অর্দ্ধেক শিশু ৮ বৎসর বয়সে মারা যায়।

৪। বাংলায় প্রতি মিনিটে ৪টী শিশু মরে।

৫। বাংলায় সন্তানপ্রসবকালে প্রতি ৪০টী প্রসূতির মধ্যে ১টী মারা যায়। বিলাতে ২০০র মধ্যে ১টীর মৃত্যু হয়। (স্বাস্থ্য—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬)

৬। এদেশে প্রতি মিনিটে ১টী গরু রপ্তানি হয়; কাজেই শিশুরা দুধ না পাইয়া রোগে ভুগিয়া মরে।

(স্বাস্থ্য—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬)

৭। এদেশে খবরের কাগজের উর্দ্ধতম প্রকাশ-সংখ্যা (cerculation) ২০ হাজার। জাপানে ২ খানি কাগজের প্রকাশ সংখ্যা ২৫ লক্ষ।

৮। এদেশে ১৫০ বৎসরের শিক্ষানীতির ফলে শতকরা ৮ জন মাত্রে মাত্র শিক্ষিত; প্রকৃত শিক্ষিত শতকরা ১ জন কিনা সন্দেহ।

জাপানে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ঘোষণা হয় যে ১০ বৎসরের মধ্যে একটী গ্রামও প্রাথমিকশিক্ষা-বিযুক্ত থাকিবে না; তাহার ফলে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৯৯ জন শিক্ষিত।

(আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা)

৯। ভারতবাসীর গড়ে দৈনিক আয় ৬ পয়সা মাত্র।

(সঞ্জীবনী—২৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬)

১০। বাংলায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু বেশী প্রায় ৪॥০ লক্ষ। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ ৫০ বৎসর পরে) হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান বেশী প্রায় ৪৬ লক্ষ। অযথা তাড়নাই এই বৃদ্ধির কারণ বলিয়া অনেকে মনে করেন।

১১। বাংলায় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ২ কোটী হিন্দু; মুসলমান ২॥০ কোটী। এই বেশী ৫০ লক্ষ অন্তত হিন্দু ছিল।

* উপরোক্ত দুইটী তালিকা গত ২২শে মের Young Indiaতে প্রকাশিত "Is Poverty Killing India" "দারিদ্র্য কি ভারতবর্ষকে বধ করিতেছে" প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত।

রাজা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ লাহা সি-আই-ই

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ)

কৌলিক ও মৌলিক প্রতিভা

যে বিশাল বটবৃক্ষ যোজন যোজনান্তর ব্যাপিয়া অবস্থিত, যাহার সহস্র শাখা-বাহুপল্লবে কত বিচিত্র বিহঙ্গম নৈশ-বাস রচনা করিতেছে, কত পথিক যাহার ছায়াতলে আতপ-তাপে ক্লিষ্ট দেহ শীতল করিতেছে, তাহা কেবল মাত্র স্বকীয় বীজের প্রভাবেই সমুদ্ভূত নয়—রৌদ্র-শিশির এবং মৃত্তিকার সঞ্চিত রসও তাহার বৃদ্ধি ও পুষ্টি-সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। বস্তুতঃ কোন কিছুর উন্নতি বা বৃদ্ধির কারণ নির্ণয় করিতে হইলে মাত্র উহার জন্মগত উপাদানকে ধরিলে চলিবে না, আহৃত উপাদান বা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেও কারণের বিষয়ীভূত বলিয়া ধরিতে হইবে, নতুবা প্রকৃত কারণ নির্ণয় হইবে না। যদি কৌলিক বা জন্মগত উপাদানই বৃদ্ধির মূলীভূত কারণ হয়, তবে যে বীজ বারিহীন ধূসর মরু-বালুকার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইল,তাহার বৃদ্ধি ত দূরের কথা—অঙ্কুরোদগম হইল না কেন? অথচ সরস মৃত্তিকার রস-ধারা লাভ করিয়া অপর বীজ বসুধার শ্যাম শোভা বাড়াইয়া তুলিল। সুতরাং জন্মগত বা কৌলিক প্রতিভাই মানবের উন্নতির একমাত্র কারণ নয়; মৌলিক বা আহৃত প্রতিভাও সমভাবে কার্য্যকরী—এমন কি, কোন্ খানে একটির আরম্ভ ও অপরটির অবসান, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য; উভয়ের সম্মিলনে মণিকাঞ্চন-সংযোগের মত মানবজীবন বরণীয়, মহনীয় ও রমণীয় হইয়া উঠে।

বাঙ্গালার ব্যবসায়ি-সমাজের গৌরবস্থানীয় মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ লাহা সি-আই-ই মহোদয়ের

জীবনেও তাঁহার অভাবনীয় সাফল্যের মূলে ঐ দুই শক্তির অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার পুত্ররূপে কৌলিক ব্যবসায়-প্রতিভা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পরন্তু ঐ কৌলিক প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় অদম্য উৎসাহ, চেষ্টা ও পরিশ্রম প্রভৃতি মৌলিক গুণাবলী সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে জীবনের পথে উন্নতির তুঙ্গশীর্ষে উপনীত করিয়াছে।

জন্ম ও বাল্যজীবন

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। হৃষীকেশ লাহা মহোদয় স্বনামধন্য মহারাজা ৺দুর্গাচরণ লাহার কনিষ্ঠ পুত্র। বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রথমে তিনি হিন্দু স্কুলে প্রবেশলাভ করেন, পরে স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হন। বাল্যকাল হইতেই বিদ্যালাভে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ দৃষ্ট হইত।

কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে শিক্ষানবিশ

কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে পিতার আদেশে হৃষীকেশ কর্ম্মজীবনে প্রবিষ্ট হন। ব্যবসায়-কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞতালাভের জন্য তিনি সুপ্রসিদ্ধ কেলী কোম্পানীতে শিক্ষানবিশ নিযুক্ত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে পৈত্রিক ব্যবসায়ের পরিচালনায়ও স্বীয় শক্তি নিযুক্ত করেন। জীবনের পরবর্ত্তী কালে তিনি যে বহুবিধ ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর হইয়াছিলেন এবং অনেক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান তাঁহার সাহায্যগ্রহণের জন্য আগ্রহান্বিত ছিল, তাহার কারণ, তিনি শিক্ষানবিশি কালেই বিপুল কারবারের পরিচালক হইয়াছিলেন এবং ব্যবসায়ের প্রত্যেক বিভাগের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রত্যেক কাজে তাঁহার যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাঁহাকে ব্যবসায়পরিচালনার ত্রুটি লক্ষ্য করিতে সমর্থ করিত, অপরের পক্ষে তাহা সহজ ছিল না; সুতরাং তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিচক্ষণ চিকিৎসকের মত ব্যবসায়ের দোষনির্ণয় করিয়া উহাকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারিতেন।

যাঁহারা মনে করেন ব্যবসায়ে শিখিবার কিছুই নাই, ভুঁইফোঁড় ব্যবসাদার হইয়া মাত্র পুঁজি চালিয়া দুদিনে বড়লোক হওয়া সম্ভব, তাঁহাদের ধারণা ভ্রান্ত। বাস্তবিক, সংসারে শিক্ষা ব্যতীত কোন বস্তুরই উৎকর্ষ সাধিত হয় না। পাশ্চাত্য দেশের ব্যবসায়ধুরন্ধরদিগের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রথম জীবনে সকলেই শিক্ষানবিশের জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন; রাজা হৃষীকেশও শিক্ষানবিশের জীবনের মধ্য দিয়া জীবনপথের কিছু অংশ অতিক্রম না করিলে আজ ব্যবসায়িসমাজে যে মহোচ্চ পদে তিনি অধিষ্ঠিত, তাহা লাভ করিতে পারিতেন কি না কে বলিবে?

এই সময় আরও একটি দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়,—তিনি বুঝিয়াছিলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করিতে হইলে অন্তর্ব্বাণিজ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিলে চলিবে না—বহির্ব্বাণিজ্যেও হস্তক্ষেপ করিতে হইবে, আর বহির্ব্বাণিজ্যে উন্নতিশীল হইতে হইলে বৈদেশিক ভাষায় অধিকার থাকা বিশেষ প্রয়োজন; নতুবা বৈদেশিক বিনিময়-হার, মুদ্রা-তত্ত্ব, বাণিজ্য-পরিভাষা প্রভৃতি বিষয়ে গভীর জ্ঞানলাভ সম্ভবপর নহে; এবং তাহা না হইলে বৈদেশিক বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করাও বিড়ম্বনা; এইজন্য ঐ শিক্ষানবিশি কালেই তিনি ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভে যত্নবান্ হন।

কর্ম্মক্ষেত্রের প্রথম স্তর

শিক্ষানবিশ জীবনের অবসানে তিনি পিতার আদেশে বিশাল জমিদারীর পরিচালনভার স্বীয় হস্তে গ্রহণ করেন; কারণ তাঁহার খুল্লতাত শ্যামাচরণ লাহার এই সময়ে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তিনি জমিদারীর কার্য্য পরিচালনে অসমর্থ হন। যুবক হৃষীকেশ ব্যবসায়পরিদর্শন ও জমিদারীপরিচালনা এই উভয় কার্য্য এক সঙ্গে নির্ব্বাহ করিতে থাকেন।

কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বিতীয় স্তর

সিন্ধুনদ যেমন বিপুল জলধারা একটি প্রবাহে আবদ্ধ রাখিতে অসমর্থ হইয়া পঞ্চনদের সৃষ্টি করিয়া পঞ্জাব প্রদেশকে শস্য-সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে, রাজা হৃষীকেশের হৃদয়-নিহিত উৎসাহ-ধারাও জমিদারী পরিচালনা এবং পৈত্রিক-ব্যবসায়ের (প্রাণকৃষ্ণ লাহা এণ্ড কোং) মধ্যে আত্মহারা হইয়া থাকিতে পারিল না,—নবীন পথে নবীন কার্য্যে আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তাই পিতার অনুমতি লইয়া তিনি বিগত উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে "কৃষ্ণদাস লাহা এণ্ড কোং" নামক স্বতন্ত্র কারবারের প্রতিষ্ঠা করেন।

জনহিতকর অনুষ্ঠানে যোগ

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন্ বা বঙ্গীয় জমিদার-সভার প্রথমে সম্পাদক ও পরে সভাপতিরূপে তিনি দীর্ঘকাল ঐ সভার পরিচালনা করেন। বাঙ্গালীরাও যে ব্যবসায়ে পশ্চাদপদ নহে, পরন্তু বিদেশী বণিক্‌গণের মতই ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন, ইহা প্রমাণিত করিবার জন্য এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে বঙ্গীয় বণিক্‌গণের স্বার্থসংরক্ষণ-প্রচেষ্টায় তিনি তাঁহার বন্ধু রায় সীতানাথ রায় বাহাদুরের সহযোগে বঙ্গীয় বণিক সংঘ বা বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার্ অফ্ কমার্সকে একটী শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। তিনি এখনও ঐ সভার সভাপতিরূপে উহার উন্নতিবিধানে নিয়োজিত। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি

কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য, পোর্টট্রাষ্টের কমিশনর, ইমপ্রূভমেণ্ট ট্রাষ্টের সদস্য, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও ইষ্ট বেঙ্গল রেলপথের পরামর্শসভার সদস্য এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের তিনিই প্রথম বেসরকারী সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বান্ধবের ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের ট্রাষ্টী ছিলেন। এতদ্ভিন্ন বহু বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টররূপে এই পরিণত বয়সেও তিনি যেরূপ পরিশ্রম করেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে যখন ভারতীয় ডিরেক্টর সর্ব্বপ্রথম নিযুক্ত করা হয়, তখন ঐ সমস্ত ডিরেক্টরদিগের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন এবং কলিকাতায় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের গভর্ণরদিগের সভাপতির পদে তাঁহাকেই মনোনীত করা হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয় যে তাঁহার ব্যবসায়-পরিচালনা-শক্তির উপর গবর্ণমেণ্টও কতদূর আস্থাবান্।

ব্যক্তিগত জীবন

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহার মত উদার, পরোপকারী, ধার্ম্মিক ও সরল খুব কম দেখা যায়। যখন ভারতীয় বণিক্দিগের প্রতিনিধিরূপে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যের পদ গ্রহণ করিবার জন্য তিনি সরকার কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হন, তখন প্রতিষ্ঠালালসাহীন-চিত্ত রাজা হৃষীকেশ স্বয়ং ঐ পদ গ্রহণ না করিয়া রায় সীতানাথ রায় বাহাদুরকে ঐ পদে মনোনীত করিবার জন্য সরকারকে পরামর্শ দেন। সরকার তাঁহার মত বন্ধুবৎসল মহানুভব ব্যক্তির পরামর্শ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি অত্যন্ত অমায়িক ও মিষ্টভাষী। স্বজাতির উন্নতির জন্য তাঁহার সুদীর্ঘ প্রচেষ্টা সকলের অনুকরণীয়। তিনি নিখিল বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর প্রথম সভাপতি ও কেন্দ্র-সমিতির স্থায়ী সভাপতি। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজেরও সভাপতিরূপে যাহাতে সুবর্ণবণিক্ জাতি জ্ঞানগরিমায় গরিষ্ঠ হইয়া সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে, তজ্জন্য চিরজীবন সচেষ্ট; কিন্তু তাহা বলিয়া অপর জাতির প্রতি কখনও অবজ্ঞা প্রকাশ করেন না। গুণানুসারে তিনি সকল জাতিরই সমাদর করিয়া থাকেন। প্রার্থী কখনো তাঁহার সম্মুখ হইতে রিক্তহস্তে প্রত্যাগমন করে না। সত্যের প্রতি তাঁহার অবিচল নিষ্ঠা সকলেরই অনুকরণীয়।

অবসর জীবন

বর্ত্তমানে ৭৮ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ লাহা ও ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের উপর বহু কর্ম্মভার অর্পণ করিয়া অবসরজীবনে জ্ঞানচর্চ্চায় নিয়োজিত আছেন; কিন্তু এই অবসর জীবনেও বহু কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত—তাঁহার উপদেশে বহু কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে।

অপূর্ব্ব মনীষা, অসাধারণ পরিশ্রম, ব্যসনবিলাসহীন সরল জীবনযাপন, অলোকসামান্য জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা ও গভীর ব্যবসায়বুদ্ধি রাজা হৃষীকেশকে বঙ্গীয় ব্যবসায়ি-সমাজে মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছে।

গ্রন্থপরিচয়।

ইণ্ডাষ্ট্রী—একখানি শিল্পবিষয়ক মাসিক-পত্র; সেপ্টেম্বর সংখ্যা ১৯৩০। শ্যামবাজার "কেশব ভবন" হইতে শ্রীযুক্ত কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।

প্রকাশক গত সেপ্টেম্বর মাসের সংখ্যাতে তুলার চাষ, সুতা তৈয়ারী, তকলী ও চরকাতে সুতা কাটা এবং তাহার পাট করা ও বোনা প্রভৃতি বিষয়গুলি সুচিন্তিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। স্বদেশী শিল্পের বাজার ও তাহার ক্রেতা ও বিক্রেতাদিগের নামের তালিকা এবং কয়েকটী দ্রব্য প্রস্তুতের মূল উপাদান ও ভাগ দেওয়া হইয়াছে। স্বল্প মূলধনে ব্যবসায়-করণেচ্ছু ব্যক্তিগণ এই পত্রিকা দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবেন।

ম্যানুফ্যাকচারীং ইণ্ডাষ্ট্রীস্—"কেশব ভবন ইণ্ডাষ্ট্রী বুকডিপো" হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন আকারে ১১৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০ টাকা।

প্রকাশক পুস্তকখানিতে কয়েকটী শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের মূল উপাদান ও ভাগ প্রদান করিয়াছেন; বিশেষতঃ মৃৎশিল্প, কাচ, বাতি ও কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুতের নানারূপ প্রণালী সরল ও সহজভাবে আলোচিত হইয়াছে। অল্প মূলধনে গৃহশিল্পকে পুনর্জ্জীবিত করিবার সহজ প্রণালীর নির্দ্দেশ ইহাতে আছে। বর্ত্তমান বেকার-সমস্যার দিনে বঙ্গদেশ ও ভারতবাসী এই পুস্তকপাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। কৃ. চ.

সংবাদ।

ডাঃ বি, এন, দে—ডাঃ বি, এন, দে মহোদয় কলিকাতা কর্পোরেশনের ড্রেনেজ বিভাগে বিশেষ ইঞ্জিনিয়ানরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি অল্প কালের মধ্যে যে একটী Scheme দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিভা ও কৃতিত্ব সমুজ্জ্বল আকারে প্রকাশিত হইয়াছে; এবং তাঁহার নিয়োগের বিরুদ্ধপক্ষকে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্ করিয়া দিয়াছে। আরও একটি বিষয়ে তাঁহার প্রতিভা সুদীপ্ত আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। বর্ত্তমানে কলিকাতা-বাসী বৈদ্যুতিক আলোক ও পাখার বাতাসের উপ-সম্ভোগের জন্য প্রতি ইউনিট ন্যূনাধিক তিন আনা হিসাবে

দিতে বাধ্য হন, কিন্তু ডাঃ যে সম্প্রতি একটি Schemeএ দেখাইয়াছেন যে প্রতি ইউনিট তিনি ন্যূনাধিক দুই পয়সা হিসাবে যোগাইতে পারিবেন। এই সকল কারণে তিনি কর্পোরেশনে আরও পাঁচ বৎসরের জন্য বিশেষ ইঞ্জিনিয়াররূপে নিযুক্ত হইলেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম এবং তাঁহাকে ইহার জন্য অভিনন্দিত করিতেছি। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি বিশেষভাবে বঙ্গদেশের হইলেও সমগ্র ভারতের গৌরবের বিষয় নিঃসন্দেহ।

ডাঃ সি. ভি. রমণের 'নোবেল'-পুরস্কার-প্রাপ্তি।—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার খ্যাতনামা অধ্যাপক স্যর চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমণ এবার পদার্থবিদ্যায় অভিনব গবেষণার ফলে বিশ্ববিশ্রুত 'নোবেল'-পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। এসিয়াবাসীর মধ্যে ইনিই প্রথম বিজ্ঞানে 'নোবেল'-পুরস্কার লাভ করিলেন। আচার্য্য রমণ মাদ্রাজের অধিবাসী হইলেও ইঁহার এই সম্মানলাভে ভারতবর্ষ এবং বিশেষভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবান্বিত হইলেন। শ্রীযুত রমণের বয়ঃক্রম এখন ৪২ বৎসর মাত্র। এই অল্প বয়সেই ইনি যেরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আশা হয়, ভবিষ্যতে নানাভাবে জগতের জ্ঞানভাণ্ডারকে ইনি ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবেন। আমাদের দেশে 'প্রতিভাবান্ ছাত্র' বলিতে যাহা বুঝায়, রমণের পাঠ্যজীবনে তাহার সবকয়টী গুণই তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি রমণ অতি উৎকর্ষের সহিত অল্প বয়সেই একে একে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাই তাঁহাকে আজ এই 'নোবেল'-পুরস্কারলাভের যোগ্যতা দেয় নাই; সে যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন ইনি নিরবচ্ছিন্ন গবেষণাপ্রবৃত্তি হইতে। এই সাধনাই ইঁহাকে সিদ্ধির পথে উত্তীর্ণ করিয়াছে; ভারতীয় ছাত্রসমাজকে আচার্য্য রমণের গৌরবময় জীবনের এই শিক্ষাই আজ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে বলি। আচার্য্য রমণ বহুদিন হইতেই আপন গবেষণার ফলস্বরূপ কিছু কিছু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু ইঁহার নবতম আবিষ্ক্রিয়ায় ইনি দেখাইয়াছেন যে, বিভিন্ন দ্রব্য যে আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত করে, তাহার মধ্যে অজ্ঞাতপূর্ব্ব কয়েকটী রেখা আছে এবং ইহাদের প্রত্যেকটী দ্রব্যের অণুসমাবেশের সহিত একটী গাণিতিক অনুপাত রক্ষা করিয়া চলে। এই আবিষ্কারটী এত অদ্ভুত হইয়াছে যে, জগতের সকল বৈজ্ঞানিকই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন; এবং সম্ভবতঃ এই আবিষ্ক্রিয়ার জন্যই শ্রীযুক্ত রমণ এবারে 'নোবেল'-পুরস্কার পাইয়াছেন।

মহাত্মা রাজা রামমোহনের স্মৃতিবার্ষিকী।—গত ১০ই আশ্বিন (২৭শে সেপ্টেম্বর) শনিবার মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধতিথি উপলক্ষ্যে 'ডিব্রুগড় ব্রহ্মমন্দিরে' শ্রীলক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্থানীয় বহু গণমান্য ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। উদ্বোধন-সঙ্গীতান্তে শ্রীমতী জগদা দেবী বরদোলৈ, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ শর্ম্মা, শ্রীচিদানন্দ দাস প্রভৃতি সংক্ষেপে মহাত্মার জীবনকথা বিবৃত করেন। অতঃপর পুনঃ সঙ্গীতান্তে শ্রীরত্নাবলী বড়ুয়া বি-এ একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীবিষ্ণুকিঙ্কর কলিতার কবিতা ও শ্রীআশা-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতান্তে স্বয়ং সভাপতি মহাশয় রাজার মহনীয় জীবনী ও জীবনব্রত সম্বন্ধে সংক্ষেপে সুসংযত ভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর একটী সঙ্গীতান্তে সভা 'মধুরেণ' সমাপ্ত হয়।

চিত্র।—এবার পত্রিকার মুখপত্রে যে হাফটোন-চিত্রখানি প্রকাশিত হইল, উহার ব্লকখানি ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা পি-এইচ. ডি, পি. আর. এস মহাশয়ের সৌজন্যে অধিগত।

শোকসংবাদ।

রায় বাহাদুর ৺যোগেন্দ্রনাথ সেন।—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পিতৃব্যপুত্র রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ সেন গত ১৪ই আশ্বিন বুধবার ৯৯নং ল্যান্সডাউন রোডে পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি বাল্যকালে ব্রহ্মানন্দের বড় প্রিয় ছিলেন; এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী ছাত্রসঙ্ঘের অন্যতম নিষ্ঠাবান্ ও নীতিপরায়ণ উৎসাহী সভ্য ছিলেন। পরিণত বয়সে ইনি সম্বলপুরে সরকারী উকিলের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দীর্ঘকাল স্থানীয় হিতকর কার্য্যের প্রভাবসম্পন্ন নেতারূপে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পুত্রপরিজনদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান্ ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার সদ্গতি বিধান করুন।

৺প্রতিভা দেবী ঘোষজায়া—এড্ভোকেট শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের পত্নী প্রতিভা দেবী দীর্ঘকাল রক্তশূন্যতা রোগে ভুগিয়া গত ২৩শে আশ্বিন শুক্রবার রাত্রি সার্দ্ধ একাদশ ঘটিকায় ১২নং আণ্টনিবাগান লেনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসর হইয়াছিল; ইনি ভক্ত পিতা ৺রাধানাথ দেবের যোগ্যা কন্যাই ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; এবং পূজা বন্দনা সঙ্গীত ও প্রার্থনাদিতে বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন। ধর্ম্মের কল্যাণস্পর্শে ইঁহার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি একেবারেই তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। ইঁহার সহিত স্বল্পকালের পরিচয়েও কতবার যে ইঁহার গৃহে পারিবারিক উপাসনায় আহূত হইয়া সানন্দে যোগদান করিয়াছি এবং সুমিষ্ট ব্যবহারে ও প্রাণপূর্ণ আতিথ্যে তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, আজ তাহা একে একে স্মরণে আসিতেছে। স্বামীপুত্রের এই প্রগাঢ় শোকে সান্ত্বনা বিতরণ পূর্ব্বক ভগবান্ এই পুণ্যবতী নারীর ঔর্দ্ধদেহিক কল্যাণ বিধান করুন।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
নবপ্রকাশিত গ্রন্থ

হবিঃ

(সঙ্গীত ভারতী শ্রীবাণী দেবী Mus. Doc. Ind. কর্ত্তৃক স্বরলিপি সহ)

রয়াল ৪ পেজী ৮ + ১১৬ পৃষ্ঠা ; ছাপা ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট ; প্রচ্ছদে ও মুখপত্রে দুইখানি ভাবোদ্দীপক চিত্র সম্বলিত।

এই গ্রন্থে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের রচিত ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা সর্ব্ববিধ উচ্চাঙ্গের ৫০খানি বাছা বাছা গান দেওয়া হইয়াছে। সেই সকল গান বিশুদ্ধ রীতি অনুযায়ী তান ও লয় সমন্বিত। গানগুলি তান ও লয় সংযোগে স্বরলিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গানগুলির ভাব যেমন সুন্দর, সুরও তেমনি মনোহর। গানগুলিতে রাগরাগিণী ও তাল-লয়ের শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধতা রক্ষিত হওয়ায় সঙ্গীতরসজ্ঞমাত্রেরই বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। পুস্তকখানি প্রত্যেক সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তির হাতের নিকটে রাখিবার যোগ্য। সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগ হইতে যে প্রণালীতে বিদ্যালয়ে সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গানগুলি নির্ব্বাচিত হইয়াছে এবং সেই কারণে গ্রন্থখানি আবালবৃদ্ধ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সকলেরই উপযোগী হইয়াছে। ইহাতে প্রাভাতিক ও সান্ধ্য ৩৩টী বিভিন্ন রাগ ও রাগিণী এবং ১৮টী বিভিন্ন তালের গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য অতি সুলভ ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫।১ বি, বারাণসী ঘোষের সেকেণ্ড লেন, পোষ্ট বড়বাজার, কলিকাতা এবং মেসার্স ডোয়ার্কিন এণ্ড সন, ৮ নং ডালহাউসি স্কোয়ার, এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থালয়ে (কলিকাতা) প্রাপ্তব্য।

"এই গ্রন্থে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত ৫০টি সঙ্গীত ও তাহার স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদের সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্র, "ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু" এই গ্রন্থের প্রথম সঙ্গীত। সঙ্গীতশাস্ত্র-বিদুষী শ্রীমতী বাণী দেবী কল্যাণ তেওরা সুর-তালে ঐ মন্ত্রের বল প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং এই বেদগান সকলেই সহজে শিখিতে পারিবেন।

"বাণী দেবী স্বয়ং সুন্দর গান করিতে পারেন, সঙ্গীতবিদ্যায় তিনি পারদর্শিনী, গানের স্বরলিপি রচনায় সুনিপুণা। পিতা ভগবদ্ভাবে মগ্ন হইয়া সঙ্গীত রচনা করিতেছেন, কন্যা সুর-তালে তাহা গাহিতেছেন। ভারতের প্রতি গৃহে এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া মানবকুল পুণ্যালোকে পরিপূরিত হউক—'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্' নীচ আমোদ প্রমোদ বর্জ্জন করুক।"

সঞ্জীবনী—৬ই চৈত্র, ১৩৩৬।

Bandhu Amar—(My Friend.) By Kshitendra Nath Tagore, (Adi Brahmo Samaj Press, Calcutta, Re. 1/.)

This is a book of prayer. Mr. Tagore, the Minister of the Adi Brahmo Somaj, is known as a saintly man. In this book he has embodied thirty-one of his prayers to the Almighty whom he looks upon as his friend. Their beauty cannot be realized except by those who in time of distress seek relief and comfort by prayer. To them the book will be very helpful.

Statesman 9. 3 30.

KHEAL OR RANDOM THOUGHTS.—BY KSHITINDRA NATH TAGORE.

(Adi Brahmo Samaj Press. Re. 1-8.]

Mr. Tagore has earned a reputation as an essayist. This Volume contains a systematic chain of thoughts about men and things that came to him during his travels on four different occasions; and the descriptions incidentally offer opportunities for the reader to make himself acquainted with the manners and customs of the well-known Tagore family of Calcutta. The most noticeable feature of the book is the author's eagerness to induce his readers to look even at the ordinary things around them in a spiritual way. The book will be welcomed by all who enjoy deep thinking. Statesman 23. 3. 30.

জ্ঞান ও কর্ম্ম লইয়াই মানুষ ; তাহার জ্ঞানসাধন ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে যেমন চক্ষু শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মসাধন ইন্দ্রিয়-গুলির মধ্যে তেমনি মুখ শ্রেষ্ঠ ; কারণ, চক্ষু রূপের দ্বারা, মুখ আহার্য্যের দ্বারা, বাকী ইন্দ্রিয়গুলির নিত্য পুষ্টি ও কান্তি রক্ষা করে।

কিন্তু ভুলিবেন না—চক্ষুর যেমন

=চশমা=

মুখের তেমনি

=দাঁত=

যুগপৎ শোভা ও শক্তি।

অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সযত্ন পরীক্ষা ও ব্যবস্থা অনুসারে আধুনিক রুচিসঙ্গত শোভন ও সুদৃশ্য 'চশমা' ও 'দাঁত' সরবরাহে আমরা সর্ব্বদা প্রস্তুত।

Tattwabodhini Patrika

Reg. No. C 462

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৮তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীপ্যারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৶০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৮তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০১। সাল ১৩৩৭। শক ১৮৫২। খৃঃ ১৯৩০। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩১।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(১)। প্রেম-পারাবারে।

মা! তোমার গানের সুধায় আমার অন্তর-খানি ভরিয়া দাও—ভরাইয়া লইয়া আমি যেখানে ইচ্ছা ভাসিয়া চলি না কেন? তখন আমার আর কোনই ভয় থাকিবে না। মাঝিরা যেমন "সারী" গান গাহিতে গাহিতে তাহাদের নৌকা বাহিয়া চলে, আমিও তেমনি তোমার শেখান গান গাহিতে গাহিতে আমার জীর্ণ তরীখানি তোমারই প্রেমপারাবারে ভাসাইয়া দিব—দেখি সে আমাকে কোথায় লইয়া যায়, আমি কোন্ কূলে গিয়া পৌঁছাই। দিনের আলো নিভিয়া যাক—সে আলো আমার চোখে বড়ই ধাঁধাঁ লাগাইয়া দেয়, আমি সমস্তই অন্ধকার দেখি, আমার খুব কাছের জিনিসও দেখিতে পাই না। রাতের আঁধার আমায় ঘিরিয়া ফেলুক—কি আশ্চর্য্য! এই অন্ধকারের ভিতরেই আমার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যায়, আমার খুব কাছে আর খুব দূরে যাহা কিছু আছে, সকলই যেন স্পষ্ট দেখিতে পাই। তোমার নাম-গানের গুণে আমার ভয়-ভাবনা সকলই আমার কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। আমি এখন এই অন্ধকারের ভিতর বেশ আছি—বড় সুখে আছি—উপরে অনন্ত, নীচে অনন্ত, চারি পাশে অনন্ত। এই অনন্তের মাঝে জীবনতরী ভাসাইয়া দিয়া নির্ভয়ে থাকা যে কি আনন্দ, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে পারিব না, বলিতেও চাহি না। মা! আমার এখন আর কেহই নাই—এখন তুমি আর আমি—তুমি গান গাও, আর আমি শুনি; আবার তোমারই গাওয়া গান শিখিয়া আমি ছোট কচি শিশুর মত সুরে বেসুরে গাহিব, আর তুমি শুনিবে। এই ভাবে জীর্ণ তরী বাহিয়া যখন শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত মনে তোমার চরণমূলে গিয়া পৌঁছিব, তখন তুমি একবার—তুমি আমার সর্ব্বাঙ্গে একবার তোমার স্নেহহস্ত বুলাইয়া দিও—আমার সকল জ্বালাযন্ত্রণা দূর হইয়া যাইবে, আর আমি তোমার স্নেহের পূর্ণ জ্যোতিতে নিত্যকাল থাকিব।

(২)। সংসারে।

মা! রাস্তার এক ধারে দাঁড়াইয়া আছি। চেনা অচেনা কত লোক কাছে আসিতেছে আর দূরে যাইতেছে। চেনা লোকেরাও কত অচেনা হইয়া যাইতেছে, আর অচেনা কত চেনা হইতেছে। যথার্থ হৃদয় দিয়া কেহই কাহাকেও ডাকিতেছে

না। এ সমস্ত দেখিয়া প্রাণের ভিতর কান্না উথলিয়া উঠিতেছে। সমস্ত সংসারে যেন একটা দোকানদারী চলিতেছে, পরস্পর পরস্পরকে ঠকাইবার একটা জুয়াখেলা চলিতেছে। এ সমস্ত দেখিয়া সংসারে এক মুহূর্ত্তও আর থাকিতে প্রাণ চাহে না। আমার সর্ব্বাঙ্গ ধুলায় ভরিয়া গিয়াছে—ধুলার ভারে আমার নিশ্বাস আর বহিতে চাহে না। মা। তুমিও কাঁদিতেছ? আমার কষ্ট যাহা হইতেছে তাহা হউক। কিন্তু আমার কষ্ট দেখিয়া যদি তুমি কাঁদ, ব্যথা পাও, সেইটাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কষ্ট, তাহাতেই আমার বুক ভাঙ্গিয়া যায়, মৃত্যু ঘনাইয়া আসে। সংসারে যে যতই আমাকে ভালবাসুক, তোমা অপেক্ষা আর কেহই আমাকে বেশী ভালবাসে না। তোমার সেই ভালবাসা যখন আমার বুকের ভিতর ছোট ছোট সুগন্ধ যুঁইফুলের মত হাসিতে থাকে, তখনই আমার প্রাণ আনন্দে অধীর হয়, সমস্ত দুঃখকষ্ট মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হয়। মা! তুমি অন্তরে এসো, তোমার হাসি সেখানে ছড়াইয়া দাও। আমার প্রাণ শত ভৈরবী রাগিণীতে শতবিধ লয়ে তোমার নাম গাহিয়া উঠুক। এই সমস্ত পথিকেরা চলিয়া যাক, রাত্রি ঘনাইয়া আসুক। আমি তোমার সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া যাই। তোমার স্নেহহস্তে আমার অঙ্গ হইতে ধুলা ঝাড়িয়া দাও, আমাকে তোমার প্রেমের বিমল বারিতে স্নান করাইয়া পবিত্র কর। আমার প্রাণের কান্না থামিয়া যাক। সারা দিন সারা রাত কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে—আর কাঁদিতেও পারি না। মা! এখন তোমার বুকের উপর আমাকে ফেলিয়া এই ধুলায় ভরা অন্ধকার সংসার হইতে ঘরে লইয়া চল। সংসারের কেহই যেন আমার অভাব অনুভব না করে। আমি তোমার কোলে লুকাইয়া থাকিব।

৫৩। নিরাশ্রয়ের আশ্রয়।

মা! দেখ, চারিদিক হইতে আমার উপর আঘাত আসিতেছে। আমার দেহমন জর্জ্জরিত হইয়া পড়িতেছে। তোমার ঐ বুকের ভিতর আমাকে ক্ষণেকের জন্য লুকাইয়া রাখ—সংসারের কঠিন আঘাত হইতে আমাকে একটুখানি বাঁচাও। মা! একবার তুমি দেখিয়া যাও—আমার সর্ব্বাঙ্গ আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে; সর্ব্বাঙ্গ হইতে রক্তধারা ঝরিতেছে। তুমি আসিয়া শান্তিজলে সেই রক্তধারা ধুইয়া দিবে, সেই আশায় আজ পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়া আছি—এখন পর্য্যন্ত জীবন বহির্গত হয় নাই। আমাকে দুর্ব্বল দেখিয়া সকলেই পদাঘাত করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আমার প্রাণ হইতে মা—মা ছাড়া আর কোন নাম, আর কোন কান্নাই বাহির হইতেছে না। তোমার স্নেহের বক্ষ ছাড়া আমার লুকাইবার আর কোনই স্থান নাই। ঝড়ের সময় নদনদীসকল যে প্রকার ভয়াবহ আকার ধারণ করে আর যে প্রকার ভীষণ গর্জ্জন করিতে থাকে, আমারও চারিদিকে সংসার সেই প্রকার ভীষণ রবে গর্জ্জিয়া উঠিতেছে। আমার প্রাণ আতঙ্কে আকুল হইয়া উঠিতেছে। মা! এ সময়ে তুমি একটীবার আসিয়া আমাকে তোমার কোলে তুলিয়া লও আর তোমার শান্তিগীত গাহিয়া আমাকে সান্ত্বনা দাও—আমার প্রাণের ধড়ফড়ানি নির্ব্বাপিত হউক। মা! সুখ—সুখ করিয়া আমি কতই পাগল হইয়া বেড়াইয়াছি—হায়রে! সুখ কোথায়! একমাত্র তোমার কোল ছাড়া সুখশান্তি কোথাও নাই। সোনার স্বপ্ন দিয়া কত ঘর বাঁধিলাম, সংসার পাতিলাম। কিন্তু সংসারের ঝড়ের মুখে মুহূর্ত্তের মধ্যে সে সমস্ত ঘর কোথায় যে উড়িয়া গেল—কে জানে? এখন আমি তো সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়; একমাত্র তুমি আমার আশ্রয় রহিয়াছ, তাই আমি আজও বাঁচিয়া আছি। আর আমি কিছুই বলিতে পারিতেছি না। মা! আমায় তুমি তোমার বুকের উপর তুলিয়া লও—মুহূর্ত্তের জন্যও সংসারের আঘাত ভুলিতে দাও।

৫৪। আশ্রয়-ভিক্ষা।

মা! সংসারের ঘূর্ণীপাকে আমায় ফেলিয়া তুমি কোথায় গিয়াছ? সংসারের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার ক্ষমতা আমার নাই। দেহে একটুখানি বলবিধান হইতে না হইতেই দেহখানি তো জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। আমার সাধ্য কি যে সংসার-সাগরের শতবিধ শ্বাপদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া উদ্ধার পাই। মা! এসময়ে তুমি কোথায় গেলে? কোন্ দূর-দূরান্তরে, কোন্ লোক-লোকান্তরে

তুমি ঘুরিতেছ ফিরিতেছ. এদিকে তোমার এই দীনদুঃখী সন্তান ভয়ে ত্রাসে কাঁদিয়া আকুল। এইটুকু জানি আর সেইটুকু জানিয়াই শত ভয়ের মধ্যে শত আতঙ্কের মধ্যেও আমি নিশ্চিন্ত আছি যে, তোমার মঙ্গলদৃষ্টি আমার উপরে সর্ব্বদা পড়িয়া আছে। সংসারের ভীষণ শ্বাপদদিগের হস্তে আমাকে নিহত হইতে দিবে না, বিনষ্ট হইতে দিবে না, ইহা বেশ জানি। তোমার চরণে নিবেদন করি, আমি এই ভয়ের মধ্যে, চিন্তার মধ্যে বাঁচিতেও আর পারিতেছি না। তুমি আসিয়া দেখা দাও—কোলে তুলিয়া একটুখানি আশ্রয় দাও। কেবলই ইচ্ছা করিতেছে—মা-মা বলিয়া তোমার কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে থাকি। আমার হৃদয়ে কান্না যে কি রকম উথলিয়া উঠিতেছে, তাহা তোমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানাইতে চাহি না। সহানুভূতি—মা! আমার প্রাণের ব্যথা তুমি ছাড়া আর বুঝিবে কে যে, সে সহানুভূতি করিবে? তুমি যদি আমায় কোলে না লও, তবে আমার এই দুর্ব্বল পায়েই নির্ভর করিয়া অজানা রাস্তায় আপনাকে ছাড়িয়া দিব—যেখানে গিয়া পড়ি সেইখানেই গিয়া পড়িব। তোমার ইচ্ছা হয় বাঁচাইও, ইচ্ছা হয় বাঁচাইও না—মরণের হাতেই মরিতে দিও। নীরবে যে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে, সময়ে সেইগুলি যেন সজীব হইয়া তোমার চরণে আমার জীবনমরণের বারতা দিয়া আসে। যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে কোলে লইয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে দিও; আর যদি মরি, তবে একবার সেই মৃত প্রাণের উপর তোমার স্নেহহস্ত বুলাইয়া দিও—তাহাতেও আমি সুখ পাইব।

আত্মানুসন্ধান।

(শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ)

হৃদয়কমলমধ্যে দ্বৈতহীনং বরেণ্যং
নিখিলমনুজবেদ্যং প্রেমগম্যং প্রশান্তম্।
জননমরণভীতিভ্রংসি সচ্চিৎস্বরূপং
সকলভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে॥

'সকল ভুবনের বীজ, চৈতন্যসত্তা, অদ্বিতীয়, প্রশান্ত, সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ, বরণীয়, নিখিল মানবের চরম জ্ঞেয় ব্রহ্মকে হৃদয়পদ্মে প্রেমের দ্বারা জ্ঞাত হইয়া জন্ম-মৃত্যুর ভয় হইতে মুক্ত হই।'

কোথাও একখানি ছবি পাইলে তাহাকে যেমন আমরা ফ্রেমে না বাঁধাইয়া ঘরে টাঙ্গাইতে পারি না, তেমনই কোন বস্তু বা ঘটনার বিষয় যখন আমরা অবগত হই, তখন যতক্ষণ না উহাকে কোন বিশেষ দেশ ও কালের ফ্রেমে আঁটিয়া লই, ততক্ষণ আমরা তৃপ্তি পাই না। এইরূপে জগতের কোন বস্তু বা ব্যাপার, যখনই আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়, তখনই উহা কোন বিশেষ দেশ ও কালের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ হইয়া প্রকাশ পায়। এ বিষয়ে আমাদের অভ্যাস এমনই পাকা হইয়া গিয়াছে যে, কোথাও ইহার অন্যথার সম্ভাবনাও দেখিলে আমাদের মন খুঁত খুঁত করিতে থাকে। এইজন্য ঈশ্বর সম্বন্ধে যখন কোন কথা বলি বা শুনি, তখন তাঁহারও প্রতি আমরা সসীমভাবের ভাষা প্রয়োগ করিতে বাধ্য হই। সংসারী মূর্খ জীব আমরা মনে করি, এই ধূলি-মলিন পৃথিবীর বহু ঊর্দ্ধে দূরে—সুদূরে, স্বর্গলোকে বা ব্রহ্মলোকে সেই মহান্ পুরুষ অবস্থান করিতেছেন। এইরূপে মর্ত্ত্যমানবের অন্তরে, অমরলোকের সুখকরী কল্পনা জাগ্রত হইয়া উঠে। মরণশীল সংসারের নশ্বর-ভোগে অতৃপ্ত জীবের উগ্র কল্পনা এক অপূর্ব্বলোকের পরিকল্পনায় তন্ময় হইয়া পড়ে, নানা দিব্য শব্দস্পর্শরূপ-রসগন্ধে তাহাকে ভূষিত করিয়া তৃপ্ত হয়; তাই মানুষের সারা জীবনের এই একমাত্র কামনা হয় যে, "কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল নন্দনে"! কিন্তু এই পৃথিবী যেমন আপন ধূলিমলিন রুক্ষ মূর্ত্তি লইয়া ঊর্দ্ধে উদার আকাশের স্নিগ্ধ নীলিমায় দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক মনে করে "কোথায় তুমি—কোন্ ঊর্দ্ধ লোকে, আর কোথায় আমি—কত নিম্নে অধঃপতিত,—আমাদের উভয়ের মধ্যে কি বিরাট ব্যবধান!" তেমনই পাপমলিন আমরা যখনই সেই অপাপবিদ্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখনই মনে করি তুমি "দূরাৎ সুদূরে"; কিন্তু পৃথিবী যেমন জানে না যে ঊর্দ্ধের ঐ অনন্ত নীলাকাশই তাহাকে মায়ের স্নেহালিঙ্গনের মত চারিদিক হইতে আবেষ্টন করিয়া পরমানন্দে বুকে তুলিয়া ধরিয়াছে শুধু নহে, তাহারই মাঝে অনুপ্রবিষ্ট অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে; তেমনই আমরাও জানি না যে যিনি "দূরাৎ সুদূরে" তিনিই আবার "অন্তিকে চ"—যিনি "বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ" তিনিই আবার "গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং"—যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তিনিই আবার আমাদের হৃদয়কন্দরেও অবস্থিতি করিতেছেন।

শাস্ত্রে বলা হইয়াছে "বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্মশব্দঃ পরিকীর্ত্তিতঃ" যিনি স্বয়ং বৃহৎ ও নিত্য নব নব রূপে

প্রকাশশীল তিনিই ব্রহ্ম। এইজন্য উপাসনাতেও আমরা বলি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ব্রহ্ম শুধু সত্তায় ও জ্ঞানে অনন্ত নহেন, তিনি মঙ্গলে শক্তিতে দেশে ও কালেও অনন্ত। এইজন্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হইয়াছে "স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যঃ" তিনি দেশ ও কালের অতীত। এই গ্রহউপগ্রহে বিভক্ত বিরাট ব্রহ্মাণ্ড এবং দিনে মাসে বৎসরে শতাব্দীতে বিভক্ত বিপুল কাল যাঁহাতে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে "তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্" তিনি শ্রেষ্ঠ মহান্ পুরুষ।

এই শ্রেষ্ঠ পুরুষকে মানুষ খুঁজিয়া বাহির করিবে কিরূপে? যিনি দেশ ও কালের অতীত, দেশ ও কালের কুটিল জালে বিজড়িত জীব আমরা তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইব কিরূপে? তিনি দেশ ও কালের অতীত হইলেও দেশ ও কাল তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই— "যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ম্" তাঁহারই প্রভাবে যে এই জগৎপ্রপঞ্চ বিঘূর্ণিত হইতেছে। শুধু ইহাই নহে, এই মহান্ দেবতাই যে বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বের ছোটবড় সকল কর্ম্মেই ইঁহার মঙ্গলহস্ত প্রসারিত। ইঁহারই আদেশে "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" সূর্য্য ও চন্দ্রমা বিধৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। ইঁহারই ভয়ে "সূর্য্যস্তপতি অগ্নিস্তপতি"; "ভয়াৎ ইন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ" ইঁহারই ভয়ে মেঘ বায়ু ও মৃত্যু দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। আবার এই পুরুষই পুষ্পকোরকের অন্তরালে অবস্থান করিয়া তাহাকে দিনে দিনে রূপে রসে গন্ধে বিবর্দ্ধিত করিয়া বিকশিত করিয়া তুলিতেছেন। ইনি যেমন একদিকে "মহতো মহীয়ান্", তেমনি অপরদিকে তিনি "অণোর-ণীয়ান্"। খানিকটা তালপাকানো সূতার মাঝখানটা পাইলে যেমন তাহাকে পাওয়া হয় না—অনুসন্ধান করিয়া মূল বাহির করিলে তবে তাহাকে যথার্থ পাওয়া যায়; তেমনি এই জগৎ এই সংসার ব্রহ্মে নিত্য বিধৃত হইয়া স্থিতি করিলেও সংসারী আমরা তাহার মূল খুঁজিতে প্রবৃত্ত না হওয়ায় তাঁহাকে পাইতেছি না—বৃথাই ইতস্ততঃ ঘুরিয়া মরিতেছি।

পথ চলিতে চলিতে সেই সব লোকের সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব, যাঁহারা আমাদের বিপরীত-মুখী হইয়া আসিতেছেন। আমরা যদি উত্তরমুখে চলিতে থাকি, তবে যাঁহারা সেই পথে দক্ষিণমুখে আসিতেছেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবেই। তেমনি যিনি "বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ" সেই সর্ব্বগত দেবতাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে বাহ্যপ্রকৃতি হইতে অন্তরে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে হইবে। এই সর্ব্বগত দেবতার আত্মপ্রকাশের বিবরণ ছান্দোগ্যোপনিষৎ এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—"একোঽহং বহু স্যাম্ প্রজায়েয়", আমি এক—বহু হইলাম, প্রকৃষ্টরূপে বিকশিত হইলাম। অর্থাৎ দেবতা এক হইলেও তাঁহার বিকাশ ও প্রকাশ হইতেছে বহুদিকে ও বহুভাবে; সুতরাং তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে আমাদিগকে চলিতে হইবে বহু হইতে একের অভিমুখে। কিন্তু "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ" ভগবান্ আমাদের ইন্দ্রিয়-গুলিকে বহির্মুখ বস্তুর অভিমুখীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; "তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি" তাই তাহারা বহির্বিষয়কেই শুধু দেখে—অন্তরাত্মাকে দেখে না। চক্ষু চলিয়াছে রূপে, ঘ্রাণ চলিয়াছে গন্ধে, কান চলিয়াছে শব্দে—এইরূপে আমার সবকয়টী ইন্দ্রিয়ই বহির্বিষয়েই ঘুরিয়া মরিতেছে। অথচ অন্তরাত্মাই হইতেছেন, সেই ঊর্দ্ধমূল, অবাক্শাখ, সংসাররূপী সনাতন অশ্বত্থবৃক্ষের মূল। আবার এই সংসারবৃক্ষের ব্রহ্মরূপী মূল "সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" প্রতি মানবের অন্তরে অন্তরে নিহিত। জগতে বহুরূপে ও বহুভাবে প্রকাশমান ব্রহ্মই এই জীবের হৃদয়গুহায় এক অদ্বিতীয় আত্মারূপে অবস্থান করিতেছেন। আমরা এই আত্মাকেই চাহিতেছি; কারণ "রসো বৈ সঃ" ইনিই রসস্বরূপ, "এষ হ্যেবানন্দয়াতি" ইনিই সকলকে আনন্দ বিতরণ করিতেছেন; এই অন্তরাত্মা প্রকৃতিতে বহুভাবে ও বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়া আমরাও বস্তুর পথে চলিয়া বহিঃপ্রকৃতিতেই তাঁহাকে পাইবার চেষ্টা করি; তাই ছুটাছুটীই সার হইতেছে, ইঁহাকে ধরিতে পারিতেছি না; দূর হইতে চক্ষে আমাদের সচ্চিদানন্দের স্বপ্নমাধুরী ছড়াইয়া দিয়া ইনি সরিয়া পড়িতেছেন; আর আমরা সেই আলোর নেশায় উন্মত্ত হইয়া ছুটীয়া চলিয়াছি-সম্মুখে বস্তুর দিকে। "দংক্রম্যমানা পরিয়ন্তি মূঢ়াঃ" মূঢ় আমরা কতরূপ কুটীল গতির আশ্রয়ই না গ্রহণ করিতেছি; নিজেরা যে কিছুই বুঝিনা এই বোধটুকুও আমাদের নাই; আমরা যে একেবারে অজ্ঞানের কূপে ডুবিয়া আছি। তাই নিজেরাই আমরা আপনাদিগকে পণ্ডিত ভাবিয়া তৃপ্ত আছি। দুচোখে যাহাকেই দেখিতেছি, তাহাকেই আপন মিথ্যা পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে উপদেশ দিতে অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু ফল হইতেছে, "অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ" একজন অন্ধ যেন আর একজন অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে।

তবে আমাদের উপায় কি? কে আমাদিগকে পথ দেখাইবে? "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" যে পথ ধরিয়া মহাজন গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়াছেন, সে-ই তো পথ; কিন্তু সে পথের সন্ধান পাইব কোথায়? সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে শিষ্যের চঞ্চল অন্তরকে শান্ত করিবার জন্য যাহাতে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে "ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি" সেই উপনিষদেই শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে উক্ত হইয়াছে—

ধীর ব্যক্তি বহির্বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অন্তরাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন "কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ" কি উপায়ে? "আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্" অমৃতত্বলাভের ইচ্ছা করিলে দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করিতে হইবে। "কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে উহাতে প্রচ্ছন্ন অগ্নি যেমন আপনি প্রকটিত হইয়া উঠে, তেমনি সাধক অন্তর্মুখী দৃষ্টির সাহায্যে আপন অন্তরে ধ্যানাভ্যাসের দ্বারা সেই নিগূঢ় দেবতাকে অবলোকন করেন।" কারণ "তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পিঃ স্রোতঃস্বাপঃ অরণিষু চাগ্নিঃ এবমাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ" যেমন তিলে তৈল, দধিতে ঘৃত, নদীগর্ভে জল এবং অরণির মধ্যে অগ্নি অন্তর্নিহিত দৃষ্ট হয়, সেইরূপ আত্মার অন্তরে পরমাত্মা পরিদৃষ্ট হন।

কিন্তু নিতান্ত অধঃপতিত আমাদের যে এমন সুন্দর ধ্যানপথটিও মনঃপূত হইতেছে না; প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করে, এই যে সুন্দরী ধরণী, যিনি মুহুর্মুহু নব নব বেশে আমাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ ও অন্তরকে তৃপ্ত করিতেছেন, শেষে কি ইহাকে ছাড়িয়া হৃদয়গুহার বদ্ধদৃষ্টি হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে? ধীরেরা বলেন,—হাঁ, ইহাই কল্যাণপথ। আপাততঃ ইহা তোমাদের প্রিয় না হইলেও শ্রেয়ঃ ইহাতেই।

বিশ্বের অধিষ্ঠাতা সেই "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ" যিনি "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখঃ" সেই রাজরাজ দেবদেবকে যিনি না আপন হৃদয়পুণ্ডরীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি কিরূপে তাঁহার এই বিশ্বৈশ্বর্য্য উপভোগ করিয়া আনন্দরসে অভিষিক্ত হইতে পারিবেন? "একে বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি" সেই এক অদ্বিতীয় পুরুষকে জানিতে পারিলে সকলকেই জানা হয়, তাঁহাকেই ভালবাসিতে পারিলে সকলকেই ভালবাসা যায়।

অতএব হে বন্ধু, হে সাধক সত্যই যদি আমাদের সাধনায় অভিরুচি হইয়া থাকে, তবে পথের কথা ভাবিয়া বিষণ্ণ হইবার অবকাশ নাই—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" উত্থান কর, জাগ্রত হও; শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় সাধনার দুর্গম পথ অবলম্বন কর। সেই আদিত্যবর্ণ "তমসঃ পরস্তাৎ" মহান্ পুরুষকে আপন অন্তরাত্মায় অবগত হও। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" অমৃতত্বপ্রাপ্তির আর দ্বিতীয় পথ নাই।

হে ঈশান, হে দেব, হে বরদ! তুমি আমাদিগকে এই বর দাও, যেন এই সত্যপথ তোমার এই কল্যাণপথ হইতে আমরা ভ্রষ্ট না হই। হে সহস্রশীর্ষা সর্ব্বগ পুরুষ! তুমি ত সকলকে আবরণ করিয়া অবস্থান করিতেছ, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটি কীটকেও তুমি মুহূর্ত্তের জন্য পরিত্যাগ কর না, আমরাও যেন তোমাকে কদাপি পরিত্যাগ না করি, এই আশীর্ব্বাদ আমাদিগের মস্তকে বর্ষণ কর।*

মনের মানুষ।

গান (বাউলের সুর)

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আঁধার ঘরে জলছে বাতি
দিবা রাতি নাই যেখানে
মনের মানুষ সেইখানে
(তোর) মনের মানুষ সেইখানে ॥ (ধুয়া)
সঙ্গে সদা ঘোরে সে যে—
মরিস্ কেন দূরে খুঁজে?
ঘরের কোণে চক্ষু বুজে
দেখ্ গে' না তোর আছে বসে
মনের মানুষ সেইখানে
(তোর) মনের মানুষ সেইখানে ॥
কাঁটার বনে মরলে ঘুরে
দেহখানা (তোর) যাবে ছড়ে;
কেউ না তখন আসবে কাছে—
সবাই ছেড়ে যাবে পাছে—
দেখ্‌বি শুধু তোর প্রাণে (গো)
মনের মানুষ তোর প্রাণে ॥
ছয়জনা তোর সাথী হোল—
জালিয়ে পুড়িয়ে তোকে খেল—
তবু তাদের ছাড়্লি নে কো—
মনের মানুষ ধরলি নে কো—
ক্ষিতি ঠাকুর কেঁদে আকুল
মনের মানুষ প্রাণে (গো)
মনের মানুষ তোর প্রাণে ॥

---

* সপ্তসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে "বেহালা ব্রাহ্মসমাজে" গত ৩০শে কার্ত্তিক বিবৃত।

স্ত্রীশিক্ষায় মদনমোহন।

(শ্রীরত্নমালা দেবী)

অসাধারণ প্রতিভা, নিরহঙ্কারিতা, সারল্য ও অমায়িকতায় মদনমোহন সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন। তখনকার শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ বঙ্গনারীগণের পরম সুহৃদ মহাত্মা বেথুন সাহেব তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুতা স্থাপন করেন। ইঁহারা দুইজনেই স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে নিতান্ত সচেষ্ট ছিলেন। উভয়ের সহযোগিতায় তাঁহাদের এ শুভ প্রচেষ্টা সাফল্যলাভের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। মহাত্মা বেথুন তখন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইল। মদনমোহনও সমাজসংস্কারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। উভয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও অনুরাগের ফলে বঙ্গবালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য অবিলম্বে বেথুন স্কুল স্থাপিত হইল। সিমলার উত্তর-পশ্চিম কোণে হেদোর ধারে যে সুন্দর অট্টালিকাটী আজিও সমুন্নতভাবে দাঁড়াইয়া আছে, উহাই বেথুন সাহেবের অক্ষয় কীর্ত্তি। এই অট্টালিকার ভিত্তিস্থাপনের সময় তর্কালঙ্কার ও বেথুন সাহেব স্বহস্তে উহাতে নবরত্ন নিখাত করিয়াছিলেন।

অট্টালিকা নির্ম্মাণ শেষ হইল, বিদ্যালয় স্থাপিত হইল; কিন্তু কেহই কন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। অধিকন্তু এই বেথুন-স্কুল স্থাপনের সাহায্য করার অপরাধে মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি হিন্দুসমাজ হইতে বিতাড়িত হইলেন। আজ সেই বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ই বাংলার নারীশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে দুইএকটা 'মিশন-স্কুল' ছাড়া হিন্দুগৃহের কন্যাদের পাঠের জন্য কোন বিদ্যালয় ছিল না। তখনকার দিনে কোন সম্ভ্রান্ত হিন্দুগৃহের কন্যাকে কেহ মিশনারী স্কুলে পাঠাইত না। ঐ সকল বিদ্যালয়ে তখন কেবল নীচজাতীয়া কন্যারাই শিক্ষা পাইত। স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারের এই পুণ্য প্রচেষ্টায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই সাহায্য করেন। মহাত্মা বেথুনের এই শুভ কর্ম্মে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি সহযোগী হইয়াছিলেন।

বেথুন-স্কুল স্থাপিত হইলে মহাপ্রাণ বেথুন প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুর গৃহে গৃহে গিয়া তাঁহার অভিলাষ জানাইলেন; তথাপি কন্যাদের স্কুলে পাঠাইতে কেহই অগ্রসর হইলেন না। সমাজচ্যুতি ও জাতিচ্যুতির ভয়ে সকলেই নীরব রহিলেন। কেবল সাহসী ও নির্ভীক মদনমোহন স্কুল স্থাপনের পরই ভুবনমালা ও কুন্দমালা নামে স্বীয় কন্যাদ্বয়কে প্রথমেই উক্ত স্কুলে ভর্ত্তি করিলেন। মদনমোহনের সৎসাহস নির্ভীকতা ও উৎসাহ দেখিয়া বেথুন সাহেবের তাঁহার উপর আরও শতগুণ শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। মদনমোহনের এই সাধু দৃষ্টান্তে তখন রামগোপাল ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ কন্যাদের উক্ত বিদ্যালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। মদনমোহন কিন্তু কন্যাদের প্রথমে স্কুলে দেওয়ার অপরাধে সমাজচ্যুত ও জাতিচ্যুত হইলেন। তাঁহার উপর লোকের বিদ্বেষ এতদূর দৃঢ় ও প্রবল হইল যে, কটুবাক্য নিন্দা ও গালাগালি কিছুই আর তাঁহার অপ্রাপ্য রহিল না। তর্কালঙ্কার কিন্তু নির্ভয়ে বীরের ন্যায় অটলভাবেই রহিলেন।

স্কুল স্থাপিত হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তেই বেথুন সাহেব উহার তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন। তর্কালঙ্কারের সঙ্গে তিনি স্বয়ং মধ্যে মধ্যে স্কুল পরিদর্শনে যাইতেন এবং প্রতিবার বালিকাদের জন্য নানা প্রকার খেলনা ও পুতুল লইয়া গিয়া তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিতেন ও নিজে তাহাদের সঙ্গে খেলা করিতেন। বাড়ী ফিরিবার সময় তিনি ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে উভয় কক্ষে ধারণ করিয়া স্বভবনে গমন করিতেন; এবং তাহাদের বালিকাসুলভ সকল অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিতেন। ভুবনমালা ও কুন্দমালা বেথুনের এতদূর স্নেহভাজন হইয়াছিলেন যে লেডী ড্যালহাউসী পর্য্যন্ত ইঁহাদের অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। ক্রমে ক্রমে বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল বটে, কিন্তু বালিকাদের বিদ্যাশিক্ষার উপযোগী কোন পুস্তক না থাকায় তাহাদের পাঠে বিঘ্ন হইতে লাগিল। এরূপ কঠিন শিক্ষাকার্য্যের ভার তর্কালঙ্কার ভিন্ন কেহ লইতে সক্ষম ছিলেন না; এজন্য উহা তর্কালঙ্কারের উপরেই অর্পিত হইয়াছিল। শুধু মুখে মুখে শিক্ষা দিলে বালিকারা তাহা ধারণা করিতে পারিত না দেখিয়া শিক্ষাদানের সুবিধার্থ তর্কালঙ্কার স্বয়ং তিন ভাগে বিভক্ত 'শিশুশিক্ষা' নামে যে পুস্তক রচনা করেন, উহার প্রথম ভাগখানি তিনি বেথুন সাহেবের নামে উৎসর্গ করেন। সেই উৎসর্গ-পত্রটী সাধারণের গোচরার্থ এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"মহামহিম মান্যবর শ্রীযুক্ত জে, ই, ডি, বীটন
ভারতবর্ষীয় রাজ-সমাজসদস্য।
শিক্ষাসমাজাধিপতি মহোদয়েষু

সমুচিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন—
অনেকেই অবগত আছেন, প্রথম পাঠোপযোগী পুস্তকের অসদ্ভাব নিবন্ধন অস্মদ্দেশীয় শিশুগণের যথা-

নিয়মে পাঠ ও স্বদেশীয় ভাষাশিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না, আমি সেই অসম্ভাবনিরাকরণে বিশেষ বালিকাগণের শিক্ষায় সংসাধন করিবার আশয়ে যে পুস্তকরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি,—এই পত্রদ্বারা তাহার প্রাথমিক সূত্রপাত করিলাম।

সচরাচর দেখা যায় কি ছোট কি বড় গ্রন্থকার মাত্রেই আপনার পুস্তক যত কেন তুচ্ছ হউক না, কোন মহানুভব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নামানুগৃহীত করিয়া লোকসমাজে প্রচারিত করিয়া থাকেন। এই বিশ্বজনীন ব্যবহার-দর্শনে বাসনা হইয়াছে আমারও পুস্তকসকল আপনার নামাক্ষর-যুক্ত হইয়া প্রচারিত হয়।

আপনি শিক্ষাসমাজের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া অস্মদ্দেশীয় লোকের বিদ্যা বিনয় শীল ও সুনীতিসম্পাদনে আন্তরিক যত্ন ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। বিশেষতঃ এতদ্দেশের হতভাগ্য নারীগণের দুরবস্থাদর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া অজ্ঞানান্ধকূপ হইতে তাহাদের উদ্ধারমানসে যে অশেষ প্রয়াস পাইতেছেন, আমি আপনার সেই সকল বিশুদ্ধ গুণে মুগ্ধ হইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আপনার সুপ্রতিষ্ঠ নামসংযোজনসাহসে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাতে আমি অনুযোগ্য হইব ভাবিয়াছি। আপনার মহানুভাব স্বভাব ও অলোকসামান্য গুণগ্রাম আমার পক্ষে স্বপক্ষতা করিবে তাহার আর সন্দেহ নাই॥

ভবদীয়
শ্রীমদন মোহন শর্ম্মা"

মদনমোহনের "শিশুশিক্ষার" ন্যায় এমন সহজ সরল মধুর শিশুপাঠ্য পুস্তক আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা যে শিশুদিগের শিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী, তাহা বলাই বাহুল্য; এখনো পর্য্যন্ত মদনমোহনের শিশু-শিক্ষার সেই প্রভাতবর্ণনটী সকলেরই প্রাণে মধুর ঝঙ্কার তুলে; এবং অদ্যাপি সেই গীতি-কবিতাটী শিশুকণ্ঠে বীণার ন্যায় বাজিয়া উঠে। পাঠক-পাঠিকাগণের জন্য মদনমোহনের সেই সুপ্রসিদ্ধ প্রভাতবর্ণনটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

প্রভাতবর্ণন।

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল।
ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল।
গগনে উঠিল রবি লোহিত বরণ।
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন।
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।
উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।

এই কবিতাটী যেমন মধুর তেমনি সরস সরল ও প্রাণস্পর্শী; আজিও শিশুগণের কণ্ঠে মদনমোহনের মধুর প্রভাতবর্ণন শুনিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হই। শিশুগণের পাঠোপযোগী এরূপ সুন্দর কবিতা আর কোন কবিরই লেখনী হইতে নিঃসৃত হয় নাই। মদনমোহনের শিশু-শিক্ষা ভাষায় ও শব্দলালিত্যে শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। তাঁহার "শিশুশিক্ষা"র প্রথমভাগ যেমন সরল ও সুকুমার শিশুদের পক্ষে একান্ত উপযোগী, উহার দ্বিতীয়ভাগও তদ্রূপ; প্রত্যেক সংযুক্ত অক্ষরের উদাহরণস্বরূপ ইহাতে যে সকল নীতিউপদেশ বিন্যস্ত হইয়াছে, সেইগুলি গুরুউপদিষ্ট নীতিমালার ন্যায় আশৈশব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া থাকে। শিশুশিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এত সরল যে শিশুরা পাঠের কঠোরতা আদৌ অনুভব করিতে পারে না; অধিকন্তু হাসিতে হাসিতে তাহারা উহা সানন্দে আয়ত্ত করিয়া ফেলে; সুতরাং বিদ্যাশিক্ষার অনুরাগ তাহাদের আরও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শিশুশিক্ষার তৃতীয়ভাগখানি তর্কালঙ্কার কি অভিপ্রায়ে রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার গল্পগুলি বড় মধুর ও নীতি-উপদেশে পূর্ণ। পাঠকপাঠিকাদের জন্য নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

"সুবোধ বালক।—সুশীল ও সুবোধ বালক সর্ব্বদা লেখাপড়া করে। সারাদিন খেলা করিয়া বেড়ায় না। পাঠের সময় সে যেমন পাঠ বলিতে পারে, তেমন আর কেহই পারে না। এজন্য শিক্ষক মহাশয় তাহার উপর বড়ই সন্তুষ্ট থাকেন। সে কখন মন্দ কর্ম্ম করে না, মন্দ কথা মুখে আনে না। গুরুলোকেরা তাহাকে যাহা বলেন সে তাহাই করে। কদাচ তাঁহাদের অবাধ্য হয় না। তাহাকে একবার যে কর্ম্ম করিতে নিষেধ করা যায়, সে তাহা কখনই করে না। এজন্য সে সকলের প্রিয় হয়।"

নীতিশিক্ষা সহ এমন সরল প্রাঞ্জল মধুর ভাষা দুর্লভ। ইহার প্রত্যেক কথার মধ্যে নীতিজ্ঞানের আদর্শ আছে। মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা' প্রকৃতই শিশুশিক্ষার উপযোগী। প্রত্যেক কথাই নীতি-উপদেশপূর্ণ। 'শিশুশিক্ষা'র পর কত শত পুস্তক রচিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার তরুণমস্তিষ্ক-প্রসূত 'শিশুশিক্ষা'র ন্যায় এমন প্রাণস্পর্শী সরল সহজ ভাষায় শিশুপাঠ্য কোন পুস্তক আর প্রকাশিত হয় নাই। ইহার পদ্যাংশ ও গদ্যাংশ উভয়ই মধুর।

—

উৎসবানন্দ-রামমোহন রায়-সংবাদ

(৬)

(ডাঃ তি, রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

যচ্ছ্রোত্রাদেরধিষ্ঠানং চক্ষুর্বর্গাদ্যগোচরং। স্বতোঽধ্যক্ষং পরং ব্রহ্ম নিত্যং বয়মুপাস্মহে। অস্মৎপ্রস্থাপিতপ্রথমদ্বিতীয়োত্তরে সমালোচিতবতা ভবতা যদুক্তং শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে লব্ধবৈরাগ্যাণামিবাস্মাকমতিজল্পনমত্যন্তানুচিতমেবেতি তদতীবাশ্চর্য্যং। তত্র তত্রোত্তরে ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তদিতরস্য বা বৈরসূচকৈকবাক্যস্যাপ্যভাবাৎ, ব্রহ্মাদিতৃণান্তবস্তুনো ব্রহ্মাধ্যাসেন ব্রহ্মত্বং পশ্যতাং কস্মিন্নপি দ্বেষোৎপত্তেরসম্ভবাচ্চ। কচিদ্দ্বৈতমতং কচিদ্বিশিষ্টাদ্বৈতমতমবলম্ব্য যৎ পৌনঃপুন্যেন ভগবৎকৃষ্ণবিগ্রহস্য সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মত্ব- নিত্যত্ব- প্রচ্যুতিরহিতত্ব-বিভুত্ব-সচ্চিদানন্দত্বম্ উক্তং তত্র পৃচ্ছা, যঃ তদীয়বিগ্রহঃ পাঞ্চভৌতিকস্তদিতরো বা? আদ্যে ক্ষিত্যাদ্যারব্ধশরীরস্য অবয়বিত্বেন বৃদ্ধিহ্রাসশালিত্বেন পরিচ্ছিন্নত্বেন চ তদীয়বিগ্রহস্য নিত্যত্বপ্রচ্যুতিরহিতত্ববিভুত্বং সর্ব্বথাঽসম্ভবমেব। তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম; অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ইত্যাদি শ্রুতিব্রহ্মসূত্রাণাং বিরোধশ্চ স্যাৎ। দ্বিতীয়ে তু পাঞ্চভৌতিকভিন্নস্য তস্য বিগ্রহস্য রূপবত্ত্বাভাবাদ্দর্শনাসম্ভবঃ, লোকে ক্ষিত্যপ্‌তেজস্তৎসমবেতভিন্নস্য বস্তুনশ্চক্ষুরাদিবিষয়ীভূতত্বং প্রসিদ্ধতরম্; এবং সতি তদ্বিগ্রহে হস্তপাদাদীনাং শ্রীবৎসবনমালাবেণুধ্বজবজ্রাঙ্কুশনূপুরপীতাম্বরাদীনাঞ্চ কল্পনং তৈরূপহিতত্বদ্বিগ্রহস্য দিদৃক্ষা চ ন কয়াচিদ্‌যুক্ত্যা সঙ্গচ্ছতে। যদি চ শাস্ত্রং প্রত্যক্ষং তন্মূলকানুমানঞ্চ তুচ্ছীকৃত্য স্বগণপরিতোষণার্থং বৈষ্ণবাঃ শ্রীবৎসবনমালাদ্যুপহিতশ্রীকৃষ্ণবিগ্রহোঽপ্রাকৃতো নিত্যানন্দরূপঃ প্রাকৃতচক্ষুরাদ্যগোচরোঽপি সন্ দৃঢ়তরভক্তিদ্রবীভূতচিত্তৈঃ কেবলং মনসা দৃশ্যত ইতি ব্রূয়ুঃ, তদা কথয়ামাস জগতি চক্ষুরাদিভিঃ প্রাগননুভূতস্যাবয়বিনঃ স্বপ্নে জাগ্রদবস্থায়াং বা মনসি সর্ব্বথৈব প্রকাশাভাবৎ চক্ষুরাদ্যগোচরস্য তস্যানন্দবিগ্রহস্য মানসদর্শনমসম্ভবং, চক্ষুরাদিভিরুপলব্ধস্যাবয়বিনো দিক্কালবৃত্তিত্বেনাপরিচ্ছিন্নত্বাদনীশ্বরত্বঞ্চেতি। যৎ পুনঃ স্বপ্নে শশাদৌ শৃঙ্গাদীনাম্ অলৌকিকদর্শনং জাগ্রদবস্থায়াং তেষাং কল্পনঞ্চ, তত্তু পৃথক্‌ত্বেন শশশৃঙ্গয়োঃ প্রাগদর্শনাদেব, সর্ব্বথা হি জন্মান্ধস্য প্রাগদৃষ্টত্বেন স্বপ্নাদৌ শশশৃঙ্গদর্শনম্ অনয়োর্বা বস্তুনাং দর্শনঞ্চ ন সম্ভবতি। কিঞ্চ ভক্তিবশাৎ অবয়বিন আনন্দত্বেন পরিগ্রহঃ, স্নেহাৎ কুৎসিতস্যাপি পুত্রস্য রুচিরত্বেনানুভবঃ, দ্বেষাদিদ্বত্বোঽপি শত্রোররূপত্বেনাবগমশ্চ ভক্তিস্নেহদ্বেষবৎস্বেব দৃশ্যতে; বস্তুতস্তদ্বিকারোদ্ভবাৎ তেষাং জ্ঞানানাং ভ্রমত্বেনাবয়বিনি পুত্রে শত্রৌ চ আনন্দত্বং রুচিরত্বমরূপত্বঞ্চালীকমেব। ব্রহ্মবুদ্ধ্যানন্দত্বরত্বাপরিচ্ছিন্নত্বাদিস্মরণে কৃষ্ণমহেশ্বরদেবীপ্রভৃতীনাং তুল্যত্বমতারতম্যঞ্চ প্রত্যেকেন তেষাং মাহাত্ম্যসূচকগ্রন্থবাহুল্যাৎ।

অস্মল্লিখিতবিনিগমনাবিরহদোষমনবহিতবতা যৎ পুনরুক্তং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানাং তত্ত্বত ঐক্যেঽপি আকাশবদুপাধিভেদাৎ সেব্যসেবকভাবো নাপ্রসিদ্ধ ইতি তত্রাপি বিপ্রতিপত্ত্যা; পরন্তু ইদমুক্তবাদৃশ্যং তদনুগতা যুক্তিশ্চ তেষাং একস্য বিষ্ণোঃ সেব্যত্বমপরয়োঃ সেবকত্বং কথয়তাং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানাম্ ঐক্যম্ উপাধিতঃ পরস্পরসেব্যসেবকভাবঞ্চ দর্শয়তাং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণতন্ত্রাদিশাস্ত্রাণ্যনাদৃতবতাং বৈষ্ণবাণাং কদাপ্যানুকূল্যায় ন ভবতঃ; মিথ্যাত্বেন পরিগৃহীতোপাধিকপ্রত্যক্‌তত্ত্ববিদাং প্রেপ্সিতব্রহ্মবিদ্যানাঞ্চ উপাধিবৈলক্ষণ্যমাদায়ালং বিচারেণ। যদুক্তং ভগবতি কৃষ্ণ এব মিথোবিরোধিবিচিত্রশক্তয়ঃ সন্তি বর্ত্তীতি, তত্রেদমবধীয়তাং—অস্থূলমনণু, অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা, অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ ইত্যাদ্যাঃ বিরুদ্ধধর্ম্মোপদেশেন পরমাত্মনো ব্যাপকত্বমেব প্রতিপাদয়ন্ত্যঃ শ্রুতয়ো ব্যোমবদপরিচ্ছিন্নেঽবাঙ্‌মনসোগোচরে পরব্রহ্মণ্যেব সঙ্গচ্ছন্তে; অনেন ‘সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দেভ্য’ ইত্যাদিসিদ্ধান্তবাক্যাৎ ন তু পরিচ্ছিন্নে কস্মিংশ্চিৎ বিগ্রহে মিথো বিরুদ্ধশক্তয়ঃ সর্ব্বগতত্বঞ্চ সম্ভবতি, তস্য পরিমাণবতঃ সংযোগানধিকরণদেশাবৃত্তিত্বাৎ। যচ্চ—সদসচ্চাহমর্জ্জুন ইত্যাদিনা ভগবতি বিষ্ণৌ, অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম অসচ্চ সদসচ্চ য ইত্যাদিনা মহেশ্বরে শিবে, সদসত্বাখিলাত্মিকে ইত্যাদিনা বিশ্বমাতরি দেব্যাং, ত্বমস্তকঃ সর্ব্বমিদং ধ্রুবাধ্রুবম্ ইত্যাদিনা ভগবতি গরুড়ে, ত্বদ্রূপমেতৎ সদসৎ পরাবরম্ ইত্যাদিনা সুদর্শন-চক্রে বিরুদ্ধধর্ম্মাভিধানং স্মর্য্যতে; তৎ ব্রহ্মবুদ্ধ্যৈব, ন তূপাধিপরিচ্ছিন্নত্বাভিপ্রায়েণ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ ইত্যাদিমীমাংসাবাক্যাৎ। অতো হরৌ নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যে ন কোঽপি স্যাদসম্ভব ইত্যাদিবাক্যদৃষ্ট্যা বিশেষেণ বিষ্ণাবেব ব্রহ্মত্বং সর্ব্বধর্ম্মাশ্রয়ত্বঞ্চ কেবলবিষ্ণুপ্রতিপাদকশাস্ত্রেষু শ্রদ্ধাবতা ভবতা যদভিহিতং তৎসর্ব্বশাস্ত্রপ্রামাণ্যসম্পাদকাসম্মতমেব; প্রত্যুত শৈবাঃ—রুদ্রভক্ত্যা তু কৃষ্ণেণ জগদ্‌ব্যাপ্তং মহাত্মনা ইত্যাদিবাক্যাৎ বিষ্ণোর্বিভুত্বমানন্দবিগ্রহত্বঞ্চ শশিসূর্য্যাগ্নিনেত্রস্য মহেশ্বরস্য প্রসাদাৎ, শাক্তাশ্চ গোলোকাধিপতির্দেবীস্তুতিপরায়ণঃ কালীপদপ্রসাদেন সোঽভবল্লোকপালকঃ ইত্যাদিদর্শনাৎ ভগবতঃ কৃষ্ণস্য গোলোকাধিপতিত্বং জগৎপালকত্বঞ্চ নিখিলবিশ্বেষাং সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারয়িত্র্যা দেব্যাঃ প্রসাদাদেব মন্যন্তে। অন্যোন্যাকৃষ্ট্যা শাস্ত্রসংঘর্ষণেন তদ্ব্যাকুলীকরণং স্বপক্ষপক্ষপাত-সোপাধিকোপাসকা ইব প্রেপ্সিতং-

ব্রহ্মবিদ্যায়াং বিশেষনিষ্ঠিতৈঃ ভবদ্ভিঃ কদাপি নাশঙ্কনীয়ং, যতঃ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোপপুরাণতন্ত্রসংহিতানিগমাগমপ্রভৃতীনি সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা পরব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বেনাস্মন্নির্ষ্ঠানামনুকূলান্যেব ভবন্তি। বিষ্ণুপরায়ণেন ভগবতা (?) যদুক্তং বিষ্ণুৎকর্ষং শ্রুত্বা শিবপ্রাধান্যায় মাহেশ্বরগীতা-শৈবকান্দবচনানি পঠন্তঃ শৈবাঃ, তথা দেব্যুৎকর্ষায় আগমোক্তবচনানি অধীয়ানাঃ শাক্তাশ্চ হরিহরোপাসকমতেন দণ্ড্যাস্তৈঃ সহাপরিচ্ছিন্নবিগ্রহোপাসনারসিকানামালাপনমপ্যসাম্প্রতমিতি তেন তু বদতো ব্যাঘাতঃ (?); যদি স্বেষ্টদেবোৎকর্ষপ্রতিপাদনাৎ শৈবাঃ শাক্তাশ্চ হরিহরোপাসকৈর্দ্দণ্ডনীয়া এবমপরিচ্ছিন্নোপাসনারসিকৈরনালাপ্যাঃ স্যুস্তদা তেনৈব স্বেষ্টদেবোৎকর্ষকথনাপরাধেন বৈষ্ণবা অপি কথং দণ্ডনীয়া অনালাপ্যাশ্চ ন ভবেয়ুঃ? বস্তুতো দেবানাং তদিতরেষাঞ্চোৎকর্ষং ব্রহ্মোৎকর্ষত্বেন মন্যমানৈরপরিচ্ছিন্নোপাসনারসিকতত্ত্ববিদ্ভিঃ স্বস্বেষ্টদেবোৎকর্ষং কথয়ন্তঃ শাক্তশৈববৈষ্ণবা দ্বেষ্যত্বেনানালাপ্যত্বেন চ কদাপি ন পরিগৃহ্যন্তে। কিঞ্চ পুরুষোত্তমস্য বিষ্ণোর্মাহাত্ম্যসূচনায় যানি স্বকৃতবহুবিধানি গদ্যানি ভাগবত-ভগবদ্গীতাবচনানি চ অলেখিষত, তানি তু—তাদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম-ইত্যাদি-শ্রুত্যর্থান্ বিভাবয়দ্ভিঃ প্রেপ্সিতব্রহ্মবিদ্যৈঃ, এবং—প্রসাদ্য বরদং দেবং চরাচরগুরুং শিবং, যুগে যুগে তু কৃষ্ণেণ তোষিতো বৈ মহেশ্বর-ইত্যাদিভারতীয়বচনানি পঠদ্ভিঃ শৈবৈঃ, নির্ম্মাল্যং কালিকা-দেব্যা গৃহ্যতে বিষ্ণুনা সতা, অংশশ্চ পালকো বিষ্ণুর্মহাসত্ত্বপরায়ণ-ইত্যাদিবাক্যান্যধীয়ানৈঃ শাক্তৈশ্চ বিরুদ্ধার্থায় ন কল্প্যন্তে। আস্তাং তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে, যাবন্ন দৃশ্যতে সাক্ষাৎ শ্রীমদ্ভাগবত-পরম্-ইত্যাদিনা ভাগবতস্য তদিতরপুরাণেভ্যঃ প্রাধান্যং, এবং—গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ-ইত্যাদিনা মাহেশ্বরগীতাদিভ্যো ভগবদ্গীতায়া উৎকর্ষঞ্চ যৎ ধ্বনিতং তদদষ্টোবাসঞ্জতং, ভগবতো ব্যাসস্যাপ্তত্বেন তদীয়বাক্যানাং প্রমাণত্বেনাবৈষম্যাৎ। কিঞ্চ অস্মৎপ্রভৃতিকতিপয়ৈঃ পুরাণত্বেন মান্যস্য ভাগবতস্য পুরাণত্বেন সর্ব্বলোকপরিগৃহীতশিব-লিঙ্গ-স্কন্দাদিভ্যঃ প্রাধান্যকথনং সর্ব্বজ্ঞত্বেন তুল্যয়োর্ভগবতোঃ পদ্মনাভ-মহেশ্বরয়োর্মুখনিঃসৃত-ভগবদ্গীতা-মহেশ্বরগীতয়োর্বৈষম্যজ্ঞানঞ্চ পক্ষপাতসংজাতদৃঢ়সংস্কারেভ্য এব রোচতে। য। ভগবদ্গীতায়া ভাগবতস্য চ প্রাধান্যং চিকীর্ষুণা ভবতা তয়োঃ স্তুতিপরাণি বচনানি লিখিতানি তথৈব প্রত্যেকপুরাণস্য স্বস্বাগমসংহিতায়াশ্চ প্রশংসার্থকানি বহূনি বচনানি প্রাপ্যন্তে। তেষু কানিচিৎ বচনানি লিখ্যন্তে। মহাভারত-মাহাত্ম্যে আদিপর্ব্বণি—একতশ্চতুরো বেদাঃ ভারতঞ্চৈতদেকতঃ। পুরা কিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতম্॥ চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যোহ্যধিকং যদা। ততঃ প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে॥ শৈবে—যথা গ্রহাণাং তপনঃ নদীনাং জাহ্নবী যথা। যথা সুরাণাং বিশেশঃ পুরাণানামিদং তথা॥ মহানির্ব্বাণে—যথা নগেষু হিমবান্ তারকাসু যথা শশী। তাপবান্ তেজঃসু তন্ত্রেষু তন্ত্ররাজমিদং তথা॥ কুলার্ণবে—কিং বেদৈঃ কিং পুরাণৈশ্চ কিং শাস্ত্রৈর্বহুভিঃ শিবে। বিজ্ঞাতেঽস্মিন্ মহাতন্ত্রে সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥ এতানি বচনানি তু তত্তচ্ছাস্ত্রমাহাত্ম্যপ্রতিপাদকান্যেব, ন ত্বন্যোন্যপ্রামাণ্যব্যবচ্ছেদকানি; অন্যথা পরস্পরবিরোধিত্বাৎ সর্ব্বেষাং শাস্ত্রাণাং প্রমাণত্বং ব্যাহন্যেত। সত্ত্বগুণস্য শ্রৈষ্ঠ্যাত্তদুপহিতস্য বিষ্ণোঃ রজস্তমোগুণোপহিতাভ্যাং ব্রহ্মশিবাভ্যাং প্রাধান্যং মন্যমানানাং বৈষ্ণবানাং মতং ভবতা স্বয়মেবানভীষ্টত্বেন মতম্; অতএব তত্রালং বাগ্ব্যয়েন, তেষাং প্রবোধনায় পূর্ব্বপ্রস্থাপিতোত্তরং বহুমন্যামহে। যদুক্তং ভগবৎপূজ্যপাদশ্রীশঙ্করাচার্য্যেণ কুত্রাপি ভাষ্যাদৌ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহস্য পরিচ্ছিন্নত্বাদিকং নাশঙ্কিতং, তত্ত্বশেষশাস্ত্রদর্শিনাং ভবতামযোগ্যমিব ভাতি। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তনামরূপাণি মায়াকার্য্যত্বেন নিশ্চিতবদ্ভিঃ পূজ্যপাদৈস্তলবকারোপনিষদ্ভাষ্যে যদভিহিতং তদাকর্ণ্যতাং—"অন্যদেব তদ্বিদিতাদথোঽবিদিতাদধি" ইত্যনেন বাক্যেনাত্মা ব্রহ্মেতি প্রতিপাদিতে শ্রোতুরাশঙ্কা জাতা,—কথঞ্চাত্মা ব্রহ্ম? আত্মা হি নামাধিকৃতঃ কর্ম্মণ্যুপাসনে চ। সংসারী কর্ম্মোপাসনং বা সাধনমনুষ্ঠায় ব্রহ্ম দেবান্ স্বর্গং বা প্রাপ্তুমিচ্ছতি; তস্মাদন্য উপাস্যো বিষ্ণুরীশ্বর ইন্দ্রঃ প্রাণো বা ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি ন ত্বাত্মা, লোকপ্রত্যয়বিরোধাচ্চ। তথান্যে তার্কিকা ঈশ্বরাদাত্মাঽন্য ইত্যাচক্ষতে। তথা কর্ম্মিণোঽমুং যজ অমুং যজেত্যনেনান্যা এব দেবতা উপাসতে, তস্মাদ্যুক্তং যদ্বিদিতমিত্যুপাস্যং তদ্ব্রহ্ম ভবেৎ ততোঽন্য উপাসক ইতি। তামেতামাশঙ্কাং শিষ্যস্য লিঙ্গেনোপলক্ষ্য তদ্বাক্যাদ্বা মৈবং শঙ্কিষ্ঠাঃ যচ্চৈতন্যমাত্রমিত্যাদি। ভবৎপ্রশংসিত-রামনারায়ণ-ক্ষত্রিয়শ্রীমন্নৃপনারায়ণ-শিরোমণী বিজয়েতাং স্বস্বশিষ্যান্ স্বমতম্ উপদিশতাঞ্চ; এবং শাক্তশৈবাদিসংস্থিত-শ্রীযুক্তকাশীপ্রসাদাগমবাগীশ-শ্রীমৎকালীশঙ্করভট্টাচার্য্য-শ্রীলশ্রীগৌরহরানন্দগোস্বামিনোঽপি বিজয়েতাং স্বকীয়চ্ছাত্রান্ শাস্ত্রার্থান্ গ্রাহয়ন্তু চ, তযোস্তেষু চান্তরবৈরাণাম্, অস্মাকং তেন হানিলাভৌ ন স্তঃ। যল্লিখিতং—যাবন্তি রোগনিবর্ত্তকান্যৌষধানি সন্তি একেনৈব রোগিণা তানি সর্ব্বাণ্যেব ন সেব্যানি, কিন্তু রোগং নিশ্চিত্য তন্নিবর্ত্তকমৌষধং ভুঙ্ক্তে; এবং যুক্ত্যা স্বাজ্ঞানদূরীকরণপর্য্যন্তং তদনুকূলশাস্ত্রাভ্যাসস্য গুণত্বেনাভিধানাৎ বৈষ্ণবশাস্ত্রাভ্যাসোঽন্যশাস্ত্রাভ্যাসো বৈষ্ণবানাং যুক্ত ইতি, তত্তু পাক্ষিকোপাসকানামপাতত্তো রমণীয়ং; তত্ত্বতস্তু সকলশাস্ত্রসন্দর্ভবিরুদ্ধ-

মিব ভাতি, অবিদ্যাবন্ধনকদৈকযোগস্য স্বতত্ত্বজ্ঞানস্যৈক-ত্বেবজং বিনাহন্যৌষধবিরহাৎ—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়, নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে, সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ, সর্ব্বেষা-মপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং, তদ্ধ্যগ্রং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ, কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি, তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবজ্জ্ঞানং ন বিন্দতি - ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিমানবস্তুত্যাগমপ্রমাণাৎ। অতএব সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা আত্মতত্ত্বপ্রতিপাদকানি সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি আত্মতত্ত্ববিবিদিষূণাং যথাশক্তি আলোচ্যানি ভবন্তি। সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি॥ ওমিত্যেতৎ॥

২০ অগ্রহায়ণস্য ১২২৩।

ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বকথা।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কতকগুলি পুরাতন কথা আমি ইতিপূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়াছি, এবং যাঁহারা আদিব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের কয়েক জনের পরিচয়ও দিয়াছি। বাকী যাহা জানি, তাহা আমার মৃত্যুর সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায়, বিশেষতঃ সাধারণব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত শ্রীযুক্ত প্রতুল চন্দ্র সোম ও শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয়ের অনুরোধে আমি তাহা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিয়া যাইব স্থির করিয়াছি। এবারে ভবানী-পুর ব্রাহ্মসমাজের কথা লিপিবদ্ধ হইল। পরবর্ত্তী সংখ্যা হইতে বেহালা, হুগলী, বর্দ্ধমান, কালনা, বহরমপুরপ্রমুখ ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে যাহা আমি নিজ জ্ঞানে জানি, তাহার উল্লেখ করিতে থাকিব।

ভবানীপুর-ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে হাইকোর্টের অন্যতম জজ ৺শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের নাম ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত। তিনি যখন ওকালতি করিতেন, তখন ভবানীপুর জগুবাবুর বাজারের ঠিক উত্তরে রসারোডে তাঁহার যে বাসা ছিল, সেইখানেই ব্রহ্মোপাসনা চলিত। তাঁহার অন্য সঙ্গী ছিলেন উক্ত আদালতের সিনিয়ার উকীল শ্রদ্ধেয় অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। জজ দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়েরও উক্ত সভার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি ছিল, আর ছিল বয়োবৃদ্ধ নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মী শ্রদ্ধেয় শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাহার পরে উক্ত সভা বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজগৃহে আনীত হইলে উহার ট্রষ্টী হন বিখ্যাত উকীল মহেশ চন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিগণ। মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় খ্যাতনামা উকীল শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী অনেকদিন ধরিয়া ভবানী-পুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। হাইকোর্টের তদানীন্তন জজ রমেশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়েরও উক্ত সমাজের সহিত যোগ ছিল। আমার পিতা ৺বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহুদিন ধরিয়া সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য্য চালাইয়া আসিয়াছিলেন। ইং ১৮৮৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে আমি একদিন ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে উপা-সনা করিতেছি, দেখিলাম রমেশ বাবু আসিয়া উপস্থিত। তিনি উপাসনার শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। নিয়মিত উপাসকের মধ্যে হাইকোর্টের উকীল ৺গিরিজাশঙ্কর মজুমদার, মুনসেফ পরে জেলা জজ যোগেশ চন্দ্র মিত্র, শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার রামকৃষ্ণ চন্দ্র প্রমুখ কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; একদিনের জন্যও তাঁহাদের অনাগমন ঘটিত না। সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র-লেখক ৺শীতল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মধ্যে মধ্যে বেদীতে বসিতেন। উৎসবের সময় ভবানীপুরের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত উকীল ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি-গণের আগমনে সমাজগৃহে ও তাহার বারাণ্ডায় স্থান সঙ্কুলান হইত না। বিষ্ণুবাবু প্রমুখ বিখ্যাত গায়কগণ সঙ্গীত করিতেন। একবার বিখ্যাত গায়ক যদুভট্ট উৎসবে বিষ্ণু বাবুর সহিত গান করেন। এতদ্ব্যতীত বিষ্ণু বাবু প্রতি সোমবার সাপ্তাহিক উপা-সনায় গান করিতে আসিতেন। রমেশ বাবু (জজ) সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। প্রায়ই উপাসনার পরে কলাবিৎ বিষ্ণু বাবুকে নিজ গৃহে (ব্রাহ্মসমাজের ঠিক পার্শ্বে) ডাকিয়া পাঠাইতেন। সেখানে অনেকক্ষণ ধরিয়া সঙ্গীত হইত এবং তাঁহার ভ্রাতা অদ্বিতীয় মৃদঙ্গবাদক কেশব বাবু পাখোয়াজ বাজাইতেন। এইরূপে পরস্পরে ও তৎসঙ্গে শ্রোতৃবৃন্দ বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেন। এখন আর সে বিষ্ণু বাবুও নাই ও ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ-স্বরূপ আমার পিতাও বর্ত্তমান নাই। শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ভবানীপুরে চৌধুরী মহাশয়দিগের বাটীতে অবস্থানকালীন, তিনি সর্ব্বপ্রথম আমার পিতার মুখে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মোপাসনা শ্রবণ করেন, তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল না।

আজকাল ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের প্রতি জনসাধা-রণের সেরূপ উদ্যম ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না। বিগত প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ আমি প্রতি সোমবার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করি। সুকণ্ঠ গায়ক অক্ষয় চন্দ্র মল্লিক (কিরণ) আর জীবিত নাই। তাঁহার

স্থানে চুণিলাল মুখোপাধ্যায় ও পাঁচুগোপাল মল্লিক সঙ্গীতের ভার লইয়াছেন।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের আর একটু ইতিহাস আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এখানে ব্রহ্ম বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য ছাত্রদিগের মধ্যে শিতিকণ্ঠ মল্লিক, রাজেন্দ্র নাথ মল্লিক (বিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের পিতা), প্রসন্ন কুমার বিশ্বাস, ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী, শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আদিব্রাহ্মসমাজে সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ-আচার্য্যগণই পূর্ব্ব হইতেই বেদীর কার্য্য করিতেছিলেন। আদিব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে মহর্ষি তাহার বিশেষ অন্যথা করেন নাই। কেবলমাত্র কেশব বাবু ও রাজনারায়ণ বাবু অল্প দিনের জন্য সে অধিকার পান। আদিব্রাহ্মসমাজ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মণেতর আচার্য্য বেদীর কার্য্য করিতেন। আমার পিতার পূর্ব্বে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে একজন বঙ্গজ কায়স্থ আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। মহর্ষিও একবার নিজে প্রসন্নকুমার বিশ্বাসকে লইয়া বেদীতে বসেন ও একত্রে উপাসনা-কার্য্য সম্পন্ন করেন। যাঁহারা মহর্ষিকে এ সম্বন্ধে অনুদার বলিতে চান তাঁহাদের একথা জানা উচিত। প্রসন্ন বাবু ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ব্রজসুন্দর মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।*

এখানে আর একটী কথা উল্লেখযোগ্য। উহা ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের সহিত সংযুক্ত। কেশব বাবু আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার পরে শিতিকণ্ঠ মল্লিক, ব্রজনাথ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ কয়েকজন কেশব বাবুর ঘোর পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজকে আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহাকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য একটী মোকর্দ্দমা প্রায় ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে আলিপুর-জজ আদালতে উপস্থিত হয়। ঐ মোকর্দ্দমা তুমুলভাবে চলিয়াছিল। আমার পিতা আদিব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একজন সাক্ষী ছিলেন। ঐ মোকর্দ্দমা খরচা সহ ডিস্‌মিস হইয়া যায়। আদিব্রাহ্মসমাজের পক্ষীয়গণ জয়যুক্ত হন। কিন্তু তাঁহারা নিজ উদারতাবশতঃ মোকর্দ্দমার খরচার জন্য বিরোধীপক্ষের বিরুদ্ধে ডিক্রীজারি করেন নাই, উহা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

আর একটী কথা এই, ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ সাধারণের চাঁদায় নির্ম্মিত হয়। গৃহটী প্রস্তুত হইয়াছিল বটে কিন্তু অর্থের অভাবে দরজায় "বালগুলি" প্রস্তুত হয় নাই, দর্ম্মা দিয়া বন্ধ করিতে হইত। ঐ অবস্থায় একদিন উপাসনার জন্য দেবেন্দ্রনাথ আহূত হন এবং তিনি স্বচক্ষে দরজাগুলির দুর্দ্দশা দেখিয়া নিজ ব্যয়ে উহার বালগুলি প্রস্তুত করিয়া দেন। শিতিকণ্ঠ বাবু শেষ জীবনে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি গৃহটীর উন্নতিসাধনের জন্য নিজ হইতে অনেক টাকা ব্যয় করেন। তিনিই সমাজগৃহে তাড়িত আলোক ও পাখা ব্যবস্থা করেন। বিগত বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বিশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবার জন্য যোগ্য ব্যক্তি মিলিতেছে না। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে বর্ষশেষ-দিনের উপাসনায় আমি মহর্ষিদেবকে উপাসনা ও বক্তৃতা করিতে দেখিয়াছি। তাঁহার তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত থাকিয়া ঐ বক্তৃতার যে নোট লন, তাহা ১৭৯৭ শকের আষাঢ় মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। রাজা রামমোহন রায়ের আবাসনিকেতনের সান্নিধ্যে খানাকুলে তাঁহার বাস ছিল। তিনি প্রথমে পটলডাঙ্গায় পরে ভবানীপুরে আসিয়া বাস করেন। তিনি ইংরাজী আইন পুস্তকের প্রকাশক ছিলেন। প্রিভি কাউন্সিলের নজির তিনি কয়েক ভলুমে বাহির করেন। প্রথম প্রথম উহা তিনি হাইকোর্টের উকিল প্রাণনাথ পণ্ডিতের নামে এবং পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে আমার নামে বাহির করেন। ভবানীপুরে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ট যোগ ছিল। তাঁহারই সংস্পর্শে আসিয়া আমার পিতা ব্রাহ্মসমাজের আলোক পান। আমার পিতাকে বিশেষ উৎসাহী ও বুদ্ধিমান দেখিয়া তিনি মহর্ষির সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেন। আমার পিতা যে বেহালাব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বহু পরিমাণে তাঁহারই উৎসাহে। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ৯০ বৎসরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি অতীত কালের জীবন্ত সাক্ষী ছিলেন। পঠদ্দশা হইতেই ব্রাহ্ম-

---

* ঢাকার শ্রদ্ধেয় ব্রজসুন্দর বাবুর কন্যার সহিত প্রসন্নবাবুর বিবাহ ১৭৮১ শকে হয়। ব্রজসুন্দর বাবু বঙ্গজ কায়স্থ, অথচ প্রসন্ন বাবু দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থ; এইরূপ বিবাহ এতদঞ্চলে এই প্রথম। এই বিবাহ মহর্ষির চেষ্টায় সংসাধিত হইয়াছিল। মহর্ষি হিন্দুর বর্ণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে যে সব উপবিভাগ বর্ত্তমান, তাহা বিদূরণের প্রয়াসী ছিলেন। এই কারণেই পরবর্ত্তী সময়ে নিজের পৌত্রী ৺প্রতিভা দেবীর সহিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সন্তান আশুতোষ চৌধুরীর বিবাহ হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার ভবিষ্যৎদৃষ্টি ও উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সমাজের সঙ্গে ও আমার পিতার সঙ্গে তাঁহার যোগ ছিল। বার্দ্ধক্যেও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার উৎসাহ ম্লান হয় নাই। এক সোমবার ভয়ানক দুর্দ্দিন, সন্ধ্যা হইতেই প্রবল ঝড় ও নিদারুণ বারিপাত আরম্ভ হইয়াছে। উপাসনা অন্তে বিদায়কে পড়িয়া আমি শ্রীনাথ বাবুকে বলিলাম,—আজ আর বাড়ী ফিরিতে পারিব না, এখানে সমাজের বেঞ্চের উপর শুইয়া থাকি। আপনার বাড়ী তো দূরে নহে, আপনি চলিয়া যান। উত্তরে তিনি বলিলেন,—বাবা! তুমি এখানে একলা পড়িয়া থাকিবে আর আমি বাড়ী যাইব, তাহা হইবে না; আমিও তোমার নিকট এই সমাজেই থাকিব। আমি তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিলাম না। দুইজনেই সমাজ-গৃহে পড়িয়া রহিলাম। পরদিন প্রাতে ঝড়বৃষ্টি থামিলে পদব্রজে বেহালায় আসিলাম। অনেকের নিকট এইরূপ সদয় ব্যবহার পাইয়া যৌবনের এক সময় সরসভাবে অতিবাহিত হইয়াছে। কিন্তু "তে হি নো দিবসা গতাঃ"; আজকালকার দিনে সেরূপ আন্তরিকতা আর খুঁজিয়া পাই না।

সফলতা।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

ওগো পিতা মোর জীবনে আজ কি সুপ্রভাত,
তোমার উদার কিরণে যে ঘুচিয়ে দিলা রাত।
ডাকিনি গো আপনি ছুটে এলে
কি করুণার স্নিগ্ধ ধারা ঢেলে
তোমায় প্রণাম দেবার আগে করলে আশীর্ব্বাদ
ওগো পিতা মোর জীবনে আজ কি সুপ্রভাত!

উদার স্নেহে বিশাল বুকে নিলে আমার টানি,
অন্তঃমুখে শোনালে কি মরম-হরণ বাণী;
আপনি তুমি কতই যতন করে
খাওয়াও সুধা আমায় আশা ভরে
সব জ্বালা দূর করে যে বুলিয়ে দাও হাত
ওগো পিতা মোর জীবনে আজ কি সুপ্রভাত।

স্বাস্থ্যপথ্য।

অন্ন।

(শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

ভৃষ্ট তণ্ডুলান্ন।

ভৃষ্ট তণ্ডুলের অর্থাৎ ভাজা চাউলের ভাত চরকের মতে শ্লৈষ্মিক রোগ প্রভৃতিতে পথ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু সুশ্রুতে উহা লঘু ও কফনাশক বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"লঘুঃ সুগন্ধিঃ কফহা বিজ্ঞেয়ো ভৃষ্টতণ্ডুলঃ॥"

চক্রপাণি দ্রব্যগুণসংগ্রহে উহাকে অত্যন্ত লঘু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা,—"ভৃষ্টতণ্ডুলজোঽত্যর্থং" এই অংশের ব্যাখ্যায় টীকাকার শিবদাস বলিয়াছেন যে, "ভৃষ্টতণ্ডুলজ স্তু অত্যর্থং লঘুঃ"।

ভৃষ্টতণ্ডুলকৃত অন্নের সুপথ্যতা পুনরাবর্ত্তক জ্বররোগাক্রান্তের শরীরে সুপরীক্ষিত। এমন কতক রোগী দেখা যায়, জ্বর বেশ সারিয়া গেলেও অন্নপথ্য করিলেই আবার তাহাদের জ্বর দেখা দেয়। তাহাদের পক্ষে ভৃষ্ট তণ্ডুলের অন্ন সহ্য হয়। ভর্জ্জনপ্রক্রিয়ায় তণ্ডুলস্থ স্বাভাবিক রস বিশুষ্কিত হয়, উহাই উল্লিখিত রোগীর পক্ষে সুপথ্যতার কারণ।

চরকে মাংসাদির সহিত পক্ব অন্নের গুণ-বিশেষ কথিত হইয়াছে,—

"মাংস-শাক-বসা-তৈল-ঘৃত-মজ্জা-ফলৌদনাঃ।
বল্যাঃ সন্তর্পণা হৃদ্যা গুরবো বৃংহয়ন্তি চ॥"

মাংস শাক (তরকারী) বসা তৈল ঘৃত মজ্জা ও ফল, ইহাদের সহিত একত্র পক্ব অন্ন বলকর সন্তর্পণ হৃদ্য গুরুপাক ও শরীরবর্দ্ধক।

দ্রব্যগুণসংগ্রহে চক্রপাণি বলিয়াছেন যে, মাংসাদির সহিত সিদ্ধ অন্ন, শুক্র ও শরীরবর্দ্ধক। রসৌদন অর্থাৎ মাংসরসের সহিত পক্ব অন্ন অংশোষক বলবর্দ্ধক অন্নরোচক ও বায়ুনাশক।

স্বর্গীয় ডাক্তার অক্ষয়কুমার ভাদুড়ি মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার একটি অদ্ভুত প্রকৃতির রোগী ছিল। জ্বর হইলে সেই রোগী কোনরূপ খাদ্যই গ্রহণ করিত না। উপবাসে রোগীর আপত্তি ছিল না। কিন্তু যেদিন রোগীকে পথ্য দিতে হইবে, সেই দিনই পোলাও দেওয়া আবশ্যক। রোগীর পক্ষে পোলাও এতই সাত্ম্য ছিল যে, দীর্ঘকাল অনাহারের পরও পোলাও তাহার বেশ জীর্ণ হইত।

চক্রপাণির দ্রব্যগুণে পানীয়ভক্তের (পান্তাভাতের) গুণ বলা হইয়াছে,—

"পানীয়ভক্তং বুধিতং মেহঃ-স্বেদ-কফপ্রদম্।
ত্রিদোষ-কোপণং রুক্ষং মলকৃন্মূত্রলং পরম্॥"

বাসী পান্তাভাত মেহঃ স্বেদ ও কফবর্দ্ধক, ত্রিদোষের প্রকোপজনক, রুক্ষ, মলনিঃসারক ও অত্যন্ত মূত্রবর্দ্ধক।

বিষপ্রয়োগের রোগীকে বিষোপদ্রব-প্রশমনার্থ অনেক সময় পান্তাভাতের জল পথ্যরূপে খাইতে দেওয়া হইয়া থাকে। অতিমাত্রায় দীর্ঘকাল ঔষধ খাইতে খাইতে যাহার শরীর অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া যায়, অনিয়তরূপে হাঁই উঠিতে থাকে, চক্ষুজ্বালা অনুভূত হয়, তাহাদের পক্ষে পান্তাভাত পথ্য। পান্তাভাতের রুক্ষগুণ এবং ত্রিদোষকোপণতা উপলব্ধ হয় না। প্রত্যুত বায়ুপ্রশমন-গুণ অনুভূত হয়।

ঘোলের সহিত ভাত "ঘোলভক্ত" নামে অভিহিত হইয়াছে।

"ঘোলভক্তং শ্রমার্শোঘ্নং রুচ্যং তর্পণদীপনম্॥"

ঘোলের সহিত অন্ন শ্রমনাশক অর্শরোগনাশক রুচিকর, তর্পণ এবং অগ্নির উদ্দীপক। যদিও এস্থলে নিরুপপদ ভক্ত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তথাপি ব্যবহারানুসারে উহা পানীয়ভক্ত বলিয়াই বুঝিতে হইবে। ঘোলপান্তাই লোকে উল্লিখিত গুণশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ডাইল ভাত।

জ্বর-বিরামের পর মুগডাইলের অথবা মসুরডাইলের সহিত অন্ন পাক করিয়া রোগীকে পথ্য দিবার ব্যবস্থা পূর্ব্বে খুব দেখিয়াছি। এখনও এই রীতি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

ধান্যের শ্রেণীবিভাগ।

ধান্যের জাতিবিভাগানুসারে তৎসম্ভূত তণ্ডুলনিষ্পন্ন অন্নের গুণবিশেষ লক্ষিত হয়। আয়ুর্ব্বেদ স্মৃতি প্রভৃতি নানা শাস্ত্রেই ধান্যের নানাপ্রকার শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়।

রাজবল্লভ-দ্রব্যগুণ নামক নাতিপ্রাচীন-নিবন্ধে ধান্যের শালি, ষষ্টিক ও ব্রীহি এই তিন প্রকার বিভাগ দেখা যায়।

"অথ ধান্যং ত্রিধা শালি-ষষ্টিক-ব্রীহিভেদতঃ।"

এই তিন শ্রেণীর ধান্যের মধ্যে হেমন্তকালজাত ধান্য "শালি"। গ্রীষ্মকালজাত ধান্য "ষষ্টিক" এবং বর্ষাকালজাত ধান্যের নাম ব্রীহি ও আশুধান্য অর্থাৎ আউস।

"শালয়ো হৈমনা তত্র ষষ্টিকা গ্রীষ্মজা অপি।
ব্রীহয়শ্চাশবঃ খ্যাতাঃ প্রাবৃট্কালসমুদ্ভবাঃ॥"

ইহাদের মধ্যে শালিধান্য-তণ্ডুলজ অন্ন মধুর শীতবীর্য্য লঘুপাক সুখজনক, (পাঠান্তরে বলকারক) পিত্তনাশক বায়ু ও কফের কিঞ্চিদ্বর্দ্ধক স্নিগ্ধ অল্পমলকারক ও মলসংকোচক।

"শালয়ো মধুরাঃ শীতা লঘুপাকাঃ সুখাবহাঃ।
(বলাবহাঃ। পাঠান্তরম্)
পিত্তঘ্নাস্তোনিল-কফাঃ স্নিগ্ধা রুক্ষাল্পবর্চ্চসঃ॥"

গ্রন্থকার বর্ষাকালজাত আশুধান্যকে ব্রীহি নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই নির্দ্দেশ সঙ্গত হয় নাই। কারণ বিবিধ স্মৃতিনিবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থে শরৎকালপক্ক ধান্যই ব্রীহি-নামে কথিত হইয়াছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন,

"ব্রীহিঃ শরৎপক্ক-ধান্যং"। শ্রাদ্ধতত্ত্ব।

শরৎকালে এবং বসন্তকালে নবযজ্ঞের বিধান আছে।

"শরৎবসন্তয়োঃ কেচিন্নবযজ্ঞং প্রচক্ষতে।"

এবং ব্রীহিপাকে ও যবপাকেও নবযজ্ঞের বিধান দেখা যায়,—

"ব্রীহিপাকে চ কর্ত্তব্যং যবপাকে চ পার্থিব।"

সুতরাং শরৎকালপক্ক ধান্যের নামই ব্রীহি। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যদিগের মতেও শরৎপক্ক ধান্যই ব্রীহি।

ধান্যের মধ্যে রক্তশালির গুণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যথা—

"রক্তশালি স্ত্রিদোষঘ্নশ্চক্ষুষ্যঃ শুক্রমূত্রলঃ।
তৃষ্ণাঘ্নো বহ্নিকৃৎ স্বর্য্যো হৃদ্যস্তদনু চাপরে॥"

রক্তশালির অন্ন ত্রিদোষনাশক চক্ষুর হিতকর শুক্রবর্দ্ধক মূত্রকারক তৃষ্ণানিবারক অগ্নিবর্দ্ধক স্বরমাধুর্য্যজনক ও হৃদয়ের হিতকর। অন্যান্য ধান্যের তণ্ডুল গুণে নিকৃষ্ট।

উক্ত ধান্যের চাউল রক্তবর্ণ হয় বলিয়াই উহার রক্তশালি নাম হইয়াছে, এমত মনে হয়। উহাকে রাজসাহী প্রদেশে "গুনী" ধান বলিয়া থাকে। পূর্ব্বময়মনসিংহে উহার পারিভাষিক নাম "আমন"। উহার ভাত নূতনাবস্থায় অতীব মিষ্ট। আমাদের প্রদেশে উহার আতপ চাউল ভিন্ন 'উষ্ণা' হইত না; কারণ মুসলমান পর্য্যন্তের বিশ্বাস ছিল যে আমন ধান বামুন, উহাকে সিদ্ধ করা যায় না। আজকালের অবস্থা জানি না। দাউদখানি ধান্যও রক্তশালি, ইহা অনেকের মত। লোহিতশালি প্রভৃতি নিত্য আমনের উদাহরণ। আমনধান জমিতে ছিটান হইয়া থাকে, রোপিত হয় না। ছিটা ধানের চাউল সাধারণতঃ মোটা হইয়া থাকে। কিন্তু একবার পুস্তকানুসন্ধান প্রসঙ্গে আমাতী গিয়া শ্রীযুক্ত কামদা বিশী মহাশয়ের অতিথি হইয়াছিলাম। সেখানে খুব সরু গুনীর চাউল দেখিয়াছি। কামদা বাবু আমাকে খির্সাপাতের ভাত দিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের খাদ্য ছিল সরু গুনী। তাহাতে আমার মনে হইয়াছিল যে, রক্তশালি গুণে অটুট হইলেও আজকাল ভদ্রতার হিসাবে হেয় হইয়া পড়িয়াছে।

মাতৃসংযুক্ত নূতন তণ্ডুলীর গরম গরম ভাত ঘৃতসৈন্ধব-সংযোগে একটি উল্লেখযোগ্য উপাদেয় খাদ্য। নারিকেল গুড় দুগ্ধ ও কদলীসংযোগে উহার নূতন চাউলও বেশ মুখরোচক খাদ্য। এই চাউল নূতনাবস্থায়ও বাঙ্গালীর সাত্ম্য সুতরাং পথ্য।

রক্তশালির গুণাপেক্ষা অন্যান্য শালির গুণ কিঞ্চিৎ হীন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

"শালয়ো রক্তশালীনাং কিঞ্চিদ্দীনগুণা গুণৈঃ।"

দগ্ধভূমিতে যে সকল শালিধান্য জন্মিয়া থাকে, তাহার অন্ন লঘুপাক কষায়রস বিষ্ঠামূত্রের সঙ্কোচক রুক্ষ ও শ্লেষ্মনাশক।

দগ্ধায়াং যবনৌ জাতাঃ শালয়ো লঘুপাকিনঃ।
কষায়া বদ্ধবিন্মূত্রা রুক্ষাঃ শ্লেষ্মাপকর্ষণাঃ॥

যে সমস্ত শালিধান্য ছিন্নপ্ররূঢ় অর্থাৎ একবার গাছ কাটিয়া ফেলিলে পুনরায় গোড়া হইতে নির্গত ও বর্দ্ধিত গাছ হইতে সঞ্জাত, তাহাদের অন্ন রুক্ষ ও মলনিরোধক।

"শালয় শ্ছিন্নরূঢ়া যে রুক্ষাস্তে বদ্ধবর্চ্চসঃ॥"

ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে শালির এবং রক্তশালির অন্য-প্রকার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"কণ্ডনেন বিনা শুক্লা হৈমন্তাঃ শালয়ঃ স্মৃতাঃ।
শালয়ো মধুরা স্নিগ্ধা বল্যা বদ্ধাল্পবর্চ্চসঃ॥
কষায়া লঘবো রুচ্যাঃ স্বর্য্যা বৃষ্যাশ্চ বৃংহণাঃ।
অল্পানিলকফাঃ শীতাঃ পিত্তঘ্না মূত্রলাস্তথা॥"

অর্থ—ছাঁটনপ্রক্রিয়া ব্যতীতই যাহার চাউল শুক্লবর্ণ হয়, তাদৃশ হৈমন্তিক ধান্যের নাম "শালি"। শালায় মধুর স্নিগ্ধ বলকারক মলরোধক ও অল্প মলকারক কষায়রস লঘুপাক রুচিকর স্বরসংশোধক বৃষ্য পোষক অল্পবায়ু-জনক শীতগুণ পিত্তনাশক ও মূত্রকারক।

রক্তশালির্বরস্তেষু বল্যো বর্ণ্য স্ত্রিদোষজিৎ।
চক্ষুষ্যো মূত্রলঃ স্বর্য্যঃ শুক্রলস্তৃড়্জ্বরাপহঃ॥
বিষব্রণ-শ্বাসকাশ-দাহনুদ্বহ্নিপুষ্টিদঃ।
তস্মাদল্পান্তরগুণাঃ শালয়ো মহদাদয়ঃ॥

সমস্ত শালির মধ্যে রক্তশালি শ্রেষ্ঠ বলকারক বর্ণো-জ্জ্বল্যসম্পাদক ত্রিদোষনাশক চক্ষুর হিতকর মূত্রকারক স্বরসংশোধক শুক্রবর্দ্ধক তৃষ্ণাজ্বরনাশক বিষ-ব্রণ-শ্বাসকাশ দাহ-নিবারক অগ্নিবর্দ্ধক ও পুষ্টিকর। মহাশালি প্রভৃতির গুণ এতদপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন।

ভাবমিশ্র রক্তশালিকে "দাউদখানী" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এইরূপ, "রক্তশালিঃ দাউদ-খানী ইতি লোকে মগধদেশে প্রসিদ্ধঃ।" হস্তলিখিত রাজবল্লভ-দ্রব্যগুণে ভাবমিশ্রের অভিমত দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আধুনিক "আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহে" ভাবমিশ্রের মত গৃহীত হইয়াছে। ভাবমিশ্র "কৈদার" নামক আর এক প্রকার শালিধান্যের নামনির্দ্দেশ ও গুণনির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"কৈদারা বাতপিত্তঘ্না গুরবঃ কফশুক্রলাঃ।
কষায়া অল্পবর্চ্চসো মেধ্যাশ্চৈব বলাবহাঃ॥"

কৈদারাঃ কৃষ্টক্ষেত্রজা উক্তাঃ।

কেদারসংজ্ঞক ক্ষেত্রজাত ধান্য বাতপিত্তনাশক গুরু-পাক কফশুক্রবর্দ্ধক কষায়রস অল্পমলকারক মেধাজনক ও বলবর্দ্ধক। কৃষ্ট ভূমিতে উপ্ত অর্থাৎ ছিটান বীজ হইতে জাত ধান্যের নাম "কৈদার"। অতঃপর মিশ্রমহাশয় লিখিয়াছেন যে,

"স্থলজাঃ স্বাদবঃ পিত্ত-কফঘ্না বহ্নিবাতদাঃ।
কিঞ্চিত্তিক্তাঃ কষায়াশ্চ বিপাকে কটুকা অপি॥"

স্থলজা অকৃষ্টভূমিজাতাঃ স্বয়ংজাতাঃ।

ইহার অর্থ—স্থলজ ধান্য মিষ্টস্বাদ পিত্তকফনাশক অগ্নিবায়ু-বর্দ্ধক কিঞ্চিৎ তিক্ত ও কষায়রস এবং বিপাকে মধুররস। কৈদারের ও স্থলজের ব্যাখ্যাবিভ্রাট ঘটিয়াছে। যে ক্ষেত্রে নিরত জল বাধিয়া থাকে তাহার নাম কেদার। কেদার-জাত শস্য কৈদার অর্থাৎ জলজ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। ইহাতে ভূমির কর্ষণের-অকর্ষণের কোন কথা নাই। প্রদর্শিত অর্থ মানিয়া লইলেই পরবর্ত্তী বচনে স্থলজের গুণনির্দ্দেশ সুসঙ্গত হয়। কারণ জলজ ও স্থলজ এই উভয়রূপে পদার্থবিভাগ অনেক স্থলেই প্রসিদ্ধ। কৈদার অর্থ কৃষ্টক্ষেত্রজাত, আর স্থলজ অর্থ অকৃষ্টভূমি-জাত, ঈদৃশ ব্যাখ্যার মূল কিছুই দেখা যায় না। সাহিত্যিক বর্ণনায় কেদার শব্দের জলময়ক্ষেত্ররূপ অর্থই বুঝা যায়। অমরকোষের টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন, "কে জলে দাতি বিদারণমস্য" অর্থাৎ জল হইলে যে ভূভাগকে কর্ষণ করা হয় তাহার নাম কেদার। মহাকবি ভারবি কিরাতার্জ্জুনীয়ের চতুর্থ সর্গে শরদ্বর্ণন-প্রসঙ্গে কলম-ক্ষেত্রের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে আমাদের অভিমতই সমর্থিত হয়।

"তুতোষ পশ্যন্ কলমস্য সোঽধিকং
সবারিজে বারিণি রামণীয়কম্।"

সেই অর্জ্জুন পদ্মযুক্তজলমধ্যস্থিত কলম নামক ধান্যের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন।

অমরসিংহ কলম প্রভৃতি এবং ষষ্টিক প্রভৃতি ধান্যকে "শালি" নামে অভিহিত করিয়াছেন। "শালয়ঃ কলমা-দ্যাশ্চ ষষ্টিকাদ্যাশ্চ পুংস্যমী"। টীকাকার লিখিয়াছেন "কলমাদ্যাঃ ষষ্টিকাদ্যাশ্চ ধান্যবিশেষাঃ শালয় উচ্যন্তে। তত্র বৃহত্বানাং বহুতরজলোৎপন্নং ধান্যং কলমশব্দবাচ্যং, এতদপেক্ষয়া কিঞ্চিদপকৃষ্টঃ ষষ্টিরাত্রেণ পচ্যমানঃ ষষ্টিকঃ। বহুতর-জলোৎপন্ন ধান্যের নাম কলম। সুতরাং পূর্ব্বো...

পর্য্যালোচনানুসারে "কলম" ধান্যই "কৈদার" নাম পাইবার যোগ্য।

অতঃপর ভাবমিশ্র বাপিত ও অবাপিত এই উভয়ের গুণনির্দ্দেশ করিয়াছেন,

বাপিতা মধুরা বৃষ্যা বল্যাঃ পিত্তপ্রণাশনাঃ।
শ্লেষ্মলাশ্চাল্পবর্চ্চস্কাঃ কষায়া গুরবো হিমাঃ॥
বাপিতাঃ কৃষ্টক্ষেত্রে অকৃষ্টক্ষেত্রে চ।
বাপিতেভ্যো গুণৈঃ কিঞ্চিদ্ধীনাঃ প্রোক্তা অবাপিতাঃ।
কৃষ্টক্ষেত্রে অকৃষ্টক্ষেত্রে বা।

কৃষ্টক্ষেত্রে অথবা অকৃষ্টক্ষেত্রে বাপিত ধান্যের অন্ন মধুর বৃষ্য বলবর্দ্ধক পিত্তনাশক শ্লেষ্মবর্দ্ধক মলের অল্পতাজনক কষায়রস গুরুপাক ও শীতল। অবাপিত ধান্যের অন্ন বাপিতের গুণাপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন। রাজবল্লভদ্রব্যগুণে লিখিত আছে,—

বাপিতং কতরন্ধান্যং কিঞ্চিদ্ধীনমবাপিতম্।

পাঠান্তর আছে, "বাপিতং গুরুতদ্ধান্যং"

কতক ধান্য বাপিত আর কতক অবাপিত। বাপিতাপেক্ষা অবাপিত কিঞ্চিৎ হীনগুণ। পাঠান্তরের অর্থ বাপিত ধান্যের অন্ন গুরুপাক।

রাজবল্লভ-দ্রব্যগুণে রোপ্য ধান্যের এবং অতিরোপ্য ধান্যের গুণ বলা হইয়াছে;—

"রোপ্যাতিরোপ্যা লঘবঃ শীঘ্রপাকা গুণোত্তরাঃ।
অবিদাহিনো দোষহরা বল্যা মূত্রবিবর্দ্ধনাঃ।"

রোপ্যধানের ও অতিরোপ্যধানের অন্ন লঘু শীঘ্রপাক গুণে শ্রেষ্ঠ অবিদাহী দোষনাশক বলকর ও মূত্রবর্দ্ধক।

ধানের চারা করিয়া তাহাকে স্থানান্তরে রোপণ করা হইলে তাহার নাম "রোপ্য"; ঐ রোপ্যকে আবার স্থানান্তরে রোপণ করিলে উহা 'অতিরোপ্য" নামে অভিহিত হয়।

ভাবমিশ্র রোপ্যের ও অতিরোপ্যের গুণ পৃথক করিয়া একটু বিশেষভাবে লিখিয়াছেন,—

"রোপিতা স্তু নবা বৃষ্যা পুরাণা লঘবঃ স্মৃতাঃ।
তেভ্যস্তু রোপিতা ভূয়ঃ শীঘ্রপাকা গুণাধিকাঃ॥"

রোপিত ধান্যের নুতন চাউলের অন্ন বৃষ্য পুরাতন চাউলের অন্ন লঘু। পুনরায় রোপিত ধান্যের ভাত শীঘ্রপাকী ও উৎকৃষ্ট গুণশালী।

ভাবমিশ্র প্রথমতঃ ধান্যকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—

"শালিধান্যং ব্রীহিধান্যং শূকধান্যং তৃতীয়কম্।
শিম্বীধান্যং ক্ষুদ্রধান্যমিত্যুক্তং ধান্যপঞ্চকম্॥"

শালিধান্য ব্রীহিধান্য শূকধান্য শিম্বীধান্য ও ক্ষুদ্রধান্য, এই পাঁচ প্রকার ধান্য। তন্মধ্যে রক্তশালি প্রভৃতি শালি, ষষ্টিক প্রভৃতি ব্রীহি, যব প্রভৃতি শূকধান্য, মুগ প্রভৃতি শিম্বীধান্য এবং কঙ্গু প্রভৃতি ক্ষুদ্রধান্য।

"শালয়ো রক্তশাল্যাদ্যা ব্রীহয়ঃ ষষ্টিকাদয়ঃ।
যবাদিকং শূকধান্যং মুদ্গাদ্যং শিম্বিধান্যকম্।
কঙ্গ্বাদিকং ক্ষুদ্রধান্যং তৃণধান্যঞ্চ তৎস্মৃতম্॥"

অতঃপর তিনি কতকগুলি শালিধান্যের নাম নির্দ্দেশ করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন যে,

"ইত্যাদ্যাঃ শালয়ঃ সন্তি বহবো বহুদেশজাঃ।
গ্রন্থবিস্তরভীতেস্তে সমস্তা নাত্র ভাষিতাঃ॥"

নানাদেশজাত বহুপ্রকার শালি আছে। তন্মধ্যে কয়টির মাত্র নাম কথিত হইল। গ্রন্থের বিস্তারভয়ে সমস্ত নাম কথিত হইল না। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত নামসংগ্রহ অসম্ভব। তাঁহার লিপিভঙ্গী হইতে হৈমন্তিক ধান্য শালিনামে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

চরক সুশ্রুত প্রভৃতি মূলসংহিতায় যাহা দেখিতে পাইয়াছেন এবং গ্রন্থকারের সময়ে মূলসংহিতার পাঠ যেরূপ ছিল, তাহাই অবিচারিতরূপে কিঞ্চিৎ ভাষান্তরিত করিয়া মিশ্রমহাশয় স্বকীয় নিবন্ধে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। দেশপ্রভাব ও জনশ্রুতিও গ্রন্থমধ্যে অবিচারিতভাবেই স্থান পাইয়াছে। সংস্কৃতভাষার অধিকাংশ গ্রন্থই গতানুগতিকতার পরিচয় দিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ-নিবন্ধকারদিগের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্ত বিচার করিয়া দ্রব্যগুণ প্রভৃতি সন্নিবেশিত করিয়াছেন। চরকের টীকায় এবং স্বকীয় প্রত্যেক নিবন্ধেই তাঁহার অনন্যসাধারণতা প্রস্ফুটিত হইয়া বাঙ্গালীর সূক্ষ্ম মনীষার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

চরক-সংহিতায় (সূত্রস্থান ২৭ অধ্যায়) রক্তশালি মহাশালি প্রভৃতি কতকগুলি শালিধান্যের শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত শালির মধ্যে রক্তশালিই গুণশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। টীকাকার চক্রপাণি দ্রব্যগুণনির্ণয়প্রসঙ্গে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "দ্রব্যের নাম নানাদেশপ্রসিদ্ধ। অতএব নামজ্ঞানে সম্পূর্ণ সামর্থ্য কাহারও নাই। অন্য কোন টীকাকারই নামানুসারে সমস্ত দ্রব্যের পরিচয় করাইয়া দিতে সমর্থ নহেন; অতএব দেশান্তরবাসী মানবদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া প্রায়ই নাম জানিতে হয়। যাহা গৌড়দেশে প্রচলিত আছে, তাহাই লিখিব; এবং অন্য দেশপ্রসিদ্ধও কিছু কিছু বলিব। বেদাগ্রগ্রহারে "কলম" প্রসিদ্ধ। "শকুনাহৃত" অবন্তীদেশে "চক্র" নামে প্রসিদ্ধ। রক্তশালি প্রসিদ্ধই আছে। গ্রন্থকারের উক্তি হইতে মনে হয়, তাঁহার সময়ে গৌড়ে "রক্তশালি" সকলেই নামতঃ চিনিত। হয়ত কালক্রমে উহাই "রুনী" নামে ব্যবহৃত

হইতেছে। চক্রপাণির অভিমত স্মার্ত্তমতের সহিত সংস্বরে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে; যথা,—"অত্র শালিঃ হৈমন্তিকং ধান্যং, ষষ্টিকাদয়শ্চ গ্রৈষ্মিকাঃ, ব্রীহয়ঃ শারদা ইতি ব্যবস্থা।" হৈমন্তিক ধান্য শালি, ষষ্টিক প্রভৃতি গ্রীষ্ম-ঋতুসম্ভূত, এবং ব্রীহি শরৎকালধান্য। টীকাকারগণ অনেক আজগবি মতের উপন্যাস করিয়াছেন। চরকাদি-প্রসিদ্ধ "শকুনাহৃত" নামক শালিসম্বন্ধে উল্লনাচার্য্য বলিয়াছেন, "বৃদ্ধবৈদ্যাস্তু—

দ্বীপান্তরাৎ সমানীতো গরুড়েন মহাত্মনা।
শকুনাহৃতশালিঃ স্যাদ্‌গরুড়াপরনামকঃ।।"

মহামতি গরুড় দ্বীপান্তর হইতে একপ্রকার শালিধান্য আনয়ন করিয়াছিলেন। উহার নাম শকুনাহৃত, অপর নাম গরুড়। পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ এই সকল অনাবশ্যক বিবরণ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

নূতন ও পুরাতন ধান্যের গুণ।

সাধারণের একটি দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, চাউল যতই পুরাণ হয়, ততই তাহার গুণের উৎকর্ষ হয়। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের উপদেশ ইহার বিপরীত। চরকে উক্ত হইয়াছে যে,

"শূকধান্যং শমীধান্যং সমাতীতং প্রশস্যতে।
পুরাণং প্রায়শো রুক্ষং প্রায়েণাভিনবং গুরু।।"

(সূত্রস্থান ২৭ অ, ২৮৯)

শূকধান্য ব্রীহি প্রভৃতি এবং শমীধান্য মুদ্গ প্রভৃতি এক বৎসরের পুরাতনই প্রশস্ত। এক বৎসরের পর প্রায়ই রুক্ষ হয় এবং নূতনাবস্থায় প্রায়ই গুরু।

চক্রপাণির দ্রব্যগুণে দেখা যায়—

ধান্যং সর্ব্বং সমাতীতং পথ্যং লঘুনাণ্য নবম্।
অতঃ পরং লঘুতরং রুক্ষং বাতপ্রকোপনম্।।

সমস্ত ধান্যই এক বৎসরের পর লঘু হয়, সুতরাং পথ্য। নবধান্য গুরু ও অপথ্য। দুই বৎসরের পর ধান্য লঘুতর রুক্ষ ও বাতপ্রকোপকর হয়।

সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে—

অনার্ত্তবং ব্যাধিহতং অপর্য্যাগতমেব চ।
অভূমিজং নবঞ্চাপি ন ধান্যং গুণবৎ স্মৃতম্।।
নবং ধান্যমভিষ্যন্দি লঘু সংবৎসরোষিতম্।
বিদাহি গুরু বিষ্টম্ভি বিরূঢ়ং দৃষ্টিদূষণম্।। ৩৬

(সূত্রস্থান ৪৬)

অকালজাত ধান্য, ব্যাধির দ্বারা দূষিত ধান্য, অপরিপক্ব ধান্য, নিকৃষ্টভূমিজাত ধান্য ও নূতন ধান্য গুণযুক্ত নহে। নূতন ধান্য অভিষ্যন্দজনক, সংবৎসরাতীত ধান্য লঘু। অঙ্কুরিত ধান্য বিদাহজনক বিষ্টম্ভকারক (পেটভার করে) ও দৃষ্টিশক্তির হানিকর।

রাজবল্লভ-দ্রব্যগুণে লিখিত আছে—

"নবং ধান্যমভিষ্যন্দি লঘু সংবৎসরোষিতম্।
সংবৎসরদ্বয়াদূর্দ্ধং ধান্যং বাতপ্রকোপনম্।
রুক্ষং লঘুতরঞ্চাপি পুংস্ত্বঘাতি প্রকীর্ত্তিতম্।।"

নূতন ধান্য অভিষ্যন্দিকর, এক বৎসরের পুরাণ ধান্য লঘু, দুই বৎসরের অধিক কালের ধান্য বাতপ্রকোপকারক রুক্ষ অত্যন্ত লঘু এবং পুংস্ত্ব-নাশক।

শমীধান্যজাত ডাউল পুরাতনই পথ্য, কিন্তু উহা মুখপ্রিয় হয় না।

উপাদানবিচার।

মানুষের খাদ্য ভাত ডাল প্রভৃতি। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ সকলেই ধান্যের ও নানাপ্রকার কলায়ের গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার কারণ কি? এই আশঙ্কা খণ্ডনাভিপ্রায়ে ভাবমিশ্র বলিয়াছেন,—

"সমবায়িনি হেতৌ যে মুনিভির্গণিতা গুণাঃ।
কার্য্যেঽপি তেঽখিলা জ্ঞেয়াঃ পরিভাষেতি ভাষিতা।।
কচিৎ সংস্কারভেদেন গুণভেদো ভবেদ্‌যতঃ।
তণ্ডুলং লঘু পুরাণস্য শালেস্তচ্চিপিটো গুরুঃ।।
কচিদ্‌যোগপ্রভাবেণ গুণান্তরমপেক্ষতে।
কদলং গুরু সর্পিশ্চ তদ্‌যুক্তং লঘু চ ভবেৎ।।"

(ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড দ্বিতীয়ভাগ কৃতান্নবর্গ)

বস্তুর সমবায়ি কারণে অর্থাৎ উপাদানে যে সকল গুণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার কার্য্যেও সেই সকল গুণ রহিয়াছে, এ মত বুঝিতে হইবে। এই সিদ্ধান্তানুসারেই শাস্ত্রীয় পরিভাষা কথিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ধান্যে যে গুণ আছে, তন্নিষ্পন্ন তণ্ডুলে ও অন্নেও সেই গুণ আছে; এই নিয়ম স্বাভাবিক। কোন স্থলে সংস্কারবশতঃ গুণান্তর ঘটিয়া থাকে। যেমন পুরাতন শালিধান্যের ভাত লঘু, সুতরাং সুপথ্য; কিন্তু পুরাতন ধান্যসম্ভূত চিড়া গুরু অতএব অপথ্য। সুতরাং রোগীর পথ্যে নূতন ধানের চিড়াই ব্যবহার্য্য। কোথাও সংযোগপ্রভাবে দ্রব্যে গুণান্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন কদলীফল ও ঘৃত উভয়ই গুরুপাক, কিন্তু উভয় সংযুক্ত হইলে লঘুপাক হইয়া থাকে।

প্রসঙ্গত ইহাও বক্তব্য যে, আয়ুর্ব্বেদে "অধিকরণ-শক্তিনামক" স্থানবিশেষে দ্রব্যের প্রয়োগ জন্য যে শক্তি অবধারিত হইয়াছে, উহার কার্য্য অতি বিস্ময়কর। সংযোগোৎপন্ন গুণান্তর আধারভেদে উপাদানের প্রতিকূল কার্য্য করিয়া থাকে। পান ও আদা উভয়েই উষ্ণবীর্য্য। কিন্তু উহাদিগকে একত্র বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে মাথা ঠাণ্ডা হয়। যে রোগী মাথা গরম হওয়ার দরুণ অনিদ্রায় ছট্‌ফট্ করে, উক্ত প্রলেপপ্রয়োগে সেও নিরুপদ্রব হইয়া ঘুমাইতে পারে। এইরূপ সংযোগ ও অধিকরণ-শক্তির উদাহরণের অভাব নাই।

ঋষিযুগের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ ক্রমপরীক্ষালব্ধ অনেক অভিনব তত্ত্বের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে অবস্থানুসারে সংস্কারজ গুণান্তরের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবমিশ্র বলিয়াছেন—

"দগ্ধমৎস্যো গুণৈঃ শ্রেষ্ঠঃ পুষ্টিকৃদ্বলবর্দ্ধনঃ।"

দগ্ধ মৎস্য শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক।

চক্রপাণি লিখিয়াছেন—

"দগ্ধমৎস্যো শুক্রবৃষ্যো বৃংহণঃ প্রাণবর্দ্ধনঃ।
ক্ষীণশুক্রাশ্চ যে কেচিৎ ভগ্নজর্জ্জরিতাশ্চ যে।
নিত্যং স্ত্রী-সেবিনশ্চৈব ক্ষীণরেতস এব চ।
দগ্ধমৎস্যো হিতস্তেষাং সতৈল-লবণান্বিতঃ॥"

পোড়ামাছ শুক্র বৃষ্য উপচয়কারক ও জীবনীশক্তি-বর্দ্ধক। যাহাদের শুক্র ক্ষীণ হইয়াছে, এবং যাহাদের জরাজীর্ণ দেহ ভাজিয়া পড়িয়াছে, যাহারা নিত্য স্ত্রী-সংসর্গনিবন্ধন ক্ষীণশুক্র হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের পক্ষে তৈললবণান্বিত দগ্ধমৎস্য হিতকর।

ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে আচার্য্যগণ পরীক্ষিত বস্তুগুণ যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অনেক স্থলে তাহার বিপরীত গুণও বুঝিতে পারা যায়।

চক্রপাণি বলিয়াছেন,—

"হংসবীজং পরং বল্যং বৃংহণং বাতনাশনম্।
পাকে লঘুতরং প্রোক্তং সর্ব্বাময়বিবর্জ্জিতম্॥"

হংসডিম্ব অত্যন্ত বলকর পুষ্টিকর ও বাতনাশক। উহা অত্যন্ত লঘুপাক। সমস্ত রোগেই উহা পথ্য। কিন্তু এই অভিমতের বিপরীত গুণ অনেক স্থলেই অনুভূত হয়। আমবাত রোগীর পক্ষে এবং যাহাদের পেট গরম তাহাদের পক্ষে উহা অতীব অনিষ্টকর। কাঁচা হংস-ডিমের কুসুম অত্যন্ত উত্তেজক। কিন্তু অনেকের শরীরে উহা পারদের মত ফুটিয়া বাহির হইতে দেখা যায়।

চক্রপাণি ডিম্ব সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন—

"মৎস্য-কূর্ম্মখগাণ্ডানি স্বাদুবাজীকরাণি চ।"

মৎস্য কূর্ম্ম ও পক্ষী ইহাদের ডিম সুস্বাদু ও রতিশক্তি-বর্দ্ধক।

কুক্কুট ও হংস প্রায় একজাতীয় জীব। হংসীকুক্কুটের সঙ্গমে উহাদের বংশবৃদ্ধি প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

The Religious Ideal of Rammohun Roy*

(Sj. Golock Chandra Das)

Raja Rammohun Roy with his marvellously keen insight into the spirit of all things discovered that the unity of Life is better expressed through diversity of forms than through their uniformity, and showed the way how the universality of a religion could be reconciled to diversity of forms taken by it at different times in different places. He wrote two treatises on this point in the form of questions and answers, one in English, called "The Universal Religion: Religious Instruction founded on Sacred Authorities", and the other in Bengali, called '<u>Anusthan.</u>' The latter book is an exact counter-part of the former. Only, what he laid down as a general principle in his English tract for all theistic denominations of the world, he specialised in his Bengali tract for the Hindu theists. The following quotations will bear out my statement :—

"* * * In this worship (theistic worship) it is indispensably necessary to use exertions to subdue the senses, and to read such passages as direct attentions to the Supreme Spirit. * * *

It is obvious that as we are so constituted, that without the help of sound ;we can conceive no idea ; therefore, by means of the texts treating of the Supreme Being, we should contemplate Him." Vide "The Universal Religion etc, A. 9."

(Counterpart.)

" * * * ইন্দ্রিয়দমনে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করা এ উপাসনার (ব্রহ্মোপাসনার) আবশ্যক সাধন হয়। * * * প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন, অর্থাৎ আমাদের অভ্যাস সিদ্ধ ইহা হইয়াছে যে শব্দের অবলম্বন বিনা অর্থের অবগতি হয় না, অতএব পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী ও শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্রাদির অবলম্বন দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন করিবেন।" দ্রষ্টব্য, "অনুষ্ঠান, ১৯ উত্তর।"

The Raja further elaborated the above special aspect of the universal Religion in his other Bengali Publications, namely,

* Read at the Raja Rammohun Roy Memorial Meeting held on the 27th September, 1930, at the Keshab Hall, Hazaribagh.

the Preface of the Mandukyopanishad, "বেদান্তসার (The Abridgement of Vedant," "ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ (The characteristics of a Theistic House holder)," "গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানম্ (The worship of Brahman by means of the Gayatri)." All these writings and 'অনুষ্ঠান' are his own independent productions, in which he inculcated the Hindu method of spiritual and ethical culture for the Hindu theists.

In the Trust Deed of the Brahmo Samaj we find that the Raja established it as a meeting place "of all sorts and descriptions of people without distinction", * * * "for the worship and adoration of the Eternal, Unsearchable and Immutable Being who is the Author and Preserver of the Universe," and for "the strengthening" of "the bonds of union" among "men of all religious persuasions and creeds." But the form of worship that the Raja introduced into his church was purely a Vedantic one, which was evidently meant as a particular method of worship and national culture for the Hindu theists. For men of other religious persuations and creeds, he certainly entertained the idea of introducing other forms of worship and culture as well,—such as an Islamic form for the Muhammadan Unitarians, and a Christian one for the Unitarian Christians. In fact he did so as a tentative measure. For in his Brahmo Samaj the Muhamadan and Eurasian boys would now and then recite hymns respectively in Persian and English in the evening.

Anyone desiring to join the Vedantic form of worship held in the Raja's church, was not required to abandon his own national ideal of worship and culture, and his own national customs, manners, rites, observances, institution, etc. It was for this reason that Rammohun Roy before the establishment of his church attended with his sons, other relatives and friends the usual Divine service held in the Christian Unitarian church set up by Mr. William Adam, and Mr. Adam in his turn attended the divine service held in the Raja's church, when it was established. And it was for this reason also that neither the Raja nor Mr. Adam ever felt any necessity for the amalgamation of their respective churches, or for one's being proselytised into the other's national form of religion.

Rammohun Roy wrote a Pamphlet called "প্রার্থনাপত্র (Exhortation letter)" in which he offered his humble request to those who, following the unitarian Srutis of the Vedas, believed God as one without a second, and looked after other's welfare just as they sought their own good, saying that they should treat with great affection those of their countrymen who, though not conversant with the Vedas, entertained the same belief and took the same benevolent view of others. The following is his request,—"দশনামী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনেকে এবং গুরু নানকের সম্প্রদায় ও দাদুপন্থী ও কবীরপন্থী এবং সন্তমতাবলম্বি প্রভৃতি এই ধর্মাক্রান্ত হয়েন, তাঁহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্তব্য হয়। * * * বিদেশীয়দের অন্তঃপাতী ইউরোপীয়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বরকে সর্বথা এক জানেন ও মনের শুদ্ধভাবে কেবল তাঁহারই উপাসনা করেন এবং দয়ার বিস্তীর্ণতাকে পরমার্থ সাধন জানেন তাঁহাদিগেরও উপাস্যের ঐক্যসম্বন্ধবোধে অতিশয় প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা কর্তব্য হয়। তাঁহারা যিশুখৃষ্টকে পরমেশ্বরের প্রেরিত ও আপনাদের আচার্য্য কহেন। ইহাতে পরমার্থ বিষয়ে আত্মীয়তা কিরূপে হয় এমত আশঙ্কা উচিত নহে, যেহেতু উপাস্যের ঐক্য ও অনুষ্ঠানের ঐক্য উপাসকদের আত্মীয়তার কারণ হইয়া থাকে।" By these Europeans the Raja evidently meant the Unitarian Christians of Europe, and by premulgating the principle that the identity of the worshipped and of culture, inspite of all differences in other respects, was the cause of friendship among the

worshippers; he counted the Mahamadan sufis and Muwahhidins also among our spiritual friends.

"Not only did he (Rammohun Roy) include" says Dr. B. N. Seal, "Hindu, Moslem and Christian theists in one theistic fraternity as brothers in faith, he extended his fellowship and co-operation to those who by whatever name would acknowledge some principle of the universe, the need of meditation on that principle as good, and the love and service of man as the guiding principle of the conduct of life. Buddhists and Jainas and believers in a Law of Nature he would therefore acknowledge as not against the theistic fraternity but with it." Some theists now-a-days insinuate Buddhism and Jainism as being atheistic. But Rammohun Roy contradicts their insinuation by saying—"এই প্রকারে যাঁহারা কাল কিম্বা স্বভাব অথবা বুদ্ধ কিম্বা অন্য কোন পদার্থকে জগতের নির্বাহকর্তা কহিয়া থাকেন, তাঁহারাও বিচারত এ উপাসনার অর্থাৎ জগতের নির্বাহকর্তারূপে চিন্তনের বিরোধী হইতে পারিবেন না।"

(Anusthan, A 5.)

By founding the Brambo Samaj the Raja gave effect to the grand conception of his Universal religion. He intended his church as a common place of theistic worship for men of all religious persuations and creeds for the strengthening of the bonds of union among them. Though he atfirst introduced only the Hindu Vedantic form of worship into his church, he had also the idea of introducing other denominational forms of it for men of other religious persuations in process of time. * But as he did not live to do it himself the plan of his work passed into the hands of his successors. The Central idea of Rammohun Roy's mind was that to whatever denomination a man might belong he might join any form of worship without foregoing his own denominational form of culture and social customs. The diversity of the forms of worship and culture was considered by him rather favourable than detrimental to the realisation of the one Divine Life. As a candle shines the brighter in darkness than in sun shine, and as a picture of a certain colour gives a more vivid representation of life on a back-ground of different colour, so the one life of God is, by contrast, better expressed through diversity of forms than through their uniformity.

It is for this reason that the Raja took advantage of this law of Nature in cementing all the nations of the world into a universal brotherhood by the one unifying principle of the love of God. A little reflection will enable us to discover how far still we are from the realisation of the grand ideal set forth by Raja Rammohun Roy, one hundred years before. It will take us perhaps ten times a century for the full appreciation of the plan of his work, as is signified by the expression "a man of a thousand years," used with reference to him in the monthly repository issued in September 1832.

The true realisation of the unity of Life is a grand Synthesis, which is yet indeed in the womb of the future, and is to be brought above by joint efforts of all the theistic denominations of the world, by their forming a common link of brotherhood among themselves. It is to be a brotherhood of the nations of the world instead of that of some isolated individuals coming into the fold of some denomination and subscribing to a few doctrines dictated by it,—to be an internationalism formed under the inspiration of a common supernational or universal ideal beckoning all nations on to itself as their common goal—to be a world—Organisation of "many houses" for diverse forms of worship obtaining in diffe-

* আমরা ইহার কোন প্রমাণ পাই নাই। সং সং

rent faiths, within the "one mansion" of the common Father of all nations, where men and women of all religious persuasions will be free to join every form of worship respecting different forms, practised by each of them, and thus working in perfect harmony with one another. The Brahmo Samaj, as the Hindu unitarian church, is evidently one of the "many houses" within the "one mansion" of the common Father of all nations.

It is by aiming at the regeneration of nations at large and not at the proselytism of individuals belonging to them that we can fittingly and successfully carry on the propaganda work of a universal religion like ours. The Brahmo Propagandist has always to bear in mind that Brahmoism, has two aspects, one universal, and the other national and that the "one mansion" of the common Father of all nations must be large enough to hold all the nations within its bound, by which it is to be understood that the common creed of the universal theistic fraternity we are going to establish in the world must be most essential in its character, most simple, and wide in its range, and broad in its Catholicity. We can not conceive of a creed more comprehensive and better suited to the purpose than one conceived by Raja Rammohun Roy by extending the fellowship of the world theistic fraternity to those who by whatever name would acknowledge some principle of the universe, the need of meditation on that principle as good, and the love and service of man as the guiding principle of the conduct of life. Our universal theistic fraternity ought to be based on this simple creed.

The Raja was the first in the world history to conceive the method of comparing one religion with another and thereby discovering and estimating their respective merits and advantages. This method gradually developed into the modern science of comparative Religion. The Brahmo propagandist should by help of it bring out the strong points of all historic religions prominently before the notice of the followers of each of them, so that they might reap the benefit of discovering the repective deficiencies of the different aspects of one another's religion and making them up by assimilating the spirit of the excellences of the corrosponding phases of every other religion.

Next comes the universal theistic brotherhood of nations itself for our consideration, as the means of the full realisation of our ideal as set forth by Raja Rammohun Roy. According to this ideal a world theistic federation is to be organised by founding different denominational churches all the world over for the worship of the common Father of all humanity with different forms of adoration peculiar to different types of theism, in order that any worshipper irrespective of his traditional culture might join any form of worship for the purpose of strengthening the social soliderity among brethren of different faiths. It is by means of such a federation that each religion would "grow by mutual contact and assimilation and by convergenee to a common ideal" though each preserving its own historic continuity. As along with the individual progress of a man, he never loses his individuality, but shapes it according to his ideal of perfection by receiving an impetus from his comradeship with persons of nobler character, so a nation never disintegrates itself into the general progress of humanity, but grows and develops according to the universal ideal, in full consciousness of its special characteristics and genius consti-

tuting its peculiarity, by coming in contact with and receiving an impetus from other nations more advanced than itself.

In Rammohun's concrete universal theism we find a clear solution of the three great problems of the modern age, namely, the adaptability or otherwise of the scriptural authority to reason, the nationality of a religion to its universality, and hero-worship to free thinking, appearing practically in succession, before the eyes of the leaders and the members of the Adi, Indian and Sadharan Brahmo Samajes, respectively. The greatest message of the great Rammohun brought to the world in this new epoch of its history, is the, proclamation of a universal religion, of which each national religion in its integrity must be a component part, and which must therefore be competent to abundantly supply the individuals of each nation with their national, as well as, international resources and means for their spiritual and ethical growths. Let us then members of the three Brahmo churches, as well as those among others who would perpetuate the pure worship of one God, join together under the banner of the greatest man of the modern age, in whose system of religion we find a promise of the redress of our common grievances and also a very fine promise of the realisation of a universal brotherhood of nations vouchsafed unto us, as a New epoch-making dispensation of our Divine Father.

হিন্দুসভা ও বহুবিবাহ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

গত ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখের সঞ্জীবনীতে আমরা দেখিলাম যে, এই সেদিন ঢাকা নগরীতে হিন্দুসভার যে অধিবেশন হইয়াছিল, সেই অধিবেশনে উহার অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি হিন্দুসমাজ রক্ষা করিবার জন্য বহুবিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে এই ব্যবস্থা তাঁহার অসমসাহসিকতার পরিচয় হইতে পারে, কিন্তু উহা তাঁহার সমাজ সম্বন্ধে দূরদর্শিতার বা গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। তাঁহার বোধ হয় অবিদিত নাই যে ইংরাজশাসন এদেশে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবার ঠিক পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কৌলীন্য-প্রথার প্রবল প্রতাপে বঙ্গদেশ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই কৌলীন্যপ্রথার ফলে এদেশে অনেক গৃহে একএকটী কুলীনের সঙ্গে এমন কি ২০০।২৫০ শত পর্য্যন্ত "কন্যা" বিবাহ দেওয়া হইত। কুলরক্ষার জন্য এক দিকে দুগ্ধপোষ্য শিশুর অপর দিকে ৬০ বৎসরেরও অধিক অনূঢ়া "কন্যা" নিতান্ত অল্পবয়স্ক বালক অথবা গঙ্গাযাত্রী মরণোন্মুখ কুলীনের সহিত বিবাহ দিয়া সমাজের উচ্চ পদ অধিকারে ইচ্ছুক ব্যক্তি স্বীয় কুল রক্ষা করিবার অপূর্ব্ব ব্যবস্থা করিতেন। এ বিষয়ে সমাজের অবস্থা ইতিপূর্ব্বে কিরূপ ছিল সভাপতি মহাশয় তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলে পূজ্যপাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহবিষয়ক প্রস্তাব দেখিতে পারেন। বহুবিবাহ-সমর্থন তাঁহার ব্যক্তিগত মত হইতে পারে, কিন্তু আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি যে হিন্দুসভা ইহা প্রত্যাখ্যান করিবে। বহুবিবাহের ফলে এক স্বামীর মৃত্যুতে কত বালিকা ও যুবতী স্ত্রীলোক যে বিধবা হইত, তাহা সেকালের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে সহজেই বুঝা যাইবে। ঐরূপে বিধবার সংখ্যা অন্যায়রূপে বর্দ্ধিত হওয়ায় ভীষণ দুর্নীতি দেশের সর্ব্বাঙ্গ যে কিরূপ ছাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বহুবিবাহের ফলে এককালে বহু বিধবা হওয়া এবং তাহারই ফলে দুর্নীতির বহুল প্রসারের সম্ভাবনা। বহুবিবাহপ্রচলনের বিরুদ্ধে এইটি বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কারণ হইলেও উহার বিরুদ্ধে আরও অনেক কারণ যে উপস্থিত করা যাইতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য; অর্থনৈতিক সমস্যা সেই সকল কারণের অন্যতর। কেবল কতকগুলি পুত্রকন্যার জন্মগ্রহণের ব্যবস্থা করিলেই দেশের উন্নতি ও কল্যাণসাধনের উপায় করা হয় না, তাহাদের উপযুক্তরূপে লালনপালনের ব্যবস্থা, সুচারু আহারাদি দ্বারা পুষ্টিসাধন এবং উপযুক্তরূপে জ্ঞান-প্রদানপূর্ব্বক শিক্ষাদির ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই দেশের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। বর্ত্তমানে বলিতে গেলে দেশে প্রতি পুরুষের একপত্নীক হইবার প্রথাই সমধিক প্রচলিত; তাহাতেই যে পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করিতেছে, আহারাদির অভাবে তাহাদেরই জীবনরক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমানে দেশে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা কিরূপ

বাড়িয়া চলিয়াছে, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ভীষণ রোগের প্রতাপে কত বালক ও যুবক যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতে বা পদার্পণ করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, যাঁহারা সে বিষয়ে অনুসন্ধান না করেন বা পল্লীগ্রামে বাস করিয়াও প্রত্যক্ষ না করেন, তাঁহারা আমাদের এ কথার সারবত্তা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না। বহুবিবাহ সমর্থন করিবার পরিবর্ত্তে সভাপতি মহাশয় যদি দেশের চতুর্দ্দিকে খাদ্যাদির দুর্ম্মূল্যতা দূর করিবার, জ্ঞান-বিতরণের ব্যবস্থা করিবার যুক্তিপূর্ণ উপদেশ দিতেন, তবে দেশের অধিকতর কল্যাণ সাধিত হইত নিঃসন্দেহ।

আইনের দ্বারা বা অপর কোন উপায়ে বহুবিবাহ এদেশ হইতে বিতাড়িত হয় নাই। উহার দ্বারা অত্যন্ত কুফল হইবার কারণেই এবং জনসাধারণের ভীষণ আর্থিক কষ্ট হইবার কারণেই এই অনিষ্টজনক প্রথা যথাসম্ভব অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। অনেকে বলেন, ইংরাজদিগের অনুকরণেই এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছে; আমরা তাহা মনে করি না। স্বাভাবিক কারণেই ইহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

কমল বসুর বাটীর স্থাননির্দ্দেশ।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

আদিব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান গৃহ ও তাহার তলস্থ জমি সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বে কমললোচন বসুর বাটীতে ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র তারিখে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইয়া প্রায় সার্দ্ধ এক বৎসর কাল ধরিয়া উহা তথায় চলিয়াছিল। কিন্তু উক্ত কমল বসুর বাটী চিৎপুর রোডের কোথায় সংস্থিত, কেহই তাহার সবিশেষ পরিচয়-লাভের চেষ্টা করেন নাই। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রাজার জীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার এক বিস্তৃত জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার পুস্তকেও ঐ স্থানের প্রকৃত সন্ধান মিলে না। শ্রদ্ধেয় কেশব বাবুর জীবনীলেখক গৌর-গোবিন্দ উপাধ্যায় মহাশয় এইমাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, কমল বসুর বাটী রাজার আবাস-নিকেতন মাণিক-তলার সান্নিধ্যে ছিল। তিনিও স্থাননির্দ্দেশ করিবার আদৌ চেষ্টা পান নাই। অথচ ভাদ্রোৎসব লইয়া কেশব বাবু প্রমুখ সকলে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়াছেন। অনেকেরই ধারণা যে, কমল বসুর বাটী চিৎপুর রোডের অপর পারে আদিব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে। আমরা অনেক দিন ধরিয়া বিশেষ চেষ্টা ও অনুসন্ধানের পরে জানিতে পারিয়াছি যে, কমল বসুর বাটী আদিব্রাহ্মসমাজ-গৃহের তিন চারিটী বাটীর দক্ষিণে চিৎপুর রোডের উপরেই ছিল। উহার বর্ত্তমান মিউনিসিপাল হোল্ডিং নম্বর ৫১। আদিব্রাহ্মসমাজ-গৃহের ও জমির বর্ত্তমান নম্বর ৫৫। শ্রীযুক্ত চুণীলাল কর নামে একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি, যাঁহার বাটী আদি-ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের অল্প দক্ষিণে, তাঁহার নিকট সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছি যে কমল বসুর বাটী বিক্রয় হইলে উহা হরি মল্লিক ক্রয় করেন। হরি মল্লিকের নিকট হরনাথ মল্লিক এবং উক্ত হরনাথ মল্লিকের নিকট হইতে যুগলকিশোর বিলাসীরাম খরিদ করেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহার পুত্র চতুর্ভুজ বাবু জীবিত আছেন। উক্ত ৫১ নম্বরের বাটী যে কমল বসুর ছিল, চুণীলাল কর মহাশয় তাঁহার প্রতিবেশী বলিয়া তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। চুণীলাল বাবু আরও বলিলেন যে তাঁহাদের পূর্ব্বতন অনেক সরিকের নিকট আদিব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান জমি খরিদ করা হয়। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসলেখক লিওনার্ড সাহেবও তাঁহার পুস্তকের ফুটনোটে লিখিয়াছেন যে, কমল বসুর বাটীর বর্ত্তমান মালিক হরনাথ মল্লিক। অবশ্য তিনি বাটীর নম্বর দেন নাই। তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, যেখানে সুপ্রকাশ্যভাবে ব্রহ্মোপাসনার সূচনা হয়, তাহার বর্ত্তমান নম্বর ৫১। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসলেখকের পক্ষে স্থাননির্দ্দেশের যে যথেষ্ট মূল্য আছে, তাহা বলা বাহুল্য। আমরা শীঘ্রই চতুর্ভুজ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পূর্ব্ব দলিলাদি দেখিব, এইরূপ মনস্থ করিয়াছি। তিনি অন্যত্র বাস করেন। রেভাঃ আলেকজাণ্ডার ডফ এই বাটীতেই রাজা রাম-মোহনের সাহায্যে তাঁহার প্রথম ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপরিচয়।

কলিকাতা ম্যুনিসিপাল গেজেট (বার্ষিক সংখ্যা)।

শ্রীঅমল হোম সম্পাদিত। মূল্য আট আনা।

কলিকাতা ম্যুনিসিপাল গেজেটের (Calcutta Munici-pal Gazette) ষষ্টবার্ষিক সংখ্যাখানি আমরা পাইয়াছি। পত্রিকাখানি কলিকাতার ন্যায় বিরাট সহরের ম্যুনিসি-প্যালিটির সর্ব্বতোভাবেই উপযুক্ত হইয়াছে। ইহার ছাপা, কাগজ ও প্রচ্ছদপত্র সুন্দর ও সুষ্ঠু। এই সংখ্যাখানিতে সুলেখক-লিখিত বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রবন্ধই গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। নানাদেশীয় ম্যুনিসিপালিটির বিষয়ে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য উক্ত

হওয়ায় জগতে আমাদের স্থান কোথায় এবং কিরূপে আরও উন্নতি করা যায়, এবিষয়ে চিন্তা করিবার একটি পথ উন্মুক্ত করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন দেশের ম্যুনিসিপালিটির সভাপতি ও লর্ড মেয়রদের অভিনন্দন-পত্রগুলি প্রকাশিত হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে প্রেম ও প্রীতির যোগ সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রদ্ধেয় দেশবন্ধু, বরেণ্য সুরেন্দ্রনাথ, মাননীয় সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য প্রতিভাবান্ নাগরিকগণের চিত্র প্রকাশিত হওয়ায় পত্রিকাখানির সৌন্দর্য্য ও মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বার্ষিক সংখ্যাটীর জন্য আমরা শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়কে অভিনন্দন করিতেছি।

কা. মু.

সৎকথা—শ্রীশরৎচন্দ্র ধর। মূল্য চারি আনা।

শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র ধর মহাশয়ের 'সৎকথা' পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। ইহাতে ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক বহু মূল্যবান উপদেশ নানাস্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের মানুষ শুধু স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত, সৎকথা বা সদুপদেশ শুনিবার মত আগ্রহ প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্তরের সাধুভাব সজাগ রাখিতে হইলে এইজাতীয় সৎকথার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। উন্নত ধর্ম্মজীবনলাভেচ্ছু সুধীবৃন্দের নিকট ইহার আদর হইবে, মনে হয়।

জ্ঞা. ব.

সংবাদ।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের "সেরিফ" পদে নিয়োগ।—প্রফুল্লনাথ বর্ত্তমানে ৪৩ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। ইনি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীটের বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। ৪ঠা পৌষ (২০শে ডিসেম্বর) হইতে তিনি এক বৎসর কালের জন্য সেরিফের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। প্রফুল্লনাথ স্বনামধন্য স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পৌত্র, ধনী জমিদার। মাইকেলের জীবনীলেখক সুপণ্ডিত। স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বহুদিন তাঁহার গৃহশিক্ষক ছিলেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করিয়া ইনি এক বৎসর কাল য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। ভারতীয় শিল্পকলা, বাঙ্গালা সাহিত্য এবং ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলার ইনি একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বিশেষ অনুরাগী। প্রফুল্লনাথ সদাশয়, মিষ্টভাষী পরদুঃখকাতর বিদ্যোৎসাহী এবং সকল জনহিতকর কার্য্যে অগ্রণী। ইনি কলিকাতার ঠাকুর-গোষ্ঠির অন্যতর স্তম্ভ। এই সম্মানজনক পদপ্রাপ্তিতে আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন করিতেছি।

আরও আনন্দের বিষয় এই যে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের নপ্তৃপুত্র হাইকোর্টের উকীল ৺ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় অন্যতর পুত্র এটর্ণী শ্রীযুক্ত রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রফুল্লবাবুর সহকারীরূপে "ডেপুটি শেরিফের" পদ লাভ করিয়াছেন।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব।—গত ৩০শে কার্ত্তিক রবিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সপ্তসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃ-সন্ধ্যায় যথারীতি উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল; এবং অপরাহ্ণ ৩৷৷০ ঘটিকায় ব্রাহ্মধর্ম্মের "পারায়ণ" হইয়াছিল। উৎসবের এই অভিনব অঙ্গটী বেহালা ব্রাহ্মসমাজের একান্ত নিজস্ব। সান্ধ্য উপাসনায় সঙ্গীতের অংশ বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। এই সময়ে যে উপদেশ বিবৃত হইয়াছিল, পত্রিকার স্থানান্তরে তাহা প্রকাশিত হইল। উপাসনান্তে সমবেত জনগণের যথারীতি জলযোগের বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল।

গার্হস্থ্য সংবাদ।

সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ।—গত ২১শে অগ্রহায়ণ রবিবার, পূর্ব্বাহ্ণ সার্দ্ধ দশ ঘটিকায় ৺যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্রের অনুপস্থিতিতে কনিষ্ঠ শ্রীমান্ ভাস্করনাথ মুখোপাধ্যায় সহোদরগণ সহ আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে তদীয় শিবপুরের বাসভবনে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তদুপলক্ষ্যে যে পারিবারিক উপাসনার আয়োজন হয়, তাহাতে আদিব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় যথারীতি ষোড়শ দানদ্রব্য উৎসর্গ পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনান্তে শ্রাদ্ধীয় ব্যাখ্যানাদি পাঠ করেন। সন্ধ্যায় আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া একটী ভোজসভার আয়োজন হইয়াছিল।

তত্ত্ববোধিনী বিজ্ঞাপনী।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নবপ্রকাশিত "কলিকাতায় চলা ফেরা" সম্বন্ধে অভিমত।

প্রাপ্তিস্থান—৫৫ আপার চিৎপুর রোড;
মূল্য ৷৵০ বার আনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে ক্ষিতীন্দ্রবাবু সেকালের অর্থাৎ এখনকার পঞ্চাশপঞ্চান্ন বৎসর পূর্ব্বেকার কলিকাতার পথঘাটের এবং প্রসঙ্গক্রমে সেকালের ধনবান ও গৃহস্থদিগের সামাজিক রীতিনীতির আলোচনা করিয়াছেন। সেকালে কলিকাতার পথঘাট কিরূপ ভীষণ ছিল, তাহা এখনকার কলিকাতাবাসীদের মধ্যে যাঁহারা না দেখিয়াছেন তাঁহারা কল্পনা করিতেও অসমর্থ। এককালে কলিকাতার যে সকল পল্লীতে সত্য সত্য "দিনে ডাকাতি" হইত, লোকে দিনমানে যে সকল গলিপথ দিয়া যাইবার সময় গুণ্ডা ও বদমায়েসগণের দ্বারা লুণ্ঠিত, প্রহৃত—এমন কি নিহতও হইত, এখন সেই সকল গলিপথের অনেকগুলিই সুপ্রশস্ত রাজপথে পরিণত হইয়াছে। যে সকল পথের উভয় পার্শ্বে কাফ্রি গুণ্ডা ও বদমায়েসগণের আড্ডা খোলার ঘর ছিল, এখন সেই সকল পথের পার্শ্বে সুরম্য অট্টালিকা উচ্চশিখরে দণ্ডায়মান হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে প্রমোদোদ্যান শোভা পাইতেছে। কলিকাতার সেই অতীত দৃশ্য-লোকলোচনের অন্তরাল হইলেও অনেকের স্মৃতিপটে অঙ্কিত রহিয়াছে। ক্ষিতীন্দ্র বাবু এই পুস্তকে সেই স্মৃতিকে জাগরূক রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা এখন যেরূপ "হুতোম প্যাঁচার নক্সায়" প্রাচীন কলিকাতার এক দিকের দৃশ্য দেখিতে পাই, এই পুস্তকেও সেইরূপ আর এক দিকের দৃশ্য সুদক্ষ শিল্পীর দ্বারা সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। গ্রন্থকার কেবল সেকালের পথঘাট ও যানবাহনের বর্ণনা করিয়াই বিরত হয়েন নাই, সেকালের সহিত একালের তুলনা করিয়া অনেক স্থলে ভালমন্দ বিচারও করিয়াছিলেন। পুস্তকখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। আমরা কলিকাতার ট্রাম-বাস-মোটর-বিহারী নবীনের দলকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। হিতবাদী ৩রা পৌষ, ১৩৩৭।

Calikatay Chala Fera—Sekale ar Ekale (Moving about in Calcutta—Past and Present) by Kshitindranath Tagore, Published by Brajendra Nath Chatterjee, Adi'Brahmo Samaj Press, 55 Upper Chitpore Road, P. 138, illustrated As. 12.

Calcutta 40—50 years ago was indeed a very different place from what it is to-day. We see how the appearance of the old familiar parts of the city is changing before our eyes from year to year. The Improvement Trust and the development of the modern sanitary and vehicular arrangements are, in the main, responsible for the rapid transformation of Calcutta. With this change in methods of locomotion, housebuilding, drainage, water supply, handling of traffic, lighting, disposal of sewage, etc, change in the habits of the city folk and in their outlook as citizens is bound to come, and it is certain that one returning to Calcutta, say after the lapse of even 29 years, would find life in the city to be of a new order.

How this change gradually came to pass is a fascinating story. The story of the disappearance to day of the dirt-heaps which used to be piled up in those days in street corners and thrown into road-side ponds, whose number was legion, to rot away and attract myriads of flies in the process, to spread disease and death; how the open drains in busy thoroughfares like Chitpore Road gave place, little by little, to the modern sewerage system of to-day; how the *ticca gharry* and the *palanquin*, the only modes of vehicular locomotion, fell into disfavour and horse drawn trams of a later period were replaced by electric trams; how rickshaws, and then motor cars and motor buses appeared in the streets of calcutta; evolution of street lighting from kerosene to gas and finally, electricity—all this is told by Mr. Tagore, himself a distinguished member of one of the oldest aristocratic families of calcutta, in a very interesting way in this attractive little volume Strange to think that all this happened within living memory! Interspersed with the account are told many stories illustrative of the manners of Calcutta Society half a century ago.

The book is appropriately dedicated to the *ex* Mayor. Mr. J. M. Sen-Gupta and will prove interesting reading not only to the ordinary citizen of Calcutta but also to the outsider who will enjoy being transported for an hour to the olden days with their (to a moderner) quaint ways of life.

The Calcutta Municipal Gazette. 13, Dec.1930.

'হবিঃ' সম্বন্ধে অভিমত।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধিপ্রণীত ও সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী কর্ত্তৃক স্বরলিপি-সঙ্কলিত। ১১৬ পৃষ্ঠা—মূল্য ॥০ টাকা। ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড, আদিব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে প্রাপ্তব্য।

স্বরলিপি-সঙ্কলিত এই গীতিকবিতা গ্রন্থের নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। প্রচ্ছদপত্রে যজ্ঞেরা ভাবতে হুতাশন হবির আহুতি গ্রহণ করিতেছেন। প্রথমেই বেদগানে প্রাণের মালিনা কালিমা দূরীভূত হইয়া পরব্রহ্মে চিত্ত সমর্পিত হইবার জন্য উন্মুখ হয়। তারপর বিভিন্ন গানের মধ্য দিয়া বিভিন্নভাবে ভক্তির পূত মন্দাকিনী হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া পরব্রহ্মের চরণ-তলে উপনীত হইতে প্রয়াসী। জীবনের কর্ম্ম-কোলাহলের অবসানে সত্য সত্যই মনে হয় সমগ্র প্রাণ যজ্ঞাগ্নিতে আহুত হবির মত পরব্রহ্মের চরণে ডালি দিয়া জীবন সার্থক করি। প্রত্যেক সঙ্গীতটি সেই ভাবের উদ্বোধক। শান্ত-সন্ধ্যায় গ্রন্থকার বলিতেছেন—

"এমন মধুর সন্ধ্যাবেলা—প্রেমভক্তি নানাফুলে,
চিত্তসাজি সাজাইয়া দাও গো তাঁরি পায়ে তুলে।
ডাকবার মত ডাক তাঁরে ব্যাকুল করুণ সুরে
দেখা দেবেন প্রাণের মাঝে আপনারেও ভুলে।
মন যাও রে এবার অন্তঃপুরে।"

সুবর্ণবণিক সমাচার—অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ সাল।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নবপ্রকাশিত গ্রন্থ

হবিঃ

(গানের বহি)

(সঙ্গীত-ভারতী শ্রীবাণী দেবী Mus. Doc. Ind. কর্ত্তৃক স্বরলিপি সহ)

রয়াল ৪ পেজী ৮০+১১৬ পৃষ্ঠা ; ছাপা ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট ; প্রচ্ছদে ও মুখপত্রে দুইখানি ভাবোদ্দীপক চিত্র সম্বলিত।

এই গ্রন্থে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের রচিত ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা সর্ব্ববিধ উচ্চাঙ্গের ৫০খানি বাছা বাছা গান দেওয়া হইয়াছে। সেই সকল গান বিশুদ্ধ রীতি অনুযায়ী তান ও লয় সমন্বিত। গানগুলি তান ও লয় যথাযথভাবে স্বরলিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গানগুলির ভাব যেমন সুন্দর, সুরও তেমনি মনোহর। গানগুলিতে রাগরাগিণী ও তাল-লয়ের শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধতা রক্ষিত হওয়ায় সঙ্গীতরসজ্ঞমাত্রেরই বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। পুস্তকখানি প্রত্যেক সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তির হাতের নিকটে রাখিবার যোগ্য। সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগ হইতে যে প্রণালীতে বিদ্যালয়ে সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গানগুলি নির্ব্বাচিত হইয়াছে এবং সেই কারণে গ্রন্থখানি আবালবৃদ্ধ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সকলেরই উপযোগী হইয়াছে। ইহাতে প্রাভাতিক ও সান্ধ্য ৩০টী বিভিন্ন রাগ ও রাগিণী এবং ১৮টী বিভিন্ন তালের গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য অতি সুলভ ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

এ১ বি, বারাণসী ঘোষের সেকেণ্ড লেন, পোষ্ট বড়বাজার, কলিকাতা এবং মেসার্স ডোয়ার্কিন এণ্ড সন, ৮ নং ড্যালহাউসি স্কোয়ার, এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থালয়ে (কলিকাতা) প্রাপ্তব্য।

"এই গ্রন্থে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত ৫০টি সঙ্গীত ও তাহার স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদের সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্র, "ওঁ পিতা নোহসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু" এই গ্রন্থের প্রথম সঙ্গীত। সঙ্গীতশাস্ত্র-বিদুষী শ্রীমতী বাণী দেবী কল্যাণ ঠেওরা সুর-তালে ঐ মন্ত্রের বল প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং এই বেদগান সকলেই সহজে শিখিতে পারিবেন।

"বাণী দেবী স্বয়ং সুন্দর গান করিতে পারেন, সঙ্গীতবিদ্যায় তিনি পারদর্শিনী, গানের স্বরলিপি রচনায় সুনিপুণা। পিতা ভগবদ্ভাবে মগ্ন হইয়া সঙ্গীত রচনা করিতেছেন, কন্যা সুর-তালে তাহা গাহিতেছেন। ভারতের প্রতি গৃহে এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া মানবকুল পুণ্যালোকে পরিপূরিত হউক—'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্' নীচ আমোদপ্রমোদ বর্জ্জন করুক।"

সঞ্জীবনী—৬ই চৈত্র, ১৩৩৬।

Bandhu Amar—(My Friend.) By Kshitendra Nath Tagore, (Adi Brahmo Samaj Press, Calcutta, Re. 1/.)

This is a book of prayer. Mr. Tagore, the Minister of the Adi Brahmo Somaj, is known as a saintly man. In this book he has embodied thirty-one of his prayers to the Almighty whom he looks upon as his friend. Their beauty cannot be realized except by those who in time of distress seek relief and comfort by prayer. To them the book will be very helpful.

Statesman 9. 3 30.

KHEAL OR RANDOM THOUGHTS.—BY KSHITINDRA NATH TAGORE.

(Adi Brahmo Samaj Press. Re. 1-8.]

Mr. Tagore has earned a reputation as an essayist. This Volume contains a systematic chain of thoughts about men and things that came to him during his travels on four different occasions; and the descriptions incidentally offer opportunities for the reader to make himself acquainted with the manners and customs of the well-known Tagore family of Calcutta. The most noticeable feature of the book is the author's eagerness to induce his readers to look even at the ordinary things around them in a spiritual way. The book will be welcomed by all who enjoy deep thinking. Statesman 23. 3. 30.

Tattwabodhini Patrika

Reg. No. C 462

একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দ্বাবিংশ কল্প—চতুর্থ ভাগ

সংখ্যা ১০৪৯

১৮৫২ শক পৌষ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৮তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(৭ম বর্ষ ১৩৩৭)

বাঙ্গলার সঙ্গীত বিষয়ক একমাত্র সচিত্র মাসিক।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অধ্যাপক ডাঃ কালিদাস নাগ এম-এ, ডি-লিট (প্যারিস)

ভারতের বিশুদ্ধ সঙ্গীত শিক্ষার সকল প্রকার অভাব দূর করিয়া সকলের প্রশংসার্হ হইয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রাদি বিষয়ে প্রতিমাসে নিয়মিত প্রবন্ধ স্বরলিপি ও আলোচনা বাহির হইতেছে। আধুনিক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞগণের রচিত গান ও তাহার স্বরলিপি শিক্ষার জন্য ইহাই একমাত্র সহায়। দেশীয় ওস্তাদগণের পবিত্র জীবনী ও শিক্ষাধারীর আলোচনাতে পত্রিকাখানি অলঙ্কৃত থাকে। বালক বালিকা-গণের শিক্ষার জন্য সহজ ও সরল ভাষায় প্রবন্ধ, স্বরলিপি প্রভৃতি প্রতি সংখ্যাতে যত্নসহকারে প্রকাশিত হয়। আজই গ্রাহক হউন।

বার্ষিক মূল্য ৩৷৹। প্রতি সংখ্যা ।৴৹ মাত্র।

কর্ম্মকর্ত্তা

৮ সি লালবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের

খেয়াল

সরস ভঙ্গিতে অভিনব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। অথচ প্রবীণ গ্রন্থকারের প্রাসঙ্গিক পরিপক্ক চিন্তাগুলির মধ্যে ভাবিবার চিন্তিবার অনেক বিষয় স্বতই সমাবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। রয়াল ১৬ পেজী আকারের ১৲+২৩৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ৯ খানি হাফটোন-চিত্রে সুশোভিত; ছাপা ও কাগজ ভাল। উৎকৃষ্ট সবুজ কাপড়ে স্বর্ণাঙ্কিত সুন্দর বাঁধাই। মূল্য ১॥৹ মাত্র। ডাঃ মাশুল ৴৹ আনা।

এদেশের কথা

পাক্ষিক পত্র

দেশের অভাব অভিযোগের কথা, দেশের লোকের রোজকার জীবনে যে সব সমস্যা তাদের পীড়িত করে তাই হচ্ছে "এদেশের কথার" আলোচনার বিষয়। স্বাস্থ্যকর আবেষ্টন, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, সুলভ ও অকৃত্রিম ভোগ্য, বিশুদ্ধ দুধ-ঘির উৎপাদন যাতে প্রত্যেক নাগরিক, প্রত্যেক পল্লীবাসীর জীবন, উপভোগ্য হয়ে উঠে "এদেশের কথা" তারই বার্ত্তা মাসে দুবার ঘর ঘরে বহন করে। এদেশের কথার আলোচ্য বিষয়:—(১) নাগরিকের কর্ত্তব্য ও অধিকার (২) শিশুদের শিক্ষা ও চরিত্র গঠন। (৩) খাদের বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং খাদ্যের প্রকারভেদ সম্বন্ধে আলোচনা। (৪) দেশের লোক যাতে মানুষ হয়ে উঠে—যাতে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শেখে। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ মাত্র। বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়।

এদেশের কথা আফিস

২২, আর, জি, কর রোড, শ্যামবাজার কলিকাতা।

দশ বৎসর শ্রীমতী প্রতিভা দেবী বয়সে

(*Lady Chowdhury*)

বিদ্বজ্জনসমাগমে সেতার বাজাইতেছেন

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৮-তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এসসি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০১। সাল ১৩৩৭। শক ১৮৫২। খৃঃ ১৯৩০। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩১।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৫৫। প্রসন্ন হও।

মা! আর বাঁচি না—বাঁচিবার ইচ্ছাও নাই। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, তবেই আমি বাঁচিব। তোমাকে যদি আমি প্রসন্ন করিতে না পারি, আমার সমস্ত অপরাধ যদি তুমি ক্ষমা না কর, তবে আমার বাঁচিয়া কোনই লাভ নাই—মৃত্যুই আমার ভাল। প্রভাতে সূর্য্য উদিত হইয়া আকাশে সোনা ঢালিয়া দিক না কেন,—আমার চক্ষে যেন আগুণ ঢালিয়া দেয়। আমার কাছে অন্ধকারই বড় প্রিয়। ঐ অন্ধকারের ভিতর মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া থাকি, কেহই আমাকে একটীবারও না ডাকে,—তাহাই আমার কাছে বড় ভাল লাগে। ইচ্ছা হয়, কেবল কাঁদি, আর কেবল কাঁদি—আর, ঐ তোমার চরণে অনুক্ষণ দৃষ্টি স্থির রাখিয়া তোমার প্রসন্ন মুখের হাসি ভিক্ষা করি। নদীর কূলে তোমারই নাম শুনিব বলিয়া যাই বটে, কিন্তু সেখানে গিয়া সে গান শুনিতে পাই না—কেবল নিজের বুকের ভিতরেই বেসুরা আওয়াজ শুনিতে পাই। তখন ইচ্ছা হয়, ঐ নদীর শীতল কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া চিরকালের মত শীতল হই—তখন যদি আমার চিরশান্ত মুখ দেখিয়া তোমারও ক্রোধ শান্ত হইয়া আসে, আর একটীবার আমাকে কোলে তুলিয়া লও, আর আমার সেই অসাড় শান্ত দেহে তোমার একটী নিশ্বাসও আসিয়া লাগে। মা—প্রসন্ন হও—একটীবার এই সন্তানকে কোলে লইয়া তোমার ঐ প্রসন্ন মুখের চুম্বন দাও; একটীবার এই বড় দুঃখী সন্তানকে দুবাহুতে জড়াইয়া ধর। আমি ঐশ্বর্য্যের প্রত্যাশী নহি—আমি তোমার একটুখানি আদরের প্রত্যাশী। ছেলেকে যদি মায়ের আদরই না দিবে, তবে তাহাকে জন্ম দিলে কেন? না—আদর দাও বা নাই দাও, জন্ম-জন্ম তোমার কোলে আমায় জন্ম লইবার অধিকার দিও, যাহাতে অন্তত তোমার মুখখানি সময়ে সময়ে দেখিতে পাই।

৫৬। তোমাতে আমাতে যোগ।

মা! আর আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়া থাকিও না! এই প্রভাতে সকলেই তোমার স্নেহহস্তের কোমল স্পর্শ লাভ করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে আর হাসিমাখামুখে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। কেবল আমার উপরেই তোমার স্পর্শ পড়ে নাই। আনন্দ আমার অদৃষ্টে বুঝি

লেখা নাই! আমার রক্তধারা দুই চক্ষু ফুটিয়া অশ্রুধারার আকারে ঝরিতেছে—তাহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। ফুলের কোমল প্রাণখোলা মনভোলা ভাবে হাসিতেছে। মা! আমারই প্রাণে কি হাসি কি, তাহা জানিতে পারিব না? মধুমক্ষিকারা ফুলের সঙ্গে কাণে কাণে কত কি কথা বলিয়া মধু সংগ্রহ করিয়া কি যে গান গাহিতে গাহিতে নিজের বাসায় ঢুকিতেছে। আমারই প্রাণে কি চিরকালের জন্য সমস্ত গান থামিয়া যাইবে? মলয় বাতাস কোন্ দূর—সুদূর হইতে আসিয়া তোমায় ব্যজন করিয়া যাইতেছে; আর আমার প্রাণের তপ্ত নিশ্বাসেও কি তোমায় এতটুকু ব্যজন করিতে পারিব না? আমার আর আছে কি?—ঐ একটুখানি তপ্ত নিশ্বাস ছাড়া আর তো কিছুই রাখি নাই। দিবানিশি ঐ নিশ্বাস তোমার একটুখানি স্পর্শলাভ করিবার আকুল আশায় ছটফট করিয়া মরিতেছে। মা! একটীবার আমায় কোলে লও। তোমার বিরহ আমার আর সহ্য হইতেছে না। আমাকে মারিয়াও যদি তুমি একবার আমায় কোলে লও, তবে এই বুক পাতিয়া দিতেছি—আমাকে মারিয়াও একবার কোলে লও। পুত্র শত অপরাধী হইলেও মাতা তাহাকে ফেলিতে পারে না। মা! তোমার সঙ্গে আমার যে নাড়ীতে-নাড়ীতে যোগ। সে যোগ চেষ্টা করিয়া তুমিও কাটাইতে পারিবে না, চেষ্টা করিয়া আমিও পারিব না—সে যোগ অনন্ত কালের যোগ—সে যোগ ইহকাল পরকালের যোগ। সেই যোগের দোহাই দিয়া আমি তোমাকে আকুল অন্তরে ডাকিয়া বলিতেছি—তুমি এসো, একবার আমায় আদর করিয়া কোলে লও আর আমার মুখ তোমার স্নেহচুম্বনে ভরিয়া দাও। দেখি, ইহার পরও তুমি দূরে সরিয়া থাকিতে পার কি না।

৫৭। তোমায় লাভ করিলে শান্তি।

মা! তুমি প্রাণের উপর স্বপ্নের মত আস আর স্বপ্নের মত চলিয়া যাও। যখন আস, তখন প্রাণের ভিতর শতবিধ তান ও লয়ের শতেক ভৈরবী রাগিণীর গান জাগিয়া উঠে। আবার যখন চলিয়া যাও, তখন প্রাণের ভিতর পূরবী রাগিণী জাগিয়া উঠিয়া বিষাদের ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তখন আর প্রাণ ঘরে থাকিতে চায় না—বিবাগী হইয়া তোমার অন্বেষণে বাহির হইতে চায়। যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সুন্দর, তাহারই অন্তরালে তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য প্রাণ অধীর হইয়া উঠে। দিনের পর দিন চলিয়া যায়, তোমাকে যখন খুজিয়া না পাই—তখন যে প্রাণ ভাঙ্গিয়া যায়, কান্না ফুকারিয়া বাহির হয়। কাঁদিতে কাঁদিতে প্রাণ যখন বাহির হইতে যায়, জীবনের সেই শেষ মুহূর্ত্তে আবার তুমি দেখা দাও; তখন আবার কি-এক শক্তিতে প্রাণ ফিরাইয়া আন। তখন আবার সকলই হাসিতে থাকে। সমস্ত বিশ্ব আবার প্রাণে ঢলঢল হইয়া উঠে। তখন গাছে গাছে কত সুগন্ধ ফুল ফোটে, কত ময়ূর ময়ূরী কত বিহগ বিহগী আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। তখন আমার প্রাণের সোণার রঙ্গে যাহার দিকে চক্ষু ফিরাই তাহাই রাঙ্গাইয়া তোলে। তখন আবার তোমার হাত ধরিয়া ঘরে ফিরিয়া আসি। তখন ঘরে কতই আনন্দ কতই প্রেম খেলিতে থাকে। প্রাণের ভিতর থেকে সমস্ত দ্বেষ হিংসা বিরোধ-বিবাদ পলায়ন করে। শান্তি লাভ করিয়া বাঁচি।

৫৮। অতীত-স্মৃতি।

মা! আজ মনে পড়ে সেই ছেলেবেলার কথা, যখন আমি আমার কচি কচি দুই বাহুতে তোমাকে কি রকম জাপটাইয়া ধরিয়া আদর করিতাম, আর তুমি তাহার পাল্টা জবাবে আমাকে আদরে ও চুম্বনে ভরিয়া দিতে। এতই ভরিয়া দিতে যে, আমি মুগ্ধের মত কতক্ষণ নীরব হইয়া থাকিতাম, আর তোমার ঐ স্নেহভরা প্রেম-পূর্ণ মুখের দিকে তাকাইতে তাকাইতে আত্মহারা হইয়া যাইতাম। মনে পড়ে ছেলেবেলার সেই একদিনের কথা, যেদিন তুমি আমার কচি প্রাণের ডাকের সাড়ায় নিশ্চিতরূপে বলিয়া দিয়াছিলে—"তুমি আমার আমি তোমার।" মনে পড়ে আজ সেই একদিনের কথা, সেই ঘোর অমাবস্যার কথা—যে দিন তোমা হইতে আমি একটুখানি দূরে সরিয়া গিয়াছিলাম; সেইদিন সন্ধ্যাবেলা ঘন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মসীমাখা মেঘে সমস্ত আকাশ ছাইয়া

গেল। আমার অন্তরও কি এক অজানা বিষাদের ঘন অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। বাহিরে ঝড় উঠিল —সে কি ঝড়! প্রকৃতির ভিতর যেন কি এক মারামারি হাতাহাতি লাগিয়া গেল; বড় বড় বৃক্ষরাজির ডালপালাগুলি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া দূর দূরান্তরে পড়িতে লাগিল। সম্মুখে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী—আজ তাহারই বা দাপট দেখে কে! ঢেউগুলি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া আছড়াইয়া-পাছড়াইয়া কূলের উপর আসিয়া লাগিতে লাগিল। তখন—মা! সেই অমাবস্যা রাতের সন্ধ্যাবেলা আমার সমস্ত প্রাণ একটীবার তোমাকে দেখিবার জন্য কি রকম আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তুমি জান। মা—মা বলিয়া সে যে কি কান্না কাঁদিয়াছিলাম, তাহা আমিই জানি—সমস্ত প্রাণ নিংড়াইয়া যেন সেই কান্না উঠিয়াছিল। সেদিনকার আদর কি আমি ভুলিব? তাহার স্মৃতি আমার অনন্তকালের পাথেয় হইবে। আজ কি জানি কেন, অতীত জীবনের কতই স্মৃতি প্রাণের ভিতর উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। মনে পড়ে সেই আর এক দিনের কথা। দিগন্ত প্রান্তর—সন্ধ্যা বেলা—চারিদিকে ভীষণ শ্বাপদ-সকল বিচরণ করিতেছে—ভ্রূক্ষেপ নাই—চলিয়াছি তো চলিয়াছি—কোন্ পথে তাহা জানি না। আমার বাসনা অতৃপ্ত রাখিবার কারণে বিষাদ সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, তাই বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। তুমি কত ডাকিলে ফিরিয়া আসিবার জন্য, কিন্তু অভিমানে আমি তোমার সে ডাক শুনি নাই। ভয়ে প্রাণ আঁৎকাইয়া উঠিতেছিল, তবু তোমার ডাকে সাড়া দিই নাই। তুমি দেখিলে যে, অভিমানে আমি বিনাশের মুখে কি রকম ছুটিয়া চলিয়াছি। তুমি আর থাকিতে পারিলে না—তুমি ছুটিয়া আসিয়া তোমার এই বিদ্রোহী সন্তানকে কোলে লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলে—কত উপদেশ দিয়া আমার সেই উদ্বেলিত অভিমান দূর করিলে। আমি বুঝিলাম যে, আমারই হিতের জন্য আমার বাসনা অতৃপ্ত রাখিয়াছিলে। আজ জীবনের সন্ধ্যা-বেলায় সেইদিনের মত গাঢ় আলিঙ্গনে আদর কর; সেই সেদিনের মত কোলে লইয়া আমার দেহ মন হইতে সমস্ত পথের ধূলি মুছিয়া দাও—আমাকে নির্ম্মল করিয়া দাও।

—

নবশতাব্দীতে প্রথম ব্রহ্মোৎসবের উদ্বোধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

স্বাধীনতার বীজ বপন।

ভগবানের দয়ায় ব্রাহ্মসমাজ নবশতাব্দীতে পদার্পণ করিয়াছে। স্বাধীনতার জন্য দেশে যে কঠোর সংগ্রাম চলিয়াছে, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা রাজা রাম-মোহন রায় সর্ব্বপ্রথম সেই স্বাধীনতার বিজয় বৈজয়ন্তী এদেশের এক অংশে স্থিত এই কলিকাতা নগরীতে প্রোথিত করেন। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজা রামমোহন রায় এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ তাঁহার অনুগামী শিষ্যগণ যে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার বীজ দেশের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন, আজ সেই বীজ পরি-পুষ্ট হইয়া সমগ্র দেশবাসীকে স্বাধীনতা লাভের পথে অগ্রসর করিতে সমর্থ হইতেছে। কেবল সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা কেন, সেই স্বাধীনতার উপর দাঁড়াইয়া ব্রাহ্ম-সমাজ যে সকল আদর্শ একে একে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, আজ, বলিতে কি, সমগ্র ভারত সেই সকল নিজস্ব করিয়া লইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজের উত্থান পতনের সহিত হিন্দুসমাজের উত্থান ও পতন অনিবার্য্য।

সুধী বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই একটু আলোচনা করি-লেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই পুণ্যভূমি ভারতভূমিকে বাঁচাইতে চাহিলে, মৃতপ্রায় অবস্থা হইতে সজীব করিয়া তুলিতে চাহিলে, ব্রাহ্মসমাজকে বাঁচাইয়া রাখা উচিত—শুধু উচিত নহে, বাঁচাইয়া রাখিতে হইবেই। ব্রাহ্মসমাজ যেদিন মৃত্যুমুখে পড়িবে, সেদিন সেই পতনের আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া সমগ্র ভারতও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে নিঃসন্দেহ। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের অবসানে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশ, বিশেষতঃ জর্ম্মনি নিতান্তই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। জর্ম্মনি এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, অপরাপর দেশের নিকটে সাহায্য না পাইলে হয়তো ধরাপৃষ্ঠ হইতে দেশ হিসাবে বিলুপ্ত হইয়া যাইত, জর্ম্মনদিগের ন্যায় অত প্রতাপশালী জাতিরও পৃথক্ জাতিত্ব অন্তর্হিত হইবার সূচনা হইয়াছিল। শত্রু-পক্ষ জগত হইতে বিলুপ্ত হইবে, তাহার জন্য মিত্রসংঘের অন্তরে বড়ই ব্যথা ও ভয় জাগিয়া উঠিল। এই ব্যথা ও ভয় শত্রুপক্ষের প্রতি সহৃদয়তা জনিত নহে, কিন্তু নিজে-দের স্বার্থরক্ষার জন্য উদ্বেগজনিত। মিত্রসংঘ আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন এবং এই সত্য ঘোষণা করিলেন যে, জর্ম্মানিকে মৃত্যু হইতে বাঁচাইয়া তুলিতেই হইবে, কারণ জর্ম্মনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার আকর্ষণে সমস্ত

ইউরোপকে যুদ্ধাপরের দায়িত্ব লইতে হইবে। এইভাবে প্রণোদিত হইয়া মিত্রসংঘ নানা উপায়ে সাহায্য করিয়া জর্ম্মনিকে পুনরায় জীবন লাভ করিবার অবসর প্রদান করিলেন। সেইরূপ ইহাও একটী মহাসত্য যে, যে হিন্দু সমাজের অভিব্যক্তিতে উহারই কুক্ষি হইতে ব্রাহ্মসমাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ব্রাহ্মসমাজ যদি রসের অভাবে, পুষ্টির অভাবে শুকাইয়া যায়, মরণের পথে অগ্রসর হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাহার পারিপার্শ্বিক হিন্দুসমাজও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গ গ্রহণ করিবে। আবার ইহাও স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, ব্রাহ্মসমাজ যদি উন্নতির অভিমুখে অগ্রসর হয় সকল বিষয়ে পরিপুষ্টি লাভ করে, তবে তাহার মূল হিন্দু সমাজও সবেগে ও সবলে উন্নতির পথে চলিতে বাধ্য হইবে। উভয়েরই মূল যে এক—একেবারেই এক।

উভয় সমাজের সাহায্যের ফল।

ব্রাহ্মসমাজের এক শতাব্দী সুখদুঃখের ভিতর দিয়া, উন্নতি ও অবনতির ভিতর দিয়া কাটিয়া গেল। সম্মুখে দ্বিতীয় শতাব্দী মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখা দিতেছে সমস্ত পৃথিবীতে এক মহাজাগরণ জাগিয়া উঠিয়াছে। সবল যৌবন সমগ্র বিশ্বকে আনন্দের পথে, উন্নতির পথে, মঙ্গলের পথে যেন ঠেলিয়া লইয়া চলিতেছে। এই শুভ লগ্নে ব্রাহ্মসমাজের ঘুমাইয়া থাকিলে চলিবে না। একদিকে হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজকে তুলিয়া ধরিবে, নিজের রক্তমাংসের দ্বারা ইহাকে সজীব করিয়া তুলিবে; অপরদিকে ব্রাহ্মসমাজ উন্নততম আদর্শসমূহের বিজয়পতাকা লইয়া, সমরক্ষেত্রে পতাকাবাহীর ন্যায় হিন্দুসমাজের অগ্রে অগ্রে চলিতে থাকিবে। এইভাবে উভয়ে পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া অগ্রসর হইলে, কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে অচিরে এই ভারতের চরণতলে বিশ্বজগত মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইবে।

দেশের দাস মনোভাবের পরিচয়।

ব্রাহ্মসমাজ আমাদের সম্মুখে যে সকল আদর্শ ধারণ করিয়াছেন, সে সকল আদর্শ ভারতের প্রাণের প্রতিকূল তো নহেই প্রত্যুত সে সমস্তই উহার সম্পূর্ণ অনুকূল, কারণ সেগুলি ভারতের সমগ্র জাতীয় প্রাণের অভিব্যক্তির পরিণামেই আবির্ভূত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, সেই আদর্শগুলি যেমন ভারতের অস্থিমজ্জায় জড়িত, তেমনি সেগুলি উদারতম মন্ত্রবীজের কেন্দ্রের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই কারণে সেই সকল আদর্শ যে ব্যক্তি যে দেশ, যে সমাজ বা যে জাতি অবলম্বন করিবে, তাহাকেই উন্নতির পথে, মঙ্গলের পথে ও সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার পথে না টানিয়া লইয়া থাকিতে পারে না। ভারতের বহির্ভূত দেশের অধিবাসী যখন সেই সকল আদর্শ গ্রহণ করিয়া ভারতে প্রচার করিতে উদ্যত হইবে, তখন আমরা তাহা আমাদের নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিব, অথবা তাহার পূর্ব্বেই আমরা সেগুলি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকটে প্রাপ্ত, আমাদের জাতীয় সম্পত্তি বিবেচিত করিয়া গ্রহণ করিব? ভারতের বহির্দেশীয় নিকট সেগুলি চর্ব্বিতচর্ব্বণরূপে গ্রহণ করিলে আমাদের দাসমনোভাবেরই অনন্যসাধারণ পরিচয় পাওয়া যাইবে। আজ থিয়সফি সমাজের অনেকের স্বীকৃত "জগদ্‌গুরু" শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমূর্ত্তি যে সকল উদার মত প্রচার করিতেছেন, ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত আদর্শ মতসমূহ হইতে সেগুলির কোনই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু আমাদের দাসমনোভাবের কারণে ঐ যে ইংরাজ মহিলার তত্ত্বাবধানে বিলাতপ্রবাসী হইয়া বিলাত হইতে শিক্ষাদীক্ষা লইয়া প্রত্যাগত কৃষ্ণমূর্ত্তি বিদেশীয় ভাষায় সার্ব্বভৌমিক সত্য সকল—যাহা কোন সমাজের বা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের একমাত্র নিজস্ব নহে, এবং বর্ত্তমান যুগে যে সকল সত্য ব্রাহ্মসমাজই জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বিঘোষিত করিয়াছেন—সেই সত্য সকল অনায়াসে মানিয়া লইতে উদ্যত হইলাম, কিন্তু এতদিন ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজ স্বদেশের ভাষায় ও জাতীয়ভাবে ঐ সত্যসকল একনিষ্ঠভাবে প্রচার করিতেছিলেন, এতদিন যেন উহা আমাদের কর্ণেও প্রবেশ করিতে চাহে নাই, প্রবেশ করিলেও আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে দেশে যে মঙ্গলবায়ু প্রবাহিত হইতে চলিয়াছে, তাহার মুখে দাসমনোভাব উড়াইয়া দিতে হইবে—এখন স্বজাতীয় ভাবের মধ্য দিয়া এবং স্বদেশের ভাষায় যে-সকল সত্য প্রচারিত করা হইবে, তাহা আদরের সঙ্গে আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে—নচেৎ আমাদের সমুত্থানের আর আশা নাই। আজ আমরা নানাবিধ সত্য শিক্ষা করিবার জন্য দেশবিদেশের গুরুদের চরণতলে বসিতে দ্বিধা করিতেছি না; কিন্তু আমাদের বর্ত্তমানে কর্ত্তব্য এই যে, আমরা সকল বিষয়ক, অন্তত অধ্যাত্মবিষয়ক এমন উদার সত্য প্রচার করিব যে, বিশ্বজগতের তত্ত্বজিজ্ঞাসুমাত্রেই ভারতের শিক্ষাগুরুদের চরণতলে বসিয়া সেই সকল সত্য লাভ করিবার জন্য আগ্রহশীল হইবে। এই ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইলে ভারতবাসীমাত্রকেই যে ব্রাহ্মসমাজের পতাকাতলে আসিয়া জমিতে হইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মসমাজের অভাব।

ব্রাহ্মসমাজকে সজীব রাখিতে চাহিলে, নবশতাব্দীর জন্য আবশ্যক নানা কার্য্যে অগ্রণী দেখিতে চাহিলে অর্থের প্রয়োজন। বর্ত্তমান যুগের সভ্য মানবসমাজের এমনই ব্যবস্থা যে, এক পা নড়িতে গেলে অর্থ আবশ্যক। প্রচারকের দরকার—কিন্তু যাঁহাকে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত

করিবে, তাহার ভরণপোষণের তো একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। আবশ্যক হইলে তাঁহাকে সপরিবারে ভরণপোষণ করিতে হইবে—এক কথায়, প্রচারককে পরিবার পোষণের চিন্তা হইতে মুক্ত করিতে হইবে, তবেই না তিনি স্বাধীনভাবে প্রাণ খুলিয়া প্রচারকার্য্যে লাগিতে পারিবেন। যদি অবিবাহিত শুদ্ধচরিত্র প্রচারক পাওয়া যায়, তবে একদিক দিয়া তাহাতে অনেক সুবিধা আছে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত আদর্শ গৃহস্থজীবন—প্রচারক গৃহস্থ হইয়াও যেমন উপদেশের দ্বারা, তেমনি দৃষ্টান্তের দ্বারা যদি ধর্ম্মজীবন—কথায় ও কার্য্যে জীবনের বিশুদ্ধ আদর্শ দেখাইতে পারেন, তবে তাহাই ব্রাহ্মপ্রচারকের প্রকৃত কার্য্য হইবে। সঙ্গীত বল, তাহার জন্যও একজন সঙ্গীতজ্ঞ রাখিতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। একভাবের কয়েকজনকে লইয়া সংঘবদ্ধ করিতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। একথা বলিলে চলিবে না যে, হাতে পয়সা নাই, কোথা হইতে দিব? যখন দোকানে জিনিস কিনিতে আমরা যাই, তখন তো একটা "বৃত্তি" দিতে বাধ্য হই। সেই "বৃত্তি" হইতে সম্পন্ন হয় বারোয়ারি পূজা প্রভৃতি। অনেক সময়েই তাহার অপব্যবহার হইয়া থাকে। আমরাও কি প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহে ব্রাহ্মসমাজকে সাহায্য করিবার জন্য "বৃত্তি" স্থাপন করিতে পারি না? যেভাবে ভগবান ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন, তাহাতে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই, তাহাতে আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, রাজা রামমোহন রায়ের প্রাণ দিয়া গড়া এই স্মৃতি কিছুতেই বিলুপ্ত হইবে না, বরঞ্চ অচিরে সজীব ও সবল হইয়া উঠিবে। তবে একথা বলিব যে, ভগবান অবশ্য যন্ত্রী হইলেও মানুষই তাঁহার যন্ত্র। তাঁহার কার্য্য সাধনের জন্য মানুষকেই অগ্রসর হইতে হইবে। যে শুভ অবসর আসিয়াছে, ইহা রাজা রামমোহন রায়ের মত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মত, ঋষিকল্প রাজনারায়ণ বসুর মত—এক কথায়, এই ব্রাহ্মসমাজের মত প্রচারের ঠিক উপযুক্ত অবসর আসিয়াছে। অর্থাভাবে এমন শুভ লগ্ন যদি আমরা হারাইয়া বসিতে বাধ্য হই, তবে তাহা আমাদেরই লজ্জার বিষয়—তাহা আমাদেরই প্রকৃত স্বাধীনতা পাইবার অনুপযুক্ততারই পরিচয় বলিয়া গৃহীত হইবে।

নব শতাব্দীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং তদুপদিষ্ট সকল বিষয়ের প্রচারকার্য্যে এমন উদ্যমের সহিত লাগিতে হইবে যে, কেবল এদেশ নহে, কিন্তু দেশবিদেশ সর্ব্বত্র ইহার প্রভাব সম্যক উপলব্ধ হয়—সমগ্র বিশ্বের অধিবাসীগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ববিষয়ক উপদেশ শুনিবার জন্য এদেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।

আদিব্রাহ্মসমাজের অভাব ও দাবী।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সমগ্র হিন্দুভারতের নিকট যদি কোন ধর্ম্মসমাজ মুক্তহস্তে দান পাইবার দাবী করিতে পারে, তবে আমরা শতবার বলিব, উহা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহায্যে পরিপুষ্ট আদিব্রাহ্মসমাজ। সমগ্র মুসলমান ভারতের সহায়হস্ত পাইবার দাবী যদি কোন ধর্ম্ম সমাজ করিতে পারে, তবে উহা "জবরদস্ত মৌলবি" মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত আদিব্রাহ্মসমাজ।

অর্থাভাবে আদিব্রাহ্মসমাজ অনেক বিষয়ের অভাব অত্যন্ত তীব্রভাবে উপলব্ধি করিলেও সে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছেন। দুই চারজন সংস্কৃত ও ইংরাজীতে সুশিক্ষিত প্রচারক আবশ্যক। দুই চারজন সঙ্গীতজ্ঞ আবশ্যক—যাঁহারা মফঃস্বলে প্রচারকদিগের সঙ্গে গিয়া স্বরলিপির সাহায্যে ব্রহ্মসঙ্গীত শিক্ষা দিতে পারিবেন। একখানি সুপরিচালিত ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা দেশবিদেশে আদিব্রাহ্মসমাজের মর্ম্মকথা শুনাইবার জন্য বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ব্যতীত একটী সুপ্রশস্ত বাসস্থান আবশ্যক, যেখানে উৎসবাদি সময়ে বা কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যের সময়ে সমাহূত ব্যক্তিগণ কিছুকালের জন্য নির্ব্বিঘ্নে অবস্থিতি করিয়া সমস্ত হৃদয় দিয়া ঐ সকল কার্য্যে যোগ দিতে পারেন। অভাব অভিযোগের তো সীমা নাই। এই যে আদিব্রাহ্মসমাজের একশত বৎসর পূর্ণ হইয়া গেল, একমাত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্যতীত কে ইহার দুঃখ কষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন—কে ইহার অভাব পূর্ণ করিবার জন্য সমস্ত হৃদয়ের সহিত সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন? এই একশত বৎসরের মধ্যে, ভারতের স্বাধীনতার সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ের সর্ব্বপ্রধান স্মৃতি এই আদিব্রাহ্মসমাজকে কয়জন রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাহায্য না পাইলে সত্যই আজ আদিব্রাহ্মসমাজ কোথায় যে বিলুপ্ত হইয়া যাইত তাহা কে বলিতে পারে? এই আদিব্রাহ্মসমাজকে সুচারুরূপে রক্ষা করিবার জন্য বেশী কিছু দরকার হয় না—শতকরা ১৲ টাকা, ।৷০ আনা বা চার আনা বা দুই আনা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হয়। কোম্পানির কাগজ কিনিতে চাও—দালালি দিতে হইবে প্রতি ১০০ টাকার কাগজে দুই আনা। সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজের জন্য বৃত্তি হিসাবে শতকরা যাহা কিছু পারা যায় তাহাই বৃত্তিরূপে নির্দ্দিষ্ট রাখিলে বেশী হইল বলিয়া তো মনে হয় না।

ইহা কি কম পরিতাপের বিষয় যে, আজ এক শত বৎসরের মধ্যে আদিব্রাহ্মসমাজ সুচারুরূপে মেরামত হইতে পারিল না ? বর্ত্তমানে ইহা ভালরূপ মেরামত করিতেই প্রায় কুড়ি ত্রিশ হাজার টাকা লাগিবে। কে এই সৎকার্য্য দান করিতে অগ্রসর হইবেন ? আমার এই রোদন কি অরণ্যে রোদন হইবে ? মঙ্গলময় ভগবান যদি থাকেন এবং তাঁহারই মঙ্গলবিধানেই যদি এই ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তবে আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনিই ইহার স্থায়িত্বের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, সকলই অচিরেই বিধান করিবেন।

উপসংহারে আমি ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি যে, তিনি দেশবাসীর অন্তরে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের দিক্‌ভ্রষ্ট মতিগতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করুন, যাহাতে তাঁহারা তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রত উদ্‌যাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন এবং ব্রাহ্মসমাজের বিজয় সর্ব্বত্র অকুণ্ঠিতচিত্তে ঘোষণা করিতে পারেন।

মহর্ষিদেবের চন্দননগরে অবস্থান।

(৺লালবিহারী বড়াল, ১৩২৩ সালে লিখিত)

মহর্ষিদেব বহুদিনের পর হিমালয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমে চন্দননগরের বারবাস্থিত গঙ্গাধারের বাড়ী যাহাতে Thiestle Hotel অবস্থিত ছিল ; এবং তৎপরে চুঁচুড়ার বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর বাহাদুর Mr. Lees এক্ষণে যে বাড়ীতে বাস করিতেছেন তথায় কিছুদিন বাস করেন। এখানে একটী বহু শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট প্রাচীন বটবৃক্ষ অবস্থিত। ইহার নিবিড় ছায়া ও মনোরম শাখা, মনে শান্তি ও আনন্দ দান করে, মহর্ষিদেব ইহার তলে আসন বিছাইতেন এবং সকলের সহিত সদ্ভাবে ও সাধুভাবে মিলিত হইতেন। অতঃপর বাবু যদুর প্রসিদ্ধ ডাকাতি পড়া বাটীতে অবস্থান করেন। এই তিনটী স্থানের প্রাকৃতিক শোভা অতিশয় রমণীয়. গঙ্গার দিগন্তব্যাপী মনোহর দৃশ্য সম্মুখে প্রসারিত। গঙ্গা সর্ব্বকাল ইহার পাদমূল বিধৌত করিয়া যাইতেছে, তরঙ্গমালা সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, তথাপি বনস্পতি-দল চির নবীন বেশে অঙ্কপুলকে দোলায়মান ; নির্নিমেষ-নয়নে চন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিতেছে। গগনতল তারকাবলম্ব প্রতি অঙ্গনীতে মতির বিছানা পাতিয়া দিয়া ভক্তজনকে আহ্বান করিয়া বলিতেছে "তোরা পৃথিবীর মৃত্তিকা লইয়া সাম্রাজ্যকে ভুলিয়া গেলি"। বিহঙ্গমগণ নিরন্তর প্রফুল্লিত মনে গান করিয়া অচেতন আত্মার চেতনা সম্পাদন করিতেছে। এই সকল প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে বাস করিয়া সহজেই মন মহেশের মহদ্ যশ ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হয়। মহর্ষিদেব এই স্থানটীকে তাঁহার মনের অনুকূলক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লইয়াছিলেন, যদিও এক্ষণে এলোক হইতে তিনি অপসৃত হইয়াছেন এবং বাড়ীটি হস্তান্তরিত হইয়া রূপান্তরিত হইয়াছে।

ধর্ম্মপুর নিবাসী ভক্তপ্রাণ ৺রসিকলাল দত্ত যিনি Hooghly Branch School এর তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন, যাঁহার গৃহে ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং যিনি নিত্যনিয়মে পুত্র কন্যা, বন্ধু বান্ধব ও স্বদেশবাসীকে লইয়া বিনম্রভাবে প্রতি রবিবারে সভা বসাইতেন ও উৎসব করিতেন ও সকলকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইতেন। তাঁহারই প্রযত্নে এই বাটী স্থিরীকৃত হইয়াছিল, এই সুবিমল শান্তির আলয় আবাসস্থানরূপে নির্ণয়ে মহর্ষিদেবের প্রাণের পিপাসা কি ছিল তাহা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়।

> জ্ঞানী লোক লভে সুখ জলের কল্লোলে
> পুণ্যাত্মা লভয়ে শান্তি পর্ব্বতের কোলে
> মতিমান অচঞ্চল স্বভাবের গুণে
> জ্ঞানবান সদা থাকে প্রফুল্ল অন্তরে
> পুণ্যবান্ দীর্ঘজীবি জানে সর্ব্ব নরে ॥

এখানে মহর্ষিদেবের আশ্রয়ে ভক্তপ্রাণ ৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ছায়ার ন্যায় মহর্ষিদেবের নিকট সর্ব্বকাল অবস্থান করিতেন, পরম ভক্তিভাজন আচার্য্য মহামতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সদা প্রফুল্লিত মনে এই বাটীর নিম্নতলে "অতি ধীর গম্ভীরভাবে" তাঁহার অচল বৈঠক পাতিয়া বিরাজ করিতেন, তাঁহার সম্মুখে একটী কাষ্ঠের ছোট্ট টেবিল। তিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া লেখনীর স্রোত এমনি প্রবলবেগে বাহির করিতেন যে দিন অবসান হইয়া যাইত, তথাপি এ স্রোত থামিত না। বিবেক বৈরাগ্য ও সদ্ভাবপূর্ণ কত সঙ্গীত, কবিতা, বক্তৃতা ও সারগর্ভ প্রবন্ধ তাঁহার হৃদয়কন্দর হইতে অতি সহজে বিনির্গত হইয়া কত শত নিরাশ অন্তরে, কত যে অপার শান্তি প্রবাহিত করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে ? এই প্রবাহ তিনি কুলপাবন সৎপুত্রের ন্যায় আজীবন সজীব রাখিয়াছেন, তাঁহার সুবিখ্যাত "আচার্য্যের উপদেশ এই স্থান হইতেই বাহির হইয়াছিল, একদিন তিনি আমাকে বলিলেন—বড়াল তুমি কিরূপ স্বরগ্রাম যন্ত্র আমাকে দেখাও। আমি বলিলাম—পুনরায় যখন আমি বাটী আসিব, আপনাকে দেখাইব, তদনুসারে যখন আমি পুনরায় তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইলাম, তাঁহাকে

ছইখানি English Gold যাহারপ্রত্যেকের মূল্য ২৬৮৮৮ তাই দেখাইলাম,এবং একটীর উপর আর একটী সংস্থাপন করায় জুড়িয়া গেল, দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন ও বলিলেন "সুবর্ণের জ্যোৎস্না আনিয়াছ" ইহার একটী Table প্রস্তুত করিতে কত টাকা লাগিবে। আমি বলিলাম ১০ হাজার টাকা, ইহা শুনিয়া তিনি এমনি উচ্চ হাস্য করিলেন যে, বোধ হইল মাধব দত্তর সেই প্রাচীন ভবন, যাহাতে অনেক কাল পূর্ব্বে ডাকাত পড়িয়াছিল, পড়িয়া গেল। তাঁহার হাস্যের মধ্যে এমনি মধুর গম্ভীরভাব বিরাজ করিত যে, বালক বৃদ্ধ যুবা অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত ইহাতে তৃপ্ত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না।

মহর্ষিদেবের একখানি চমৎকার দুই কুঠরিবিশিষ্ট বজরা গঙ্গাবক্ষে অতি নিকটে বিরাজ করিত। তিনি প্রতিদিন উপাসনান্তে নিত্য নিয়মে, প্রাতেঃ ও স্যায়ংকালে বেড়াইতে যাইতেন, তাঁহার আসন একখানি বেতের চৌকি, বজরার ছাতের উপর থাকিত, আমি আমার সুবৃহৎ সুবর্ণের ব্যবসা উপলক্ষে কলিকাতায় ২২ দিন এবং হুগলির ভবনে ৮ দিন থাকিতাম। এই ৮ দিন সর্ব্বপ্রযত্নে মহর্ষিদেবের সৎসঙ্গ লাভ করিয়া প্রাণ মন সুশীতল করিতাম, আমার সেই ক্ষুদ্র হারমোনিয়ম যাহা আমার মাতাঠাকুরাণী আমার বিবাহ উপলক্ষে ১৮৭৪ সালে উপহার দিয়াছিলেন, যাহা আমি সর্ব্বপ্রযত্নে প্রাণপ্রিয়রূপে রক্ষা করিয়া আসিতেছি, সঙ্গে লইয়া যাইতাম, এবং মহর্ষিদেবকে নূতন নূতন গান শুনাইতাম, যাহা, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ তৎকালে রচনা করিয়া আদিব্রাহ্মসমাজে গান করিয়া সকলকে উদ্বোধিত করিতেন এবং যাহা একবার মাত্র শ্রবণ করিয়াই আমি আদায় করিতাম। মহর্ষিদেব এই সকল গান তাঁহার ভবনে ও গঙ্গাবক্ষে শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হইতেন এবং আমাকে তাঁহার কোমল হস্ত দ্বারা মস্তকে হাত বুলাইয়া দিতেন ও বলিতেন "বড়াল তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক"। আহা সেইদিন স্মরণ হইলে মনে হয় আমি কোথায় আর তিনি কোথায়? আনন্দলোক হইতে আজো তাঁহার আশীর্ব্বাদ আসিতেছে।

নারীধর্ম্ম।

(শ্রীসুখদাসুন্দরী দেবী মজুমদার)

বর্ত্তমান কালে সরল বঙ্গভাষায় লিখিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্বলিত হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসাগ্রন্থ সর্ব্বত্র অতি সুলভ মূল্যে প্রাপ্তব্য। নারীদের এই সমস্ত গ্রন্থ সাহায্যে স্ব স্ব পরিবারস্থ সকলের চিকিৎসার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষের নারীগণ চিরকালই পতিব্রতা; তাঁহারা পূর্ব্বকালে পতির সহিত যজ্ঞাদি কার্য্য সম্পাদন করিতেন, এবং কোন কোন বিদুষী নারী যজ্ঞের মন্ত্রও রচনা করিতেন। বিশ্ববারা নাম্নী একজন বিদুষী নারী, এইরূপ অনেক মন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঈদৃশী বিদ্যাবতী এবং জ্ঞানবতী নারীরাও স্বহস্তে রন্ধনাদি সমুদয় গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতেন।

বিবাহের সময় কন্যাকে যে উপদেশ প্রদত্ত হইত, তাহার একাংশ ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত করা গেল। "সুলক্ষণা ও সৌভাগ্যবতী হইয়া পতিগৃহে বাস কর, দাসদাসী এবং গৃহপালিত পশুর মঙ্গলকারিণী হও! তোমার নয়ন ক্রোধশূন্য হউক, পতি-শুশ্রূষা পরায়ণা হও, পশুদিগের মঙ্গলবিধান কর। তোমার নয়ন সর্ব্বদা প্রফুল্ল হউক, তোমার সৌন্দর্য্য মঙ্গলকারিণী হউক। বীরপ্রসবিনী হও; দেব, অতিথি, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, ভাসুর, দেবর প্রভৃতি পরিবারস্থ সকলের সেবাপরায়ণা হও।"

ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী, জ্যোতির্বিদ্যার প্রবর্ত্তিকা খনা, অঙ্কবিদ্যার উদ্ভাবিকা লীলাবতী প্রভৃতি প্রাচীন ভারত মহিলারা গৃহকার্য্য করিতেন।

ভারতসম্রাট দাশরথি রামের মহিষী সীতাদেবী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পরিবারস্থ সমস্ত পোষ্যবর্গকে আহার করাইতেন এবং নিজে অবশিষ্ট অন্ন আহার করিতেন। ঈদৃশী বিদ্যাবতী, জ্ঞানবতী ও পুণ্যবতী নারীরা যখন স্বহস্তে রন্ধনাদি যাবতীয় গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতেন, তখন ইহা ধ্রুব সত্য যে, রন্ধনাদি যাবতীয় গৃহকার্য্য নারীদের প্রধান কর্ত্তব্য।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে উল্লিখিত আছে, বিদেহ প্রদেশে করাল নামক জনক-বংশীয় রাজার যজ্ঞীয় সভার পণ্ডিতগণের মধ্যে শাস্ত্রবিষয়ক এক বিচার হইয়াছিল। তাহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব জগৎতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এতৎসমস্তই আলোচিত হইয়াছিল। এই পণ্ডিত সভায় গর্গবংশ সমুদ্ভবা একজন ব্রাহ্মণ কুমারী এইরূপ কঠিন বৈজ্ঞানিক বিচার করিয়াছিলেন, যাহা পাঠ করিয়া অবাক হইতে হয়। এই ব্রাহ্মণ কুমারীও সমুদয় গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। প্রাচীন ভারত রমণীরা ধর্ম্মনীতিসম্পন্না, তপশ্চরণে অনুরক্তা, আলস্য বর্জ্জিতা, গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা এবং স্বামীর যথার্থ সহধর্ম্মিণী ছিলেন।

প্রাচীন ভারত মহিলার মধ্যে অনেকেই কি জগৎতত্ত্ব, কি জীবতত্ত্ব, কি ব্রহ্মতত্ত্ব, কি রাজনীতি, কি শিল্পবিদ্যা, কি সঙ্গীতবিদ্যা কি যুদ্ধবিদ্যা সর্ব্ববিষয়ে প্রভূত জ্ঞান

সম্পন্না ছিলেন এবং এইরূপ উচ্চ জ্ঞানালোচনায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াও তাঁহারা স্বহস্তে গৃহকর্ম্ম-সম্পাদন করিতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা মহাখণ্ডের এক ধর্ম্ম মহাসভায় দাঁড়াইয়া বেদান্ত-দর্শন বিষয়ক বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন,—জগতের নারীজাতির আদর্শ স্থানীয় ভারতের সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি পুণ্যবতী রমণীরা উচ্চ-জ্ঞানবতী হইয়াও গৃহকর্ম্ম করিতেন।

বিবি আনিবেশান্তও তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন, প্রাচীন ভারতের মহিলারাই জগতের আদর্শ; তাঁহারা উচ্চ জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনায় ও রাজ্যপরিচালনায় স্বামীর আনুকূল্য করিয়াও গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতেন। তিনি স্বয়ং প্রাচীন ভারত মহিলাদিগকে আদর্শ করিয়া নিজ জীবন যাপন করিতে বাসনা করিয়াছেন।

পুণ্যশ্লোকা, প্রাতঃস্মরণীয়া পরলোকগতা রাণী ভবানী বিপুল ভূসম্পত্তির অধিশ্বরী ছিলেন। তিনি স্বয়ং বিশাল জমিদারী পরিচালনা করিয়াও গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতেন মহর্ষি কপিলদেবের মাতা দেবহুতি সাংখ্যবিদ্যা লাভ করিয়াও গৃহকর্ম্ম করিতেন।

যীশু এক দিবস ভজনালয়ে প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময় কতিপয় নারী তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ চাহিল, তখন তিনি বলিলেন, "নারীগণ, পাতিব্রত্য ও সেবাব্রত অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন কর।"

কোরাণের বঙ্গানুবাদে উল্লিখিত আছে, সাম্যমন্ত্র-প্রচারক মহাত্মা মহম্মদ নারীদিগকে উপদেশ ছলে, "পাতিব্রত্য এবং সেবাব্রতই" নারীদের পরম ধর্ম্ম বলিয়াছেন।

জগতের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মহাপুরুষ, ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান, পণ্ডিত, নীতিবিদ এবং ধর্ম্মপ্রচারক মহাত্মাদের মতে পাতিব্রত্য, সেবাব্রত, তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা এবং রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম করা নারীদের পরম কর্ত্তব্য। কিন্তু আজকাল নারীগণ প্রায় সকলেই কর্ত্তব্য বিমূঢ়া।

বর্ত্তমান সময়ে অস্মদ্দেশীয় অধিকাংশ নারীগণই প্রাচীন ভারত মহিলাদের মত জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনাও করেন না এবং গৃহকর্ম্মও করেন না; তাঁহারা অনর্থক দেহভার বহন করিতেছেন।

সামান্য বেতনভোগী কেরানী, স্কুলমাষ্টার প্রভৃতির পত্নীরাও রন্ধনাদি গৃহকার্য্য করা অপমান মনে করেন, আর যাঁহারা অধিক উপার্জ্জনশীল এবং বৈভবশালী, তাঁহাদের গৃহিনীগণ তো ধরাকে সরার মত জ্ঞান করিয়া মাটিতে পা দিতেই অসম্মান বোধ করেন।

প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই আজকাল বেতনভোগী পাচক পাক করে; গৃহিনীরা আলস্যের সজীব মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া বসিয়া দিন কাটান। তাঁহারা পরিবারস্থ পীড়িত ব্যক্তিকেও সাগু বার্লি সিদ্ধ করিয়া পথ্য প্রদান করিতে ভত মহাক্লেশ বোধ করেন। পাচক উপস্থিত না থাকিলে বালকবালিকারা যথাসময় খাদ্য পায় না। এইরূপ অসুবিধা সর্ব্বদা প্রায় সকল পরিবারেই সংঘটিত হয়।

পাচকের হাতে রন্ধনাদি যাবতীয় গৃহকর্ম্মের ভার থাকায় গৃহকার্য্যাদি সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়ম সহকারে পরিচালিত হয় না। তাহারা খাদ্যসামগ্রীর যথেচ্ছ অপচয় করে, এক সের বস্তুর জায়গায় পাঁচ সের লাগায়। পাক ভাল হউক বা মন্দ হউক, খাইয়া লোকে পরিতৃপ্তি বোধ করুক আর না করুক, সেজন্য তাহার কোন ভয় ভাবনা নাই, সে কেবল দিন গণনা করে, কবে মাসকাবার হবে, মাহিনা পাব।

পাচক ব্রাহ্মণ বা শূদ্র যে জাতিই হউক যদি সে দুষ্টস্বভাব, নৈতিক-চরিত্রহীন, পাপমতি ও সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে তাহার পকান্ন, ভোজনকারীদের দেহে সেই সমস্ত দোষ ও ব্যাধি সংক্রমিত করিতে পারে, ইহা সত্য। পাচকের পকান্ন এবং বাজারের হোটেলান্ন উভয়ই সমান দুষিত।

মনুষ্য দেহ একটি তড়িদ্‌যন্ত্র বিশেষ। স্পর্শাদি দ্বারা এক শরীরের দোষগুণ অন্য শরীরে বৈদ্যুতিক বেগে সংক্রমিত হইতে পারে। এইজন্য পাপমতি ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সহিত একাসনে উপবেশন, এক শয্যায় শয়ন, একত্র ভোজন এবং তাহার পকান্ন আহার করা স্মৃতিশাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে।

পাচকের বেতন ও খোরাকী বাবত মাসে মাসে কতগুলি টকা অপব্যয়িত হয়। যদি নারীগণ আলস্য বর্জ্জন করিয়া স্ব স্ব রন্ধনাদি গৃহকার্য্য সম্পাদন করেন তাহা হইলে অপব্যয় নিবারিত হইতে পারে, পাকও ভাল হইতে পারে, পরিবারস্থ পোষ্যবর্গেরা পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করিয়া সুস্থ সবল ও দীর্ঘজীবী হইতে পারে।

আজ কাল দেশে দৈন্যরূপ দানবের যাদৃশ দৌরাত্ম্য, এই অবস্থায় অর্থের অপব্যয় করা মহা অন্যায়।

দেশে কোটি কোটি লোক দু'বেলা পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পায় না, কাপড় পড়িতে পায় না, অভাবের তাড়নায় পুত্র-কন্যা বিক্রয় করিতে উদ্যত হয়। এই ভীষণ দুঃসময়ে প্রিয় ভগিনীগণ! আপনারা আলস্য ও বিলাসিতার মোহ-মদিরায় কর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইয়া থাকিবেন না। আপনারা নিজেদের কর্ত্তব্য রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম নিজ নিজ হস্তে সম্পাদন করুন, আর পাচকের পকান্ন খাইয়া স্বাস্থ্যহানি করিবেন না। যে টাকা মাসে মাসে পাচকের জন্য অপচয় করেন, নিজেরা রন্ধনাদি গৃহকার্য্য করিয়া সেই টাকা বাঁচাইয়া স্ত্রীশিক্ষা ও দরিদ্র নারায়ণের সেবায় ব্যয় করুন, ইহাতে ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণ লাভ করিতে পারিবেন।

বৈদিক সভ্যতার পরিচয়।

(স্বামী ভূমানন্দ)

যে দেশে আর্য্যগণ বসবাস করিতেন, সে দেশকে ঋগ্বেদে সপ্তসিন্ধু বলা হইয়াছে; সে দেশের পূর্ব্বে—সরস্বতী, উত্তরে—হিমালয়, পশ্চিমে—সিন্ধু, দক্ষিণে—রাজপুতানা। এই সীমানার মধ্যে যে স্থলভাগ, তাহার মধ্যে আবার পাঁচটি নদী আছে। যথা ঝিলাম, চিনাব, বিপাশা ইরাবতী (রাভী) ও শতদ্রু। ইহা ছাড়া সরস্বতী ও সিন্ধুত আছেই।

ঋগ্বেদে বেদপন্থী জাতিকে "আর্য্যবর্ণং" বলা হইয়াছে। এই আর্য্যবর্ণং একবচনে ব্যবহৃত হওয়ায় স্বীকার করিতেই হইবে, আর্য্যজাতির মধ্যে বংশগত কোন জাতিবিভাগ ছিল না। থাকিলে যেমন থাকিত, তেমনই ভাবে দ্বি বা বহুবচনের প্রয়োগও থাকিত।

ঋগ্বেদে আর্য্য, দস্যু বা তস্কর, অসুর ও দাস শব্দের প্রয়োগ আছে। তন্মধ্যে :—

(ক) আর্য্যগণ—বেদে বিশ্বাসবান থাকিয়া চাষআবাদ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিত, বিদ্যার চর্চ্চা করিত, যাগযজ্ঞ সম্পাদন করিত, বেদ-পাঠ, চিকিৎসাবিজ্ঞান জ্যোতিষ প্রভৃতি বিদ্যার অনুশীলন করিত।

(খ) দস্যু বা তস্কর—আর্য্যগণের বিপরীত কার্য্য করিত বলিয়া আর্য্যগণ উহাদিগকে দস্যু বলিয়া অভিহিত করিত।

(গ) যাহারা পাহাড়ে থাকিত, আর্য্যগণ তাহাদিগকে অসুর বলিত।

(ঘ) দাসজাতি—যে সকল দস্যু বা অনার্য্যগণ আর্য্যগণের অধীনে কাজকর্ম্ম করিত, তাহাদিগকে দাসশব্দে অভিহিত করা হইত।

আর্য্যগণ ব্রহ্মের উপাসনা সহ তেত্রিশটি দেবতার উদ্দেশে যাগযজ্ঞাদি করিত। বৈদিক ঋষিই প্রথমে বলিয়াছিলেন,—'একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি'; অর্থাৎ তিনি এক, কিন্তু জ্ঞানিগণ তাঁহাকে (বহুর মধ্যে উপলব্ধি করিয়া) বহুনামে অভিহিত করেন। দেবতাদিগের ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, দেবতার মধ্যে ব্রহ্মের অধিক প্রকাশ থাকিলেও আর্য্যগণ প্রথমে পূষা অর্থাৎ পোষণকর্ত্তা দেবতা বা সূর্য্যের ভক্ত ছিলেন। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার দূর হইয়া গেলে মানবের ত্রাস দূর হয়, সূর্য্যোদয়ে মানবের কর্ম্মপ্রচেষ্টা জাগ্রত হয়; এইজন্য পূষার নাম হইল, পথস্পতি। পরে আর্য্যগণ বরুণ-দেবতার ভক্ত হইলেন। কারণ চাষের জন্য জলের প্রয়োজন। তারপর ইন্দ্রদেবতার ভক্ত হইলেন। এই ইন্দ্রের পরিচয়ে বলা হইয়াছে,—আকাশে ইন্দ্রই—সূর্য্য, অন্তরীক্ষে ইন্দ্রই—বিদ্যুত এবং ভূতলে ইন্দ্রই—অগ্নি। সুতরাং ধার্য্য হইল,—ইন্দ্রকে পূজা করিলেই সকল দেবতার পূজা করা হইবে। দস্যু বা যাযাবরগণ চাষআবাদ করিত না, পশুপালন ব্যপদেশে যত্র তত্র বিচরণ করিত। খাদ্যের অভাব হইলে লুঠ করিয়া খাইত। এই দস্যুগণের দেবতা হইল জল-শূন্য মেঘ বা বৃত্র। বৃষ্টি হইলে পশু লইয়া দস্যুগণ বড়ই প্রমাদে পড়িত, এই জন্য তাহারা জলযুক্ত মেঘ বা দেববৃত্র অপেক্ষা জলশূন্য মেঘ বা বৃত্রের পক্ষপাতী ছিল।

ঋগ্বেদে অসুর কিংবা দাসগণের দেবতার নামের কোন উল্লেখ নাই।

বেদে দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম প্রচলিত না থাকায় বাধ্যতামূলক কোন কর্ম্মের ব্যবস্থা কাহারও জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল না। তবে ঋষিগণ যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহার ফলে সকাম কর্ম্মই আর্য্যগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাহার হেতু, এইভাবে লিখিত আছে :—

"অগ্রে তখন (ব্রহ্মের) মনে কাম বীজরূপে ছিল। কবিগণ প্রজ্ঞাদ্বারা হৃদয়ে অন্বেষণ করিয়া সতের বন্ধনকে অসতে আনিয়াছিলেন।(১)" "কে ইহা কাহাকে দিল? কাম কাহাকে দিল। কাম দাতা, কাম গ্রহীতা। কাম (কাম) সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিল। (২)"

সগুণ ব্রহ্মের কামনায় জগৎ প্রসূত, এইজন্য জগতও কামনাময়। মানব জগতের মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং সকাম কর্ম্ম তাহার স্বভাব।

কামনা হইতে যে জীব-জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই জীব ও জগতের পোষণের জন্য কেহ বাধ্যতামূলক কোন কর্ম্মের সৃষ্টি করেন নাই; যেহেতু মানুষের কাম্য বস্তু এক রকম নহে।

আর্য্যগণের মধ্যে যুবকযুবতী-বিবাহ প্রচলিত (৩) ও বিধবাবিবাহ নির্দ্দিষ্ট আছে (৪)। স্বয়ম্বরপ্রথায় বিবাহ হইতে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রকাশ রহিয়াছে। (৫) যজ্ঞে গাভী, বৃষ, অশ্ব, হরিণ, মেষ, মহিষ প্রভৃতির মাংসপ্রদান ও পরে আহারের উল্লেখ আছে। আর্য্যগণের কর্ম্মতালিকা দৃষ্টে জানা যাইবে যে, তাহারা সকলেই সকাম কর্ম্ম করিত। মৃতের জন্য অশৌচ বা তর্পণ প্রভৃতি দু' একটি ইঙ্গিত ঋগ্বেদে থাকিলেও তাহার ইতিকর্ত্তব্য-

(১) 'কামস্তদগ্রে' ইত্যাদি। ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত, ৪ ঋক্। (২) 'ক ইদম্ কস্মা অদাৎ' অথর্ব্ববেদ, তৃতীয় ২৯ ", ৭।

(৩) তমস্মেরা যুবতয়ো যুবানাং ইত্যাদি। ঋগ্বে ২য় ম, ৩৫ সূ, ৪ ঋক্।

(৪) ইমা নারীরবিধবাঃ ইত্যাদি। ঋগ্বেদ ১০ম, ১৮সূ, ৭ ঋক্।

(৫) কিয়তি যোষা মর্য্যতো বধূয়োঃ। ১০ম ম, ২৭ সূ ১২ ঋক্।

তাংশ সমগ্র বেদমধ্যে কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না। বেদমধ্যে অলৌকিক ক্ষমতার কথা বেদে উক্ত আছে, কিন্তু মানুষ (তিনি ঋষি বা স্তোত্রকার, যাহাই হউন না কেন), কদাপি আকাশে বিচরণ করে, মৃতের প্রাণদান করে, মন্ত্র দ্বারা প্রজাসৃষ্টি করে, এই রকম অসম্ভব কথা; কিম্বা দশ হাজার বৎসর কোন ঋষির পরমায়ু, দশ সহস্র মত্ত মাতঙ্গের মত কেহ বলশালী, এমন বর্ণনা ঋগ্বেদে নাই। বৈদিক সভ্যতার সকল বিষয় সাজাইয়া দেখাইতে গেলে আর্য্যজাতির ইতিহাস এই প্রকার দাঁড়াইবে :—

১। তৎকালীন মানুষ মাত্রেই সমজাতীয় বিবেচিত হইলেও আদর্শানুযায়ী নিজ নিজ কামনার পরিপূরণের জন্য কাজ করিতে যাইয়া জাতির সৃষ্টি হইল। ইহারই ফলে আর্য্য, দস্যু বা তস্কর, অসুর ও দাসজাতির নামকরণ হইল। পরে আর্য্যজাতির মধ্যে কর্ম্ম আশ্রয়ে শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল।

২। আর্য্যগণমধ্যে বাল্যাবস্থায় বিদ্যার্জ্জনে প্রবল অনুরাগ ছিল।

৩। স্বয়ম্বরপ্রথায় বিবাহ প্রচলিত ছিল। (১) এই প্রথা প্রচলিত থাকায় (ক) স্ত্রীস্বাধীনতা স্বীকৃত হইতেছে, ও (খ) তরুণী কন্যার বিবাহ প্রমাণিত হইতেছে। বিশেষতঃ 'চতুর্থীকর্ম্মের' ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় অঋতুমতী কন্যার যে বিবাহ সিদ্ধ ছিল না, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

বিবাহের পরে চতুর্থীকর্ম্ম নামে অবশ্যকরণীয় একটী অনুষ্ঠান ছিল। বিবাহের পর অন্ততঃ তিন দিন বর ও কন্যা ক্ষার ও লবণ-বর্জ্জিত আহার করিবে। ব্রহ্মচর্য্য পালন করতঃ রাত্রিতে উভয়ে একই গৃহে পৃথক শয্যায় শয়ন করিবে। চতুর্থ দিন চতুর্থীকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া সন্তানকামনায় বর স্ত্রীসম্ভোগ করিবে। [গৃহ্যসূত্র দ্রষ্টব্য]।

৪। বিধবাবিবাহ (২) ও নিয়োগপ্রথা (৩) সমাজে প্রচলিত ছিল।

৫। শ্রৌত কর্ম্ম বলিতে মাত্র তিনটি কর্ম্মের ব্যবস্থা বুঝাইত। যথা :—যাগ বা যজ্ঞ, হোম, দান। পশুযাগে গাভী, (৪) বৃষ, নীল গাই, বৎসতরী, মহিষ, (৫) অশ্ব, অজ, হরিণ, মেষ প্রভৃতির মাংস (৬) ব্যবহৃত হইত এবং আর্য্যগণ এই সকল পশুর মাংস ভোজন করিত (৭)।

(১) ঋগ্বেদ, ১০।২৭।১২ ঋক্।
(২) ঋগ্বেদ, ১০।১৮।৮, ৮ ঋক্।
(৩) ঋগ্বেদ, ১০।৪০।২, ঋক্।
(৪) ঋগ্বেদ, ২।৭।৫, ঋক্।
(৫) „ ৫।২৯।৮ „
(৬) „ ৬।১৬।৪৭ „
(৭) গোভিল ও আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র দ্রষ্টব্য।

৬। আর্য্যবর্গের মধ্যে বর্ণপার্থক্যে শ্রেণীবিভাগ ছিল। বংশগত শ্রেণীবিভাগ বা বংশগত কর্ম্মবিভাগ ছিল না। (৮) যথা :—

(ক) আদলী অর্থাৎ এক এক গ্রামের কাপড়িয়া।

(খ) ঋষি অর্থাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা ও বাগ্যজ্ঞের ব্যবস্থাদাতা।

(গ) হোতা অর্থাৎ যজ্ঞে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক স্তোত্রপাঠকারী।

ইতিপূর্ব্বে বহুশ্রেণীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে অতএব পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

এই ভাবে নানা প্রকার কার্য্যের জন্য আর্য্যগণ বহুশ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তখন "স্বধর্ম্ম" বলিতে ব্যক্তিগত কর্ম্মে স্বাভাবিক অনুরাগই বুঝাইত। বংশগত জাতিই তখন ছিল না, সুতরাং 'স্বধর্ম্ম' অর্থে কখন বংশগত জাতির নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম বুঝাইতে পারে না। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে মানুষ যে কর্ম্মে সমর্থ ছিল, তাহা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিত।

৭। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আহারাদি প্রচলিত ছিল এবং সকলেই সকলের কন্যা বিবাহ করিতে পারিত। যে সমাজে সকলে সকলের কন্যা বিবাহ করিতে না পারে, সে সমাজে কখন স্বয়ম্বরপ্রথা প্রচলিত থাকিতে পারে না।

৮। দস্যুগণও আর্য্য হইতে পারিত এবং সেই সকল দস্যুর সঙ্গে আর্য্যগণের আহার ও বিহারাদির প্রচলনও ছিল।

৯। ঋষি বা জ্ঞানীগণ নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন।

১০। জনসাধারণ ইচ্ছা ও সামর্থ্যানুসারে পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গকামনায় শ্রৌত কর্ম্ম (যাগ হোম ও দান) করিত।

১১। উপবীত-ধারণপ্রথা ছিল না।

১২। অগ্নিতে হবন ভিন্ন অন্য কোন প্রকার মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত ছিল না।

১৩। শ্রাদ্ধ, তর্পণ, বিবাহাদি দশবিধ সংস্কার, পঞ্চদেবতার পূজা, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি যে সকল স্মার্ত্তকর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ, তাহার প্রচলন ত দূরের কথা, ঐ সকল কর্ম্ম বৈদিক যুগে কেহ জানিত না।

১৪। প্রথমে 'গোত্র' বলিয়া কিছু ছিল না। নামের শেষের কেহ কোন উপপদ ব্যবহার করিত না।

(৮) বাজসনেয়সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে আছে,—"দেশধর্ম্ম-জাতিধর্ম্ম-কুলধর্ম্মান্ শ্রুত্যনুবাদ অব্রবীন্ মনুঃ।" অর্থাৎ বেদে দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম না থাকায়, উহা মনু বলিয়াছেন। এখানে 'মনু' বলিতে মনুসংহিতায় ভৃগুপ্রোক্ত বিধানই যুক্ত করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। বেদের বিরুদ্ধে যে কোন ব্যবস্থাই অপ্রামাণিক।

উপরে বৈদিক সভ্যতার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দেওয়া গেল। বর্ত্তমান সামাজিক প্রথা নিম্নরূপ হইয়া যে সকল পাঠক এতক্ষণ ধরিয়া বৈদিক সভ্যতার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, এইবার তাঁহারাই বর্ত্তমান প্রথার সহিত তুলনা করিয়া বলুন, বৈদিক সভ্যতার কোন নিদর্শন হিন্দুসমাজে আছে কি? বরং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রাহ্ম-সমাজের এবং পরোক্ষভাবে মুসলমানসমাজের সহিতই বৈদিক সভ্যতার সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন।

রাজা রামমোহন রায় (১)—নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহা বেদসম্মত।

(২) মূর্ত্তিপূজা বেদ সমর্থন করেন নাই বলিয়া রাজা রামমোহন রায়ও উহা সমর্থন করেন নাই।

(৩) সাবালিকা কন্যার বিবাহ, বিধবাবিবাহও বেদসম্মত।

(৪) অসবর্ণ কন্যার বিবাহ বেদসম্মত।

(৫) স্মার্ত্তদিগের তর্পণ প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বেদ-সম্মত নহে বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত।

(৬) বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম বেদের অনুশাসন নহে বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজ জাতি ও বংশগত কর্ম্ম স্বীকার করেন না। কিন্তু বেদে মোক্ষকামীর জন্য নির্গুণ ব্রহ্মের উপা-সনা ও সকামকর্ম্মীর জন্য যজ্ঞের ব্যবস্থা ছিল। বেদের এই অধিকারবাদ ব্রাহ্মসমাজ অস্বীকার করিয়াছেন, অর্থাৎ একই রকম উপাসনাপদ্ধতি সকলেরই জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। বেদের অধিকারবাদ অর্থে স্বধর্ম্ম বা নিজের স্বাভাবিক বৃত্তির বশে কাজ। ব্রাহ্মসমাজ এক উপাসনা ছাড়া স্বধর্ম্মবশে কাহাকেও ধর্ম্মাচরণে উপদেশ করেন নাই।

(৭) বেদে উপবীতধারণ * ও নামের শেষে উপপদ গ্রহণের ব্যবস্থা নাই। এক্ষেত্রে আদিসমাজ বেদের বিরুদ্ধে উপবীত ধারণ এবং সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ নামের শেষে উপপদ অর্থাৎ রায়, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

(৮) বৈদিক পশুযাগের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ব্রাহ্মসমাজ আহারের জন্য জাতিপাত বা ধর্ম্মনষ্ট স্বীকার করেন না।

এক কথায় বলিতে গেলে যে ব্রাহ্মগণ অধিকাংশ বেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সামাজিক বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা হইলেন ম্লেচ্ছভাবাপন্ন—আর যে হিন্দুগণ বেদপন্থী আর্য্যের বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, অথচ প্রায় কোন বৈদিক অনু-শাসনই মান্য করেন না; তাঁহারা হইলেন—সনাতনী।

এ পর্য্যন্ত ঋগ্বেদসংহিতার মন্ত্রসহায়ে দেখা গেল, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এবং জাতিগত কর্ম্ম বেদসম্মত নহে।

* ইহা ঠিক নহে, মানব-গৃহ্যসূত্র দেখুন। ভং সং

গো-বেচারী হিন্দু।

(কোঃ কর্ণেল শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
অবসরপ্রাপ্ত আই-এম্‌-এস্)

ইংরেজেরা আমাদিগকে একটী নূতন খেতাপ দিয়া-ছেন, "দি মাইল্ড হিন্দু" অর্থাৎ নিরীহ গো-বেচারী হিন্দু। এই প্রশংসাসূচক উপাধি, তাঁহারা নানাক্ষেত্রে নানাভাবে প্রয়োগ করেন; কেহ বা যথার্থই প্রশংসা করিতে ঐ কথা ব্যবহার করেন, আর কেহবা দয়া ও অনুকম্পা কিম্বা বিদ্রূপ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতে আমাদিগকে নিরীহ গো-বেচারী হিন্দু বলেন। এ উপাধিতে বিভূষিত হইতে আমরা মনে মনে একটু গৌরব মনে করি। আমাদের মনের ভাব ও দৈনিক জীবন, নিশ্চেষ্টতা এবং বৈরাগ্য-মূলক; আমরা বলি সকল জাতি হইতে আমাদের একটু বিশেষত্ব আছে; নিরীহ ও গো-বেচারী হওয়া আমাদের বিশেষত্ব।

বাস্তবিকই আমরা নিরীহ ও গো-বেচারী জাতি; বাঙ্গালার বাহিরে কোন হিন্দুজাতি সহিষ্ণুতাতে আমাদের তুল্য নহে। পশ্চিমদেশবাসী হিন্দুরা "ভাল মানুষ" বলিয়া আমাদিগকে সুখ্যাতি করেন; কথা দুইটী বাঙ্গালা ভাষা হইতে গৃহীত ও বাঙ্গালীদের জন্যই ব্যবহৃত হয়। বাস্তবিকই আমরা ধরিত্রীর ন্যায় সর্ব্বংসহা; আমরা সাত চড়ে রা-কাড়ি না; এমন অপমান নাই যাহা আমরা মুখ বুজিয়া সহ্য না করি, এমন লাঞ্ছনা অত্যাচার নির্য্যাতন নাই, যাহা আমরা নীরবে অম্লানবদনে, অক্ষুব্ধচিত্তে না ভোগ করি। আমাদিগকে কিল মারিতেছে, লাঠি মারিতেছে; জুতা মারিতেছে, ঘর ভাঙ্গিয়া জিনিষপত্র লুটপাট করিতেছে, আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিতেছে, চক্ষের সম্মুখে ঝি-বোয়ের ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছে, তাহাদিগকে কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে,—এ সব আমরা প্রতিদিন দেখি ও সহ্য করি। আত্মরক্ষা, প্রতিশোধ অথবা প্রতিকারের চিন্তা কখন মনে উদয় হয় না। আমাদের ললাটদেশে ভ্রূকুটি কখন দেখা দেয় না, আমাদের ভুজদ্বয়ের তরল পেশী কখন সঙ্কুচিত হয় না। আমরা বুক চাপড়াই, মাথা চাপড়াই, মাটীতে মাথা খুঁড়ি, কাঁদি আর্ত্তনাদ করি এবং সমস্তই ভাগ্যের উপর বরাত দিই; যাঁহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহারা বলেন—

ন দৈবস্যাতিভারোঽস্তি ন দৈবস্যাতিবর্ত্তনম্ *

দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই, দৈবকে অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ নহেন। আর যাঁহারা সংস্কৃত না জানেন, তাঁহারা বলেন—কি আমার দুর্ভাগ্য, কি আমার দুরদৃষ্ট!

এখন যেরূপ হিন্দুদের মনের অবস্থা, চিরদিন এরূপ ছিল না; এক সময়ে আমরা বলিতাম, স্ত্রীলোকের

* এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি মহাভারত হইতে গৃহীত।

তিনটী গুণ—মৃদুত্ব, তনুত্ব ও বিক্লবত্ব এবং ব্যায়ামশীলতা, কর্কশতা ও বীর্য্যবত্তা পুরুষের তিনটি গুণ। জনসাধারণের কথা ছাড়িয়া দিই, জয়দেব নিজ ভগবানকে "মৃদুচারী" করিয়াছেন। তাঁহার হস্তে প্রভঞ্জন হইয়াছেন "ধীর-সমীরে"। এখন আমরা সকলেই "ধীরে রজনী ধীরে"। এখন সাধু বলিলে শান্তশিষ্ট বুঝায়; এক সময়ে সাধুর লক্ষণ ছিল শূরতা। তখন হিন্দু বলিত—

ন হি শৌর্য্যাৎ পরং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।

ত্রৈলোক্যমধ্যে শৌর্য্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। তাঁহারা বলিতেন—

সর্ব্বং বলবতাং পথ্যং সর্ব্বং বলবতাং শুচিঃ।

বলবান্ ব্যক্তিদের সকলই হিতকর, সকলই শুচি এবং সকল ধর্ম্ম্য হইয়া থাকে। তখন বলিতাম, শ্রী বলের অনুগামী হইয়া থাকেন।

এক সময়ে হিন্দুরা গো-বেচারী হিন্দু ছিল না, বরঞ্চ ইহার বিপরীতই ছিল।

পুত্রঃ সখা বা ভ্রাতা বা, পিতা বা যদি বা গুরুঃ।
রিপুস্থানেষু বর্ত্তন্তে হন্তব্যা ভূতিমিচ্ছতা॥

পুত্র, সখা, ভ্রাতা, পিতা অথবা গুরু যদ্যপি শত্রুতা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নিহত করা শুভার্থী ব্যক্তির বিধেয়।

অধার্ম্মিকাস্তু হন্তব্যা ইতি মে ব্রতমাহিতম্।
অধার্ম্মিকদিগকে অবশ্য বিনাশ করিতে হইবে।
নাধর্ম্মো বিদ্যতে কশ্চিচ্ছত্রূন্ হত্বাঽততায়িনঃ।

নানা সদ্‌গুণান্বিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও আততায়ী হইলে অথবা অন্য কেহ প্রাণের হন্তা হইলে তাহাকে নিহত করা বিধেয়। পাপাচার ও অধার্ম্মিক ব্যক্তিকে বধ করিলে পাপ হয় না।

সর্ব্বোপায়ৈর্নিহন্তব্যাঃ শত্রবঃ শত্রুসূদন।
পুরা যুদ্ধাদ্বলাদ্বাপি প্রকুর্ব্বন্তি তবাহিতম্॥

যাহারা কৌশল বা বল দ্বারা সতত অহিতাচরণ করে, সেই শত্রুদিগকে সর্ব্বোপায়ে নিহত করা কর্ত্তব্য।

সে সময়ে হিন্দুরা নিরীহ গো-বেচারী ছিল না।
ন পুত্রঃ পিতরং জজ্ঞে পিতা বা পুত্রমৌরসম্।
ন ভ্রাতা ভ্রাতরং তত্র স্বস্রীয়ং ন চ মাতুলঃ॥

যুদ্ধস্থলে পুত্র পিতাকে, পিতা ঔরসপুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, ভাগীনেয় মাতুলকে, মাতুল ভাগীনেয়কে ও সখা সখাকে জানিতে পারিলেন না।

শ্রেয়স্তু মরণং যুদ্ধে, ন ভীতস্য পলায়নম্।

ভীত হইয়া পলায়ন করা অপেক্ষা বরং যুদ্ধে প্রাণ-পরিত্যাগই শ্রেয়। তখন যুদ্ধক্ষেত্রের উচিত—

ছিন্ধি ভিন্ধি প্রধাবস্থং পাতয়াভিসরেতি চ।

ছেদন কর; চূর্ণ কর, পশ্চাৎ ধাবমান হও, ভূমিতে পাতিত কর, স্বয়ং অগ্রসর হও। তখন আক্রমণকারী বিদেশীয় সৈনিকেরা যে পথে আসিবে, সেই পথের কূপের জল বিষমিশ্রিত করিয়া রাখিত। পরদেশ আক্রমণকালে অশ্বারোহী সৈন্যগণ দ্বারা শত্রুদিগের পক্ব শস্য-সকল নষ্ট করিতে হইত। "যে কোন উপায়েই হউক শত্রু-নাশ করিবে।"

জানন্নপি চ যঃ পাপং শক্তিমান্ ন নিযচ্ছতি।
ঈশঃ সন্ সোঽপি তেনৈব কর্ম্মণা সম্প্রযুজ্যতে॥

যে ব্যক্তি শক্তিমান্ ও পাপনিবারণক্ষম হইয়াও জানিয়া শুনিয়া পাপকর্ম্মের প্রতিশোধ না করে, সেই ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হয়।

তখন হিন্দুরা বলিত, প্রবঞ্চককে বধ করা স্বর্গ তুল্য।
হত্বা বৈ পুরুষো রাজন্ নিকর্ত্তারমরিন্দম।
অত্যায় নরকং গচ্ছেৎ স্বর্গেণাস্য স সম্মিতঃ॥

হে অরিন্দম নরনাথ! পুরুষ যদি প্রবঞ্চককে সদ্য বিনাশ করিয়া নরকেও গমন করে, তথাচ সেই নরক তাহার স্বর্গ সমান হয়।

যুদ্ধস্থলে হয় পরাজয়, না হয় মৃত্যু হইয়া থাকে; কিন্তু পরাজয় অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়।

পরাজয়ো বা মৃত্যুর্বা শ্রেয়ান্ মৃত্যুর্ন নির্জ্জয়ঃ।
বিজিতাশ্চারয়ো হ্যেতে শস্ত্রোৎসর্গাদ্ মৃতোপমাঃ॥

"জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া যে যুদ্ধ করে তাঁহাকে ইন্দ্রও ভয় করে।" "শত্রু যখন জানিতে পারে যে বৈরী জীবনের প্রতি আস্থাশূন্য হইয়া যুদ্ধার্থ উদ্যম প্রকাশ করিতেছে, গৃহস্থিত সর্পের ন্যায়, তাহা হইতে ভীত হয়।" এই ছিল তখনকার নীতি।

প্রাণভয়ের নিমিত্ত তখন হিন্দুরা বিখ্যাত ছিল না।

কালে হি সমনুপ্রাপ্তে ত্যক্তব্যং হ্যপি জীবিতম্।

উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে প্রিয়তম প্রাণকেও পরিত্যাগ করিতে হয়।

এখন শান্তশিষ্ট হওয়া হিন্দুর লক্ষণ। তখন একজন হিন্দুমাতা নিজ পুত্রকে বলিতেছেন, "অমর্ষ অক্ষমাযুক্ত হওয়া যথার্থ পুরুষের কার্য্য; যে ব্যক্তি নিয়ত ক্ষমাশীল ও অমর্ষশূন্য হইয়া থাকে, সে স্ত্রীও নহে, পুরুষও নহে; তাহাকে একটা নপুংসক বলিলেই হয়।" তিনি আরও নিজ পুত্রকে বলিতেছেন—

নির্ম্মন্যুশ্চাপ্যসংখ্যেয়ঃ পুরুষঃ ক্লীবসাধনঃ।
যাবজ্জীবং নিরাশোঽসি কল্যাণায় ধুরং বহ॥
উদ্ভাবয়স্ব বীর্য্যং বা তাং বা গচ্ছ ধ্রুবাং গতিম্॥

তোমার না আছে সংরম্ভ, না আছে পুরুষকার, তোমার আকার বুদ্ধি প্রবৃত্তি সকলই ক্লীবের ন্যায়; তোমাকে

পুরুষ বলিয়া গণনা করা অবিধেয়। তুমি হয় বীর্য্য প্রকাশ কর, না হয় নিত্য সিদ্ধ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হও।

এখন এমন একটা দিনও যায় না, যেদিন বাঙ্গালা দেশে অন্ততঃ একশত হিন্দু স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নষ্ট না হয়। এক সময় হিন্দুরা বলিত—

"যোষিতো হি সদা রক্ষ্যাঃ"

ভার্য্যাভিহর্ত্তা বৈরী যো যশ্চ রাজ্যাহরো রিপুঃ।

যাচমানোঽপি সংগ্রামে ন মোক্তব্যঃ কথঞ্চন॥

যে বৈরী ভার্য্যাপহারী ও রাজ্যহারী হয়, সে যাচ্ঞা করিলেও সমরে তাহাকে কোন প্রকারে বিমুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে।

এক সময়ে যুদ্ধ বলিয়া একটা প্রকৃত সামগ্রী ছিল। এখন আমরা যাত্রা ও থিয়েটারী যুদ্ধ দেখি। তখন বলিত—

জিত্বা বা পৃথিবীং ভুঙ্ক্ষ্ব হতো বা স্বর্গমাপ্নু হি।

তাঁহাকে জয় করিয়া সমুদয় পৃথিবী-রাজ্য ভোগ করুন, অথবা সমরে হত হইয়া স্বর্গ লাভ করুন।

যখন অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, যুদ্ধে তাঁহার পুত্র দুঃশাসন হত হইয়াছে; তখন পুত্রহীন বৃদ্ধ রাজা দূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

ন স পৃষ্ঠমবত্রাসাদ্রণে শৌর্য্যাৎ প্রদর্শয়েৎ।

তিনি তো পরমপদ প্রস্ত হইয়াও শূরত্ব প্রযুক্ত শত্রুভয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নাই?

হুত্বা শরীরং সংগ্রামে কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্।

বিজিত্য চ পরাণাজৌ যশঃ প্রাপ্স্যামি কেবলম্॥

আমি সমর-হুতাশনে শরীর আহুতি দিয়া সুদুষ্কর কর্ম্ম করিয়া এবং সংগ্রামে শত্রুবিজয়ী হইয়া সম্পূর্ণ যশোভাজন হইব।

ন হি শৈনেয় (?) দাশার্হা যুদ্ধে রক্ষন্তি জীবিতম্।

অযুদ্ধমনবস্থানং সংগ্রামে চ পলায়নম্॥

ভীরূণাং সম্মতো মার্গো নৈব দাশার্হ-সেবিতঃ॥

দাশার্হ-বংশীয়গণ যুদ্ধে জীবনের প্রতি স্নেহ করেন না; এবং রণে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ না করা, সম্মুখে অনবস্থান ও পলায়ন এই তিনটী যে ভীরুদিগের সম্মত, তাহা সেবন করেন না। তখন সংশপ্তক বলিয়া এক দল যোদ্ধা থাকিত, তাহারা এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত, যে, হয় তাহারা জয় করিবে, না হয়, রণক্ষেত্রে প্রাণদান করিবে। তখন হিন্দুরা বলিত—ন চ প্রাণসমং দানং।

যুদ্ধক্ষেত্রে মুমূর্ষু দুর্য্যোধনের শেষ কথা—

স্বস্তি প্রাপ্নুত ভদ্রং বঃ স্বর্গে নঃ সঙ্গমঃ পুনঃ।

আপনারা কল্যাণ লাভ করুন, স্বর্গে পুনরায় আমার সহিত আপনাদিগের মিলন হইবে।

এক সময় হিন্দুদিগের মধ্যে কীর্ত্তি বলিয়া একটা চীজ সামগ্রী ছিল।

সীদন্তাবপি কৌন্তেয় ন কীর্ত্তিরবসীদতি।

যিনি ধূর্ব্বহনে নিযুক্ত হইয়া যথাসময়ে সমাহিত ভার বহন করেন, তিনি স্বয়ং অবসন্ন হইলেও তাঁহার কীর্ত্তি অবসন্ন হয় না। আর এই কীর্ত্তি কেবল একমাত্র যুদ্ধ দ্বারা লভ্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

ইহ কীর্ত্তির্বিধাতব্যা সা চ যুদ্ধেন নান্যথা॥

ইহলোকে কীর্ত্তি স্থাপন করাই উচিত, তাহাও যুদ্ধ ব্যতীত হয় না।

এখানে একটু হাসির কথা বলি, আমরা যেমন নিজের মুখে কালি মাখাইয়া নিজে হাসিতে পারি ও অপরকে হাসাইতে পারি, সেইরূপ জগতে আর কোন জাতি পারে না; সেই কারণে "হাসির কথা" বলিলাম। অনেকে বলিবেন, যে যুদ্ধ কীর্ত্তি এ সকল ক্ষত্রিয়দের কথা, বাঙ্গালা দেশে দুই বর্ণ মাত্র আছে, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র; তাঁহাদের পক্ষে এ সব কথা খাটে না। এ কথাটা কতদূর সত্য তাহা বিচার করিবার এ স্থান নহে। যদিও ধরিয়া লই যে, বাঙ্গালার অধিকাংশ লোকই শূদ্রমধ্যে পরিগণিত, তাহা হইলেও যুদ্ধে নিহত হইলে চতুর্ব্বর্ণেরই স্বর্গপ্রাপ্তি হয়; ইহাই ছিল এক সময়ে এদেশের লোকের বিশ্বাস। যাহাই হউক, শাস্ত্রমতে বাঙ্গালীরা ক্ষত্রিয়; ইহারা ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়াদের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।* এস্থলে বলা উচিত, এই ক্ষত্রিয়-শব্দের অর্থ প্রচলিত ক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ হইতে কিয়দংশে বিভিন্ন। তথাপি বাঙ্গালীরা যে ক্ষত্রিয়-নাম গ্রহণ করিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহাভারত লিখিবার সময় অর্থাৎ চতুর্থ-পঞ্চম খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালীরা কাপুরুষত্বের নিমিত্ত বিখ্যাত ছিলেন না, বরঞ্চ তাহার বিপরীতই দেখিতে পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রকৃত ঘটনা কিনা, সে সম্বন্ধে এস্থলে বিচারের প্রয়োজন নাই। তবে কাল্পনিক হউক বা প্রকৃত হউক, সে যুদ্ধবর্ণনায় বাঙ্গালার রাজা ও বাঙ্গালীর নাম অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালীরা ভীরু বা কাপুরুষ হইলে ব্যাসদেব কখন তাহাদিগকে বীর সাজাইয়া রঙ্গমঞ্চে দেখাইতেন না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ে সমুদ্রসেন ছিলেন বাঙ্গালার রাজা। তিনি ও তাঁহার পুত্র চন্দ্রসেন বঙ্গসৈন্য লইয়া কুরুপক্ষে যুদ্ধ করেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ যাঁহার সহায়, সেই দুর্য্যোধন স্বয়ং বলিতেছেন—চেদিগণ ও বঙ্গগণ আমার আশ্রয় হইয়াছেন।

বঙ্গাঙ্গবিষয়াধ্যক্ষং সহস্রাক্ষসমং বলে।

বঙ্গ, অঙ্গরাজ যিনি বলে ইন্দ্রতুল্য। আমরা বঙ্গদেশীয় যোধগণের "বঙ্গবীরাঃ" কথা শুনি; "বঙ্গদেশীয় উৎকৃষ্ট যোধগণ" "গজারোহী বঙ্গসৈন্য" দেখিতে পাই। "বঙ্গানাং

* এ বিষয়ে প্রমাণ দিলে ভাল হইত। ভাঃ সং

অধীশ্বরো বলী” তিনি “রুদ্রসেবসন”। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বাঙ্গালীরা দুর্য্যোধনের পক্ষে ছিলেন। একদিন ভীমের পুত্র রাক্ষস ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করেন; “মগধাধী বঙ্গাধিপতি ঘটোৎকচের প্রেরিত শক্তি হইতে দুর্য্যোধনকে রক্ষা করেন।” কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আঠার দিন হয়; ষোলদিন যুদ্ধ করিয়া বঙ্গরাজ সমুদ্রসেন সাত্যকির হস্তে নিহত হন। পাণ্ডব পক্ষে সাত্যকি অর্জ্জুনতুল্য বীর ছিলেন।

বঙ্গরাজকে অন্যত্রও যুদ্ধ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার পুত্র চন্দ্রসেন সমুদ্র-দেশাধিপতি চিত্রসেনকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। বাঙ্গালীরা তখন ভারতবর্ষ মধ্যে একটা নগণ্য জাতি ছিল না, তাহার পরিচয় অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে যেস্থানে ভীম, অর্জ্জুন, কর্ণ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন সেখানেও আমরা বঙ্গরাজকে দেখিতে পাই, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞেও বঙ্গরাজ গিয়া উপস্থিত। এখন আমরা কাটাকে বানান বলি। আর সেই বাঙ্গালীরাই হইয়াছেন নিরীহ গো-বেচারী। এ-পরিবর্ত্তন কি কারণে ঘটিল, কবে হইতে হইল, এ প্রশ্ন চিন্তা করিতে মনে হয় এখন দু' একজনের ইচ্ছা হইতেছে।

প্রীতির অঞ্জলী।

(শ্রীরত্নমালা দেবী)

নব কুসুমিত কুঞ্জ কাননে
তোমারি সুবাস ছড়ায়ে আজ।
মন্দ মন্দ বহিছে সমীর
বিতরি গন্ধ ধরার মাঝ।
তোমারি জ্যোতি গগনে গগনে
গাইছে চন্দ্র তারকা সব।
তোমারি মহিমা গায় চরাচর
তোমারি বন্দনা পুলক-রব।
বিহগ গাহিছে বন্দনা গীতি
নদী গাহিতেছে তোমারি গান।
বিশ্ব গাইছে জয় জয় রবে
প্রণত হইয়া তোমারি নাম।
তোমারি পূজার প্রীতির অর্ঘ
চয়ন করিয়া আছি কে আমি।
প্রীতির অঞ্জলী দিয়েছি চরণে
নমি তব পদে জগৎস্বামী।

THE

BRAHMA SAMAJ

UNDER

DEVENDRANATH THAKUR.

CHAPTER II.

(3)

15. Maharshi Devendranath Thakur as reformer.

Devendranath Thakur, who makes a conspicuous figure throughout this period of the *Brahma Samaj* history, as its restorer to a permanent state of prosperity, the Great Reformer of Hinduism, the purifier of its tenets and doctrines, and the re-modeller of its rituals and liturgy, now claims our attention.

16. His ancestry traced from Bhatta-Narayan and the Religion of the family.

Devendranath Thakur is descended from Joyram Thakur, the progenitor of the opulent and illustrious family of the Thakurs of Calcutta. He is a linial descendant of Bhattanarayana, one of the five Brahmins who emigrated from Kanauj to Bengal, and the author of the well-known Sanskrit drama entitled the Veni-Sanhara, or Rape of the Lock. His family long continued votaries of the Vaishnava religion till Devendranath's father, the renowned Dwarkanath Thakur, and his uncles, Ramanath and Prasanna Kumar Thakurs, embraced Raja Ram Mohun Roy's religious opinions.

17. His birth and early education.

Devendranath Thakur was born in 1818, and as he was the first-born son of his opulent father, was brought up with all possible care and luxury. He had at an early age the benefit of private tution in Bengali, English, Sanskrit and Persian, and at a more advanced age a regular training

in Music, Gymnastics, and other polite accomplishments. Although his father was able to have placed him in the highest public schools in the metropolis, yet his intimacy with Ram Mohun Roy made him send his favourite boy to the Raja's school, in order to encourage and benefit that institution by his example. After finishing his ordinary course of education there, Devendra nath was removed to the Hindu College.

18. His religious beliefs in early life.

Being born in a land of idolaters, and belonging to a family of idolaters, young Devendra had naturally imbibed early in life the idolatry of his countrymen. The idolatrous practices of the *pujas* and *homas* were still in full force in his family, and our future reformer was brought up during his minority amidst pompous festivals and ceremonious observances. In the account of his life, given by himself in his reply to the address of Babu Keshub Chander Sen,* he tells us that, "Since my investiture with the sacred thread in early youth, when I saw the Salgram stone (a symbol of Vishnu) constantly worshipped at my house, when every year my enthusiasm was excited by the festival of the Durgah Puja, when every day on my way to school I used to prostrate myself before the Siddheswari of Thunthuniah (an image of Kali, the black goddess) with a prayer that I may acquit myself well at my daily examinations, it was then my belief that the Salagram stone, the ten-handed Durgah, and the two-handed Siddeswari, each was God himself."

19. Effect of Collegiate Education.

But these idolatrous beliefs were not of long continuance. His collegiate education served to call forth the powers of his budding mind, and develop the latent faculties and capacities of his youthful understanding.

It would be an interesting study to examine the effect a liberal English Education had upon the Hindu mind at this period. The impetus given by Mr. H. L. V. Derozio, the East Indian poet and metaphysician, and Teacher of the Hindu College, to free discussion on all subjects, whether social, moral, or religious, created a great convulsion among the more advanced students. Derozio was himself a free-thinker, though not an atheist, on his own confession, and he not only impressed upon his pupils the duty of thinking freely for themselves, but instructed them in the principles of Hume's Doctrine of Scepticism. For this conduct he was ultimately dismissed by the College authorities. †

20. Note against Sceptic Philosophy.

This scepticsm, says Dr. Beattie in his Essay on the "Nature and Immutability of Truth," in opposition to Hume, is totally subversive of science, morality and religion, both natural and revealed. "I desire to know," says the same philosopher in a postscript to his essay, "what good effects this scepticism is likely to produce. It humbles, we are told, our pride of understanding. Indeed! and are they to be considered as patterns of humility who set the wisdom of all former ages at naught, in defiance to the common sense of mankind, and say to the wisest and best men that ever did honor to our nation, ye are fools and hypocrites; we only are candid, honest and sagacious! Is this humility? Should I be humble were I to speak and act in this manner? Every man of sense will pronounce me lost to all shame, and apos-

* T. Patrika, No. 292.

† See Peary Chand Mitra's Life of David Hare for further particulars on this subject.

tate from truth and virtue, an enemy to human kind, and my own conscience would justify the censure."

(21. Raja Rammohun Ray and Rev. Duff on teaching sceptical philosophy.

This pernicious state of scepticism was more dreaded by Ram Mohun Roy than the deplorable idolatry against which he was contending. He is reported to have said to a young man, who told him that he had been a deist before, but was now an atheist, "At that rate you will soon be a beast." He used to rally Prasanna Kumar Thakur on account of his leaning to scepticism and call him the "country philosopher," as distinguished from the eminent sceptical philosophers of Europe. The Raja's friend, Dr. Duff, also has, in his article against the then prevailing system of collegiate instruction, severely censured the manner in which mental philosophy was taught to the natives of this country, which, while it helped to undermine their faith in their own religion, pointed out no way for supplying them with a better.)

22. Derozio's death and reaction among his pupils.

But the death of Mr. Derozio, and his death-bed recantation of the principles he professed in life made a strong impression on his pupils, who attended on the sad occasion. A reaction took place. Some ran to the lectures of Drs. Duff and Dealtry on Christianity; others to those of Adams and the *Brahma Samaj*; and the late lapse to infidelity was converted to religious inquiry and research.

23. Devendranath not—in direct touch with Derozio.

How sceptical soever the students of the Hindu College of that time were, the case with Devendranath was different. He was admitted into a lower class of the College than that in which Derozio taught, and the latter was dismissed only four months after his admission. He did not therefore catch the infection of scepticism. He was on the brink of the vortex, but was not plunged into it.

24. Turning point in Devendranath's Life.

An event happened during the College days of Devendranath, which produced in his mind a conviction of the infinity of God and the absurdity of idolatry. The *Tattwabodhini Patrika* gives the following, curious account of this occurrence, in Devendanath's own words: "In my early youth the infinite firmament studded with stars, gave me a knowledge of the Infinite Deity. One day in an auspicious hour, this infinite sky, decked with countless stars, expanded before my vision and shone conspicuous before my eye-sight. My whole mind, my whole soul, was at once attracted by the wonderful sight. At that moment my reason, developing itself, decided that this could not be the work of a finite hand. At that moment, the eyes of divine knowledge were opened. * * * In that auspicious hour when my eyes were opened towards the infinite sky, my reason, opening itself at the time, drove away my belief in idolatry in an instant. Then I came to know at once that the countless stars of the infinite sky were not the production of a finite hand. They were the infinite works of an infinite being.

25. Astronomy as help to God realisation.

This account of the fresh perception by Devendranath of the divine power, and the Infinity of the Divine essence by a contemplation of the heavenly bodies, is neither strange nor improbable, though, at the same time, it is likely to be read with doubts by many. When we consider the universal assent given by poets, sages, and philosophers to the power a contemplation

of the heavens lies in inspiring the noblest and sublimest conceptions which the mind of man is capable of forming of the Divine power and wisdom, we cannot wonder at Devendranath's conviction of the agency and superintendence of God caused by such contemplation. The combination of certain circumstances which produced these effects in him are however not always attended with similar results in an unthinking mind. We find the father of mankind in his inquiry into divine knowledge referred to the book of heaven as a guide to his yet unborn generations for a knowledge of God.

"To ask or search I blame thee not,
for heaven
Is the book of GOD, before thee set,
Wherein to read his wondrous works,
and learn,
His seasons, hours, or days, or months,
or years."*

The poet Young inculcates the same lesson throughout the last book of his Night Thoughts, from which we quote the following :—

"This prospect vast, what is it ?—
Weighed aright,
'Tis nature's system of divinity,
And every student of the night inspires.
'Tis elder scripture writ by God's
own hand :
Scripture authentic ! uncorrupt by man.
What read we here ?—Th' existence
of a God ?
Yes ; and of other beings, man above"

Again,

"Why from yon arch, that infinite of space,
With infinite of lucid orbs replete,
Which set the living firmament on fire,
At the first glance, in such an overwhelm
Of wonderful, on man's astonish'd sight,
Rushes Omnipotence ?—to curb our pride ;
Our reason rouse, and lead it to that power,
Whose love lets down these silver
chains of light ;
To draw up man's ambition to himself,
And bind our chaste affections to his throne.
Thus the three virtues, least alive on earth,
And welcom'd on heaven's coast with most
applause,
An humble, pure, and Heavenly-minded
heart,
Are here inspir'd :—and can'st thou gaze
too long ?"

The following couplet is much more conclusive than the preceding ones :—

"Devotion ! daughter of astronomy !
An undevout Astronomer is mad."

Among the ancients the same idea existed. We find Cicero pointing to Heaven in support of the great argument of divine existence in his book on religion "De Natura Deorum," from which we cite the following.

"Quid potest esse tam apertum, tamque perspicuum cum coelum suspeximus, coelestiaque contemplati sumus, quam esse aliquod numen praestantissimae mentis, quo haec regantur ? Quod qui dubitet haud sane in telligo, curnon idem, sol sit, an nullus sit dubitare possit. Quid enim est hoc illo evidentius ?" B. II. Cap. II.*

Many other instances from Cicero may be quoted in support of this theory.

Aristotle also says that the observation of the heavens leads us to the knowledge of a Divine Architect, although he maintains their existence from eternity. "When,"

---

* Paradise Lost—Book VIII.

* When we view the heavens, and contemplate the celestial bodies, can anything be more plain, or appear with clearer evidence, than that there is a deity of most consummate wisdom, by whom they are governed ? He that entertains any doubt of this, may, in my opinion, with equal reason, doubt of the existence of the sun. For wherein is the one more evident "* * *"

he says, "on night's overshadowing the earth, they beheld the firmament bespangled with stars; when they had been made acquainted with the still varying phases of the moon, both in its increase and wane; also with the rising and setting of all these heavenly bodies, and their stated and unvaried revolutions from all eternity, certainly, on such a prospect, they would be convinced that there were Gods, and that the great scenes before us were their work."

26. Devedranath—believer in Infinite God.

But to return to our account of Devendranath. We see that since his soul was impressed with the image of God as the receptacle of infinite perfections, filling endless space with his omnipresence, he became a believer in His infinity, exactly in the sense attached to it by Ram Mohun Roy, which the following extract from his Reminiscences preserved by Chunder Sekhar Dev will show: "'That the Supreme Being pervades eternal existence of every description, spiritual as well as material. He is in fine the supreme soul of the universe. As the human soul pervades our body from one end to the other, so does he pervade all space, and time, and every thing contained in it.'

27. His busy career and a set-back.

A busy career however, after his collegiate education was over, prevented the communication of these reflections to others, and the course of pleasure and dissipation pursued by him at this time prevented any permanent practical results from being produced,

28. His Grand-mother's death and its effect on him.

The death of his grand mother in Pous 1760 Saka (December 1838), served to revive his religious sentiments with redoubled force, and altered the course of his life from levity and indulgence to religious devotion and scepticism. Accompanying the dying lady to the riverside he watched over her last moments with all the tender concern of pious and filial affection. While thus engaged in the moonlight on the bank of the river, beside the dead body, he fell into a reverie, and a train of sublime thoughts "crowded on his mind, and the sudden vision of the Object without whom the soul finds no rest until it rests in Him, immersed it in heavenly bliss untasted before." He did not sleep that night, the rapture was so great. He is said to have been so transported with spiritual joy and delight that he considered wealth valueless in comparison with this rapture. Two or three days after he gave away all his furniture and articles of dress; it is needless to say they were of great value. He tried to retaste that rapture but could not succeed. This threw him into a state of melancholy equal in proportion to the magnitude of his former joy.

The state of his mind at this time is very well depicted in the words of the Brahmic song: "Tell, O! tell who shall bring Him back to me. Having lost the Support of Life, what shall I do with life? I know the pleasure which wealth and worldly possessions can give. I have no need of that pleasure and that wealth." He now began to search after the Beloved of his soul. "Ah! tell me who knows him. Where shall I go to have a sight of the life of life."*

---

* Brahmic Hyms.

ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বকথা।

হুগলী ব্রাহ্মসমাজ।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

শ্রীযুক্ত গোকুলকৃষ্ণ সিংহ নামক জনৈক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি হুগলি বালিতে বাস করিতেন। তিনি হুগলী স্মল কজ কোর্টের বেঞ্চ ক্লার্ক অর্থাৎ পেশকার ছিলেন। সে সময়ে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। হুগলী স্মল কজ কোর্টের জজ মাসের মধ্যে কয়েক দিন করিয়া শ্রীরামপুরে আসিয়া বিচারকার্য্য সমাধা করিতেন। গোকুল বাবুকেও তাঁহার সঙ্গে আসিতে হইত। তিনি স্বর্গগত দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন। একদিন দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে হুগলীতে যান। পঠদ্দশার পরে অনেক দিন অবধি গোকুল বাবুর সহিত দ্বারিক বাবুর আর সাক্ষাৎ হয় নাই। দ্বারিক-বাবু সন্ধান করিয়া গোকুল বাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া গোকুল বাবুর নাম ধরিয়া বাহিরের দরজা হইতে ডাকিতে লাগিলেন। গোকুলবাবু আসিয়া দেখিলেন স্বয়ং জজ দ্বারিক বাবু আসিয়া উপস্থিত। দ্বারিক বাবুকে যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়া তাঁহাকে উপরের ঘরে লইয়া গেলেন। গোকুল বাবু যতই "আপনি" "মহাশয়" প্রভৃতি বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন, ততই দ্বারিক বাবু তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন তুই আমাকে পঠদ্দশায় দ্বারিক বলিয়া ডাকতিস্, এখনও আমাকে তুই দ্বারিক বলিয়া একবার ডাক্, তাহা না হইলে আমি তোর বাটীতে জলগ্রহণ করিব না। গোকুল বাবু বড়ই সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলেন। পরে অগত্যা বাধ্য হইয়া পরস্পর পরস্পরকে নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ শিষ্টালাপের পর দ্বারিক বাবু কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এ কথা আমি গোকুল বাবুর মুখে শুনিয়াছি। গোকুল বাবু আমার পিতার সংস্পর্শে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে মিলিত হন এবং আমরণ আমার পিতাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। হুগলীতে গোকুল বাবুর বাসায় প্রতি বৎসর ব্রহ্মোৎসব হইত। তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং মহর্ষি পরিবারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল, আমার পিতা প্রতি বৎসর ঐ উৎসবে উপাসনাদি করিতেন। গোকুল বাবুর বাসার অনতিদূরে শ্রীযুক্ত লালবিহারী বড়াল ও পান্নালাল বড়ালের বাস-গৃহ ছিল। তাঁহারা গোকুল বাবু ও আমার পিতার সংস্পর্শে আসিয়া উভয় ভ্রাতাই ব্রাহ্মসমাজের টানের মধ্যে আসিয়া পড়েন। তাঁহাদের উভয় ভ্রাতারই পিতার আমল হইতে বড়বাজারে সোনারূপা বিক্রয়ের বিস্তৃত কারবার ছিল। তাঁহারা প্রতি বুধবার আদি-ব্রাহ্মসমাজে তরুণ বয়স হইতে আসিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের উভয় ভ্রাতারই সুকণ্ঠ ছিল। গোকুল বাবুও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা গোকুল বাবুর নিকটে প্রথমে ব্রহ্মসঙ্গীত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। আমার পিতৃদেব উহার পূর্ব্ব হইতে কালনা উৎসবে যাইতেন। লালবিহারি বাবু ও পান্নাবাবু ঐ উৎসবে আমার পিতার সহযাত্রী হইতেন এবং ব্রহ্মোৎসবে সঙ্গীত করিয়া ধন্য হইতেন। হুগলীতে যে উৎসব হইত; তাহাতে হুগলীর অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আবির্ভাব হইত। পরে গোকুল বাবু নিজের বস-বাসের জন্য একখানি সুন্দর অট্টালিকা তাঁহার বাসার সান্নিধ্যে নির্ম্মাণ করেন। ঐ গৃহপ্রবেশ ১৮০৯ শকে হয়। তদুপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। ঐ উৎসবে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি মাত্র ব্রহ্মসঙ্গীত রচিত হইয়াছিল। আমি একা উপাসনা করি এবং যে বক্তৃতা করি তাহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মুখে "কোথা আছ প্রভু এসেছি দীন হীন" ও আরও ৩।৪টি সঙ্গীত সেই প্রথম শ্রবণ করি। তাঁহার অতি মধুর কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া যান। গোকুল বাবু আহারের বিস্তৃত আয়োজন করিয়াছিলেন। পরে আমরা আহারান্তে বিদায় গ্রহণ করি।

পূর্ব্বকথিত লালবিহারি বাবু ও পান্না বাবু তাঁহাদের হুগলীর আবাস নিকেতনে ২।৩ বৎসর ধরিয়া উৎসব করেন। আমরাও যাই। মহর্ষি তখন হুগলীতে তাঁহার Retreat নামক আবাস নিকেতনে অবস্থান করিতেন। শ্রদ্ধেয় জ্যোতিবাবু একবার ঐ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত দুই ভ্রাতা মধ্যে মধ্যে মহর্ষির নিকট যাইয়া সঙ্গীত শুনাইয়া আসিতেন। উক্ত লালবিহারী বাবু, বিখ্যাত প্রসাদ দাস বড়ালের খুব নিকট আত্মীয় ছিলেন। প্রসাদদাস বাবু ও তাঁহার আত্মীয়গণ ঐ উৎসবে যোগ দিতেন। লালবিহারি বাবুদের বড়বাজা-রের কারবার উঠিয়া গেলেও তাঁহারা প্রায় প্রতি বুধবারের উপাসনায় যোগ দিতেন। বেহালা ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসবে আসিয়া অপরাহ্নে সঙ্গীতাদি করিতেন। লালবিহারী বাবু জীবিত নাই, পান্নালাল বাবু এখনও জীবিত। পান্নাবাবু বিখ্যাত ব্রজমোহন মল্লিকের জামাতা। বয়সের আধিক্যে তিনি পূর্ব্বের মত কর্ম্মঠ না হইলেও তিনি ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনুরাগী। হুগলী জজকোর্টের জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল পাঁচকড়ি বাবুর সহিত গোকুল বাবুর সৌহার্দ্দ্য ছিল। তাঁহারা উভয়েই

সঙ্গীত করিতেন। বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে তাঁহাদিগকে সঙ্গীত করিতে দেখিয়াছি। ঐ উৎসবে আমার পিতার সহিত তথাকার উৎসবে যাইতাম। ১৮২৯ শকের ২।৩ বৎসর পরে গোকুল বাবুর দেহান্ত হয়। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে ব্রাহ্ম উৎসাহী রসিকলাল দত্ত হুগলীর অদূরে ধর্ম্মপুর নামক স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। আমার পিতা প্রতি বৎসর তথাকার সাম্বৎসরিক উৎসবে যোগ দিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে উক্ত সমাজের আর কোন সাড়া পাওয়া যায় না। হুগলী অবস্থানকালীন মহর্ষিদেবের সহিত রসিক বাবুর বেশ পরিচয় হইয়াছিল।

৺প্রতিভাদেবী।

(শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়).

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র ৺হেমেন্দ্রনাথ-ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং স্বনামধন্য সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী ৯ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৪৩ শকের ২৩ পৌষ তারিখে মাঘোৎসবের পূর্ব্বেই পরলোক গমন করেন। মাঘোৎসব আসিলেই তাঁহার স্মৃতি মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। মাঘোৎসবে বালক বালিকারা যে সঙ্গীত করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন, প্রতিভা দেবীই তাহার পথ প্রদর্শক। মাঘোৎসবে সঙ্গীত করা যেমন প্রতিভা সুন্দরীর খ্যাতিপ্রতিপত্তির কারণ হইয়াছিল; সেইরূপ তাঁহার অযাচিত খ্যাতিপ্রতিপত্তির আরও একটী কারণ উপস্থিত হইয়াছিল, একটী বিদ্বজ্জনসমাগম, দ্বিতীয়টী "বালক" পত্রে প্রথম স্বরলিপিপ্রকাশ। অনেকেই জানেন যে যোড়াসাঁকোর ঠাকুরভবনে মধ্যে মধ্যে বিদ্বজ্জনসমাগম উপলক্ষে উৎসব হইত। বিদ্বজ্জনসমাগম নামেতেই ইহার উদ্দেশ্য বুঝা যাইতেছে—উদ্দেশ্য এই যে পাঁচজন বিদ্বান ব্যক্তি পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে না থাকিয়া এইরূপ সমাগমোৎসবে পরিচিত হইয়া পরস্পরের সহিত ভাবের আদান প্রদান করেন। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ইহার প্রধান উদ্যোগী ও অনুষ্ঠাতা। এই বিদ্বজ্জনসমাগম নানা কারণে উঠিয়া যাইবার পর এ পর্য্যন্ত তদ্রূপ আর কিছুই অনুষ্ঠিত হইল না, ইহা অতি দুঃখের বিষয়। যাই হোক, এই বিদ্বজ্জনসমাগমোৎসবে প্রধানত নানাপ্রকার যন্ত্রবাদ্য, গান, অভিনয় অনুষ্ঠিত হইত। বিদ্বজ্জনসমাগম উপলক্ষে প্রতিভাদেবী তাঁহার পিতৃদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রথম কয়েক বৎসর সঙ্গীত করিয়া এবং সেতার প্রভৃতি বাজাইয়া সমগ্র সভাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এই সভায় কেবল মাত্র বিদ্বান ব্যক্তিগণ এবং আনুষঙ্গিকভাবে পরিচিত বন্ধুগণ ও আত্মীয়স্বজন নিমন্ত্রিত হইতেন। সভাস্থ সকলেই সেই ১১।১২ বৎসরের সরস্বতীপ্রতিম বালিকার সঙ্গীত ও যন্ত্রবাদ্য শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা আজও আমরা মানসপটে দেখিতেছি। প্রতিভাসুন্দরী ইহার জন্য ৺রঘুনন্দন ঠাকুরের নিকট একটী সুবৃহৎ মূল্যবান তানপুরা এবং রাজা শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকট স্বপ্রণীত সঙ্গীতবিষয়ক অনেক পুস্তক পারিতোষিকরূপে প্রাপ্ত হয়েন।

ইহার কিছু পরে বিদ্বজ্জনসমাগম উপলক্ষে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত সুপ্রসিদ্ধ বিশুদ্ধনীতি গীতিনাট্য "বাল্মীকিপ্রতিভা" অভিনীত হয়। এই অভিনয় সম্বন্ধে "আর্য্যদর্শনের" সম্পাদক লিখিতেছেন—"গত ১৬ই ফাল্গুন (১২৮৭) শনিবার সন্ধ্যার পর কলিকাতা-নিবাসী মহর্ষিপ্রতিম শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের ভবনে "বিদ্বজ্জনসমাগম" উপলক্ষে বাল্মীকিপ্রতিভা নামে একখানি অভিনব নাট্যগীতির অভিনয় হইয়াছিল। সেই অভিনয়ে উক্ত মহোদয়ের অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "প্রতিভা" নাম্নী কন্যা প্রথমে বালিকা, পরে সরস্বতীমূর্ত্তিতে অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়াছিলেন।" ভদ্রপরিবারের পুত্রকন্যাগণ যে নানাবিধ যন্ত্রবাদ্য এবং বিশুদ্ধভাবের অভিনয়াদি দ্বারা গৃহকে উজ্জ্বল ও সুখী করিতে পারেন, তাহার দৃষ্টান্ত এই বিদ্বজ্জনসমাগমেই প্রথম প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাহার পরে আজকাল দেখি, নব্যহিন্দু ও ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের কন্যাগণ সেতার প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র শিখিতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়াছেন।

প্রতিভাসুন্দরীর খ্যাতিপ্রতিপত্তির আর একটী কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "বালক" পত্রে স্বরলিপি প্রকাশ। দূরদর্শী হেমেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন যে কেবল ব্যক্তিবিশেষ সঙ্গীত শিখিলে বা জনসাধারণকে দুএকদিন মাত্র শুনাইলে চিরস্থায়ী ও সুদূরব্যাপী উপকারের সম্ভাবনা নাই। সেই কারণেই তিনি প্রতিভাদেবীর দ্বারা বহুপূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্মসঙ্গীত ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীত প্রভৃতি ইউরোপীয় প্রণালীতে স্বরলিপিবদ্ধ করাইয়া লইতেছিলেন। এই কার্য্য অনেকদূর অগ্রসর হইবার পর হেমেন্দ্রনাথের দেহান্ত সংঘটিত হইয়াছিল। ইহার কিছু পরে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্রবধূ শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী "বালক" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পত্রে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত শূন্যমাত্রিক স্বরলিপি প্রণালীতে প্রতিভাসুন্দরী অনুরুদ্ধ হইয়া প্রথম একটী সঙ্গীত স্বরলিপি-সহ প্রকাশ করেন। সেই সময়ে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে

ভাল সঙ্গীত শিখিবার একটী আকাঙ্ক্ষার ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল এবং ঠিক উপযুক্ত সময়ে তিনি স্বরলিপিতে গান প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন মহিলা স্বরলিপিকে সহজবোধ্য করিয়া বিস্তৃতভাবে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হন নাই, স্বরলিপিকে সাধারণগম্য করিয়া তুলিতে পারেন নাই; প্রতিভাসুন্দরী স্বরলিপিকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগের মধ্যে সহজসাধ্যরূপে আনয়ন করিয়া বঙ্গদেশের যে কি উপকার করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। তিনি স্বাধীনভাবে এই স্বরলিপির প্রয়োগপথ আবিষ্কার করিতে যে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমরা বলিতে বাধ্য যে, এখন যতই কেন নূতন স্বরলিপি প্রকাশিত হউক না, সকলেরই সহজ প্রয়োগপথের প্রথম পথপ্রদর্শক হেমেন্দ্রনাথের কন্যা সেই প্রতিভাসুন্দরী। আজকাল স্বরলিপি দ্বারা সঙ্গীত প্রকাশের ফলে কত পুরমহিলা সঙ্গীতের দ্বারা হৃদয়ের উন্নতিসাধন করিতেছেন এবং কত যে ভবিষ্যতে করিবেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

শেষ বয়সে বিশেষভাবে দেশীয় সঙ্গীতের উন্নতি সাধনই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার কায়মনধন সকলই নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রথমে গৃহে "আনন্দ সভা" স্থাপন করিয়া পরিশেষে তাহারই কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার জন্য "সঙ্গীত সংঘ" সংস্থাপন করিলেন এবং সমগ্র বঙ্গদেশে দেশীয় সঙ্গীতের বহুল প্রচার কামনায় "আনন্দ সঙ্গীত" পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করেন।

তাঁহার মধুর চরিত্র তাঁহার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উভয় কুলকেই মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার পরলোকগমনে সম্ভ্রান্ত শিক্ষিতা মহিলাগণের মধ্যে যে স্থান শূন্য হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

ধর্ম্মে উদারতা।

(শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়)

মানুষের মন স্বতঃই অনুদার। অতি পুরাকাল হইতেই ইতিহাস এই কথার সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে। দুঃখের বিষয় যেখানে সকলের চেয়ে বেশী উদারতা থাকা উচিত, সেই ধর্ম্ম লইয়াই বেশী অনুদারতা দেখা যায়। যদিও প্রত্যেক ধর্ম্মের মহাপুরুষেরাই বিপরীত মতাবলম্বীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে উপদেশ দিয়াছেন, তথাপি দেখিতে পাওয়া যায় যে সাধারণ জনসমাজ সে নীতিকে জীবনে বরণ করিয়া লইতে পারেন নাই। একথা কেবল ভারতবর্ষের বা কোনও দেশবিশেষের প্রতিই আরোপ করা যায় না, পরন্তু সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় ঋষিরা অত্যন্ত উদার হইলেও তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত গ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের ধর্ম্মের দোহাই দিয়া শত শত নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও অমানুষিক অত্যাচার করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। নিজ মতাবলম্বীর অনেক অতি গর্হিত কার্য্যকেও সমর্থন করা ধার্ম্মিকতার অঙ্গ বলে আজও অনেক স্থলে গৃহীত হইতেছে। শৈব রাজা কর্ত্তৃক বৈষ্ণব রামানুজের ভ্রাতার চক্ষু উৎপাটন আজও অনেক শৈবের কাছে দোষণীয় বলে মনে হয় না। হজরত মহম্মদ, বুদ্ধদেব ও যীশুখৃষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষেরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রতিবাসীকে ভাইয়ের ন্যায় ভালবাসিতে এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রাণে যাহাতে কোনওরূপ আঘাত লাগে এরূপ কোনও কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, ত্যাগ ও সাধনার দ্বারা মানুষকে সত্য পথ দেখাইবার ও সেই পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতে আদেশ দিয়াছেন; কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা ঠিক তাহার উল্টাই দেখিতে পাই। কেনের দ্বারা তাহার ভ্রাতা এবেলের হত্যাকাণ্ডও এই মতবিরোধের কারণেই সংসাধিত হইয়াছিল। মহাত্মা মহম্মদের মতাবলম্বীরা সেই মহাপুরুষের দোহাই দিয়াই আজও কত হত্যাকাণ্ড ও অন্যায় আচরণ করিয়া যাইতেছে, তাহা সংবাদপত্র পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। সেদিনও তুর্কীস্থানে সহস্র সহস্র নিরস্ত্র আরমেনীয়দিগের যে হত্যা অবাধে চলিয়াছিল তাহার মূলেও এই অন্যধর্ম্মবেষিতা।

ধর্ম্মাশোকের সমসাময়িক ইতিহাস পাঠে আমরা এই জানিতে পারি যে বুদ্ধদেবের উপদেশই ছিল যে প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রতিই সম্মান ও সহানুভূতি দেখাইবে। অন্যের ধর্ম্মের প্রতি কোনওরূপ দোষারোপ না করিয়া নিজের ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে হইবে। অন্য মতের মধ্যেও সত্যকে দেখিতে পাইলে তাহা সসম্মানে গ্রহণ করিবে। যে পরধর্ম্মের নিন্দা করিয়া নিজ ধর্ম্মের সম্মান বর্দ্ধন করিবার চেষ্টা করে, সে উভয় মতকেই সমান আঘাত করে এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গই করে। এহেন অমূল্য উপদেশ যে ধর্ম্মের মূল ভিত্তি সেই ধর্ম্মাবলম্বীরাই যখন বৌদ্ধ কাপালিকদের ভীষণ অত্যাচারকে সমর্থন করিয়াছেন দেখিতে পাই, তখন মনপ্রাণ উদাস ও বিষণ্ণ হয়ে উঠে। যে খৃষ্ট প্রত্যেক মানুষকেই ভাই বলে গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছেন—যিনি তাঁহার একজন শিষ্যকেই তাঁহার শত্রুর গুপ্তচর জেনেও ক্ষমা

করেন নাই বরং সম্মান করে পা ধুইয়ে দিয়েছেন—অতি যন্ত্রণায় মৃত্যুর সম্মুখীন হ'য়েও ঈশ্বরের কাছে শত্রুদের ক্ষমা করবার জন্য প্রার্থনা করেছেন, তাঁহারই শিষ্যরা ভিন্ন মত পোষণ করা অপরাধে জীবন্ত নরনারীকে পুড়িয়ে মারতেও কুণ্ঠিত হন নাই। যে হিন্দু ধর্ম্মের একখা'ন প্রধান গ্রন্থ ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকই (ঈশাবাস্যমিদং জগৎ) জগতের প্রত্যেক দ্রব্যটিকে ঈশ্বর দ্বারা আবৃত বলে প্রকাশ করেছেন, সেই হিন্দুরাই অন্যধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি কি ঘৃণা পোষণ করিতেন 'যবন' প্রভৃতি নামেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম্মের নামে এখনও যে অত্যাচার যে হয় না তাহাও বলা যায় না। অবশ্য খাঁটি হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান বা মুসলমান, যাঁহারা প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রতিই শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি রাখেন, এরূপ কেহ নাই বলিলেও অসত্য বলাই হইবে; তবে তাহার সংখ্যা বড় অল্প। যুগে যুগে কতবার ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁরই নাম গ্রহণ করে পাপের পিচ্ছিল পথে চলতে আরম্ভ করেছে এবং প্রত্যেক বারই ঈশ্বর তাঁর একজন সাধু সন্তানের দ্বারা উপদেশ দিয়া মানবকে সেই পঙ্কিল পথ হ'তে উদ্ধার করে এনেছেন। এই সাধু সন্তানদিগকেই অবতার বা পয়গম্বর বলিয়া অভিহিত করা হয়।

আমরা যদি ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি সুচারুরূপে পাঠ করি, তবে লক্ষ্য করতে পারব যে যখনই ধর্ম্মের উদারতা মানব-মন থেকে অদৃশ্য হ'তে আরম্ভ হয়েছে, তখনই একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। একশত বৎসরের কিছু বেশী হ'ল এই বাঙ্গলা দেশেই একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি আমাদের সকলেরই বিশেষ সম্মানার্হ মহাত্মা রামমোহন রায়। যাঁরা সেই সময়কার ধর্ম্ম ও সমাজজীবনের ইতিহাস জানেন, তাঁরাই বলতে পারবেন যে তখন মানবহৃদয় অনুদারতা ও দ্বেষের দ্বারা কতদূর কলুষিত হয়ে উঠেছিল। কথায় কথায় লোককে একঘরে করা ও সামাজিক দণ্ড প্রদান করার ফলে লোকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। পরধর্ম্মাবলম্বীর কথা তো দূরে থাক একই ধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতিও কোনও সহানুভূতি দেখা যাইত না, বরং ঘৃণাই পরিলক্ষিত হইত। এক ব্রাহ্মণের মধ্যেই রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক প্রভৃতি নানাশ্রেণীর ব্যক্তিগণ পরস্পর পরস্পরের নিন্দা ও কুৎসা করিতে দ্বিধা করিতেন না। শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে মর্ম্মান্তিক দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল। ফলতঃ ছোট খাট বিবাদ বিসম্বাদ লাগিয়াই থাকিত। নিজের দল কিসে প্রাধান্য লাভ করিবে এবং পরদল কিরূপে নির্য্যাতিত হইবে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে করিতে মানুষ কেমন যে অনুদার ও হীন হইয়া পড়িতেছিল তাহাই নহে, অধিকন্তু সত্য পথকে হারাইয়া ফেলিতে ছিল এবং শান্তি ও শৃঙ্খলার শত্রু হইয়া দাঁড়াইতেছিল।

মহাত্মা রামমোহনের প্রাণে এই সব দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ হইল এবং তিনি কিসে মানুষ এই সব দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া শান্তি ও আনন্দ লাভ করিতে পারে তাহারই উপায়নির্দ্ধারণে ব্যস্ত হইলেন। তিনি নানাদেশ ঘুরিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জানিলেন যে প্রত্যেক ধর্ম্মের মূলেই একই সত্য নিহিত রহিয়াছে, কেবল বাহ্যিক কতকগুলি আচারব্যবহারে দেশ-কাল ও পাত্রানুসারে কিছু কিছু পার্থক্য আছে, এবং মানুষ এই মূল সত্যকে হারাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই কতকগুলি মিথ্যা দল বাঁধিয়া জগতের ও নিজের উন্নতির ও শান্তির অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে। মানুষ অমৃতের সন্তান হইয়াও মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইবে, ইহা হইতেই পারে না। তিনি নানারূপ অসহ্য কষ্ট আত্মীয়স্বজনের নিন্দা, সামাজিক অত্যাচার সহ্য করিয়াও ধর্ম্মের সত্য ও শাশ্বত রূপকে প্রকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সকল মহাপুরুষের ন্যায়ই তাঁহাকেও নানাবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে যে ঈশ্বর প্রেরণা দিতেছিলেন।

ভগবান তাঁহার পতাকাধারী করিয়া যাঁহাকে পাঠান, তাঁহাকে তাঁহার নাম প্রচারে যদি দুঃখ আসে তাহাও অম্লান বদনে সহ্য করিবার শক্তি দেন। সকল প্রকার প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিবার শক্তিই এই মহাপুরুষদের থাকে, আমরা বুদ্ধ, যীশু মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি অন্যান্য মহাত্মাদের জীবনে ইহার স্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই। মহাত্মা রামমোহনও এই সত্যের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি সাংসারিক সকল আশাই ছাড়িয়া এই মহান্ সত্যকে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, সমগ্র জগতই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত অতএব পরস্পরের প্রতি অন্যায় ভেদদৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য নয়। ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই পূর্ণ ও শাশ্বত হইতে পারে না। পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও সাধু ব্যবহারই ঈশ্বরের প্রিয় এবং ইহাই তাঁহার প্রকৃত পূজা। উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতাই প্রকৃত ধর্ম্ম। মানুষ যত দিন এই মহান্ ধর্ম্মকে কায়মনপ্রাণে বরণ করিয়া না লইবে ততদিন সত্যকে সে পাইবে না—জীবনও তার কাছে মরীচিকাবৎ নিরাশার স্থল হইবে।

আজ সময় এসেছে যখন প্রত্যেক মানুষের উচিত যে সে এই কল্যাণময় ধর্ম্ম, যাহা ভগবান এই মহাপুরুষের মুখ দিয়ে আমাদের কাছে বলেছেন, সর্ব্বান্তঃকরণে বরণ করে নিয়ে মনপ্রাণকে শীতল করে এবং এই জগতকে হিংসা, দ্বেষ ও অনুদারতার হাত হতে নিষ্কৃতি দিয়ে ভগবানের প্রিয় পূজাভূমি করে তুলে। আমরা যদি দুর্ব্বলতাবশতঃ পথ হারাতে বসি এবং আমরা শুভ ইচ্ছা নিয়ে তাঁর কাছে বল ভিক্ষা করে নিই, তবে তাঁহার পতাকার নীচে সদম্ভে এসে দাঁড়াতে পারিব এবং তাঁহার জয়যাত্রার পথিক হয়ে ধন্য হইব। তাঁর করুণা হতে আমরা কেহই বঞ্চিত নই, এবং তাঁহার কাছে কেহই হীন বা ঘৃণ্য নই, একথা নিজের অন্তরে ও সবার অন্তরে জাগরিত করে রাখিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজ এই উপদেশই সমগ্র জগতের কাছে প্রকাশ করিতে চান।

'প্রার্থনা আত্মার অন্ন'।

('Prayer is the food of soul')

(শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সেন—বালকের রচনা)

খুব তলাইয়া না ভাবিলে, কেবলমাত্র প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝা যায় না যে,—'প্রার্থনা আত্মার অন্ন'—এই উক্তিটী সর্ব্বাংশে সত্য কিনা? ইহা মনে করা স্বাভাবিক যে, 'প্রার্থনা আত্মার অন্ন', এ আবার কি? আত্মার আবার অন্ন কি রকম? ইত্যাদি কিন্তু যদি অন্তদৃষ্টির প্রয়োগ করা যায় তবে দেখা যায় বাস্তবিকই 'প্রার্থনা আত্মার অন্ন'।

শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আমরা আত্মার অস্তিত্ব ও জীবনীশক্তি অনুভব করি। সুতরাং এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, আত্মার স্থিতি শরীরের কোনও এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে নহে, পরন্তু উহা (দেহের) সকল স্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের মনও এই আত্মার অন্যতর ইন্দ্রিয়। জীবদেহের আত্মা পরমাত্মা হইতে নিঃসৃত এবং ইহা তাঁহাতেই বিলীন হইতে চায়। সুতরাং আমাদের স্ব স্ব অন্তরের মধ্যে যে ঈশ্বর বাস করিতেছেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—"নিজের অন্তরে দৃষ্টি নিয়োগ কর, তাহা হইলেই ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে। তাঁহাকে পাইতে বনে যাইতে হইবে না, কেবল নিজের আত্মার দিকে দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলেই দেখিবে তিনি কি ভাবে তোমার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন।" বাস্তবিকই তাই, মানবের মন অহর্নিশি বাহিরের টানে আসক্ত—উহা কখনও ভিতরের দিকে চায় না। মন যতক্ষণ বাহিরের দিকে আকৃষ্ট থাকে, ততক্ষণ আত্মার উন্নতি হয় না। মানুষ বাহিরের যা কুড়ায় বা যা কুড়াইতে ইচ্ছা করে, বুঝে উহাই তাহার সর্ব্বস্ব; কিন্তু ভ্রমেও কখনও মনে করে না যে, ভিতরে যাহা পাওয়া যায় তাহা বাহিরের চেয়ে কত বেশী।

মানুষ ভোগসুখেই গা ঢালিয়া দেয়, কারণ সে ইহাই মনে করে, যে শরীরের উন্নতি ও সুখভোগই জীবনের লক্ষ্য; কিন্তু তার বুঝে না যে আত্মার উন্নতিই মুখ্য লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথ—অবিরাম ভগবৎ উপাসনা।

কচ্ছপ যেমন মস্তকটী গুটাইয়া খোলসের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, তেমনি করিয়া যদি আমরা আমাদের চারিদিকে ছড়ান মনকে এক করিয়া সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথে অভিনিবিষ্ট রাখি, তবে নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং সাধনার বলে আমরা নিশ্চয়ই সেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিব। পরমাত্মাকে দেখিতে হইলে এইভাবে বাহিরের সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিতে হইবে। এই নূতন পথে যদি একবার অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারা যায়, তবে আর ইহা হইতে দূরে যাইবার শক্তি থাকে না, তখন কেবল ইহাকেই অনুসরণ করিতে ইচ্ছা হয়। অবশেষে দীর্ঘ সাধনার পর, দীর্ঘ প্রার্থনার পর সেই ঈপ্সিত বস্তু লাভ করা যায়; আত্মা তখন পরমাত্মাতে বিরাজ করে।

সাধকদের জীবনে দেখা গিয়াছে যে, তাঁহারা যখন মনকে বাহির হইতে গুটাইয়া লইয়া সেই অনন্তের প্রতি নিবিষ্ট রাখেন তখন তাঁহাদের দেহ নিষ্পন্দ বলিয়া বোধ হয়। কেন এই রকম হয়? না তখন তাঁহাদের আত্মা জীবদেহ ছাড়িয়া পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করে। আবার যখন তাঁহারা মনকে ছড়াইয়া দেন, তখন সেই প্রাণহীন দেহ আবার সজীব হইয়া উঠে। সাধনার প্রথম কয়েক দিবসে তাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ আহার করেন, কিন্তু পরে যতই অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই আহারের কথা ভুলিয়া যান। আত্মা ও শরীর দুইটী পৃথক বস্তু। আত্মা যখন দূরে কোন এক অজানা দেশে চলিয়া যায় তখন দেহ পড়িয়া থাকে, উহা অন্ন সংগ্রহে নিশ্চেষ্ট থাকে, যাহারা অজ্ঞ তাহারা শুধুই শরীরের আহার সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে, দেহকেই পরিপুষ্ট করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু আত্মার আহার যোগায় না; সেই আহার কি? না প্রার্থনামূলক উপাসনা। কিন্তু সাধকরা বুঝেন যে বাহিরের আহার শরীরকে দৃঢ় করে এবং প্রার্থনা আত্মাকে উন্নত করে। তাঁহারা বাহিরের আহার ভুলিয়া যান এইজন্য যে তাঁহারা ভিতরে, তাঁহাদের সাধনের মধ্যে কিছু আহার পান যাহা তাঁহাদিগকে বহিরের ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অতীত করিয়া দেয়। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে মানুষ বাহিরের আহার না পাইলেও ভিতরের আহারে, অর্থাৎ প্রার্থনা-সুধা-রসে তৃপ্ত থাকে। এই প্রার্থনার ক্ষুধানিবৃত্তিশক্তি আছে বলিয়াই তাঁহারা সাধনার পথ হইতে বিচলিত হন না, কারণ এই প্রার্থনাই তাঁহাদিগকে ক্ষুধার অতীত করিয়া তুলে। তবে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে যেমন বাহিরের আহার শরীরকে সবল করে, সেইরূপ প্রার্থনা আত্মাকে সবল করে, ইহাকে পরমাত্মাতে লীন হইবার পথ দেখাইয়া দেয়। যখন শরীর ও আত্মা এই দুইটী পৃথক বস্তু এবং যখন শরীরকে সুঠাম ও রক্ষা করিতে আহারের প্রয়োজন তখন আত্মারও উন্নতির জন্য একটা আহার আছে এবং সেই আহারই প্রার্থনা।

আদিব্রাহ্মসমাজ

৫৫, আপার চিৎপুর রোড কলিকাতা

একাধিকশততম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

করুণাময় ভগবানের প্রসাদে ব্রাহ্মসমাজ এক শতাব্দী অতিক্রম করিয়া নবশতাব্দীর প্রথম বৎসরে পদার্পণ করিল। এই প্রথম বৎসরের মাঘোৎসব নিম্নলিখিত তালিকা অনুসারে সম্পন্ন করা হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। ভক্তজনগণের ও বন্ধুবান্ধবের সমাগম ও সহৃদয়তার উপরেই উৎসবের সাফল্য নির্ভর করে। আপনি সপরিবারে ও সবান্ধবে যথাস্থানে ও যথাকালে উৎসবে যোগদান করিলে সুখী ও উপকৃত হইব। ইতি

আদিব্রাহ্মসমাজ
৫৫, আপার চিপুর রোড
যোড়াসাঁকো, কলিকাতা
২রা মাঘ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ
১০১, ব্রাহ্মসম্বৎ।

বিনীত
শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য বেদান্ততীর্থ।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

কার্য্যতালিকা।*

৪ঠা মাঘ—১৮ই জানুয়ারি রবিবার—প্রাতে ৮ ঘটিকায় নবশতাব্দীর প্রথম ব্রহ্মোৎসবের উদ্বোধন। আদিব্রাহ্মসমাজ ৫৫ আপার চিৎপুর রোড—আচার্য্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপাসনান্তে কীর্ত্তন।

৬ই মাঘ—২০শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার—সায়ংকালে ৬॥০ ঘটিকায় শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিরোভাব দিনে আদিব্রাহ্মসমাজ ৫৫, আপার চিৎপুর রোড, বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হইবে; আচার্য্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য বেদান্ততীর্থ।

৭ই মাঘ—২১শে জানুয়ারি, বুধবার—সায়ংকালে ৬॥০ ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজ ৫৫ আপার চিৎপুর রোড। ব্রহ্মোপাসনা হইবে; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ। বক্তা শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ সিংহ এম-এ, বি-এল ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ।

৮ই মাঘ—২২শে জানুয়ারী—বৃহস্পতিবার—সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজ—৫৫, আপার চিৎপুর রোড—ব্রহ্মোপাসনা হইবে আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

৯ই মাঘ—২৩শে জানুয়ারী—শুক্রবার—সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজ ৫৫, আপার চিৎপুর রোড—হিন্দীতে ব্রহ্মোপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অযোধ্যাপ্রসাদ।

১০ই মাঘ—২৪শে জানুয়ারী শনিবার—সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজ ৫৫, আপার চিৎপুর রোড, ইংরাজীতে উপাসনা—আচার্য্য সদানন্দ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস।

১১ই মাঘ,—রবিবার ২৫শে জানুয়ারি, প্রাতে—৮ ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজ ৫৫, আপার চিৎপুর রোড। বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন এবারকার মাঘোৎসবে যোগ দিতে পারিবেন না বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু তিনি আশা করেন যে ভক্তজনগণের আনুকূল্যে ও সহায়তায় নবশতাব্দীর প্রথম মাঘোৎসব সুসম্পন্ন হইবে।

---

* প্রয়োজনমত অনিবার্য্য পরিবর্ত্তন করা হইলে সংবাদপত্রের সাহায্যে তাহা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইবে।

তত্ত্ববোধিনী বিজ্ঞাপনী।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নবপ্রকাশিত
গ্রন্থ সম্বন্ধে অভিমত।

কলিকাতায় চলাফেরা (সেকালে আর একালে) —সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য ৸০ আনা। প্রাপ্তির ঠিকানা—আদিব্রাহ্মসমাজ ৫৫, অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। ইহাতে কলিকাতার চলাফেরা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এগুলি স্থানীয় ইতিবৃত্ত সংগ্রহের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিবে সন্দেহ নাই। বাইণ্ডিং এবং ছাপা বেশ ভাল।

সঞ্জীবনী সেবক—অগ্রহায়ণ ১৩৩১।

এক হিসাবে বইখানি চমৎকার। কলিকাতার যান বাহনের ইতিহাস বিবৃতিচ্ছলে লেখক কলিকাতার জন্ম ও পরিপুষ্টির একটি চমৎকার ইতিহাস এই গ্রন্থখানিতে দিয়াছেন। রচনাভঙ্গি কৌতূহলোদ্দীপক ও সরস। সম্মিলনী—১৬ই পৌষ, ১৩৩১।

যাঁহারা প্রাচীন কলিকাতার রাস্তাঘাট যানবাহনাদির অবস্থা সম্বন্ধে কৌতূহলী এই বইখানি তাঁহাদের মন্দ লাগিবে না। নবশক্তি—২রা মাঘ, ১৩৩১।

খেয়াল—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, তত্ত্বনিধি বিরচিত। কলিকাতা ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীমনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ছাপা কাগজ বাঁধাই উৎকৃষ্ট। মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

খেয়ালের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "এই খেয়ালটি শুধু খেয়াল মাত্র নহে। হ্যাম্‌লেট্ সম্বন্ধে যেমন সেক্সপীয়র বলিয়াছেন যে হ্যাম্‌লেটের পাগলামীর ভিতরেও একটা শৃঙ্খলা দেখা যাইত "There was a method his madness"—সেইরূপ খেয়ালের ভিতরেও একটা শৃঙ্খলা দেখা যাইবে। এই গ্রন্থে আমার তিনটি ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে এবং তাহার সঙ্গে ভ্রমণবৃত্তান্তের আকারে লিখিত একটী উপন্যাসের ভূমিকা আছে—এই চারিটী লইয়া আমার খেয়ালের জন্ম।"

ভূমিকায় গ্রন্থকার খেয়ালের জন্মবৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মাত্র প্রদান করিয়াছেন। আমরা আগ্রহসহকারে "খেয়াল"—পুস্তকখানি অভিনিবেশ পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। গ্রন্থকার সুপণ্ডিত এবং সাহিত্য সংসারে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সর্ব্বজন-সুপরিচিত। খেয়ালের ভাষা প্রাঞ্জল ও চিত্তগ্রাহী। ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সহিত গ্রন্থকারের পবিত্র জীবনের অনেকানেক বিচিত্র ঘটনাও এই খেয়ালে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুস্তকখানিতে জানিবার, বুঝিবার, ভাবিবার ও শিখিবার অনেক বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। খেয়াল কেবলমাত্র জীবনের বিচিত্র-ঘটনাপূর্ণ মামুলী ভ্রমণ বৃত্তান্ত নহে—সমাজের বংশের ও স্বজাতির বিশিষ্টতা না হারাইয়া মানব কি প্রকারে স্বভাবে চরিত্রে জ্ঞানে ও ভক্তিতে লোকসমাজে প্রকৃত মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে পারে, খেয়ালে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত ইংরাজী শিক্ষিত হইয়াও যেরূপ সত্যপরায়ণ সদাচারী তাহা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির আদর্শরূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

জন্মভূমি—বৈশাখ, ১৩৩৬।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

180 / 6. 3. 31.

মাঘোৎসব সংখ্যা।

৮৮তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে শ্রীরণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৮তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০১। সাল ১৩৩৭। শক ১৮৫২। খৃঃ ১৯৩১। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩১।

নবশতাব্দীর প্রথম ১১ই মাঘে।

তরুণ সম্প্রদায়কে আহ্বান।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

নব শতাব্দীর প্রথম মাঘোৎসব সমাগত। সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া আশা নিরাশার ভিতর দিয়া ব্রাহ্মসমাজের এক শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে, ব্রাহ্ম-সমাজ নবশতাব্দীতে পদার্পণ করিয়াছে। বিগত শতাব্দীতে ব্রাহ্মসমাজ দেশকে যাহা দান করিয়াছেন তাহার মূল্যের ইয়ত্তা করা যায় কিনা সন্দেহ; তথাপি সে দানের বিষয় চিন্তা করিয়া আমাদের আশা পূর্ণ হইতেছে না। নবশতাব্দীতে আমাদের দেশকে আরও অনেক বিষয় দান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, জ্ঞানে ও ধর্ম্মে, যশে ও মানে, ধনে ও গৌরবে, সকলের অগ্রগামী হইয়া আমাদের চলিতে হইবে, তবেই দেশে ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব সার্থক হইবে।

কেবল এদেশে নয় সমগ্র জগতে জাগরণের এক মহাবাণী সমুত্থিত হইতেছে। ব্রাহ্ম-সমাজকে যে নামেই অভিহিত কর না কেন, একমাত্র ব্রাহ্মসমাজই সেই বাণীকে সুপরিস্ফুট আকারপ্রদানে সক্ষম। সেই বাণীর মূলমন্ত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বিঘোষিত করিয়াছেন যে, ভগবানকে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রীতি করা এবং সকল হৃদয় দিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনরূপ উপাসনাই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল ও কল্যাণের মূল। জগতের মঙ্গল ও কল্যাণ কি উপায়ে সাধিত হইতে পারে তাহার সন্ধানে ও নিরাকরণে অনেক দেশরই নেতৃস্থানীয় মহাপুরুষগণ ব্যাপৃত আছেন। কিন্তু আমরা ইহা সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, যে কেহ যে কোন উপায় আবিষ্কার করুন না কেন, তাহাকে ব্রহ্মকেন্দ্রক না করিলে ভগবৎপ্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনকে উহার ভিত্তিরূপে স্থাপিত না করিলে তাহার শেষ মীমাংসা কিছুতেই সম্ভব নহে। ব্রাহ্মসমাজ সেই কারণে ব্রহ্মোপাসনাকে জগতের সর্ব্বত্র জনসাধারণের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

রুশিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি নবজাগ্রত দেশে তথাকার প্রচলিত ধর্ম্মসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হই-য়াছে দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে, সেই সেই দেশ হইতে প্রকৃতই ধর্ম্ম বুঝি বিতাড়িত হইয়াছে; এবং তাহারই ফলে সেই সেই দেশ কত না উন্নতি তড়িৎবেগে লাভ করিয়াছে। আজ কয়েক মাস হইল এই পুণ্যভূমি ভারতের নেতৃস্থানীয় দুই এক ব্যক্তি তাঁহাদের বক্তৃতায় এই মর্ম্মেরই কতকগুলি উক্তি করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহার সম্ভব-

পরতা বা অসম্ভবপরতা আলোচনা করিয়া দেখিলেন না। যে ব্রহ্মোপাসনা একভাবে হউক বা অন্যভাবে হউক মানবমাত্রেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, এবং সত্যধর্ম্ম যাহার অপর নামমাত্র, কোন সমাজের বা কোন রাষ্ট্রীয় শাসনের এমন ক্ষমতা নাই যে লেখনীর মুখে বা আদেশের বলে সেই প্রকৃত সত্যধর্ম্ম মানবহৃদয় হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারে। ইতিহাস এ বিষয়ে পদে পদে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যে ফরাসী বিপ্লব সকল দেশের বিপ্লবের আদর্শরূপে গৃহীত হইয়া থাকে, কোন্ ইতিহাসপাঠক না জানেন যে, সেই ফরাসীবিপ্লব সর্ব্বতোভাবে দেশ হইতে ধর্ম্ম নামই মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলেও দেশের উপর প্রচলিত ধর্ম্ম সজোরে আসিয়া চাপিয়া বসিল; তবে সেই ধর্ম্ম হইতে সাম্প্রদায়িকভাবের অনেক অনিষ্টকর বিষয়সকল ঝরিয়া গিয়া তাহাকে অনেকটা অসাম্প্রদায়িকতার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। সেইরূপ রুশিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশেও যে প্রচলিত ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িকতার শতবিধ পাশজালে আবদ্ধ করিয়া জনসাধারণের হৃদয়কে পরাধীনতার নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত করিয়া তুলিতেছিল, মুক্তির আকর ভগবান হইতে নিঃসৃত মানবাত্মা যে পরাধীনতা সহ্য করিতে সর্ব্বতোভাবে অক্ষম, সেই সকল দেশবাসী সেই পরাধীনতার আশ্রয়ভূমি প্রচলিত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মেরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; বর্ত্তমানে সেই সেই দেশের বিবরণ যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, সেই সেই দেশে অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম বিজয়-লাভের পথে চলিয়াছে।

ব্রাহ্মমাজের যে সকল নেতা অধ্যাত্মরাজ্যের উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সুমহান জাগরণবাণী জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রথম শ্রবণ করাইয়াছিলেন, বিগত শতাব্দীতে তাঁহাদিগের প্রায় সকলেরই তিরোভাব ঘটিয়াছে। সেই প্রকার বজ্রনির্ঘোষে ব্রাহ্মসমাজের বাণী শুনাইবার লোক আজও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। ব্রাহ্মসমাজে বর্ত্তমানে যাঁহারা রহিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা আসিবেন আমরা দেখিতে চাই যে, সেই নব্য সম্প্রদায় তাঁহাদের কথায় ও কাজে —আচারে ও ব্যবহারে, এক কথায় সমগ্র জীবনের ভিতর দিয়া এবং সমষ্টিভাবে ব্রাহ্মসমাজেরও ভিতর দিয়া ব্রাহ্মসমাজের বাণী জগতের সর্ব্বত্র পুনঃপ্রচারে প্রবৃত্ত হউন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয়পতাকা সর্ব্বত্র উত্তোলিত করিয়া সমগ্র জগতকে ব্রাহ্মধর্ম্মের পতাকাতলে আনয়ন করিয়া জগতে শান্তিস্থাপনে সহায়তা করুন।

আমরা খুব দৃঢ়তাসহকারে বলিতে পারি যে প্রকৃত সত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত জগতে সর্ব্বতোভাবে শান্তিস্থাপনের সম্ভাবনা আসিতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজে আধ্যাত্মিকতার অন্নে যাঁহারা পরিপুষ্ট, ব্রাহ্মসমাজের স্তন্যে যাঁহারা লালিতপালিত, জগতের শান্তিসহায়ক ব্রহ্মোপাসনা প্রচার কার্য্যে তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইতেই হইবে। স্বার্থ বলিদান করিয়া আত্মত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই কার্য্যে একাত্ম হইয়া যাইতে হইবে। তবেই তাঁহারা বিজয়লাভে সক্ষম হইবেন।

এই কার্য্যের জন্য কাহাকেও সংসার ত্যাগ করিতে হয় না। সংসারের ভিতর দিয়াই ব্রহ্মোপাসনা প্রচারকার্য্যের ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে। কেবল রোগী ও ভোগীর উপযুক্ত সংসারের প্রতি অতিমাত্রায় আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে। বিগত শতাব্দীতে ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণ দেশকে অনেক বিষয়ে অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রভৃতি সংস্থাপনের দ্বারা সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পথ উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন; একেশ্বরবাদসম্মত অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রচলনের দ্বারা ব্রহ্মোপাসক জনসাধারণকে গৃহ্যকর্ম্মেও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবার পথ সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়া গিয়াছেন। ঋষিকল্প রাজনারায়ণ বসু হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতা উপলক্ষে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের পথ সর্ব্বসমক্ষে সর্ব্বপ্রথম খুলিয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ভাই প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতি সবল প্রচারকদিগের সাহায্যে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের সুসংবাদ জগতের সর্ব্বত্র বিঘোষিত করিয়াছেন। অক্লান্তকর্ম্মা আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মক্ষেত্রকে বহুমুখী করিয়া তুলিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় সেই সকল বীর মহাপুরুষ-

দিগের জীবনকে আমাদের সম্মুখে আদর্শরূপে রক্ষা করিয়া আমাদিগের সকল কর্ম্মে, সংসারের ভিতরে ও বাহিরে ব্রাহ্মধর্ম্মকে জয়যুক্ত করিবার লক্ষ্য স্থির রাখিতে হইবে।

আমাদের সম্মুখে কর্ম্মক্ষেত্র সুবিস্তৃত পড়িয়া রহিয়াছে। যে ভেদাভেদ জন্য আমরা জাতি হিসাবে কিছুতেই মস্তক উত্তোলন করিতে সক্ষম হইতেছি না, এক সেই ভেদাভেদ দূর করিতে গেলেই অতুল পরিশ্রমে কার্য্যে লাগিতে হইবে। মিলনের মঙ্গলশঙ্খের তূর্যধ্বনিতে সমগ্র বিশ্ব মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। বিবাদ কলহের ঝনঝনা ভেদ করিয়াও মিলনের মহানিনাদ গর্জ্জিয়া উঠিয়া আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। এমন শুভ লগ্নে ভেদাভেদ রাখা আর চলে না—ভেদাভেদ দূর করিতে হইবেই এবং অন্যোন্য সাহচর্য্যে পরস্পরে হাত ধরাধরি করিয়া ব্রহ্মলাভের পথে যাত্রী হইতে হইবে। যে অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাবের কারণে আমাদের দেশ পরাধীনতার নিষ্পেষণে জীবন্মৃত অবস্থায় কালযাপন করিতে বাধ্য হইতেছে সেই অজ্ঞান দূর করিবার জন্য আমাদের সকলের একপ্রাণে ও একযোগে চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেইদিকেই আমাদের কর্ম্মের কূলকিনারা বা সীমা দেখিতে পাই না।

আমরা,—যাঁহারা ক্ষুদ্র শক্তি হইলেও বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের হাল ধরিয়া তাহাকে কোন প্রকারে স্বীয় গন্তব্যপথে লইয়া চলিয়াছি,—আমাদিগের জীবনের কার্য্য শেষ হইতে চলিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজকে সজীব রাখিতে চাহিলে তরুণসম্প্রদায়কে অগ্রসর হইতে হইবে এবং তাঁহাদের সবল মুষ্টিতে হাল ধরিয়া মূর্ত্তিপূজা, নাস্তিকতা প্রভৃতি শতবিধ আবর্ত্তের আক্রমণ এড়াইয়া ব্রাহ্মসমাজকে প্রকৃত সাধনের পথে ভগবানের প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনমূলক ব্রহ্মনিষ্ঠার পথে অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে। আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি আমাদের তরুণ বন্ধুগণ নবশতাব্দীতে তাঁহাদের সমবেত প্রযত্ন ও উদ্যোগে ব্রাহ্মধর্ম্মকে নিজ নিজ আত্মাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, নিজ নিজ সমাজে ও পরিবারে ছোট বড় সকল কার্য্যের ভিতর দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা প্রচার করুন, সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার ভিত্তি প্রতিজনের আত্মাতে প্রোথিত করুন এবং ব্রাহ্মসমাজকে নবতর বিজয়মন্ত্রে সঞ্জীবিত ও শক্তিমান করিয়া তুলুন।*

মাঘোৎসবের উদ্দেশ্য।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

আদিব্রাহ্মসমাজের প্রবেশদ্বার যেদিন জাতিনির্ব্বিশেষে সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে—সকলের জন্য সর্ব্বপ্রথম সমুদ্‌ঘাটিত হয়, সংখ্যা গণনা করিতে গেলে তাহা শতাধিক বর্ষের কথা। ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের দানের প্রকৃত মূল্য আজও আমরা তেমন করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, কিন্তু যতই দিন অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে, ততই বুঝিতেছি যে কি এক বিরাট পুরুষ আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিদ্বেষ তাঁহার প্রচার পন্থাকে অকারণ বন্ধুর করিয়া তোলে নাই। যিনি তাঁহার গ্রন্থাবলী নির্ব্বিষ্টচিত্তে পাঠ করিবেন, দেখিতে পাইবেন, তাঁহার যুক্তিতর্ক এদেশের শাস্ত্ররাজিরই উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার বিশ্বজনীন প্রেম, তাঁহাকে কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতে দেয় নাই। জনসমাজের ভিতরে বিদ্বেষের হুতাশন প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য তাঁহার আগমন হয় নাই। উপহাসের তীক্ষ্ণ বাণে কাহাকেও আঘাত করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হন নাই। শাস্ত্রের নিভৃত মর্ম্মের দিকে, প্রকৃত সত্যের দিকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্যই তাঁহার আবির্ভাব। বিরাট তাঁহার সাধনা, বিপুল তাঁহার অধ্যয়ন ছিল। তাই বহুভাষাবিৎ রাজা রামমোহন সমভাবে বেদ বেদান্ত কোরাণ বাইবেল অধ্যয়ন করিয়া প্রতি ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত সারসত্যের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য আহ্বান রাখিয়া গিয়াছেন। নিরবচ্ছিন্ন গতানুগতিকতার উপরে একান্ত নির্ভর করিলে, নব নব আলোক যাহা চারিদিকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার প্রতি উদাসীন থাকিলে, যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের অবমাননা হয়, এই কথাই তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

মনে রাখিতে হইবে, ভারতের প্রকৃত ইতিহাস বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন মতবাদের ইতিহাস। ঐ সমস্ত মত-

* ১০১ ব্রাহ্মসম্বৎ, ১১ই মাঘ রবিবার আদিব্রাহ্মসমাজে বিবৃত।

বাদের ঘাতপ্রতিঘাতে উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য একেশ্বরবাদ—অমূর্ত্ত ঈশ্বরের আরাধনা জনসাধারণের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছিল। উহার বহুশতাব্দী পরে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশের আধ্যাত্মিকক্ষেত্রে বিষম চঞ্চলতার সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল, জ্ঞানের সঙ্গে প্রচলিত ধর্ম্মের অসামঞ্জস্য চারিদিক হইতে পরিলক্ষিত হইতে আরম্ভ করিল, স্বধর্ম্মপ্রীতি-স্বজাতিপ্রেম যখন অবসাদ দশা প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হইল, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। অন্ধ বিশ্বাসের উপরে নহে, কিন্তু অকাট্য যুক্তিতর্কের উপরে অথচ শাস্ত্রমূলক বিশ্বজনীন সত্যের উপরে তিনি এই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পরে আবির্ভূত হইলেন—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তিনি আসিলেন রাজার অসমাপ্ত অনুষ্ঠানকে পূর্ণাবয়ব প্রদান করিবার জন্য, ব্রাহ্মধর্ম্মকে সাধনার উপযোগী করিবার জন্য, ইহাকে জ্ঞাননিষ্ঠ সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য করিবার জন্য, ব্রহ্ম-জ্ঞান ব্রহ্ম-ধ্যান ব্রহ্মামৃত রসপান—এই সুনিশ্চিত সোপানপরম্পরা সমুদ্‌ঘাটিত করিবার জন্য।

আজ ব্রহ্মের নামে—পবিত্র মাঘোৎসবে সকলে মিলিত হইয়াছে। স্মরণে রাখিও, এই সঙ্গীত ও বক্তৃতা ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বস্ব নহে। চিত্তের নির্ম্মলতা সাধনই আমাদের একমাত্র সাধন, সকল কালে—সকল স্থানে তাঁহার চিরজাগ্রত সত্তা অনুভব করাই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। হৃদয়মন্দিরে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতি কৃতজ্ঞতার বিমল অঞ্জলি প্রতিদিন তাঁহাকে নিবেদন করাই আমাদের চরম লক্ষ্য। প্রকৃত আধ্যাত্মিক সত্যের স্থান যে, সম্প্রদায়গত গণ্ডীর বহু উপরে তাহা উপলব্ধি করাই আমাদের চরম উদ্দেশ্য। ভক্তি-বৃত্তির সাময়িক উত্তেজনায় নয়, কিন্তু অন্তরের অচঞ্চল অনুরাগ তাঁহার প্রতি উদ্দীপ্ত করাই আমাদের একমাত্র পুরুষার্থ। অপরদিকে বিলাসবিরহিত বৈরাগ্যের ভাব, স্বদেশপ্রীতির ভাব, সমগ্র মানবের ভিতরে অখণ্ড ভ্রাতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের এই পবিত্রতম ধর্ম্মের অন্যতম দিক।

বাহিরের অগণ্য অসংখ্য কর্ত্তব্যে আমরা পরিবৃত। কিন্তু তাই বলিয়া অন্তর্লোকের প্রতি উদাসীন হইলে চলিবে না। প্রতি মানবের পরিপূর্ণ সার্থকতা তাঁহার নাম গানে, তাঁহার মহিমা প্রচারে, তাঁহারই আদেশ-বহনে এবং সত্যের সুবিমল আলোক লাভ করিবার জন্য আপনাকে সম্প্রদায়ের উপরে তুলিয়া ধরায়। আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে যে এই অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্যই রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব, এবং এই আদিব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা।

এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ও এই একেশ্বরবাদের ঘোষণার দিন অবলম্বনে, এই পবিত্র মুহূর্ত্তে আজ আমাদের এই পবিত্র উৎসব আয়োজন। আধ্যাত্মিক রাজ্যে রাজার এই যে বিরাট দান, তাহার প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আজ হৃদয়তন্ত্রীকে একবার ঝঙ্কৃত করিয়া তোল। "মধ্যে বামনমাসীনং" সেই যে চিরজাগ্রত দেবতা যিনি সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান, তাঁহাকে অন্তরের ভিতরে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি কর, এবং গানে ও আনন্দ ধ্বনিতে এই উৎসবমন্দিরকে মুখরিত করিয়া তোল। তাঁহার অমোঘ বরাভয় লাভ করিবার জন্য তাঁহার দক্ষিণ মুখের দিকে অন্তর্দৃষ্টি স্থাপন কর এবং নিজ নিজ জীবনকে আজ উৎসবময় করিয়া তোল। সমগ্র ভারতের মধ্যে নিরাকার ব্রহ্মপূজার এই আদি মন্দিরে আসিয়াছ, এই অনুভূতিতে অন্তর্দেশ আজ আলোড়িত হইয়া উঠুক; আজ হৃদয়থালভরা ভক্তিপুষ্পহার সেই চিরন্তন পরব্রহ্মের চরণে অঞ্জলি দিয়া জীবনকে মধুময় করিয়া তোল। তাঁহার মঙ্গল আশীর্ব্বাদের কোমল স্পর্শ আজ আমাদের সকলের মস্তকের উপরে অবতীর্ণ হউক যাহাতে আমরা চির কৃত-কৃতার্থতা লাভ করিয়া ধন্য হই; এবং আমাদের এই উৎসব সার্থক হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

উৎসবগীতি

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

রাগিণী আশা ভৈরবী—ঠুংরী।

তোমা সম প্রেমময় কে শুভদায়ী
আজি নব নব ভাবে ভাই বন্ধু মিলে সবে
বন্দনা গীত তব গায়।
আনন্দ সঙ্গীত হইয়া ধ্বনিত গগন প্রাঙ্গন ছায়।
তারি সাথে একতানে গাহিবারে শত গানে
প্রাণ মন সদা হেন চায়।
হৃদয়ে হৃদয়ে আজি নাম তব উঠে বাজি
সুখ বায়ু বহে সব ঠাঁয়
শান্তি সাগর তুমি আনন্দ আকর ভূমি
মন সদা তোমা পানে ধায়।
তোমারে না পাই যদি আর নাহি কোন গতি
মুক্তির নাহিক উপায়।
তোমারি চরণ দাও লইনু শরণ তায়
রেখো প্রভু রেখো তব পায়॥
আশীষ দাও শিরে ঘরে যেন যাই ফিরে
তোমারি হেরি মুখ ভায়
সংসার মাঝে, ছোট বড় কাজে
মোদের হইও সহায়॥

মাঘোৎসবের দান।*

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ)

স্মরণাতীত কাল হইতে আর্য্যঋষিগণ রবির উত্তরায়ণ-সংক্রমণের প্রারম্ভকাল মাঘমাসকে পুণ্যময় ও পবিত্র বলিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। সেই সময় হইতে আর্য্যজাতি মাঘমাসে বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান বিধান করিয়া মাঘের পবিত্র স্মৃতি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছেন।

এই মাঘ মাসের পুণ্য দিনে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রাজা রামমোহনের পুণ্য প্রতিষ্ঠান ব্রাহ্মসমাজও প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই ব্রাহ্মসমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠার পুণ্য-প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া শতবর্ষ ধরিয়া প্রত্যেক মাঘ মাসে উৎসবার্থ ব্রহ্মোপাসকগণ এই পুণ্য মন্দিরে সমাগত হইয়া উৎসবানন্দের বিমল পীযূষধারা পান করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। আজ নব শতাব্দীর নবীন মাঘোৎসবের পুণ্য দিন। বিশ্ব নিয়ন্তার অপরিমেয় করুণার ধারা বক্ষে লইয়া এই নব শতাব্দীর মাঘোৎসবের প্রথম প্রভাত ব্রহ্মোপাসকগণকে অভিনন্দিত করিতেছে; আজ সেই পরম পিতার কল্যাণবাণী ঘোষণা করিয়া মাঘোৎসবের প্রভাত তপন সমুদিত হইয়া বিশ্ববাসী নরনারীকে জাগাইয়া তুলিতেছে। আজ মাঘোৎসবের আনন্দ ভক্তমণ্ডলীর অন্তরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

এই মাঘোৎসবে আমরা এমন কি পাইতেছি, যাহা সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে, আশা-নিরাশার ভিতরে সফলতা-বিফলতার সুখ-দুঃখ ও সাহচর্য্যে হাসি-কান্নার ভিতর দিয়া আমাদিগকে আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের পথে লইয়া চলিবে। বাস্তবিক যদি আমরা সেরূপ কোন বস্তু প্রাণে প্রাণে হৃদয়ে হৃদয়ে উপলব্ধি করি, তবেই বুঝিব আমাদের এ মাঘোৎসব সার্থক হইবে। আমাদের এই উৎসবের মধ্যে যদি সেরূপ কিছু না পাইয়া থাকি, তবে বুঝিব, এ মাঘোৎসব সফল হয় নাই—"মিথ্যা এই সহকারশাখা, মিথ্যা শুধু মঙ্গল-ঘট সংস্থাপন!"

ধর্ম্মজীবনে স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক, কুসংস্কারের মোহ-বন্ধন-ছেদনকারী মহামনীষী বুদ্ধ বলিয়াছেন, "মানবের চিন্তাধারা বিনষ্ট হয় না, সূক্ষ্মভাবে উহা অবস্থান করে; পরে যখন অন্য কোন ব্যক্তি সদৃশ চিন্তায় নিমগ্ন হয়, তখন পূর্ব্ব ব্যক্তির চিন্তাতরঙ্গ পরবর্ত্তী ব্যক্তির হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করে, পূর্ব্বাশার উদয়াচলে তপনকিরণের মত নৈরাশ্য-তিমির দূর করিয়া আশার আলোক রেখা ফুটাইয়া তুলে এবং অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করে।"

আমাদেরও এই বর্ত্তমান নবশতাব্দীর মাঘোৎসবের পূর্ব্বে বিগত শতাব্দীতে যে সমস্ত ধর্ম্মপ্রাণ ব্রহ্মোপাসক শুদ্ধ-নির্ম্মলচিত্তে পরব্রহ্মের চরণে যে চিন্তাধারা প্রেরণ করিয়াছিলেন—তাঁহাদের সেই চিন্তাধারা প্রবল সংহত-শক্তির আকারে আমাদের অন্তরে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবহমান হইতেছে। বাস্তবিক যখন ভাবি, এই মাঘোৎসবে—শত বর্ষ ধরিয়া রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া কত অজ্ঞাত ও অখ্যাতনামা ব্রহ্মোপাসক পরব্রহ্মের চরণে আত্মনিবেদন করিয়াছেন, হৃদয়ের জ্বালাযন্ত্রণা দূর করিয়া শান্তির অমিয়-নির্ঝরপ্রবাহে স্নান করিয়া স্নিগ্ধ হইয়াছেন, সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় চন্দন-শীতল হইয়াছে; তখন সত্য সত্যই মনে হয়, ঐ সমস্ত ব্রহ্মোপাসকগণের অশরীরিবাণী যেন আমার প্রাণের তারে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে, যেমন দূরদূরান্তর স্থিত স্বর-লহরী বেতার-যন্ত্রে বাজিয়া উঠে। তখন সত্য সত্যই উৎসব আনন্দের উজ্জ্বলতায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে। এমনি করিয়া দেশে দেশে কালে কালে যে সমস্ত ব্রহ্মোপাসক ধরণীবক্ষ অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, এখনো করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন,—তাঁহাদের সকলের মধ্যে অতীন্দ্রিয় জগতের বাণীরূপে চিন্তাতরঙ্গ একটি যোগসূত্র সংস্থাপন করে—মাঘোৎসবের মধ্য দিয়া আমরা উপলব্ধি করিতে পারি—আমরা সকলেই ব্রহ্মোপাসক—সকলেই এক পরম পিতার সন্তান—অমৃতের পুত্র—এই শিক্ষাই মাঘোৎসবের প্রথম ও প্রধান দান।

মাঘোৎসব বর্ত্তমানেও আমাদের পরস্পরের মধ্যে মিলনের সংযোগরেখা টানিয়া দিয়াছে। সংসারের কাজকর্ম্মে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সমাজ-গণ্ডীর অভ্যন্তরে আমরা কর্ত্তব্যানুরোধে বাস করিলেও, যখন মাঘোৎসবের কথা মনে পড়ে, অমনি সকলে ছুটিয়া অন্ততঃ কয়েকটি দিনের জন্যও, এই পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে উপনীত হইবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রাণে জাগিয়া উঠে, পরস্পরের সহায়তায়, পরস্পরের সাহচর্য্যে, মিলনানন্দে, যিনি সমস্ত মিলনের মূলীভূত উপাদান, সকল কারণের কারণ ও বিভু, সেই পরব্রহ্মের উপাসনার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হই, অন্য সময়ে যাহা অসম্ভব,—শারীরিক মানসিক প্রাকৃতিক সমুদয় বাধা বিঘ্ন অপসারিত করিয়া মাঘোৎসবে আমরা তাহা সম্ভব করিয়া তুলি—পরস্পরের মিলনে একীভূত প্রাণে পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত হই—ভুলিয়া যাই এ সময় হিসাবের, মান-অপমান, উচ্চনীচ ভেদাভেদ—আর্থিক ও সামাজিক মান মর্য্যাদা—এই মাঘোৎসবে আমরা সকলে সমান—মানবের জন্মগত সাম্যভাবে অনু-

* মাঘোৎসব উপলক্ষে আদিব্রাহ্মসমাজগৃহে বিবৃত।

প্রাণিত হইয়া সমবেত উপাসনার প্রতিষ্ঠাই মাঘোৎসবের দ্বিতীয় দান।

পরিশেষে মাঘোৎসব আমাদিগকে আরও একটি মহত্তর শিক্ষা প্রদান করে;—সাধারণতঃ আমরা মানুষ; মানুষের জন্মগত দুর্ব্বলতা আমাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। সেই দুর্ব্বলতার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা কূটনীতি পরিচালনে অভ্যস্ত; সাংসারিক কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য আমরা অনেক সময় চাণক্যনীতি অনুসরণ করিয়া কুটিলতার আশ্রয় গ্রহণ করি, সত্যকে মিথ্যার আবরণে প্রচ্ছন্ন করিতে সচেষ্ট হই—মাঘোৎসবেই আমরা দেখি, যে এখানে কূটনীতি চলিবে না—পবিত্র মন্দিরে পরব্রহ্মের উপাসনায় আমরা সমবেত, তাঁহার নিকট যে আমাদের কিছুই গোপন রাখা চলিবে না, তিনি যে অন্তর্য্যামী, বিভু; কেমন করিয়া সেই পরম পিতার নিত্যজাগ্রত শাশ্বত নয়নের সম্মুখে আমরা মিথ্যাচারে সত্যের দীপ্ত মূর্ত্তি প্রচ্ছন্ন করিব? এখানে যে মিথ্যাচার সহজেই ধরা পড়িবে! এখানে আমরা বাহিক কূটনীতি পরিহার করিয়া অন্তরে নিত্য সত্যের উৎসধারা উৎসারিত করিয়া দিয়া পরব্রহ্মের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া বলি—প্রভু অকৃতি আমি হলেও আমি তোমারি শরণাপন্ন, তুমি আমাকে সত্যপথে হাত ধরিয়া লইয়া চল। যখনই আমরা সাংসারিক জীবনে মিথ্যাচার-কুটিলতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হই, অমনি মাঘোৎসবের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আমাদিগকে মিথ্যাচার হইতে নিবৃত্ত করে; আমাদিগকে জলদমন্দ্রে সাবধান করে—মাঘোৎসবে পরম পিতার চরণে কি নিবেদন করিয়াছিলে—আর এখন কি করিতে যাইতেছ? এইভাবে মাঘোৎসবের অমৃতময়ী বাণী আমাদিগকে দৈনন্দিন জীবনকে সহজ সরল সত্যপথে প্রবর্ত্তিত করিতে বাধ্য করে, ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইতে সহায়তা করে; ধীরে ধীরে সদ্য রোগমুক্ত দুর্ব্বল শীর্ণদেহ শিশুকে যেমন মাতা প্রভাতের শীতল সমীরে হাত ধরিয়া পাদচারণা করিতে সহায়তা করেন, তেমনি মাঘোৎসবও স্নেহশীলা ধর্ম্মজননীরূপে আমাদিগকে মিথ্যাব্যাধির দুর্ব্বলতা পরিহার করিতে উপদেশ দিয়া সত্যপথে পাদচারণ অভ্যাস করান। দৈনন্দিন জীবনে মাঘোৎসবের এ দান অমূল্য সম্পদরূপে গণনা করিতে পারি।

যে শিক্ষা আমরা মাঘোৎসবে পাই, তাহার মধ্য দিয়া আমাদের অন্তরে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সঞ্চারিত হয়, একে অন্যের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইতে শিখি; তারপর এই সহানুভূতি মানব হইতে জীবচরাচরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। যখন কোন কীটপতঙ্গের দুঃখ দেখি, তখন মনে হয় ঐ কীটপতঙ্গও ত ব্রহ্মের সৃষ্ট জীব—আমি যদি প্রকৃত ব্রহ্মোপাসক হই, তখন আমি কিরূপে ঐ ব্রহ্মসৃষ্ট কীটের উপর অত্যাচার করিতে সমর্থ হইব? আমার চক্ষে যে কীট সহানুভূতির উদ্রেক করিবে—মনে হইবে আমাদের উভয়েরই উৎপত্তিভূমি এক—সমবেদনায় হৃদয় গলিয়া যাইবে, প্রকৃত ব্রহ্মোপাসকের মত কোমল সহানুভূতি-সম্পন্ন হৃদয় জগতে বিরল।

মাঘোৎসবে আর একটি মহৎ দান—ধর্ম্মজীবনের স্বাধীনতা। এই মাঘমাসে ধর্ম্মজীবনের স্বাধীনতা লাভের জন্য মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন, আর তাঁহারই সেই কর্ম্মপ্রচেষ্টার ধারা আমরা মঘোৎসবের মধ্য দিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করি; যখনই ভাবি, আমরা যে দুর্ব্বল মানব—কি শক্তি আছে আমাদের প্রচলিত মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের, অমনি মনে হয় আমাদের মধ্যে যে নায়েগ্রার জলপ্রপাতের বিপুল শক্তি সুপ্ত রহিয়াছে—আমরা ত কোন মিথ্যাচারের দাস নহি, আমরা সত্যের সন্তান, অমৃতের পুত্র, পরব্রহ্মের মহতী শক্তি আমাদিগের পশ্চাতে, তখনই আমাদের সাময়িক দুর্ব্বলতা শক্তিহীনতা দূরে সরিয়া যায়, জাগিয়া উঠে সুপ্তসিংহের বীর্য্য অন্তরের সমস্ত শক্তিহীনতার ভাবকে পদদলিত করিয়া। জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মে এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যদি আমরা সংসারপথে চলিতে পারি, তবেই বুঝিব মাঘোৎসব সার্থক হইয়াছে; সফল হইয়াছে। মাঘোৎসবের মধ্য দিয়া আমরা পাইয়াছি শাশ্বত নিত্য ধন, যাহা রাজার বহুমূল্য মুকুটমণির চেয়ে মূল্যবান, যাহা প্রভাতসূর্য্যের হীরণকিরণের চেয়েও গরিমাময়, গোমুখীর জলধারার চেয়েও পবিত্র।

আজ প্রভাতের আনন্দ-কিরণ জীবগণকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। আকাশে উজ্জ্বল অসংখ্য তারকার প্রদীপ যাঁহার আরতিতে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, যে পরম পিতার আরতিতে গৃহে গৃহে মঙ্গল শঙ্খ নিনাদিত হইতেছে, সেই পরব্রহ্মের বন্দনায় আজ আমাদের পুণ্য মাঘোৎসবে ভক্তের হৃদয়ে ভক্তিগঙ্গা বহমান। শান্ত মঙ্গল জগৎপ্রসবিতার মঙ্গল আশীর্ব্বাদে আজ আমরা মাঘোৎসবের সমবেত ব্রহ্মোপাসকগণের অন্তরে মিলন-রাখী বন্ধন করিতে চাহি, যাহাতে বর্ষে বর্ষে আমরা এমনই পুণ্য মঙ্গল মুহূর্ত্তে আবার সমবেত হইয়া মাঘোৎসবের মধ্যদিয়া পরব্রহ্মের চরণে আত্মনিবেদন করিতে পারি।

আজ যাঁহার অনন্ত মঙ্গলপ্রদ ইচ্ছায় আমাদের এই মাঘোৎসব অনন্ত আনন্দের ধারা বহিয়া আনিয়াছে, অনন্ত কল্যাণের আকররূপে প্রতিভাত হইয়াছে, যিনি অগ্নিতে, যিনি সলিলে, যিনি মলয়ের মৃদু হিল্লোলে, যিনি বিকশিত কুসুমভূষিত কুঞ্জকাননে, যিনি জ্যোৎস্নালোকিত নদী-তরঙ্গে, যাঁহার শুভ ইচ্ছায় দিন রাত্রির

ঘূর্ণ্যমানচক্র কালরূপে প্রতিভাত; যাঁহার অপার করুণা একক জননীর স্নেহদয়ায়, ভ্রাতাভগ্নীর পতি পত্নীর বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল প্রেমে প্রতি পদে বিপদে আমাদের নয়নসম্মুখে প্রকাশিত হয়, রোগে শোকে বিপদে বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে যাঁহার শান্তনাবাণী অন্তরে বাজিয়া উঠে, যিনি প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যে বিরাজিত, আজ এই শান্ত স্নিগ্ধমঙ্গল প্রভাতে আমাদের হৃদয় নিঃসৃত প্রেমফুলে ভক্তিচন্দনে তাঁহারই অর্চ্চনা করি, তাঁহারই পুণ্যচরণে প্রণিপাত করি, তিনি আমাদিগকে সকল বিপদ, সকল ভয়ের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহারই অমৃতময়ী করুণাধারা আমাদিগের মস্তকে বর্ষণ করুন—তাঁহারই পুণ্যনাম জয় যুক্ত হউক।

Invocation

(*Swami Sadananda*)

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।

O children of God! arise, awake from your long slumber of ignorance and receive the knowledge of the Supreme Brahman from the acharya who has realised Him.

Tempus fugit! One more year has rolled by under the Divine wheel and we are again in the midst of our annual festivities. Should we call it a festival? It is more sacred and more solemn than a festival. Festival is too low a term for the auspicious occasion under which God has gathered us together today. It is not a festival but a day of spiritual reconciliation of the men of faith, under the high standard of the theistic church—the church of universal religion. It is a day of bringing us into closer contact with our Divine Creator. It will be a pity if there be anyone in this house of God who has not come, here with a sincere craving—a real thirst—for meeting the Lord. It will also be a pity if any one goes away from this place of worship without realising Him.

It was in this sacred hall that Maharsi Devendra Nath inspired the spiritual lives of the earlier leaders of the Brahmo Samaj by his memorable sermons. It was from this very pulpit which I so unworthily occupy today, that the light of Maharshi's sadhana dazzled forth and dispelled the darkness from the hearts of many true worshippers of God. It was here that Brahmananda Keshab Chandra Sen, Pandit Sivanath Shastri and other saints of the Brahmo Samaj got their spiritual rebirth.

We may be unworthy but the sanctity of this sacred temple has not gone. The mortal body of the Maharshi has disappeared from us, but he is still present with us in spirit to help us in our devotion and bless us for ever. The whole temple is surcharged with the Divine Spirit once invoked by our venerable leader. Being under the roof of such a holy temple and having a dip into the sanctified atmosphere, do you want to go away empty handed? Having entered this temple of Jagarnath do you want to return home without seeing Him? If that be your desire you must have come here in vain.

Sisters and Brothers, dont be despondent. Forget for the moment all your worldly cares and concentrate your minds on Him alone, whom you have come to worship. Worship is not merely the chanting of the hymns or strotras, nor the hearing of minister's sermon. It is the sacrifice of one's self at the feet of the Supreme Self—the complete surrender of one's soul to the Supreme Soul. If you fail to do so under these auspicious circumstances you will never be able to do it anywhere else.

I therefore entreat you, O comrades-in-faith, to make yourselves ready to receive the Lord who is standing at the doors of your hearts and enthrone Him in the "*hiranmaya kosa*", the golden case, that lies hidden therein. Truly it was said by the Rishis of old.

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥

Those who know their own self, they realise the Supreme Spirit that is without impurity, the holy, the light of the lights, within the golden case of their souls.

SERMON.

(*Brahmo Sombat 101. 11th Magh—*
Swami Sadananda)

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।

• • • •

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

O Bharata, whenever there is a decay of dharma (religion) and an ascendency of adharma (irreligion), I manifest myseif in time and space, in order to re-establish the dharma.

When the country had fallen from the higher ideals of religion and culture of ancient India, when religion was degenerated and had centred round numberless idolatrous and superstitious rites and ceremonies, when God-worship was converted into mere formalities, festivities and tamasas, when the social and political life of the nation had become dormant and inactive, when the motherhood of India was shackled and imprisoned within the four walls of purda, when the national aspirations of the people were crushed under continued subjugation of foreign yoke, the spirit of the Lord manifested in the Rishi Raja Ram Mohun Roy of the blessed memory and inspired him with the noble idea of the general emancipation of the children of his motherland, The silent tears that flowed down his cheeks at the deplorable condition of this holy and sacred land, had not fallen in vain.

The Raja foresaw the beautiful picture of a brighter and regenerated India ; he worked for it ; he died in the vision of a happy and glorious India. Who can say he lived in vain ?

A careful survey of the present religious, social and political condition of the people of India, the advent of the new era and the birth of the new spirit of nationalism, will shew the following prominent features :—

1. The love for truth
2. The love for Motherland
3. The spirit of brotherhood
4. The spirit of service and sacrifice
5. The craving for independence
6. The awakening of motherhood
7. The spirit of toleration
8. The emancipation of the depressed and suppressed classes.

These are the pillars on which Raja Ram Mohun Roy founded the Brahmo Samaj more than a hundred years ago. The people laughed at his "mad" venture, abused and persecuted him, opposed him vehemently, and even made attempts to crush him. But the undaunted founder of the Brahmo Samaj, the most sincere and ardent patriot and reformer, under the guidance of the Supreme power, remained unmoved and went on with his noble mission, inspite of all the fears and frawns of his countrymen. Today his actions have been justified. Now where is the man to bring in slur upon him ?

The spirit of the much abused Brahmo Samaj has now penetrated into every home, permeated through every heart in the country. It is now being adored by every man ; it is being admired by every nation. I am not a slave to name. Call it by any name you please, but you must admit that the new spirit that has dawned in the country has been originated from the Brahmo Samaj. Is it not a sufficient vindication of the existence of the Brahmo Samaj ?

The Brahmo Samaj has brought a new light, a new vision, a new life, not only for India but for the whole world. It has dispelled the darkness of bigotry, prejudice and superstition and turned the tide of social, political and religious thoughts of the country. Men of every community are now shaping their houses on the model of the Brahmo Samaj and following the footsteps of our earlier leaders. Is this not a glory for the Brahmo Samaj ?

Sisters and Brothers, the Brahmo Samaj is the highest of all gifts that God has bestowed upon you, it is the highest blessing of our Almighty Father, for through it He has given us Himself. The Brahmo Samaj is the richest of all treasures entrusted to your care. If you know how to realise it, if you know how to utilise it for the good of humanity, yours is the peace and happiness secured. A most sacred duty has been entrusted to you by God and the founder of the Brahmo Samaj. Your mission

is spread over a vast field, the sphere of your work is unlimited, You have to restore the kingdom of God on earth : you have to save the struggling humanity from the depth of materialism. You may call me an idealist, but if I have understood properly the mission of the Brahmo Samaj, it is nothing else.

The Brahmo Samaj is one of the principal architects for the new world-in-making. When should every Brahmo heart exclaim within himself: "My mission is to unite man and man and not to separate man from man My aim is to build a new world—the world of peace, love, brotherhood and harmony among all nations and races. The sphere of my mission is unlimited, My vision is unimpaired by bigotry and prejudice. I have no enmity with anybody. I love my enemy, I respect my persecutor and oppressor. I know no hatred. God is my guide, truth is my resting place, righteousness is my path of pilgrimage. All prophets all saints and all sages are my objects of veneration. Followers of all religions are my brothers-in-God."

Sadhana is the main pillar of the Brahmo Samaj. The true significance of the Brahmo Samaj cannot be realised, cannot be understood, without sadhana. The Rishis of old, therefore, gave their highest thoughts to sadhana, and so they reached the goal of human life, which every Brahmo should aspire after. Without sadhana a Brahmo life is meaningless. It is therefore that Maharshi Devendra Nath Tagore concentrated his whole attention, mind and soul, to sadhana and reached the highest stage of spiritual life, among us. The fruits of his sadhana are his immortal book "Brahmo Dharma", and his memorable sermons which he delivered from the pulpit of the Adi Brahmo Samaj. Brahmananda Keshab Chandra Sen was also a great man of sadhana, as well as a reformer. And so also were Pandit Sivanath Sastri and Sadhu Bejoy Krishna Goswami, There were also other sadhakas of the Brahmo Samaj in the earlier days of our church. These men of God had built up the Brahmo Samaj and raised it to a very high status and they gave inspirations to many a leader of reformed religious communities. But the members of the Brahmo Samaj have now fallen from the high pedestal. It is a pity no doubt, but it is a stern fact which no one can dare deny. The present members of the Brahmo Samaj, with a few honourable exceptions, have given themselves up more to forms and formalities, prestige and tradition and thereby narrowed their visions to a very great extent, and compromised their positions before the eyes of the world. Our young men have revolted and the elders have become more selfish. What is the reason ? The reason is, to my mind, the want of sadhana among us. We have now concentrated our attentions more to social and political reforms than to sadhana or spiritual culture. We seem to have forgotten that sadhana is the real shakti for achievement of success in every sphere of human life. Of course there are still some among us who have not neglected sadhana but their number is very limited.

The Brahmo Samaj is great, but its greatness will only be realised when we concentrate our mind to sadhana. I therefore appeal to you, most humbly entreat you, in the name of our dearly beloved Samaj not to neglect sadhana, for sadhana is the very life of a Brahmo. A Brahmo without sadhana is a body without soul.

Let me now conclude this sermon in the vitalising words of Brahmananda Keshab Chandra Sen :—

DAUGHTERS and SONS of BHARATA-MATA—dearly beloved Sisters and Brothers ; the blessed morning of your regeneration has dawned ; awake, arise. The great GOD, our Merciful Father, standeth at your doors, with the treasures of redeeming grace and summoneth you to come. Obey the holy call instantly. Let your eyes behold the golden light of the new day ; let your ears receive the sacred chant of salvation ; let your lips praise the hallowed name of the Redeemer ; let your hands worship His holy feet. Long, too long, have you slumbered in the cells of idolatry and superstition heretical oppression and custom-bred corruption, Your moral ailments have been acute, your spiritual poverty has been paralysing. Your pitiable

plight draws tears from human eyes. Shall Infinite Mercy look on with apathy? No; it cannot be. The all-benignant Father hastens to relieve those that cry unto Him. Beloved India, the night of thy sorrow is vanishing; the angel of Truth, ushering in light and love, stands radiant in yonder East. The path which leads thee into the house of GOD opens before thy eager eyes.

Already some have responded to the Father's call and gathered under the holy banner of His Truth. Frail, famished and sin-laden, they have come, eagerly and hopefully, in quest of salvation. They are congregated in the Worship of their Father in spirit—in truth, love and righteousness; they constitute the true Church of GOD. With faith and humble trust they are ceaselessly praying unto the Lord and increasingly imbibing righteousness through His grace. Dear Sisters and Brothers, join that band of GOD's ardent Worshippers and find peace everlasting. Confessing sins, abandoning pride, thirsting for righteousness, pray to GOD incessantly. Repose complete trust in the One True GOD who is infinite in mercy and holiness, and believe that by praying unto Him and serving Him you shall attain peace, strength and happiness. You may be very sinful, yet the Lord will deliver you. There is mercy enough in our God even for the meanest and most degraded. In spite of our repeated revolt and persistent ingratitude, He is ever our loving Father. We may forsake Him, He never forsakes us. He is always eager to receive back 'the prodigal son'. Run to such a loving Father and fall at His feet, He will exalt you; repent and He will make you rejoice. Hasten to the dear home He has set up for you, rich with the unspeakable treasures of the spirit. Stand around His altar and receive, even from His holy hand, the boon of salvation, He will feed you with the bread of life, clothe you with righteousness, and gladden you with His abounding grace.

Come, then, unto the Father, all ye, my erring and sorrowing countrymen and countrywomen, I, a fellow sinner, Your humble brother and servant, beg you to come to my good Father's house, Come from all quarters; come from the uttermost parts of the dear fatherland; come all, high or humble, learned or illiterate, old or young —all ye who are heavy-laden with sin and sorrow: come humbly and prayerfully to our Father's mansions of peace. The poor shall become rich and the weak strong; the blind shall receive sight and the dumb speech; the dead shall come to life again—all through His redeeming grace.

Sing the Father's loving-Kindness, ye men and women of India. Sing, hills and dales, streams and meadows, woods and plains, cities and hamlets. Ye winds of heaven, carry, far and wide, the message of His mercy. Blessed be the GOD of Truth, Love and Holiness for ever!—Amen.

নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

প্রাতঃকাল।

গান্ধারী—আড়াঠেকা।

আজিকে মধুর সুবিমল প্রাতে মরম বাঁশরী উঠিল বাজিয়া।
আজি নামে তব ওহে প্রিয়তম শত নব গান উঠিছে ফুটিয়া
তোমারি মধুরে সকলি মধুর তব পুণ্যগন্ধ পড়িছে ঝরিয়া
সুমন্দ বাতাস তোমারি নিশ্বাস দিতেছে
আমারে পাগল করিয়া।

গান্ধারী—তেতালা।

মোর প্রাণ-মন ভরি' পূজিব তোমায়—
এস সজ্জিত সুন্দর মনমন্দিরে হে।
পূজি প্রেমফুলে হে লও তাহে তুলে,
শোক-দুঃখ জ্বালা যাব আনন্দে ভুলে—
সদানন্দ পিয়া রহিব ভোর প্রাণ-মন ভরি' পূজিব।

আশাবরী—তেতালা।

তব চরণকমলে মম মনভ্রমর আজি প্রাতে ধায়
হর্ষে বিভোর।
দিব তোমারে—কিছু নাহি গো; নিয়েছ সব হরি' মোর॥
হাসে চারি দিশি ফুল পাতা গগনে উথলে আনন্দ-ঘোর।
ভিক্ষা পদে তব—রাখ বাঁধিয়া রেখ! দিয়া প্রেমের ডোর॥

শুক্ল বেলাবলী—তেতালা।

আঁখির আগে রয়েছ নিশিদিন
তবু তোমারে হেরি না কেন?
যদি কভু তুমি মোর আসিলে পরাণে হে
নিশি দিন যায় কাটি প্রভু পলক যেন॥

সরফর্দা—আড়াঠেকা।

সদা চাহে পরাণ জননী হে!
আছ জাগিয়া সদা প্রাণে জননী হে!
চরণে তব প্রণমি হে প্রাণ মন ভরে
দাও আশীষ শিরে মোর জননী হে!

ভৈরবী—তেতালা।

দেখা দাও—দাও সদা হৃদয়ে—মোর হৃদয়ে।
থেকো না দূরে মোর ধরি তব চরণে।
ডাকিছে সুদীনে কর যোড়ে—দেখা দাও প্রাণ বিহারী
প্রভু বাঁচাও ভকতে॥

আশাবরী—আড়াঠেকা।

প্রাণ মোর ধাইছে
তোমার পদে প্রভু হে।
দূর কর জননী ত্রাস আমার
ভবে ভয়সঙ্কুল॥

রামকেলী—আড়াঠেকা।

হৃদে ধর প্রাণের সে দেব দয়াময়।
অন্য কথা ছাড়ি দাও
সদা তাঁরি কথা কও।
সবে দেখ তাঁরি ছায়া
ভেবে না এ সবি মায়া—
আনন্দেরি কথা কহতে সুজন বিনয়॥
নামে তাঁর উছসিয়া
উঠুক সবার হিয়া—
দুখ শোক জয় হোক
দূর হোক ভয়।
করি' তাঁর নাম গান
পূর্ণ হোক সর্ব্বকাম
তাঁহার চরণ ধরি'
হও রে নির্ভয়॥

সায়ংকাল।

দরবারী কানাড়া—ঝাঁপতাল।

তাঁহারে দেখ অন্তরে হে নর—
কাটায়ো নাকো বৃথা জগতে জীবন ওরে মূঢ় জনের।
এই ভবসাগর পার হবে তাঁহারি নামে—
তিনি সেতু বিধরণ—গোচর ধ্যানের।
চরণে তাঁরি দাও চিত সঁপিয়া—
পাও সুন্দর পুণ্য ধাম হে দুর্লভ সুরগণের।
যুগে যুগে অটল হৃদয়ে ধাও তাঁহারি পানে
জয়গীত শতকণ্ঠে গাও মহেশের।

গৌরসারঙ্গ—কাওয়ালী।

তোমার লাগি আছি জাগিয়া
দিবা নিশি একা বসি আকুল হিয়া।
যেওনা ছেড়ে নাথ দুখী ব'লে মোরে
পূজিব সকল হৃদয় দিয়া।

খাম্বাজ—তাল ফেরতা।

শঙ্কর শিব সঙ্কটহারী।
নিস্তার প্রভু জয় দেবদেব।
আকুল প্রাণে আমারি ভকত চিতবিহারী
দেখা দাও ভিক্ষা মাগি জয় দেবদেব।
পিপাসিত চিতবারি ত্রিলোক জগতধারি
দীননাথ দয়াসিন্ধু জয় দেবদেব।
(ওহে) সংসারকাণ্ডারী আশ্রিতভয়হারী
ভবপারে যাও লয়ে জয় দেবদেব।

পূরবী—ব্রহ্মতাল।

ভুলিল প্রাণ-মন মম সুন্দর প্রভু হেরি তোমা প্রাণে।
ভুলি সব হৃদয় যখন পূরে তোমার মধু নামে॥
ধ্বনিত করে নীলাম্বর যবে বাঁশরী তব মধু তানে॥

মোহিনী—সুরফাঁকতাল।

কারণ আদি সব শক্তিমূল পরমেশ্বর শুভদ
অন্তরে তব বাণী দাও হে।
শুভাকর আদিনাথ গুণসাগর অরূপ
চরণ ধরি তব শুভমতি দাও হে॥
তব করুণা ধরি আছে সুরয চন্দ্র তারা পবন
আদি অনুখন হে
আমি অকিঞ্চন তব প্রসাদ দেব
যাচি সদা মলিন দুখী জন হে॥

গৌরসারং—তেওরা।

নির্ম্মল মুখ তব দেখাও আজ
সব ভয় দূর হয় দেখি' ও-মুখ হে।
এসো হে এসো নাথ ডাকি যোড়করে
তোমারি শরণ পেলে ভুলি সব দুখ হে॥

(শ্রীক্ষেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর)

ঝিঁঝিট—তাল রাস।

অতি ধীরে ধীরে কাল বেলা তীরে
আসিয়া দাঁড়ালে কালের আড়ালে।
কে তুমি আমারে ডাক বারে বারে
কাঁদ মোর তরে ডাক স্নেহ ভরে
ডাকিত আমারে হে মোর জননী
কত না আদরে দিবস রজনী।
তোমারে চাহিয়া ভ্রমি পথে পথে
চলেছি বাহিয়া একাকী এ স্রোতে,
তমসা রজনী ভগন তরণী
চলেছি বাহিয়া একাকী জননী।

সমাজসংস্কারে মদনমোহন।

(শ্রীরত্নমালা দেবী)

শিশুশিক্ষা-রচনাতে বেথুন সাহেব তর্কালঙ্কারের উপর বড় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বেথুন মদনমোহনকে একদিন বলিলেন, মদন! তোমার শিশুশিক্ষাত্রয় রচনায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আমি তোমার কোন উপকার করিতে ইচ্ছা করি। বল তুমি কি করিলে সন্তুষ্ট হও? মদনমোহন বিনীতভাবে বলিলেন,—মহাশয়! আপনি বিপুল জলধি পার হইয়া বঙ্গদেশে আসিয়া বঙ্গরমণীগণের দুর্দ্দশামোচনে এই বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। আমি বঙ্গবাসী, আপনি বিদেশীয় মহাত্মা আমাদের দেশীয় নারীগণের দুর্দ্দশামোচনে যত্নবান হইয়াছেন। ইহাতে আমি সাহায্যমাত্র করিয়াছি। তাহাতে আমি পুরস্কারের যোগ্য কিসে হইলাম? বেথুন সাহেব লজ্জিত হইয়া আর কিছুই বলিলেন না। কিন্তু প্রকারান্তরে তর্কালঙ্কারের উপকার করা তাঁহার দৃঢ়-সংকল্প রহিল। [illegible] জন্য বেথুন সাহেব তর্কালঙ্কারকে [illegible] অনুরোধ করিলে তর্কালঙ্কার তাঁহার বন্ধু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া [illegible] বেথুন সাহেবের উদ্দেশ্য বিফল হইল। [illegible] কলেজের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হইলে বেথুন সাহেব তর্কালঙ্কারকে ঐ পদ গ্রহণে অনুরোধ করেন। কিন্তু তর্কালঙ্কার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ পদের উপযুক্ত বলায় বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ পদে বাধ্য হইয়া নিযুক্ত করেন। তর্কালঙ্কারের ন্যায় উদারহৃদয় বন্ধুবৎসল ব্যক্তি জগতে অতি বিরল ছিল। বন্ধুকে আপন অপেক্ষা উচ্চতর পদে অভিষিক্ত করিয়া তর্কালঙ্কার বন্ধুত্বের ও ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর ও তর্কালঙ্কার যৎকালে সংস্কৃত কলেজে ছিলেন, তখন তাঁহারা ১২৫৪ সালে একটী মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া তাহার নাম "সংস্কৃত যন্ত্র" রাখিলেন। তর্কালঙ্কারের উদ্যোগেই এই সংস্কৃতযন্ত্র স্থাপন হইল। তর্কালঙ্কার মনে করিলেন এই মুদ্রাযন্ত্রে তাঁহাদের ইচ্ছামত পুস্তকসকল মুদ্রিত হইবে। বিদ্যাসাগর ও তর্কালঙ্কার উভয়েই এই সংস্কৃতযন্ত্রের সমান অংশীদার ছিলেন। তখন মুদ্রাযন্ত্রের বহুল প্রচার হয় নাই। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই বলিয়াছেন,—"আমি ও তর্কালঙ্কার যখন সংস্কৃত কলেজে ছিলাম, তর্কালঙ্কারের উদ্যোগেই সংস্কৃতপ্রেস-ডিপজিটরী স্থাপিত হয়।" উভয়ের চেষ্টায় সংস্কৃত প্রেসের দিন দিন উন্নতি লাভও হইয়াছিল।

এই সময়ে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছিলেন। বালিকাবিধবাদের দুঃখে তাঁহার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিল। কিরূপে বালবিধবাদের দুঃখমোচন হইবে এই চিন্তায় তাঁহার আহারনিদ্রা বন্ধ হইল। কিসে সমাজের দুর্গতি দূর হইবে, কিসে বিধবা অনাথাদের দুর্দ্দশা দূর হইবে, মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগর এই চিন্তায় অত্যন্ত কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমকালীন ব্যক্তিগণের মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, প্যারীমোহন মিত্র, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই এ বিষয়ে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি বালবিধবাগণের দুর্গতিমোচনের জন্য পণ্ডিতবর্গকে ডাকাইয়া তাঁহাদের অভিমত লইয়া স্বাক্ষর করাইয়াও লইয়াছিলেন। হিন্দুসমাজের মধ্যে যাহাতে বিধবাবিবাহ প্রচলন হয়, তাহার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাজের কিছুমাত্র ভয় না করিয়া সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলে মদনমোহন তাঁহার অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।

বিধবাবিবাহের তুমুল আন্দোলন লইয়া হিন্দুসমাজ যখন টলমল করিতেছিল, তর্কালঙ্কার যখন বিধবাবিবাহের জন্য নিরন্তর অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছেন, অনতিকাল মধ্যেই তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইল। পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তখন অকৃতদার-ছিলেন। তিনি মদনমোহনের একান্ত বন্ধুও ছিলেন। [illegible] গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত

ব্রহ্মবান্ধব মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা কালীমতীর সহিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহ স্থির হইল। খাঁটুরা গ্রাম-নিবাসী রামধন বিদ্যারত্নের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিধবা-বিবাহের প্রথম পরিণেতা।

এই বিধবাবিবাহে তর্কালঙ্কার বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তর্কালঙ্কারই এই বিবাহের সমস্ত যোগাযোগ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তিনিই প্রথম বিধবাবিবাহের সংযোজনকর্তা। ঐ বিধবা বালিকা তাহার মাতার সহিত সর্ব্বদাই তর্কালঙ্কারের বাটীতে বেড়াইতে আসিতেন। তর্কালঙ্কারের চেষ্টাতেই মাতা ও পুত্রী কলিকাতায় আনীতা হয়েন এবং সুকীয়া ষ্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতেই অবস্থান করেন। ১২৬৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ১৩ তারিখে রামগোপাল ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি সকলের উদ্যোগে পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সহিত বিধবা কন্যা কালীমতীর বিবাহ সম্পন্ন হইল। সুবিখ্যাত জয়নারায়ণ তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি অনেক বড় বড় পণ্ডিত বাল-বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া ঐ বিবাহসভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং কন্যাদান করিয়াছিলেন। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর এই বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া বালবিধবার বিবাহ হওয়া উচিতই মনে করিয়াছিলেন। ইহাতে হিন্দুসমাজ রক্ষা হইবে ও ভ্রূণহত্যা শিশুহত্যা প্রভৃতি পাপ হইতে অজ্ঞ নরনারী নিষ্কৃতি পাইবে। এই উদ্দেশ্যেই তাঁহার বিধবাবিবাহ-প্রচলন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এত কোমলহৃদয় ছিলেন যে, অনাথা বালবিধবাদের দুঃখ দেখিলে তাঁহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইত। তিনি দিবারাত্রি এই বিষয়ের চিন্তা করিতেন।

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিধবাবিবাহ করায় হিন্দুসমাজ তর্কালঙ্কারের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছিল। 'প্রভাকর' পত্র তর্কালঙ্কারকে যথেষ্ট গালিবর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু নির্ভীক তর্কালঙ্কার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত নির্ভয়ে সমাজের সকল উৎপীড়ন হাসিমুখেই সহ্য করিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর জনহিতকর যে সকল কার্য্য করিতেন, তর্কালঙ্কার তৎক্ষণাৎ আসিয়া তাঁহার দক্ষিণহস্তরূপে দাঁড়াইতেন। একদা বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতার কোন গলির মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন, একটী অনাথ দীনহীন ব্যক্তি কলেরা রোগাক্রান্ত হইয়া ফুটপাতের উপর পড়িয়া আছে। তখনও তাহার জীবনের আশা ছিল। তিনি অবিলম্বে একখানি ভাড়াটে গাড়ী ডাকিয়া স্বহস্তে তাহার মলমূত্র ধৌত করিয়া গাড়োয়ানের সাহায্যে তাহাকে স্বীয় আবাসে আনয়ন করিলেন এবং স্বয়ং তাহাকে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। মদনমোহনও এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে বিদ্যাসাগরের নিকট আসিয়া সেই মুমূর্ষু রোগীর সেবার ভার গ্রহণ করিলেন।

মদনমোহন অতি গম্ভীরপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে উদ্যমশীল ও কর্ম্মঠ ছিলেন এবং যে কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেন তাহা না সম্পূর্ণ করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। সকল কাজেই তিনি চেষ্টাশীল ও অধ্যবসায়ে পূর্ণ ছিলেন। তিনি সকল কার্য্যেই পুরুষকার অবলম্বন করিতেন। দৈবে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তিনি পুরুষকার দ্বারাই আপনাকে এতটা উন্নত করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল সামাজিক উন্নতি বা স্ত্রীশিক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যতীত এ সকল বিষয়ে আর কেহই তাঁহার সাহায্য করেন নাই। হিন্দুসমাজ তখন কুসংস্কারে পূর্ণ, অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন; হিন্দুনারীগণ তখনও অনেকেই নিরক্ষর। এই সময় মহাত্মা বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন উভয়েই সমাজের দুরবস্থাদর্শনে দুঃখিত হইয়া সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় সমাজের নানা উন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা লোকের এতদূর বিদ্বেষভাজন হইয়া উঠিলেন যে, তর্কালঙ্কারকে কেহই সুনয়নে দেখিতেন না। তাঁহার উপর সকলেরই হিংসা, দ্বেষ ও আক্রোশ প্রবল ছিল। কিন্তু তর্কালঙ্কার এতই ক্ষমাশীল ছিলেন যে, কাহারও কটুবাক্যে ক্রুদ্ধ হইতেন না। তিনি দেশের কল্যাণ কামনায়, সমাজের কল্যাণকামনায় আপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিসে সমাজসংস্কার হইবে, কিসে হিন্দুনারী-শিক্ষার বিস্তৃতি হইবে, কিসে গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে, কিসে দীনদুঃখী অনাথআতুরের জন্য অন্নশালা স্থাপিত হইবে, এইসকল দেশহিতকর কার্য্যের জন্য দেশের লোক উন্নত হইয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিবে বলিয়াই তর্কালঙ্কার নিজের অর্থসামর্থ্য দিয়া মুর্শিদাবাদ কান্দীতে দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, অনাথমন্দির প্রভৃতি সংস্থাপন করত দেশের লোকের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার শুধু জ্ঞানী ছিলেন না, শুধু পণ্ডিত বা কবি ছিলেন না, দুঃখীর দুঃখ দেখিলেই সমবেদনায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিত।

তিনি প্রাণপণে দারিদ্র্যের দুঃখনিবারণে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এ সংসার স্বার্থের আবরণে আবৃত। এখানে আসিয়া মানুষ যদি নিজের সুখস্বচ্ছন্দ, ধন-ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াই আত্মসুখপরায়ণ হইয়া জীবনাতি-

পাত করে, তবে বিশ্বের মঙ্গল কিসে কল্যাণ আর কে ভাবিবে? জগতের মঙ্গল সাধন করিতে গেলে আত্ম-বলি দিতে হইবে। আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া পরার্থে জীবন ব্যয় করিতে হইবে। মানুষের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব কয়জনের থাকে? এ সংসারে আসিয়া কয়জন মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারে? তাই মনে হয় তিনি ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। ভগবানের অসীম দয়া তাঁহার উপর পূর্ণভাবেই বিরাজিত ছিল। তিনি জীবিতকাল পর্য্যন্ত এই পরহিতব্রতেই রত ছিলেন।

আয়ুর্ব্বেদে দন্তস্বাস্থ্য।

(শ্রীঅমূল্য চন্দ্র বৈদ্যরত্ন)

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহর্ষিগণ স্বাস্থ্যবিধির আলোচনা-প্রসঙ্গে মনুষ্যশরীরের হিতাহিতসাধক যাবতীয় বিষয়েরই আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা তাঁহাদের সেই সর্ব্ববিষয়িণী প্রতিভা হইতে দন্তস্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় উপদেশ উদ্ধারপূর্ব্বক পাঠকবর্গকে উপহার দিব। শরীর হিত-চিন্তাপরায়ণ পাঠক এই আলোচনায় বুঝিতে পারিবেন যে, আজ এই বিংশ শতাব্দীর দন্তস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পাশ্চাত্য ভূমির আবিষ্কার বহুকাল পূর্ব্বেই সেই সূক্ষ্মদৃষ্টি-সম্পন্ন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ঋষিগণের জ্ঞানের গোচরীভূত হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল কথা আজ স্বপ্নকথারূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে। আজ পরকীয় ইতিহাস আমাদের রত্নময় কণ্ঠভূষণ। নিজের ইতিহাস আমাদের পক্ষে বিষময় প্রহরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! কাজেই আমরা পূর্ব্বাচার্য্যগণের সকল জ্ঞানেই অন্ধ। পাশ্চাত্য-বিদ্যানিপুণ ভারতসন্তান যদি আজ সত্যকার "স্বদেশী" হইয়া সেই আর্য্যগৌরবের ললামভূত আয়ুর্ব্বেদের "চরক সুশ্রুতের" প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি প্রদান করেন, তাহা হইলে হয় তো এই পরকীয় রীতি-নীতির সংক্রামকতা ক্রমে ক্রমে আমাদের ছাড়িতে পারে! হয় তো তাহাতে আবার ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার সেই পূর্ব্বদিন ফিরিয়া আসিতে পারে।

স্বাস্থ্যবিধি আলোচনা করিতে যাইয়া—আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ প্রথমেই দন্তস্বাস্থ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাই যে—

"তত্রাদৌ দন্তপবনং দ্বাদশাঙ্গুলমায়তং।
কনিষ্ঠিকা-পরিণাহমৃজ্বগ্রথিতমব্রণং॥
অযুগ্মগ্রন্থি যচ্চাপি প্রত্যগ্রং শস্তভূমিজং।
অবেক্ষ্যর্ত্তুঞ্চ দোষঞ্চ রসং বীর্য্যঞ্চ যোজয়েৎ॥
কষায়ং মধুরং তিক্তং কটুকং প্রাতরুত্থিতঃ।
নিম্বশ্চ তিক্তকে শ্রেষ্ঠঃ কষায়ে খদিরস্তথা।
মধূকো মধুরে শ্রেষ্ঠঃ করঞ্জঃ কটুকে তথা॥"

সুশ্রুত, চিকিৎসিতস্থান।

যাঁহারা ও আরোগ্যার্থী প্রত্যহ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রথমতঃ দ্বাদশাঙ্গুল লম্বা, কনিষ্ঠাঙ্গুলি-সদৃশ পরিণাহ-বিশিষ্ট (circumference), সরল (সোজা), অগ্রন্থিত (গিঁটযুক্ত না হয়), অব্রণ (কীটদষ্ট না হয়) অযুগ্মগ্রন্থি (দুই দিকেই গিঁট না থাকে) প্রত্যগ্র (নূতন) ও প্রশস্ত ভূমিজাত দন্তকাষ্ঠ সংগ্রহ করিবে এবং এই দন্তকাষ্ঠ ঋতু, বাতাদি শারীরিক দোষ, বৃক্ষের মধুরাদি রস ও কাষ্ঠের অন্তর্নিহিত বীর্য্য এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ বিচারপূর্ব্বক ব্যবহার করিবে। সাধারণতঃ দন্তধাবনে কষায়, মধুর, তিক্ত ও কটু- (astringent, sweet, bitter ও sour taste) রসাত্মক দন্তকাষ্ঠ সুশ্রুতাচার্য্যের মতে ব্যবহার্য্য। এই চতুর্ব্বিধ রসবিশিষ্ট বৃক্ষের মধ্যে যথাক্রমে তিক্তরস-বিশিষ্টের মধ্যে নিম্ব, কষায় রসের মধ্যে খদির, মধুর রসের মধ্যে মৌল (মৌয়া) ও কটু রসের মধ্যে করঞ্জ বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠই প্রশস্ত। প্রথমতঃ দন্তকাষ্ঠের একটী অন্তভাগ দন্ত দ্বারা চিবাইয়া (বর্ত্তমান ব্রষের সদৃশ হইবে) পরে তদ্দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিতে হয়।

ইহার পরই মহর্ষি সুশ্রুত দন্তশোধন-চূর্ণ (tooth powder) সহযোগে উক্ত দন্তকাষ্ঠের ব্যবহারবিধি বলিয়াছেন। যথা:—

"ক্ষৌদ্র-ব্যোষ-ত্রিবর্গাক্তং সতৈলং সৈন্ধবেন চ।
চূর্ণেন তেজোবত্যাশ্চ দন্তান্নিত্যং বিশোধয়েৎ॥
একৈকং ঘর্ষয়েদ্দন্তং মৃদুনা কূর্চ্চকেন চ।
দন্তশোধনচূর্ণেন দন্তমাংসান্যবাধয়ন্॥

মধু, শুঁট, পিপুল, মরিচ, হরিতকী, আমলা, বহেরা ও চৈ চূর্ণ করিয়া তৈল ও লবণ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা দন্ত মার্জ্জন করিবেন। কোমল কূর্চ্চক (tooth brush) দ্বারা দন্তশোধন-চূর্ণ লইয়া এক-একটী করিয়া দন্ত ঘর্ষণ করিবে। এরূপ ভাবে ঘর্ষণ করিতে হইবে, যাহাতে দন্তমূলগত মাংসে আঘাত না লাগে।

কেবল "সৈন্ধব" চূর্ণ সহযোগেও যদি প্রত্যহ দন্তধাবন করা যায়, তাহা হইলে দন্তের কোন পীড়াই হইবে না। এইরূপে কাষ্ঠনির্ম্মিত দন্তধাবন কাষ্ঠের (ব্রষের) কথা বলিয়া অন্যত্র আবার মৎস্যের গলদেশের অস্থি হইতে দন্তধাবন-কাষ্ঠ (tooth brush) প্রস্তুত করিয়াও ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন—

"মৃদুনা বা দন্তধাবনকূর্চ্চকেনাপহরেৎ॥"

মহর্ষি চরকাচার্য্য প্রতিদিন দুইবার করিয়া দন্ত-

ধাবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এইরূপে দন্তধাবন করিলে উহা বায়ু মুখদুর্গন্ধ নষ্ট হয় এবং জিহ্বা দন্ত-মুখগত মল বাহির হইয়া, আহারে রুচি উৎপন্ন হয় ও দন্তসমূহ পরিষ্কার ও সুশোভিত হয়।

"আপোথিতাগ্রং দ্বৌ কালৌ কষায়ং কটুতিক্তকম্।
ভক্ষয়েদ্দন্তপবনং দন্তমাংসান্যবাধয়ন্ ॥
নিহন্তি গন্ধবৈরস্যং জিহ্বাদন্তাস্যজং মলম্।
নিষ্কৃষ্য রুচিমাধত্তে সদ্যো দন্তবিশোধনম্ ॥"

চরক।

দন্তকাষ্ঠের অগ্রভাগ চিবাইয়া সরু সরু (ব্রুষের ন্যায়) করিয়া—প্রত্যহ প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যায় দন্তধাবন করা উচিত। দন্তকাষ্ঠ এরূপভাবে ব্যবহার করিবে, যাহাতে দন্তমাংস আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। দন্তকাষ্ঠ কষায়, কটু বা তিক্তরসবিশিষ্ট হইবে। এইরূপ দন্তমার্জ্জনের দ্বারা মুখের দুর্গন্ধ, বিরসভাব, এবং জিহ্বা, দন্ত ও মুখের মলাংশ বাহির হইয়া রুচি জন্মাইয়া থাকে। দন্তমার্জ্জন দ্বারা দন্তসমূহ বিশুদ্ধ হয়।

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য শ্রীমৎ ভাবমিশ্র দন্তধাবন কাষ্ঠরূপে ব্যবহারের জন্য আরও কতকগুলি বৃক্ষকাষ্ঠের নাম করিয়াছেন। আকন্দ, বট, বদরী (কুল), বিল্ব (বেল), যজ্ঞডুমুর, আম্র, কদম্ব, চম্পক (চাঁপা), শিরীষ, আপাঙ্গ, অর্জ্জুন, কুড়চি, জাতি ও কহলার। তিনি এই বৃক্ষজাত দন্তকাষ্ঠের বহুল গুণ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার পর মহর্ষি চরক ও সুশ্রুত উভয়েই ভোজনের পর দন্তদ্বয়মধ্যগত খাদ্যাংশকে বাহির করিবার উপদেশ দিয়াছেন এবং সে কারণ তৃণকে "খড়কা"রূপে ব্যবহারের উপদেশ দিয়াছেন। মহর্ষিরা বলিয়াছেন যে ঐ দন্তদ্বয়-মধ্যগত ভুক্তবস্তুর অংশ বাহির না করিলে উহা ক্রমশঃ পচিয়া (decompose) মুখে দুর্গন্ধ উৎপাদন করিবে ও অন্য দন্তরোগের কারণভূত হইবে। এই "খড়কা" (tooth pick) সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া শ্রীমৎ ভাবমিশ্র আরও একটু সতর্কতার সহিত এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে,

ভোজনে দন্তলগ্নানি নিষ্কৃত্যাচমনং চরেৎ।
দন্তান্তর-গতং চান্নং শোধনেনাহরেৎ শনৈঃ ॥
কুর্য্যাদনিষ্কৃতং তদ্ধি মুখস্যানিষ্টগন্ধতাং ॥
দন্তলগ্নমনির্হার্য্যং লেপং মন্যেত দন্তবৎ ॥
ন তত্র বহুশঃ কুর্য্যাৎ যত্নং নির্হরণং প্রতি।

ভাবপ্রকাশ।

ঐ দন্তদ্বয় মধ্যগত খাদ্যাংশ যদি সহজে বাহির না হয়—তাহা হইলে উহা বাহির করিবার জন্য কোনরূপ বল-প্রকাশ করিবে না। এইরূপ প্রাত্যহিক নিত্য ক্রিয়ায় স্বাস্থ্যবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান হেতুরূপে দন্তধাবনের উপদেশ দিবার পর মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন যে—

ন খাদেদ্ গল-তাল্বোষ্ঠ-জিহ্বারোগসমুদ্ভবে।
অথাস্যপাকে শ্বাসে চ কাসহিক্কাবমীষু চ।
দুর্ব্বলোঽজীর্ণভুক্তশ্চ মূর্চ্ছার্ত্তো মদপীড়িতঃ।
শিরোরুগার্ত্তস্তৃষিতঃ শ্রান্তঃ পানক্লমান্বিতঃ।
অর্দ্দিতী কর্ণশূলী চ দন্তরোগী চ মানবঃ।
বর্জ্জয়েদ্ দন্তকাষ্ঠঞ্চ হৃদ্রোগসমুত্থোঽপি চ ॥

সুশ্রুত, চিকিৎসিতস্থান।

গলরোগ, তালুরোগ, ওষ্ঠরোগ, জিহ্বারোগ, মুখপাক, শ্বাস, কাস, হিক্কা, বমি, মূর্চ্ছা মদাত্যয় (মদ্যপানজনিত রোগ), অর্দ্দিত (Facial Paralysis), কর্ণশূল, দন্ত-রোগ, হৃদ্রোগ,—এই সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ও ভুক্তদ্রব্যের অজীর্ণাবস্থায় এবং শিরোরোগী, পিপাসার্ত্ত, পরিশ্রান্ত ও পথশ্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার একান্ত অহিতকর।

আমরা অন্যত্র দন্তরোগাধিকারে দেখিতে পাই যে, মহর্ষিই আবার দন্তরোগের কোন কোন অবস্থায় দন্ত-কাষ্ঠ ব্যবহারের বিশেষ উপদেশ দিয়াছেন। এই নিষেধ ও বিধির সমাধান করিতে যাইয়া আমাদের মহর্ষি চরকের উক্তি মনে পড়ে :—

"... ... বিস্তরেণ নিদর্শিতম্।
যেভ্যো যৎ হিতং যস্মাৎ কর্ম্ম যেভ্যশ্চ বর্জ্জিতম্ ॥
ন চৈকান্তেন নির্দ্দিষ্টে তত্রাভিনিবিশেদ্ বুধঃ।
স্বয়মপ্যত্র বৈদ্যেন তর্ক্যং বুদ্ধিমতা ভবেৎ ॥
উৎপদ্যেত হি সাবস্থা দেশকালবলং প্রতি।
যস্যাং কার্য্যমকার্য্যং স্যাৎ কর্ম্ম-কার্য্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥
তস্মাৎ সত্যপি নির্দ্দিষ্টে কুর্য্যাদূহ্যাং স্বয়ং ধিয়া।
বিনা তর্কেণ যা সিদ্ধির্যদৃচ্ছাসিদ্ধিরেব সা ॥

চরক, সিদ্ধিস্থান।

... ... এইরূপ বিস্তারিতভাবে কর্ম্ম নিদর্শিত হইল। যে কারণে যাহাদের পক্ষে যাহা অহিতকর বা হিতকর তাহাও সমস্ত নির্দ্দিষ্ট হইল। যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল, চিকিৎসক সেই সকল নিয়মের প্রতি একান্ত নির্ভর না করিয়া নিজের বুদ্ধিও চালনা করিবেন; এবং কোন নিয়ম যদি পরিবর্ত্তনোপযোগী বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তাহার পরিবর্ত্তন করিবেন। যেহেতু, দেশ, কাল ও বল সম্বন্ধে কখন কখন এরূপ অবস্থার উৎপত্তি হয়, যে অবস্থায় অকর্ত্তব্য কর্ত্তব্য এবং কর্ত্তব্যও অকর্ত্তব্য হইয়া থাকে। অতএব নিয়মসমূহ নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও নিজের বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া নূতন আবিষ্কার করিতে হয়। নিজের বুদ্ধির চালনা না করিয়া যে সিদ্ধি লাভ করা যায়, তাহা যদৃচ্ছালব্ধ কৃতকার্য্যতা।

তাই মনে হয় যদি দেশের সুশিক্ষিতগণ আয়ুর্ব্বেদকে পুনরায় আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকগণ অচিরকালের মধ্যেই আবার নূতন নূতন আবিষ্কারের দ্বারা এই লুপ্তপ্রায় শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার করিয়া দেশকে আয়ুর্ব্বেদের মহিমাগৌরবে বিমণ্ডিত করিতে সমর্থ হইবেন; এবং মহর্ষিপ্রোক্ত চিকিৎসাপ্রণালীর সম্যক প্রবর্ত্তনে দেশ হইতে পূর্ব্বোক্ত ভীষণ ব্যাধি সমূলে দূরীভূত হইবে। শরীর রোগমুক্ত হইলে আবার ভারতবাসী শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হইয়া পূর্ব্বঋষিদিগের ন্যায় ধ্যান, ধারণা, যোগ ও নব নব কীর্ত্তিকলাপের উন্মেষণে সমর্থ হইবে।

শোভাযাত্রার গান।

চল্‌রে আগে

শঙ্করা—পটতাল।

চল্‌রে আগে, সবাকার আগে, থেকোনাকো পিছে পড়ে ভাই
ভাল কাজে লেগে হব মোরা সবে ভুবনজয়ী।
ধর্‌বো সত্যের পথ্‌ ও ভাই—মোদের্‌ চরম্‌ পথ্‌
ধর্ম্মে কর্ম্মে অটল অচল হয়ে হব মোরা ভুবনজয়ী।

গান ও সুর—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী।

১´ • ১´ • ১´ • ১´ •
II র্সা -া | -া র্সা I না -া | ধা -া I পা না | ধা র্সা I না -া | না -া I
চ • ল্‌ রে আ • গে • স বা কা র আ • গে •

১´ • ১´ • ১´ • ১´ •
I পা -া | -া পা I গা -া | পা -া I গা গা | রা রা I সা -া | -া -া I
থে • • কো না • কো • পি ছে প ড়ে ভা • ই •

১´ • ১´ • ১´ • ১´ •
I সা -া | গা -া I সা -া | গা -া I পা -া | সা -া I গা -া | পা -া I
ভা • ল • কা • জে • লে • গে • হ • ব •

১´ • ১´ • ১´ •
I র্সা র্সা | র্সা র্সা I র্রা র্সা | র্সা না I পা -া | ধা -া II
মো রা স বে ভু ব ন জ য়ী • য়ী •

১´ • ১´ • ১´ • ১´ •
I র্সা -া | -া র্গা I র্রা -া | র্গা র্মা I র্গা -া | -া র্রা I র্সা -া | না -া I
ধ • র্‌ বো স • ত্যে র্‌ প • • থ্‌ ও • ভা ই

১´ • ১´ • ১´ • ১´ •
I পা -া | না -া I ধা -া | র্সা -া I না -া | -া -া I গা -া | পা -া I
মো • দে র্‌ চ • র ম্‌ প • • থ্‌ ধ • র্ম্মে •

১´ • ১´ • ১´ • ১´ •
I মা -া | ধা -া I পা -া | না -া I ধা -া | র্সা -া I না -া | র্রা -া I
ক • র্ম্মে • অ • ট ল্‌ অ • চ ল্‌ হ • য়ে •

১´ • ১´ • ১´ •
I র্গা র্রা | র্সা র্সা I র্সা র্সা | র্সা র্না I পা -া | ধা -া IIII
হ ব মো রা ভু ব ন জ য়ী • • •

বেহাগ—পটতাল।

আগে চল আগে চল পিছে পড়ে থেকো না।
জগত উঠেছে জেগে ঘুমায়ে আর থেকো না।
কাজে শুভ লেগে যাও সবার আগে ধেয়ে যাও
প্রাণ্ যাক্ প্রাণ্ থাক্ কিছুতে ভয়্ কোরো না।
হৃদয়ে ধরম ধরে রও—টলো না টলো না।

গান ও সুর—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী।

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০ ১´ ০ ॥
II গা মা। পা পা I গা মা। পা পা I গা মা। পা পা I মা গা। রসসা -া I
আ গে চ ল আ গে চ ল পি ছে প ড়ে থে কো না০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
I সা গা। গা মা I পা পা। না না I র্সা র্গা। র্রা র্সা I না না। ধপপা -া II
জ গ ত উ ঠে ছে জে গে ঘু মা য়ে আর থে কো না০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
{I পাঃ নঃ। না না I র্সা র্সা। র্রা -া I র্সা না। র্সা র্গা I র্রা র্সা। না -া I}
কা জে শু ভ লে গে যা ও স বার্ আ গে ধে য়ে যা ও

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
I পা ধা। ধা া I গা পা। পা া I ধা র্রা। র্সা না I ধা পা। মা গা I
প্রা ণ্ যা ক্ প্রা ণ্ থা ক্ কি ছু তে ভয়্ কো রো না ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
I গা পা। গা পা I গা পা। পা ধা I না -া। -া -া I না না। না র্সা I
হৃ দ য়ে ধ র ম ধ রে র ০ ০ ও ট লো না ০

১´ ০ ১´ ০
I র্রা া। র্সা না I ধা পা। মপা া IIII
০ ০ ট লো না ০ ০ ০

নারীধর্ম্ম।

(৺সুখদাসুন্দরী দেবী মজুমদার)

(২)

কার্পণ্য ও ব্যয়বাহুল্য উভয়ই ন্যায়ধর্ম্ম-বিগর্হিত, পরিমিতব্যয়িতাই ন্যায়ধর্ম্ম-সম্মত। পরমেশ্বর একটি পরমাণুও অপরিমিত ব্যয় করেন না।

অপরিমিত ব্যয় করা নারীদের কর্ত্তব্য নয়। পরিমিত ব্যয় করা, ধনধান্য সুরক্ষিত রাখা নারীদের কর্ত্তব্য। নারীগণ গৃহের লক্ষ্মী, গৃহের শ্রী ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। গৃহের দ্রব্য-সামগ্রীর অপচয় করা তাঁহাদের অন্যায়;

প্রত্যহ গৃহকর্ম্ম প্রীতির সহিত সম্পাদন করা, গৃহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা, ধর্ম্মার্থ-কামবিষয়ে অহর্নিশি স্বামীর সহিত একচিত্ত থাকা, জীবিকাবিষয়ে একচিত্ত ও সমান-ব্রত হওয়া, কায়মনোবাক্যে স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হওয়া,

* বিশেষ দ্রষ্টব্য।—শেষের গানটিতে যেখানে হাইফেন-বিহীন আকার আছে যথা "া" সেখানে সুরের বিশ্রাম বুঝাইবে, কিন্তু গতির বিরাম হইবে না। উপরোক্ত দুইটি গানই একটু অপেক্ষাকৃত দ্রুত লয়ে গেয়।

ছায়ার ন্যায় ভর্ত্তার অনুগত থাকা, সখীর ন্যায় পতির সর্ব্বকর্ম্মে হিতচেষ্টা করা, স্বামীর আজ্ঞা পালন করা, প্রত্যহ পতির সহিত সাংসারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব করা, পতি-ভক্তিমতী গৃহকার্য্যে সুদক্ষা ও প্রিয়ভাষিণী হওয়া নারীগণের পরম কর্ত্তব্য।

দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত ও মূর্খ ভর্ত্তাকে অবজ্ঞা করা নারীদের মহাপাপ। স্বামীর বাক্য পালন করা নারীগণের কর্ত্তব্য, কারণ ইহাই তাঁহাদের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। ভর্ত্তা, ভ্রাতা, পিতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর প্রভৃতির প্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কার ও ভোজ্য পরিধান ও ভোজন করিয়াই পরিতুষ্ট থাকা নারীগণের কর্ত্তব্য, অন্যের ভোগৈশ্বর্য্যের প্রতি লোভ করা পাপ।

প্রত্যহ গৃহোপকরণ পরিমার্জ্জিত করিয়া যথাযোগ্য স্থানে শ্রেণীবদ্ধরূপে সুসজ্জিত রাখা নারীদের কর্ত্তব্য। কোন বস্তুই উপর্য্যুপরি স্তূপীকৃত করিয়া রাখা অনুচিত। আলস্য পরিহারপূর্ব্বক সমুদয় কর্ম্মই স্বামীর বশবর্ত্তিনী থাকিয়া নারীদের করা উচিত।

স্বামী দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিতি করিলে ক্রীড়া, শরীর-সংস্কার, সভাদর্শন, উৎসবদর্শন, হাস্য-পরিহাস এবং পরগৃহে গমন করা নারীদের অকর্ত্তব্য।

কন্যাকালে পিতার, বিবাহের পর ভর্ত্তার এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের তত্ত্বাবধানে অবস্থিতি করাই নারীগণের কর্ত্তব্য। যে সময় প্রকৃত রক্ষকের অভাব হইবে, সেই সময়ে যথাযোগ্য আত্মীয়স্বজনের তত্ত্বাবধানে অবস্থান করাই উচিত। কোন সময়েই অবাধ স্বাধীনতায় অবস্থিতি করা নারীদের সঙ্গত নয়। পতিহীনা নারীগণের পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর বা মাতুলালয়ে অবস্থিতি করা উচিত, অন্যথা করিলে নিন্দনীয় হইতে হয়।

স্বামীর প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত, সদাচার-সম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় হইলে নারীগণের ইহকালে যশঃ ও পরকালে সদগতি লাভ হয়।

ভর্ত্তার সমান-ব্রতাচরণ করা, সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত কার্য্যে পতির আনুকূল্য করা নারীগণের কর্ত্তব্য। সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গলাচরণ করা নারীদের উচিত।

নারীগণের পৃথক ব্রতোপবাস নাই, পতির সেবা করাই নারীদিগের ব্রত, উপবাস ও ধর্ম্ম। যে নারী পতি জীবিত সত্ত্বে উপবাস ও ব্রতাচরণ করে, শাস্ত্রকারদিগের মতে সে স্বামীর আয়ুহরণ ও নরকগমন করে। নারীগণের পতিই পরমারাধ্য, কায়মনোবাক্যে পতির সেবা করিলেই সমস্ত দেবতা তাঁহাদের প্রতি প্রীত হন। পতির পরলোকগমনে নারীর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কাল যাপন করা উচিত।

পরিবারস্থ কাহারও প্রতি দ্বেষ করা উচিত নয়। সকলের সহিত সাধু ব্যবহার করা, সর্ব্বজীবের প্রতি দয়া করা, অভিমান ও অহঙ্কার সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা, সুখে দুঃখে চিত্তে সমতা ও আনন্দ রাখা নারীদের কর্ত্তব্য।

ক্ষমাশীলা হওয়া উচিত। সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বাবস্থায় সন্তুষ্ট-চিত্ত থাকা, সর্ব্ববিষয়ে সংযত থাকা, চিত্তচাঞ্চল্য পরিহার করা কর্ত্তব্য। কাহাকেও ক্লেশ দেওয়া, পরনিন্দা করা, ক্রোধ ও লোভ করা অনুচিত।

সংসারের ধারণ-পোষণের জন্য ভর্ত্তার বশবর্ত্তিনী হইয়া কি গৃহকর্ম্ম, কি শিল্পকার্য্য, কি যুদ্ধকার্য্য, কি কৃষিকর্ম্ম, কি রাজ্যপরিচালনা, কি জ্ঞান-বিজ্ঞানআলোচনা, স্বধর্ম্মানুসারে সমস্ত কর্ম্ম করাই নারীদিগের পরম নৈতিক কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারাই পরমেশ্বরের ভজনপূজন হয়, এবং ক্রমশঃ ইহা দ্বারাই শেষে মোক্ষলাভ হয়।

অন্যের ক্রোধকে শান্তি দ্বারা, দুষ্টকে সাধুতা দ্বারা, মিথ্যাকে সত্য দ্বারা জয় করা কর্ত্তব্য। কেহ অন্যায় করিলে তাহার প্রতিশোধের জন্য ব্যগ্র হওয়া উচিত নহে, সদাচরণ দ্বারা তাহাকে সাধু করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নিজের যাহা অপ্রিয়, সেরূপ ব্যবহার অন্যের প্রতি করা অনুচিত। যে নারী ক্রোধাদি রিপুসমূহকে জয় করিয়াছে, সে ইহকালে যশস্বিনী ও পরকালে সদগতি লাভ করে।

নিজের যাহা প্রতিকূল অথবা দুঃখ-কারক বলিয়া মনে হয়, সেরূপ ব্যবহার অন্যের সহিত করা অনুচিত। নিজে সুখে থাকিতে ইচ্ছা করিলে অন্যের সুখে বাধাবিঘ্ন উপস্থিত করা, নিজে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিলে অপরের জীবন বিনাশ করিতে বাসনা করা কর্ত্তব্য নহে। আমি নিজে যাহা ইচ্ছা করি, অপরেও তাহা ইচ্ছা করে, ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া ন্যায়-ধর্ম্মের সহিত নিজের মত সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করা নারীদের পরম কর্ত্তব্য।

আত্মীয়পরিজনকে দয়া করা, তাহাদিগকে যথাশক্তি দান করা, তাহাদিগের কল্যাণ করা, তাহাদিগের ঐহিক-পারত্রিক উন্নতিসাধনে চেষ্টা করা, তাহাদিগকে প্রীতি করা, তাহাদের সেবা করা, তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে যত্ন করা, তাহাদিগকে ক্লেশ না দেওয়া, তাহাদের সহিত ন্যায় ও সমতাপূর্ব্বক ব্যবহার করা, কাহাকেও প্রতারিত না করা, কাহার কোন দ্রব্য হরণ না করা,

কাহাকেও হিংসা না করা, কাহারও নিকট মিথ্যা কথা না বলা, সর্ব্বভূতের মঙ্গল সাধন করিবার বুদ্ধি মনে পোষণ করা এবং সকলকেই এক পিতা পরমেশ্বরের সন্তান মনে করিয়া তাহাদিগের সহিত ভাইভগিনীর মত ব্যবহার করা প্রত্যেক নারীর পরম কর্ত্তব্য।

পুত্রকন্যা ও পরিবারের প্রতি প্রীতি ও সেবা করা আত্মৌপম্য-বুদ্ধি শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তিকা।

যাজ্ঞবল্ক্য আপন পত্নী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিতেন, "পুত্রকন্যা-পরিবৃত পরিবারের সেবায় আত্মার ব্যাপ্তির সঙ্কোচ না করিয়া বিশ্বজগৎ আত্মময় অবলোকন কর এবং সমস্ত প্রাণীই এক পরিবারভুক্ত—এই ধারণানুসারে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বভূতের সেবা করা নারীদিগের পরম কর্ত্তব্য।"

আমার শরীরের মধ্যে পরমেশ্বর আত্মার আত্মারূপে যে প্রকার আছেন, অপরের আত্মাতেও তিনি পরমাত্মারূপে সে প্রকার জাগ্রত আছেন, ইহা যে নারী সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ জানিয়া কায়মনোবাক্যে সর্ব্বপ্রাণীর সেবা করে, সে-ই অমৃতত্ব লাভ করে।

বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্ব মান্য করিতেন না, তথাপি তিনি উপদেশ দিতেন, "যেমন আমি তেমনি অপর, এইরূপ নিজের সমান বুঝিয়া সকলের সহিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।"

ইহুদী ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তক আদেশ করে, "তুমি আপন পরিবার ও প্রতিবেশীকে আপনারই মত প্রীতি ও সেবা কর"।

পরিবারে আত্মৌপম্য বুদ্ধি অনুসারে আত্মবৎ সমবুদ্ধিতে অন্যের সহিত ব্যবহার করিবার অভ্যাস আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য; কিন্তু সর্ব্বদা পরিবারে বদ্ধ না থাকিয়া গ্রামবাসী, দেশবাসী, সমগ্র মানবজাতি ও সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি আত্মৌপম্য বুদ্ধির অধিকাধিক ব্যাপ্তি করা কর্ত্তব্য; এবং নিজের মধ্যে যে পরমেশ্বর আত্মারূপে আছেন, তিনিই সর্ব্বভূতে আত্মারূপে বিদ্যমান, ইহা উপলব্ধি করিয়া কীটপতঙ্গ, স্বেদজউদ্ভিজ্জ, অণ্ডজজরায়ুজ প্রভৃতি সর্ব্বভূত সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি প্রীতি ও সেবা করা পরম কর্ত্তব্য। ইহাই জ্ঞানের চরম সীমা, মনুষ্যত্বের পূর্ণতা, ইহাই আত্মৌপম্যরূপ সূত্রের চরম ও ব্যাপক অর্থ। এই পরম জ্ঞান অর্জ্জন করিবার যোগ্যতা যে যে যজ্ঞদানাদি কর্ম্ম দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, সেই সমস্ত কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধিকর।

চিত্তশুদ্ধির সত্য অর্থ স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করা, এবং সমগ্র জগতে একই পরমেশ্বর আত্মারূপে সমভাবে অবস্থিত আছেন, দর্শন করা।

এই দর্শন দ্বারাই ব্রহ্মাত্মৈক্য উপলব্ধি হয়, এবং ইহারই জন্য গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্ম্মকে স্মৃতিকারেরা বিহিত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

এই পরম সিদ্ধাবস্থা লাভ করিবার নিমিত্তই পতিপুত্র ও পরিবারের সেবারূপ মহাযজ্ঞ করা নারীদিগের পরম নৈতিক ধর্ম্ম।

মহদ্বাণী।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

চিন্তা ও কর্ম্ম জীবনের মাপকাঠি, শুধু সময় নহে।

লাবক।

ছোট ছোট বিষয়ে সর্ব্বদাই তোমার প্রতি অপরের বিশ্বাস রক্ষা করাই বীরোচিত মহদ্‌গুণ।

সেণ্ট বনাভেনচর।

দূরবর্ত্তী উজ্জ্বল গ্রহতারকা অপেক্ষা গৃহকর্ম্মে ক্ষুদ্র দীপই বেশী কাজে আসে; তোমায় পথ দেখাইবার জন্য মানুষের নিকট দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা কর এবং শান্তির জন্য গ্রহতারকার নিকটে গমন কর।

বুলবর লিটন।

চারিদিক ভাল করিয়া বুঝিয়া যে কাজ আরম্ভ করা যায়, সে কাজ ভাল করিয়া শেষ করাই মঙ্গলজনক।

রসকিন।

ছবির প্রতি আমরা যেটুকু দরদ দেখাই, ভাল আলোকে ধরিয়া যেভাবে দেখিতে যাই, মানুষের প্রতি অন্ততঃ সেইটুকু দরদ দেখানো উচিত, অন্ততঃ সেইভাবে সুদৃষ্টির আলোকে ধরিয়া দেখা উচিত। এমার্সন।

যৌবনে যখন রক্ত বেশ একটু গরম থাকে, সেই সময়ই মানুষের সকল কাজের পক্ষে ভাল; বার্দ্ধক্যে যখন জীবনের সমস্ত সারভাগ খরচ হইয়া যায়, তখন মানুষের সময় যেন ভাল হইতেই চাহে না, মন্দ হইতে মন্দতরই হইয়া পড়ে। হেরিক।

সন্তোষ জীবনকে মধুময় করে। ডিকেন্স।

প্রত্যক্ষ কোন কারণ বিনা একরত্তি পরিচয়েই যে তোমার প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসা দেখায়, তাহাকে বিশ্বাস করিও না। ধর্ম্মের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলিকে এবং সুনীতিসমূহকে যে নিজের দুর্ব্বলতা বলিয়া জানাইতে যায়, তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিবে।

চেষ্টার কীল্ড।

পুরস্কার—আমার মাথার উপর দিয়া পাখী উড়িয়া যাওয়া আমি বন্ধ করিতে পারি না; কিন্তু আমার টুপির নীচে তাহাদের বাসা বাঁধা বন্ধ করিতে পারি।

লুথার।

চরিত্র—বন্দরে বিপদপ্রদীপসমূহের (Beacon lights) দ্বারা অল্পসংখ্যক ইন্ধনের সাহায্যে বৃহৎ আলো জ্বালাইয়া যেমন সাগরগামী জাহাজ প্রভৃতিকে বিশেষ সাহায্য করা যায়, সেইরূপ সমুজ্জ্বল চরিত্রবান মানব ঝঞ্ঝাবিক্ষিপ্ত নগরে নিজে অল্প যাহা কিছুতে সন্তুষ্ট থাকিয়া তাঁহার সনাগরিকগণের অনেক মঙ্গল সাধন করেন।

এপিক্‌টেটস্।

সন্তোষ—যাহার চিত্তে সন্তোষ রাজত্ব করে, তাহার চিত্ত যাহা কিছু মহান ও মঙ্গল, সকলেরই উৎস হইয়া উঠে। শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম যাহা কিছু জগতে সংঘটিত হয়, তাহা এই প্রকার সন্তোষময় চিত্ত হইতেই প্রসূত হইয়াছে। যাহাদের আত্মা ছোটখাটো বিষয় লইয়া থাকে ও নিরানন্দের মধ্যে গুমরিয়া মরে; যাহাদের আত্মা কেবলই অতীতের জন্যই হাহুতাশ করিতে থাকে এবং ভবিষ্যৎকে ভীতির চক্ষে দেখে, তাহারা জীবনের পবিত্রতম মুহূর্ত্ত ধরিতে সক্ষম হয় না। শিলার।

পিতা-পুত্র—পিতা পুত্রের শরীরের ন্যায় মনেরও উপর আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় দেখি যে, পিতারা পুত্রগণের "কেবলং জন্মহেতবঃ"। এমার্সন।

অলঙ্কারপ্রয়োগ—অনেকে তাঁহাদের উপদেশ ও গভীর ভাবপূর্ণ বক্তৃতাদিতে একরাশ অলঙ্কার প্রয়োগ করেন। সুবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে নীল লাল প্রভৃতি বর্ণের ফুল ফুটিতে দেখা যায়। ঐ প্রকার অলঙ্কারের সঙ্গে এই সকল ফুলের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। যাহারা কেবলমাত্র দৃষ্টিসুখের জন্য আসে তাহাদের নিকট ঐ সমস্ত সুদৃশ্য ফুলগুলি আনন্দদায়ক বটে, কিন্তু শস্য হইতে যাহারা লাভের আশা করে, তাহাদের পক্ষে ঐ সকল ফুল বরঞ্চ ক্ষতিজনক।

পোপ।

অন্যায় ঔৎসুক্য—যে ব্যক্তি অন্যায় ঔৎসুক্যবশত এ-লোক সে-লোকের কাজ কর্ম্ম দেখিতে থাকে, তাহাকে ঐ অন্যায় ঔৎসুক্যের জন্য সময়ে আঘাত পাইতে হইবে। মৌচাকের কাছে দাঁড়াইয়া যদি কেহ মৌমাছির কাজকর্ম্ম দেখিয়া বৃথা ঔৎসুক্য নিবারণ করিতে চাহিবে, তাহাকে সময়ে মৌমাছির দংশনজ্বালা সহ্য করিতে হইবে। পোপ।

প্রকৃতিসন্দর্শন—গ্রীষ্মের শেষে যখন বসন্ত বায়ুর মৃদুমধুর হিল্লোল তাহার শান্তিপূর্ণ স্পর্শে জগৎকে শীতল করে, এবং স্বর্গ ও মর্ত্তকে এক অখণ্ড আনন্দধারায় অভিষিক্ত করে, তখন ঘরের বাহিরে গিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ না করা এবং সেই আনন্দের অংশ লাভের চেষ্টা না করা প্রকৃতির বিরুদ্ধে অপরাধ এবং চিত্তের ক্ষুদ্রতার পরিচায়ক। মিলটন্।

প্রশংসা ও নিন্দা—প্রশংসা করিতে শিক্ষা করা বড়ই ভাল। ক্রমাগত ঊর্দ্ধমুখে দেখিতে থাকিলে আমাদের মনও ঊর্দ্ধমুখে বর্দ্ধিত হইবে। অপরের প্রতি ঘৃণা করা ও অপরকে নিন্দা করা ক্রমাগত অভ্যাস করিলে মানুষ যেমন তাহার নিন্দা ও ঘৃণার বস্তুর সঙ্গে সমান স্তরে নামিতে বাধ্য, সেইরূপ উহার বিপরীতে অন্যের ভাল দেখিয়া প্রশংসা করা ও শ্রদ্ধা করা অভ্যাস করিলে স্বভাবতই আমরা আমাদের প্রশংসা ও শ্রদ্ধার বস্তুর কিছু না কিছু ভাগ পাইব নিঃসন্দেহ।

ডাঃ আর্ণল্ড।

উপহাসে উপেক্ষা—উপহাসের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইতে পারা একটা পরম আশীর্ব্বাদ। এই উদাসীনতার অর্থ এই যে, আমরা ভালরূপই জানি যে, আমাদের ভিতরে মহান্ ও উৎকৃষ্ট যাহা কিছু আছে, তাহা মূর্খ ব্যতীত অন্যের নিকটে উপহাসের বস্তু নহে, সুতরাং যদি মূর্খেরা উপহাসের হাসি হাসে, জ্ঞানী লোকেরা তাহাদিগকে হাসিতে দিয়া ভালই করেন।

ডাঃ আর্ণল্ড।

আশা—আশা বৈতরণী নদী—আশাই দুঃখসাগর পার করিবার নদী। প্রবচন।

পরিবর্ত্তনের আশা ব্যতীত কেহই সুখী হয় না।

ডাঃ জনসন।

"যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তর মাঝে,
বর্জ্জিল ভয়, অর্জ্জিল জয়, সার্থক হ'ল কাজে।
দিন আগত ঐ,—ভারত তবু কই?
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ কঠিন ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদ-ভার হান অশনিপাতে,
ছায়া-ভয় চকিত মূঢ় করহ পরিত্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে।"

রবীন্দ্রনাথ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

উপনিষদ বলিয়াছেন—

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥ কঠ।

শুনিবার উপায় অভাবে অনেকে ব্রহ্মনাম করিতে পারে না, শুনিয়াও অনেকে জানিতে পারে না। ব্রহ্মের বিষয়ে সুবক্তা অতিশয় দুর্লভ, সম্যক্‌ভাবে তাঁহাকে জানিয়াছেন এমন জ্ঞাতাও বিরল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিপুণভাবে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা হইয়াছিলেন।

সহস্র সহস্র ব্যক্তি সাংসারিক মোহ ও ইন্দ্রিয়লালসায় মুগ্ধ, সকলের চিত্তই নিম্নগামী। অলীক ও নশ্বরেই সকলে বিমোহিত। জন্মমৃত্যুর প্রবাহে সমস্ত মানবই যাওয়া আসা করিতেছে। ইহা হইতে বাহির হইবার কাহারও সাধ্য নাই চেষ্টাও নাই। যিনি আপনার শক্তি পবিত্রতা ও একনিষ্ঠা দ্বারা জন্মমৃত্যুর প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া অনন্ত জ্ঞান ও শাশ্বতী শান্তির অধিকারী হন, তিনিই মহাপুরুষ।

এই জগতের রূপরসে সকলেই মুগ্ধ, কিন্তু ইহার উৎপত্তি ও পরিণতি সাধারণ মানবের নিকট অবিদিত। যিনি এই বিশ্বের অনির্ব্বচনীয় পরম কারণকে আপনার তপস্যাবলে দর্শন করিয়া করামলকবৎ সর্ব্বদাই উপভোগ করিতেছেন, তিনিই মহর্ষি।

পরম পূজ্যপাদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যখন সাধকদিগের নিকটে "মহর্ষি" নামে অভিহিত হন, তাহার বহু পূর্ব্বেই তিনি "মহর্ষিত্ব" লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহারা দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন প্রথম যৌবনেই তিনি অন্তরে বাহিরে পরম সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ঋষি শব্দের অর্থ দ্রষ্টা অর্থাৎ পরম সত্যের দর্শনকারী। দেবেন্দ্রনাথ যৌবনেই এই উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়া এদেশে আর্য্যধর্ম্মের মাহমাময় আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি যখন "মহর্ষি" উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন, সে সময় শাস্ত্রে যাঁহাকে মহর্ষিত্ব বলিয়াছে তাহার উন্নততর অবস্থায় তিনি উঠিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথের "মহর্ষি" উপাধি তাঁহার মহত্ত্বকে সম্যক প্রকাশ করিতে পারে না।

একবার কোনও এক সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত ব্যক্তি মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে কি "মহর্ষি" বলা যায়?" উত্তরে গোস্বামীজি বলেন "মহর্ষি বলিলে তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান করা হইল না, তাঁহাকে মহা"মহর্ষি" বলাই শোভনীয়।"

সংস্কৃতে উক্ত হইয়াছে "গুণী গুণং বেত্তি" মহাপুরুষ না হইলে কেহ মহাপুরুষদের ভাব জানিতে পারেন না, একথা বর্ণে বর্ণে সত্য। যিনি স্বয়ং ধ্যানসিদ্ধ ও পরম সত্যের দ্রষ্টা তিনিই ধ্যানসিদ্ধ মহর্ষির মহত্ত্ব সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শুনিয়াছি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মহর্ষিকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন "তুমি কলিযুগের জনক, জনকের মতন তুমিও সংসারে থেকেও ঈশ্বরে ডুবে আছ।" রামকৃষ্ণদেব স্বয়ং সত্যদ্রষ্টা আত্মজয়ী মহাপুরুষ। তিনি যে মহর্ষির ন্যায় মহাত্মাকে চিনিতে পারিবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

মহর্ষি মহত্ত্বের কোন্ উচ্চতম অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গে অবস্থান করিতেন তাহা নির্ণয় করা আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে একান্ত দুঃসাধ্য। তবে তাঁহার মহান জীবনের অনুধ্যানে চিত্তে পবিত্রভাব জাগ্রত হইয়া উঠে, এইজন্যই আমার এই তুচ্ছ প্রয়াস। নতুবা অনন্ত আকাশকে ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ রাখা অথবা বিশাল সমুদ্রের অগাধ জলরাশি মৃত্তিকাভাণ্ডে রুদ্ধ করিবার চেষ্টা নিতান্ত অসম্ভব।

প্রথমেই মনে পড়ে তাঁহার অপূর্ব্ব সত্যনিষ্ঠার কথা; যাহার সম্বন্ধে কবি কণ্ঠে গাহিয়াছেন—

"সত্যনিষ্ঠ ঋষি দেবেন্দ্র সত্যযুগের জাগায় স্মৃতি"।

মহর্ষির যখন পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল তখন পিতার বিষম ঋণভারে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেও অসত্যের পথ গ্রহণ করেন নাই। অশেষ ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া কিরূপে তিনি দারিদ্র্যের কঠোর মূর্ত্তিকে বরণ করিয়াছিলেন তাহা পড়িতে পড়িতে মনে একসঙ্গে শ্রদ্ধা ও বিস্ময় জাগাইয়া দেয়া তাঁহার আত্মার উদ্দেশে মস্তককে ভক্তিনত করিয়া দেয়। সত্যের জন্য ধর্ম্মের জন্য তিনি সমস্ত বিষয় মহাজনদের হাতে তুলিয়া দরিদ্রজীবন গ্রহণ করিলেন। শুধু তাহাই নয়, সম্ভব হইবামাত্র কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার পিতার প্রতিশ্রুত দান একলক্ষ টাকা সুদ সমেত পরিশোধ করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তিনি এই টাকা না দিলেও কেহ তাঁহাকে নিন্দা করিতেন না। তবে মহর্ষি ইহা করিলেন কেন? ইহার মূলে ছিল তাঁহার প্রকৃতিগত সত্যনিষ্ঠা। 'পিতা যখন প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন তখন অবশ্যই দান করিব, নতুবা ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইব।' এই ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াই তিনি এমন কার্য্য করিয়াছিলেন।

"সত্য" এই কথাটি শুনিলে মহর্ষির সমগ্র শরীরে একটি পবিত্র আনন্দের প্রবাহ বহিয়া যাইত। তাঁহার

দেহের রক্ত দ্রুত বহিয়া তাঁহার সৌম্য মুখ উজ্জ্বল ও রক্তিম করিয়া দিত, মাথার কেশগুলি কদম কেশরের ন্যায় ঋজু হইয়া উঠিত। এই সত্যনিষ্ঠাই তাঁহার বরেণ্য জীবনের ভিত্তি। তিনি শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা বুঝিয়াছিলেন—

"নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ॥"

ব্রহ্মকে কেহ ঊর্দ্ধে নিম্নে মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। যাঁহার নাম মহদ্‌যশ তাঁহার কোনও প্রতিমা নাই।

যখন তাঁহার অন্তরে উপনিষদের এই সত্য প্রত্যক্ষ হইল তখন বুঝিলেন পৌত্তলিকতা অলীক মিথ্যা ও ভ্রান্ত মতবাদ। মূর্ত্তিপূজা কখনই আর্য্যধর্ম্মের অঙ্গীভূত নয়। মূর্ত্তিপূজা শুধু ভ্রান্তির পরিপোষক। মন্দির মসজিদ কোথাও ঈশ্বর আবদ্ধ নহেন। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, বিশ্বে ওতপ্রোত। তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ, তাঁহার মহিমা সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। "যিনি আপনার মধ্যে সেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন, তাঁহারই শান্তি হয় অন্য কাহারও নয়।"*

পিতৃশ্রাদ্ধ সময়ে দেবেন্দ্রনাথ কিছুতেই শালগ্রামপূজা ও অন্যান্য পৌত্তলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন না। ইহাতে তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবর্গ সকলেই তাঁহাকে বর্জ্জন করিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ আপনার সত্যনিষ্ঠায় অবিচল ছিলেন বলিয়া অন্তরে নির্ম্মল আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলেন। এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি এক অপূর্ব্ব শান্তি লাভ করিলেন। তিনি লিখিয়াছেন "সকলে আমাকে ত্যাগ করিলেন কিন্তু তিনি (ঈশ্বর) আমাকে অধিকতর গ্রহণ করিলেন।"

এই সত্যনিষ্ঠার পরিচয় মহর্ষির জীবনচরিতের ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায়। সংক্ষেপে তাহা বলা একান্ত অসম্ভব।

মহর্ষির ধর্ম্মজীবনের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে তাঁহার গেরুয়া প্রভৃতি "ভেক" গ্রহণের প্রতি বিরক্তি। উপবাস, বিশেষ বিশেষ নদীতে স্নান, মন্দিরে গমন প্রভৃতিতে মহর্ষির শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি সন্ন্যাসবাদ অবতারবাদ গুরুবাদ প্রভৃতি অস্বাভাবিক ধর্ম্মমত আদৌ পছন্দ করিতেন না।

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত "যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু। যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥" এই মতই মহর্ষি ধর্ম্মসাধনের পক্ষে অনুকূল বিবেচনা করিতেন এবং এইভাবে ধর্ম্মসাধনা করিয়া তিনি ধর্ম্মজীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছিলেন।

উপনিষদের আদর্শেই মহর্ষির ধর্ম্মজীবন গঠিত হইয়াছিল। সত্য কথা বলিতে কি, উপনিষদের বরেণ্য ঋষিবৃন্দের আদর্শ এযুগে একমাত্র তাঁহাতেই পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় ঋষিদিগের ব্রহ্মবাদের অনির্ব্বচনীয় নিগূঢ় তত্ত্বই তাঁহার জীবনে সম্যকভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। মহর্ষির ব্রহ্মবাদ সম্পূর্ণ যুক্তিমূলক গভীর বিরাট ও সর্ব্বতোভাবে আত্মার মুক্তিবিধায়ক।

মহর্ষির ধর্ম্মজীবন ধর্ম্মজগতে এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছে। উপাসনা বলিতে তিনি বুঝিতেন "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" ব্রহ্মকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনই তাঁহার উপাসনা। ভক্তি বলিতে তিনি বুঝিতেন "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" ঈশ্বরে শ্রেষ্ঠ অনুরাগই ভক্তি। সমস্ত চিত্ত ঈশ্বরচিন্তায় সমাহিত হইয়া ধীরে ধীরে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে আত্মাকে উপনীত করিয়া নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপশিখার ন্যায় যখন অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ডুবিয়া পূর্ণ শান্তভাব লাভ করে, তাহাই মহর্ষির উপাসনার লক্ষ্য ছিল। "শান্তমুপাসীত" শান্ত হইয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে, ইহাই ছিল মহর্ষির সাধনা ও শিক্ষা। মহর্ষি একদিকে যেমন ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, অপরদিকে আবার জ্ঞানের সাধনা হইতেও বিরত হন নাই। জ্ঞানের অনুশীলনে তিনি দেহান্তকাল পর্য্যন্ত নিমগ্ন ছিলেন। তিনি অহংব্রহ্মবাদ অথবা সর্ব্বব্রহ্মবাদ (pantheism) সমর্থন করিতেন না।

ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা সংযম ও পবিত্রতাসহায়ে নিত্য নিত্য নূতন আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করিয়া অনন্তজ্ঞান অশেষ পবিত্রতা অপার আনন্দ ও চিরন্তনী শান্তিতে অবস্থান করাই মহর্ষির ধর্ম্মজীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল। আত্মার অনন্ত উন্নতিই মহর্ষির নিকট ঈপ্সিত ছিল।

মহর্ষির ধর্ম্মজীবনের গভীরতা নির্ণয় করা অসাধ্য। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের কথা যতই বলি, ততই ফুরাইতে চায় না। একটী কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, সংসারের শত প্রকার চঞ্চলতা শোকদুঃখ বৈষয়িক ব্যাপারের মধ্যেও যে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত মহর্ষিদেব। যে ভাবে তিনি ঈশ্বরের দিকে ছুটিয়াছিলেন তাহা একান্ত স্বাভাবিক। পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ একস্থানে লিখিয়াছেন * তাঁহার "পিতার (মহর্ষিদেবের) আধ্যাত্মিকতা খালকাটার ন্যায় ছিল না পরন্তু নদীর ন্যায় স্বতঃনিসৃতা ও বেগবতী ছিল।" বুদ্ধিবিচারের দ্বারা একটা মনগড়া (fantastic) ধর্ম্মমত মহর্ষি খাড়া করেন নাই। পরন্তু তাঁহার তপস্যালব্ধ অনুভূতির মধ্যে সত্যের

* তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শাশ্বতী শান্তিঃ নেতরেষাম্"।

* ১৩২৬ প্রবাসী "শিবনাথ শাস্ত্রী" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

যে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার ধর্ম্মজীবনে প্রেরণা দান করিয়াছিল। যদিও বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ধর্ম্মশাস্ত্র কাব্য প্রভৃতির উপর তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল, যদিও তিনি স্বয়ং একজন অসাধারণ মনীষী ছিলেন, তবুও শুধু বুদ্ধিকে ভিত্তি করিয়া তিনি ধর্ম্মাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। ইহা ছিল তাঁহার সিদ্ধ জীবনের আধ্যাত্মিক সত্যের উপর অবস্থিত।

মহর্ষির আধ্যাত্মিক প্রভাব কতখানি ফলপ্রসূ ছিল তাহার পরিচয় শুধু তাঁহার ব্রহ্মজ্যোতি-উদ্ভাসিত ভাবমুগ্ধ সুন্দর মুখখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বোঝা যাইত। তাঁহার পবিত্র মুখ দেখিয়া অনেক নাস্তিকও ঈশ্বরপ্রেমিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। যিনিই তাঁহাকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখিয়াছেন, তিনি তাঁহার সে মূর্ত্তি কখনও ভোলেন নাই। যে সমস্ত ভাগ্যবান তাঁহাকে দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন "মহর্ষি-দর্শনে মনের নীচভাব দূর হইয়া উহা পবিত্রভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিত।" ইহাই তাঁহার মহত্ত্বের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

একাধিকশততম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

নব শতাব্দীর প্রথম মাঘোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গেল। যে মাঘোৎসবে দেবতারাও মঙ্গলশঙ্খ নিনাদিত করেন, যে মাঘোৎসবে দেবমানব একহৃদয়ে পরব্রহ্মের জয়কীর্ত্তনে উদ্যত হয়েন, যে মাঘোৎসবে প্রতিবারই একএকটী অভিনব প্রেরণা—নবীন উদ্যম আমাদের প্রসুপ্ত অন্তরাত্মার মাঝে জাগৃতি আনয়ন করে, কোন্ ভাষায় তাহার বিবৃতি প্রদান করিব? প্রতি উপাসনায় উপদেশে ও উদ্বোধনে ভক্তজনগণের আত্মায় আত্মায় যে আনন্দরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কোন মানবীয় ভাষায় কি তাহার অভিব্যক্তি সম্ভব? উৎসব যখন আমাদের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া তাহার বিজয়শঙ্খ নিনাদিত করিল, তখনও আমরা প্রস্তুত হইতে পারি নাই—কল্পনাও করিতে পারি নাই যে, এবারকার উৎসব এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে। এবার সমাজের সেবক ও কর্ম্মীগণ প্রায় সকলেই অসুস্থ থাকায় উৎসবের আয়োজন-আড়ম্বরে আমাদের শক্তি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, আমরা উহার সাফল্যে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছিলাম; কিন্তু উৎসবদেবতার কি অহেতুকী কৃপা! তিনি স্বয়ং তাঁহার উৎসবতরণীর কর্ণধার হইয়া উহাকে পরিপূর্ণ সফলতার মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিলেন, আমাদের অবসন্ন চিত্তকে তাঁহার প্রেমরসধারায় সিক্তিত করিয়া সরস করিয়া তুলিলেন। উৎসবদেবতার এই অহেতুকী কৃপালাভ এবার নবশতাব্দীর এই প্রথম মাঘোৎসবের বিশেষ দান।

এবার একেশ্বরবাদী বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত সম্মিলিতভাবে উৎসবআয়োজন হইয়াছিল। তাই উৎসবক্ষেত্রে এবার আর্য্যসমাজও আহূত হইয়াছিলেন। সপ্তাহব্যাপী উৎসবআয়োজন যেন সপ্তদল পদ্মের মত ভগবানের প্রেমকিরণপাতে আপনিই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল।

গত ৪ঠা মাঘ রবিবার আদিব্রাহ্মসমাজের মাসিক উপাসনার দিন থাকায় উহাই একাধিকশততম মাঘোৎসবের উদ্বোধন দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হয়। প্রাতে ৮ ঘটিকায় শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় শ্রীমান ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া বেদীগ্রহণ করেন। চিন্তামণি বাবু তাঁহার স্বভাবসুগম্ভীরকণ্ঠে সমবেত উপাসকবর্গকে উদ্বোধিত করেন। আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত থাকিতে বাধ্য হওয়ায় তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান ক্ষেমেন্দ্রনাথ পিতার অগ্নিময়ী বোধন-বাণী ধীরে ধীরে শান্তকণ্ঠে পাঠ করিয়া জ্বলদক্ষরে উপাসকগণের অন্তরে উহা আঁকিয়া দেন। এই বাণী "নব শতাব্দীর প্রথম উদ্বোধন" নামে মুদ্রিত হইয়া সভাস্থলে বিতরিত হইয়াছিল। সভাস্থলে পঠিত না হইলেও ঐ পুস্তিকার সহিত ক্ষিতীন্দ্রনাথের "আদিব্রাহ্মসমাজের অভাব ও দাবী" নামে স্বতন্ত্র একটী প্রবন্ধ মুদ্রিত ছিল। এই উভয় প্রবন্ধই আমরা পত্রিকার গত সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি।

৬ই মাঘ মঙ্গলবার শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিরোভাব উপলক্ষে এবারে আদিব্রাহ্মসমাজে একটী বিশেষ সান্ধ্য উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল। এদিনে বেদীগ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ। পণ্ডিত সুরেশচন্দ্রের উদ্বোধনান্তে চিন্তামণি বাবু অতি সুন্দরভাবে শ্রীমন্মহর্ষিজীবনের বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিয়া উপদেশ প্রদান করেন। অদ্য উপাসনাগৃহে আশাতীতরূপ জনসমাগম হইয়াছিল।

৭ই মাঘ বুধবার সাপ্তাহিক উপাসনার দিবস। এদিনে বেদীগ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ। পণ্ডিত সুরেশচন্দ্রের উদ্বোধনান্তে আমাদের যুবক বন্ধু শ্রীমান হেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ মহাশয় তাঁহার স্বভাব-

সুললিত মধুর তাঁহার "মাঘোৎসবের দান" বিষয়ে একটী সুন্দর নিবন্ধ পাঠ করেন। হেমেন্দ্রবিজয়ের এই নিবন্ধ পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। সর্ব্বশেষে আচার্য্য চিন্তামণির একটী সংক্ষিপ্ত প্রার্থনান্তে উপাসনা সাঙ্গ হয়।

৮ই মাঘ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় বেদীগ্রহণ করিয়াছিলেন পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থকে সঙ্গে লইয়া শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র। প্রবীণ আচার্য্য কৃষ্ণকুমার তাঁহার স্বভাব-সুগম্ভীরকণ্ঠে উদ্বোধন ও "ব্রহ্মদর্শন"-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

৯ই মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় হিন্দীতে ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এদিনের সাফল্যদৃষ্টে অনুমান হয়, আদিব্রাহ্মসমাজের চতুষ্পার্শ্বে অধুনা যেরূপ হিন্দীভাষী জনসমাজের বসতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এখানে মাঝে মাঝে এইজাতীয় অনুষ্ঠানের বিশেষ সার্থকতা আছে। আর্য্যসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অযোধ্যাপ্রসাদ এদিন বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার উদ্বোধন ও "ব্রহ্মোপাসনা" বিষয়ক উপদেশ এমনি হৃদয়গ্রাহী ও সুবোধ্য হইয়াছিল যে, সমবেত বাঙ্গালী উপাসকগণেরও তৃপ্তিবিধান করিয়াছিল। এদিনে সঙ্গীতও হিন্দীতেই হইয়াছিল এবং উহার ভার লইয়াছিলেন আর্য্যসমাজের সঙ্গীতাচার্য্যগণ।

১০ই মাঘ শনিবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় ইংরাজীতে ব্রহ্মোপাসনার আয়োজন হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের সহযোগিতায় বেদীগ্রহণ করিয়াছিলেন স্বামী সদানন্দ। ইনি ইংরাজীভাষায় যে উদ্বোধন ও উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, উহা পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল এবং সভাস্থলে উহা পুস্তিকাকারে বিতরিত হইয়াছিল।

অবশেষে ১১ই মাঘের সেই পুণ্যময়ী উষা দেখা দিল। পূর্ব্বগগনে রঙ্গিন আভায় যেন দেবতার হর্ষ ফুটিয়া উঠিল। সুপ্রাচীন উপাসনালয় আজ পত্রে পুষ্পে ও প্রভাতের আলোয় একটী অভিনব শান্ত-শ্রী ধারণ করিয়াছে। বেলা ৮ ঘটিকায় উপাসনাগৃহটী ধীরে ধীরে উপাসকগণে পূর্ণ হইয়া আসিলে শঙ্খঘণ্টার মঙ্গল নিনাদে উপাসনার পুণ্য আহ্বান ভক্তজনগণের অন্তরে অন্তরে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। তখন সমবেতকণ্ঠে বেদগান উত্থিত হইল—"অসতো মা সদ্গময়"। শ্রীমান ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদীগ্রহণ করিলে আমাদের যুবক বন্ধু শ্রীমান হেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ মহাশয় বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া "মানবজীবনে ব্রহ্মোপাসনা" বিষয়ে একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ তাঁহার কবিত্বময় ভাষায় ও সুললিতকণ্ঠে পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধটী পত্রিকার আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গম্ভীরকণ্ঠে দুইটী সঙ্গীত করিলে পর প্রবীণ আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথের ১১ই মাঘের আগমনী বোধন-বাণী তাঁহার পুত্র শ্রীমান ক্ষেমেন্দ্রনাথ সুগম্ভীরকণ্ঠে পাঠ করিয়া সমবেত উপাসকগণের অন্তরাত্মাকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিলেন। অতঃপর স্বাধ্যায়ান্তে দুইটী গীত হইলে পর আচার্য্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ "জাগরণী বাণী" পাঠ করিলেন। এই উদ্বোধন ও উপদেশ পুস্তিকাকারে পৃথক পৃথক মুদ্রিত হইয়া সভাস্থলে বিতরিত হইয়াছিল এবং পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায়ও প্রকাশিত হইল। উপদেশান্তে তিনটী সঙ্গীত হইয়া সকলের অন্তরকে ভক্তিরসে সিক্ত করিয়া তৃপ্ত করিয়াছিল।

এবার আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্য্য সুগায়ক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানতঃ সঙ্গীতের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সত্র ভৃক শ্রীমান ফকীরচন্দ্র নাথ দিবসত্রয় সঙ্গীতের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। শ্রীবচ্চন মিশ্র সঙ্গীতগুলির সঙ্গে সঙ্গে এসরাজ বাজাইয়া শ্রোতাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। উৎসবে যে সব নূতন সঙ্গীত গীত হইয়াছিল, উহা স্থানান্তরে "নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত" নামে প্রকাশিত হইল।

যাঁহাদের আনুকূল্যে ও সহযোগিতায় এবারকার উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে, তাঁহাদের সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। সর্ব্বশেষে যাঁহার আশীর্ব্বাদে এবারকার উৎসব সাফল্যলাভ করিয়াছে, তাঁহার চরণে ভক্তিপূর্ণ নমস্কার করি।

গার্হস্থ্য সংবাদ।

জাতকর্ম্ম।—গত ১৪ই মাঘ বুধবার পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী ডাক্তার শ্রীমান শচীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নব কুমারীর জাতকর্ম্ম ক্ষিতীন্দ্রভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথপ্রবর্ত্তিত পদ্ধতি অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভগবান নব কুমারীকে নিত্য আশিষ প্রদানে ও বর্দ্ধিত করিয়া তুলুন।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নবপ্রকাশিত গ্রন্থ

[illegible]

(গানের বহি)

(সঙ্গীত-ভারতী শ্রীবাণী দেবী Mus. Doc. Ind., কর্ত্তৃক স্বরলিপি [illegible])

রয়াল ৪ পেজী ৮০+১১৬ পৃষ্ঠা ; ছাপা ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট ; গ্রন্থের [illegible] চিত্র সম্বলিত।

এই গ্রন্থে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের রচিত ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা সর্ব্ববিধ উচ্চাঙ্গের ৫০খানি বাছা বাছা গান দেওয়া হইয়াছে। সেই সকল গান বিশুদ্ধ রীতি অনুযায়ী তান ও লয় সমন্বিত। গানগুলি তান ও লয় সহকারে স্বরলিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গানগুলির ভাব যেমন সুন্দর, সুরও তেমনি মনোহর। গানগুলিতে রাগরাগিণী ও তাল-লয়ের শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধতা রক্ষিত হওয়ায় সঙ্গীতরসজ্ঞমাত্রেরই বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। পুস্তকখানি প্রত্যেক সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তির হাতের নিকটে রাখিবার যোগ্য। সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগ হইতে যে প্রণালীতে বিদ্যালয়ে সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গানগুলি নির্ব্বাচিত হইয়াছে এবং সেই কারণে গ্রন্থখানি আবালবৃদ্ধ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সকলেরই উপযোগী হইয়াছে। ইহাতে প্রাভাতিক ও সান্ধ্য ৩৩টী বিভিন্ন রাগ ও রাগিণী এবং ১৮টী বিভিন্ন তালের গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য অতি সুলভ ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫।১ বি, বারাণসী ঘোষের সেকেণ্ড লেন, পোষ্ট বড়বাজার, কলিকাতা এবং মেসার্স ডোয়ার্কিন এণ্ড সন, ৮ নং ডালহাউসি স্কোয়ার, এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থালয়ে (কলিকাতা) প্রাপ্তব্য।

"এই গ্রন্থে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত ৫০টি সঙ্গীত ও তাহার স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদের সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্র, "ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু" এই গ্রন্থের প্রথম সঙ্গীত। সঙ্গীতশাস্ত্র-বিদুষী শ্রীমতী বাণী দেবী কল্যাণ ঠেকা সুর-তালে ঐ মন্ত্রের বল প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং এই বেদগান সকলেই সহজে শিখিতে পারিবেন।

"বাণী দেবী স্বয়ং সুন্দর গান করিতে পারেন, সঙ্গীতবিদ্যায় তিনি পারদর্শিনী, গানের স্বরলিপি রচনায় সুনিপুণা। পিতা ভগবদ্ভাবে মগ্ন হইয়া সঙ্গীত রচনা করিতেছেন, কন্যা সুর-তালে তাহা বাঁধিতেছেন। ভারতের প্রতি গৃহে এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া মানবকুল পুণ্যালোকে পরিপূরিত হউক—'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্' নীচ আমোদপ্রমোদ বর্জ্জন করুক।"

সঞ্জীবনী—৬ই চৈত্র, ১৩৩৬।

Bandhu Amar—(My Friend.) By Kshitendra Nath Tagore, (Adi Brahmo Samaj Press, Calcutta, Re. 1/.)

This is a book of prayer. Mr. Tagore, the Minister of the Adi Brahmo Somaj, is known as a saintly man. In this book he has embodied thirty-one of his prayers to the Almighty whom he looks upon as his friend. Their beauty cannot be realized except by those who in time of distress seek relief and comfort by prayer. To them the book will be very helpful.

Statesman 9. 3 30.

KHEAL OR RANDOM THOUGHTS.—BY KSHITINDRA NATH TAGORE. (Adi Brahmo Samaj Press. Re. 1-8.]

Mr. Tagore has earned a reputation as an essayist. This Volume contains a systematic chain of thoughts about men and things that came to him during his travels on four different occasions; and the descriptions incidentally offer opportunities for the reader to make himself acquainted with the manners and customs of the well-known Tagore family of Calcutta. The most noticeable feature of the book is the author's eagerness to induce his readers to look even at the ordinary things around them in a spiritual way. The book will be welcomed by all who enjoy deep thinking. Statesman 23. 3. 30.

নূতন পুস্তক! **বন্ধু আমার!** নূতন পুস্তক।

প্র কা শি ত হ ই ল।

আরুনর আধ্যাত্মিক গদ্য-কাব্য। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে ভক্তের ভাবাত্ম সাধকের অন্তরুক আলোক সম্পাতে [illegible] আত্মসমর্পণ-যোগ বর্ণিত হইয়াছে। বিপদে যাহারা ব্যথিত, দুঃখে যাহারা জীর্ণ, এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের প্রিয় বন্ধুর [illegible] দিয়া শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করিবে। [illegible] ১৬ পেজী আকারে ১২৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ছাপা ও কাগজ ভাল, উৎকৃষ্ট নবুজ কাপড়ে [illegible] সুন্দর বাঁধাই। মূল্য ১৲ টাকা। ডাঃ মাশুল ৷৴ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—[illegible] ১৪, আপার চিৎপুর রোড [illegible] কলিকাতা।

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C 462

একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দ্বাবিংশ কল্প—চতুর্থ ভাগ

সংখ্যা ১০৫১ — ১৮৫২ শক ফাল্গুন

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৮তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৶০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে শ্রীরণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৮তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০১। সাল ১৩৩৭। শক ১৮৫২। খৃঃ ১৯৩১। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩১।

উদ্বোধন।

(শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ)

সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—"এমন মানবজমিন রইল পড়ে, আবাদ করলে ফলতো সোনা"। বড়ই সত্য কথা তিনি বলিয়াছেন। আমরা কত কিছুর চাষ-আবাদ করিয়া চলিয়াছি। কিন্তু সকল চাষের মূল যে মানব-জমিনের চাষ, মনকে সরস ও সজীব করিবার চাষ, সে-দিকে আমরা কোনই লক্ষ্য রাখি না, দৃষ্টি দিই না। মন মরিয়া থাকিলে কোন কিছুরই চাষ ভালরকম চলিতেই পারিবে না, অথচ সেই মনই অকর্ষিত থাকিয়া যায়—মনের চাষের দিকে কিছুমাত্র মনোযোগ দিই না। মনে করি, সেই অকর্ষিত মনের ক্ষেত্রে কতই সুগন্ধ ফুলের গাছ, কতই সুস্বাদ ফলের গাছ আপনা হইতেই জন্মিবে; কিন্তু ফলে দেখি যে তেমন উর্ব্বরক্ষেত্র কাঁটা গাছে এবং গন্ধহীন ফুলের গাছে—বিস্বাদ ও বিষাক্ত ফলের গাছে ভরিয়া গিয়াছে। মিথ্যা জ্ঞান ও মিথ্যা প্রীতি হৃদয়ের সমস্ত মঙ্গলরস চুষিয়া লইবার কারণে হৃদয়ের সমস্ত সদ্ভাব সমস্ত সত্যজ্ঞান শুকাইয়া মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছে। সদ্ভাব ও সত্যজ্ঞানকে জাগাইয়া তুলিবার ইচ্ছা আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। কিন্তু মিথ্যা যাহা কিছু, সমস্তই আমাদের হৃদয়কে ঘিরিয়া রাখাতে আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছি—সত্যকে জাগাইয়া তুলিবার ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিবার কোনই অবসর হইতেছে না।

সত্যের বীজসংগ্রহে আমরা নিয়তই নিরত রহিয়াছি—সে বিষয়ে আমরা কিছুমাত্র বিরত হই নাই। পৃথিবীর যেখানে যাহা কিছু ভাল উপদেশ পাই, আমরা দুহাতে তাহা সাগ্রহে সংগ্রহ করি। উপাসনায়, উপদেশে, সাধু-দিগের জীবনে, স্বাধ্যায়ে, যখন যেখানে যাহা কিছু ভাল পাই তাহাই সযত্নে সংগ্রহ করি এবং মনের উপরে তাহা ছড়াইয়া দিই। কিন্তু সেই বীজগুলি সেই অকর্ষিত মনের ক্ষেত্রের উপরেই থাকিয়া যায়, তাহার নিম্নে বসিতে চায় না। সুতরাং আমরা সেগুলি হইতে একটা অঙ্কুরও উদ্গত হইতে দেখি না। হিংসা, দ্বেষ ও স্বার্থপরতার এবং সংশয় ও অবিশ্বাসের শতসহস্র কণ্টকবৃক্ষে মন যে ভরিয়া গিয়াছে—চাষের অভাবে মন নিতান্ত ঊষর হইয়া উঠিতেছে। তখন কে ইহাকে পরিষ্কৃত করিবে? কে এই কণ্টকবৃক্ষসকল, কে এই বিষাক্ত বিস্বাদ ফলের বৃক্ষসকল এই সরসক্ষেত্র হইতে উৎপাটিত করিয়া ইহাকে পুনরায় সজীব করিয়া তুলিবে, ইহাকে সত্যধর্ম্মের ও পুণ্যকর্ম্মের বীজে পরিপূর্ণ করিবে? কাহার প্রেমহস্তের সংস্পর্শ লাভ করিয়া এই মনভূমি আবার চাষের উপযুক্ত হইবে, শতবিধ সদ্ভাবের উৎস হইয়া উঠিবে?

ভগবানকে প্রাণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কর। আমাদের মনে প্রাণে তাঁহার স্নেহপ্রেমের অফুরন্ত ধারা বর্ষিত হইয়া মনকে সরস ও সজীব করিয়া তুলুক। একমাত্র ভগবানের স্নেহহস্তই আমাদের অন্তরের ঘন কণ্টকারণ্য উৎপাটিত করিবার শক্তি ধারণ করে। দ্বেষহিংসা স্বার্থপরতা

প্রভৃতির চরণে আত্মবিক্রয় করিয়া যখন মানুষ জর্জ্জরিত হইয়া উঠে, কূলকিনারা দেখিতে পায় না, তখনই সে ছুটিয়া গিয়া ভগবানের চরণে আছড়াইয়া পড়ে। ভগবান তখন তাহাকে স্নেহভরে তুলিয়া ধরেন।

দ্বেষহিংসা প্রভৃতির দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে ভগবানের চরণে ছুটিয়া গেলে চলিবে না—তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মোপাসকগণ যেভাবে আপনাদের হৃদয়মনকে সরস ও উর্ব্বর করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের কত সুন্দর ফসল ফলাইয়া গিয়াছেন, আমাদেরও সেইভাবে দৃঢ়তার সহিত নিষ্ঠার সহিত ভগবানকে নেতৃত্বপদে বরণ করিয়া মনের ক্ষেত্রে যথাযুক্ত চাষ দিতে হইবে এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মের সুন্দর ফসল ফলাইতে হইবে।

দ্বেষহিংসা স্বার্থপরতা প্রভৃতি নীচভাবের দাসত্ব পদদলিত করিয়া দাও। উত্তরবংশীয় সন্তানসন্ততির মঙ্গল ও কল্যাণ যদি প্রার্থনা কর, তবে আমাদের সকলের প্রতি ভগবানের মঙ্গল আহ্বান কর্ণে শ্রবণ কর এবং প্রাণে গ্রহণ কর। সঙ্কীর্ণ গভীর মোহ বিচূর্ণ কর, স্বার্থপরতার বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া দাও। ভূমা পরমেশ্বরের দিকে মনপ্রাণ প্রসারিত কর। কেবল নিয়মিত উপাসনা-দিনে আসিয়া নিয়মিত উপাসনা ও উপদেশ শুনিয়া চলিয়া যাইও না। প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি কার্য্যে ভগবানের সংস্পর্শ অন্তরে উপলব্ধি কর এবং তাঁহার আলোক, তাঁহার নিশ্বাস যাহাতে অন্তরে প্রবেশ করিয়া অন্তরকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করিয়া তুলিতে পারে, তাহার জন্য হৃদয়দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া দাও, হৃদয়মনকে উদার করিয়া তোল। যাহার দুঃখ অশ্রুধারায় বিগলিত হইবে, তাহাকেই ভাই বলিয়া প্রাণের ভিতর বরণ করিয়া লও। ভগবৎপ্রদত্ত মানবজন্ম সার্থক হইয়া গড়িয়া উঠুক।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৩১। মায়ে-পোয়ে।

মা! আমা হইতে আর তুমি লুকাইয়া থাকিও না; তোমার আর আমার মাঝে কোন অন্তরাল থাকিতে দিও না। তুমি মা আর আমি সন্তান—এই ভাবটাই আমাকে যে কোন্ রসে ডুবাইয়া রাখে, তাহা আমি বুঝিতেই পারি না। যখনই ইহা ভাবি, তখনই সকল ইচ্ছা দূর হইয়া কেবল একই ইচ্ছা হয় যে তোমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তোমাকে আমি আদর করি, আর তুমিও আমাকে আদর কর। মা! তোমাকে পাইবার জন্য যদি সংসার ভুলিতে হয়, তবে তাহাও আমাকে ভুলাইয়া দাও। আমার সমস্ত আশা ভরসা তোমার ঐ চরণে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। আমার যাহা কিছু কাজকর্ম্ম, সকলের ভিতর তুমিই আছ। সকল কাজে তুমি আসিয়া প্রসন্নমুখে দাঁড়াইলে আমার কাজগুলি কেমন সহজে সুসিদ্ধ হয়। এখন বেশ বুঝিয়াছি যে, তোমায় আমায় যে সম্বন্ধ, এ সম্বন্ধ কখনও বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া—অনন্ত-অনন্ত কাল ধরিয়া তুমি আমার মা, আর আমি তোমার সন্তান। ভাবিতেও কি সুখ—কি আরাম—অনন্ত কাল-পারাবারে ভাসিয়া চলিয়াছি—সাথী কেহ নাই, সংসারের কোলাহল এতটুকু নাই—কি গভীর শান্ত নীরবতা—সঙ্গে আছ কেবল তুমি—কেবল তুমি; আর তোমার ঐ নীরব অনিমেষ মঙ্গলদৃষ্টি। মা! আমি সুস্পষ্ট দেখিতেছি, তোমার আমার মাঝে স্থানেরও যেমন ব্যবধান নাই, কালেরও তেমনি ব্যবধান নাই—যেন কোন্ এক অদৃশ্য যাদুবলে কালের সম্বন্ধ কোন্ এক অদৃশ্যের ভিতর লুকাইয়া গিয়া আমাদের উভয়কে এক করিয়া দিয়াছে। তোমার অপরূপ উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে আসিয়া আমার নয়ন ঝলসাইয়া দিও না। আমি বড়ই অবশচরণে শ্রান্তক্লান্তদেহে তোমার চরণতলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি; আমি একবিন্দু শান্তিবারির আশায় আসিয়াছি—বড় পিপাসা। আর কিছু চাহি না মা—কেবল তুমি একবার কোলে লইয়া আমায় একটুখানি শান্তিজল দিয়া আমার পিপাসার শান্তি কর। আবার সেই পূর্ব্বের মত তুমি আমার প্রাণে হাসিরাশি ছড়াইয়া দাও—সেগুলি ফুলের আকারে ফুটিয়া উঠিয়া প্রাণের ভিতর সুবাসিত করিয়া তুলুক; সমস্ত অন্ধকার হৃদয় হইতে কাটিয়া যাউক। তুমি আমার প্রাণে আসিয়া অধিষ্ঠিত হও, আমার প্রাণে যত কিছু ভাল গান আছে সমস্তই বাজিয়া উঠুক।

৬০। শিশু।

মা! তুমি যে কেমন করিয়া আমাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছ তাহা আমি বেশ জানি। কবে যে আমি তোমার কোলে জন্ম লইয়াছি তাহা জানিনা। কিন্তু ইহা বেশ মনে পড়ে যে জন্ম অবধিই প্রাণ ভরিয়া তোমাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছি আর আমার কচি কচি হাতে তোমাকে জড়াইয়া আদর করিয়া প্রাণভরা আনন্দ পাইয়াছি। ইহা বেশ মনে পড়ে যে, জন্ম অবধিই তুমি আমাকে তোমার স্নেহভরা স্তন্যদানে আমাকে বরিষ্ঠ বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছ। আমার খেলিবার জন্য ধরাতলে কত সোনারূপা ছড়াইয়া রাখিয়াছ, ভূধরে সাগরে কত মণিমুক্তা রাখিয়া দিয়াছ। আমাকে শিক্ষা দিবার জন্য এই পৃথিবীতে, আর সম্মুখের এই আকাশে কত জ্ঞানরত্ন নিহিত করিয়া রাখিয়াছ। আমার খেলারও শেষ নাই, শেখারও অন্ত নাই। আমি গান শিখিয়া তোমার নাম গাহিতে পারিব বলিয়া চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্র সকলের ভিতর দিয়া কত সুন্দর—কত সুমিষ্ট গান নিঃসৃত হইতেছে! আমার সারা জীবনে সে গান শিখিয়া কি শেষ করিতে পারিব? ক খ শিখিতে শিখিতেই তো জীবন শেষ হইতে চলিয়াছে। আমি এই রাশি রাশি জ্ঞান শিক্ষা করিয়া তোমার পণ্ডিতমূর্খ ছেলে হইতে চাহি না। আমি যেন মূর্খই থাকি, আর তোমার মুখের উপদেশে জন্ম জন্ম যেন ক-খই শিখিতে থাকি।

৬১। নীরবে।

মা! তোমার কাছে যাহারা আসিয়াছে, আসিয়া আদর পাইতেছে, তাহারা আগে চলিয়া যাক। আমি সকলের পিছনে থাকিব। সকলে চলিয়া যাইবার পর নীরবে নির্জ্জনে তুমি আমাকে কোলে তুলিয়া আদর করিও। তখন আমাকে কোলে শোয়াইয়া অনাহত সুরে গান গাহিয়া ঘুম পাড়াইও। যে গানে আমি স্বপ্নের ভিতর দিয়াও তোমারই মুখ দেখিতে পাই, সেই গান গাহিও। যে গানে আমার হৃদয়ে আনন্দের উৎস খুলিয়া যায়, তুমি সেই গান গাহিও। তোমার স্তন্যধারা পান করিব আর তোমায় আমায় সেই আনন্দ একা একা চুপি চুপি ভোগ করিব। মা! তোমাকে যে ভালবাসিতে শিখিয়াছি—এই ভালবাসার শেষ তো দেখি না—মনে হয় যেন ভালবাসিয়াই চলিয়াছি—ভালবাসিয়া যে কত কাল কাটিয়া গিয়াছে, তাহার আদিঅন্ত কিছুই যেন খুঁজিয়াই পাই না। তুমি আমার বড়ই সুন্দর। সৌন্দর্য্যে তুমি নিত্যই ঢলঢল রহিয়াছ। তোমার সকলই সুন্দর। তোমার চন্দ্রসূর্য্য সুন্দর; তোমার গ্রহতারকা সুন্দর; তোমার ঘন মেঘমালাও সুন্দর। তোমার গান সুন্দর; তোমার নীরব থাকাও সুন্দর। আমার সুখে যখন তুমি সুখ প্রকাশ কর তাহাও যেমন সুন্দর; আমার দুঃখে যখন দুঃখ পাইয়া আমার অশ্রু মুছাইয়া দাও, তাহাও তেমনি সুন্দর।

৬২। তোমাতে আমাতে।

মা! তুমি আমার পার্শ্বে নিত্যকাল থাক, আমার সমস্ত ভয় বিদূরিত হউক। আমাকে তোমার পার্শ্বে নিত্যকাল রাখ, আমার জন্য তোমার সমস্ত ভাবনা বিদূরিত হউক। তুমি গান গাও আমি তাহা শুনি। তোমার সেই গান শিখিয়া আবার আমি গাহি, তুমি তাহা শোন। তুমি আমার মস্তকে তোমার প্রীতিপূর্ণ আশীর্ব্বাদ প্রদান কর। আমি তোমার চরণে প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি। তুমি আমাকে কথা বলিতে শিখাও। আমি তোমার কথা নির্ব্বাকভাবে শুনিতে শিখি। তুমি আমার আনন্দের জন্য বিশুভ্র সুগন্ধ ফুলরাশি ফুটাইয়া তোল। আমি তোমার আনন্দের জন্য সেই ফুলগুলি তুলিয়া তোমার পূজা করি। তুমি আমার আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য জীবন দিয়াছ। আমি তোমায় আনন্দ দিবার জন্য জীবন ধরিয়া আছি। তুমি এজীবনের স্মৃতি দিয়া আমায় মুগ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছ। আমি তোমার কাছ থেকে শতসহস্র জীবনের স্মৃতি না লইয়া তোমায় নিশ্চিন্ত হইতে দিব না। তুমি মাঝে মাঝে দূরে সরিয়া গিয়া আমায় কি রকম কাঁদাও। আমি তোমার পিছনে পিছনে চলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমায় কাঁদাইব। তুমি আমায় কোলে তুলিবে, আমি তোমার কোলে উঠিব, তবে আমি ছাড়িব। তুমি আমায় শতেক স্নেহচুম্বন দিবে, আমি

তোমার স্নেহচুম্বন বারে বারে আদায় করিব, তবে ছাড়িব। তোমার সৌন্দর্য্য আমার স্পর্শ করিয়া আমাকে সুন্দর করিয়া তুলিবে। আমার সৌন্দর্য্যে তোমার মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়া উঠিবে, তবে আমি ছাড়িব। তুমি আমাকে তোমার সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিবে। আমি আমার যাহা কিছু সমস্তই তোমাকে সমর্পণ করিয়া ভোগ করিব। তুমি আমাকে তোমার বুকে ফেলিয়া ঘুম পাড়াইবে। আমি তোমার কোলে শুইয়া সুখনিদ্রার জীবন লাভ করিব।

৬৩। নিত্য জাগ্রত থাক।

মা! আজ প্রত্যুষে আমার সমস্ত হৃদয় তোমাকেই খুঁজিতেছে, তোমার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার জ্যোতিতে আমার হৃদয় পূর্ণ কর—হৃদয়ের অন্ধকার ঘুচিয়া যাক। আমার হৃদয়ের প্রাঙ্গণে সুগন্ধ ফুলরাশি ফুটাইয়া তোল—তাহার সুগন্ধে আমার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া দাও। আমার জীবনটাকে তোমার হাতের বীণা কর এবং তোমার হাতের কোমল স্পর্শে তাহার তারগুলি ঝঙ্কার দিয়া উঠুক। মা! আমার স্বপনে জাগরণে আহারে বিহারে তুমি নিত্য জাগ্রত থাক। বিষাদের ঘন অন্ধকার যখন আমায় ঘিরিয়া ফেলিবে, তখন তুমি আমাকে বিনষ্ট হইতে দিও না, আমাকে রক্ষা করিও। সুখরাশি যখন আমার সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকিবে এবং শত প্রলোভনে আমাকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিবে, তখনও তুমি আমাকে বিনষ্ট হইতে দিও না, আমাকে রক্ষা করিও। প্রত্যূষে তোমারই প্রসন্ন মুখ দেখাইয়া আমাকে জাগাইয়া তুলিও। সন্ধ্যায় তোমারই প্রসন্ন মুখ দেখাইয়া আমাকে ঘুমের দোলায় দোলাইয়া দিও। আমার নয়নের সম্মুখে তোমার প্রসন্ন মুখ নিত্য ধারণ করিও। তোমার অনাহত সঙ্গীতের ভৈরবী রাগিণী বাজিয়া উঠিয়া আমার প্রাণে নিত্য নূতন সফল স্বপ্ন জাগাইয়া তুলুক, আর আমি সেই স্বপ্নের মাঝে জাগিয়া উঠি। মা! আমি আর আমাতে থাকিতে পারিতেছি না। আমার বুকে পিঠে তোমার স্নেহহস্ত রাখিয়া আমার প্রাণের ধকধকি থামাইয়া দাও। আমি তোমারই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।

শতবর্ষ পরে।

(রায় বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার)

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে শতাব্দীকাল অতীত হইয়া গেল। শতবর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে পুণ্যশ্লোক রাজা রামমোহন ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার জীবনের বিশেষভাব, আজ, বার্ষিক স্মৃতি-মাত্রে অবসিত। ব্রাহ্মসমাজের, বঙ্গসমাজের, জীবন-ক্ষেত্রে তাহার আর কোনও অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। সেইরূপই, তৎপরবর্ত্তী ব্রাহ্মসমাজের অধিনায়কগণের বিশিষ্টতাই বা কোথায় দেখা যায়? বৎসরান্তে, একএক গতানুগতিক স্মৃতি-সভাতেই, তাঁহাদের গুণ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে মাত্র। ব্রহ্মবাদীগণের ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে কচিৎ কুত্রাপি তাঁহাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হইতে পারে—অতি সূক্ষ্মভাবে গভীর বিশ্লেষণে!

রাজর্ষি রামমোহনের মৌলিকতা তাঁহার বিশেষ ভাষাভিজ্ঞতায়, নানাদেশীয় এবং এদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়নে ও আলোচনায়, ভারতীয় আর্য্য জাতির প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচারে এবং আধুনিক কুলানুগত সর্ব্বধর্ম্মের সংস্কারে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৌলিকতা তাঁহার আত্মজ্ঞানে ও ব্রহ্মজ্ঞানে; তাঁহার সুসঙ্গত উপাসনা-প্রণালীউদ্ভাবনে এবং উপনিষদাদির ব্যাখ্যানে; তাঁহার নির্জ্জনসাধনে; তাঁহার বিষয়বিজয়ী বিশ্বানন্দে, অন্তরে ও একান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠায়।

ব্রহ্মানন্দ কেশবের প্রভাব,—দেশীয় ভাবকে ধর্ম্মালোকে পারশুদ্ধ করিয়া দেশীয়ভাবে জনসাধারণে তাহার প্রচারে ও প্রভাববিস্তারে; ধর্ম্মমণ্ডলী গঠন করিয়া, মণ্ডলী-সহায়তায় ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সংস্কারে, সজন-সাধনায় ও ভক্তির প্রাবল্যপ্রতিষ্ঠায়।

আজ শতবর্ষপরে সে নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন, সে সত্যানুসন্ধান, সে সার্ব্বজনীন মিলনভূমির প্রতিষ্ঠা কোথায়? সে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের, সে ধর্ম্মশীল যৌবনের, সে তপস্যামগ্ন ব্রহ্মালোক-উজ্জ্বল প্রশান্ত প্রত্যক্ষসাধনের প্রমাণ কোথায়? কোথায় সে লোকোত্তর-ব্রত, সে ভক্তির উচ্ছ্বাস? সে সংস্কার এবং প্রচারের সত্য উৎসাহ?

কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। আমরা আমাদের ধর্ম্মাধিকারসূত্রে লব্ধ, বহুসাধনসঙ্কেত এবং সিদ্ধি-রত্নমাণ হারাইয়া কেবল পূর্ব্বগৌরবের প্রাণহীন অভিনয় করিতেছি মাত্র।

সে পূর্ব্বস্মৃতিগত ধর্ম্মজীবন পুনরায় প্রাত্যহিক জীবনে আনিয়া নূতন প্রাণের প্রভাব প্রয়োগ করিবার উপায় কি?

সকলেরই এবিষয়ে গভীর চিন্তার এবং ব্যাকুল প্রার্থনার প্রয়োজন। আমি একজন অতি নগণ্য ব্যক্তি; ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসাধনের প্রথমাক্ষর পর্য্যন্তও আমার অধিগত হয় নাই। কর্ম্মক্ষেত্রেই কর্ত্তব্যবুদ্ধির সাহায্যে আজীবন কাটাইয়া শেষবয়সে ভাগ্যচিন্তায় দিন অতিবাহিত করিতেছি মাত্র। অভাজনের পক্ষে যে প্রশ্ন আমি এই প্রবন্ধে উত্থাপিত করিলাম, তাহা "মন্দঃ কবিযশঃ-প্রার্থী"র প্রয়াস মাত্র; সুতরাং অনধিকার চর্চ্চা বলিয়াই ত প্রতীয়মান হইবে। ফলে, "গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।"

তথাপি যেমন ইংরাজী প্রবচনে আছে, যাহারা খেলায় ব্যস্ত, তাহাদের অপেক্ষা, যাহারা দর্শক মাত্র, তাহারাই বেশী দেখে এবং বুঝিতে পারে,—সেইরূপ আমি বহিঃস্থ দর্শক হইয়া যাহা দেখিয়াছি এবং ভাবিয়াছি, সম্ভবতঃ তাহা অসঙ্গত, অপ্রাসঙ্গিক ও অগ্রাহ্য না-ও হইতে পারে। এইমাত্র ভরসা।

আমার মনে হয়, কোনও যুগধর্ম্মের ইতিহাসেই ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের অবিচ্ছিন্ন ধারা প্রবাহিত হইতে পারে না; এবং হয়ও নাই। "সম্ভবামি যুগে যুগে" বাক্য স্মরণ করিলে বুঝা যায়, মহাত্মাগণ একএক যুগে সম্ভূত হইয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিতই করিয়া যান। তাহা চিরক্রিয়াশীল রাখিবার জন্য তাঁহারা চিরস্থায়ী হইতে পারেন না; কিম্বা উত্তরাধিকারী সম্প্রদায়কে নিজ নিজ শক্তির অংশও দিয়া যাইতে পারেন না। প্রবর্ত্তকগণ যথাকালে অপসৃত হইলে প্রবর্ত্তিত পন্থা রক্ষা করার ভার যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত হয়, তাঁহারা সাধারণতই অসাধারণ প্রতিভাধিকারী হন না, এ-ই যেন বিধি। মহাজনগণের অনুসৃত পন্থাই "পন্থা", সত্য বটে, কিন্তু অনুসারীগণ আপন আপন শিক্ষা বুদ্ধি ও বিচারানুসারে চলিয়া যে পন্থাকে "পন্থা" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাতে আর প্রথম "পন্থার" পরিচ্ছন্নতা, সরলতা ও দীপ্ত ওজস্বিতার পরিচয় পাওয়া দুর্ঘট। ক্রমশঃ সে পন্থার পথিক-সংখ্যা হীন হইয়া আসে, তাহার প্রভাব খর্ব্ব হয়, এবং ব্যবহার ও আবিষ্কারের অভাবে সে পথে বহুপ্রকারের 'আগাছার' উদ্ভব হয়।

আমি বলিতে চাই, যে, সব সময়েই ধর্ম্মবীরগণের অবস্থিতি কোনও সমাজে সম্ভব নয়। আমাদের মত সাধারণ সংসারী ব্যক্তিগণেরই, প্রবর্ত্তিত উন্নত-ধর্ম্মের 'ধারা' প্রবাহিত রাখিবার উপায় চিন্তা করিতে এবং দৈনন্দিন জীবনে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। Great menএর পরিবর্ত্তে Mediocrity দ্বারাই কাজ চালাইতে হইবে; Great menদের আচরিত উপায়ের অন্ধ অনুকরণ করিলেও চলিবে না,—এবং তাঁহাদের পুনরাবির্ভাবের জন্য প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া থাকিলেও ইহলৌকিক জীবন নির্ব্বাহ করা কঠিন হইবে। প্রত্যেক যুগেই বিশেষ বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থা আসিয়া থাকে। সেই সেই অবস্থা অনুসারে উপযোগী ব্যবস্থা করাতেই আমাদের কৃতিত্ব। আমরা মহানুভব ধার্ম্মিক প্রবর্ত্তকদিগের ন্যায় কোন এক মহান প্রভাবে লোকোত্তর কীর্ত্তি স্থাপনা করিতে অশক্ত, কিন্তু যে ধারা তাঁহারা প্রবর্ত্তিত করিয়া যান, তাহা অক্ষুণ্ণ, অকলুষ, অপ্রতিহত রাখিবার সময়ানুযোগী ব্যবস্থা করা আমাদের সাধারণ সাধ্যের আয়ত্ত।

Mediocrityর একমাত্র সাধন, অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া ব্যবস্থা করা; যাহা মহাজনগণের প্রতিভায় উৎপন্ন, তাহা কর্ম্মকুশলতায় (organisation) দ্বারা, সংরক্ষণ করা। আমাদের বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজে সেই কর্ম্মকুশলতারই অভাব। আমরা মৌখিক বচনে, এবং লেখনীমুখেই এই অভাব সম্বন্ধে আক্ষেপ এবং অনুশোচনা করিয়া থাকি, এবং সে আক্ষেপ ও অনুশোচনা সপ্তাহান্তে, মাসান্তে, বর্ষান্তে, অবিশ্রান্ত পুনঃপুনঃ আলোচিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ হয় না; কর্ম্মারম্ভেই দেখা যায়, "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া!" কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে গেলেই বিভীষিকা, কোথায় men এবং money, 'কর্ম্মশীল' এবং 'অর্থশালী' লোক কোথায়? আমাদের এমন কর্ম্মভীরুতাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, কর্ম্ম-উপলক্ষে আমাদের বিরোধের এবং ভয়ের আর অন্ত নাই। যত মতভেদ সবই কর্ম্মোপলক্ষে আসিয়া আমাদের ভীরুতার সমর্থন করিয়া থাকে। সেইজন্য ক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া ভাবরাজ্যে নির্ব্বিবাদ বিচরণই আমাদের এখনকার অবলম্বন।

'ভাবরাজ্যে'র সহিত 'কর্ম্মক্ষেত্রের' কিন্তু এমনই বিধিবিহিত সূত্র নিহিত আছে যে একের ক্ষয়ে অপরের ক্ষয়, একের জয়ে অপরের জয়, অবশ্যম্ভাবী। কর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করিলে, ভাব প্রাণহীন শক্তিহীন অভিনয় মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। ভাবের সঙ্গে ভাব না রাখিতে পারিলে কর্ম্মও শ্রান্তি অবসাদ অহঙ্কার নৈরাশ্য ও নৈষ্ফল্যের নিদানে পরিণত হইয়া থাকে।

আমাদের বর্ত্তমান শতাব্দী-স্থায়ী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন—জ্ঞান-কর্ম্ম-সেবা-ভক্তি সকলেরই সুষমানুসারী সম্মিলন। পরস্পর নিরলম্ব জ্ঞান বা কর্ম্ম বা ভক্তি বা সেবার দ্বারাই আমাদের এই বিশ্বজনীন মূল সদ্ধর্ম্মের অনুসৃত জীবন্মুক্তি সম্ভব হয় না; ইহাই গতযুগের ঋষিগণের অনুমোদিত লোকসেবার উপায়। কর্ম্ম ও জ্ঞানের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত বা পরিত্যক্ত হইলে, শুধু 'তথাকথিত' সামাজিক উপাসনা-

প্রণালী এবং 'উৎসব'উচ্ছ্বাসের দ্বারাই ভক্তিভূমি সিক্ত করিতে পারিলে, সমাজের পরিত্রাণ হইবে না।

'ভাবের' উৎস বহিতে থাকিবে, তদনুযায়ী প্রত্যক্ষ-সাধ্য কর্ম্মের ক্ষেত্র থাকিবে না, সে ভাবের প্রভাব জীবনে কতটুকু এবং কত দিনের?

কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং কর্ম্মকুশলতার চর্চা করা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় একান্তই কর্ত্তব্য বলিয়া আমার মনে হয়।

কর্ম্মেই আমাদের ব্যক্তিগত রুচি, মত, বিশ্বাসের পার্থক্য-সত্ত্বেও, মিলনের সম্ভাবনা আছে। তিন-তিনটি পৃথক্ উপাসকশ্রেণীর, পৃথক্ উপাসনা-আলোচনা-ভাব-বিনিময়ের দ্বারা আমরা আমাদের লৌকিক ও সামাজিক কর্ত্তব্যক্ষেত্রের আহ্বান অবহেলা করিতে অভ্যস্ত হইয়া যাইতেছি। ইহা দ্বারা, মুখে মৈত্রী এবং করুণার প্রচার করিলেও, কার্য্যতঃ আমরা ভেদ এবং কাঠিন্যেরই অধ্যবসায়ে সিদ্ধহস্ত।

সকল সমাজেই সামাজিক 'লোকহিতব্রত' অনুষ্ঠেয় বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। সকল সমাজেই জ্ঞানের প্রসার, অভীষ্ট বলিয়া সম্মানিত হয়। সভ্যতার মূলমন্ত্রই (যেমন ইংরাজী কবি Mathew Arnoldএর প্রবন্ধে) "sweetness" (প্রীতির মাধুর্য্য) এবং "light" (জ্ঞানের জ্যোতিঃ)। প্রীতি এবং জ্ঞান; কর্ম্মেই প্রচারিত, কর্ম্মেই আচারিত হইতে পারে।

"নামে রুচি এবং জীবে দয়াই" আমাদের বঙ্গদেশীয় শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত যুগধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান সূত্র। ব্রাহ্মধর্ম্মেরও মূল সেই একই সূত্র, "তস্মিন্ প্রীতিঃ, তস্য প্রিয়কার্য্য-সাধনং তদুপাসনমেব।" ব্রহ্মোপাসনা, ব্রহ্মে প্রীতি (মৌখিক নহে), এবং ব্রহ্মের প্রিয়কার্য্য, লোকহিত-সাধনেই নিহিত। ব্রহ্মপ্রীতির প্রকৃত পরীক্ষা এবং পরিচয় কোথায়? তাঁহার প্রিয় কার্য্যসাধনে। প্রকৃত উপাসক যিনি, তিনি তাঁহার প্রিয় কর্ম্মক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন না। তিনি জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ভক্তির সমন্বয় সাধন করিতে সচেষ্ট হন।

আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানলাভের চেষ্টায় বিরক্তি এবং কর্ম্মসাধনের প্রয়াসে অমনোযোগই আমাদের উন্নতির পরিপন্থী হইয়া পড়িয়াছে।

জ্ঞানের প্রসারে পাছে ভাবরস শুষ্ক হয়,—কর্ম্মের কোলাহলে পাছে শুদ্ধ ভাবগত উপাসনা-সাধনের ব্যাঘাত হয়,—এই ভয়েই বোধ হয় আমাদের এখনকার যুগের 'উপাসনা'-সাধকগণ, cultureএর এত বিরোধী।

'Let knowledge grow form more to more,
But more of reverence in us dwell;'

ইংরাজকবি Tennysonএর মহাবাক্যের মর্ম্ম, তাঁহাদের অধিগত বলিয়া ত বোধ হয় না।

জ্ঞানচর্চা করিলে যে ভক্তি পলায়ন করিবে, তাহা কেন? আর জ্ঞান ও প্রীতির সাধন করিলে যে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া লোকহিত-ক্ষেত্র হইতে দূরে অপসৃত হইতে হইবে, তাহাই বা কেন? বুঝা যায় না।

যাহা হউক, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে—শুধু ব্রাহ্মসমাজ কেন, আমাদের সমগ্র দেশের পক্ষে,—জ্ঞান, প্রীতি এবং কর্ম্মের বহুল চর্চা এবং প্রচার, বিশেষ বাঞ্ছনীয় হইয়াছে। এ কার্য্যে ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণী হওয়া শোভনীয় এবং সম্ভবও বটে।

আমার ইচ্ছা হয়, 'culture' এবং 'service' (জ্ঞান ও প্রীতির সাধন এবং সমাজহিতোপযোগী কর্ম্মের আয়োজন) ধর্ম্মেই আমাদের তিন 'সমাজে' প্রথম সকল-মিলন, সুসাধ্য করা যায়। 'আদি', 'নববিধান' এবং 'সাধারণ', তিন মিলিয়া একত্র যদি cultureএর এক সাধারণ-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে পারেন,—এবং তিনে এক হইয়া, যদি সাধারণ-সাধ্য লোকহিত-ব্রতের (social serviceএর) ব্যবস্থা চিরস্থায়ীরূপে গঠিত করিতে পারেন,—তাহা হইলে, এক সঙ্গে পঠন-পাঠন, একসঙ্গে এক কর্ম্মে যোগ এবং সহায়তা, ইত্যাদি দৈনিক কর্ম্মে প্রত্যক্ষ মিলনের অভ্যাসে, আমাদের বিদ্বেষবিরোধ-বিভেদ-বুদ্ধি প্রতিহত ও দূরীকৃত হইয়া যাইবে। মত-ভেদে প্রীতিভেদ হইবে না। কর্ম্মী এবং কর্ম্ম-প্রয়োজন অর্থেরও অভাব হইবে না।

তিন সমাজের পৃথক্ তিন সভাপতি ও কর্ম্মাধ্যক্ষগণ কি, এই বিষয়ে একত্র হইয়া, সভ্য-সভ্য আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত, এবং কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে অনিচ্ছুক হইবেন?

উত্থান-গীতি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৯. ১. ৩১)

[মার্কিন কবি লংফেলোর Psalm of Lifeএর অনুবাদ।]

বোলো না বোলো না মোরে
বিষাদ-করুণ স্বরে
স্বপ্নমাত্র বৃথাই জীবন।
রবে যে নিদ্রার কোলে
জেনো তারে মৃত ব'লে—
সত্য নহে, দেখে যা নয়ন॥ ১

জীবন বড়ই সত্য
কর্ম্মই তাহার তত্ত্ব
মরণ অভীষ্ট কভু নয়।
নিয়মিত হতে ধূলি—
পরিণামে হবে ধূলি—
আত্মাতে প্রযুজ্য নাহি হয় ॥ ২

মগ্ন থাকা সুখভোগে,
কিম্বা সদা দুঃখ-শোকে—
নহে তাহা লক্ষ্য কিবা পথ।
কর্ম্ম কর—প্রতি পলে
পার যেন ভীম বলে
এগিয়ে চলিতে বহু পথ ॥ ৩

কর্ম্মের অবধি নাই—
কাল হু হু চলে যায়—
হৃদয় সবল আছে বটে।
তবুও জানিবে সদা—
বস্ত্রাবৃত ঢাকে যথা—
মৃত্যুবাদ্য নিতি বেজে ওঠে ॥ ৪

জগতের সুপ্রশস্ত—
যুদ্ধক্ষেত্রে সুপ্রচণ্ড—
জীবন-ভাম্বুর থাকি মাঝে।
নির্ব্বাক নিরীহ জীব
থেকো না যেন রে ক্লীব—
দাঁড়াও যুদ্ধে বীরের সাজে ॥ ৫

হলেও সুখের রাস্তা,
ভবিষ্যে রেখো না আস্থা ;—
ছেড়ে দাও অতীতের গান।
কর্ম্ম কর প্রতিক্ষণে
প্রাণময় বর্ত্তমানে
দৃঢ় চিত্তে—শিরে ভগবান ॥ ৬

মহত চরিত আনে
সদাই মোদের প্রাণে—
মোরাও মহত হতে পারি।
মরণের কাল এলে
কাল-সিন্ধু-বালু'পরে
পদাঙ্ক রাখিয়া সারি সারি ॥ ৭

বুঝি বা সে চিহ্ন হেরি'
সুদূরতর জীবনের
সিন্ধু পারাবারে ভাসমান।
হতাশা-বিমূঢ়-মন
ভগ্নতরী কোন জন
সাহসে ভরিবে তার প্রাণ ॥ ৮

ওঠ তবে—লাগো কাজে
ভাগ্যে যা থাক্, তা আছে—
এগিয়ে চল বিজয় পথে।
জয় লাভ হবে যত
চলিবারে শেখো তত
শ্রমে ধৈর্য্যে দাঁড়াবার পথে ॥ ৯

ভারতে ব্রহ্মোপাসনার অভিব্যক্তি

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ)

মানবজীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা কর্‌লে দেখা যায়, ব্রহ্মোপাসনা মানব-জীবনের সহিত যেন ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত—অঙ্গহীন মানব যেমন 'পূর্ণ'-পদবাচ্য হতে পারে না, তেমনি ব্রহ্মোপাসনাবিহীন জীবনকেও পূর্ণ জীবন নামে অভিহিত করা চলে না। বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানপ্লাবিত যুগে ব্রহ্মোপাসনা বল্‌তে যাহা হৃদয়ঙ্গম হয়, মানবজীবনের সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে ঠিক তাহা বোঝাত না।

মানবীয় সভ্যতার আদিম যুগে, যখন মানব গিরি-গুহায় বাস করে' বন্য ফলমূল কিংবা বন্য পশুপক্ষীর আমমাংস ভক্ষণ করে' জীবন কাটাত, তখন সেই আদিম মানবের মনে প্রকৃতির যে বস্তু বিস্ময় বা ভয় উৎপাদন কর্‌ত, যে বস্তুর শক্তি মানবের শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করে প্রাধান্য লাভ করতে পার্‌ত, সেই বস্তুর প্রতি ভয়ে ও বিস্ময়ে তার মন ভরে উঠ্‌ত, এবং সেই বস্তুরই সে পূজা করত। এই সময়ই মানব প্রস্তর, বিরাট বৃক্ষ প্রভৃতিকে পূজা ক'রে, ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করে অন্তরের ক্ষুধার নিবৃত্তি কর্‌ত; আজো যে হিন্দুদের মধ্যে বট বা অশ্বত্থ বৃক্ষের পূজা প্রভৃতি দেখা যায়, আমার মনে হয় উহা ঐ আদিম যুগের উপাসনার ক্ষীণ স্মৃতি।

মানব যখন সভ্যতা-সোপানে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌ল, যাকে মানব পূর্ব্বে পূজা কর্‌ত তা যখন মানবশক্তির নিকট মস্তক নত কর্‌তে লাগল—প্রস্তর ভীষণ অস্ত্রাঘাতে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হল, বিরাট মহীরুহ ভীষণ কুঠারাঘাতে ছিন্নমূল হয়ে ভূতলে লুটিয়ে পড়ল, তখন মানবের উপাসনাও ভিন্নমূর্ত্তি পরিগ্রহ কর্‌ল; এইযুগে মানবের শক্তিপ্রত্যাহতকারী নৈসর্গিক বস্তু মাত্রই পূজা পায়নি, পরন্তু যা সুন্দর, যা রমণীয়—তাও ক্রমে মানবের আরাধনার বস্তু হয়ে উঠ্‌ল।

পূর্ব্বে মানব রন্ধন করতে পার্‌ত না; কিন্তু সভ্যতা-পথে অগ্রসর মানব যখন রন্ধন-বিদ্যা আরম্ভ কর্‌লে,

তখন অগ্নি হল তার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় দ্রব্য; সুতরাং অগ্নি দেবতামণ্ডলীর শীর্ষস্থান অধিকার কর্‌ল; অগ্নির জ্যোতি নৈশ-তিমির দূরীভূত করে, হিংস্র শ্বাপদের ভয় বিনষ্ট করে, প্রাণে সাহসের সঞ্চার করে, শীতের প্রতাপ মন্দীভূত করে, জীবকূলকে উত্তাপ দান করে,—সুতরাং অগ্নিই শ্রেষ্ঠ; তিনিই দেবগণের মুখস্বরূপ হয়ে যজ্ঞের হবি গ্রহণ কর্‌তে লাগলেন।

সূর্য্য কোটি কোটি দীপালোক-নির্জ্জিতকারী কিরণে দিবসের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করেন; প্রভাতে পূর্ব্বাশার উদয়াচলে লোহিতবিম্বের মধ্য দিয়ে তিনি জীবজগতে নূতন বাণী সঞ্চারিত করেন—আলস্য-জড়তা পরিহার করে মানব তাঁরই আহ্বানে জেগে ওঠে; তিনি মানবের কর্ম্মময় জীবন পরিচালন করে থাকেন; আবার তাঁর অভাবে শস্যের উৎপত্তির ব্যাঘাত হয়; সুতরাং তিনিও মানবের অশেষ উপকার করে থাকেন। এ হিসাবে তিনিও প্রতাপশালী দেবতা বলে পূজা পেতে লাগলেন। আজও ভারতে সৌরসম্প্রদায় নামে এক ধর্ম্মসম্প্রদায় সূর্য্য-নারায়ণের উপাসনা করে থাকে।

জল না হলে জীবের এক দণ্ড চলে না, পিপাসার নিবৃত্তি, রন্ধনকার্য্য, স্নান, শস্যের উৎপাদন—সমস্ত কার্য্যেই জল একান্ত দরকার, সুতরাং বরুণ-দেবতার উদ্ভব হল—তিনিও মানবের পূজ্য বলে অভিহিত হলেন।

ঐ যে আকাশে মেঘমালা ঘনিয়ে আসে, ঝটিকার প্রচণ্ড হুঙ্কার প্রকাণ্ড দানব-দৈত্যের আরাবের মত শ্রুতিমূলে প্রবেশ করে, অরণ্যানীর শ্যামলশীর্ষে বিরাট্‌ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়; মানবের প্রাণ ভয়ে কম্পিত হয়ে ওঠে; আবার শান্ত মৃদুল দক্ষিণ পবন পুষ্পগন্ধ বুকে নিয়ে দিকে দিগন্তরে ছুটাছুটি করে; আবার এক মুহূর্ত্ত বায়ুর অভাব হলে মানবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—কাজেই বায়ুও মানবের পূজার অধিকারী।

তার পর এল মানবের মনোজগতে এক বিষম সমস্যা—ভীষণ মৃত্যু ইহজগতের সমস্ত সম্বন্ধ শেষ করে দেয়। এই ভীষণ মৃত্যু-সমস্যা মানবের জ্ঞানবুদ্ধি সব আচ্ছন্ন করে আত্মপ্রকাশ কর্‌ল; কিন্তু মৃত্যু, যার স্পর্শে মানবের যা কিছু চৈতন্য জ্ঞানবুদ্ধি-প্রতিভা সমস্ত পলকে বিলুপ্ত; যার কঠোর ইঙ্গিতে স্নেহমায়া-মমতার অবসান—সে রহস্য উদ্ভেদে অসমর্থ মানব যম বা মৃত্যুপতির পূজা আরম্ভ করল।

কুলুকুলু নিনাদে বীচিবিক্ষোভময়ী স্বচ্ছনির্ঝরিণী দূর-দিগন্তে ছুটে চলে; শান্ত সন্ধ্যার অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যকিরণে অনুরঞ্জিত তরঙ্গিণীর মুক্ত দেহ মানবের প্রাণে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে; অমনি মানব নির্ঝরিণী মধ্যে জলদেবীর আরাধনা করল; গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী আজো সেই বহুদূর অতীতের মানব-প্রাণের সৌন্দর্য্যানুভূতির স্মৃতি বুকে নিয়ে চন্দনচর্চ্চিত কুসুমদাম তরঙ্গে তরঙ্গে সাগরে নিয়ে যাচ্ছে।

ঘন বনানী ধীর সমীরে দুলে উঠেছে; কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুমস্তবকে দ্বিরেদমালা গুঞ্জন করে যাচ্ছে; ছায়াবহুল বনস্পতির পল্লবমর্ম্মরের সঙ্গে বিহগের কলকূজন মিলে গেছে, আর অমনি আনন্দপ্রফুল্লহৃদয় মানব সেই অরণ্যানীর মাঝে বনদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে তাহার পূজার মঙ্গল-শঙ্খ বাজাতে সুরু কর্‌ল।

এইরূপে বিশ্লেষণ কর্‌লে দেখা যাবে, এই যুগে মানব যা কিছু সুন্দর, যা কিছু আনন্দদায়ক, যা কিছু প্রয়োজনীয় বলে অন্তরের অন্তস্তলে অনুভব করেছে, অমনি তার মধ্যে একটী কোন দেবতার প্রতিষ্ঠা করে হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। ভারতের বৈদিক যুগের প্রথম ভাগের দেবতামণ্ডলী এবং গ্রীকদেবমণ্ডলীর মধ্যে এই যুগের স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায়।

সভ্যতার আলোক যখন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল, তখন প্রতিপদে দেবতামণ্ডলীর ছায়া দেখে মানবপ্রাণ চমকে উঠ্‌ল; আরো দেখা গেল—জ্ঞানের বিকাশে যাকে যে দেবতা বলে পূজা করেছে, সে নৈসর্গিক পদার্থ—বাস্তবিক তার শুভাশুভের কোন ক্ষমতা নেই, তখন মানব-মন ঐ গতানুগতিক দেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নবীন পন্থার আবিষ্কারে ব্যস্ত হল; অনুসন্ধানের ফলে মানব দেখ্‌তে পেলে—বিশাল বিশ্বে দুইটী শক্তি ক্রিয়াশীল; ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জীবন-মৃত্যু, আলোক-অন্ধকার, দিন-রাত্রি, শীত-গ্রীষ্ম—এই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে বিশ্ব ছুটে চলেছে। যা আমাদের উপকারক, যা আমাদের পক্ষে হিতকর, তাকেই আমরা দেবতা বলে পূজা কর্ত্তে উঠে পড়ে লাগলাম; আর যা নিপীড়নকারী, দুঃখদায়ক তাই পাপ, দানব বা সয়তান নামে অভিহিত হয়ে গেল।

পার্শীদের ধর্ম্মগ্রন্থ জেন্দাবেস্তায় দেখা যায়—অহুরমজ্‌দ্‌ ও আহ্রিম্যাণ নামক দুটি পরস্পর বিরুদ্ধগুণাবলম্বী দেবতার অধিনায়কতায় এই পৃথিবী পরিচালিত; অহুরমজ্‌দ্‌ যতই ভাল করতে চেষ্টা করুক না কেন, আহ্রিম্যাণের চক্রান্তে তাহার মধ্যে মন্দ প্রবেশ করবেই।

বাইবেলেও দেখা যায়, স্বর্গের নন্দনকাননে সর্পরূপী সয়তান প্রবেশ করে সুখের হাট ভেঙ্গে দিয়ে গেল। স্বর্গচ্যুত মানব মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকার্জ্জনের জন্য অভিশপ্ত ললাট নিয়ে পৃথিবীর বুকে উপনীত হল। ঈশ্বরের এই দোষরহিত সৃষ্টির মধ্যে সয়তান দুঃখের রেখা

এঁকে দিয়ে গেল। বৃহদারণ্যকে দেখা যায়, দেবাসুর-দ্বন্দ্বে মানবের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় পাপ দ্বারা বিদ্ধ হল।

গৃহস্থ-পরিজনবর্গ যদি দিবানিশি কলহ-কোলাহলে মত্ত হয়ে থাকেন, তবে সে গৃহের ধ্বংস অনিবার্য্য। মানবের মনোরাজ্যেও ঠিক এই কথাই প্রযুক্ত হতে পারে। অন্তর-প্রদেশ যদি নিত্য যুদ্ধে মত্ত থাকে, তবে সেখানে স্থায়ী শান্তির আশা বিড়ম্বনা মাত্র!

সুতরাং আবার মানব-মন এই দ্বন্দ্বের অন্তরালস্থিত নিত্য সত্যের সন্ধানে ব্যাকুলভাবে নিযুক্ত হল। কেঁদে উঠ্‌ল মানবপ্রাণ এই দ্বন্দ্বের নিরসন-চেষ্টায়।

এইবার মানব-মন নবপথে পদার্পণ কর্‌ল। সভ্যতার উন্নততর অবস্থায় মানবশক্তি পৃথিবীর বহু বস্তুর উপরে আধিপত্য করতে আরম্ভ করেছিল; ঠিক সেই আধিপত্যের ভাব কল্পনালোকে মূর্ত্ত করে মানব উপাসনায় প্রবৃত্ত হল—মানুষেরই মত ঈশ্বরের কল্পনা কর্‌ল। এইখানেই Anthropomorphism বা মানবীকরণের সৃষ্টি এবং পরিশেষে এই ভাবই মূর্ত্তিপূজায় বিকাশ লাভ করেছে।

মানবের জ্ঞান এই কল্পনায় আত্মহারা হয়ে থাকতে সমর্থ হল না; এতে প্রত্যেক মানুষের ঈশ্বর স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়াল; কারণ রাম যে মূর্ত্তি কল্পনা কর্‌তে ভালবাসে শ্যাম তা বাসে না; মানবমনের গঠন অনুসারে ঐশ্বরিক কল্পনায় ভেদ দেখা দিল, মানব-মন উত্যক্ত হয়ে উঠ্‌ল।

আবার অনুসন্ধান আরম্ভ হল। এইবার মানব সত্যের সন্ধান পেল—উপনিষদ্‌ উদাত্তকণ্ঠে গেয়ে উঠ্‌ল—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বম্‌
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

যিনি এক অদ্বিতীয়; সমস্ত বৈষম্য, সমস্ত দ্বন্দ্বের যিনি অতীত;—শশাঙ্কতারকার স্নিগ্ধ জ্যোতিতেও যিনি, অগ্নি ও সূর্য্যের দীপ্ত গরিমায়ও তিনি; সন্ধ্যার শান্তভাবে যাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হয়, নিশীথিনীর নিবিড় অন্ধকারের অন্তরালে তাঁহারই মধুর মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে; যিনি জন্মের মধ্য দিয়ে আনন্দ-কোলাহলের স্রষ্টা, মৃত্যুর মধ্যে তাঁহারই রুদ্রভাব প্রকাশ পায়; তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের গভীর গর্জ্জনে যিনি মূর্ত্ত, তিনিই জ্যোৎস্নাহসিত অন্তহীন নীল বারিধির শান্তবক্ষে স্নিগ্ধমূর্ত্তিতে দীপ্যমান; সমস্ত দ্বন্দ্ব—শীতোষ্ণ-সুখদুঃখের অবিরাম সংঘাতের ভিতর যাঁহার একত্ব অনুভূত হয়, তিনিই জীবনের জীবন, তিনিই প্রাণের প্রাণ—ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্‌।

এই পরম সত্য, চরম তত্ত্ব উপলব্ধিপূর্ব্বক মানব খণ্ডের পূজা পরিহার করে অখণ্ডের অনন্তের পূজায় রত হল। অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করে মানব শান্তি প্রাপ্ত হ'ল, জরা-মরণ-ব্যাধির জ্বালাযন্ত্রণার কবল হতে মুক্তির পথ খুঁজে পেল।

কালচক্রনেমির অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনে ভারতে উপনিষদের গভীর বাণী উপেক্ষিত হল। আবার ভারতবর্ষ ক্রিয়াকাণ্ডে মত্ত হয়ে হিংসা-যজ্ঞে মঙ্গলের অনুসন্ধান করে বেড়াতে লাগ্‌ল। এই সময় মহামতি বুদ্ধদেব তাঁর অলৌকিক প্রতিভাবলে ভারতে নবযুগের প্রবর্ত্তন কর্‌লেন। কিন্তু তাঁর মতেও একটা প্রকাণ্ড ফাঁক রয়ে গেল—তিনি ব্রহ্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব রইলেন। মানবের স্বাভাবিক ভক্তির উৎস নির্গমন-পথ পেলে না। পরে অবশ্য বুদ্ধদেবকেই উপাস্য দেবতারূপে তাঁর শিষ্যমণ্ডলী ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করেছে।

সময়ের আবর্ত্তনে বুদ্ধের মত মানবের ব্রহ্মোপাসনার পিপাসা নিবৃত্ত করতে সমর্থ হল না। এই সময় আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদের বিজয়ভেরী নিনাদিত করলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ থেকে দূরীভূত হল সত্য, কিন্তু ক্ষুদ্র সসীম খণ্ড মানব নিজেকে 'সোঽহম্‌' মনে কর্‌তে পার্‌ল না—'তত্ত্বমসি' উচ্চারণ কর্‌তে জীবের রসনা আড়ষ্ট হয়ে আসতে লাগল। বাস্তবিক প্রতি পদে ক্ষুণ্ণ হতগর্ব্ব মানব কেমন করে নিজেকে ব্রহ্ম বলে ভাব্‌তে পারে? মানুষ চায় অনন্ত ব্রহ্মকে হৃদয়ের ভালবাসা নিবেদন কর্‌তে—ব্রহ্ম বলে অহঙ্কারে মত্ত হতে নয়।

তাই আচার্য্য রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নিয়ে শঙ্করের মায়াবাদের নিরসনে প্রবৃত্ত হলেন। পরে বঙ্গদেশে ভক্তবীর চৈতন্যদেব অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব নিরূপণ করে ব্রহ্মোপাসনার সহজ পথ নির্ণয় করে গেছেন।

কালধর্ম্মে চৈতন্যের ভক্তিবাদ রূপান্তরিত হয়ে গেল। মানব পরব্রহ্মের অর্চ্চনা পরিহার করে পুনরায় খণ্ড দেবদেবীর পূজায় রত হল। মানবের হৃদয়রাজ্য অজ্ঞান-কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন হওয়ায় ব্রহ্ম প্রচ্ছন্ন হয়ে গেলেন।

এই সময় যুগাবতার মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ভারতের ভাগ্যাকাশে প্রভাতী তারকার মত সমুদিত হয়ে কঠোর হিমযামিনীর অবসান ঘোষণা করলেন। রাজা রামমোহন দেখলেন, ভারতবাসী অজ্ঞান-তিমিরে নিমগ্ন; প্রাচীন উপনিষৎসম্মত এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের পূজা না করে খণ্ড দেবদেবীর উপাসনায় প্রবৃত্ত; বিবিধ কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন মানব-মন প্রকৃত সত্য কি তাহার নির্ণয়ে প্রবৃত্ত না হয়ে শাস্ত্রানুশাসন ব'লে কুসংস্কারের বশবর্ত্তী। প্রকৃত শাস্ত্রবাক্য কি, হিন্দুর প্রকৃত

ধর্ম্ম কি, তা তখন অনেকেই জানতেন না; পরন্ত হিন্দু বলে গোঁড়ামি পূর্ণ মাত্রায় ছিল। রাজা রামমোহনের অন্তরপ্রদেশে অনুসন্ধিৎসার তীব্র বহ্নি জ্বলে উঠ্‌ল; সেই হৃদয়াবেগের তীব্র প্রেরণায় তিনি শাস্ত্রাধ্যয়নে রত হয়ে, বহু গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে আর্য্য ঋষির প্রাচীন লুপ্ত ভাণ্ডারের সন্ধান লাভ করে নিজে কৃতার্থ হলেন এবং তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার অমৃতময় ফল দেশবাসীর পুরোভাগে উপস্থাপিত কর্‌লেন। উহা শাশ্বত অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা।

রাজা রামমোহনের প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মোপাসনা শঙ্করের অদ্বৈত ব্রহ্মের উপাসনা নয়। রামমোহনের ব্রহ্মোপাসনায় আচার্য্য রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, চৈতন্যদেবের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ এবং পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেলের Absolute Idealismএর সমাবেশ দেখা যায়। ব্রহ্মকে জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ বলে, বন্ধু বলে, মাতা বলে, পিতা বলে হৃদয়নিহিত ভক্তির অফুরন্ত উৎস উৎসারিত করে দিতে হবে; মনে করতে হবে—তিনি আমার অন্তরে বাহিরে—বিশ্বজগতে; সঙ্গীতমাধুর্য্যে, গোধূলির রক্তিম রাগে, উষার নবারুণ কিরণে, বিহগের কলকাকলীতে, মহাসমুদ্রের অন্তহীন বক্ষে, ধূসর মরুর ঝটিকাসন্তাড়িত বালুকাপুঞ্জে, নীহারিকার জ্যোতির্ম্ময় কলেবরে—আমার দুঃখসুখ-আপদসম্পদের মধ্যে তিনি বিরাজিত।

এই সংসারের সমস্ত কর্ম্মে, ব্রহ্মেরই অনুশাসনবাণী অনুসরণ করতে হবে; পিতামাতার স্নেহ, বন্ধুর প্রীতি, স্ত্রীর ভালবাসা, ভৃত্যের সেবা—সকলেরই মধ্যে পরম পিতার মঙ্গলহস্ত অনুভব করতে হবে। আমরা যদি তাঁর শরণাপন্ন হই, তিনি এই বিঘ্নসঙ্কুল সংসার-সমুদ্রে আমাদিগকে অনায়াসে পার করে দেবেন।

মানবজীবন সৃষ্টির আদিকাল থেকে যে পরমপিতার উপাসনার জন্য ব্যগ্র হয়ে কালাতিপাত করেছে,—কত পথে কত মতে পরিভ্রমণ করে ক্লান্ত হয়েছে—সেই চরম সত্য রামমোহন দেশবাসীর নিকট উপস্থাপিত করলেন, কিন্তু কি দেখলেন? দেখলেন, জন্মাবধি অন্ধকার-গুহাবাসী মানব যেমন হঠাৎ আলোক দেখলে সে দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌তে পারে না—তার চক্ষু আলোকের ঔজ্জ্বল্যে ঝল্‌সে যায়, দেশবাসীও তেমনি তাঁর এই সত্য ঠিক গ্রহণ কর্‌তে অক্ষম; অজ্ঞান-কুসংস্কারে অন্ধ দেশবাসী—এ সত্যের তীব্র তেজ সহ্য কর্‌তে পারছে না—কুসংস্কারই তখন তাদের নিকট রমণীয় বলে মনে হ'চ্ছিল।

দেশবাসীর এই অবস্থা নিরীক্ষণ ক'রে, রামমোহন দেশের উন্নতির জন্য, যাতে দেশবাসী তাঁর প্রাণের ঈপ্সিত ব্রহ্মোপাসনায় আত্মনিয়োগ কর্ত্তে পারে তার জন্য, দেশে শিক্ষার নব ধারা প্রবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি দেখলেন, যদি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তরঙ্গ এসে দেশবাসীর মানসতটে আঘাত করে, তবেই এই জীর্ণমূল কুসংস্কারের তরু ভূমিসাৎ হবে। এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হয়ে তিনি তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল মহামতি লর্ড বেণ্টিঙ্ককে ইংরাজীশিক্ষাপ্রবর্ত্তনের জন্য পত্র লিখেছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় বুঝেছিলেন যে, মানব যদি সুশিক্ষা লাভ কর্‌তে পারে, যদি বিজ্ঞানের নবীন আলোকে বিশ্বরহস্যের অভিনব তত্ত্ব উদ্ঘাটন করে প্রতিপদে বিশ্বনিয়ন্তার অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টিকৌশল প্রত্যক্ষ কর্‌তে পারে, তবেই বুঝতে পারবে এক অন্তহীন ঐশী শক্তি বিশ্বের প্রত্যেক কেন্দ্রে ক্রিয়াশীল; সুতরাং সসীম গণ্ডীর মধ্যে সেই মহীয়সী শক্তিকে আবদ্ধ কল্পনা করা কুসংস্কার মাত্র। তবেই এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের চরণতলে মানবের গর্ব্বোন্নত উচ্চ শির নত হবে; সুতরাং কি গভীর দূরদৃষ্টির বলে তিনি ইংরাজীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, তা ভাবলেও বিস্মিত হ'তে হয়।

রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে ভারতে ইংরাজীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় নি; পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তরঙ্গ ভারতের উপকূলে আঘাত করে নি; তখন ভারত শিক্ষায় ও সাধনায় পশ্চাৎপদ হয়ে পড়েছিল, ভারতবাসী সাম্প্রদায়িক কলহে মত্ত হয়ে প্রকৃত ধর্ম্মভাব থেকে সরে গিয়েছিল। রাজা রামমোহন তাৎকালিক প্রাচ্য শিক্ষার সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ হয়েও তার ফলে সাধারণ ভারতবাসীর অবনতি দেখেও তিনি গবর্ণর জেনারেলকে তদানীন্তন শিক্ষার সমালোচনাপূর্ণ পত্র লিখেছিলেন।

রাজা রামমোহন বুঝেছিলেন যদি তাৎকালিক শিক্ষা-প্রণালীতে জীবন অতিবাহিত করা যায়, তবে কি ব্যবহারিক, কি পারমার্থিক—কোন উন্নতিই জীবন-পথে দেখা দেবে না। কি ভাষাজ্ঞানে, কি অন্য কোন আধ্যাত্মিক জ্ঞানে এইরূপ শিক্ষা কার্য্যকরী হতে পারে না। আবাল্য প্রাচ্যভাবে শিক্ষিত প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তদানীন্তন প্রাচ্যভাবে শিক্ষার দোষ গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং তাহারই ফলে সংস্কৃত কলেজে ইংরাজীশিক্ষার প্রবর্ত্তন এবং 'বিদ্যাসাগর' কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

কালবশে প্রত্যেক নিয়মেরই পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। জীর্ণ পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে থাকা আর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা একই কথা।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, রাজা রামমোহন তার-

তের যে উপকার করে গেছেন, ভবিষ্যতের বহুশতাব্দী-ব্যাপী তার ফল গোচরীভূত হবে। আজ ভারতব্যাপী যে স্বাধীনতার আন্দোলন রাজনীতির মধ্য দিয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছে, রামমোহনকে তার পথপ্রদর্শক বলে মনে করা যেতে পারে; কারণ রামমোহনই প্রথম কুসংস্কারের শত বন্ধন ছিন্ন করে মানবাত্মার মুক্তি-সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন—ধর্ম্মের জন্য স্বাধীনতা-সংগ্রামই রামমোহনের অমর-কীর্ত্তি। এমন কি, ধর্ম্মের এই স্বাধীনতার জন্য তাঁকে পিতৃগৃহ পরিহার করে সুদূর তিব্বতে পর্য্যন্ত যেতে হয়েছিল—তিনি সমস্ত অত্যাচার নীরবে অম্লানবদনে সহ্য করেছিলেন।

ধর্ম্মের সঙ্গে, ব্রহ্মোপাসনার সঙ্গে যে মানবজীবনের শাশ্বত সংযোগ, এই তত্ত্ব পুনঃসংস্থাপন করে মহাত্মা রাজা রামমোহন অকালে নশ্বর দেহ পরিহার করে চলে গেলেন; যাঁর মধ্যে রাজা রামমোহনের সাধনা মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করেছিল, সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় জীবনে ব্রহ্মোপাসনাই যে মানবজীবনের একমাত্র কেন্দ্র, ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে যে মানবজীবন পঙ্গু, সংসারপথে চল্‌তে অসমর্থ; মানবের সুখদুঃখ, সম্পদবিপদ, রোগশোক—সবই যে ব্রহ্মেরই মঙ্গলহস্তের শুভ আশীর্ব্বাদ, এই সত্য প্রকটিত করেন।

এই ব্রহ্মোপাসনাই যেন আমাদের জীবনের সার-ব্রত বলে গ্রহণ কর্‌তে পারি। প্রভাতে সায়াহ্নে, সম্পদে বিপদে, দিবস-মাস-বৎসরে, কর্ম্মক্লান্তির অবসন্ন অবসরে, আমোদ-প্রমোদের অবিরাম প্রবাহে, শোকদুঃখের হৃদয়ভেদী হাহাকারে, ঐশ্বর্য্যসম্পদের রমণীয় মূর্ত্তির অভ্যন্তরে যেন আমরা পরব্রহ্মের মঙ্গলেচ্ছা প্রত্যক্ষ করিতে পারি।

নব শতাব্দীর প্রথম উৎসবপ্রভাতে আজ যাঁরা ব্রহ্ম-রসপিপাসু হয়ে রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধন-মন্দিরে সমবেত হয়েছেন, পুণ্যময় অমৃতময় শাশ্বত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোক হতে রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁদের মনে প্রাণে ব্রহ্মোপাসনার ব্যাকুল আগ্রহ জাগরিত করুন।

শান্ত প্রভাতে শ্যামল দূর্ব্বাদলে অরুণকিরণ-বিহসিত হিমবিন্দু ব্রহ্মকৃপা বিতরণ করুক। সংসারতাপবিদগ্ধ উপাসকমণ্ডলী অন্তরে বাহিরে বিশ্বজগতে, পরব্রহ্মের আনন্দরসধারাপাতে কৃতকৃতার্থ হউন।*

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

শুক্লবেলাবলী—একতালা।

আঁখির আগে রয়েছ নিশিদিন
তবু তোমারে হেরি না কেন।
যদি তবু তুমি মোর আসিলে পরাণে হে,
নিশিদিন যায় কাটি প্রভু পলক যেন॥

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী।

৩ ১´ ২ ‖ ২
II { পা ধা। মা গরা গা সা I গরা গা মা -া। (-া -া) } গরা গা সা সা।
আঁ খি র আ• • গে র• য়ে ছ • • • •• • নি শি

৩ ১´ ২ ৩
। গা মা পা -া I পপা ধনা র্সা র্সা। র্সনা র্রা র্সা না। র্রর্সর্সা -া ধা পা I
দি ন ত • বু• •• • তো মা• • রে • হে• • রি না

১´ ২
I পপা ধনা র্সা পা। গা ধা II
কে• •• • ন • •

---

* গত ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে আদিব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে বিবৃত।

৩ ১´ ২
II { পা পা । নধা না র্সা র্সা I র্সা না র্সর্সা -া । র্সা র্সা র্সর্সা র্গর্রা ।
: ব দি ত০ বু ঝু খি মো ০ য়০ ০ আ দি লে০ ০০

৩ ১´ ২ ০
। র্গা র্মা র্গা র্রা I র্সর্রা র্সর্সা ধা -া । পা -া } পধা মা । গরা গা মা পা I
প ০ রা পে হে০ ০০ ০ ০ ০০ বি০ শি দি০ ন যা য়্

১´ ২ ৩ ১´
I পা পা পা পপা । ধনা র্সর্রা র্সা র্সা । র্সর্রা র্সর্সা ধা পা I পপা ধনা র্সা পা ।
কা টি প্র ভু০ ০০ ০০ প দ ব০ ০০ ০ ০ যে০ ০০ ০ ন্দ

২
। ণা ধা II II
০ ০

জজ্‌পণ্ডিত মদনমোহন।

(শ্রীরত্নমালা দেবী)

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের হৃদয় অতি উন্নত ও উদার ছিল। তাঁহার দেহ কান্তিপূর্ণ এবং চরিত্র নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ ছিল। মিথ্যা প্রবঞ্চনা, খলতা, কপটতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। যাহা সত্য, যাহা ন্যায় তাহা তিনি নিরপেক্ষভাবেই গ্রহণ করিতেন।

দুঃখের বিষয়, কলিকাতা বাস কালেই তাঁহার উদরাময় প্রবল হইয়া উঠিল এবং ক্রমে ক্রমে ব্যাধি কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। তিনি কিছুই পরিপাক করিতে পারিতেন না। সামান্য সাগু-বার্লি খাইয়াই দিন যাপন করিতেন। দিন দিন তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। এই সময়ে মুর্শিদাবাদে জজ্‌পণ্ডিতের পদ শূন্য হয়। তিনি ঐ কার্য্যের জন্য আবেদন করিলে বেথুন সাহেব তর্কালঙ্কারের জন্য লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরকে এতদূর অনুরোধ করেন যে, লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর পূর্ব্বে যে ব্যক্তিকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহাকে কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত করিয়া তর্কালঙ্কারকে জজ্‌পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তর্কালঙ্কার পরিবারবর্গসহ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ যাত্রা করেন। তাঁহার গমনের পূর্ব্বেই তাঁহার নাম মুর্শিদাবাদের সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইয়াছিল। তিনি মুর্শিদাবাদ পৌছিয়াই পরম সুহৃদের ন্যায় সর্ব্বত্র সকল স্থানেই সমাদরে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মনোহর কান্তি, মধুর বচন ও গভীর বুদ্ধিদর্শনে আবাল-বৃদ্ধ সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি ও সম্মান করিত। জজ্‌ ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর সকলেরই তিনি প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত ব্যবস্থা কেহই খণ্ডন করিতে পারিতেন না।

তর্কালঙ্কারের বক্তৃতাশক্তি প্রথমে মুর্শিদাবাদেই বিকশিত হয়। তিনি মুর্শিদাবাদে বহু সভায় স্বয়ং বক্তৃতা করিয়া দেশের কল্যাণের জন্য সাধারণের মনকে অনুকূল করেন। দীনহীন অনাথ ও বিধবাদের জন্য একটী দাতব্যসমিতি সংস্থাপন করেন। অদ্যাপি অনেক দরিদ্র অনাথ ঐ দাতব্যসমিতি হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। তিনি অন্ধ খঞ্জ ও কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত লোকের জন্য একটী অনাথাশ্রম স্থাপন করেন এবং সাধারণ লোকের উপকারের জন্য একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। তর্কালঙ্কারের মুর্শিদাবাদ আগমনের পূর্ব্বে এখানে এরূপ দাতব্যসমিতি বা অনাথাশ্রম ও দাতব্য চিকিৎসালয় কিছুই ছিল না। সুতরাং তর্কালঙ্কারকেই ঐ সকল লোকহিতকর কার্য্যের প্রথম প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে।

মুর্শিদাবাদে তিনি সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কাল জজ্‌পণ্ডিতের কার্য্য করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে বহু পরিবার প্রতিপালন করিতে হইত। তখনকার দিনে সংসারে একজন উপায়ক্ষম হইলেই দশজনকে প্রতিপালন করিবার ভার লইতে হইত। স্ত্রীপুত্রকন্যাই শুধু প্রতিপাল্য ছিল না, পিতামাতা ভাইভগ্নী আত্মীয়স্বজন ও পরিবার মধ্যে গণ্য হইতেন। মদনমোহনের সুবৃহৎ পরিবারে তাঁহার [illegible] ভগ্নী ও ভগ্নীপতিগণ এবং তাঁহাদের-ভাগিনেয়ীরাও

সংসারে পরিবারভুক্ত ছিল। তাহা ছাড়া তাঁহার "বসুধৈব কুটুম্বকম্"—যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, একটি পয়সাও সঞ্চয় হইত না। কত অনাথ দীনহীন দুঃস্থ তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইত। তিনি সহোদরা ভগ্নী ও ভগ্নীর পুত্র-কন্যাদের অত্যন্ত স্নেহ করিতেন ও ভালবাসিতেন। তিনি যাহা বেতন পাইতেন তাহা হইতে মাসিক ১০০৲ টাকা পিতাকে দিতেন। তিনি কলিকাতায় থাকিতেই তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপীমোহনের বিসূচিকা রোগে বিল্বগ্রামে মৃত্যু হয়। জীবনাধিক কনিষ্ঠ ভ্রাতার শোকে তিনি নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই মদনমোহন যখন মুর্শিদাবাদ থাকেন, তখন তাঁহার পিতার সহসা মৃত্যু ঘটিল। তর্কালঙ্কার পিতৃশোকে বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন; এবং মৃত্যু-কালে পিতৃদেবের চরণদর্শন ঘটিল না বলিয়া সকলের নিকট আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যিনি তাঁহার জন্মদাতা, যিনি তাঁহার শিক্ষক, যিনি তাঁহার সুখদুঃখ সম্পদবিপদের আশ্রয় ও তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধু, তাঁহার বিয়োগসংবাদে তর্কালঙ্কারের হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইল। তর্কালঙ্কার তাঁহার স্নেহময় পিতাকে বড়ই ভালবাসিতেন ও দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। পিতার বাৎসল্যপূর্ণ মুখখানি মনে করিয়া তাঁহার নয়নে অবিরল জলধারা পতিত হইতে লাগিল। পিতার মৃত্যুসংবাদে পিতৃভক্ত মদনমোহন তিন দিন অন্নজল গ্রহণ করেন নাই—দিবানিশি রোদন করিতেন। পতি-পুত্রহীনা জননীর অবস্থা মনে করিয়া তাঁহার হৃদয়ে শোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কিরূপে বাটী গিয়া জননীর শোকমূর্ত্তি দর্শন করিবেন এই ভাবিয়া তাঁহার নয়নে অজস্র অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। তর্কালঙ্কারের ভগ্নীপতিগণ ও বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নী ও ভগ্নীগণ অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন। মাতামহী দেবতুল্য শ্বশুরের শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন।

পরদিন হইতে তর্কালঙ্কার পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার জন্য নানাবিধ দ্রব্য কিনিতে লাগিলেন। স্বর্গগত পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য তিনি ঘৃত-ময়দা চাউল-চিনি খাগড়াই বাসন বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট শয্যা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া নৌকাযোগে সমস্ত বিল্বগ্রামে পাঠাইয়া দিলেন; এবং তিন দিনের ছুটী মাত্র পাইয়া পরিবারবর্গসহ বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতৃ-ভ্রাতৃহীন শূন্য বাটী যেন তাঁহার অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল। পূর্ব্বে তিনি বাটী আসিলে তাঁহার পুত্রবৎসল পিতা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিতেন। ছোট ভাইটী দাদাকে দেখিলেই আনন্দে তাঁহার গলা ধরিয়া দাদা দাদা বলিয়া কত আব্দার করিত। আজ তাঁহাদের অভাবে গৃহ যেন শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল। মদনমোহনকে দেখিয়া পতি-পুত্রহীনা তাঁহার জননী ভূপতিতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কন্যাগণ ও বধূ সকলেই জননীর বৈধব্যবেশদর্শনে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। কন্যাগণ পিতাভ্রাতার শোকে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মাতামহী শ্বশুরদেবরের শোকে কাঁদিয়া অস্থির হইলেন। তখন গ্রামের সকলে আসিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া পিতৃকার্য্যের উপদেশ দিলেন।

দশম দিবসে তর্কালঙ্কার ক্ষৌরকার্য্যাদি সমাপন করিয়া পরদিন যথাবিহিত পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণভোজন ও বহু কাঙ্গালী ভোজন করাইলেন। বিল্বগ্রামের দলপতিগণ দলাদলির ঘোঁট করিয়া অনেকে আসিলেন না, কিন্তু বাহিরের বহুলোক আসিয়াছিলেন। মদনমোহন যে তিনদিন বাটীতে ছিলেন জননীকে সর্ব্বদাই সান্ত্বনা দিতেন। অশ্রুজলে মাতাপুত্রের বুক ভাসিয়া যাইত। কি করিবেন—চাকরীর ছুটী নাই, তাই অগত্যা সকলকে কিছুদিনের জন্য মাতার নিকট রাখিয়া তিনি একাকীই মুর্শিদাবাদ চলিয়া গেলেন।

পিতৃবিয়োগের কিছুদিন পরে তিনি তাঁহার বিল্বগ্রামের বাটীখানি দোতলা করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহা এমন সুন্দর সুদৃশ্য হইয়াছিল যে, দূর হইতে দেখিলে চিত্রিত পুরীর ন্যায় বোধ হইত। তর্কালঙ্কারের মধ্যম ভগ্নীপতির তত্ত্বাবধানেই তাঁহার বাটীখানি প্রস্তুত হইয়াছিল। উহা সম্পূর্ণ হইলে তিনি বাগান ও পুষ্করিণীর সংস্কার করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর মদনমোহন বেতন পাইলে জননীর হস্তেই ১০০৲ টাকা খরচের জন্য দিতেন। মদনমোহনের জননীকে বিল্বগ্রামে সকলেই ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। মদনমোহনের পত্নী গৃহকার্য্যে সুনিপুণা ও অত্যন্ত শ্রমপরায়ণা ছিলেন। যে কয়েক মাস তিনি শ্বশ্রূর নিকট বিল্বগ্রামে ছিলেন, স্বহস্তে রন্ধনপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতেন; সকলকে আহার করাইয়া অবশেষে স্বয়ং আহার করিতেন। পল্লীগ্রামে রন্ধনগৃহে শূদ্রপ্রবেশ নিষেধ। এজন্য মাতামহীকে গৃহের পবিত্রতারক্ষার জন্য স্বহস্তে পাকশালা পরিষ্কার করিতে হইত। তর্কালঙ্কারের পিতামহের গৃহদেবতা শালগ্রাম গৃহে ছিলেন; তর্কালঙ্কারের জননী তাঁহার নিত্যপূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। মাতামহী শালগ্রামসেবার জন্য পবিত্রভাবে অন্ন পাক করিয়া সকল বিষয়ে শুচিতা ও পবিত্রতা রক্ষা

করিতেন। তখনকার গৃহিণীরা বিদুষী ও বিদ্যাবতী ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদের মত কর্ত্তব্যপরায়ণা স্নেহময়ী দয়াবতী গুরুশুশ্রূষা-নিরত পতিসেবা-পরায়ণা নারী এখনকার দিনে সুদুর্লভ। আমি মধ্যে মধ্যে মাতামহীর নিকট বিষগ্রামে যাইতাম। তাঁহার গৃহকার্য্যে দক্ষতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। বালিকা বয়সে আমি তাঁহার শিক্ষানবিসী করিতাম। দয়াভক্তি স্নেহমমতার আদর্শময়ী মাতামহীকে দেখিয়া তাঁহার চরণে মস্তক বিনত হইত।

স্ব-তন্ত্রশিক্ষা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

[১৩১২ সালে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে দেশে যখন প্রথম জাতীয় ভাবের জাগৃতি দেখা দেয়, তখন তৎকালীন মনীষীগণ বঙ্গসন্তানদিগের জন্য জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া উহার আলোচনায় ও অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সময় সুপ্রসিদ্ধ সমাজতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "স্বতন্ত্র-শিক্ষার কল্পনা" নামে একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ ১৩১২ সালের ৫ই ফাল্গুনের 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত হয়। 'বসুমতীর' তদানীন্তন সম্পাদক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় উহা স্বকীয় পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়া এ সম্বন্ধে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। আমার লিখিত অভিমত "স্ব-তন্ত্রশিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ" নামে বসুমতীর পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটী পড়িয়া ইন্দ্রনাথ সুখী হইয়াছিলেন; এবং অধুনা উহা তাঁহার গ্রন্থাবলী মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই কারণে এবং ইহা ব্যতীত প্রবন্ধে যে সকল বিষয় অবতারিত হইয়াছে, সেগুলি বর্ত্তমানেও অনেক সময়ে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আলোচনার বিষয় হয়। তাঁহাদের আলোচনায় যৎকিঞ্চিৎ সহায়তা করিতে পারে এই বিবেচনায় অনেকে ইহা পত্রিকায় পুনঃপ্রকাশের জন্য আমাকে অনুরোধ করায়, ইহা প্রকাশিত হইল। শ্রীক্ষি.]

বসুমতীপত্রিকায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "স্বতন্ত্রশিক্ষার কল্পনা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছিল। আপনি তৎসম্বন্ধে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

প্রবীণ সমাজ-তত্ত্বজ্ঞের প্রবন্ধের উপর মতামত প্রকাশরূপ ধৃষ্টতাপ্রদর্শনে আমি অক্ষম। তবে বিষয়ের গুরুতাবিবেচনায় আমাকে দুই একটা কথা বলিবার অবসর ও অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

ইন্দ্রনাথ বাবু যে উপসংহারে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার ত মতভেদ নাই-ই। আমি প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় আজ পনয়ো-ষোল বৎসর এই মত প্রচার করিয়া আসিতেছি। আমার বিশ্বাস, কোন প্রকৃত নিরপেক্ষ স্বদেশহিতৈষীরও সে বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে না। "বঙ্গবাসী" সংবাদপত্র, শ্রদ্ধাস্পদ ইন্দ্রনাথ বাবু প্রভৃতি মহারথিগণকে ধন্য যে, তাঁহাদের ধারাবাহিক চেষ্টার ফলে অমোদপ্রিয়, সুতরাং পাশ্চাত্য সমাজের অনুরাগী অনেক নব্য সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণের হৃদয়ে স্ব-সমাজের প্রতি অন্ততঃ ক্ষণিক ও মৌখিক অনুরাগও আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। একটী প্রবাদ আছে যে, ভাল লোককেও ক্রমাগত চোর চোর বলিলে সে চোর হইয়া পড়ে এবং চোরকেও সাধু সাধু বলিলে সেও সাধু হয়। সেইরূপ আমাদেরও আশা হয় যে, এই সকল ব্যক্তি অন্ততঃ ক্ষণিক ও মৌখিক অনুরাগ দেখাইতে দেখাইতে পরিণামে সত্যই নিজ নিজ সমাজের গুণগ্রাহী হইবেন। এই বিষয়ে ইন্দ্রনাথ বাবু প্রভৃতি মহাশয়গণের অনুসরণ করিয়া যতটুকু সহায়তা করিয়াছি, ততটুকুই নিজেকে ধন্য মনে করি।

ইন্দ্রনাথ বাবুর প্রবন্ধের উপসংহারটুকু এই, "যে স্ব-তন্ত্র শিক্ষার গুণে আমাদের সমাজে শান্তির সুধাধারা প্রবাহিত হইত, সেই স্ব-তন্ত্র শিক্ষা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইলেই আবার আমরা সুখী হইতে পারিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর সেই স্ব-তন্ত্র শিক্ষা ভিন্ন যে সুখলাভের উপায়ান্তর নাই, ইহাই নিশ্চয়। আবার বর্ণাশ্রমের সুব্যবস্থায় আমাদিগকে ব্রতী হইতে হইবে, আবার ব্রাহ্মণাদির বর্ণক্রমে প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে হইবে, আবার এ সমাজে সন্তোষধর্ম্মা সদ্‌ব্রাহ্মণের পূজা যাহাতে প্রবৃত্ত হয়, সমাদর যাহাতে সমৃদ্ধ হয়, এবং মর্য্যাদা যাহাতে মানসে মুদ্রাঙ্কিতবৎ হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

আমরা যতদূর দেখিতে পাই, তাহাতে দেখি যে, ফলে অনেকের একমত হয়; কিন্তু সেই মত দাঁড় করাইতে গেলে যে কিরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত, তদ্বিষয়েই যত কিছু মতভেদ ও গণ্ডগোল। কথা এই বটে যে, "ব্রাহ্মণাদির বর্ণক্রমে প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে হইবে," কিন্তু কি উপায়ে তাহা সংঘটিত হইবে, তাহাই বিচার্য্য। আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, সাধারণত

মনুসংহিতাকে অবলম্বন করিয়া তৎপ্রদর্শিত পথে বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে, ও করিলেও টিঁকিতে পারিবে। তবে তাহাতে যে দুই চারিটী সাময়িক প্রথা উল্লিখিত আছে, তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিত্যাগ করিলেই চলিবে। মনুসংহিতার অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্র অনুসরণ করিতে হইবে।

"বর্ণাশ্রম সমাজ" যে কি অর্থে ইন্দ্রনাথ বাবু ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা প্রবন্ধের কোথাও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন নাই। সমগ্র প্রবন্ধটী পড়িয়া আমাদের অনুমান হয় যে, জাতিভেদরূপ ভিত্তির উপর সংগঠিত সমাজ অর্থেই বর্ণাশ্রম সমাজ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। জাতিভেদ ভাল কি মন্দ, তাহা এই ক্ষুদ্র আলোচনায় বিচার করা অসম্ভব, এবং আমি তাহা করিতেও ইচ্ছা করি না। এইমাত্র বলিতে পারি যে, জাতিভেদ কোন না কোন আকারে থাকিবেই। যখন ইহা থাকিবেই, তখন ইহার সুগঠন প্রদান করিলেই কি ভাল হয় না? আলোচনার ফলে আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, জাতিভেদ সম্বন্ধে মনুসংহিতার মন্ত্র এই যে, গুণকর্ম্মভেদের উপরেই জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত, এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়াও কর্ত্তব্য। পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি অস্বীকার করিলে সমাজের অস্তিত্বের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া এক ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণের উপযুক্ত কর্ম্ম করে, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণের পদবীতে রক্ষা কর এবং উপযুক্ত মর্য্যাদা দাও; কিন্তু যে ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া ব্রাহ্মণের অনুপযুক্ত মদ্যপান, ব্যভিচার, প্রতারণা প্রভৃতি কর্ম্মে আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়, তাহাকে যদি ব্রাহ্মণত্ব হইতে নামাইয়া দেওয়া না হয়, তবে পাপের দণ্ড কোথায়? সমাজের বিরুদ্ধে এরূপ গুরুতর পাপের দণ্ড সমাজের হস্তে থাকা কর্ত্তব্য। যে সমাজ এরূপ দণ্ড দিতে ভয় পায় বা অক্ষম, সেই ভীরু কাপুরুষ ও দুর্ব্বল সমাজের মৃত্যুই শ্রেয়।

কেবল পরলোকে শাস্তির কথা বলিলে চলিবে না, ইহলোকেও শাস্তি চাই। সেইরূপ যদি কোন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র-বংশ পুরুষানুক্রমে সাধুবৃত্তি অবলম্বন করে, তবে সেই সেই বংশ ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীর অধিকার পাইবে না কেন, তাহার ত কোন যুক্তি দেখিতে পাই না। যখন ভারতে এইরূপ গুণকর্ম্মভেদে জাতিভেদ সংঘটিত হইত, তখন আত্ম-বিচ্ছেদ বিবাদ কলহ প্রভৃতির কোনই কারণ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু যখন অবধি দোষ-গুণ-নির্ব্বিচারে জাতিভেদ জন্মানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল, তখন অবধিই মধ্যে মধ্যে গুরুতর আত্মবিচ্ছেদ বিবাদ-বিপ্লব প্রভৃতি সংঘটিত হইতে লাগিল। সমাজকে সজীব করিতে ইচ্ছা করিলে ন্যায়ের পুরস্কার এবং অন্যায়ের প্রতিবিধানের উপায় রাখিতেই হইবে। জন্মানুসারে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হইবার একটী প্রধান কারণ আলস্য। এইরূপ জাতিভেদের উপর দণ্ডায়মান সমাজে সজীবতার আবশ্যক হয় না।

উপসংহারে ইন্দ্রনাথ বাবুর সহিত আমি একমত হইলেও তাঁহার মূল প্রবন্ধের সহিত আমি মিলিতে পারি নাই। তিনি প্রবীণ ধর্ম্মভীরু হইয়াও সংস্কার বশতঃ নিজ সমাজের গুণকীর্ত্তনে অগ্রসর হইয়া অন্যান্য জাতির সমাজকে কটূক্তি করিয়াছেন। "ম্লেচ্ছাদিরা সর্ব্বাচারবিহীন গোখাদক এবং বেদের বিরুদ্ধভাষী ও বহুভাষী।" এই কথাগুলি বর্ত্তমানে হিন্দুদিগের শ্রুতিপ্রিয় হইলেও বলিতে বাধ্য যে, এগুলি অন্যায়রূপে উক্ত হইয়াছে। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমাদের বর্ণাশ্রমপ্রথা আমাদের সমাজের উপযোগী বলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, অথবা সমাজ হইতে ঝরিয়া পড়িবার উপযুক্তরূপ জীর্ণ হইয়া পড়ে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া এই প্রথাকে ইংরাজ-সমাজে রোপণ করিলেই যে সুফল হইবে, এ কথা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করা যায় না। ইংরাজ প্রভৃতি জাতি যদি সর্ব্বাচারবিহীন হইত, তাহা হইলে কি আজ তাহারা সর্ব্ববিষয়ে নেতৃত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইত? আমরা নিজেকে স্তোকবাক্যে সন্তুষ্ট রাখিতে পারি যে, আমাদের জড়তা ও আলস্য শ্রেষ্ঠতম উন্নতির নামান্তর মাত্র এবং অন্যান্য জাতির সজীবতা রূপান্তরিত অবনতি। আমরা দিবানিশি আলস্যশয্যায় শয়ন করিয়া কল্পনা করিতে পারি যে, আমরাই একমাত্র শুদ্ধাচারী ও ধর্ম্মের পারগামী এবং অন্যান্য জাতি সকলেই আচারবিহীন ও অধর্ম্মপরায়ণ। এইরূপ ভাবিয়া পরনিন্দা করিলেই কি আমরা ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইব এবং অন্যান্য জাতি নিরয়গামী হইবে? আমার ত সে ধারণা নাই। আমার বিশ্বাস যে, প্রত্যেক জাতিই আপনাপন গুণকর্ম্মের অভিব্যক্তি সাধন করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক জাতিরই সমাজে নিজ নিজ উপযোগী আচারব্যবহার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আমরা এখানে যেমন প্রকৃত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সম্মানদানে অগ্রসর হই, বিলাতেও সেইরূপ গ্লাডষ্টোনের ন্যায় মহাত্মাদিগের প্রতি ততোধিক সম্মান প্রদর্শিত হয়। গ্লাডোষ্টোনের ন্যায় ব্যক্তিগণ আমাদের দেশের ব্রাহ্মণের স্থান অধিকারে কিসে অনুপযুক্ত, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। গোখাদক নাম যে ম্লেচ্ছের প্রতি অর্পিত হইয়াছে, তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্বতন অনেক ঋষিও ম্লেচ্ছের শ্রেণীতে পড়িয়া যান। বর্ত্তমান হিন্দুজাতি সাধারণতঃ গোখাদক না হইয়াও যে অবনতি লাভ করিয়াছে, এবং অন্যান্য জাতি গোখাদক হইয়া যে উন্নতির

শিখরে আরোহণ করিতেছে, তাহাতে পূর্ব্বতন গোখাদক পবিত্র ঋষিদিগকেও ম্লেচ্ছ বলিয়া অভিহিত করিতে হয়; তাহা আমাদের পক্ষে শোভা পায় না; সেইরূপ বর্ত্তমান উন্নত জাতিসমূহকেও গোখাদক ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করাও আমাদের মহত্ত্ব ও ঔদার্য্যের পরিচায়ক নহে। গো অথবা কোন প্রকার জীবহিংসার সমর্থন করি না বটে, কিন্তু অযথা অপর জাতির নিন্দাও আমার প্রিয় নহে। ম্লেচ্ছগণ বহুভাষী, একথা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। ইন্দ্রনাথ বাবু স্বজাতি ও আশ্রমের প্রেমের স্রোতে আত্মসম্বরণে অক্ষম হইয়াছেন বোধ হয়। আমাদের ন্যায় বঙ্গবীরগণের এত বক্তৃতাও যে ইন্দ্রনাথ বাবুর কানে পৌঁছায় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। বহুভাষিত্বই যদি ম্লেচ্ছত্বের কারণ হয়, তবে আমার বোধ হয় সাধারণত বাঙ্গালীই ম্লেচ্ছদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থানলাভের অধিকারী। ম্লেচ্ছদিগকে বেদের বিরুদ্ধভাষী বলা কোন কাজেরই কথা নহে, কারণ তাহাদের মধ্যে কয়টা লোকে বেদের নাম শুনিয়াছে যে, তাহার বিরুদ্ধে কথা বলিবে? বরঞ্চ আমরা জানিয়া শুনিয়া বেদবিরুদ্ধ আচরণ করি বলিয়া আমাদিগের নিজেকেই ম্লেচ্ছ বলা কর্ত্তব্য। অপ্রয়োজনে অপরের প্রতি কটূক্তি আমার নিতান্তই অপ্রিয়, তাই এ সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিলাম।

ইন্দ্রনাথ বাবু জাপানের উন্নতিকে উন্নতিই বলেন না। উন্নতি, শ্রেষ্ঠতা এ সকলই আপেক্ষিক শব্দ। আমার পক্ষে যাহা উন্নতি, অপরের পক্ষে তাহা উন্নতি না হইতে পারে। আমার কিছু অন্নসংস্থান আছে, তাই আমি এই লিখিতেছি; কিন্তু একজন ব্যবসায়ী, যাহাকে নানাদিক্ দেখিয়া শুনিয়া নিজের ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে হইবে, তাহাকে লিখিতে বলিলে প্রকৃতপক্ষে কি তাহার অবনতির পথ উন্মুক্ত করা হইল না? জড়তা উন্নতি নহে, সজীবতাই উন্নতি। জাতি সজীব থাকিলে নিজ নিজ উন্নতির যথার্থ পথ নিজেই আবিষ্কার করিতে পারে। বৈদিক কাল কেন উন্নতির কাল ছিল? তখন সমাজ সজীব ছিল বলিয়াই উন্নতি হইত। কেবল বৈদিক কাল বলিয়া নহে, বেদেও এখনকার কালের উপযুক্ত নানা দুর্নীতির কথা যথেষ্ট উল্লিখিত আছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও উন্নতি হইয়াছিল—সজীবতা ছিল। পার্থিব উন্নতির প্রতি পরাঙ্মুখতা প্রদর্শিত হইত না, প্রত্যুত তাহাকেই আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান করা হইত। যখন অবধি মোহান্ধতা প্রযুক্ত ঋষিদের মনোগত অভিপ্রায় অবগত না হইয়া সাধারণ ব্যক্তি পরা ও অপরা বিদ্যার মধ্যে বিভাগের একটা প্রাচীর সংস্থাপন করিল, তখন অবধিই আমাদের অবনতির সূত্রপাত।

আর একটী বিষয় বলিয়া আমি আপনার নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। ইন্দ্রনাথ বাবু যে যুক্তিবলে বর্ণাশ্রমসমাজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

তিনি বলেন "অনাদি কাল হইতে আজি পর্য্যন্ত এই বর্ণাশ্রম-সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত আছে; অনন্তকাল এ সমাজ প্রতিষ্ঠিতই থাকিবে। * * * কোথাও বর্ণাশ্রম সমাজের বন্ধনের শৈথিল্য ঘটিয়াছে, তাহাও সত্য; দিন দিন যেন বর্ণাশ্রম সমাজের শক্তিক্ষয় হইতেছে, ইহাও অস্বীকার করি না। কিন্তু এই যে শত শক্তিক্ষয় ও অঙ্গহীনতা ও বন্ধন-শৈথিল্যের মধ্যেও "বর্ণাশ্রম সমাজ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, অদ্যাপি আত্মরক্ষণ করিয়া চলিতেছে, * * * বর্ণাশ্রমসমাজের এই স্থায়িত্বই বর্ণাশ্রম-সমাজের শ্রেষ্ঠতার এক প্রধান নিদর্শন।" অনাদি কাল আমরা বর্ত্তমান শরীরে ছিলামও না এবং অনন্তকালও থাকিব না; সুতরাং ইন্দ্রনাথ বাবুর বর্ণাশ্রম সমাজের চির অস্তিত্ব-বিষয়ক যুক্তির যাথার্থ্য পরীক্ষা আমাদের পক্ষে দুর্ঘট। তবে ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, ভারতের আর্য্যদের সমাজে বিপ্লব ও পরিবর্ত্তনের বহুল তরঙ্গ চলিয়া গিয়াছে। ইন্দ্রনাথ বাবুরও উক্তি আলোচনা করিলে সন্দেহ হয় যে, তিনিও এই বর্ণাশ্রম-সমাজের চিরস্থায়িত্ব স্বীকার করেন না। যে সমাজের অঙ্গহীনতা ঘটিতে পারিল, বন্ধন-শৈথিল্য আসিতে পারিল, এবং শক্তিক্ষয় সম্ভব হইল, সে সমাজের চিরপ্রতিষ্ঠা ও অটুটত্ব কোথায়? এই সকল সত্ত্বেও যদি বর্ণাশ্রম সমাজের অস্তিত্ব থাকে, তবে তাহা নিশ্চয়ই বর্ণাশ্রম-সমাজের নিজের গুণে নহে, কিন্তু প্রয়োজনের বলে এবং দেশের মাটীর গুণে। যে দেশে পরিবর্ত্তন-মাত্রই সসঙ্কোচে দৃষ্ট হয়, যে দেশের অধিবাসীগণ বসিতে পাইলে দাঁড়াইতে চাহে না, সে দেশে যে কোন প্রথা অনিষ্টকর হউক বা ইষ্টকর হউক, প্রয়োজনীয় হউক বা অনাবশ্যক হউক, একবার কোন সূত্রে প্রচলিত হইয়া গেলেই তাহার চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করা কিছু আশ্চর্য্য কথা নহে। যে যুক্তিবলে ইন্দ্রনাথ বাবু আমাদের দেশের বর্ণাশ্রম-সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, সেই যুক্তিবলে বোধ হয় প্রত্যেক সমাজ অন্তত প্রত্যেক সভ্যসমাজ নিজ নিজ সুপ্রতিষ্ঠতা ও অটুটত্ব প্রমাণ করিতে সমর্থ।

আমি যথেষ্ট ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছি, তজ্জন্য আশা করি ইন্দ্রনাথ বাবু এবং আপনি এবং পাঠকবর্গ আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। সত্যই বর্ণাশ্রম সমাজের প্রতি আমার একান্ত অনুরাগ বলিয়াই আমি এত কথা বলিলাম। কেবল মুখে বলিলে কি হইবে যে, আমাদের

naturally was glad to find the knowledge he was seeking in the Sastras of his own country. His former impression was that Hinduism was all Idolatry, but he now found Monotheism in it. He betook himself therefore to a study of the Upanishads under Pandit Ramchandra Vidyavagisa, his first religious tutor.

34. Tattwabodini Sabha—*Aswin* 1764 *Saka* Oct. 1839.

In order fully to investigate the doctrines of monotheism, contained in the Vedantas and other Hindu Sastras, as also for the diffusion of monotheistic truths among his countrymen, Devendranath, in conjunction with some of his friends, established the *Tattwabodhini Sabha* in the month of Aswin 1761, *Saka* (Oct. 1839, A.D.) in the 22nd year of his age. "The *Tattwabodhini Sabha* or Society for the Communication of Truth was," says Miss Collet, "a Society whose avowed object was to sustain the labours of Ram Mohun Roy, by introducing gradually among the natives of this country the monotheistic system of divine worship inculcated in the original Hindu scriptures." As far as however can be learnt from the original records of the Society, and other information furnished by native friends, the avowed object of the *Tattwabodhini Sabha* was not so much to follow in the very footsteps of Ram Mohun Roy as to make deeper investigations of divine knowledge from the Sastras than Ram Mohun Roy had done. Ram Mohun Roy's researches were, however, a great help to them.

35. Important event in each decade.

The *Tattwabodhini Sabha* was established in Saka 1761 (1839). It is to be noted that the first year of every decade of the history of the *Brahma Somaj* has been marked by a very important event. These important events are noted below.

36. Revival of Atmiya Sabha—1741 *Saka.*

Saka 1741. Revival of the *Atmiya Sabha* of "Friendly Society," after the termination of the Supreme Court Law-suits in which Ram Mohun Roy was involved. Had the *Atmiya Sabha* not been revived, there would have been no *Brahma Samaj* at all.

37. Parmanent building of the Samaj—1751 *Saka.*

1751. Establishment of the *Brahma Samaj* in a permanent form by its removal to its own building at Jorasanko.

38. Tattwabodhini Sabha—1761 *Saka.*

1761. Establishment of the *Tattwabodhini Sabha.*

39. Brahma Dharma Grantha—1771 *Saka.*

1771. Publication of the *Brahma Dharma Grantha* or the Book of the Religion of the One God.

40. Brahma Vidyalaya—1781 *Saka.*

1781. Establishment of the *Brahma Vidyalaya* or Brahma School by Devendranath Thakur and Kesub Chunder Sen for the diffusion of Brahma Dharma among the younger section of the community.

41. Agitation against Man-worship—1791 *Saka.*

1791. Great agitation against the doctrine and practice of Man-Worship on the part of certain Brahmas, and consequent purification of the church from such abuses.

42. Tattwabodhini Sabha—Its members and work.

To return to our narrative. The *Tattwabodhini Sabha* was joined by the richest and most influential members of the Hindu

community, among whom Maharaja Mahtaba Chandra Bahadur of Burdwan, Raja Srisa Chandra Roy of Nudea, Raja Satyacharan Ghosal Bhukailas, Jayakrishna Mukerji, Mahesh Chandra Sing and other Rajas and Zemindars stood forth as the immediate companions and friends of Devendra nath to promote the views of the Society. They availed themselves chiefly of the Vedanta among other Hindu Sastras to diffuse monotheism. "The Society," says Miss Collet "held regular weekly meetings at Devandanath's house, where discourses on religious subjects were delivered. Besides these, monthly meetings were held for worship when prayers were offered, and texts from the Upanishad were recited and expounded." Pandit Ramchandra Vidyavagisa officiated as minister, there was an assemblage of three hundred persons at the second aniversary of the Society. They were called Vedentists at this time because they based their religious faith chiefly on the Vedanta or Upanishads.

43. Tattwabodhini Patrika and its object.

The *Tattwabodhini* Society had a veneration for the Hindu Sastras and availed itself of extracts from these great depositories of the national faith in its writings for disseminating its doctrines among the people. The first number of its organ, the *T. Patrika* declares the great "object of the publication of that journal to be the extraction of the essence of the Sastras, for the communication of the knowledge of God and of the true mode of worshipping Him, as well as for showing that his worship was the best of all kinds of divine worship." The *Tattwabodhini Sabha* was therefore strictly a national institution. Devendranath had henceforward to contend with many of his friends, especially lately with Kesub Chunder Sen, to maintain the national character of the *Brahma Samaj* and the catholic nature of *Brahma Dharma*.

44. Amalgamation of T. Sabha and the Brahma Samaj.

In 1762 Saka (A.D. 1840) Devendranath took charge of the management of the *Brahma Samaj*, which was then in a very neglected state, being alone supported by the bounty of Dwarkanath Thakur, and upheld by the ministration of Ramachandra Vidyavagisa. Soon after this the *Tattwabodhini Sabha* and *Brahma Samaj* were amalgamated. The monthly prayer meetings of the *Tattwabodhini* were abolished and a monthly *Samaj* was held instead. This *Samaj* is now held in the morning of the first Sunday of every month. The religious functions of the *Tattwabodhini* were henceforth transferred the *Brahma Samaj*, and it became simply propagandistic association from that time.

We shall now proceed to relate as briefly as possible the acts of the *Tattwabodhini Sabha* before its amalgamation with the *Samaj*, and their joint efforts after their incorporation in the cause of reform. But before doing so, it is somewhat necessary to clear up a discrepancy occurring in the sources of my information respecting its first foundation, and the lasting services it rendered the *Samaj*.

45. Discripancy *re.* the foundation of T. Sabha.

The information kindly furnished by Rajnarain Bose, the present President of the *Adi Brahma Somaj* acquaints us with the origination and foundation of the *Tattwabodhini* by Devendranath in the 22nd year of his age, in the month of Aswin 1761. Saka (A.D. 1839). But the *Itivritta* states

সমাজে ধর্ম্মের প্রাধান্য ? কোথায় তাহার পরিচয় ? ‘একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথার ফলে আমরা সুবিধা পাইলেই জ্ঞাতিগোষ্ঠীর গলে ছুরিকা বসাইতে কুণ্ঠিত হই না ; ধর্ম্মের নাম করিয়া মদ্য-পান ও ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিই, আমাদের সমাজের মঙ্গল কোথায় ? আমাদের সমাজ যে এখনও আছে, ইহাই আশ্চর্য্য। যেমন স্বদেশী সম্বন্ধে একটা আনন্দজনক ভাব সকলের মনে জাগ্রত হইয়াছে, সেইরূপ সমাজ সম্বন্ধেও একটা দৃঢ়ভাব জাগ্রত হইলেই আমাদের মঙ্গল। স্বদেশী হাঙ্গামার ন্যায় এই বিষয়ে হল্লা করিলে চলিবে না। কয়েকটী নেতৃপদস্থ ব্যক্তি একত্র হইয়া অগ্রসর হইলেই প্রচুর কার্য্য হইবে। বিবাহ প্রভৃতি কার্য্যে যে ‘সামাজিক’-গ্রহণরূপ আত্মীয়ের পীড়ন অন্যায়, ইহা ক্রমশঃই সমাজের মধ্যে বদ্ধমূল হইতেছে, কিন্তু ইহার জন্য টাউনহলে কয়টা সভা হইয়াছিল ? সামাজিক শিক্ষা, স্ব-তন্ত্র শিক্ষা সমাজের মুখপত্রদিগের হস্তে এবং প্রত্যেকের নিজের নিজের হস্তে। এখানে কাপুরুষ ভীরুদের স্থান নাই। এই সকল বিষয়ে কথা কহিতে গেলেই ঐ সেই মুখ্য কথায় আসিয়া পড়িতে হয়।

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠাতেই শরীর, মন ও আত্মার তেজ আসে, সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা দূরে পলায়ন করে। বিদেশীয়ের হস্তে অপরা বিদ্যা শিক্ষাদানের সংস্র বন্দোবস্ত থাকিলেও ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত থাকিলে পরা বিদ্যা স্বতই হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দাও, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবার একটা অবসর দাও। এইরূপ উপায়সকল অবলম্বন করিতে করিতে তবে আমাদের হারানিধি শান্তি-সুখ যথাসময়ে খুঁজিয়া পাইব ; সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। ভগবানকে প্রাণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, পারি না কেন ? ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। শরীর ও মন দুর্ব্বল, এই কথা একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য এতদিন অবলম্বন করি নাই। বেশ, আজ হইতেই তাহা করিব এবং দৌর্ব্বল্যকে আমার নিকটে পদার্পণ করিতে দিব না। ভগবান্—আমার প্রাণের ভগবান্—তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিব ? পারিব না—তাহা পারিব না। লোকে যে যাহা ইচ্ছা বলুক, পাগল বলুক বা জ্ঞানী বলুক, আমি ব্রহ্মচর্য্যের বল বুঝিয়াছি ; সুতরাং কেহই আর আমাকে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। এই প্রকারভাবে নিজেকে নিযুক্ত কর, দেখিবে ভারতের মুখশ্রী অন্যভাব ধারণ করিবে।

THE

BRAHMA SAMAJ

UNDER

DEVENDRANATH THAKUR.

CHAPTER II.

(4)

29. His enquiry after truth.

The commencement of this search was the grand turning point in Devendranath's life. It gave rise to all his philosophical enquiries, all his religious studies, and all his religious acts.

He studied works of philosophy to ascertain whether the object that attracted his soul really existed, or was merely due to imagination. Should he place his love on a nonentity ? That cannot be. While prosecuting his philosophical enquiries, he did not neglect to study the works of atheistical and sceptical writers. As a conscientious enquirer, he thought it his duty to examine both sides of the question. But his mind trembled when he felt the arguments of such writers to be strong ; it rejoiced, yea it rojoiced in a degree beyond description when he found them refuted by stronger writers on the side of Theism. The nature of his philosophical studies can be perceived from a mention of the writers, whom he studied one after another on the subject. They were Hume, Browne, Fichte, Kant and Cousin. The last he considers to be his greatest *Guru* among philosophers. His love of and thirst after God led him to study the writings of religious men with greater avidity than those of philosophers, but he no-where found such peace and consolation for his troubled soul as in the Upanishads. The said love of and thirst after God led him to try to perform the works which He loves best, and especially to propagate His holy religion. This brought

about the establishment of the *Tattwabodhini Sabha* and the improvement of the *Brahma Samaj*. His life is a complicated tissue of the celestial vision, which, though it rarely crossed the path of his life, aye as rarely as the flower of the aloe tree, to quote the simile of Theodore Parker, greets the human vision, influenced it all along,—philosophical inquiry religious study and religious action, interweaving simultaneously their webs with one another. He once said he himself could not unravel the tangled skeins of such a life. How could then any historian succeed in doing so? But, however complicated its texture be, it can be summed up in two words; continual love of, and thirst after, his beloved God.

30. His *Smasana-vairagya.*

But to resume our narrative. The death scene related above produced in Devendranath what he himself calls a *Smasana vairágya*, or indifference to worldly matters proceeding from a death scene, but it was not of a transient nature as that expression ordinarily implies. It gave a tone of settled melancholy and religious devotion, to his mind for ever afterwards. He felt no pleasure in the company of his friends but used often to withdraw from society and retire to the Botanical Gardens at Seebpore, where he spent whole days in silent meditation, seeking the heavenly light which had flashed on him before. This contemplative disposition gave such a turn to his future life and conduct that he has ever afterwards been known to take a deep delight in solitude and lonely communion with the Father of the Universe.

31. Analogy with Buddha and Luther.

We find a striking analogy between the turn given to Devendra's mind by a death scene and incidents in the life of the two great reformers of the East and West—the celebrated Buddha and renowned Luther, both of whom took a like predilection to religion from causes similar to those which influenced the Brahmic reformer.

Of Luther it is said that walking one day with a fellow student in the fields, he saw his companion struck dead by lightning, an occurrence which so affected him that he determined thenceforward to retire from the world, and devote himself to a monastic life. Almost the same cause induced the holy Buddha to renounce the pleasures of a palace and lead a life of mendicancy and meditation in the deep recesses of forests.

32. His finding *Isopanishad-leaf.*

The History of the *Samáj* gives a long account of Devendranath's indifference to worldly possessions proceeding from his resignation to God. He is mentioned to have been so transported with spiritual joy and delight, that he considered wealth valueless, in comparison with the inward felicity (*Brahmananda*) arising from meditation. In this state of mind he happened one day to take up a stray leaf of Isopanishad, in which he met with the following remarkable passage: "Whatever is in this world is full of the Deity. Practising abstinence, enjoy Him, and do not covet the riches of any." In these words he found an exact counterpart of his religious sentiments. This attracted his attention to the study of the doctrines of the Upanishads or the Vedanta, and led him soon after to embrace its precepts as the only true guide to real happiness here and hereafter.

33. His Study of Upanishadas.

When he was at a loss to determine where to go for religious knowledge, he

that he joined it in 1763 Saka (A. D. 1841), or two years after it had really been established, without mentioning the original founder. It is strange how the history of an institution like the *Brahma Samaj*, not yet 50 years old, and written by natives, should thus disagree in such material points.

46. Early days of T. Sabha.

The *Tattwabodhini Sabha* began on a poor scale, its members comprising at its beginning only ten young men, who were required to contribute one-sixtieth part of their respective incomes for its necessary expenses. Its main object was the investigation of truth, and the diffusion of knowledge among the people. It held weekly meetings for discussions, monthly prayer meetings, and annual meetings on the 21st Aswin (September). under the guidance of Ramachandra Vidyavagisa its Minister. After its union with the *Brahma Samaj*, the order of these meetings was of course changed. At the present day, the monthly prayer meetings are held at the *Samaj* on the first Sunday morning of every Bengali month. The day of the anniversary meetings was changed to the 11th Magh of every year, that being the day on which Ram Mohun Roy permanently removed the *Samaj* to the present building at Jorasanko.

47. Unian of *T. Sabha* with Brahma Samaj and its benificial results.

The incorporation of the *Tattwabodhini Sabha* and the *Brahma Samaj* was attended with beneficial results to the latter, The *Samaj*, which had been almost deserted, was now well attended. Hitherto the recitation of the Upanishads, with the exposition of scriptural texts, and a chanting of hymns, composed the whole service. Devendranath now introduced a regular form of worship, including prayers to God for spiritual light and strength. Ram Mohun Roy had inculcated a mode of worship in his *Avateramika*, but it was found difficult for the majority to understand or practise it; it was therefore laid aside as impraticable and useless.

48. Covenant (*Diksha-Grahan*) introduced —7th *Poue*, 1765 *Saka*. (A. D. 1843)

Hitherto the profession of Brahmaism was with the majority of its followers merely nominal, without any practical results. A Brahma was in many respects no better than an idolator, for though he was an anti-idolator in public, at home he conformed to all the idolatrous usages of his country. Devendanath Thakur therefore, at this time, not only introduced a regular form of worship into the *Samaj* but the Brahmic covenant also, requiring the signature of every member, sincerely embracing its faith and tenets by a solemn renunciation of idolatry. Twenty members of the *Tattwabodhini Sabha*, including Devendranath, took the covenant before Ramchandra Vidyavagisa, the minister of the *Samaj*, on the 7th Pous, Saka 1765 (A. D, 1843). Chunder Sekhar Dev and Nandakishore Bose, two of Ram Mohun Roy's disciples also signed the Brahmic covenant.

49. 'Vedantic faith' changed to *Brahma Dharma* – 11th pous, 1768 *Saka*. (A. D. 1846)

The first vow in the covenant contained the words, "I embrace the Vedantic Faith." The words "Vedantic Faith" were changed afterwards to "Brahma Dharma," at a meeting of the *Tattwabodhini Sabha* held on the 11th Pous 1758 Saka (A. D. 1846), at the proposition of Rajnarain Bose, seconded by Akhaya Kumar Datta. The Brahmas, however, still called themselves Vedantists in all their writings.

প্রার্থনা।

হে মঙ্গলবিধাতা! তোমার মঙ্গলবিধান পূর্ণ হউক। আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি; তুমি যে কোন্ কার্য্যকে কি ভাবে তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত কর, আমরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারি না। তুমি বিগতবিবাদ। তোমার সন্তান হইয়া আমরা বৃথাই বিবাদকলহে প্রবৃত্ত হই। আমাদের পরস্পরের মধ্য হইতে সেই বিবাদবিসম্বাদ বিদূরিত কর।

পরলোকগত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরীর স্মৃতিকল্পে।

পত্রিকার মুদ্রাঙ্কন যখন শেষপ্রায়, তখন এই মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদ আমাদের কর্ণগোচর হইল যে, তত্ত্ববোধিনীর অন্যতর সুধী সম্পাদক আমাদের পরমবন্ধু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডাক্তার বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস-সি আর ইহজগতে নাই। গত ২০শে ফাল্গুন বুধবার অপরাহ্নে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ায় তিনি তাঁহার বালীগঞ্জের বাসভবনে হঠাৎ পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। ইঁহাকে যে এত শীঘ্র হারাইতে হইবে, তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

আমার যখন বয়স চৌদ্দ বৎসর, তখন আমি সংস্কৃত কলেজ হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজী ও বিজ্ঞান পড়িবার জন্য যাইতাম। আমি নীরবে যাইতাম, নীরবে চলিয়া আসিতাম। সহপাঠীদিগের মধ্যে কাহারও সহিত বিশেষ কোন আলাপ-পরিচয় হয় নাই,—আলাপ-পরিচয় করার অভ্যাস আমার ছিল না। একদিন ডাঃ চৌধুরী (তখন অবশ্য ডাক্তার হন নাই) আর একটি সহপাঠীর সহিত মিলিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ফিরিবার পথে আমাকে আটকাইয়া বলিলেন যে, আমরা আপনার সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে ইচ্ছুক এবং তাঁহারা আমার বাড়ীতে আসিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; আমি আনন্দের সহিত তাহাতে সম্মতি জানাইলাম। পথে দাঁড়াইয়া দুইচার মিনিটের জন্য যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার বিনয় ও চরিত্রমাধুর্য্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলাম। সংস্কৃত কলেজে মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় আমার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার নিকট ইতি-পূর্ব্বেই ডাঃ চৌধুরীর শ্বশুরমহাশয় ৺হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের গুণগ্রামের বিষয় অনেক কিছু শুনিয়াছিলাম। তর্কালঙ্কার মহাশয় ও চৌধুরী মহাশয় উভয়েই আমাদের বাড়ীর অতি নিকট অবস্থিতি করিতেন। উভয়েই ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী। একজন তথাকার খ্যাতনামা পণ্ডিত, অপরজন তথাকার সুপরিচিত জমীদার। আমি শুনিয়াছিলাম যে, হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সহিত পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচয় ছিল। গুণী ব্যক্তি গুণীর মর্য্যাদা বুঝেন। চৌধুরী মহাশয় সংস্কৃত ও দর্শনাদিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পরিচয় শুনিয়া আমার বিশেষ আনন্দই হইল।

আমার সহিত প্রথম পরিচয়ের পর ডাঃ চৌধুরী আমার গৃহে মাত্র দুই-তিনবার আসিয়াছিলেন। হঠাৎ একদিন শুনিলাম যে, তিনি বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য বিলাত গমন করিয়াছেন। তাহার পর প্রায় সাত বৎসর অতীত হইয়া গেল, এই সময়ে আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার পত্রাদি-বিনিময় হয় নাই। তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়া এবং জীবতত্ত্ববিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইয়া প্রত্যাগমের পর প্রথমেই তিনি তাঁহার এক বিলাতপ্রত্যাগত সহপাঠী বন্ধুর সহিত আসিয়া আমার সহিত দেখা করিলেন। এই দ্বিতীয় বন্ধু ডাঃ ৺দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঘটনাসূত্রে আমাদের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ডাঃ চৌধুরী তাঁহার বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেন। সেই সময়ে ডাঃ চাটুর্য্যের গৃহে গমনাগমন উপলক্ষে ডঃ চৌধুরীর সহিত আমার পরিচয় বিশেষ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়া বক্ষ ফুলিয়া উঠে নাই, সেকালে এইরূপ তরুণ যুবক ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু ডাঃ চৌধুরীর আচারব্যবহারে সেরূপ গর্ব্বের ভাব তিল-মাত্র প্রকাশ পাইত না—সেই পূর্ব্বের ন্যায় বিনয়-নম্রভাব আর কথাবার্ত্তায় অপূর্ব্ব মাধুরী। আমি তখন মাত্র কয়েক বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াছি—জীবতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে আমি খুবই অজ্ঞ ছিলাম। ডাঃ চৌধুরীর বিনম্র স্বভাব এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ-সম্বন্ধীয় তাঁহার জ্ঞানগর্ভ কথাসকল আমাকে খুবই আকর্ষণ করিত। আমি প্রায় নিত্যই তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে যাইতাম। তিনি বিজ্ঞানের একজন মহারথী হইলেও আশ্চর্য্য এই যে, সংস্কৃত সাহিত্য-দর্শনাদিতেও তাঁহার অনুরাগ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কি বিজ্ঞান, কি ইংরাজী সাহিত্য-দর্শনাদি, কি সংস্কৃত সাহিত্য-দর্শনাদি, সকল বিষয়েই তিনি যে জ্ঞানরাজী সঞ্চিত করিয়াছিলেন, তাহা নির্ভুল ছিল। আমি তাঁহার নিকট যে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া যে উত্তর পাইয়াছি, তাহাতে একটিও ভুল খুজিয়া পাই নাই। বলিতে কি, তাঁহার সহিত প্রত্যেক-বার আলাপেই আমার তাঁহাকে সজীব জ্ঞানভাণ্ডার বলিয়া মনে হইত।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর যখন সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে মৎস্য-কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল, তখন জীবতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকায় ডাঃ চৌধুরী উক্ত কমিশনে সার কৃষ্ণগোবিন্দের দক্ষিণহস্তরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে মৎস্য-সম্বন্ধীয় নানা তত্ত্ববিষয়ে তিনি যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়া-ছিলেন, তাহা হইতেই জীবতত্ত্ব-বিজ্ঞানের মহলে তাঁহার খ্যাতি সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সম্ভবত ইহার ফলেই তিনি কলিকাতা যাদুঘরের জীবতত্ত্ববিভাগের পরিদর্শক-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন ভারতীয় এই গৌরবপূর্ণ উচ্চ পদ লাভ করিতে পারেন নাই। এই পদ লাভ করিয়া তিনি যাদুঘরের জীবজন্তুর দেহগুলি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুসজ্জিত করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন এবং জনসাধারণের অনুসন্ধিৎসার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। জীবতত্ত্ববিভাগে তিনি এতই প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যে, ভারতে মধ্যে মধ্যে যে বিজ্ঞান-মহাসভা আহূত হয়, এদেশে জীবতত্ত্ববিদ্ বহু ইংরাজ থাকিতেও উক্ত মহাসভার এক অধিবেশনে জীবতত্ত্ব-বিভাগের তিনি একবাক্যে সভাপতি-রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। জীবতত্ত্ববিষয়ে তাঁহার ন্যায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ভারতে দ্বিতীয় কেহ আছেন কি না সন্দেহ।

তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ

করিবার পর জীবতত্ত্ববিষয়ে বঙ্গভাষায় একটী আপ্-টু-ডেট্ গ্রন্থ লিখিয়া যাইবেন। এই উদ্দেশ্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে তিনি মেণ্ডেল-তত্ত্ব বিষয়ক কয়েকটী ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তিনি গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিতে পারিলেন না।

না পারিবার একটি প্রধান কারণ তাঁহার অদম্য জ্ঞানপিপাসা। তিনি বলিতেন যে বর্ত্তমান যুগে জ্ঞানের প্রসার এত দ্রুতগতিতে বিস্তৃত হইতেছে যে, ঘরে বসিয়া বই পড়িয়া নিজের জ্ঞানকে হাতনাগাৎ করিয়া আনা অসম্ভব; তাহার পরিবর্ত্তে যে বিষয়ে যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যেখানে নিজ নিজ অধীত বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন, সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারই মুখে সেই বিষয়ে তত্ত্ব সংগ্রহ করা উচিত। এই কারণে এই কলিকাতা নগরীর কোন সভাসমিতিতে এমন কোন সারবান বক্তৃতা হইত না, যেখানে তিনি উপস্থিত হইয়া মধুমক্ষিকার মধুসংগ্রহের ন্যায় জ্ঞানতত্ত্ব-সংগ্রহে রত না থাকতেন। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞান ও সাহিত্যবিষয়ক সকল অনুষ্ঠানেই, বিশেষত এদেশীয় হিতকর অনুষ্ঠান মাত্রেই তিনি তাঁহার সহযোগিতা প্রদান করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। তাঁহার কর্ম্ম হইতে অবসরগ্রহণের পর কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ যখনই তাঁহাকে জীবতত্ত্ববিষয়ে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন, বিনা দ্বিধায় তিনি তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন।

তাঁহার জ্ঞানপিপাসার ন্যায় তাঁহার হৃদয়ের উদারতাও বহুবিস্তৃত ছিল। তিনি সাধারণব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইলেও তাঁহার হৃদয়ের উদার ভাব লক্ষ্য করিয়া আমি যখন তাঁহাকে আদিব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার সভ্য হইবার জন্য অনুরোধ করিলাম, তখন তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহা স্বীকার করিলেন এবং কিছুদিন পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকারও সহযোগী সম্পাদক হইতে সম্মত হইলেন। শুধু মুখে নহে, কিন্তু কার্য্যতঃ আদিব্রাহ্মসমাজের এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কিরূপে উন্নতি সাধিত হইতে পারে এবং তাহাদের পূর্ব্বগৌরব ফিরিয়া আসিতে পারে তদ্বিষয়ে উপদেশ ও পরামর্শ প্রভৃতি দিয়া আমাকে যে তিনি কি পর্য্যন্ত সাহায্য করিয়াছেন, তাহা মুখে প্রকাশ করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না।

আদিব্রাহ্মসমাজে যে কোন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা অনুষ্ঠিত হইত, সেই উপাসনাসভাতেই তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দেখা যাইত। কেবল গত মাঘোৎসবে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া তিনি বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তাঁহার হৃদয়ের উদারতাও যেমন স্বাভাবিক ছিল, তাঁহার অমায়িক ভাবও সেইরূপ স্বাভাবিক ছিল; একবার যিনিই তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছেন তিনিই তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। এই কারণে কাহারও সহিত তাঁহার শত্রুতা ছিল না। বন্ধুবান্ধবের মধ্যে তিনি অজাতশত্রু বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

ইঁহার মৃত্যুতে আমি যে শেলসম আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে পারিব না। তিনি আমার নিকট জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারও অধিক ছিলেন। কিন্তু তদপেক্ষা আমার হৃদয়ে অধিক আঘাত পাইতেছি এই স্মরণ করিয়া যে, কেবল তাঁহার নিজের পল্লীবাসী নহে, কিন্তু এই বঙ্গদেশের বহু বহু অসহায় ছাত্র তাঁহাদিগকে সুপরামর্শ ও অর্থদান প্রভৃতি নানা ভাবে ও উপায়ে সহায়তা করিবার এক অকৃত্রিম বন্ধু হারাইলেন। তাঁহার বিধবা পত্নী এবং কন্যা ও জামাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি পরিজনবর্গকে কি ভাষায় যে সান্ত্বনা প্রদান করিব তাহা জানি না—তাঁহাদিগকে এইটুকু বলিতে পারি যে, তাঁহাদের পক্ষে ইহা কম সান্ত্বনার কথা নহে যে, এই জ্ঞানবীর ও কর্ম্মবীরের মৃত্যুতে সমগ্র শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রাণ হইতে গভীর ক্রন্দনধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। পরম পিতা ও পরম মাতা পরমেশ্বর তাঁহার বিশ্বজগতের যেখানে পরলোকগত জ্ঞানোন্নত ধর্ম্মোন্নত আত্মার উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, দেবতাদিগের আনন্দধ্বনির মধ্যে তিনি সেখানে সমুদিত হইবেন নিঃসন্দেহ। ভগবান তাঁহার মঙ্গলভাবের রক্ষাকবচে পরলোকগত আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন এবং তাঁহার পরিজনবর্গের অন্তরে শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া এই দুর্ব্বহ শোকভার বহন করিবার শক্তিসামর্থ্য প্রদান করুন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই প্রার্থনা করি।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সংবাদ।

রাজনৈতিক বন্দীগণের মুক্তি—মহাত্মা গান্ধীর সহিত মহামতি লর্ড আরউইনের মীমাংসার ফলে অনেকগুলি রাজবন্দী মুক্তিলাভ করিতেছেন ও করিবেন, এবং এইরূপে শান্তির হাওয়া এদেশে আবার চলিতে আরম্ভ করিবে; এ সংবাদে সমগ্র ভারতবাসীর অন্তরে জীবন্ত আশার সঞ্চার হইতেছে। আমরা চিরদিনই শান্তির ভিখারী। ব্যাপক শিক্ষার প্রভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকার লাভের যে প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহা কতক পরিমাণে পূর্ত্তিলাভ করিতে না পারিলে সে শান্তিলাভ যে সুদূরপরাহত, তাহা শাসক ও শাসিত উভয়েই তুল্যভাবে অনুভব করিতেছেন। স্থিরধী রাজপ্রতিনিধি এক্ষেত্রে নানা বাধার মধ্যে যে দূরদর্শনের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই প্রশংসনীয়। অন্যদিকে সমগ্র ভারতের মুক্তিমার্গের পথপ্রদর্শক ত্যাগী মহাত্মা গান্ধী যেভাবে দেশের ভাগ্যতরণীর কর্ণধার হইয়া উহাকে প্রকৃত কল্যাণের দিকে চালাইতেছেন এবং আপনার জীবন্ত প্রভাব শাসক ও শাসিত উভয়ের উপরে ভগবৎপ্রেরণার বলে বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাতে আমাদের দৈন্য যে বহুপরিমাণে অচিরে প্রশমিত হইয়া যাইবে, তাহা এক প্রকার সুনিশ্চিত। বাহুবল অপেক্ষা প্রেমের বল ও ক্ষমার বল যে রাজার পক্ষে একান্ত শোভনীয়, তাহার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। এক্ষেত্রে উভয় পক্ষেরই সংযম ও সহিষ্ণুতা ও সারল্য চাই। পরস্পরের ঐকান্তিকতা চাই, তবেই দেশের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। সকল প্রকার আন্দোলনের ও যুক্তি-তর্ক ও মীমাংসার অবসানে, পূর্ব্বকালের মহিমান্বিত ভারত আবার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হউক, ঈশ্বরের নিকট ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শোকসংবাদ।

৺পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু— গত ২৪শে মাঘ শুক্রবার প্রাতঃকাল ৬-৪০ মিনিটের সময় দেশবরেণ্য পণ্ডিত মতিলাল লক্ষ্ণৌ নগরীতে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম প্রায় সপ্ততিবর্ষ হইয়াছিল। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর মৃত্যুতে সমগ্র ভারতে যে বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। লোকে আত্মীয়বিয়োগে এত কাতরতা প্রকাশ করে কি না সন্দেহ। তাঁহার মত বয়োবৃদ্ধ, ধীমান্, একনিষ্ঠ ও সর্ব্বজনমান্য জন-নায়ককে হারাইয়া ভারতের প্রতি নগর-গ্রাম হইতে হাহাকার রব সমুত্থিত হইয়াছে। ভারত জুড়িয়া দিগ্‌দিগন্তে তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা ও দরিদ্রভোজনের ব্যবস্থা বিরাটভাবেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে রাজনৈতিক সমস্যার দিনে তাঁহার অন্তর্দ্ধান যে অপূরণীয় ক্ষতি আনিয়া দিয়াছে, সহজে তাহার প্রতীকারের সম্ভাবনা নাই। মহান উদ্দেশ্য সমগ্র হৃদয়ের সহিত বরণ করিয়া লইলে মনুষ্য নিজ জীবনে যে অতি সহজেই বিরাট ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারে, ধনীশ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব মতিলালের জীবনই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পবিত্র ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম, অসামান্য তাঁহার প্রতিভা, প্রথম বয়সে পাশ্চাত্য আচারে তাঁহার দীক্ষা; কিন্তু যখন দেশের ডাক আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিল, ত্যাগমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ কুশাগ্রবুদ্ধি মতিলাল সর্ব্ববিধ বিলাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অসীম শৌর্য্যে বীর্য্যে নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং তাঁহার প্রাসাদোপম আনন্দভবন দেশের কল্যাণে উৎসর্গ করিলেন। "দেশবন্ধু"প্রবর্ত্তিত পন্থায় স্বরাজ্যদলের গুরু নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়া নানাক্ষেত্রে তিনি যে কূট রাজনৈতিকতার ও অনির্ব্বাণ প্রতিভার পরিচয় রাখিয়া গেলেন, ভারতের ভাবী ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দান করিবে। পরিশেষে কারাবাসের অসুবিধা ভোগে শরীরে যে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল, সুদীর্ঘ ও সর্ব্বদেশের চিকিৎসা সত্ত্বেও তাহার প্রতীকার হইল না। তিনি তাঁহার মহতী কীর্ত্তি, অপূর্ব্ব ত্যাগ, আশ্চর্য্য কর্ম্মকুশলতা ও বিরাট প্রতিভার যে আদর্শ রাখিয়া গেলেন, উত্তরকালে তাহা ভারতবাসীদিগের সম্মুখে আদর্শ হইয়া থাকিবে নিঃসন্দেহ। তাঁহার পরলোকগত আত্মা ভগবানের চরণে সর্ব্ববিধ শ্রান্তির পরে চিরবিশ্রাম লাভ করুক।

৺সত্যচরণ সেন সাহিত্যভূষণ।— ৺সত্যচরণ সেন সাহিত্যভূষণ মহাশয় গত ৯ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি সচ্চরিত্র, শাস্ত্রানুরাগী, সত্যবাদী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, পরদুঃখকাতর ও বিনয়ী পুরুষ ছিলেন। "পিকোচ্ছ্বাসম্" নামক সংস্কৃত পদ্যগ্রন্থখানি একাধারে ইঁহার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে। অধুনা যাঁহারা কেবলমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যের সেবা করেন, তাঁহাদেরও সকলের মধ্যে এই জাতীয় শ্লোকরচনানৈপুণ্য সর্ব্বত্র সুলভ নহে। আমরা ইঁহার পুত্র-পৌত্রাদিকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

৺কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।— গত ১৫ই মাঘ বৃহস্পতিবার শ্রদ্ধেয় কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার শ্রীরামপুরের বাসভবনে হঠাৎ পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি আদিব্রাহ্মসমাজের একজন বিশেষ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। বহুবর্ষ একনিষ্ঠার সহিত দিনাজপুরের জমিদার ৺যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের ষ্টেটে কর্ম্ম করিয়া ইনি সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার শোকার্ত্ত পুত্রকন্যাদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার কল্যাণবিধান করুন।

বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ।

বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র মিত্র মহাশয় বার্দ্ধক্য নিবন্ধন কর্ম্মে অবসর প্রার্থনা করায় তাঁহারই পরামর্শমতে বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺যোগেশ চন্দ্র সরকার মহাশয়ের অন্যতম পুত্র শ্রীমান্ সত্যানন্দ সরকার মহাশয়কে আগামী ১লা ফাল্গুন ১৩৩৭ সাল হইতে উক্ত পদে নিয়োগ করা হইল।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ট্রষ্টী ও সম্পাদক, আদিব্রাহ্মসমাজ।
২৫শে মাঘ, ১৩৩৭ সাল।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নবপ্রকাশিত গ্রন্থ

হবিষ্ট

(গানের বহি)

(সঙ্গীত-ভারতী শ্রীবাণী দেবী Mus. Doc. Ind. কর্তৃক স্বরলিপি সহ)

রয়াল ৪ পেজী ৮০ + ১১৭ পৃষ্ঠা; ছাপা ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট; প্রচ্ছদে ও মুখপত্রে দুইখানি ভাবোদ্দীপক চিত্র-সম্বলিত।

এই গ্রন্থে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের রচিত ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা সর্ব্ববিধ উচ্চাঙ্গের ৫০খানি বাছা বাছা গান দেওয়া হইয়াছে। সেই সকল গান বিশুদ্ধ রীতি অনুযায়ী তান ও লয় সমন্বিত। গানগুলি তান ও লয় সহকারে স্বরলিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গানগুলির ভাব যেমন সুন্দর, সুরও তেমনি মনোহর। গানগুলিতে রাগরাগিণী ও তাল-লয়ের শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধতা রক্ষিত হওয়ায় সঙ্গীতরসজ্ঞমাত্রেরই বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। পুস্তকখানি প্রত্যেক সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তির হাতের নিকটে রাখিবার যোগ্য। সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগ হইতে যে প্রণালীতে বিদ্যালয়ে সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গানগুলি নির্ব্বাচিত হইয়াছে এবং সেই কারণে গ্রন্থখানি আবালবৃদ্ধ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সকলেরই উপযোগী হইয়াছে। ইহাতে প্রাভাতিক ও সান্ধ্য ৩৩টী বিভিন্ন রাগ ও রাগিণী এবং ১৮টী বিভিন্ন তালের গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য অতি সুলভ ১।৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫।১ বি, বারাণসী ঘোষের সেকেণ্ড লেন, পোষ্ট বড়বাজার, কলিকাতা এবং মেসার্স ডোয়ার্কিন এণ্ড সন, ৮ নং ড্যালহাউসি স্কোয়ার, এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থালয়ে (কলিকাতা) প্রাপ্তব্য।

"এই গ্রন্থে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত ৫০টি সঙ্গীত ও তাহার স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদের সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্র, "ওঁ পিতা নোহসি পিতা নো বোধি নমস্তেহস্তু" এই গ্রন্থের প্রথম সঙ্গীত। সঙ্গীতশাস্ত্র-বিদুষী শ্রীমতী বাণী দেবী কল্যাণ তেওরা সুর-তালে ঐ মন্ত্রের বল প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং এই বেদগান সকলেই সহজে শিখিতে পারিবেন।

"বাণী দেবী স্বয়ং সুন্দর গান করিতে পারেন, সঙ্গীতবিদ্যায় তিনি পারদর্শিনী, গানের স্বরলিপি রচনায় সুনিপুণা। পিতা ভগবদ্ভাবে মগ্ন হইয়া সঙ্গীত রচনা করিতেছেন, কন্যা সুর-তালে তাহা গাহিতেছেন। ভারতের প্রতি গৃহে এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া মানবকুল পুণ্যালোকে পরিপূরিত হউক—'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্', নীচ আমোদপ্রমোদ বর্জ্জন করুক।"

সঞ্জীবনী—৬ই চৈত্র, ১৩৩৬।

Bandhu Amar—(My Friend.) By Kshitendra Nath Tagore, (Adi Brahmo Samaj Press, Calcutta, Re. 1/-)

This is a book of prayer. Mr. Tagore, the Minister of the Adi Brahmo Somaj, is known as a saintly man. In this book he has embodied thirty-one of his prayers to the Almighty whom he looks upon as his friend. Their beauty cannot be realized except by those who in time of distress seek relief and comfort by prayer. To them the book will be very helpful.

Statesman 9. 3 30.

KHEAL OR RANDOM THOUGHTS.—BY KSHITINDRA NATH TAGORE.
(Adi Brahmo Samaj Press. Re. 1-8.]

Mr. Tagore has earned a reputation as an essayist. This Volume contains a systematic chain of thoughts about men and things that came to him during his travels on four different occasions; and the descriptions incidentally offer opportunities for the reader to make himself acquainted with the manners and customs of the well-known Tagore family of Calcutta. The most noticeable feature of the book is the author's eagerness to induce his readers to look even at the ordinary things around them in a spiritual way. The book will be welcomed by all who enjoy deep thinking. Statesman 23. 3. 30.

নূতন পুস্তক! **বন্ধু আমার!** নূতন পুস্তক!

প্র কা শি ত হ ই ল।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক গদ্য-কাব্য। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে কবিত্বের ভাষায় সাধকের অনুভূত আলোক সম্পাতে উদ্ভাসিত আত্মসমর্পণ-যোগ বর্ণিত হইয়াছে। বিপদে যাহারা ব্যথিত, দুঃখে যাহারা দীর্ণ, এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের প্রিয় বন্ধুর সন্ধান দিয়া শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করিবে। রয়াল ১৬ পেজী আকারে ১২৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ছাপা ও কাগজ ভাল। উৎকৃষ্ট সবুজ কাপড়ে স্বর্ণাঙ্কিত সুন্দর বাঁধাই। মূল্য ১৲ টাকা। ডাক মাশুল ।৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—আদিব্রাহ্মসমাজ-কার্য্যালয়, ৫৫, আপার চিৎপুর রোড জোড়াসাঁকো কলিকাতা।

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C 462

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দ্বাবিংশ কল্প—চতুর্থ ভাগ

সংখ্যা ১০৫২ | ১৮৫২ শক চৈত্র

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

[illegible]তম বৎসরে চলিতেছে

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাকমাশুল ৵৹ আনা ॥ এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে শ্রীরণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৮তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০১। সাল ১৩৩৭। শক ১৮৫২। খৃঃ ১৯৩১। সম্বৎ ১৯৮৭। কলিগতাব্দ ৫০৩১।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৬৪। তোমার গান।

মা! তুমি আমার প্রাণে কথা বলিতেছ, আর আমি একমনে তাহা শুনিতেছি। আমার প্রাণে অন্য সমস্ত কথা শোনা থামিয়া গিয়াছে। আমার প্রাণে যখন ব্যথা বড়ই আঘাত দিতে থাকে, তখন তোমারই প্রাণজুড়ানো শান্তিবারিতে আমার সমস্ত ব্যথা দূর হইয়া যায়—প্রাণের উপর দিয়া কেমন একটা শান্তিবায়ুর হিল্লোল বহিয়া যায়। আমার জীবনের জীর্ণপত্র একে একে ঝরিয়া পড়িতেছে—এখন তোমার ঐ প্রসন্ন মুখের শান্তি-বচন ব্যতীত আর কিছুই এই জীবনে নূতন প্রাণ আনিতে পারিবে না। তুমি একটুখানি আমাকে কোলে লইয়া গান গাও, আর আমি পর্ব্বতের কোলে নির্ঝরিণীর মত কুলকুল স্বরে আবোল-তাবোল নানা কথা আধ আধ ভাষায় কহিতে থাকি। ক্রমে আমার চোখে যখন ঘুম আসিবে, তখন তুমি আমাকে তোমার কোলে শোয়াইয়া একদৃষ্টে স্নেহানত নয়নে আমার দিকে চাহিয়া থাকিবে, আর আমি তোমার সেই প্রসন্ন মুখ স্বপ্নে দেখিতে থাকিব। তখন তোমার প্রেমে আমার প্রেম মিলিয়া এক হইয়া যাইবে—সে অবস্থা কি সুন্দর! তোমার প্রেমে আমার সমস্ত দেহ-মন ভরিয়া উঠিবে এবং তাহার দুকূল ছাপিয়া উছলিয়া উঠিবে। আমি আর কিছুই চাহি না, যদি প্রতিদিন তোমার বুকে আমায় তুলিয়া লইয়া এই প্রকার নিত্য নূতন গান শোনাইয়া ঘুম পাড়াও। আমার কাজকর্ম্ম যাহা করিবার আছে, তাহা পড়িয়া থাক; আমি শিশুর মত তোমার কোলে নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইয়া পড়িতে চাই। যে গানে তোমার প্রসন্ন মুখ নিত্য নূতন-ভাবে দেখিতে পাইব, সেই গান হৃদয়ে অনুক্ষণ বাজিতে থাকুক।

৬৫। নির্ভর।

মা! আমি এই পথের ধারে এক কোণে বসিয়া ধুলাকাদা লইয়া কত খেলাই খেলিতেছি। আমাকে তুমি ভুলিয়া ফেলিয়া যাইও না। তুমি আমার একমাত্র নির্ভর-স্থল। একমাত্র তোমারই উপর নির্ভর করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে পারি। তোমা ছাড়া আর কাহারও উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি না—নির্ভয়ে তাহাদের সঙ্গে চলিতে পারি না। তাহারা পদে পদে আমায় কতরকম

ভয় দেখায়—কিসের ভয় তাহা জানি না। মা! কবে আবার তোমায় আমায় দেখা হবে—কবে তুমি আসিয়া আবার আমায় আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইবে? উঃ! কত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি! খেলার মাঝে যখন তোমার দিকে চক্ষু ফিরিয়া যায়, কিন্তু তোমাকে দেখিতে পায় না, তখন প্রাণ যে কি করে, তাহা কাহাকে জানাই? প্রাণ আতঙ্কে আকুল হইয়া উঠে। কোথায় কোন্ কীট এদিক ওদিক গেল—নিশ্বাসের মত একটুখানি শব্দ হইল—অমনি মনে হইল, বুঝি তুমি আসিলে। পরমুহূর্ত্তে যখন তোমাকে দেখিতে না পাইয়া হতাশ হইয়া আবার খেলা করি, তখন—তখন—ব্যর্থ আশার কত যে যন্ত্রণা, কত যে বেদনা, তাহা তুমি নিশ্চয়ই জান—আমি আর তোমাকে কি জানাইব? জীবন-প্রভাতে কত সুখস্বপ্নে বিভোর ছিলাম যে এক-এক করিয়া তোমার সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিব। কিন্তু এই জীবনসন্ধ্যায় সকল স্বপ্নই টুটিয়া গিয়াছে, খেলার ঘর যাহা কিছু করিয়াছিলাম, সে সমস্তই ভাঙ্গিয়া গেল, পুড়িয়া গেল। এখন মা! তুমি এসো—তোমারই সঙ্গে, যেখানে তুমি লইয়া যাইবে, সেইখানেই যাইব—হেথাকার ধুলোকাদার খেলা আর তিলেকের জন্য ভাল লাগিতেছে না। মা! এসো তুমি—বারেকের জন্য তোমার প্রসন্ন মুখ দেখাও।

৬৬। অভয়।

মা! তোমার আর সমস্ত নামই তো খেলায় খেলায় ভুলিয়া গিয়াছি—মনে আছে কেবল ঐ মা-নামটী। ঐ নাম ধরিয়াই তোমাকে ডাকিতেছি; এই তাসের ঘর—হাওয়ার খেলা হইতে আমাকে জোর করিয়া তুলিয়া লও, তোমার মুক্তবায়ু মুক্তপ্রাণ যে ঘরে খেলিতেছে, সেই ঘরে লইয়া যাও। তোমার প্রেমের ধারা খুলিয়া দাও—আমি সেই ধারায় স্নান করি। সংসারের কঠিন আঘাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ তো জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছে—দেহমন সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। হৃদয়ের ভালবাসা কত অপাত্রে ন্যস্ত করিয়াছিলাম—সকলই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ভাগ্যবশত তোমার চরণ পথের সম্বল করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাই তো এখন রক্ষা পাইতেছি। অবোধ শিশুর মত আমি তোমাকে যে নামেই ডাকি, যতই কেন বিরক্ত করি, আমাকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিও না। আমাকে তোমার বক্ষে তুলিয়া লইয়া শান্তিদান করিও—শুভবুদ্ধি প্রদান করিও। তুমি যদি একটীবার আমার প্রাণের ভিতর তোমার আশ্বাস-বাণী শোনাও, তবে সংসারে যতই কেন ঝড়-ঝটিকা উঠক না, যতই কেন কৃষ্ণবর্ণ ঘন মেঘে আমার জীবনকে ঘিরিয়া ফেলুক না, আমি কোন কিছুতেই ভয় পাইব না—শত ঝঞ্ঝা, শত বজ্রের কড়কড়ানি, ধূলিসমাচ্ছন্ন শত শত ক্রোশ দীর্ঘ জীবনপথ সকলই অতিক্রম করিয়া চলিব। সংসারতাপের প্রখর উত্তাপও আমাকে কষ্ট দিতে পারিবে না। বিষাদের প্রবল বন্যা যদি আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, তথাপি শেষে ঐ চরণের আশ্রয় লাভ করিব জানিয়া সম্পূর্ণ নির্ভয় থাকিব। সুখের স্বপ্ন যদি সাদা ধোঁয়ার মত সহসা অদৃশ্য হয়, হোক—যদি তোমার সত্য আশ্রয় লাভ করি। মা! আর তো পারি না—আমার দেহমন হইতে সংসারের ধূলিরাশি ঝাড়িয়া দিয়া তোমার পবিত্রতায় মাখানো ঘরে লইয়া যাও। তুমি পার্শ্বে বসিয়া থাকিও। আমি একটু নিশ্চিন্ত মনে শান্তির সহিত একটুখানি ঘুমাইতে চাই।

৬৭। আমার গানে তোমার নাম।

মা! তোমার নামে আমার প্রাণে কত গান যে জাগে, তাহা আর কাহাকে জানাইব? আমার গানের স্পন্দনে সমস্ত আকাশ স্পন্দিত হইয়া উঠে; নিশীথের নীরবতাও স্পন্দিত হইয়া উঠে। চন্দ্রতারা নির্নিমেষ নয়নে আমার পানে চাহে, আর আমার গান শুনিয়া তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে থাকে। আমার প্রাণে গানের তো অন্ত খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু যত কিছু গান ওঠে, সমস্তই বিষাদে মাখা। সর্ব্বদাই মনে হয় যেন তোমাকে কবে হারাই, কবে হারাই। মা! আমার প্রতি এইটুকু কৃপা করিও, আমি যাহা কিছু করি, সুখ বা দুঃখ যাহা কিছু আমার অদৃষ্টে হউক, তোমাকে যেন মুহূর্ত্তের জন্য না হারাই—তুমি তিলেকের জন্য আমার চোখের আড়াল হইও না। ইচ্ছা হয়, দিনের পর দিন, রাতের

পর রাত, তোমার চরণে বসিয়া আমার প্রাণে যাহা কিছু গান জাগে, সমস্তই তোমাকে শোনাই আর তোমার চোখের নীরব ইঙ্গিতে তাহার অনুমোদন পাই। আমার গানের কোনই গুণ নাই, কিন্তু সেই গানে তোমার নাম অনুক্ষণ ঝঙ্কৃত হয় বলিয়া তাহা শুনিয়া নদীর কোলে প্রেমের বাণ ডাকে, সাগরবক্ষ ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। গাহিতে গাহিতে আমারও প্রাণে কতই আশা ভাসিয়া আসে। আপনার গানে আপনিই বিভোর হই। বিশ্বজগত চোখের সম্মুখে সকলই মিলাইয়া যায়। তখন বাকী থাক তুমি, আর বাকী থাকি আমি। তখন আমাতে তুমি পূর্ণ হইয়া আস, আর তোমাতে আমি পূর্ণ হইয়া যাই। তখন বাকী বলিয়াও আর কিছু থাকে না —তুমি আর আমি, আমি আর তুমি। আর যাহা কিছু জ্ঞান-ধ্যান, সমস্তই অন্তর্হিত হইয়া যায়। তখন গানও থামিয়া যায়। তখন তোমার কোলে আমি থাকি, আর আমার হৃদয় হইতে অনাহত ধ্বনিতে তোমার নামের গান ঝরিতে থাকে। আজ তোমার যে প্রসন্ন নয়ন দেখিয়া প্রাণের মাঝে অনুপম শান্তি লাভ করিলাম, এই রকম শান্তি যেন নিত্যকাল পাই—এই আশীর্ব্বাদ কর।

৬৮। পদরেণু।

মা! আমাকে তোমার পদরেণু করিয়া দাও, যাহাতে আমি তোমার নিত্য অনুচর হইতে পারি —তুমি যেখানে যাইবে আমিও সেইখানে যাইব, আমাকে ঝাড়িয়া ফেলিলেও তোমারই কাছে পড়িয়া থাকিব, আবার সময়বিশেষে তোমারই কোলে গিয়া উঠিব। যদি বা তুমি আমাকে পথের ধারে এক কোণে ঝাড়িয়া ফেল, তাহা হইলে আমি এমন স্থানে নীরবে বসিয়া থাকিব, যেখানে তুমি নিত্যই বর্ত্তমান থাকিবে, তোমার চরণ যেখানে নিত্যই পড়িবে। সেইখানে বসিয়া বসিয়া তোমারই ঐ চরণ ধ্যান করিব, আর আশাপথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব, কবে আমার এই বক্ষ তোমার ঐ চরণ ধারণ করিবার অবসর পায়। সুদীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পর ঐ চরণে স্থান পাইব মনে করিয়াই তো আমার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে ভরিয়া উঠিতেছে। আমার এই বক্ষ যখন সত্য সত্যই তোমার ঐ চরণ রক্ষা করিবে—তখন—তখন? ভাবিতে ভাবিতেই যে আমার প্রাণে শত নব নব ভাবে গান ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছে। মা! আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তুমি অনাদি কাল হইতেই আমার মা; তুমি অনন্তকাল পর্য্যন্তও আমারই মা। আমি তোমাকে লইয়া কি যে করিব, কিছুই ভাবিয়া পাই না। কত রকমে যে তোমাকে আদর করিব, তাহা ভাবিতে যাই, কিন্তু ভাবিয়া পাই না। কত রকমে যে তোমার আদর কাড়িয়া লইব, তাহার কতই কল্পনাজল্পনা করি, কিন্তু তুমি আমার চাহিবার আগেই এতই আদরে আমাকে ভরিয়া দাও যে, আমার সে সমস্ত কল্পনা কল্পনাতেই থাকিয়া যায়। এবার আমার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে—আকাশের যে দিকে চাই, তোমাকেই দেখি; প্রাণের ভিতর যখনই চক্ষু দিই, তোমাকেই দেখি। ঊর্দ্ধেতে অধোতে, দক্ষিণে বামে আজ তোমাকেই দেখিতেছি। তোমার মঙ্গলস্পর্শে আমার সমস্ত মলিনতা বিদূরিত হইয়াছে, আমার মনপ্রাণ বিমল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার স্নেহপ্রেমে আমি সম্পূর্ণ ডুবিয়া আছি। পদে পদে মৃত্যু ঘুচিয়া গিয়াছে। আমি বাঁচিয়াছি।

বর্ষশেষের উদ্বোধন।

(শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ)

একটীএকটী করিয়া আমাদের জীবনের সব দিন কয়টীর অবসান হইয়া আসে, সব কয়টীই অনন্ত কালের গর্ভে বিলীন হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়; প্রতি মুহূর্ত্তের পরেই নব মুহূর্ত্তে আমরা আবার এক নূতন জীবন লাভ করি। এই বাৎসরিক জীবনের শেষ সন্ধ্যায়—নব জীবন লাভের এই পবিত্র সন্ধিক্ষণে, আমাদের নিজের দিকে, আত্মার দিকে একটীবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হইবে; দেখিতে হইবে যাঁহাকে লাভ করা—যাঁহার পবিত্র সিংহাসন আমাদের হৃদয়বেদীর উপর প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত—স্থির লক্ষ্য —এই একটী বৎসর ধরিয়া আমরা সেই ব্রত কতখানি পালন করিতে পারিয়াছি, সেই স্থির লক্ষ্যের পথে কতখানি অগ্রসর হইয়াছি। দীর্ঘ একটী বর্ষ ব্যাপিয়া কত সুখদুঃখ, কত সম্পৎবিপদ, কত আশা-নৈরাশ্যের

মধ্য দিয়া আমরা আমাদের জীবনের তরণীখানিকে বাহিয়া চলিয়াছি। তরণী বাহিতেছি—অক্লান্ত পরিশ্রমেই বাহিতেছি; কিন্তু সাবধান হইতে হইবে যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই—যেন পরমপদ হইতে বিচ্যুত হইয়া না পড়ি। সুখের আশায় ভ্রান্ত হইয়া যেন ধন-জন-ঐশ্বর্য্যকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া বরণ করিয়া না লই, যেন ভুলিয়া না যাই যে "ভূমৈব সুখং" ভূমাই সুখ—"নাল্পে সুখমস্তি" অল্পতায় সুখ নাই। জগতের যত দুঃখ, যত দৈন্য এই অল্পতা এই সঙ্কীর্ণতার মধ্য হইতে জন্মলাভ করিয়া ধীরে ধীরে মনুষ্যসমাজে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। যে মৃত্যুর ভয়ে আমরা রাত্রিদিন ভীত ত্রস্ত হইয়া রহিয়াছি, সেই মৃত্যুও এই সঙ্কীর্ণতাকেই আপনার প্রিয় লীলানিকেতন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহারই মধ্যে সে আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে। তাই যাহাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই, পরম গম্যস্থানকে বিস্মৃত হইয়া না যাই, তাহারই নিমিত্ত আজ এই বর্ষশেষের নিভৃত সন্ধ্যাকালে স্থিরচিত্তে বসিয়া আমাদের হিসাব করিয়া দেখিতে হইবে যে আমরা ঠিক পথে চলিতেছি কি না? আমাদের দেখিতে হইবে, বৎসরের সেই প্রথম পবিত্র দিনে আমরা যে ব্রত ধারণ করিয়া কর্ম্মস্রোতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম তাহা কতদূর পালন করিতে পারিয়াছি।

পল্লীগ্রাম হইতে যখন বালকেরা লেখাপড়া শিখিতে সহরে প্রথম আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহারা সেখানকার নিত্য নব মহোৎসবের আয়োজন দেখিয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়ে; তাহারা বুঝিয়াই উঠিতে পারে না যে, নিভৃতে দীপ জ্বালিয়া দৈনিক পাঠাভ্যাস অথবা এই নিত্য নব মহোৎসবে যোগদান, কোন্‌টী তাহাদের পক্ষে অধিক শ্রেয়স্কর। ইহাদের মধ্যে যাহাদের অন্তরে মনুষ্যত্ব থাকে, তাহারা যেমন আপনাদের নিঃসম্বল দরিদ্র পিতামাতার দুঃখ-দৈন্যের করুণ কাহিনী স্মরণ করিয়া সেই সকল নিত্য নব মহোৎসবের প্রবল আকর্ষণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়, সেইরূপ এই মর-ধরণীর প্রবাসী পথিক আমরা যদি ঠিক পথে চলিতে চাই, যদি তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী ধন-জন-ঐশ্বর্য্যের প্রবল আকর্ষণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে চাই, তবে আমাদিগকেও সেই পরম পিতা সেই করুণাময়ী জগন্মাতাকেই সর্ব্বদা স্মরণ করিতে হইবে। মাতৃভক্ত সন্তান যেমন সর্ব্বদাই তাহার চোখের সম্মুখে মায়ের স্নেহকোমল করুণ মুখখানি দেখে এবং সেই মাতৃমুখের ইঙ্গিতে সে যেমন প্রত্যেক কর্ম্মে আপনাকে প্রবর্ত্তিত করে, আমরাও তেমনি আমাদের প্রত্যেক কর্ম্মে আমাদের সেই করুণাময়ী জগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারই ইঙ্গিতে আপনাদিগকে প্রবর্ত্তিত করিব।

আজ এই বর্ষশেষে সকলেই হিসাব করিতেছে—সকল ব্যবসায়ীই আজ তাহার লাভ-লোকসান খতাইয়া দেখিতেছে। কারণ নববর্ষের পুণ্য প্রভাতে সূর্য্য যখন রজনীর যবনিকা উত্তোলন করিয়া নবভাবে উদিত হইবে, তখন ত আর হিসাব করিবার সময় পাওয়া যাইবে না—তখন যে নবীনকে আহ্বান করিয়া লইতে হইবে। আমরা সকলেই যে ব্যবসায়ের ব্যবসায়ী—যাহার হিসাবের জন্য আজ আমরা এখানে সম্মিলিত হইয়াছি, সে ব্যবসায়ের ক্ষতিবৃদ্ধি আমরা কি একবার হিসাব করিয়া দেখিব না?

আমরা যুগপৎ দুইটী জীবন যাপন করিতেছি, একটী ভিতরের অপরটী বাহিরের। বাহিরের এই জীবনকে আমরা সকলেই জানি ও মানি, কিন্তু ভিতরের জীবনের সংবাদ আমরা অনেকে রাখি না; কারণ তাহার সংবাদ লইতে হইলে ভিতরের দিকে তাকাইতে হয়, অন্তরস্থ হইতে হয়—আত্মার মধ্যে ডুবিয়া যাইতে হয়; তাহাতে যতটুকু গুরুত্ব ও ধীরতা আবশ্যক তাহা আমাদের অনেকেরই নাই। কাজেই কেবল এই বাহিরের জীবনকেই আমরা স্বীকার করি বলিয়া একমাত্র ইহারই লাভ-লোকসান আমাদের নিকট স্পষ্টভাবে দেখা দেয়, আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে, আমাদিগকে কখন সুখী কখনও বা দুঃখী করে। এই একটী বৎসরে আমরা আমাদের বাহিরের জীবনের কত পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইতেছি,—কত ভাঙাগড়া, লাভলোকসান পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পাইতেছে,—আমরা তাহারই আলোচনায় ব্যস্ত, কারণ সেইটীই যে আমাদের নিকট সত্য।

এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে? কতদিনে আমরা আমাদের প্রকৃত জীবনের খোঁজ লইব? কত সহস্র বৎসরের অঙ্কুরিত আধ্যাত্মিকতার বীজটী আজ আহার্য্যের অভাবে শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, তাহা কি আমরা দেখিব না? যে মহান্ পুরুষ আমাদের প্রেমের অর্ঘ্য গ্রহণ করিবার জন্য গোপনে আমাদের হৃদয়সিংহাসনে আসিয়া বসিয়া আছেন, আমরা কি তাঁহাকে অবহেলা করিয়া আমাদের সমস্ত প্রেমের অর্ঘ্য, পূজার সমস্ত পুষ্পই অপাত্রে ধনমানঐশ্বর্য্যের চরণেই নিবেদন করিব? কবে আমরা এই ধন-মানঐশ্বর্য্যের মধ্যে এই সংকীর্ণতার এই মৃত্যুর আবাস মধ্যে অমৃতের অভাব অনুভব করিব? কবে আমরা ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর ন্যায় করুণকণ্ঠে বলিতে পারিব "যেনাহং নামৃতা স্যাম্, কিমহং তেন কুর্য্যাম্" যাহার দ্বারা আমি অমৃতকে লাভ করিতে পারিলাম না, সেই ঐশ্বর্য্যকে লইয়া আমি কি করিব? আমরা কি কোন দিন প্রাণের সহিত হৃদয়ের সহিত বলিতে পারিব না যে, "অসতো মা সদ্গময়", অসৎ হইতে আমাদিগকে সৎস্বরূপে

লইয়া যাও; 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিঃস্বরূপে লইয়া যাও; 'মৃত্যোর্মামৃতং গময়' মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতস্বরূপে লইয়া যাও।

যাঁহার নিয়মিত শাসনে দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন অখণ্ডভাবে কালের বক্ষে ভাসিয়া চলিয়াছে, আজ এই বর্ষশেষের শান্ত সন্ধ্যায় আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি; যে অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে নিমেষ-মুহূর্ত্তসকল বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে, আজ এই বর্ষশেষ-সন্ধ্যাতে আমরা তাঁহাকেই ভক্তিভরে নমস্কার করি।

ধর্ম্মপথ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

হে লোকেশ চৈতন্যময় অধিদেব! হে মঙ্গলময় বিভো! তোমার আজ্ঞানুসারে লোকের হিতের নিমিত্ত এবং তোমার প্রীতির নিমিত্ত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হই।

মুখবন্ধ।

বর্ত্তমান নবযুগে আমরা জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি; পুরাতন যুগ নানাবিধ পুরাতন ভাবের সহিত ধীরে ধীরে অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে; নবযুগ অপরদিকে নবজীবনের নব নব ভাবের মুক্তভাণ্ডার লইয়া আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। যে প্রাণসখা আমাদিগকে জীবনমরণের ভিতর দিয়া এই যুগসন্ধিতে আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহার নামকীর্ত্তনের দ্বারা জীবনকে ধন্য করিবার অবসর দিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে প্রণাম কর। কাহারও পশ্চাতে পড়িয়া থাকিও না। তাঁহার অমৃতধামের যাত্রীগণের মধ্যে সকলের অগ্রগামী হও—সকলের অগ্রে তাঁহাকে হৃদয়ের পূজা অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হও।

প্রেমের বন্ধন।

সেই প্রাণসখা জীবনসুহৃৎ তাঁহার সহস্র বাহু বাড়াইয়া আমাদিগকে প্রেমের আলিঙ্গন দিবার জন্য এবং তাঁহার স্নেহহস্তে আমাদের হৃদয়ের প্রীতি-অর্ঘ্য গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার বিজন আসন হইতে নামিয়া আমাদের সম্মুখে সর্ব্বদাই দণ্ডায়মান। তাই সুন্দর প্রভাতে পাখীরা সুতানে গান গায়, পুষ্পসকল সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত করিয়া তোলে। তাই শত দুঃখ-শোকের মধ্যে, শত শেল সম আঘাত ভেদ করিয়াও দিকে দিকে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠে; তাই দিকে দিকে তাঁহার নামে সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া জগতবাসীকে আকুল করিয়া তোলে। চক্ষু খুলিয়া দেখ, কান পাতিয়া শোন, শতকণ্ঠে তাঁহার নামে সঙ্গীত উঠিয়া ভূলোক ও দ্যুলোককে এক করিতেছে, ইহলোক ও পরলোককে প্রেমের সূত্রে বাঁধিতেছে—মঙ্গল ও কল্যাণের এক সুরে সকল ভুবনকে ডুবাইয়া দিতেছে। নবযুগের নব আশায় উচ্ছ্বসিত এই নবীন প্রভাতকে অবহেলায় বৃথা কর্ম্মে বহিয়া যাইতে দিও না। বাহিরে প্রকৃতির মধ্যে তাঁহাকে উপলব্ধি কর; নরনারীর মুখে আনন্দ-শ্রীতে তাঁহাকে উপলব্ধি কর; এবং হৃদয়ের আনন্দে অন্তরে সেই আনন্দস্বরূপকে উপলব্ধি কর।

বিবেক ও বৈরাগ্য ধর।

তোমাদের জ্ঞান ও প্রেমকে সমুজ্জ্বল কর। একনিষ্ঠ হৃদয়ে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য যত্নবান হও। বীরের ন্যায় সকল বাধা-বিঘ্নের মধ্যে অটল হইয়া থাকিও। আবশ্যক হইলে সংসারের যাহা কিছু, তাঁহার জন্য সমস্তই ত্যাগ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিও। সুখসম্পদের ন্যায় দুঃখশোক, বিপদআপদ, সমস্তই তাঁহারই মঙ্গল-বিধান বলিয়া সন্তোষের সহিত নতমস্তকে বহন করিবে। বিবেক ও বৈরাগ্যকে সহায় করিয়া সাধনাপথে অগ্রসর হইবে। তাঁহার অভয়পদ নিশ্চয়ই লাভ করিবে। মৃত্যুও তোমাদিগকে বিভীষিকা দেখাইতে পারিবে না। ইহলোকে যখন তোমাদের কর্ম্মের অবসান হইবে, তখন তাঁহার সেই অভয়পদ আশ্রয় করিয়া হাসিতে হাসিতে সংসারের পরপারে উপনীত হইবে। তাঁহার করুণায় তোমাদের অনন্তজীবন ভরিয়া উঠিবে।

নামসঞ্জীবনী।

তাঁহার পবিত্র নামে তোমাদের প্রাণ জাগিয়া উঠুক—ভগবানের সঞ্জীবনীশক্তির নবতর স্পর্শে শক্তিময় হোক। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারা যেমন শতবিধ ছন্দে গগনপ্রাঙ্গণকে এক আশ্চর্য্য সুরে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, তেমনই তোমাদেরও অন্তরে তাঁহার নাম দিবানিশি শতবিধ তাল ও সুরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোক। তিনিই আমাদের পরম গতি, তিনিই আমাদের পরমশান্তি, তিনিই জগত-জীবন, তিনিই সন্তাপহারী ভক্তবৎসল। তিনিই দুর্ব্বলের বল, অনাথের আশ্রয়, তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাক। তিনিই তোমাদের সমস্ত পাপতাপ হরণ করুন, সকল দুঃখকষ্টের অবসান করিয়া সুখসম্পদ বিধান করুন।

তাঁহারই শরণ লও।

তোমাদের মনঃপ্রাণ তাঁহার মঙ্গলস্পর্শলাভে আনন্দে বিভোর হইয়া তাঁহারই চরণে ধাবিত হোক। আনন্দের নির্ম্মল নির্ঝর চারিদিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুক—হৃদয়-নদীর দুই কূল ভাসাইয়া দিক। নবযুগের এই প্রথম

প্রভাতে তোমাদের নিজের বলিয়া কিছুই রেখো না। তোমাদের সমস্তই তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া দাও। তাঁহার প্রেমের ধারায় তোমাদের দুঃখশোকের অনন্ত হুতাশন নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হৌক। বিপদআপদের বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন হৌক। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না। তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলে ইহজীবনে যেমন, মরণেও সেইরূপ অনুপম শান্তিলাভ করিবে। তাঁহাকে পরিত্যাগ কর—ভয় হইতে ভয়ে, ক্লেশ হইতে ক্লেশে, দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে নিপতিত হইবে।

মৃত্যু অতিক্রম কর।

কনকভানুর উজ্জ্বল জ্যোতিতে, পূর্ণচন্দ্রের রজত-কিরণে সেই মঙ্গলময়েরই প্রকাশ উপলব্ধি কর। প্রকৃতির ভিতরে তাঁহারই প্রসন্ন মুখের মঙ্গলভাব উপলব্ধি করিয়া হৃদয়কে পূর্ণ কর। তোমাদের অন্তরের অন্ধকার কাটিয়া যাউক। তোমাদের জীবন নবভাবে নবোৎসাহে পূর্ণ হৌক। তাঁহার অরূপ রূপের ধ্যানে আপনাকে অনুক্ষণ নিমগ্ন রাখ; তাঁহার বাণীর অনাহত নাদ অনুক্ষণ শ্রবণ কর। তোমাদের চারিদিকে আনন্দের মঙ্গলবায়ু প্রবাহিত হৌক, সুগন্ধে গগন ভরিয়া উঠুক। মৃত্যুর বিভীষিকা তোমরা অতিক্রম কর।

জাগিয়া ওঠ।

সমস্ত প্রকৃতির মত তাঁহার নামে তোমাদেরও জাগিয়া উঠিতে হইবে। আলস্যের কোলে মাথা রাখিয়া আরাম উপভোগ করিতে থাকিলে আর চলিবে না। সমস্ত গগন তাঁহার নামে আনন্দধারায় উথলিয়া উঠে। আমাদেরও আনন্দমনে তাঁহারই জয়গান গাহিতে হইবে এবং তাহারই তালে তালে মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের হৃদয় হইতে যে জয়গান সমুত্থিত হইবে, তাহার তালে তালে প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে আনন্দের নব নব তরঙ্গ জাগিয়া উঠিবে এবং তাহারা আনন্দময় ভগবানেরই চরণতলে ধাবিত হইবে। আমাদের হৃদয়কে সমস্তক্ষণ নিজেরই সুখদুঃখের চিন্তাতে নিমগ্ন রাখিলে চলিবে না—অন্তরকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখিলে চলিবে না।

সংসার-সেতু।

তাঁহাকে অন্তরে প্রত্যক্ষ কর। তিনিই লোক-সকলকে সেতুস্বরূপ হইয়া ধারণ করিতেছেন। তাঁহারই চরণে আত্মসমর্পণ কর। তিনি আমাদের অন্তরতম প্রাণসখা। চিত্তকে নির্ম্মল করিয়া সেখানে তাঁহারই আসন প্রতিষ্ঠিত কর। তাঁহার পূজার মনপ্রাণ অর্পণ কর—তোমাদের সকল ভয়, সকল দৈন্য বিদূরিত হইবে; দেবদুর্লভ অমৃতধাম সহজেই তোমাদের হস্তগত হইবে। অমৃতধামের যাত্রাপথে যদি কখনও তোমাদের শ্রান্তিক্লান্তি আসে, তখন তাঁহার নামে জয়ধ্বনি করিয়া পথের শ্রান্তি দূর করিও, এবং বিজয়ীর বলে আবার অগ্রসর হইও। তাঁহার জয়েই তোমাদের জয়। ইহলোক ও পরলোক সর্ব্বত্রই তাঁহার স্নেহপ্রেমে সমাবৃত আছে জানিয়া সম্পূর্ণ নির্ভর হও।

তাঁহার শরণ লও।

দুঃখশোকে, বিপদেআপদে, তোমাদের কাহারও অন্তর যদি নিষ্পিষ্ট হইয়া থাকে, তবে সেই দয়াময় ভগবানের চরণে আছড়াইয়া পড়—সকল দুঃখের শান্তি হইবে। পাপে তাপে যদি তোমাদের কাহারও অন্তর জীর্ণশীর্ণ হইয়া থাকে, তবে সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরম-পুরুষের শরণাগত হও—তিনি তাঁহার স্নেহপ্রেমের শান্তিধারায় তোমাদের সকল পাপ সকল তাপ বিধৌত করিয়া দিবেন। নিজদোষে ভুলভ্রান্তি করিয়া যদি কেহ আপনাকে তাঁহা হইতে দূরে রাখিয়া থাক এবং তাঁহার করুণাবারি হইতে আপনাকে বঞ্চিত রাখিয়া তৃষ্ণায় জর্জ্জরিত হইয়া থাক, তবে স্নেহকরুণার সেই অক্ষয় উৎসের নিকটে যাও—তাঁহার প্রেমসুধায় তোমার হৃদয় ভরিয়া যাইবে।

ভগবৎপূজায় প্রবৃত্ত হও।

প্রাচীন ও নবীন যুগের এই সন্ধিক্ষণে হৃদয়ের নিভৃত-তম প্রদেশে গিয়া তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হও। ভক্তি-প্রেমের সুগন্ধে এই পবিত্র সময়কে পবিত্রতর করিয়া তোল। অহঙ্কার, অভিমান, গর্ব্ব, সমস্তই চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া তাঁহাকেই জীবনের একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ কর। তাঁহারই আদেশপালনে সমস্ত জীবন, সমস্ত ইচ্ছা, সমস্ত শক্তি নিয়োজিত কর। সেই আনন্দস্বরূপের আনন্দ-ধারায় অভিষিক্ত হইয়া তোমাদের মনপ্রাণ আনন্দময় হইয়া উঠুক। তোমাদের আনন্দধ্বনিতে সমস্ত গগন মুখরিত হৌক। আনন্দাশ্রুতে তোমাদের বক্ষ ভাসিয়া যাক। তাঁহাকে প্রাণের ভিতর উপলব্ধি কর, তাঁহার অভয়বাণী শ্রবণ কর—তোমাদের সকল আশা পূর্ণ হৌক, প্রাণের সকল পিপাসার শান্তি হৌক। তাঁহাতেই আমাদের সকল ভোগ, সমস্ত প্রেম, সমস্ত ইচ্ছার পরিসমাপ্তি।

ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন কথা।

বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ মহতাপ চাঁদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যে

অনুরাগী হইয়াছিলেন, তাহা মহর্ষির আত্মজীবনীপাঠে অবগত হওয়া যায়। তিনি আপনার প্রাসাদের ভিতরে উপাসনার জন্য একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ঐখানেই উপাসনা সাপ্তাহিকভাবে চলিতে থাকে। কোন্নগর-নিবাসী পণ্ডিত দয়ালচন্দ্র শিরোমণি নিয়মিতভাবে তথায় যাইয়া উপাসনা করিতেন। মহাতাপ চাঁদের মৃত্যুর পর মহারাজ আপ্তাব চাঁদের আমলে উক্ত সমাজ নিষ্প্রভ হইয়া আইসে। তাঁহার মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া কালব্যাপী মামলা-মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে ঐ পারিবারিক সমাজটি উঠিয়া যায়; এবং শিরোমণি যে পাথেয় ও মাসিক বৃত্তি পাইতেন তাহা বন্ধ হইয়া যায়। আমরা বর্ত্তমান রাজার পিতা রাজা সাহেবের সহিত দেখা করিলে তিনি আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, ঐ পারিবারিক সমাজটিকে আবার পুনর্জীবিত করিবার চেষ্টা হইবে; কিন্তু নানা কারণে কোন ফলোদয় হয় নাই।

৺চন্দ্রশেখর বসু ঐ সময়ের পূর্ব্ব হইতে বর্দ্ধমান রাজসরকারে কার্য্য করিতেন। তিনি নিষ্ঠাবান সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং বেদান্তাদি-শাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। রাজা রামমোহনের সংস্কৃত গ্রন্থাবলী নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়া উহার মর্ম্মে তিনি প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি জনসাধারণের হিতার্থে একটি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ ও তৎসংক্রান্ত ভূমি খরিদ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রয়াস পাইতেছিলেন। পরিশেষে তিনি বর্দ্ধমান সহরের বাজারের পূর্ব্বদিকে ছয় কাঠা জমি ও তাহার উপরিস্থিত মেটে-গৃহাদি ১২৬৯ সালের ১০ই চৈত্র তারিখে আদিব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে নিজ নামে সম্পাদকরূপে উক্ত "ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রিত দাতব্য" হইতে খরিদ করেন এবং উক্ত বিক্রয় কোবালা ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ২০শে মে তারিখে রেজেষ্টারী হয়। উহার পরিচয় ১৮১৫ শকের আশ্বিন মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ আছে। ঐখানেই চন্দ্রশেখর বাবুর পরিচালনাধীনে ব্রাহ্মসমাজ চলিতে থাকা অবস্থায় বর্দ্ধমান ছাড়িয়া তিনি দ্বারভাঙ্গা মহারাজার সরকারে কার্য্য গ্রহণ করেন এবং নিজ প্রতিভাবলে পরে সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন।

বর্দ্ধমানে অবস্থান কালে চন্দ্রশেখর বাবু উক্ত ব্রাহ্মসমাজে ১৭৯১ শকে যে উপদেশ দেন, উহা 'অধিকারতত্ত্ব' নামে সংশোধিত হইয়া ১৭৯৩ শকের ৫ই জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত হয়। দ্বারভাঙ্গাতে অবস্থানকালীন তিনি তথায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত ব্রাহ্মসমাজে তিনি যে সমস্ত উপদেশ দিতেন তাহা ১২৮২ সালে 'বক্তৃতাকুসুমাঞ্জলি' নামে গ্রন্থাকারে বাহির হয়। উহা যেমন জ্ঞানগর্ভ তেমনই নানা তথ্যে পরিপূর্ণ। পরবর্ত্তী সময়ে তিনি "হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ, সৃষ্টি, প্রলয়তত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব, বেদান্তপ্রবেশ" নামে কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐসকল যেমনই সুচিন্তিত তেমনই গবেষণাপূর্ণ। তিনি প্রাচীন দর্শনে সবিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে ও পরে শ্রদ্ধেয় কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ও পত্রিকাতে অনেক মূল্যবান প্রস্তাব নিয়মিতরূপে লিখিতেন। তাঁহার সাংখ্যদর্শনবাদ পত্রিকাতেই প্রথম বাহির হয়। একে চন্দ্রশেখর বাবুর প্রবন্ধ, তাহার উপর কালীবর বেদান্তবাগীশ ও শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দ্বয়ের দার্শনিক প্রবন্ধ, পত্রিকাকে এক সময়ে যথেষ্ট মর্য্যাদা দান করিয়াছিল। চন্দ্রশেখর বাবু সে সময়কার ব্রাহ্মসমাজের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তাঁহাকে বেহালা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে এবং কর্ম্ম হইতে বিদায়গ্রহণের পরে বার্দ্ধক্যে আদিব্রাহ্মসমাজে মধ্যে মধ্যে আসিতে দেখিয়াছি। কখন কখন তিনি হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে তাঁহার আবাস-নিকেতনে উপাসনার জন্য আহ্বান করিতেন। তিনি বিদ্যারত্ন মহাশয় দ্বিজেন্দ্র বাবু ও আমার পিতার সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। তিনি রাজা রামমোহন রায়কে অতি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং রাজার অপরিমেয় বিদ্যাবত্তার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। কুড়ি বৎসরের উপর হইল তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া বুঝিতে পারি যে দেশের অশিক্ষিত অজ্ঞ জনসাধারণকে পরিহার করিলে চলিবে না বা প্রতিমাপূজকদিগকে নিন্দা করিয়া বাহিরে ঠেলিয়া রাখিলে চলিবে না, প্রতিমা-পূজাকে পাপকার্য্য বলিয়া অভিহিত করিলে চলিবে না। তাহাদিগের মনে আঘাত না দিয়া ধীরে ধীরে তাহাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট করিতে হইবে—ইহাই আমাদের কার্য্য ইহা মনে রাখিতে হইবে। সুকঠিন ভগবৎতত্ত্ব বুঝিবার সকলের সমান অধিকার নাই বা থাকিতে পারে না। অজ্ঞদিগকে সমুন্নত ধর্ম্মতত্ত্বের শিক্ষাপ্রদানে অল্পে অল্পে আকৃষ্ট করিয়া বর্জ্জনের ভাব পরিহার করিয়া উদারভাবে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আনয়ন করাই ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত কার্য্য। ইহা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নিজ গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়া গিয়াছেন।

বর্দ্ধমান হইতে চন্দ্রশেখর বাবুর অবসরগ্রহণের পর বর্দ্ধমান-ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনের ভার তত্রত্য শ্রদ্ধেয় সম্ভ্রান্ত উকীল অম্বিকাচরণ সরকার মহাশয়ের উপর পড়ে। তিনি বিশেষ আগ্রহ সহকারে উহার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ঐ সময়ে কয়েকজন উৎসাহী লোক তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন।

বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের দিন ঠিক থাকিত না। অধিকাংশ বৎসরে ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি এক রবিবারে হইত। কিন্তু ১৮২১ শকের ২৫শে অগ্রহায়ণে ৩৯ তম সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়াছিল। ১৮০৯ শকের পত্রিকায় যে উৎসবের বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তাহাতে সম্পাদকের নাম অম্বিকাচরণ সরকার দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮১২ শকের বিজ্ঞাপনে দেখিতে পাই "অম্বিকাচরণ সরকারের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পুত্র যোগেশচন্দ্র সরকার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হইলেন।" ঐ শকে শ্রদ্ধেয় ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর উৎসবে গমন করেন। তাঁহার উপদেশ ঐ শকের চৈত্রসংখ্যায় বাহির হয়।

আমার পিতা প্রতি বর্ষেই তথায় যাইতেন। উৎসবের পূর্ব্ব দিন সায়াহ্নে উপাসনা অম্বিকাবাবুর আবাস-নিকেতনেই হইত। পরদিন প্রাতে ও সায়াহ্নে দুইবার ব্রাহ্মসমাজেই উপাসনা হইত। আমি আমার পিতার সময় অনেকবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গিয়াছি। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উৎসবে উপস্থিত হইতেন। ব্রাহ্ম-সমাজগৃহটি ক্রমে ক্রমে একটি অট্টালিকায় রূপান্তরিত হই-য়াছে। আমার পিতার মৃত্যুর পরে শম্ভুনাথ গড়গড়ি মহাশয় ও আমি কয়েকবার উৎসবে যাই। নগেন্দ্রনাথ চট্টো-পাধ্যায় মহাশয়কেও উৎসবে দুই-তিনবার দেখি। তিনি কখন উপাসনা করিতেন, কখনও বা সঙ্গীতে যোগ দিতেন। অম্বিকাবাবু উৎসবের দিন রাত্রে অনেক লোককে নিজ বাটীতে আহ্বান করিতেন এবং বিশেষ সমাদরে তাঁহাদিগকে খাওয়াইতেন। অম্বিকাবাবু সম্ভবতঃ ১৮১১ শকে পরলোক গমন করেন।

অম্বিকাবাবুর পুত্র উকীল যোগেশচন্দ্র সরকার ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করিয়া পিতার ন্যায় কয়েক বৎসর সম্পাদকরূপে উহার সেবা করেন। যোগেশ বাবু বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার ঐ পত্রিকায় উৎসব-বিবরণ বাহির হইত। তাঁহার মৃত্যু অন্তে ব্রাহ্মসমাজ মলিন ভাব ধারণ করে। এক্ষণে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মিত্র মহাশয় অতীতের একমাত্র সাক্ষীরূপে বিরাজমান। তিনি এক্ষণে বৃদ্ধ ও দৃষ্টিশক্তি-হীন। ব্রাহ্মসমাজ রক্ষার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ। যোগেশ বাবুর মৃত্যুর পরে উৎসবকার্য্য আমাদিগকে লইয়া চালাইয়া আসিলেও বর্ত্তমানে তিনি আদৌ কর্ম্ম-ক্ষম নহেন। একারণ বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের যথেষ্ট দুর্গতি ঘটিয়াছে। বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ আবার সবল করিয়া তুলিবার জন্য আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে বিশেষ চেষ্টা চলি-তেছে। কিন্তু অর্থসঙ্কট আমাদের সমক্ষে বাধারূপে বিরাজমান।

কাল্‌না ব্রাহ্মসমাজ।

কালনা ব্রাহ্মসমাজ বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় বর্ত্তমানে বিশেষ দুর্দ্দশাপন্ন। কালনাব্রাহ্মসমাজ গঙ্গাতীরে অবস্থিত। উপাসনার জন্য একটী প্রশস্ত হল যাহা ৫০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে ভগ্নপ্রায়। শ্রদ্ধেয় বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন (যিনি হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন) তাঁহারাই কালনা ব্রাহ্মসমাজের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। বিহারীবাবু সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য্য চালাইতেন। তিনি নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। অনেকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীতও তাঁহার রচিত এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

১৮২৪ শকের ভাদ্র মাসে বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু ঘটে। উকীল অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় কয়েক বৎসর ঐ ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করেন। তাহার পর হইতে কালনা ব্রাহ্মসমাজের দুর্দ্দশা। ১৮২২ শকের উৎসব ৩৩ সাম্বৎসরিক উৎসব বলিয়া ঘোষিত। অঘোর বাবুর আমলে আমি ও ৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় উভয়েই উৎ-সবে যাইতাম। কালনা ট্রষ্টডীড ১৮১৬ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উহা হইতে জানা যায় বিহারী বাবু ও মথুরালাল মুখোপাধ্যায় শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবু, ক্ষিতীন্দ্র বাবু, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে ট্রষ্টী নির্দ্দেশ করেন। উক্ত ব্রাহ্মসমাজের জন্য মহারাজার নিকট একখণ্ড জমি কায়েমি পাট্টায় সন ১২৭৭ সালে গৃহীত হইয়াছিল।

কালনা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার পরদিন হইত। প্রাতে ও সায়াহ্নে উপাসনা হইত। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উৎসবে উপস্থিত থাকিতেন। বিহারী বাবু এবং অনেকের ভিতরে উৎসাহের ভাব দেখিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম ভবদেব নাথ। তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি নিজ হইতে বেদীর জন্য দুইটী বৈঠকী ঝাড় কিনিয়া দেন। আমার পিতা কাল্‌না উৎসবে প্রতি বৎসর যাইতেন। লালবিহারী বড়াল সুকণ্ঠ গায়ক বলাই বাবু প্রমুখ বিহারী বাবুর রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত মধুরভাবে গান করিতেন। আমরাও কালনা উৎসব দেখিবার জন্য পিতার অনুবর্ত্তী হইতাম। তখন কালনা যাইবার বিশেষ অসুবিধা ছিল। আমরা রাণাঘাট পর্য্যন্ত রেলে যাইয়া তথা হইতে চুর্ণী নদী পার হইয়া শকটযোগে শান্তিপুর যাইতাম, তথা হইতে নৌকাযোগে কালনা যাইতাম। দুই তিনবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বোটে পরিভ্রমণ কালে কালনা উৎসবে আসিয়া আমার পিতাকে লইয়া একত্রে বেদীতে বসিয়া উপদেশাদি দানে উৎসবকে মধুময় করিয়া তুলিতেন।

আমি পিতার মৃত্যুর পরে কয়েকবার কালনা-উৎসবে উপাসনা করিয়া আসিয়াছি। কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন মধ্যে মধ্যে আমার সঙ্গে উৎসবের বেদীতে বসিতেন। উক্ত কালীপ্রসন্ন বাবু, সুপণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের আত্মীয় ছিলেন। কালীপ্রসন্ন বাবু যে সমস্ত উপদেশ দিতেন তাহা "বক্তৃতামঞ্জরী" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তিনি আমাকে যে গ্রন্থখানি উপহার দিয়াছিলেন, তাহা আমি অদ্যাপি সযত্নে রক্ষা করিতেছি। তাঁহার ঐ পুস্তকের প্রথম উপদেশই এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্মই প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যযুগে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া মিলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিশেষ অনুরাগী ও ভক্ত ছিলেন; অনেকেই গ্রন্থরচনায় বক্তৃতায় গ্রন্থপ্রকাশে ও সঙ্গীতপুস্তকরচনায় কৃতিত্ব রাখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে সে শ্রদ্ধা সে নিষ্ঠা ও সে ঐকান্তিকতার ভাব বড় বিরল। সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজ সাম্প্রদায়িক মূর্ত্তি ধারণ করে নাই। যাঁহারা বিদ্বান সুপণ্ডিত তত্ত্বান্বেষী ও বিশেষ সম্ভ্রান্ত তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, ভূদেব বাবু, অক্ষয়কুমার দত্ত, শিবচন্দ্র দেব, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্যামাচরণ সরকার, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি তৎকালীন মনীষীগণের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। যাঁহারা কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে চান, তাঁহারা পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যগণের নাম দেখিতে পারেন। ঐ তত্ত্ববোধিনী সভাই এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা ও পোষণ করিয়াছিল।

দীননাথ অধ্যেতা নামক জনৈক অন্ধ প্রচারক আদিব্রাহ্মসমাজের সহিত যুক্ত ছিলেন। তিনি অন্ধ হইলেও বিশেষ জ্ঞানাপন্ন ছিলেন। কয়েকখানি উপনিষদ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি সঙ্গীত দ্বারা ও বক্তৃতাদানে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি আদিব্রাহ্মসমাজের ও বেহালার উৎসবে প্রতি বৎসর উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহার মৃত্যু ১৩০৩ সালের ৯ই মাঘ তারিখে ঘটে। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিহারী বাবুর আগ্রহাতিশয়ে কালনা-ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের অব্যবহিত পশ্চিমে তিনি পাকা বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন এবং ঐখানেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন। বিহারী বাবু উপাসনা দ্বারা এবং দীননাথ অধ্যেতা সঙ্গীত ও আলোচনা দ্বারা অনেকের মন আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। কালনা-ব্রাহ্মসমাজের অতীত কালের সাক্ষী মধ্যে মথুরানাথ গাঙ্গুলী মহাশয় ভগ্নদেহে এখনও বর্ত্তমান; আর বড় কাহাকে দেখিতে পাই না। বিহারীবাবু ও কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের অন্তে অঘোর বাবুর মৃত্যুর পরে কালনা ব্রাহ্মসমাজ উঠিয়া গিয়াছে। অর্দ্ধভগ্ন ব্রাহ্মসমাজ-গৃহটি আজও বিদ্যমান। কালনা-ব্রাহ্মসমাজকে পুনর্জ্জীবিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

আপনার পায়ে দাঁড়াও।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমরা সংবাদপত্রে দেখিয়া সুখী হইলাম, সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার জার্ম্মানীর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় আমরা তাঁহার দেশবাসী হইয়াও, তাঁহার দ্বারা বিশেষ কোন উপকার পাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলাম না। আমরা বাল্যাবধি দেখিয়া আসিতেছি যে, মুখে আমরা যথেষ্ট স্বদেশপ্রিয়তা দেখাইলেও অন্তরে বিদেশীয়ের চরণে মস্তক অবনত করিবার মোহ এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই; ইহার ফলে অনেক সময় আত্মবিচ্ছেদ ঘটে। ব্রাহ্মসমাজ তত্ত্ববোধিনীর সাহায্যে যে সকল সত্য প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন, পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত করিবার এবং দেশের শাস্ত্রসমূহের সাহায্যে, দেশের প্রাচীন লুপ্ত রত্নসকল উদ্ধার করিবার যে প্রাণপণ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন, বহুকাল যাবৎ তাহা দেশবাসীদিগের প্রাণস্পর্শ করিতে পারে নাই; কিন্তু পরে সহসা যখন থিওসফিসম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইল এবং ম্যাডাম ব্লাভ্যাড্স্কি এদেশে আবির্ভূত হইলেন, তখন তিনি মোটামুটি ব্রাহ্মসমাজেরই কর্ম্মমন্ত্রের অনুরূপ মন্ত্র লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেই দেশবাসীগণ ঐ বিদেশীয়ের নাম-মদিরায় মুগ্ধ হইয়া দলে দলে তাঁহার সম্প্রদায়ে যোগ দিতে লাগিলেন; ফলে, ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্য ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন; ইহা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের শক্তি ও কার্য্যকারিতা অনেক পরিমাণে ক্ষীণ হইয়া পড়িল, তাহা বলা বাহুল্য।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে দর্শনবিষয়ক ছাড়িয়া দিলেও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিষয়ক এমন অনেক প্রবন্ধ দেখা যায়, যেগুলির লেখক, সেকালে দেশবাসীর নিকটে উপযুক্ত উৎসাহ ও সাহায্য পাইবার অভাবে উপযুক্ত খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেই সকল প্রবন্ধের লেখক আজ জীবিত থাকিয়া সেগুলি ইংরাজীতে প্রকাশিত করিলে বিদেশীয়ের নিকট তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের নিকটেও যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিতেন। নোবেল প্রাইজ

পাইবার পূর্ব্বে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের অথবা স্যর সি, ভি, রমণের কৃতিত্ব আমরা কতটা বা কতটুকু উপলব্ধি করিয়াছিলাম, তাহা বলা যায় না। পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ যখন কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তখন অনেকেই এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, নোবেল প্রাইজ পাইবার পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মান দিবার অবসর খুঁজিয়া পান নাই কেন? ইহার কারণ ঐ একই—বিদেশীয়ের চরণে মাথা নত করিবার আন্তরিক ইচ্ছার প্রবল মোহ।

স্যর জগদীশচন্দ্র বসু আমাদের গৌরবস্থল হইলেও, বিলাতে সম্মানলাভের পূর্ব্বে দেশবাসীর নিকটে সম্মানের পরিবর্ত্তে কত-না উপেক্ষা লাভ করিয়াছিলেন! স্যর পি. সি. রায়, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি তাঁহাদের বক্তব্য বিষয় ইংরাজীতে লিখিয়া পাশ্চাত্যদেশে প্রশংসাপত্র পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা আমাদের নিকট প্রশংসা পাইতেছেন; কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ন্যায় অনেক সুবিদ্বান ও নীরবকর্ম্মী ব্যক্তি এদেশে জন্মগ্রহণ না করিয়া বিদেশে জন্মগ্রহণ করিলে কিরূপ উচ্চ সম্মানের আসন প্রাপ্ত হইতেন, তাহা বলা যায় না। কিন্তু হায়! তিনি বঙ্গবাসী হইয়া এই অজ্ঞানদগ্ধ বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং দুঃখী মাতৃভাষায় পুস্তকাদি রচনা করিয়া মাতৃভাষাকে সমধিক পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহার সম্মানপ্রদর্শনে আমরা কতটুকুই বা চেষ্টা করিয়াছি; তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য আমরা কতটুকুই বা চেষ্টা করিয়াছি! বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালীর প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের প্রতি উপযুক্ত সম্মানপ্রদর্শনে প্রকৃতই অগ্রসর হইতে চাহেন, দেশপ্রেমে সত্যই যদি তাঁহাদের হৃদয় অভিষিক্ত হইয়া থাকে, তবে দেশবাসী এবং সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য যে, রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতির ন্যায় লেখকদিগের স্বদেশীয় ভাষায় রচিত পুস্তকসকল উপস্থত হইয়া নানা উপায়ে পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট করাইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা খুঁজিয়া খুঁজিয়া ঐ সকল পুস্তক প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছেলেদের বাল্যাবধি পড়িবার ব্যবস্থা করেন। ঐ প্রকার করিলেই দেশের মহাপুরুষদিগের নাম ও কীর্ত্তি ভবিষ্যতের আশার স্থল ছাত্রদিগের অন্তরে গভীররূপে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে, এবং তাহাদিগের ভবিষ্যৎ জীবন মহনীয় করিয়া তুলিবে।

এই যে বিনয় কুমারের অর্থনীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধসকল "আর্থিক উন্নতি" মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠাসকল অলঙ্কৃত করিতেছে, আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, সেই সকল প্রবন্ধ ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হইলে যে কোন বিলাতী মাসিক পত্রে প্রকাশের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিত। কিন্তু আজ উহা দরিদ্র বঙ্গভাষায় লিখিত বলিয়া কয়জন দেশবাসীর উপযুক্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে? যে সকল শ্রেণীতে অর্থনীতি (economics) পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য বিনয়কুমার এবং অন্যান্য অর্থনীতিজ্ঞ দেশবাসীর প্রবন্ধাদি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া সেই সকলও ঐ সকল শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করা। অর্থনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে এই প্রকারের ও নানা ভাবের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট উৎসাহ না পাইলে বাঙ্গালা সাহিত্য ও বঙ্গভাষা যথাসম্ভব পরিপুষ্ট হওয়া সম্ভবপর নহে। প্রকৃত কথা এই, পরাধীনতাই দুঃখের কারণ এবং স্বাধীনতাই সুখের কারণ—"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বম্ আত্মবশং সুখং"। পদে পদে কথায় কথায় সাহিত্য প্রভৃতি আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য বিষয়েও আমাদের বিদেশীয়ের চরণে মাথা নোয়াইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও মোহ কাটাইয়া উঠিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এখনও আমরা উহাতে সক্ষম হই নাই, এ বিষয়ে জার্ম্মানী ও জাপানকে আমাদের আদর্শ স্থানে রাখিলে ভাল হয়। জার্ম্মানীতে যতদিন ফরাসী ভাষা ব্যবহৃত হইত, ততদিন সমস্ত দেশটাকে দাসমনোভাব আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু জার্ম্মানীর জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী ভাষার ব্যবহার পরিত্যক্ত হইয়া সমগ্রদেশে স্বদেশীয় জার্ম্মান ভাষাই ব্যবহৃত হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে দেশও খরবেগে উন্নতির স্রোতে ছুটিয়া চলিল। এই ভাবেরই বশবর্ত্তী হইয়া জাপানও বিদেশীয় সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করাইয়া প্রচলন করিবার ফলে উন্নতির পথে ছুটিয়া চলিতেছে দেখা যায়।

পথহারা।

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্-এ)

লুপ্ত যেথায় সকল দ্বন্দ্ব—
সকল অবসান;
সেথায় তুমি বাজাও বাঁশি,
গাও হে মধুর গান।

সীমাহারা সাগর-জলে,
তোমার ছবি নিত্য চলে;
মহাকাশের নীরবতায়
তুমি বর্ত্তমান।
অরূপ তুমি, রূপের মাঝে
চির-মূর্ত্তিমান!

হৃদয় যখন সঙ্গ পেয়ে
চম্‌কে উঠে ধীরে;
মহা ভাবের ঊর্ম্মি লাগে
জীবন-নদীর তীরে;

লুপ্ত তখন বিশ্ব-সারা,
আমিত্ব হয় পন্থা-হারা,
দেখি, অন্ধকারের তিমির মাঝে
তুমি দীপ্যমান

মহাভারতে জাতিতত্ত্ব।

(স্বামী ভূমানন্দ)

(২)

গত পৌষ সংখ্যায় 'বৈদিক সভ্যতার পরিচয়' বিষয়ক প্রবন্ধে ঋগ্বেদসংহিতা ও উপনিষদের সৃষ্টিতত্ত্ব যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পরেও কি প্রকারে বেদকে অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় বলা যাইতে পারে, তাহা বুঝি না।

সৃষ্টিতত্ত্ব-বর্ণনা হইতে কেহ যদি মনে করেন যে, আমরা বেদ ও উপনিষদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছি, তবে তাহা ভুল হইবে। এবম্প্রকার আলোচনা হইতে বরং দুইটি প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে:—(১) বেদ অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় এই মতবাদ ঠিক কিনা; এবং (২) কেমন করিয়া এবিষয়ে ভ্রান্ত মতসকল পরিহার করা যায়।

দার্শনিকভাবে বিচারপূর্ব্বক প্রক্ষিপ্ত মন্ত্রসকল বাদ দিয়া যদি কেহ নূতন করিয়া বেদ সম্পাদন করিতে পারেন, তাহা হইলে এক হিসাবে বেদকে অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ হইবে না।

সত্যই অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় বলিয়া গর্ব্ব করিবার মত অনেক সম্পদ বেদে রহিয়াছে। কিন্তু সময়ে সময়ে নানা কারণে বেদ মধ্যে প্রক্ষিপ্ত মন্ত্র যুক্ত হওয়াতেই যত গোলের কারণ হইয়াছে।

এই ভাবের গোলমাল যে বেদ-উপনিষদেই রহিয়াছে তাহা নহে, সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যেই পরস্পরবিরুদ্ধ বিধান-সকল এই প্রকার গোলযোগের কারণেই দৃষ্ট হয়। মহাভারতের আলোচনায়ও ইহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সমগ্র মহাভারতের প্রতি দৃষ্টি রক্ষা করিয়া এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে,—বৈদিক যুগে যেমন বেদপন্থী-গণের মূলজাতি আর্য্য নামে পরিচিত ছিল, মহাভারতীয় যুগে সেই প্রকার বেদপন্থীগণের মূলজাতি ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত ছিল। পরে ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও শূদ্রজাতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং ক্ষত্রিয়গণই সকল 'শ্রেণীর' শৃঙ্খলাসম্পাদনে তৎপর ছিল, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়রাজগণই ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন। এই মতের অনুকূলে "ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আদিদেব হইতে সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন হইয়াছে" যেমন উক্ত আছে,—তেমনি বংশপরিচয়ের মধ্যেও ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শূদ্রের আবির্ভাব স্বীকৃত রহিয়াছে। কিন্তু কালে এ ব্যবস্থারও যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহার নিদর্শন-স্বরূপ ব্রহ্মার মুখই ব্রাহ্মণ হইলেন, অথবা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ হইলেন এবং ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের উদ্ভব হইল, এ কথাও মহাভারতেই দৃষ্ট হইবে। কখন্ ও কেমন করিয়া এই পরিবর্ত্তন সম্ভব হইয়াছিল, সে কথার উল্লেখ যথাসময়ে সকলেই দেখিতে পাইবেন। এক্ষণে "ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কেন যে আদি-দেব হইতে সর্ব্বাগ্রে সৃষ্ট হইয়াছে" বর্ণিত আছে, তৎপক্ষে বংশপরিচয় বা কুলজীই সকলের বড় প্রমাণ। এইজন্য নিম্নে চন্দ্রবংশের কুলজী উদ্ধৃত করা গেল:—

ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ, দক্ষের পুত্র আদিত্য, তৎপুত্র বিবস্বান, তৎপুত্র মনু, তৎপুত্র পুরূরবা, তৎপুত্র আয়ু, তৎপুত্র নহুষ, তৎপুত্র যযাতি। যযাতির দুই বিবাহ,—প্রথমা স্ত্রী শুক্রাচার্য্যকন্যা দেবযানী, দ্বিতীয়া স্ত্রী দৈত্যরাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা। দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু, শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু। যদু তুর্ব্বসু দ্রুহ্যু ও অনু এই চারিজন ভারতের বাহিরে রাজ-চক্রবর্ত্তী পুরুর অধীনে করদরাজরূপে অবস্থান করেন। পুরু ভারতসাম্রাজ্যের সম্রাট হন। পুরুবংশ হইতে একদিকে মেধাতিথির পুত্রগণ ব্রাহ্মণ হন। অপরদিকে ভরতের প্রপৌত্র ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি তিন পুত্রই যজ্ঞসম্পাদনকারী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হন। দুষ্মন্তের পৌত্র বিতথের চারি পুত্র মধ্যে মহাবীর্য্য ও গর্গের পৌত্রগণ ব্রাহ্মণ হন এবং কনিষ্ঠপুত্র বৃহৎক্ষেত্র-বংশে কৃপাচার্য্য ব্রাহ্মণ হন।

পুরূরবা-পুত্র আয়ুর বংশধরগণ মধ্যে ক্ষত্রবৃদ্ধের তৃতীয় পুত্রের বংশে ভর্গপুত্র ভর্গভূমি জন্মগ্রহণ করেন। ষষ্ঠ পুত্র গৃৎসমদ-বংশে শৌনকের উৎপত্তি হয়। বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণে লিখিত আছে, এই শৌনক আপন পুত্র-গণকে গুণানুসারে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণে বিভাগ করিয়া-ছিলেন।

পুরূরবার কনিষ্ঠ পুত্র বিজয়ের বংশে বিশ্বামিত্র প্রথম ব্রাহ্মণ হন। তারপর বিশ্বামিত্র-বংশ যজ্ঞাধিকার লইয়া 'ব্রাহ্মণ' শ্রেণীভুক্ত হইলেন। [আদিপর্ব্ব, পঞ্চনবতিতম অধ্যায়]।

সুতরাং দেখা যাইতেছে ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে দক্ষ—ইঁহারা কেহই ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হন নাই। বরং এই কুলজী দৃষ্টে স্বীকার করিতেই হইবে যে, ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছিল।

জাতি বা শ্রেণীবিভাগের কথা যখন প্রথম ইতিহাসে (মহাভারত) লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তখন রাজন্য বলিতে ক্ষত্রিয় জাতিকেই বুঝাইত, সূর্য্যবংশের পরিচয়ে বাল্মীকি রচিত রামায়ণে লেখা আছে,—ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মা, তৎপুত্র মরীচি, তৎপুত্র কশ্যপ, তৎপুত্র বিবস্বান, তৎপুত্র মনু, তৎপুত্র ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এই ইক্ষ্বাকু-বংশাবতংশ।

ক্ষত্রিয় হইতে যে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছিল তাহা ভাগবতের নবমস্কন্ধে রাজর্ষি শ্রাদ্ধদেব মনুর পুত্রগণের পরিচয়ে প্রমাণিত হইবে। যথা :—

মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইক্ষ্বাকু।
" ৪র্থ " শর্য্যাতি।
" ৫ম " দিষ্ট।
" ৭ম " করূষ।
" ৮ম " পৃষধ।
" ৯ম " নভগ।

মনুর চতুর্থ পুত্র অঙ্গিরাদিগের যজ্ঞে ব্যবস্থা ও উপদেশ করিয়াছিলেন। এই হেতু যদি কেহ ইচ্ছা করেন তাহা হইলে শর্য্যাতিকে ব্রাহ্মণ বলিতে পারেন। কারণ ঋগ্বেদে ব্রাহ্মনাস, বিপ্র প্রভৃতি শব্দ যজ্ঞে মন্ত্র উচ্চারণকারী 'স্তোত্রকার'কে বুঝাইয়াছে।

মনুর পঞ্চম পুত্র দিষ্ট; দিষ্টপুত্র নাভাগকে 'বৈশ্য' বলা হইয়াছে। মনুর সপ্তম পুত্র করূষ; করূষের বংশধরগণ উত্তরাপথরক্ষক ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে যজ্ঞে নিযুক্ত হইয়া 'ব্রাহ্মণ' হন। মনুর অষ্টম পুত্র পৃষধ শূদ্র বলিয়া উক্ত আছেন।

সুতরাং সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের পরিচয়ে,—'ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম যে আদিদেব হইতে সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের পশ্চাতে যে অন্যান্য ধর্ম্মের উৎপত্তি * * সমস্ত ধর্ম্মই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের আয়ত্ত, এই নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ * * ও সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা অবিনশ্বর। উহাদের প্রভাবে সমস্ত সুশৃঙ্খল হইতে পারে' এই যে উক্তি, তাহা অস্বীকার করা চলে না।

ঋগ্বেদে বেদপন্থী জাতির নাম ছিল,—আর্য্য। মহাভারতে সেই বেদপন্থী জাতির নাম হইল ক্ষত্রিয়। ঋগ্বেদে ক্ষত্রিয়া শব্দ দেবতার বিশেষণে প্রযুক্ত দৃষ্ট হয়। সেখানে অর্থ হইয়াছে বলশালী। অতএব বর্ণ বা জাতির নামপরিবর্ত্তনে মহাভারত সনাতন পন্থা রক্ষা করে নাই। কিন্তু মহাভারত যে বেদাদর্শ ত্যাগ করিতে পারে না, করিলে তাহা যে বেদপন্থী সমাজ সহ্য করিবে না, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য পরে বৃহদারণ্যকোপনিষদের মধ্যে পরস্পরবিরুদ্ধ যে সকল সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে এক মতে উক্ত আছে, "তিনি (সগুণ ব্রহ্ম) একাকী কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলেন না; তিনি উত্তম শ্রেয়স্কর ক্ষত্রিয়জাতি সৃষ্টি করিলেন।" উপনিষদও যখন বেদ, তখন উপনিষদের মধ্যে ঐ কথা যুক্ত থাকায় ঋগ্বেদের বিরুদ্ধে মহাভারত আর্য্য নামের স্থলে যে ক্ষত্রিয় নাম গ্রহণ করিয়াছে, তাহা আর দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইল না। এমন করিয়া যখন-যেমন সমাজে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাকে সমাজ গ্রহণ করিয়া সেই ব্যবস্থা যে বেদসম্মত তাহা দেখাইতে গিয়াই প্রক্ষিপ্ত মন্ত্রের সম্ভব সাধন হইয়াছে।

ঋগ্বেদের "যদিংদ্রাগ্নী যদুষু তুর্বশেষু যদ্ দ্রুহ্যুষনুষু পুরুষুস্থঃ" * ইত্যাদি মন্ত্রের সহিত মহাভারতে যযাতি-পুত্র যদু, তুর্বসু, দ্রুহ্যু, অনু ও পুরুর নাম দেখিয়া মনে হইবে ঋগ্বেদে যে 'পঞ্চ ক্ষিতি' 'পঞ্চজনা' শব্দ রহিয়াছে যদু প্রভৃতি পাঁচ জন এই পঞ্চজন, এবং ইঁহারা পঞ্চক্ষিতি অর্থাৎ পঞ্চজনপদের গ্রামণী বা রাজা ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরু সমস্ত ভারতবর্ষের উপরে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং অপর চারি ভ্রাতা তাঁহার অধীনে বর্ত্তমান ভারত সীমান্তের বাহিরে গান্ধার, বাহ্লীক প্রভৃতি প্রদেশের করদ রাজা ছিলেন। মহাভারতে ইহাও উক্ত আছে যে,—তুর্বসু হইতে যবন এবং অনু হইতে ম্লেচ্ছ জাতির উদ্ভব হইয়াছে। অনেক পুরাণে মহাভারতের এই উক্তি সমর্থিত হইয়াছে। অতএব যে সকল জাতি বর্ত্তমানে পাঠান বা তুর্কী নামে পরিচিত তাহারা রক্তে মাংসে যে ক্ষত্রিয় বা আর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। যদিও পরবর্ত্তী যুগে ইহাদের বংশধরগণ আত্মার স্থলে আল্লা নাম গ্রহণ করিয়াছে, তবুও তাহাদের সামাজিক আচারব্যবহার বা সভ্যতা এখনও যাহা প্রচলিত আছে, তাহাতে তাহাদিগকে বর্ত্তমান আর্য্য-সভ্যতার উত্তরাধিকারী বলা যাইতে পারে। হিন্দুগণ অপেক্ষা পাঠান ও তুর্কীগণ কিম্বা ইউরোপীয় জাতিসকল যে সমধিক বৈদিক সভ্যতারই অনুসরণ করিতেছে, বৈদিক সভ্যতার আলোচনা হইতে তাহা সকলেই দেখিতে পাইয়াছেন।

ঋগ্বেদে আর্য্যবর্ণের মধ্যে বিভিন্ন কর্ম্মের দ্বারা বহু শ্রেণীর পরিচয় ইতিপূর্ব্বে সকলেই লাভ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদের সহায়ে সকলেই দেখিয়াছেন, ক্ষত্রিয়ই আদি জাতি। মহাভারতের সহায়েও সকলেই দেখিলেন—ক্ষত্রিয় হইতেই ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রের উদ্ভব হইয়াছে; এবং ইহাও সকলেই দেখিয়াছেন যে, ঋগ্বেদে যে বহু শ্রেণীবিভাগ, তাহা মহাভারতে নির্দ্দিষ্ট চারিবর্ণ বা শ্রেণীতে আবদ্ধ হইয়াছে। এই চারিবর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয়ই মূল জাতি এবং 'ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' উক্ত আছে।

যেমন করিয়া বেদ-উপনিষদের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত মন্ত্র-সকল সম্ভবতঃ বিশেষ কারণে যুক্ত হইয়াছিল, ঠিক তেমনই ভাবে হিন্দুজাতির সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত উক্তি সকল যুক্ত হইয়া একই গ্রন্থে পরস্পর বিরোধী বিধানের সমাবেশে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে

* ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১০৮ সূক্ত ৮ ঋক্।

যাহাতে কোন বুদ্ধিমান ও নিরপেক্ষ পাঠকের পক্ষেই হিন্দু জাতির ধর্ম্মগ্রন্থসকল কঠিন সমালোচনা ভিন্ন পাঠ করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

নিম্নে মহাভারতের আলোচনায় পাঠক দেখিতে পাইবেন, ত্রিকালজ্ঞ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বিরচিত গ্রন্থমধ্যে কেমন পরস্পরবিরুদ্ধ বর্ণনাসকল স্থান পাইয়াছে।

মহাভারতে সৃষ্টিতত্ত্ব-বর্ণনায় লিখিত আছে,—

(ক) "প্রথমতঃ এই বিশ্বসংসার কেবল ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল। অনন্তর সমস্ত বস্তুর বীজভূত এক অণ্ড প্রসূত হইল। ঐ অণ্ডে অনাদি, অনন্ত, অচিন্ত্যনীয়, অনির্ব্বচনীয়, সত্য-স্বরূপ, নিরাকার, নির্ব্বিকার, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ঐ অণ্ডে ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং জন্মপরিগ্রহ করিলেন। তৎপরে স্থাণু, স্বায়ম্ভুব মনু, দশ প্রচেতা, দক্ষ, দক্ষের সপ্তপুত্র, সপ্তর্ষি, চতুর্দ্দশ মনু জন্মলাভ করেন। মহর্ষিগণ একতান মনে যাহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই অপ্রমেয় পুরুষ, দশ বিশ্বদেব, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, যমজ অশ্বিনীকুমার, যক্ষ, সাধুগণ, পিশাচ, গুহ্যক এবং পিতৃগণ উৎপন্ন করিলেন। অনন্তর অনেকানেক বিদ্বান মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ উৎপন্ন হইলেন। * * * এই সকল হইতে কুরুবংশ, যদুবংশ, ভরতবংশ, যযাতিবংশ ও ইক্ষ্বাকুবংশ এবং অন্যান্য প্রভৃত রাজর্ষিবংশ সম্ভূত হয়।"

(মহাভারত আদিপর্ব্ব,—অনুক্রমণিকা অধ্যায়)

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, যখন ইহা মহাভারতে লিখিত হইয়াছিল, তখন ক্ষত্রিয় ভিন্ন ব্রাহ্মণ বা অন্য কোন জাতির নাম লেখকের কল্পনায়ও ছিল না। থাকিলে ব্রাহ্মণের কথা উল্লেখ করা কি খুব অসঙ্গত হইত?

(খ) "সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা সর্ব্বাগ্রে মহৎকে সৃষ্টি করিলেন। মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে সলিল, সলিল হইতে অগ্নি ও বায়ু এবং অগ্নি ও বায়ু হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। অনন্তর ভগবান একটি পদ্ম সৃষ্টি করিলেন। সেই পদ্ম হইতে বেদের নিধান ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। * * * আকাশ প্রভৃতি এই পঞ্চভূত দ্বারাই ব্রহ্মার মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল।"

(শান্তিপর্ব্ব, দ্ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়)

কিন্তু এই মহাভারতেরই অন্যত্র যখন দৃষ্ট হইবে—

(গ) "ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, এবং পাদদেশ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল।"

(শান্তিপর্ব্ব)

কিম্বা অন্যত্র উক্ত আছে,—

(ঘ) "আমার মুখ ব্রাহ্মণ, ভুজদ্বয় ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় বৈশ্য ও পাদদ্বয় শূদ্র হইয়াছে। * * অগ্নি আমার মুখ, পৃথিবী আমার পদ * * মহাদিক ও মহাকাল আমার শরীর, বায়ু আমার মন।"

(বনপর্ব্ব, ১৮৯ অধ্যায়)

(ঙ) কিম্বা—"ভগবান ব্রহ্মা প্রথমে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, এই ছয় জন মানসপুত্র সৃষ্টি করিলেন। * * অনন্তর তাঁহার (ব্রহ্মা) মুখ হইতে একশত ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে একশত ক্ষত্রিয়, উরু হইতে একশত বৈশ্য, পাদ হইতে একশত শূদ্র উৎপন্ন হইল।"

(শান্তিপর্ব্ব, সপ্তাধিক দ্বিশততম অধ্যায়)

উপরোক্ত সৃষ্টিবর্ণনায় একবার বলা হইয়াছে,—'মুখই ব্রাহ্মণ হইল,' আবার বলা হইয়াছে, 'মুখ হইতে ব্রাহ্মণ হইল।' অন্যত্র বলা হইয়াছে, 'একশত ব্রাহ্মণ হইল।' পূর্ব্ব অধ্যায়ে ব্রহ্মার ছয়জন মানসপুত্র স্বীকৃত হইয়াছে, ঠিক পরের অধ্যায়েই আবার সাতজন মানস পুত্র উক্ত আছে। যথা:—

(চ) "প্রথমে কেবল ব্রহ্মা বিদ্যমান ছিলেন। অনন্তর তাঁহার মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত পুত্রের উৎপত্তি হইল।"

এই সকল 'মতানৈক্য হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, যাঁহারা এই সকল বর্ণনা শাস্ত্রমধ্যে সমাবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিশেষ প্রয়োজনবোধেই ইহা করিয়াছিলেন; নতুবা এরূপ মতানৈক্য সম্ভবপর হইত না।

তৎকালীন সামাজিক অবস্থা কেমন করিয়া এই বিভিন্ন মত হইতে জানিতে পারা যাইবে, তাহাও মহাভারতেই উল্লিখিত হইয়াছে। মহাভারতে লিখিত আছে,—"ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম আদিদেব হইতে সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন হইয়াছে।" (শান্তিপর্ব্ব, চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়)

এ পর্য্যন্ত মহাভারতের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, গুণ ও কর্ম্মানুসারেই বর্ণবিভাগপ্রথা প্রচলিত থাকিলেও মূলজাতি ছিল ক্ষত্রিয়; এবং ক্ষত্রিয় হইতেই যে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার পরিচয়ও কুলজীতে দৃষ্ট হইবে।

কিন্তু এদেশে একশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা বিশ্বাস করেন সৃষ্টির প্রথম হইতে বংশগত জাতি আরম্ভ হইয়াছে। এই বংশগত জাতি নিজ জাতির গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অন্য কাহারও গণ্ডীতে মিশিতে সক্ষম ছিল না। অন্য জাতির সহিত মিলিতে হইলে তাহাকে অন্ত্যজ জাতির পর্য্যায়ভুক্ত হইতে হইবে।

মহাভারত কিন্তু অন্য রকম সাক্ষ্য দিতেছেন; যথা :— "অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব শূদ্র-বংশ হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণবংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয় এরূপ নহে; কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার অর্থাৎ যাগযজ্ঞের ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ এবং যে সকল ব্যক্তিতে তাহা লক্ষিত হয় না তাহারাই শূদ্র।"

(বনপর্ব্ব,—অশীত্যধিকশততম অধ্যায়)

প্রশ্ন হইতে পারে, যদি বৈদিক ব্যবহারই ব্রাহ্মণত্বের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত বেদবিহিত কার্য্যে সামর্থ্য না জন্মাইবে, সে পর্য্যন্ত 'জাতি' কি কোন কার্য্যকারক নহে? এই প্রশ্নের উত্তরে ত্রিকালজ্ঞ ব্যাসদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্য যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

'বাক্য, সম্ভোগ, জন্ম ও মরণ মানবজাতির সাধারণ ধর্ম্ম, এই নিমিত্ত সর্ব্বদা পুরুষেরা জাতিবিচারে বিমুখ হইয়া নারীতে সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকে; অতএব মনুষ্যজাতির মধ্যে সমুদয় বর্ণের এইরূপ সঙ্করবশতঃ ব্রাহ্মণত্বাদি দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু তাহার মধ্যে যাহারা যাগ-যজ্ঞশীল তাহারাই ব্রাহ্মণ।' 'বেদবিহিত কর্ম্মই ব্রাহ্মণত্ব-লাভের হেতু বলিয়া নাড়ীচ্ছেদনের পূর্ব্বে জাতকর্ম্ম সমাধান করিতে হয়, তদবধি সাবিত্রী মাতা ও আচার্য্য পিতা স্বরূপ হন, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষ বেদ পাঠ না করে ততদিন পর্য্যন্ত সেই পুরুষ শূদ্রের সমান থাকে।'

এই সকল বিধান হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে,— কি বৈদিক সমাজে, কি মহাভারতীয় সমাজে বংশগত জাতিবিভাগপ্রথা কদাচ প্রচলিত ছিল না। যাহা ছিল সেই 'শ্রেণী' বিভাগ গুণ ও কর্ম্মের দ্বারাই চিহ্নিত হইত।

THE

BRAHMA SAMAJ

UNDER

DEVENDRANATH THAKUR,

CHAPTER II.

(5)

50. Tattwabodhini Patsala 1762 Shak. (1840 A. D.); abolished 1768 Shak (1846 A.D.)

The *Tattwabodhini Sabha*, with Devendranath Thakur at its head, not only directed its attention to the improvement of the *Brahma Samaj*, by introducing a regular form of divine worship into the *Samaj*, and the Brahmic covenant for promoting consistency of conduct among Brahmas, but also to the diffusion of *Brahma Dharma* among the uneducated masses by the establishment of schools. By this it acquired great popularity and renown. It established the famous *Tattwabodhini Patshalah* at this time for the diffusion of both theological and secular knowledge. This *Patshalah* was established in 1762 Saka (A. D. 1840) at Calcutta, with a view, as is mentioned by the *Itivritta*, to arrest the progress of Christianity. Here the Upanishads were taken up as the principal branch of study. This school was removed afterwards to Bansbaria, in the Hughli district in 1766, Saka (A. D. 1844), where it flourished. It is said that 500 gentlemen, comprising the best educated and most influential members of the Hindu community, attended on the occasion of the first distribution of prizes to the students. It was abolished in 1768 saka (A. D. 1846) to give place to another seminary, though the above mentioned history attributes its abolition to want of funds. It was also about this time that the Society established a Vedic School at Calcutta, to explore the Vedas, and instruct its pupils in Vedic literature; Not content however with this, the *Sabha* sent in 1766

51. Pandits sent to Benares, 1766 *Shak*.

Saka (1844), and the following year, four young Brahmins to Banares to study the Veda and the Vedanta, because a knowledge of these theological writings had altogether disappeared from Bengal, and there was hardly any one to be found among the most learned pandits of this country, who could understand the obsolete dialect of the Vedas. The four young Brahmans thus deputed to Banares were Pandit Ananda Chandra Vedantavagisa, and Pandits Ramanatha, Banesvara, and Taraknath Bhattacharjas. Of these Pandits, Ananda Chandra Vedantavagisa was directed to study the Atharva Veda, which contains the 52 Upanishadas, and

the Vedanta philosophy, and Ramanatha, Banesvara, and Taraknath Bhattacharjas were to study the three other successive Vedas respectively. They were, after their return, employed as ministers and preachers in the *Brahma Samaj*.

52. Ananda Ch. Vedantavagish.

Pandit Ananda Chandra Vedantavagisa was the most conspicuous among them. He held the chief ministership of the church till his death, which occured but a year or two ago. He published valuable editions of the several Vedantic works, such as the Panchadasi, the vedanta Sara, and the Bhagavadgita; and was the editor of the Srouta and Grihya Sutras, published in the Bibliothica Indica of the Asiatic Society of Bengal.

53. *Tattwabodhini Patrika* 1765 (1843). *Shak.*

The society next started in 1765 Saka (1843) the *Tattwabodhini Patriká*, a monthly periodical in the Bengali Language, to serve as a vehicle for the communication of theological knowledge.

54. Adi Samaj Press 1762 (1840). *Shak.*

From another account we learn that the Tattwabodhini Press was presented anonymously to the *Samaj*, for its benefit in 1762 Saka (1840 A. D.) It was employed in the publication of the *Tattwabodhini Patrika*, and a re-edition of Ram Mohhun Roy's works and books on the subject of religion.

55. Akshay Kumer Dutt, Editor *T. Patrika.*

Akkhaya Kumar Datta was appointed the first editor of the *Patrika*. This gentleman ably conducted it for 12 years, till, broken down by intense application and mental labour, he had to resign it into the hands of Nobin Kristo Banerji.

The journal is still in existence and flourishing, but the most prosperous time of its career was during the editorship of Akkhaya Kumar Dutta, when the numbers of its subscribers amounted to 700, most of whom were Mofussilites, and many of whom it succeeded in converting to Brahmaism. In fact it was a very efficient vehicle for the spread of Brahmaistic principles, and it was justly been reckoned one of the three main instruments for the propagation of the Brahmic religion, the other two being *Brahma Samaj* itself and the *Tattwabodhini Sabha*. It is also admitted by all that this journal has greatly contributed to the improvement of the Bengali language.

56. Paper-committee, *T. Patrika.*

The *Tattwabodhini Sábha* had a Committee of Papers for some time connected with it. No article was published in the *patrika* without the permission of this Committee. The members were Iswara-Chandra Vidyasagar, Rajendralal Mitra (now L.L.D.), Prasanna Kumar Sarvadhikari, Ananda Krishna Bose, grandson by the mother's side of Raja Sir Radhakant Deb, Rajnarain Bose, and Ananda Chandra Vedantavagisa.

57. Devendra Nath and the Brahmic covenant; 7th *Pous* 1765 *Shak.*

It is mentioned in the history of the *Samaj*, from Devendranath's own account, that he was exposed to great trouble and annoyance on his conversion owing to his having strictly to observe the condition of of his covenant. These conditions imposed upon him the duty of discountenancing all idolatrous rites, which were still adhered to, and practised by his family in their domestic circle, and which he had no power to abolish. He was hence obliged to keep himself aloof from his family at the time of the Durga Pujah or the *Saradiya Mahotsab* (Autumnal Festival), the great religious festival of the Hindus of Bengal. "The practice of taking the Brahmic covenant, says he, was instituted on the 7th Pous 1765. On that day, I took the covenant before Ramchundra Vidyavagisa, the Acharya of the *Samaj*. From that time I used to travel out every year, when the Durga Paja was celebrated at my house. How many times have I been exposed to

the scorching rays of Aswin (September) and the gales of Kartick (October), during my travels: how often have I prayed to my God with tears in my eyes for the day when idolatrous ceremonies would be abolished from our house, and the adoration of the Infinite Deity commence in their stead."*

True it is that many Hindus had openly embraced the Brahmo faith like himself, but none with that sincerity, faith, and love, as he had done.

58. Activity against Christian Propaganda.

The following year 1767 Saka (1845) was one of the most prominent in the History of the *Samaj*, inasmuch as it exhibited the strenuous efforts of the Brahmas, in defence of their religion, against the attack of Christians and the encroachments of European missionaries.

Dr. Duff had published the year before some unmerited strictures on the Brahmas and their religion in his work: "India and Indian Missions." Other missionaries kept up the attack. These uncalled for aggressions stimulated the Brahmas to reply by a series of articles written in English, and published in the *Tattwabodhini Patrika*, and the issue of a number of pamphlets attacking Christianity, entitled "A Rational Analysis of the Gospel." The articles in the *Patrika* were afterwards collected and published in pamphlet form under the name of "Vedantic Doctrines Vindicated." The occurrence of another event—the kidnapping of Umesa Chandra Sirkar, a boy of 14 years of age, with his wife, a girl of eleven, by missionaries, and their ill-advised christening of boys under age, irritated the Hindu community to the utmost degree, The boy was released by recourse to the *Habeas Corpus* Act, and strenuous efforts were made to arrest missionary attempts at proselytism. Devendranath Thakur took the lead in these efforts and his right hand man at the time, Akkhaya Kumar Datta, made eloquent and inflammatory appeals to the Hindu community severely condemning the proceedings of the missionaries, all of which were published in the *Patrika* of the time.

59. *Hindu Hitarthi Vidyalaya.*

Devendranath succeeded in raising subscriptions amounting to Rs. 32,000, of which Rs. 1,0000 was contributed by the millionaire, Asutosha Dev, for the purpose of establishing an Anglo-vernacular School, named *Hindu 'Hitarthi Vidyaláya'* for the secular education of Hindu youths. The school long continued to be supported by the proceeds from this capital till its abolition, owing to the bankruptcy of the heirs of Austosha Dev, in whose hands the funds were placed as treasurer.

60. Death of Dwarka Nath Tagore and his *sraddha.*

The following year was attended by a very sad event to Devendranath Thakur, the death in England of his renowned father, Dwarkanath Thakur. From this event, however, the pious Devendra derived much good. He availed himself of this adversity to introduce a very necessary religious reform, that of conducting the Sraddha or funeral obsequies of a dead man in a monotheistic or unidolatrous way. This measure, instead of gaining him the approbation of his countrymen, raised a strong opposition against him from his orthodox and unreformed relatives and friends. This was the first introduction of a *Brahmic Anusthana*, or unidolatrous rite in the Hindu domestic circle, where the practice of idolatrous social ceremonies is deeply engrafted, and this instance of the first adoption of a reformed mode of *Sraddha* in Devendranath's own family greatly promoted the cause of a general reform.

61. Devendranath and his Father's debts.

Although it has no direct connection with the history of the *Samaj*, I may *en passant* here notice an event which occurred at this period in the life of Devendranath, shewing the sterling honesty of his

* Twenty-five Years' Experience of the B. Samaj.

character. Dwarkanath Thakur died involved in debts. At the time of his death his liabilities amounted to about a crore of rupees, while his assets were only 43 lakhs. In this critical state of his affairs Devendranath did not, as was commonly the case, defraud his creditors by passing through the usual whitewashing process at the Insolvent Court. He, instead of taking that imprudent step,—imprudent both in a worldly and religious point of view,—called a meeting of his creditors and frankly laid before them the whole state of his finances. His creditors were struck with such honesty that they agreed to compound with him, evincing much sympathy towards him on the occasion. It took years and years for Devendranath to pay off the compounded debts, but, by means of judicious management, and exemplary self-denial, he eventually succeeded in doing so to the utmost farthing. Never, perhaps, has the truth of the adage "Honesty is the best policy" been more signally illustrated than in the case of Devendranath Thakur. Had he adopted a dishonest policy, he would perhaps have not been able to save a tittle of his vast inheritance, but, betaking himself to an honest course of action, he has been able to save a considerable part of it.

62. Branch Samajes established in Moffussil.

To return to the main subject. Now comes the period of the establishment of Branch *Samajes* in the Mofussil, owing partly to the zeal of Devendranath himself, but more especially to the zeal and energy of his followers in their respective towns or villages. Hitherto reformation was confined to the narrow limits of Calcutta, and, notwithstanding the enlightenment of a few Mofussil zemindars, the majority of the people continued in a gross state of idolatry and ignorance. Every Brahma, who happened to be placed in the interior district, was sure to be misunderstood, and derided with the misnomer of "Kristan," "Christian", and condemned to suffer the strictest social ostracism.

But the current of reformation soon began to gather strength, and as wave after wave rolled on in every direction, false faiths and dogmas, and popular prejudices of immemorial growth were hopelessly swept away. *Samájes* were established at Bansbaria, Suksagar, Manirampur near Barrakpur, Panihati, Midnapur, Burdwan, Dacca and Rungpur. Of these the Suksagar and Midnapur Samajes were the earliest.

63. Kasiswar Mitra—Suksagar and Bhowanipur Brahma samajes.

The Suksagar Samaj was established by Kasiswar Mitra, Munsiff, afterwards a Small Cause Court Judge. Kasiswar Mitra also established the Bhowanipur Samaj long after.

64. Shiv Ch. Deb and Rajnarayan Bose—Midnapur Brahma samaj.

The Midnapur Samaj was established by Siv Chunder Dev of Konnagar, when he was a Deputy Collector there. After his transfer its existence was nearly forgot till revived by Rajnarian Bose, who was Head Master of the Zillah (now High) School there, in 1852 A. D,

65. Braja sundar Mitra—Dacca Brahma samaj.

The Dacca Samaj was established by Braja Sundar Mitra, a celebrated Brahmic reformer of Estern Bengal.

66. Maharaja of Burdwan—Burdwan Brahma samaj 1770 *Saka*—(1848 A. D.)

The Maharaja of Burdwan established the Burdwan Samaj in 1770 Saka (A. D. 1848).

67, Braja Nath Mukerji—Krisnanagore Brahma samaj.

The Krishnagar Samaj was also established about this time. Brojanath Mookerji (Teacher,) was its founder, and Ramlochan Ghose, the Principal Sudder Ameen of the District, took interest in it.

68. Ram Mohun Roy Chowdhury—Rangpur Brahma samaj.

The Rungpur Samaj was established at Tushbhander by its zemindar, Ram Mohun Roy Chudhuri, who, with some of his companions, embraced the faith at Calcutta before Devendanath Thakur.

উৎসবানন্দ-রামমোহন রায়সংবাদের বঙ্গানুবাদ।

(শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী)

(মহামহোপাধ্যায় উৎসবানন্দের)

প্রশ্ন।

মুক্তিরূপা স্ত্রীর কর্ণাভরণযুগল, মুনিগণের হৃদয়পক্ষীর দুইটীপক্ষ, অপার সংসারসমুদ্রের উপকূলদ্বয়, কলির পাপ-অন্ধকারসমূহের সূর্য্য ও চন্দ্র, পুণ্যবৃক্ষের বিকশিত মনোরম কোমল পত্রদ্বয়, বেদের নয়নযুগল রা ও ম এই বর্ণ-দুইটী সর্ব্বদা সাধুগণের মঙ্গল বিধান করুক। সচ্চিদা-নন্দানন্তবিগ্রহ পরব্রহ্ম বলিয়া যিনি উক্ত, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে (এই জগতে) মনীষিদিগের ভক্তিগম্য।

শ্রীভগবানের সচ্চিৎসুখানন্ত-মূর্ত্তি সম্বন্ধে মূঢ়বুদ্ধি-দিগের যে যে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা অনুকূল যুক্তিদ্বারা আমরা এখানে সমাধান করিব, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। অনন্তর আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের মতে জীবন্মুক্তি কাহাকে বলে, তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি, কিরূপে তাহা সম্পাদন করা যাইতে পারে এবং কেই বা তাহা লাভ করিবে ? "জীবন্মুক্ত" "ব্রাহ্মণ" "বর্ণাশ্রম অতিক্রমকারী" "কৃষ্ণভক্ত" "স্থিতপ্রজ্ঞ" ইত্যাদি পদের প্রতিপাদ্য এক কিংবা এক নহে ? প্রথম পক্ষে, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিতে এই সকল শব্দ প্রযুজ্য হয়। তাহা হইলে কৃষ্ণ ও ব্রহ্ম শব্দের একার্থতাই বলিতে হইবে। তবে আপনার প্রণীত "বেদান্তসারে"র ভাষায় "কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ দেবতা, তাঁহাকে ধ্যান করা উচিত" এই তাপনী শ্রুতিপ্রতিপাদিত শ্রেষ্ঠ দেবতার সহিত রুদ্র আকাশ জল বায়ু প্রভৃতির অভেদ অনুচিত বলিয়া মনে হয় ; কারণ উহারা (রুদ্র আকাশ জল বায়ু প্রভৃতি) সগুণ এবং তিনি (শ্রেষ্ঠদেব) নির্গুণ। এই জিজ্ঞাসা হেতু আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা সঞ্জাত হইয়াছে।

রাজা রামমোহন রায়ের

উত্তর।

যিনি রূপ নাম ইত্যাদি নির্দ্দেশবিশেষ-রহিত, ক্ষয় বিনাশ পরিণাম পীড়া ও জন্মবর্জ্জিত, এবং যাঁহাকে নিত্য বিদ্যমান মাত্র বলা যায়।

চিদাত্মা পরমেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণে লগ্নচিত্ত কোনও বৈষ্ণব নির্গুণ কৃষ্ণের সহিত সগুণ শিবাদির সাম্যের কারণ কি, ইহা কোনও ব্রহ্মজ্ঞান-লিপ্সু নাম-রূপাদির মিথ্যাত্ব ও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদির অভেদবাদীকে জিজ্ঞাসা করিলে পরাৎপর, জগতের অধীশ্বর, অদ্বৈত, পরমানন্দ-ভব, রুদ্ররূপ, সকলের একমাত্র মঙ্গল-(বিধাতা), শিবে কর্ম্ম মন ও বাক্য সমর্পণকারী তত্রস্থ কোনও শিবোপাসক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, হায়! এই বৈষ্ণব কি কৈবল্যাদি উপনিষদ দেখেন নাই ? মহাভারত ও পুরাণাদি অবলোকন করেন নাই ? কেবল বিষ্ণুপ্রতি-পাদক শ্রুতিই অধ্যয়ন করিয়াছেন ? নচেৎ তুরীয় অদ্বিতীয় শান্ত শিবে গুণের আরোপ আর শিবভক্ত শিবদত্তই যাঁহার বিষ্ণুত্ব, সেই বিষ্ণুতে নির্গুণত্ব প্রতিপাদন কখনই করিতেন না। যদি ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতির অবলীলাক্রমে জনয়িতা, পাপ হইতে মুক্তি-প্রদাতা শিবের বাস্তবিক সগুণত্ব ও অনীশ্বরত্ব হয়, আর শিবভক্ত কৃষ্ণের নির্গুণত্ব ও ঈশ্বরত্ব হয়, তাহা হইলে এই সকল (নিম্নলিখিত) শ্রুতি ও মহাভারতাদি বাক্যের গতি কি ? যথা কৈবল্যোপনিষদ—আদি মধ্য ও অন্তবিহীন এক বিভু চিদানন্দস্বরূপ হইতে উৎপন্ন উমাসহিত পরমেশ্বর প্রভু ত্রিলোচন নীলকণ্ঠ প্রশান্ত ইত্যাদি ; আরও, যাহা কিছু হইয়াছে ও যাহা কিছু হইবে সনাতন তিনিই সকল ; তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে, মুক্তির নিমিত্ত অন্য পথ নাই, ইত্যাদি। আবার শ্বেতাশ্বতরে—সত্য পরব্রহ্ম কৃষ্ণ-পিঙ্গল পুরুষ ঊর্দ্ধরেতা বিরূপাক্ষ বিশ্বরূপকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। যে রুদ্র অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি ওষধিতে, যে রুদ্র বিশ্বভুবনে প্রাবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই রুদ্রকে নমস্কার, ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতি যদি ব্রহ্মপক্ষে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা হইলে "কৃষ্ণএব পরো দেবঃ" ইত্যাদি শ্রুতিও ব্রহ্মপক্ষেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

হায়, হায়! এই বৈষ্ণব মহাভারতের দানধর্ম্মে ভীষ্ম-যুধিষ্ঠিরসংবাদে শিবসহস্রনামপ্রকরণও দেখেন নাই ? সেই প্রকরণস্থ কয়েকটী শ্লোক শিববিমুখ মূঢ়বুদ্ধিদিগের জ্ঞানের জন্য এখানে পঠিত হইতেছে। ভীষ্ম বলিতেছেন, ধীমান দেবদেবের গুণ বলিতে আমি অশক্ত। যিনি সর্ব্বগত দেব কিন্তু সর্ব্বত্র দৃষ্ট হন না। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ইন্দ্রের যিনি স্রষ্টা ও প্রভু, ব্রহ্মাদি দেবতা হইতে পিশাচ পর্য্যন্ত যাঁহাকে উপাসনা করে, যোগবিদ্, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ যাঁহাকে প্রকৃতি ও পুরুষের পরতত্ত্বরূপে চিন্তা করেন, যিনি অক্ষর পরম ব্রহ্ম, যিনি অসৎ ও সদসৎ। প্রকৃতি ও পুরুষকে স্বীয় তেজের দ্বারা বিক্ষোভিত করিয়া ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়াছিলেন বলিয়া (যিনি) দেবদেব প্রজাপতি। (সেই) ধীমান্ দেবদেবের গুণ বলিতে কে সমর্থ হয় ? শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ ভিন্ন গর্ভ-জন্ম-জরা-মরণশীল আমার মত কোন্ মর্ত্ত্য মানব পরমেশ্বর শিবকে জানিতে সমর্থ হয় ? এই বিদ্বান্ বহু-শ্রেষ্ঠ পরমহর্ষির দিব্যচক্ষু মহাতেজস্বী বিষ্ণু যোগচক্ষু দ্বারা দেখিয়া থাকেন। মহাত্মা কৃষ্ণ শিবভক্তি হেতু

জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। আবার, চরাচরগুরু বরদাতা দেব শিবকে আরাধনা করিয়া যুগে যুগে শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, ইত্যাদি। এইরূপ কাশীখণ্ডেও—একমাত্র ব্রহ্মই অদ্বিতীয়, সমস্ত (জগৎ) সত্য—সত্য; এখানে নানা বলিয়া কিছুই নাই; এক রুদ্র ভিন্ন দ্বিতীয় নাই; সেইহেতু একমহেশ্বর তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, ইত্যাদি। এইরূপ মহাভারতীয় বহু পর্ব্বে ও বহু পুরাণে ঈদৃশ বহু বচন পাওয়া যায়। সেই সেই বচনসমূহ দ্বারা স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায় যে, কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য সচ্চিদানন্দত্ব সর্ব্বজ্ঞত্বাদি মাহাত্ম্য বেদ-পুরাণাদিতে যাহা বর্ণিত আছে, সেই সকল পরমাত্মা শিবের প্রসঙ্গেই তিনি লাভ করিয়াছিলেন।

অনন্তর সেই শৈব-বৈষ্ণবের শিব ও বিষ্ণুর স্তুতি-নিন্দাবিষয়ক বিরোধ শ্রবণ করিয়া কোন হরিহরোপাসক বিষাদপ্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন। আহা! আপনারা বেদ-পুরাণাদির বিরোধী অর্থ কল্পনা করিয়া একাত্মা হরিহরের নূতন ভেদ ব্যাখ্যা করিতেছেন। "পক্ষপাত-মুক্ত হইলে (জীব) ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়" এই শ্রুতির ধ্বনিও কি আপনাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে? আরও বলি, সর্ব্বব্যাপ্ত ত্র্যক্ষর প্রণব ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের একাত্মপ্রতিপাদক, ইহা কি আপনাদের জানা নাই? হরিবংশও কি দেখেন নাই? সেখানকার কয়েকটী শ্লোক শ্রবণ করুন—ঐ যিনি বিষ্ণু তিনি রুদ্র, যিনি রুদ্র তিনি ব্রহ্মা; ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব দেবতাত্রয়ের একই মূর্ত্তি। জগতের শুভদাতা প্রভু বিষ্ণু ও মহেশ্বর কর্ত্তা ও কারণের কর্ত্তা এবং কর্ত্তা ও কারণের কারক। নারায়ণ ও মহেশ্বর অতীত ও ভবিষ্যতের উৎপাদক দেবতা। রুদ্র পরম বিষ্ণু, বিষ্ণু পরম শিব—একই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া লোকে নিত্য বিচরণ করেন, ইত্যাদি। এইরূপ "কৈলাশযাত্রা"য় হরিহরের ভেদজ্ঞান মহাপাতকের কারণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রযুক্তি হেতু ও শিষ্টপরম্পরায় ভগবান্ শ্রীধর স্বামীও ভাগবত টীকায় প্রারম্ভে তাঁহাদের উভয়কে একাত্মরূপে প্রণাম করিয়াছেন; যথা—বিষ্ণু ও শিব ঈশ্বর সর্ব্বসিদ্ধি বিধান করেন। পরস্পর-নমস্কারপ্রিয় অভেদাত্মরূপী সেই দুইজনকে বন্দনা করি।

তাহার পর পক্ষপাত হেতু ব্যাকুলিতচিত্ত বহুপরিবার শৈব ও বৈষ্ণবের শাস্ত্রবিরুদ্ধ যুক্তি হেতু দুঃখ ও করুণায় ব্যাপ্তচিত্ত, হরিহরোপাসকের বাক্য শুনিয়া আনন্দিত হইয়া আত্মতত্ত্বেচ্ছু কয়েকজন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে (বৈষ্ণব শৈব ও হরিহরিহরোপাসক—তিন জনকেই) বলিলেন:—একত্বদর্শী আমাদের মতে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যত-কিছু নামরূপ সমস্তই মায়াকার্য্য, দিক্ কাল ও আকাশে অব-স্থিত, পরিমিত এবং সত্যে আশ্রিত আছে। কেবল সত্যে আরোপিত বলিয়াই সত্যের ন্যায় প্রতীত হয়। অতএব অধ্যাসবলে 'এ সকলই ব্রহ্ম' ইহা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের অনুভূতির অনুসরণ করিয়া আমরা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ সমষ্টি ও ব্যষ্টি হিসাবে ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করি। অতএব দেবাদি হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু সুখানন্দ-স্বরূপ হইলে "এই সমস্ত তদাত্মক" ইত্যাদি পাঠকারী আমাদের কোন সন্দেহ উৎপন্ন হয় না; এবং ইহা যথার্থই। নাম ও রূপের অন্তরে যিনি আছেন, তিনি ব্রহ্ম; দ্বিতীয় হইতেই ভয় উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে সকল নাম-রূপাত্মক বস্তুই আমরা মিথ্যা বলিয়া মনে করি।

জীবন্মুক্তির সুস্পষ্ট লক্ষণ তাহার প্রমাণভূত গীতার (এই) শ্লোক দুইটী হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে—"হে পার্থ! যখন কেহ সমস্ত মনোগত কামনা পরিত্যাগ করেন, আত্মা দ্বারা আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তখন (তাঁহাকে) স্থিতপ্রজ্ঞ (জীবন্মুক্ত) বলে।" "দুঃখেও অনুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখেতে বিগতস্পৃহ। আসক্তি ভয় ও ক্রোধ অতিক্রমকারী (ব্যক্তি), স্থিরবুদ্ধি মুনি বলিয়া কথিত হন।" জীবন্মুক্তি কিরূপে কে লাভ করিবেন, এই প্রশ্ন আপ-নার সমালোচিত গীতার অগ্রিক (নিম্নোদ্ধৃত) শ্লোকের অর্থানুসারে অনুচিত বলিয়া মনে হয়। সেই শ্লোক এই—তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ প্রণিপাত প্রশ্ন এবং সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া জ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকেন।

আত্মীয়সভানির্ব্বাহক শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

"রামায়ণের কথা" সম্বন্ধে আলোচনা।

[শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয়ের রামায়ণী কথা সম্বন্ধীয় আলোচনার ফলে যে তৎকালীন অনেক সমাজতত্ত্ব সমালোচিত হইয়াছে, ইহার জন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। কিন্তু সুমিষ্ট দ্রব্য বহুল পরিমাণে ভোজন করিলে যেরূপ অপ্রীতিকর হইবার সম্ভাবনা আসে, আমাদের আশঙ্কা হয় যে, এই রামায়ণী কথা সম্বন্ধে আলোচনা সুদীর্ঘ হইবার কারণে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়া অসম্ভব নহে; তদ্ব্যতীত আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে, এই আলোচনার বাদ-প্রতিবাদের ভিতরেও অনশ্বর পরস্পরের প্রতি অপ্রীতিকর ভাব আসিয়া প্রবেশলাভ করিতেছে, ইহা মোটেই প্রার্থনীয় নহে। এই সকল কারণে নানাদিক ভাবিয়া আমরা এই আলোচনার ক্ষেত্র বিস্তৃত হইতে দিতে ইচ্ছা করি না। বৎসরের এই শেষ-সংখ্যার সঙ্গে ঐ আলোচনারও শেষ-

করিতে ইচ্ছা করিয়া বীরেশ্বর বাবুর দুইটী প্রবন্ধ এবং তদুত্তরে চিন্তামণি বাবুর লিখিত প্রত্যুত্তর, উভয় হইতেই অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক অংশসকল বাদ দিয়া উভয়েরই প্রকৃত বক্তব্যগুলি প্রকাশ করিলাম। আশা করি, উভয়েরই তজ্জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। তং সং]

(শ্রীবীরেশ্বর সেন)

গত আশ্বিনের পত্রিকায় আমার "রামায়ণের কথা" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎবিষয়ক সম্পাদক মহাশয়ের পাদটীকা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য :—

১। জাতকের প্রামাণ্য।

দশরথ-জাতকে যাহা আছে, আমি কেবল তাহারই সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম লিখিয়াছিলাম। জাতকটী প্রামাণ্য কিনা তাহার বিশেষ উল্লেখ করি নাই। গত বৎসরের চৈত্রসংখ্যার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে এইমাত্র লিখিয়াছিলাম যে, দশরথ-জাতকে রামকে সীতার ভ্রাতা বলিয়া উল্লিখিত আছে। তাহাতে সম্পাদক মহাশয় এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সীতা হয়ত রামের দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী ছিলেন। জাতকে সীতাকে রামের সহোদরা ভগিনী বলা হইয়াছে, কেবল তাহাই প্রদর্শন করা প্রয়োজন বলিয়া আমি জাতকের প্রামাণ্য বিষয়ে বিশেষ কোন কথা বলি নাই। কেবল এইমাত্র বলিয়াছিলাম যে, একই বিষয়ে দুই সম্পূর্ণ বিপরীত বিবরণ দেখিয়া বোধ হয় যে, রামসীতার বিবরণ বহুশত বৎসর পর্য্যন্ত অবিদিত থাকায় তাহা পরস্পরবিরুদ্ধ কাহিনীতে পরিণত হইয়াছিল। পরে বৌদ্ধেরা তাহার এক বিবরণ অবলম্বন করিয়া জাতক এবং হিন্দুরা অন্য কাহিনী অবলম্বন করিয়া রামায়ণ লেখেন। রামায়ণ ও জাতকের কোন্‌টী প্রথম কোন্‌টী বা পরবর্ত্তী রচনা, তাহার বিচার যদি পাঠকেরা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ঈশানচন্দ্র ঘোষ প্রকাশিত জাতকের ভূমিকা পাঠ করিবেন। কিন্তু এক বিষয়ের দুই বিরুদ্ধ বিবরণের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় হইলেও বিবরণের সত্যতা প্রমাণিত হয় না।

এই পর্য্যন্ত লিখিতে লিখিতে একটা পুরাতন কথা মনে পড়িল। অবান্তরভাবে তাহার উল্লেখ করিতেছি। ১৫।২০ বৎসর হইল সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম, একটা সভায় শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, রামায়ণ ও মহাভারত উভয়েরই ঘটনাস্থান ভারতবর্ষের বহির্ভাগে হিমালয়ের উত্তরদেশে ছিল। সেই সভায় গবর্ণর প্রমুখ বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটা কথা বোধ হয় এখনও আমার ঠিক মনে আছে; তাহা এই যে, রামায়ণে যমুনা নদীর বর্ণনায় নাকি উক্ত হইয়াছে যে, তাহা পশ্চিমবাহিনী হইয়া সাগরে পড়িতেছে। উক্তিটী কিন্তু আমি রামায়ণের সহিত মিলাইয়া দেখি নাই।

২। অহল্যা, ইন্দ্র, প্রজাপতি, অসুর প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত অর্থ।

ইন্দ্র গুরুপত্নী হরণ করিয়াও লোকপূজ্য হইয়াছিলেন, ইহা অপেক্ষা ইন্দ্র-শব্দের অর্থ সূর্য্য এবং অহল্যা-শব্দের অর্থ রাত্রি ইহা অনায়াস-বোধ্য। ইহা অধিক যুক্তি দিয়া প্রমাণ করিতে যাওয়া অনাবশ্যক। তবে অসুর-শব্দ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা তেমন স্পষ্ট হয় নাই। এখন সংক্ষেপে তাহা স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিব। আসিরিয়া (assyria) দেশের অধিবাসীদিগের সাধারণ নাম ছিল অসুর। গৃহবিবাদ বশত তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত হন এবং এক দল সুর নাম গ্রহণ করেন। ইঁহাদের অপর নাম দেব। এই মহাতত্ত্বটী প্রথমে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আবিষ্কার করেন। পরে ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরাও সংস্কৃত শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া ইহার সমর্থন পান। বেদে উক্ত হইয়াছে, সুর এবং অসুরগণ পরস্পর ভ্রাতৃব্য অর্থাৎ cousin ছিলেন। ইহা ৺উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রকাশ করেন। তিনি ভ্রাতৃব্য শব্দের প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করিয়া পাণিনির ভ্রম প্রদর্শন করেন। শ্রীযুক্ত অমূল্য চন্দ্র বিদ্যাভূষণও cousin অর্থে ভ্রাতৃব্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ১ম কাণ্ডে ৭ম অধ্যায়ে ৫ম ব্রাহ্মণের ২২ কণ্ডিকায় উক্ত হইয়াছে যে, দেব এবং অসুর একই বংশে জন্মিয়াছিলেন "দেবাশ্চ অসুরাশ্চ উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ"। ১১ কাণ্ডের ৩য় অধ্যায়ে ৪র্থ ব্রাহ্মণের প্রথম কণ্ডিকায় উক্ত হইয়াছে যে, অসুরেরা জ্যেষ্ঠ এবং সুরেরা কনিষ্ঠ "কনীয়সঃ এব দেবা জ্যায়স এব অসুরাঃ"।

রামায়ণের সময়ে লোকে এই তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই বালকাণ্ডের ৪৫ সর্গে লিখিত হইয়াছে যে, সমুদ্র-মন্থন কালে বরুণাসুরের কন্যা সুরার উত্তোলন হয়; অসুরেরা তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু দেবেরা করিলেন। এইজন্যই দেবেরা সুর আখ্যা পাইলেন। দেবেরাও যে অসুর নামে আখ্যাত হইতেন, সায়ণের সময়ে পণ্ডিতেরাও তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এইজন্য সায়ণ ইন্দ্রকে অসুর বলিয়া অভিহিত দেখিয়া অসুর শব্দের ব্যুৎপত্তি অস্‌ নিক্ষেপে করিয়া তাহার অর্থ করিলেন দিব্যাস্ত্র-নিক্ষেপকুশল।

৩। সীতার বয়স।

রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা হইবার সময়ে সীতার বয়স অন্তত একচল্লিশ বৎসর ছিল, এই কথা আমি লিখিয়াছিলাম। সম্পাদক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই যে, "অরণ্যকাণ্ডের ৪৭ সর্গে সীতা নিজেই বলিয়াছেন, বিবাহের পর তিনি ১২ বৎসর শ্বশুরবাড়ীতে ছিলেন। তাহার পর তিনি রামের সহিত বনে যান। তখন রামের বয়স ২৫ এবং তাঁহার নিজের বয়স ১৮ বৎসর।" সম্পাদক মহাশয় সীতার ১২ বৎসর শ্বশুরালয়ে থাকার কথাটা প্রক্ষিপ্ত মনে করিয়া বলেন যে, সীতার বিবাহের অব্যবহিত পরেই তাঁহার বনবাস হয়। তাহা হইলে বিবাহের সময়েও সীতার বয়স ১৮ ছিল। তাহার পর সীতা ১৪ বৎসর বনে থাকেন। তখন রাবণ তাঁহাকে হরণ করেন। সুতরাং হরণের সময়ে তাঁহার বয়স ১৮+১৪=৩২ বৎসর। শ্বশুরালয়ে ১২ বৎসর থাকার কথাটা প্রক্ষিপ্ত হইলে সমগ্র অযোধ্যাকাণ্ডটাই প্রক্ষিপ্ত। অপর পক্ষে সীতাকে একলা দেখিয়া রাবণ তাঁহাকে হরণ করিবার মানসে অতিথিরূপে তাঁহার কাছে গিয়াছিল। সীতা তাঁহাকে অতিথি ভাবিয়াই সৎকার করিতে উদ্যত হইলে রাবণ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে অন্যান্য কথার সঙ্গে সীতা বলিলেন যে, তাঁহার বয়স ১৪ বৎসর পূর্ব্বে ১৮ বৎসর ছিল। এই বয়সের কথাটাই প্রক্ষিপ্ত হওয়া অধিক সম্ভব, কেননা অতিথিকে তাহা বলার প্রয়োজন মাত্র ছিল না। যখন ৮,৯ বৎসর বয়সই বিবাহের বয়স বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল, তখনকার কোন পণ্ডিতই যে এই বিধির সমর্থন রামায়ণে আছে, ইহা দেখাইবার উদ্দেশে এই প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। রামায়ণে বহুস্থানে বলা হইয়াছে যে, বিবাহের সময়ে রামের বয়স ছিল ১৬ বৎসর। সীতা তাঁহা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও তাঁহার বয়স ১৫ হইয়াছিল। কেননা তাঁহার বয়স তখন "পতিসংযোগসুলভ" হইয়াছিল। তাহার পর ১২ বৎসর অযোধ্যায়। তাহার পর ১৪ বৎসর বনবাসে, সুতরাং হরণের সময়ে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৪১ বৎসর।*

* * *

কার্ত্তিকের পত্রিকায় চিন্তামণি বাবুর লিখিত আমার "রামায়ণের কথার" সমালোচনা সম্বলিত প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। চিন্তামণি বাবু আমার প্রবন্ধ পড়িয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, জাতক পড়িয়া আমার এই "নিশ্চিত ধারণা" হইয়াছে যে, সীতা ছিলেন রামের ভগিনী। আমার লিখিবার দোষেই বোধ হয় চিন্তামণি বাবুর এইরূপ ধারণা হইয়াছে। আমার বিবক্ষা এই ছিল যে, সীতা বাস্তবিকই রামের ভগিনী ছিলেন কিনা এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা আলোচনা করিয়া একটী নির্দ্ধারণ করুন। এই কথাটা বোধ হয় স্পষ্ট করিয়া লিখিতে পারি নাই।

আমি স্পষ্টভাবে ইহাও বলিয়াছিলাম যে, রামায়ণে সীতাকে জনকের কন্যা বলা হইয়াছে; ইহা শুনিয়া বৌদ্ধেরা জনক অর্থে পিতা বুঝিয়াছিলেন, অথবা বৌদ্ধেরাই সীতাকে রামের ভগিনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, বাল্মীকি তাহা শুনিয়া জনক নামে এক রাজার কল্পনা করিয়াছেন। এই বিষয়ের নিরপেক্ষ আলোচনা হইলে একটি সাহিত্যিক উপভোগ্য বস্তু হইবে বলিয়া আমি আশা করিয়াছিলাম।

রামায়ণে একরূপ আছে—জাতকে অন্যরূপ আছে, সুতরাং জাতক মিথ্যা; এরূপ তর্ক যেমন যুক্তিসঙ্গত বা logical নহে, জাতকের কথার বিরুদ্ধ কথা রামায়ণে আছে অতএব রামায়ণ মিথ্যা, এরূপ বলাও তেমনি illogical.

যে বিষয়ে ঐতিহাসিক স্থিরতা নাই, তাহা লইয়া কবিগণ চিরদিনই যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রজাপতি ও উষার কাহিনী বেদে একরূপ, পুরাণে অন্যরূপ। রাম ও সীতার কাহিনীও সেইরূপ রামায়ণে একপ্রকার, জাতকে অন্য প্রকার। কেননা মূল ঐতিহাসিক তত্ত্বটা যে কি, তাহা নির্ণীত হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি ইহারও ব্যঞ্জনা দিয়াছি।

জাতকরচয়িতা যে রামায়ণরচয়িতার ধর্ম্মকে অশ্রদ্ধেয় প্রমাণ করিবার জন্য দশরথজাতক রচনা করিয়াছিলেন, একথায় আমি চিন্তামণি বাবুর অনুবর্ত্তী হইতে পারি না। পূর্ব্বকালে যদি বৌদ্ধসমাজে ভ্রাতাভগিনীতে বিবাহের প্রথা থাকিয়া থাকে এবং সেই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া যদি রাম স্বীয় ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞার উৎপাদন হইতে পারে না। অবজ্ঞা জন্মাইবার অভিপ্রায় থাকিলে রামের নামে অন্য দোষ কীর্ত্তিত হইত। রামকে বরং জাতকেই অধিকতর পিতৃসত্যপালনকারীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে রামায়ণের রাম অপেক্ষা জাতকের রামকে ভাল বলিয়া দেখান হইয়াছে। যাঁহারা পক্ষপাত-শূন্য হইয়া জাতক পড়িবেন, তাঁহারা অবশ্যই ইহা উপলব্ধি করিবেন। জৈন-গ্রন্থসমূহের নানাস্থানে হিন্দুধর্ম্মকে হীন করিবার চেষ্টা দেখা যায়, অতএব বৌদ্ধ জাতকেরও উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্ম্মকে হীন করা, এরূপ যুক্তির বলবত্তা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

একটা কথা চিন্তামণি বাবুকে বিবেচনা করিতে বলি। জৈনশাস্ত্রে রাম কৃষ্ণ দশরথ প্রভৃতিকে সমসাময়িক বলা হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রেও ঐ সকল ব্যক্তির সমসাময়িকতার কথা পাওয়া যায়। রামের সমসাময়িক সুগ্রীব বলিতেছেন যে, প্রাগ্‌জ্যোতিষে নরক নামে এক দুষ্টমতি রাজা আছেন। মহাভারতে দেখি, সেই নরককে কৃষ্ণ নিহত করেন। সুতরাং রাম, কৃষ্ণ, সুগ্রীব ও নরক সমসাময়িক ছিলেন। ভীষ্ম ও পরশুরামে এবং পরশুরাম ও রামে যুদ্ধ হইয়াছিল। হরিবংশের মতে কৃষ্ণ ও বলরামের সহিত পরশুরামের সখ্য হইয়াছিল। হরিবংশে আরও আছে, কৃষ্ণ স্যমন্তক মণি চুরী করিয়াছেন এই সন্দেহ করিয়া বলরাম তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া জনকের রাজধানীতে গিয়া তথায় তাঁহার অতিথি হইয়া কিছুকাল বাস করেন। সেই

---

* ৩২ ও ৪১ সীতার এই দ্বিবিধ বয়ঃপরিমাণের সমর্থনই রামায়ণে পাওয়া যায়। স্বীয় মতের আনুকূল্যে যাঁহার যাহা ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারেন; তাহাতে আপাততঃ আপত্তির কোনই কারণ দেখা যায় না। তং সং

জনক ছিলেন রামের শ্বশুর। তাহা হইলে দেখা যায়, রাম, কৃষ্ণ, দশরথ, পরশুরাম জনক প্রভৃতি সকলেই সমসাময়িক ছিলেন। ইহাঁদের কেহ কেহ ন্যূনবয়স্ক কেহ বা কিছু অধিকবয়স্ক ছিলেন মাত্র।

আমি রামায়ণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াই প্রদর্শন করিয়াছিলাম যে, দশরথের এই সত্য ছিল যে, রাম কখনই রাজা হইবেন না। সুতরাং চৌদ্দ বৎসর পরে তিনি রাজ্য গ্রহণ করায়, তাঁহার সমগ্র পিতৃ-সত্য পালন করা হয় নাই। কিন্তু চিন্তামণি বাবু দেখাইয়াছেন যে, চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে মৃত দশরথ রামকে বলিলেন যে, আমি যে আদেশ দিয়াছিলাম তাহা তোমার সম্যক্ পালন করা হইয়াছে—তুমি এখন দেশে ফিরিয়া গিয়া রাজত্ব কর। সুতরাং দশরথের আদেশেই তাঁহার প্রথম আদেশ রহিত হইল। এই উক্তি রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত হইলেও আমি ইহার সত্যতা স্বীকার করিতে পারি না।

রামায়ণ যে মুখ্যভাবে কাব্য এবং গৌণভাবে ইতিহাস ইহা আমি অবগত আছি এবং তাহার উল্লেখও আমি করিয়াছি। আলোচনাও সেই ভাবেই হইয়াছে। যেমন ইতিহাসের তেমনি মহাকাব্যেরও সমালোচনা হইতে পারে এবং হইয়াছে।

রামায়ণরচনা সময়ে মধুপর্কে পশুবধ, মদ্যপান, পত্নীপদস্খলিতা নারীকে স্বামীর পুনর্গ্রহণ প্রভৃতি প্রচলিত ছিল, আমি তাহার উল্লেখ মাত্র করিয়াছি। আমি জাতক ও রামায়ণ পড়িয়া তদ্বিষয়ে বিচার আহ্বান করিয়াছিলাম।

লাঙ্গলের পদ্ধতিকে যে 'সীতা' বলে, ইহা প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু Weber ও Wheelerএর মতে সীতা-হরণের ব্যাখ্যা এইরূপ,—দক্ষিণাপথে পূর্ব্বে কৃষিকার্য্য ছিল না। সেই দেশবাসী কয়েকজন লোক গোপনে কৃষিবিদ্যা শিখিয়া নিজ দেশে তাহা প্রচার করিয়াছিল। এই সীতাহরণই রামায়ণে মানুষ সীতাহরণরূপ রূপকে বর্ণিত হইয়াছে।

* * *

চিন্তামণিবাবুর প্রত্যুত্তর।

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয়ের "রামায়ণের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য গত আশ্বিনের সংখ্যায় প্রকাশ করি। তিনি আবার উত্তরে যাহা লিখিয়াছেন, তদুত্তরে আমার কয়েকটী বক্তব্য সংক্ষেপে নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। বীরেশ্বর বাবু লিখিয়াছেন যে, গোমাংসভক্ষণ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। ইহা আমরা অস্বীকার করি না। তৎসম্বন্ধে এত প্রমাণপ্রয়োগের আবশ্যকতা ছিল না।

হরণকালে সীতার বয়স সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে অযোধ্যাকাণ্ডের ১১৮ সর্গের উক্তি উল্লেখ করিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সীতা যে রামচন্দ্রের ভগিনী ছিলেন না, তাহার প্রমাণ আমরা ইতিপূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ভ্রাতাভগিনীর মধ্যে যে বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আরও দুই চারিটি অনুরূপ দৃষ্টান্ত বীরেশ্বর বাবু সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র হইতে দিলে আমরা তাঁহার উক্তি বিনা তর্কে স্বীকার করিতে পারিতাম। সমগ্র রামায়ণে বা অন্য কোন পুরাণাদিতে ভ্রাতা-ভগিনীবিবাহজনিত রামচন্দ্রের কলঙ্কের বিষয় কোথাও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। জাতকের কাহিনী যে পূর্ণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ ধারণা আমাদের নাই।

বীরেশ্বর বাবু তাঁহার পত্রের আর এক স্থানে বলিয়াছেন যে, "রামায়ণে সীতাকে জনকের কন্যা বলা হইয়াছে, ইহা শুনিয়া বৌদ্ধেরা জনক অর্থে পিতা বুঝিয়াছিলেন, অথবা বৌদ্ধেরাই সীতাকে রামের ভগিনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, বাল্মীকি তাহা শুনিয়া জনক নামে এক রাজার কল্পনা করিয়াছেন।" আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, রামায়ণ আগে—না বৌদ্ধ জাতকগ্রন্থ আগে? পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ জনকশব্দটি দেখিয়া হিন্দুধারণাকে খর্ব্ব করিবার জন্য রাম ও সীতাকে ভ্রাতা ও ভগিনী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গত ১৮৪১ শকের ভাদ্র-সংখ্যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "বৌদ্ধধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্ম" সম্বন্ধে আমার যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহাতে আমি দেখাইয়াছি যে, বৌদ্ধ জাতকের অনেক গল্প বাইবেলের ভিতর স্থান পাইয়াছে। কয়েকখানি রুটি ও কয়েকটা মৎস্য লইয়া অসংখ্য লোককে খাওয়াইবার বৃত্তান্ত বাইবেলে আছে। বৌদ্ধ কাহিনীতে অতিরিক্ত কথা এই যে, একখানি রুটি খণ্ড খণ্ড করিয়া পাঁচশত লোককে খাওয়াইও এত উদ্বৃত্ত রহিল যে, তাহা পর্ব্বতগুহায় নিক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। পণ্ডিত মোক্ষমূলার বলেন যে, খৃষ্টের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্পর্শে এইরূপ অনেক কাহিনী পাশ্চাত্য ভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছিল। আমাদের কথা এই, বরং রামায়ণকে কতক পরিমাণে ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু জাতক নহে।

বীরেশ্বর বাবু আর এক স্থানে বলিয়াছেন যে, সে সময়ে মাংস ও মৎস্যের সহিত দধি মিশ্রিত করিয়া আহারের ব্যবস্থা ছিল; অন্য কোন রন্ধনের মসলা ছিল না। আমরা তাহার উত্তরে উল্লেখ করিয়াছিলাম, দধির সহিত মৎস্যমাংসের পাক আজও আছে। আমরা প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ "মিলিন্দপ্রশ্ন" হইতে দেখাইতে চাই যে, বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত প্রায় সমস্ত মসলার প্রচলন বহু পূর্ব্ব হইতে রহিয়াছে। শ্রদ্ধেয় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের ৯৩১।৩২ পৃষ্ঠায় আছে "যেমন মহারাজা, যদি কোন রাজার পাচক যুষ বা রস পাক করে, তবে সে তাহাতে দধিও প্রক্ষেপ করে, লবণও প্রক্ষেপ করে, আদাও প্রক্ষেপ করে, জীরকও প্রক্ষেপ করে, মরীচও প্রক্ষেপ করে এবং অন্যান্য প্রকারের উপকরণও প্রক্ষেপ করে" ইত্যাদি। এই গ্রন্থখানি পালিভাষায় লিখিত। ইহা উদীচ্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের একমাত্র পুস্তক বা ধর্ম্মগ্রন্থ।

উৎসবানন্দ-রামমোহন রায়সংবাদের

ডাঃ ভি. রায় কৃত টিপ্পনী।

Date of প্রশ্ন 14th Jyet Sunday. It is 1223 of which 14th Jyet is Sunday. Of 1222 it is Saterday, of 1224 it is the Monday.

14th Jyet 1223	=	26th May 1816
19th Aswin 1223	=	3rd Octr. 1816
31 Aswin 1223	=	15th Octr. 1816
20 Agrahn 1223	=	3rd Dec. 1816.

CONTENTS OF BOUND BOOK H a b of the Serampur College Library

[1] An apology for the pursuit of final beatitude independently of Brahminical observer by Rammohan Ray, Printed at the Baptist Mission Press, Circular Road.

1280 (clearly misprint for 1820) in five languages and characters. 1. Sanskrit, nagri type. 2. Sanskrit, Bengali type. 3. Hindi and Nagri 4. Bengali 5. English.

[2] ভূমিকা to reply to Mretynjay Vidyalankar's বেদান্তচন্দ্রিকা 3 pages.

[3] ঈশোপনিষদ with Sivaprasad sarma's commentary in Sanskrit 13 pages.

[4] কেনোপনিষদ with a commentary (name not given) 22 pages.

[5] উৎসবানন্দ শর্ম্মা's reply dated 19 Assin 1223, 19 pages.

[6] Rammohan Roy's reminder, dated 31st Aswin 1223, 16 pages.

[7] do do dated 20th Agrahn 1223, 10 pages.

[8] উৎসবানন্দ's question and R. Roy's answer, the Questions Dates 14 Jyet (1223), the answer was undated, 7 pages.

[9] The same as No. 8

[10] The same as No. 5

[11] The same as No. 6

[12] The same as No. 7

[13] কঠোপনিষদ্ followed by শঙ্কর's Bhasya pp. 78

[14] ঈশোপনিষদ followed by Sankar's Bhasya pp. 20

[15] কেনোপনিষদ followed by Sankar's-Bhasya pp. 38

[16] মণ্ডুকোপনিষদ followed by Sankar's Bhasya pp. 49

[17] Last 5 pages of ঈশোপনিষদ No. 3

[18] The same কেনোপনিষদ No. 4

[19] (After 2 pages of No. 18) corrigenda of the কঠ ঈশ কেন মণ্ডুক Upanisadas 2 pages.

[20] কবিতাকারের প্রত্যুত্তর ভূমিকা pp 23 and প্রত্যুত্তর 39 pp, ভূমিকা dated 1820 and প্রত্যুত্তর শকাব্দা 1742.*

"ব্রাহ্মধর্ম্মে"র মন্ত্রসংগ্রহ।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

বর্দ্ধমান-মহারাজ মহতাপ চাঁদ, মহর্ষির সংস্পর্শে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরাগী হন। আমি তাঁহার বর্দ্ধমানস্থ উদ্যানবাটিকায় সে সময়ে প্রকাশিত দুই-চারিখানি ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতাগ্রন্থ দেখিয়া আসিয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক পড়িয়া তাঁহার মনে পরে এক সময়ে এই কথাটি জাগিয়া উঠে যে, উপনিষদের মন্ত্রগুলি আমূল ব্রাহ্মধর্ম্মে সন্নিবেশ না করিয়া মহর্ষি কোন কোন স্থলে ইহার কতকটা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন কেন? অর্থাৎ কোন একটি মূল মন্ত্রের অর্দ্ধাংশের সহিত অপর মন্ত্রের অপরার্দ্ধ যোগ করিয়া কোন কোন মন্ত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে গ্রথিত করিয়াছেন কেন? তিনি কি উপনিষদের ঋষিগণ অপেক্ষা পণ্ডিত? এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে তিনি কালনা-ব্রাহ্মসমাজের বিহারীলাল বাবুকে এক পত্র লিখেন। বিহারী বাবু নিজের পক্ষে উহার সদুত্তর দেওয়া সুকঠিন বিবেচনায় উক্ত পত্রখানির সম্বন্ধে কিরূপ উত্তর দেওয়া যায়, তাহা নির্ণয় জন্য আমার পিতার পরামর্শ চাহিয়া পাঠান। রাজা মহতাপ চাঁদের একটি বাতিক ছিল যে, তাঁহার পিতৃপিতামহের নির্ম্মিত সুন্দর উদ্যানবাটিকা আবশ্যক না হইলেও কতক অংশ ভগ্ন করিয়া আবার নূতনভাবে তাহার পুনর্গঠন করিতেন। আমার পিতা পূর্ব্ব হইতে রাজার এই বাতিক জানিতেন; তাই প্রত্যুত্তর দেওয়া আমার পিতার পক্ষে কতকটা সহজ হইয়া পড়িল। পিতা এই-ভাবে বিহারী বাবুকে রাজার পত্রের উত্তর দিতে বলিলেন যে, "আপনার (রাজার) পিতা বা পিতামহ আপনার অপেক্ষা বিচক্ষণ ছিলেন, একথা আপনি বোধ হয় অস্বীকার করেন না। যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহাদের নামের সহিত বিজড়িত সুন্দর অট্টালিকাগুলি বা তাহার অংশবিশেষ ভাঙ্গিয়া আবার নূতনভাবে নির্ম্মাণ করিতেছেন কেন? রাজা নিশ্চয় বলিবেন যে, আরও সুন্দর দেখাইবার জন্য। মহর্ষির পক্ষেও তাই। তিনি উপনিষদের কোন কোন মন্ত্রকে আরও সহজ সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী করিবার জন্য উহার রচনার উপর বিন্দুমাত্র আঘাত না দিয়া উপনিষদের কোন কোন মন্ত্রের অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া তাহা অন্য মন্ত্রের অংশ-বিশেষের সহিত বিজড়িত করিয়া ও পাশাপাশি ধরিয়া

---

* শ্রীরামপুর লাইব্রেরীতে রাজা রামমোহনের কোন্ কোন্ দুষ্প্রাপ্য পুস্তক অদ্যাপি পাওয়া যায়, এই তালিকায় তাহা সুব্যক্ত হইয়াছে। রাজা রামমোহন সম্বন্ধে যাঁহারা, গবেষণা করিবেন, এই তালিকা দ্বারা তাঁহাদের সাহায্য হইবে বলিয়া আমরা ইহা প্রকাশ করিলাম। তং সং

ব্রাহ্মধর্ম্মে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। উপনিষদকার ঋষিদিগের উপর টেক্কা দিবার তাঁহার আদৌ উদ্দেশ্য ছিল না। সদ্বুদ্ধির দ্বারা (good faith) প্রণোদিত হইয়া তিনি ঐরূপ করিয়াছেন। ইহার জন্য মহর্ষির উপর দোষ দেওয়া যাইতে পারে না।" বিহারী বাবু আমার পিতার নিকট হইতে ঐরূপ ইঙ্গিত পাইয়া বর্দ্ধমান রাজাকে প্রত্যুত্তর দিলেন। রাজাও উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন; অন্ততঃ ইহার প্রত্যুত্তরে আর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই।

৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুইখানি পত্র।

"দেহ জ্ঞান"

শান্তিধাম।
সোমবার।
২৯।১।২৩

স্নেহাস্পদেষু

"দেহ জ্ঞান দিব্য জ্ঞান" আমিই আদিব্রাহ্মসমাজের উপাসনার মধ্যে প্রথম প্রবর্ত্তিত করি—মহর্ষি আমাকে একদিন বল্লেন "তুমি এ গান কোথায় পেলে? এ যে আমার প্রার্থনা"।

এর থেকে মনে হয় তাঁরই রচিত।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* * *

শেষ পত্র।

রাঁচি, ২০।২।২৫

স্নেহাস্পদেষু

ক্ষিতি, তোমার চিঠি পেয়ে সমস্ত অবগত হলুম। আমি ব্রন্‌কাইটিস্ জ্বরে শয্যাগত—ভয়ানক দুর্ব্বলতা; তাই আর কিছু লিখতে পারলুম না।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সংবাদ

"হরিসেনার" সাম্বৎসরিক—গত ৮ই চৈত্র রবিবার অপরাহ্নে "হরিসেনার" সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে হিদারাম ব্যানার্জির লেনে গোকুল-ক্ষেত্রে আহূত হইয়া পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

"আর্য্যসমাজের" সাম্বৎসরিক—গত ২২শে চৈত্র রবিবার সন্ধ্যায় "আর্য্যসমাজের" সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা "আর্য্যসমাজ-মন্দিরে" আহূত হইয়া আচার্য্য শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যথারীতি স্বাধ্যায়পাঠ ও উপদেশসহ উপাসনা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। সভাস্থলে প্রায় তিনশত উপাসক সমবেত হইয়াছিলেন। সকলেই উপাসনাতে প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

গার্হস্থ্যসংবাদ।

উপনয়ন—গত ২৭শে চৈত্র শুক্রবার, কৃষ্ণাষ্টমীর পুণ্য লগ্নে পূজ্যপাদ ৺দ্বিজেন্দ্রনাথের বৈবাহিক ৺প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের পৌত্র ও শ্রীঅমলকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অসিতকুমার রায় চৌধুরীর শুভ উপনয়ন-সংস্কার আদিব্রাহ্মসমাজের বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে তাঁহাদের বালিগঞ্জ-ষ্টেসন্ রোডের স্বকীয় বাসভবনে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উপনীত মাণবকের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ। ভগবান ইহাকে নিত্য জ্ঞান ও ধর্ম্মের পথে অগ্রসর করুন।

আনুষ্ঠানিক দান।

ডাক্তার শ্রীশচীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবাণীদেবীর নবজাত কন্যার জাতকর্ম্ম উপলক্ষে ২৲ টাকা দান পাওয়া গিয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীঅমলকুমার রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অসিতকুমার রায় চৌধুরীর উপনয়ন উপলক্ষে ২৲ টাকা দান পাওয়া গিয়াছে।

আমরা দাতাগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বর্ষশেষে ব্রহ্মোপাসনা।

আগামী ৩০শে চৈত্র সোমবার বর্ষশেষ। প্রত্যেক জীবনের একটী বৎসর নিঃশেষিত হইবে। জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া যিনি আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন, এই বর্ষশেষ-দিনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় আদি-ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।

আচার্য্য—শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়। উপদেশের বিষয়—"বর্ষচিন্তা"।

বক্তা—শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন, এম-এ। বিষয়—"রাজা রামমোহন রায়ের সহজ সাধন"

নববর্ষে ব্রহ্মোপাসনা।

পরদিন ১লা বৈশাখ মঙ্গলবার নববর্ষ। এদিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটী নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। এই নববর্ষ-দিনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হইবে। তদুপলক্ষে আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথের "ধর্ম্ম কি" এই বিষয়ে উপদেশ বিবৃত করিবেন।